তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

— কুড়ি টাকা —

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীজয়ন্ত বাকচি কর্তৃক পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

"And being a novelist, I consider myself superior to the saint, the scientist, the philosopher, and the poet, who are all great masters of different bits of man alive, but never get the whole hog.

The novel is the one bright book of life."

—D. H. Lawrence.

১

সেকালে লেখা হ'ত মহাকাব্য, একালে উপন্যাস, উপন্যাসই একালের মহাকাব্য অর্থাৎ মহা জীবনের কাব্য। মহা বলতে মহৎ নয়, ব্যাপক, বিশাল। পাশাপাশি অবিশ্যি সাহিত্যের আর সব ধারাই প্রবহমাণ এবং স্বাভাবিক নিয়মে কেউই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, থাকার কথাও নয়, ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে নিত্য নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে, সেটা বিষয় ও ভাবের দিক থেকেও বটে, রূপকল্পের দিক থেকেও বটে। লেখকরা বেছে নিচ্ছেন তাঁদের আত্ম-প্রকাশের এক-একটি পথ, কেউ কাব্যের, কেউ নাটকের, কেউ আর কিছুর। কিন্তু তবু একালের সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখবো, ডি. এইচ. লরেন্স যেমন বলেছেন, একমাত্র ঔপন্যাসিকই দাবী করতে পারেন : 'জীবনের কথা আমিই সম্পূর্ণরূপে বলতে পারি।' তিনি একথা বলতে পারেন, বলার অধিকার আছে তাঁর, কেননা, ভেবে দেখলে দেখা যাবে, উপন্যাসের ভিতর দিয়ে জীবনের কথা যেমন করে বলা যায়, যেমন করে জীবনের সমগ্রতা প্রকাশ করা যায়, সাহিত্যের আর কোন শাখার মধ্যেই তা সম্ভব হয় না, তা সে কাব্যই হোক, নাটকই হোক। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, অনেক রেখে-ঢেকে সাজিয়ে র'য়ে-স'য়ে বলার ব্যাপার আছে, একমাত্র উপন্যাসের ক্ষেত্রেই আছে অবাধ স্বাধীনতা, দরজা তার অবারিত, কোন ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ব্যাপার নেই, কোন ঢাকাঢাকির ব্যাপার নেই। বস্তুত, ডি. এইচ. লরেন্স মোক্ষম কথাটি বলেছেন এবং ঠিকই বলেছেন যে ঔপন্যাসিক সকলের ওপরে, কারণ আর কেউই জীবনের সমগ্র রূপকে সম্পূর্ণ করে তুলে ধরতে পারেন না। উপন্যাসই জীবনের উজ্জ্বল গ্রন্থ।

কথাগুলি ব্যাপক অর্থে যে কোন ঔপন্যাসিক সম্পর্কেই সত্য। স্কট থেকে হেমিংওয়ে, সল বেলো, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সাম্প্রতিক কোন বাঙালী তরুণ লেখকের লেখার দিকে তাকিয়ে ডি. এইচ. লরেন্সের এই কথাগুলি উচ্চারণ করা যায়। তবু যখনই সাহিত্য হিসেবে উপন্যাসের এই মৌলিকতার কথা ভাবি, তখন কী জানি কেন, আমাদের সাহিত্যের আরো কিছু লেখকের সঙ্গে তারাশঙ্করের কথাটাই বেশি করে মনে পড়ে। মনে পড়ে, কারণ, তারাশঙ্কর এমন একজন লেখক, সম্ভবত একমাত্র লেখক, যিনি জীবনের 'দি হোল হগ'টাই দেখতে চেয়েছেন। এইটেই

তাঁর লেখক-স্বভাবের মৌল প্রবণতা এবং তাঁর লেখায় এই প্রবণতা এতো বেশি স্পষ্ট যে তাঁর যে কোন উপন্যাস থেকে যে কোন পাঠক এই সত্যে উপনীত হতে পারেন। যখন তিনি 'কবি' লিখেছেন এবং তার অনেক পরে 'আরোগ্যনিকেতন' লিখেছেন, এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান নিশ্চয়ই আছে, তবু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট মানসিকতা হিসেবে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির লেখার মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় একই থেকে গেছে। তারাশঙ্করের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা হল, জীবনকে তিনি কখনোই বিচ্ছিন্ন একক কোন কিছু ভাবতে পারেননি, দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য অখণ্ডতা দিয়ে যে মানবজীবন রচিত, তিনি বারংবার সেই জীবনেরই সন্ধান করেছেন, তার রহস্য উন্মোচনে ব্যাপৃত হয়েছেন। এবং এখানেই তিনি ঔপন্যাসিকরূপে সেই উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত জীবনালেখ্য রচনা করেছেন—যে উপন্যাসের কথা ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর 'হোয়াই দি নভেল ম্যাটারস্' প্রবন্ধে বলেছেন।

কথাটা ব্যাখ্যা করলে ভালো হয়। তারাশঙ্করের সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে দেখা যাবে, জীবন তাঁদের কাছে মূলত কিছু ঘটনার সমাবেশ। এঁরা দেখেছেন জীবনকে, তারাশঙ্কর জীবনের ধারাকে। মানবজীবনের গহনতলে যে অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে চলেছে, যা যুগপৎ একটা বিশেষ কাল, ভূখণ্ড ও ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত এবং যা মৃত্তিকা-উদ্ভূত, তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে সেই জীবনকেই স্পর্শ করবার জন্য বারবার উন্মুখ হয়েছেন। সেইজন্যই, মূলত এই কারণেই, তিনি তাঁর কাহিনী ও চরিত্রমালাকে একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিকতা, ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়েও এগুলির সমবায়ে গঠিত অথচ এসবের অতীত একটি অখণ্ড জীবনসত্যে পৌঁছে দিয়েছেন। এখানেই তিনি আঞ্চলিকতাকে আশ্রয় করেও জীবনের মর্মমূলে উপনীত হয়েছেন, বিশেষ জীবনের চিত্রকর হয়েও তিনি চিরায়ত মানবজীবনেরই শিল্পী এবং এখানেই তিনি স্বচ্ছন্দে সব মহৎ লেখকের মতো বিশেষ কালের হয়েও বিশেষ কালের সীমা পার হতে পেরেছেন।

২

এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে হল এই সংকলনের উপন্যাস দুটির কথা ভেবে। একটি 'রাধা', অপরটি 'কীর্তিহাটের কড়চা'র শেষ অংশ।

'রাধা' উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে কিনা জানি না, কিন্তু উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস—যে যুগে তাকিয়ে সাধককবি রামপ্রসাদ খেদোক্তি করে বলেছিলেন, "এমন মানব-জমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।" সাহিত্যের দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিচয় অবশ্য ভারতচন্দ্রের নামে। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, রামপ্রসাদের মতো মানুষ কী গভীরভাবেই না তাঁর যুগকে অনুভব করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের জীবনের আশ্রয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ছবি এঁকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর 'অমাবস্যার গান' উপন্যাসে এবং এই নামকরণের ভিতরেই তিনি এই শতাব্দীর চরিত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ

করেছেন। রামপ্রসাদের মতো তারাশঙ্করও ঐ শতাব্দীর মর্মরূপ ঠিকমতো অনুভব করতে পেরেছিলেন, রামপ্রসাদের মতো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচুর্য বাঙালীর জীবনকে ঐশ্বর্যময় করতে পারতো, মানব-জমিতে সোনা ফলতে পারতো, কিন্তু ফলল না, সমস্ত সম্ভাবনা অপচয়িত হয়ে গেল। আমি জানি না, তারাশঙ্করের চোখের সামনে রামপ্রসাদের ঐ বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল কিনা, কিন্তু একথা বলতে দ্বিধা নেই, রামপ্রসাদ ইংগিতে প্রতীকতায় যে কথা বলেছিলেন, তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক হিসেবে তাকে পূর্ণ রূপ দিয়েছেন 'রাধা' উপন্যাসে। এবং আবার ডি. এইচ. লরেন্সের আপ্তবাক্য স্মরণ করছি, ক'রে বলি—কবিরূপে রামপ্রসাদ তাঁর গানে যা আভাসিত করেছেন মাত্র, ঔপন্যাসিকের ভূমিকায় তারাশঙ্কর তার সামগ্রিক ছবি এঁকেছেন। 'রাধা' উপন্যাসের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য এই।

বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ সচেতন এবং উপন্যাসটির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বারংবার অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতাগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন,

ক. আঠারো শতকের তৃতীয় দশক তখন শেষ হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে মুঘল আমল। সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুরশিদাবাদ।...১৭২৬।২৭ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র তিরিশ বছর পর আসছে পলাশীর যুদ্ধ, বাংলার নবাবশাহীর পতন। কিন্তু তখনই সুবে বাংলায় মুসলমান নবাবশাহীর উজ্জ্বলতম জৌলুসের আসর। বোধ করি বেলোয়ারী কাচের ঝাড়লণ্ঠনে সামাদানে বাতিগুলি নেববার আগে শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খ. তামাম হিন্দুস্থান ছারখার হয়ে গেল। দিল্লির বাদশাহী খতম বললেই হয়। সারা ভারত জুড়ে অধর্মের তাণ্ডব চলেছে। দুর্যোধন দুঃশাসনের জন্ম এবার এক নয়, দুই নয়, হাজার, দু হাজার। কুরুক্ষেত্রের ইসারা ঝলসাচ্ছে।

গ. বার বার—পাঁচবার। আলিবর্দী খাঁ মসনদে বসবার পর বৎসরেই প্রথম বর্গী এল। ভাস্কর পণ্ডিত আর উড়িষ্যা-ফেরত আলিবর্দী খাঁ বর্ধমান থেকে লড়াই করতে করতে এল কাটোয়া পর্যন্ত। আলিবর্দী খাঁ বাঁচল এবং শেষ পর্যন্ত জিতল, দুর্গা-নবমীর দিন, দুর্গাপূজায় নিযুক্ত ভাস্করকে অতর্কিত আক্রমণ করে হারিয়ে দিলে। ভাস্কর ফিরে গেল। পর বছরই এক দিক থেকে এল রঘুজী ভোঁসলে, অন্য দিক থেকে এল পেশোয়া বালাজী রাও। পর পর পাঁচবার। আবার এল ভাস্কর পণ্ডিত। ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা দেশে ঢুকেই হুকুম দিলে—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, নারী—কোন বিচার নাই। কাটো।

ঘ. বাংলা দেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই বিরাট ক্ষেত্রে এই ষোল বছরে যে যুদ্ধ চলেছে, তার কথা কুরুক্ষেত্র থেকে কম কি বেশী তিনি বুঝতে পারছেন না। মনে হচ্ছে যেন বেশী। কলির কুরুক্ষেত্র। বাংলা দেশে সরফরাজের ধ্বংস হল ঘিরিয়ার প্রান্তরে।...

ঙ. পলাশীর যুদ্ধের পর এখনও চার মাস পুরো পার হয়নি। পলাশীর পাপের জেরই এখনও মেটেনি। মীরণ এখনও অবাধে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নানান স্থানে নানান আয়োজনের গুজব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। উৎকণ্ঠায় মীরজাফর আফিংয়ের মাত্রা চড়িয়েছে। খাস মুরশিদাবাদ শহরে রাজা দুর্লভরাম নাকি হিন্দু আমীরদের নিয়ে জোট পাকাচ্ছে। আলিবর্দী-

বেগম সিরাজের ভ্রাতষ্পুত্র বালক মির্জা মেহেদীকে খাড়া ক'রে মসনদ দখলের চেষ্টায় আছেন। ঢাকায় একদল নবাব সরফরাজের দ্বিতীয় পুত্র আমানী খাঁকে নবাব করবার জল্পনা-কল্পনা করছে। পাটনায় রাজা রামনারায়ণ রায় আজও মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করেননি। ফরাসী জাঁদরেল মসিয়ে ল' বাংলায় আসতে আসতে পলাশীর খবর পেয়ে পথ থেকে ফিরে গিয়ে অযোধ্যায় নবাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ক্লাইভের হুকুমে গোরা সিপাই আর তেলেঙ্গী পল্টন আজ এখানে কাল ওখানে ছুটোছুটি করছে।

তারাশঙ্কর এইভাবেই উপন্যাসের সর্বত্র সুযোগমতো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের বিস্মৃত পাতাগুলি বারংবার মেলে ধরেছেন আমাদের সামনে। ইতিহাসের এই পটভূমিতেই রচিত হয়েছে উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট। এরই পাশাপাশি তিনি তাঁর কাহিনীর বিশিষ্ট আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা রচনা করেছেন। তার কিছু অংশ তুলে ধরা গেল এখানে :

ক. জিলা বীরভূমে অজয় নদীর ধারে ইলামবাজার গঞ্জ। বড় জমজমাট গঞ্জ তখন ইলামবাজার। ইলামবাজার থেকে পশ্চিমে জনুবাজার, উত্তরে সুখবাজার পর্যন্ত নিয়ে এক নাগাড় এক মস্ত জমজমাট গঞ্জ।

খ. ইলামবাজার আর জনুবাজারের মাঝখানে খানিকটা উত্তরে অজয় থেকে কিছুটা দূরে এই বাবাজী পল্লীটি। অধিকাংশই মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি, মাটির মেঝে; চারিপাশ বাঁশঝাড় নিম সজনে রাঙচিতের বেড়ার সঙ্গে জমিয়ে তুলে তারই বেড় দিয়ে ঘেরা; শান্ত নিস্তব্ধ পল্লীটি; কদাচিৎ কোলাহল কলরব শোনা যায়;

গ. অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ তখন, তখন ডাকিনী যোগিনী পিশাচ প্রভৃতি নানান ধরণের সাধনা ও সিদ্ধির বিশ্বাস এবং

এই পারিপার্শ্বিকতার উপরেই 'রাধা' উপন্যাসের কাহিনী বিধৃত। অজয়-তীরবর্তী কেঁদুলী সংলগ্ন অঞ্চলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, লেখক তারই ধারায় মিলিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণদাসী-মোহিনীর জীবনকে। আর, এরই সঙ্গে এসেছে রাধারমন দাসসরকার, অক্রুর, এসেছে কয়ো. আনন্দচাঁদ। এরা সকলেই এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ। নিজের ধর্মমত ও বিশ্বাস নিয়েই চলেছিল এদের জীবনের ধারা। অকস্মাৎ এই নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় কল্লোল তুলে আবির্ভূত হলেন কংসারি-ভক্ত মাধবানন্দ, এই উপন্যাসের নায়ক, যাঁর সাধনায় রাধার কোন স্থান নেই, নারীকে যিনি সাধনার পরিপন্থী মনে করেন। মাধবানন্দের জীবনের নেপথ্যলোক একসময় লেখক বিবৃত করেছেন, কিছুটা কয়োর মুখ দিয়ে, কিছুটা রাধারমনের। মাধবানন্দের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে মা ও মেয়ে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনী দুজনেই মোহিত, বিস্মিত। মোহিনীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করার বাসনা জাগল কৃষ্ণদাসীর মনে এবং দাসসরকার-পুত্র অক্রুরের ক্রুর বর্বর দৃষ্টি থেকে মোহিনীকে রক্ষা করবার এইটেই ছিল তার কাছে একমাত্র পথ। মোহিনী যদিও কিশোরী, তবু প্রথম দর্শনেই সে মাধবানন্দের উদ্দেশে আত্মনিবেদন করে বসে, তার প্রাণের দেবতার উদ্দেশে হাতের ফুলগুলি নিবেদন করে। অতঃপর ঘটনাস্রোত এগিয়ে যায় দ্রুতগতিতে। দাসসরকারের ঘৃণ্য লালসা ও তার ছেলের বর্বরতার হাত থেকে বাঁচবার ও মেয়েকে বাঁচাবার জন্য মেয়েকে নিয়ে যখন কৃষ্ণদাসী মাধবানন্দের

কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন মাধবানন্দ তাদের অশুচি মনে করে তাড়িয়ে দেয়। মাধবানন্দের দৃষ্টিতে পরকীয়া সাধনার মধ্যে আছে ব্যাভিচার। এই কারণেই ধিকৃত হয় তাদের নারীত্ব। মাধবানন্দ বুঝতে পারেন না তাদের আত্মনিবেদনের ভাষা।

তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে এদের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে একের পর এক নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করেছেন। কিন্তু মূলত দুটি ভিন্ন জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই সেই ঘটনাগুলি আবর্তিত হয়েছে। ঘটনাস্রোতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে একসময় অতর্কিতভাবে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় কৃষ্ণদাসী, মোহিনীও হারিয়ে যায় মাধবানন্দের জীবনের বৃত্ত থেকে। সবশেষে যখন দৃশ্যপট নবরূপে উন্মোচিত হল, তখন দেখি মোহিনীকে লেখক মাধবানন্দের সামনে উপস্থিত করেছেন। আহত অসুস্থ মাধবানন্দের আজন্মের সংস্কার এবং জীবনদর্শনের পরিবর্তন ঘটল। তিনি অনুভব করলেন, রাধা ছাড়া কৃষ্ণের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ এবং মোহিনীর রাধারূপের মাধুরী তাঁকে নবজীবন দান করল। মোহিনীও শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করলে রাধাতত্ত্বের তথা প্রেমের মহিমা। উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু কী করুণ পরিণতি ঘটল মাধবানন্দের। তাঁর জীবনাদর্শই যে শুধু ধূলি-লুন্ঠিত হল তাই নয়, তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট কেশবানন্দের তাণ্ডবকাণ্ডের বলি হতে হল। মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণেরও মৃত্যু ঘটেছিল সামান্য এক ব্যাধের ছোঁড়া তীরের আঘাতে। বস্তুত, তারাশঙ্কর যদিচ একটি ব্যক্তিজীবনের এক ট্রাজেডি রচনা করেছেন, ট্রাজেডি, কেননা মাধবানন্দের জীবনে যে পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা ছিল, মোহিনীর প্রেমকে স্বীকৃতি দিলে তাঁর সাধনা যে রূপ নিতে পারতো, তা ঘটল না ; তথাপি এ ট্রাজেডি আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন-ট্রাজেডি : অমিত ঐশ্বর্যপ্রাচুর্য সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা অপচয়িত হয়ে গেল। "এমন মানব-জমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা !"

'রাধা' হয়ত অষ্টাদশ শতাব্দীর অপচয়িত জীবনেরই আলেখ্য। কিন্তু গভীর থেকে দেখলে এর মধ্যে চিরন্তন নরনারীর জীবনযন্ত্রণার সুরও হয়ত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। একদিকে মাধবানন্দ, অন্যদিকে মোহিনী। তারাশঙ্কর দৃঢ় নিপুণতার সঙ্গে এই দুটি চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন : কখনো কেন্দ্রাতিগ কখনো কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর দিয়ে তারা একটি বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশে একটি বিশেষ যুগের প্রেক্ষাপটে একটি বৃত্তের মধ্যে এসে পড়েছে। আসলে মাধবানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর নায়ক, যার সামনে একটি যুগের চক্রাবর্তে বিধৃত এক বিশাল জীবনের রূপ উন্মোচিত এবং এই মানুষটি নায়কের মতোই অসীম শৌর্য-বীর্য নিয়ে তাঁর সমকালের যুগধর্ম ও জীবনসত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এই চরিত্রের ভিতর দিয়েই যেন সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী কথা বলে উঠেছে : অন্ধকারের ভিতর থেকে আলোর বর্তিকা জ্বলে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভোগাসক্ত ব্যাভিচারমথিত জীবনে মাধবানন্দ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন পৌরুষপূর্ণ জীবনের রূপ, চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে বীর্য ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে। বিলাস ও ভোগের পঙ্ককুণ্ড থেকে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্যই যেন তাঁর আবির্ভাব তাই তিনি বৈষ্ণবীয় রসসাধনার পথ থেকে সরে গিয়ে কঠোরতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি শুধু অজয়তীরবর্তী বৈষ্ণবসমাজকে ঘৃণা করতেন তাই নয়, বৈষ্ণবধর্মের মৌল উদ্দেশ্য

সম্পর্কেও তাঁর সংশয় ছিল। কৃষ্ণের কংসারি রূপের সাধনাই যে সত্যিকারের সাধনার ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার পথ, এই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ।

এমন সময় এল মোহিনী, চিরন্তনী নারী। প্রেম দিয়ে সেবা দিয়ে গভীর আত্মনিবেদনে এই কিশোরী নারী নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলে। মাধবানন্দের মনে এল দ্বন্দ্ব, দোলায়মান মন নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি অনুভব করলেন:

"নারীর মধ্যে আদিম মহাপ্রকৃতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন। যিনি পুরুষকে আয়ত্ত করে পরিশেষে গ্রাস করে নিশ্চিন্ত হন, তার কামনা শুধু সৃষ্টির।···কিন্তু তার রস থেকেই প্রকাশিত হয় চৈতন্যস্বরূপ, মহা অগ্নির মধ্য থেকে মহা জ্যোতির মত।"

এবং

"কৃষ্ণাবগুণ্ঠন-খসা মোহিনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার ষোল বছর ধরে কাঁখে-বওয়া রূপযৌবনের পূর্ণকুম্ভ থেকে অমৃত উথলে উঠছে। সেবার অমৃত, স্নেহের অমৃত, সান্ত্বনার অমৃত অঞ্জলি অঞ্জলি পান করেছেন তিনি। আজ মৃত্যু-কোলাহলের সম্মুখে এই প্রাণ দিয়ে ঘিরে রাধার আকৃতির মধ্যে সে অমৃত উথলে পড়ে প্লাবন তুলেছে। আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মৃত্যুর মধ্যেও তিনি একা নন। এ কী আনন্দ!"

মাধবানন্দের এই অনুভূতিই, এই পরিণতিই তারাশঙ্করের উপজীব্য, উপন্যাসটির জীবনাদর্শ। নারী ও পুরুষ: উভয়ের মিলনের ভিতর দিয়েই সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকে, উভয়ের যুগ্ম সান্নিধ্যই মানবজীবনের পরমতম সত্য। তার ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের অনুভূতি সম্ভব। নারী পুরুষের জীবনের প্রতিবন্ধক নয়, সহচরী, জীবনসত্য ও সাধনার সঙ্গিনী। মাধবানন্দ ও মোহিনীর ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই উপন্যাসে।

এবং এই জীবনসত্যে উপনীত হতে গিয়ে তারাশঙ্কর যে আয়োজন করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে বিশাল জীবনযজ্ঞের আয়োজন। এ আয়োজন মহাকাব্যোচিতও বটে। বাহ্যত এই উপন্যাসের পরিসর তেমন বিস্তৃত নয়। কিন্তু দেশকালজোড়া জীবনপ্রবাহের ভিতর থেকে এই যে সত্যানুভব, তা নিঃসন্দেহে মানবজীবনের গভীরতম উপলব্ধি। আর, এই প্রবণতাই তারাশঙ্করের উপন্যাসের মৌলধর্ম। ডি. এইচ. লরেন্সের উক্তি অনুসারে এখানেই ঔপন্যাসিকের যথার্থ ভূমিকা। বস্তুত, এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ঘটনা মাত্র নয়, তার ভিতর দিয়ে মানবজীবনের যে বিচিত্র অন্তর্গূঢ় প্রবাহ বহমান, তারাশঙ্কর তারই রূপকার।

৩

E. M. W. Tillyard তাঁর 'The Epic Strain in the English Novel' গ্রন্থে বলেছেন:

"What most makes the epic kind is a communal or choric quality.

The epic writer must express the feelings of a large group of people living in or near his own time. True, all personal feelings take on some colour from the general temper of an age. But, granted that, there are feelings that appear to be the unique concern of the individual and feelings which he knows, consciously or not, are shared by a great body of his fellows."

টিলিয়ার্ডের এই মন্তব্য অনুসরণ করে তারাশঙ্করের উপন্যাসধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, মহাকাব্যের গুণসম্পন্ন উপন্যাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সার্থক দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে তাঁর 'কীর্তিহাটের কড়চা'র মধ্যে। উপন্যাসটি চার খণ্ডে সমাপ্ত হবে। তারাশঙ্কর রচনাবলীর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে ইতিপূর্বে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত, এই সংকলনে অর্থাৎ পঞ্চদশ খণ্ডে তারই তৃতীয় অংশ প্রকাশিত হল। এর আগের দুটি খণ্ড সম্পর্কে পূর্ববর্তী দুটি ভূমিকায় উপন্যাসটির জন্মলগ্নের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গসূত্রে শুধু এটুকু বলা যায়, যদিচ কীর্তিহাট একটি বিশেষ অঞ্চলের অন্তর্গত এবং কীর্তিহাটের রায় পরিবার নামক একটি বিশেষ পরিবারের কথাই এই উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রভূমি, তথাপি, এই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বাংলার এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ও অধ্যায়কে রূপ দিয়েছেন—সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে জমিদারী প্রথা বিলোপের কাল পর্যন্ত এই উপন্যাসের সময়সীমা। বলতে গেলে দেড়শো বছরের একটানা একটি ইতিবৃত্ত, বাংলার দেড়শো বছরের জীবনধারার আলেখ্য। যদিচ রায়বংশের সাতপুরুষের কাহিনী, তার উত্থান-পতনের কথাই এই উপন্যাসের উপজীব্য এবং কীর্তিহাট থেকে কলকাতার পটভূমিতেই সমগ্র কাহিনী বিধৃত, তবু একথা বলাই বাহুল্য, কাহিনীর বিস্তৃতি এই কেন্দ্রবিন্দুকে অতিক্রম করে দিকে দিকে ধাবমান, তার ভৌগোলিক সীমানা বাংলার বাইরেও প্রসারিত। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে মিছিলের মতো অসংখ্য মানুষকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন সুদূর অতীত থেকে একালের প্রাঙ্গণে। রায়বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুড়ারাম ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে এই বংশের শেষ বংশধর সুরেশ্বর উপাখ্যান ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। এই বিস্তীর্ণ কাহিনীর পর্যালোচনা এখানে সম্ভব নয়, কারণ তার সংক্ষিপ্ততম রূপও দীর্ঘকালের হতে বাধ্য। সুতরাং কাহিনীবিন্যাসের আলোচনায় না গিয়ে উপন্যাসটির অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা গেল।

বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় রচিত এই ধরণের মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা কি তারাশঙ্করের হাতে এই প্রথম দেখা গেল? বলা বাহুল্য, না। বঙ্কিমচন্দ্রও একদা ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে এক বিশাল জীবনায়নের আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র আয়োজনও মহাকাব্যিক। তাছাড়া, তিনি তিন পুরুষের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে আর একটি মহাকাব্যিক উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন, 'যোগাযোগ' সেই সম্ভাবনার অসম্পূর্ণ প্রকাশ। পরবর্তীকালের লেখকসমাজের অনেকেই এই ধরণের উপন্যাস রচনায় বৃত হয়েছেন। মনে পড়ে প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ট্রিলজি, বুদ্ধদেব বসুর

'তিথিডোর' উপন্যাসের কথা। সময়ের বিচারে না হোক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যাসের পরিসরও সুবিস্তৃত। প্রমথনাথ বিশী সম্প্রতি 'বঙ্গভঙ্গ' থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পটভূমিকায় বাংলার এক বিস্তৃত অধ্যায়কে উপন্যাসের আধারে ধরতে চাইছেন। উপন্যাসের পাঠক হিসেবে এইসব দৃষ্টান্ত আমাদের জানা। সুতরাং এদিক থেকে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র পরিকল্পনা নতুন কিছু নয়, এই ধরণের মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনার ঐতিহ্য আমাদের কথাসাহিত্যের মধ্যে রয়ে গেছে।

কিন্তু 'কীর্তিহাটের কড়চার' মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়ে গেছে, যে সুবিস্তীর্ণ জীবন-ধারাকে রূপায়িত করা হয়েছে, আয়োজনের যে বিশালতা আছে, সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যে তার দ্বিতীয় কোন নজির চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অথবা পরবর্তীকালের লেখকসমাজ—যাঁরা মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস লেখায় আগ্রহ বোধ করেছেন, দেখা যাবে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত আলোকসম্পাত কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যক্তি বা পরিবারের উপর, সেইভাবেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে, অর্থাৎ ব্যক্তিক অথবা পারিবারিক উত্থান-পতনই প্রাধান্য পেয়েছে এবং এই সূত্রেই আবর্তিত হয়েছে সমস্ত ঘটনাপুঞ্জ। কিন্তু কীর্তিহাটের কড়চার মধ্যে তারাশঙ্কর একটি পরিবারকে আশ্রয় করেও পারিবারিক গণ্ডী অতিক্রম করে গেছেন, অথবা ঠিকমতো বলতে গেলে, একটি বিশেষ পরিবারের কথা বলতে বলতে একটি দেশের একটি যুগের চিত্র তুলে ধরাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে যে অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা ও সংস্কৃতি বাংলার ইতিহাসে প্রবাহিত হয়ে গেছে তারই কথা, তারই 'জবানবন্দী' এই উপন্যাস। রায়বংশের ইতিকথা তার অনুসঙ্গী মাত্র, লেখকের দৃষ্টি আরো গভীরে—সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বস্তুত তিনি বাংলার এক বিস্মৃত ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। রায়বংশের বংশধরদের সুখদুঃখের ইতিহাস এই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও সেই সুখদুঃখই এখানে বড় হয়ে ওঠেনি, ঘটনাবর্তে একের পর এক অসংখ্য মানুষ যেমন কাহিনীর রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে, রায়পরিবারের মানুষগুলিও সেইভাবেই এসেছে এবং তারাশঙ্কর বিশাল এক ক্যানভাসে তাদের সকলকেই একসঙ্গে ধরে রেখেছেন। এইভাবে এই উপন্যাসের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে একটি বিশেষ যুগ, একটি বিশেষ কাল,—একটি দেশের ইতিহাস। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষের জীবনকে যদি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে বলব—এই উপন্যাস একটি ব্যালে, যার নেপথ্যে বেজে চলেছে এক অশ্রুত সিম্ফনি। মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে তুলনামূলকভাবে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র এখানেই স্বাতন্ত্র্য। মহিমাও।

তারাশঙ্করের নিজের সৃষ্টির দিক থেকেও এই উপন্যাস বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র। উপন্যাস রচনা করতে বসে তিনি প্রায় সর্বত্রই একটি বিস্তৃত পটভূমি বা পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করেছেন। তার উপর উপস্থাপিত করেছেন তাঁর কাহিনী এবং চরিত্রমালা। ফলে প্রায় সব উপন্যাসেই একটা বিস্তৃত পরিধির অস্তিত্ব রয়ে গেছে। এদিক থেকে বিশেষভাবে হাঁসুলিবাঁকের উপকথা বা আরোগ্যনিকেতনের কথা মনে পড়ে। একসময় অনেকের ধারণা ছিল, আরোগ্যনিকেতনই তারাশঙ্করের প্রতিভা ও সামর্থ্যের সর্বশেষ স্বাক্ষর—যা যুগপৎ তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু, মনে হয়, শিল্পী হিসেবে তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সীমান্তে

দাঁড়িয়েও তৃপ্ত হতে পারেননি। তাই জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এতোকাল ধরে টুকরো টুকরো ভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা জীবনকে, তাঁর জীবনের বিচিত্র ও সমগ্র অভিজ্ঞতাকে, জীবনের গভীরতম উপলব্ধি ও প্রজ্ঞাকে একটি সূত্রে গেঁথে রাখতে চাইলেন। সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনার পিছনেই থাকে অভিজ্ঞতার অনুভবের উপলব্ধির পরিপক্কতা এবং জীবনবোধের পরিপূর্ণতা। এসবের সমবায় ঘটলেই একটি প্রতিভা থেকে সৃষ্টি হতে পারে সেই শিল্প, সেই সাহিত্য—যাকে বলা যায় পরিণত ফসল। সুপরিপক্ক না হলে যেমন একটি ফল সুস্বাদু হয় না, রচনা তৃপ্ত হয় না, তেমনি একজন শিল্পী বা লেখক যতক্ষণ না সেই পূর্ণতা লাভ করছেন, ততক্ষণ তাঁর পক্ষে পূর্ণায়ত সৃষ্টি সম্ভব হয় না। বলা যেতে পারে, 'কীর্তিহাটের কড়চা' সেই জাতীয় সৃষ্টি যা একজন লেখকের পরিণত জীবনের ফল; পরিণতির ভিতর দিয়ে যে প্রত্যয় যে জীবনদর্শন গড়ে ওঠে, 'কীর্তিহাটের কড়চা' তারাশঙ্করের সেই প্রত্যয় সেই জীবনদর্শন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস মহৎ, নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু এই উপন্যাস তাঁর নিজের সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা, তাঁর সমস্ত সামর্থ্যের প্রকাশ, এক কথায়, তাঁর জীবনের পূর্ণায়ত আত্মপ্রকাশ।

এমন একটি উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁকে মহাকাব্যের মতো যেমন বিশাল আয়োজন করতে হয়েছে, তেমনি মহাকাব্যের মতো একটি উপযুক্ত রূপকল্পেরও আশ্রয় নিতে হয়েছে। কে জানে কতোদিন ধরে তারাশঙ্কর সকলের অগোচরে এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন। হয়ত তা নদীর অন্তঃস্রোতের মতো সকলের অগোচরে দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। কিন্তু মনের গভীরে নিহিত অন্তরালবর্তী সেই ইতিবৃত্তকে যখন বাইরে প্রকাশের প্রয়োজন হল, তখন তাঁকে সচেতনভাবেই একটা উপযুক্ত আধার আশ্রয় করতে হল। এক্ষেত্রে দেখবো একদিকে প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্য এবং প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য, এ দুয়ের রূপকল্পের সমবায়ে তিনি এই উপন্যাসের রূপকল্প গড়ে তুলেছেন। সুরেশ্বর সুলতার সামনে যেভাবে রায়বংশের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে পিছনে ও সামনে তাকিয়েছে, তা বস্তুত য়ুরোপীয় ও ভারতীয় প্রাচীন মহাকাব্যের আদর্শেই বিবৃত হয়েছে।

বস্তুত এই উপন্যাসের রূপকল্পনাকে গথিক স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। গথিক স্থাপত্যের সামনে দাঁড়ালে তার ভাবগম্ভীর রূপ মনকে অভিভূত করে, পুরোনো দিনের স্মৃতির অরণ্যে মন হারিয়ে যেতে যেতে সমাহিত হয়ে ওঠে। বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে থাকা গথিক স্থাপত্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিত্তকে অতীতে বিলীন এক গৌরবমণ্ডিত জীবনধারা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখোমুখি নিয়ে যায়। এবং বর্তমানের ক্ষুদ্রায়ত জীবনের উপর দণ্ডায়মান এই স্থাপত্য বস্তুত অবলুপ্ত সমুন্নত এক মানবজীবনের প্রতীক। উপন্যাস হিসেবে 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় তারাশঙ্কর সাহিত্যের এমনি এক স্থাপত্য রচনা করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদার-তান্ত্রিক যে যুগ অবসিত, যার ভিতর দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে এক বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেই যুগ সেই দিগন্ত চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। তারাশঙ্কর বিস্ময়কর কৌশলে সেই ফেলে আসা সেই হারানো দিগন্তের সামনে আমাদের নিয়ে গেছেন এই উপন্যাসে। এবং সেই অতীত এমন এক জগৎ, সুখেদুঃখে, পাপেপুণ্যে, আনন্দ-বেদনায়, ঔদার্যে-অত্যাচারে করুণায় নিষ্ঠুরতায় সেই জগৎ এমন এক বিচিত্র জগৎ,—যার সামনে দাঁড়িয়ে পাঠক অভিভূত হতে বাধ্য।

এই জগৎ একদা আমাদের জীবনে সত্য ছিল এবং এই জগৎ হারিয়ে আমরা ধনী হয়েছি কিনা জানি না, এই উপন্যাসে অন্তত সেই জগৎ, একটা হারানো ঐতিহ্যকে খুঁজে পাই।

এই জগৎ থেকেই উঠে এসেছে অসংখ্য মুখ। একে একে এসেছে কুড়ারাম ভট্টাচার্য, গঙ্গাগোবিন্দ সিং, সোমেশ্বর, বীরেশ্বর, যোগেশ্বর, সুরেশ্বর, অরুণেশ্বর, অর্চনা, সুলতা, এসেছে শ্যামানন্দ, শিবানী, মহেশ্বর, এসেছে গোসাঁই, পিক্র গোয়ান, ভায়লা, গুলমহম্মদ ঠাকুর। অথবা মনোহরা, তারা হাড়ি, শিবু বাগ্দী, ছেদী সিং, সিংবা—জন রবিনসন, সোফিয়া এবং আরো কতো মানুষ। অন্যদিকে চোখে পড়ে—রাজা নবকৃষ্ণ দেব, ক্লাইভ, কর্ণওয়ালিস, হেস্টিংস থেকে শুরু করে মনীন্দ্র নন্দী, বিধানচন্দ্র রায়, আরো অনেকে। এই বিচিত্র মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সুরেশ্বর, সুলতাকে সামনে রেখে; সুরেশ্বর এদের কথা বলে চলেছে। না কথা নয়, অর্চনার ভাষায় বলা যাক্—'জবানবন্দী'।

সুরেশ্বর তার জবানবন্দীতে তার বংশধারার পরিচয় দিতে দিতে একটা গোটা যুগের, সামন্ততান্ত্রিক যুগের ছবিটা তুলে ধরেছে। সেই সূত্রেই উনিশ শতকের—একটা শতাব্দীর ধ্যানধারণা, সংস্কার ও সংস্কৃত উদ্ঘাটিত হয়েছে। এরই একটা দিক তান্ত্রিকসাধনা যা গত শতাব্দীতে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জীবনকে। তার পরিসীমা বহুদূর পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই সূত্রেই শ্যামানন্দকে কামাখ্যার আশ্রমে দেখতে পাই। অন্যদিকে ইংরেজের অনুগ্রহ-পুষ্ট জমিদার, ব্যবসায়ীদের ছবিও চিত্রিত হতে দেখি: তাদের ঔদার্য, নিষ্ঠুরতা, বিলাস ও ত্যাগের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ। তারাশঙ্কর নিখুঁতভাবে এইসব ছবি এঁকেছেন। তাই এই উপন্যাস নিছক একটা গল্প বা কাহিনী মাত্র নয়, এ হচ্ছে আমাদের বাংলার জাতীয় দলিল।

সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ভালো কি মন্দ, এ প্রশ্ন এখানে তোলা নিরর্থক। কিন্তু সেই সমাজ ব্যবস্থায় যে জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে ছিল মাটির যোগ, তাই সামন্ততান্ত্রিক প্রথার ভূমিকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে, ভূমিকেই আমরা একদা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের মর্যাদা দিয়েছিলাম। ভূমির সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল এমন এক অধিকারবোধ যা সেদিন মানুষকে মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে বেঁধে রেখেছিল। সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষ মাটির টান অনুভব করে এসেছে; সামন্ততান্ত্রিক সমাজও মানুষকে সেই মাটির সঙ্গেই বেঁধে রেখেছিল। পুরোনো মূল্যবোধ এই মাটিকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছিল। জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেমন মাটির সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছি, তেমনি সেই অধিকারবোধও হারিয়েছি। রায়বংশের শেষ বংশধর অরুণেশ্বরকে দেখতে পাই—সে তার পুরোনো মূল্যবোধ হারিয়ে জনতার রাজনীতির মধ্যে এসে পড়েছে। কীর্তিহাটের কীর্তির মধ্যে সে জীবনের কোন সত্যকেই দেখতে পায় না, তাই সে তাকে আঘাত করতেও দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত জীবন এখন একটা যান্ত্রিক ব্যাপার। গ্রামীণ ভারতবর্ষ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে সামনে রেখে যে জীবনাদর্শ রচনা করেছিল, আজকের চেতনায় তা অর্থহীন মনে হচ্ছে। সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল যৌথ পরিবার, সমাজের পুরোনো কাঠামোটাই বদলে গেল জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে। এখন আমাদের জীবনে সামগ্রিক মূল্যবোধের বদলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত। আর এর ভিতর দিয়ে সমগ্রতার

পরিবর্তে খণ্ডতার জীবনাদর্শকেই ধ্রুবসত্য বলে মনে করা হচ্ছে এবং আমরা ক্রমশই ছোট হয়ে যাচ্ছি। একটা জাতীয় জীবনের এই যে পরিবর্তন, সেকাল থেকে একালে প্রত্যাবর্তন, তারাশঙ্কর নিপুণ চিত্রকরের সামর্থ্য নিয়ে 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় তারই গাথা রচনা করেছেন; এই উপন্যাস তাই আমাদের জাতীয় জীবনের মহাকাব্য।

বিশ্বসাহিত্যে এহেন উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় জন গলস্‌ওয়ার্দির 'দি ফরসাইট সাগা'। গলস্‌ওয়ার্দি এই উপন্যাসে ফরসাইট পরিবারকে কেন্দ্র করে ভিক্টোরীয় যুগের ও প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের ব্রিটিশ সমাজের ছবি এঁকেছেন। ভিক্টোরীয় যুগের উচ্চমধ্যবিত্ত একটি ধনী পরিবারের ভিতর দিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি যুগের ও যুগপরিবর্তনের কথাই বলেছেন। তারাশঙ্করের 'কীর্তিহাটের কড়চা'ও অনুরূপ প্রকৃতির। গলস্‌ওয়ার্দির উপন্যাসে অবিশ্যি সোমস্‌ ও আইরিণের উপরেই বেশি করে আলোকসম্পাত করা হয়েছে। তারাশঙ্কর সেদিক থেকে বিশেষ চরিত্রের উপর মনোযোগী নন। 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনার সময়, আমি জানি না, তারাশঙ্কর গলস্‌ওয়ার্দির এই উপন্যাসের কথা ভেবেছিলেন কিনা। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার মধ্যে বেশ একটা মিল রয়েছে। 'দি ফরসাইট্‌ সাগা'র শুরুতেই রয়েছে ১৮৮৬ সালের ১৫ জুনের এক অপরাহ্ণে হাইড্‌ পার্কের স্টানহোপ গেটে অবস্থিত জলিয়ন ফরসাইটের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী, তরুণ নারীপুরুষ, তাঁর আত্মীয়রা মিলিত হয়েছেন। ফরসাইট পরিবারের কারো জন্মদিন, বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই ধরণের সমাবেশ প্রায়শই হয়ে থাকে। এই ফরসাইট্‌ পরিবারের সম্পত্তি, ঐশ্বর্য যেমন বিপুল, তাদের আয়ুষ্কালও তেমনি, মৃত্যু যেন তাদের ভুলে গেছে। এই পরিবারের সবচেয়ে বর্ষীয়সী মহিলা আণ্ট এ্যান্‌, তাঁর জন্ম ১৭৯৯ সালে। তিনি বসেছিলেন একটি কোণে। এছাড়া উপস্থিত হয়েছেন আংকল সুইদিন, আংকল্‌ জেমস্‌। আণ্ট এ্যান্‌ ছাড়া রয়েছেন হেস্‌টার, জুলি, আংকল রজার, নিকোলাস, আরো অনেকে। আজ অবিশ্যি এঁরা অতিথি হয়েছেন আশী বছরের বৃদ্ধ জলিয়নের গৃহে, তাঁর নাতনী জুনের প্রাক্‌-বিবাহ বাগ্‌দানের অনুষ্ঠানে। কিন্তু উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সোমস্‌ ও আইরিন। উপন্যাসটির কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ তাদের জীবনকে কেন্দ্র করেই বিধৃত। 'দি ফর্‌সাইট্‌ সাগা' আসলে ট্রিলজি। এর প্রথম খণ্ডের নাম 'দি ম্যান্‌ অফ্‌ প্রসপারিটি (১৯০৬), দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'ইন্‌ চান্‌সেরি' (১৯২০) এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম 'টু লেট' (১৯২১)। এর মাঝে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে রচিত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান্‌ সামার অফ্‌ এ ফরসাইট' (১৯১৮)। এগুলি একত্রিত হয়ে 'দি ফর্‌সাইট্‌ সাগা' নামে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে গলস্‌ওয়ার্দি তাঁর উপন্যাসের অনেক চরিত্রই বাস্তব জীবন থেকে আহরণ করেছিলেন। যেমন, গলস্‌ওয়ার্দির বাবার অনুসরণে বৃদ্ধ জলিয়নের চরিত্র চিত্রিত। আইরিণের চরিত্র উঠে এসেছে তাঁর এক আত্মীয় মেজর জর্জ গলস্‌ওয়ার্দির স্ত্রী আডা গলস্‌ওয়ার্দিকে কেন্দ্র করে। আডার সঙ্গে গলস্‌ওয়ার্দি নিজে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন, জর্জের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তাকে বিয়ে করেন। অর্থাৎ গলস্‌ওয়ার্দি তাঁর এই উপন্যাস, ১৮৮০ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত-ব্রিটিশ উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনালেখ্য আঁকতে বসে তাঁর জীবনের

অনেক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন।

পাশাপাশি 'কীতিহাটের কড়চা'র শুরুতেই দেখি ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে কলকাতার জানবাজার অঞ্চলে রায়কুটীরের হলঘরে এক শীতের রাত্রে, রাত তখন দশটা, এই উপন্যাসের কথক সুরেশ্বর ও সুলতা মুখোমুখি বসে আছে। অনেকটা 'আলেখ্যদর্শনের' মতো সুরেশ্বর তার নিজের আঁকা রায়বংশের জীবনালেখ্য ছড়ি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এখানে, গলস্‌ওয়ার্দির উপন্যাসের মতো এই নির্জন রাত্রে রায়পরিবারের বিগত বংশধরদের কেউ সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও, দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলির ইতিবৃত্ত যখন সুরেশ্বরের মুখ দিয়ে বর্ণিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই সুলতা তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিল এবং পাঠকও তাদের চলচ্চিত্রের মতো সেইভাবেই দেখতে পায় এই উপন্যাস পড়তে পড়তে। বলা বাহুল্য, তারাশঙ্করও গলস্‌ওয়ার্দির মতো তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে এই উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন। স্বভাবতই 'দি ফরসাইট্ সাগা'-য় যেমন গলস্‌ওয়ার্দিকে দেখি, 'কীতিহাটের কড়চা'য় তারাশঙ্করকেও সেইভাবেই দেখি। এবং সেই তারাশঙ্কর—যে মানুষটি জীবনের বিচিত্র তরঙ্গ-প্রতিতরঙ্গ, সমাজের বিচিত্র শ্রেণীর বিচিত্র মানুষকে দেখেছেন এবং এই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যা তাঁর জীবনে এনেছে পরিপূর্ণতা, সেই পরিপূর্ণ জীবনানুভব থেকেই তিনি এই উপন্যাসে এক অনবদ্য জীবনায়নের চিহ্ন রেখে গেছেন।

এবং একদা প্যারীর গার দু নর্দ-এর একটি বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আডা গলস্‌ওয়ার্দি (তখনো গলস্‌ওয়ার্দি তাঁকে বিয়ে করেননি) জন গলস্‌ওয়ার্দিকে বলেছিলেন: "you are just the person to write ; why don't you ?" তেমনি এই উপন্যাসের কথা মনে রেখে সেই সুরেই যে কোন পাঠক তারাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলতে পারেন, "তুমিই, একমাত্র তুমিই সেই মানুষ যে এই উপন্যাস লিখতে পারে!"

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

কীর্তিহাটের কড়চা

তৃতীয় খণ্ড

১

সুরেশ্বর বললে—এই শ্যামাকান্তের অভিশাপ নাকি রায়বংশ বহন করছে—শুধু শ্যামাকান্তের নয়—এ পাপের অংশ—সোমেশ্বর রায়—ডাকাতি করে তাঁর কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছিলেন। এই ছিল রায়বংশের বিশ্বাস।

সেকালের বিশ্বাস।

সুলতা বললে—তার মানে তো বুঝলাম না। সোমেশ্বর রায় তাঁকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন বলে ?

সুরেশ্বর বললে—এ প্রশ্ন সেইদিনই বীরেশ্বর রায় তাঁদের কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে করেছিলেন। যখন বীরেশ্বর রায় মহেশচন্দ্রের পত্র হাতে নিয়ে বসে ভাবছেন, তখনই রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। প্রয়োজন তাঁর জরুরী। কিন্তু দারোয়ান বলেছিল—হুজুরের বারণ আছে। এখন তো—

কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম রায়বাড়ীর শুধু পুরোহিতই ছিলেন না, তিনি সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তর স্টেটের একজন ট্রাস্টিও ছিলেন। তাঁর একটা অধিকার ছিল। তিনি গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার ছলে সাড়া দিয়ে ডেকেছিলেন—বীরেশ্বর !

বীরেশ্বর রায় ঘাড়টি ফিরিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন—কে ? খানিকটা চিনতে পেরেছিলেন আওয়াজ থেকে ; অন্য কেউ হলে হয় সাড়া দিতেন না, নয় দারোয়ানকে বলতেন—পরে আসতে বল !

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—আমি রামব্রহ্ম।

সজাগ হয়ে উঠে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আসুন !

ছেদী তাড়াতাড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠেই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

রামব্রহ্ম এসেই বলেছিলেন—একটি কথা যে বলতে এসেছি বাবা !

—বলুন।

—তোমার ভাগিনেয়, বলতে গেলে রায়বাড়ীর বংশধর সে-ই। তুমি তো আর বিবাহ করলে না ! কমলাকান্ত শ্যামনগরে এসেছে। শুনেছ ?

—শুনলাম ছেদীর কাছে।

—কি জন্য এসেছে, শুনেছ ?

—হ্যাঁ, রবিনসন নীলকুঠী করছে শ্যামনগর ঠাকুরপাড়ায় ; সে তাদের জমিতে জোর করে নীল বুনিয়েছে। কমলাকান্ত এসেছে সেখানে ; বিমলাকান্তের পত্র নিয়ে।

—হ্যাঁ। ছেদী তার সঙ্গে এসেছে। ছেদীর হাতে বিমলাকান্ত বাবাজী আমাকে পত্র দিয়েছে। লিখেছে "কমলাকান্ত জেদী। তাহার প্রকৃতি বীরেশ্বরের মত। সে ঝগড়াঝাঁটি বাধাইয়া বসিতে পারে। কালটা বড়ই বিরুদ্ধ কাল। আমাদের গ্রহের ফেরও বটে এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজদের আক্রোশ বাড়িয়াছেও বটে। সুতরাং বীরেশ্বরবাবুকে অনুরোধ করিবেন যেন এই বিবাদটা তিনি মিটাইয়া দেন।" তা বিমলাকান্ত কি তোমাকে কোন পত্র দেয় নি ?

—না। বীরেশ্বর রায় হেসে বলেছিলেন—তাতে তার সম্মানের হানি হত !

—না-না বাবা। বিমলাকান্ত দেবতুল্য ব্যক্তি। কিছু মনে করে না। অবিচার বরং তার ওপরই হয়েছে। কথাটা তোমাকে এতদিন আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলতে পারি নি। তোমার পিতা আমাকে তাঁর শেষ অসুখের সময় বলেছিলেন। বলেছিলেন—বিমলাকান্তের পিতার কাছে যে অপরাধ করেছি, তার আর মার্জনা নেই আমার। তার ফল আমি পেয়েছি। বুঝতে পারছি পরকালে অনন্ত নরক হবে আমার। তাছাড়া যে পাপ আমি ঘাড়ে করেছি, সে পাপ আমার বংশকে আশ্রয় করে বংশকেও নরকস্থ করবে।

—আপনি বিমলাকান্তের বাপকে, তান্ত্রিক শ্যামাকান্তকে, কাঁসাইয়ের বন্যায় ফেলে দেওয়ার কথা বলছেন?

সবিস্ময়ে রামব্রহ্ম বললেন—তুমি কি করে জানলে?

—জেনেছি।

—তবে?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বাবা আপনাকে মৃত্যুর পূর্বে অসুখের সময় কি বলেছিলেন?

—তুমি তো জান বলছ, বাবা!

—তবু আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। যা শুনেছি তা কতটা সত্য, তা একটু মিলিয়ে দেখতে চাই।

একটু চুপ করে থেকে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—সে আমি তোমাকে মুখে ব্যক্ত করতে পারব না। কারণ—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুমি তাঁর পুত্র, আমি তোমার পুরোহিত, তোমার পিতার পাপের কথা তোমাকে মুখে-মুখে বলতে জিহ্বা আড়ষ্ট হবে। আর তোমার মানও'হয়তো—। হেসেছিলেন ন্যায়রত্ন। আমি ভাল করে স্মরণ করে লিখে জানাব। একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—কিন্তু বিমলাকান্তের কথা থাক; কমলাকান্ত তোমার ভাগিনেয়, অত্যাপি তক বলতে গেলে তোমারও বংশধর, তাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। ছেদী চিঠি এনেছে, তার সঙ্গে একই নৌকাতে এসেছে আমার কন্যা এবং দৌহিত্রী। তাদের কাছে শুনলাম, বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছে বাবা। কমলাকান্তের সঙ্গে রবিন সাহেবের বচসা হয়ে গেছে। কমলাকান্ত শুধু বিমলাকান্তের রক্তধারা বহন করে না, সে বিমলার পুত্র, তোমাদের রক্ত রয়েছে, মহাজেদী। ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করেছে, সে ইতিমধ্যে গ্রামের লোকেদের নিয়ে বিবাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই আমার বৈবাহিক আমার কন্যা-দৌহিত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিলম্ব করলে হয়তো এমন কিছু ঘটে যাবে, যার আর প্রতিকার করবার কোন পথ থাকবে না।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—আমি আজই পত্র লিখে লোক পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে বজরাও পাঠাচ্ছি, কমলাকান্তকে এখানে নিয়ে আসবে। যা করবার আমি এখান থেকে করব৽ তার সেখানে থাকবার প্রয়োজন কি?

রামব্রহ্ম বিস্মিত হয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়ের কথা শুনে। বালক কমলাকান্তের উপর বীরেশ্বর রায়ের ক্রুদ্ধ আক্রোশ এবং ঘৃণার কথা তিনি জানতেন, চোখে দেখেছেন তিনি। পাঁচ বছরের কমলাকান্তকে চাকর কোলে নিয়ে বেড়াত; ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়ে বাগানে ঘোরাতো;

বীরেশ্বর রায় সেখানে থাকলে বলতেন, নিয়ে যা এই উল্লুক, ওটাকে নিয়ে যা এখান থেকে। নিয়ে যা বলছি।

শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছিল ; তখন তিনি মদ্যপান করতে শুধু করেছেন ; তিনি হুকুম দিয়েছিলেন—ওটাকে যেন তাঁর সামনে কেউ নিয়ে না আসে। যে আনবে চাবুক মেরে তার পিঠের চামড়া তুলে দেব আমি !

বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে নিয়ে থাকতেন বিবিমহলে। বিমলাকান্ত থাকতেন বাড়ীর দ্বিতীয় মহলটায়। কমলাকান্তকে মানুষ করবার জন্য দাসী ছিল—তাদের হাতে সে মানুষ হত। সে বড় ভালবাসত ভবানী দেবীকে ; বিবিমহলে যাবার জন্য ঝোঁক ধরত। কিন্তু সেখানে যেতে পেত না সে। ভবানী দেবীরও হুকুম ছিল না এ মহলে আসবার।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন থেকে সকলেই যা বুঝেছিল তা সহজ অনুমানের কথা। একসঙ্গে বিমলার এবং ভবানীর সন্তান হল, মৃতবৎসা দোষগ্রস্তা বিমলার ছেলে বাঁচল, আর ভবানীর প্রথম সন্তান মরল। এই দুঃখ এবং ক্ষোভ থেকেই হিংসায় এমন হয়ে উঠেছেন বীরেশ্বর রায়। শেষ পর্যন্ত বিমলাকান্ত পুত্র কমলাকান্তকে নিয়ে এখান থেকে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। সে আজ বারো বৎসর। এই বারো বৎসরের মধ্যে বীরেশ্বর রায় ভগ্নিপতি-ভাগিনেয়ের নাম মুখে আনেন নি। কোন সংবাদ নেন নি। এমন কি নিজের বাপের উইলকে একরকম গায়ের জোরে নাকচ করে দিয়েছেন। কমলাকান্ত দৌহিত্র হিসাবে সোমেশ্বর রায়ের আট আনা অংশের উত্তরাধিকারী, তাকে আজ এই বারো বছরের মধ্যে জমিদারীর লভ্যাংশ দেন নি। তত্ত্বতল্লাস বলেও কোন টাকা কি সামগ্রী তাকে পাঠান নি।

বিমলাকান্ত নির্লোভ মানুষ, সদাচারী পণ্ডিত মানুষ, সকলে বলে—মানুষটি দেব-চরিত্র। তিনি এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। কিন্তু কমলাকান্ত ছাড়বে না। সাবালক হলেই সে মামলা করবে। সকলের ধারণাই তাই।

গিরীন্দ্র আচার্য বলেন—মামলা হবেই ন্যায়রত্নমশাই। তার আগে কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। না হলে ধর্ম থাকবে না। বীরেশ্বর মিটমাট করবে না। সহজে বিষয় দেবে না। বিষয় বিষ। শেষে এতে কুরুক্ষেত্র হবেই। দেখুন, রাজা নবকৃষ্ণ দেব, ক্লাইবের দেওয়ান, লক্ষ লক্ষ টাকা, বিষয় তো একটা রাজ্য বিশেষ। তাঁর উইল নিয়ে মামলা হল পোষ্যপুত্র গোপীমোহন আর ছেলের সঙ্গে। ছেলে জানে হারবে, তবু মামলা করলে। দুই পক্ষে ছ লাখ টাকা খরচ করে শেষে মিটমাট। মামলা চলে বিলেত পর্যন্ত। এও তেমনি হবে।

আচার্য দু-চারবার সাহস করে একথা বীরেশ্বরকে বলেছিলেন। বীরেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—ও কথা বলবেন না আমাকে। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। হতে দেব না। আমার মৃত্যুর পর যা হয় হবে। মামলায় যদি হারি, তবে তৎক্ষণাৎ বীরেশ্বর রায় দেহত্যাগ করবে।

তাই আজ এমন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনে ব্রাহ্মণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে রায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—মঙ্গল হোক তোমার, মঙ্গল হোক বাবা। এই তো, এই তো মানুষের মত কথা, তোমার মত কথা! আজ তোমার পিতা পরলোকে তুষ্টি পাবেন।

বীরেশ্বর রায় নীরবেই সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি কিছুটা উদাস, কিছুটা বেদনাভারাক্রান্ত, কিন্তু সে দৃষ্টি প্রসন্ন।

রামব্রহ্ম বলেছিলেন—আমার কন্যা লক্ষ্মী এসেছে। ওখানে যে সব কাণ্ড চলছে, তাতেই ওরা তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে বলছিল—কমলাকান্তের নাকি চেহারা হয়েছে কার্তিকের মত। বাপেদের বংশের মত মাথায় খাটো নয়। এই লম্বা-চওড়া প্রশস্ত বুক, নাক আর চোখ এ দুটি—নাকি অবিকল তোমার মত। আমি বললাম—তা হবে না, 'নরাণাং মাতুলক্রম' যে যা।

বীরেশ্বরের মুখে এবার একটি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর বড় বড় উগ্র চোখ দুটিও নাকি জলে ভরে উঠেছিল। ন্যায়রত্নের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ন্যায়রত্ন চিঠি লিখে বীরেশ্বরের হাতে দিয়ে এসেছিলেন। সোমেশ্বর রায় মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ডেকে অকপটে নিজের পাপের কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—সেকালের মানুষের বিশ্বাসমত পারলৌকিক শান্তির ব্যবস্থা করতে। নিজে বিছানায় বসে শাস্ত্রবিধানমত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা খুলে সাগ্রহে পড়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন। হয় বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, নয় বিশ্বাস করতে মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন।

মহেশচন্দ্রের লেখা চিঠিখানায় শ্যামাকান্তের বিবরণের ঘটনার সঙ্গে কোন অমিল নেই।

অমিল ছিল দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে। দুজনেই আপন দোষ দেখতে পান নি। এখানে কিছুটা তফাৎ—শ্যামাকান্ত নিজের দোষ দেখেন নি। সোমেশ্বর কিছুটা দেখেছিলেন। ন্যায়রত্ন লিখছেন চিঠিতে—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—আপনি জানেন, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এই তান্ত্রিকের কি অত্যাচার আমি সহ্য করিয়াছি! আপনিই আমাকে এসব অনাচার বীরাচারের সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন, আমি তাহাও শুনি নাই। বংশের জন্য আমি সব সহ্য করিয়াছিলাম। তবে পাপ আমার লোভ! আমার সন্তান বাঁচিল, অবশ্য কলিকাতায় সাহেব ডাক্তার চিকিৎসা করিবার সময় বলিয়াছিলেন—এবার রক্তদোষের চিকিৎসা হইল, এবার সন্তান রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহা আমি বিশ্বাস করি না। সন্তান ওই তান্ত্রিকই বাঁচাইয়াছেন। কারণ ওই সময়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে দশ হাজার ডিগ্রী পাইলাম, তাহা তো পাইবার কথাই নয়! দুইটা একসঙ্গেই ঘটিল। আগে ডিগ্রী পরে সন্তান। তান্ত্রিক হাসিয়া বলিলেন—এখন হইয়াছে কি, তোমাকে রাজা করিয়া দিব।

এতেই লোভ হয়েছিল সোমেশ্বর রায়ের। তাঁর বিচারের দৃষ্টিতে তিনি তান্ত্রিকের শক্তির দুটি মূলধন দেখতে পেয়েছিলেন। এক ওই সৌভাগ্যশীলা রাজরাজেশ্বর, আর তাঁর তান্ত্রিক সাধনা তপস্যার শক্তি, ওই মনোহরা যোগিনী!

তাঁর মনে মনে অভিপ্রায় ছিল মনোহরাকে পেলে তিনিও এই সাধনা করতে পারবেন। এবং সিদ্ধিও পাবেন।

ইতিমধ্যে মনোহরাকে তিনি আকৃষ্ট করবারও চেষ্টা করেছিলেন। মনোহরা—যোগিনী,

না দেবী, যাই হোক সে বাইরে ছিল একটা মাথাখারাপ দরিদ্রকন্যার মত। সামান্য রঙচঙে জিনিস পেলে সে খুশী হত। ভাল খেতে পেলে খুশী হত। আর তার স্নেহ পড়েছিল বিমলার উপর। ছেলে কোলে নিয়ে সে বসে থাকত পরমানন্দে। এই সুযোগ নিয়েছিলেন সোমেশ্বর। ক্রমে তার বিশ্বাসও হয়েছিল যে, মনোহরার মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি তাঁকে বলেছিলেন—ওই সাধুটাকে ছেড়ে দে না। আমার কাছে থাক। আমি কত জিনিস দেব; কত ভাল খেতে দেব! রাণীর মত রাখব! কি?

পাগলী বলেছিল—আমাকে মারবে না ওর মত?

—না, না, না। মারব কেন?

—ও আমাকে মারে। বড় মারে।

—তাই তো বলছি, ওকে ছেড়ে দে।

—ও যে আমাকে খুন করে দেবে। ও খুনে। বাবারে।

—ওকে তাড়িয়ে দেব এখান থেকে।

—ও মন্তর জানে, মেরে ফেলবে আমাকে। তোমাকেও ফেলবে। ও তোমাকে ভয় করে না।

হঠাৎ সোমেশ্বরের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তুমি ওকে খুন করে দিতে পার না। দাও না গো! তোমার কাছে আমি খুব ভাল হয়ে থাকব। তোমার মেয়েকে মানুষ করব। দাও না গো!

এই বীজ! বীজ অঙ্কুর মিলল। পাতা বের হল। ক্রমে-ক্রমে সোমেশ্বর মনে মনে সাপের মত চক্রান্তের পাকে-পাকে বিষধারের মত হিংস্র হয়ে উঠলেন। সেদিন রাত্রে ওই বন্যায় নৌকো ভাসিয়ে ওপারে যাবার পথে তাঁর মনে সঙ্কল্প জাগল। এই সুযোগ। বন্যার এই দুর্দান্ত তুফানে ফেলে দেবেন। রক্তপাত করতে হবে না, আঘাত করতে হবে না, শুধু জলে ফেলে দেওয়া। মারবে ওকে কাঁসাই। প্রত্যক্ষ অপরাধ হবে না।

তাই দিলেন। কিন্তু—।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা বিচিত্র সুলতা, সোমেশ্বর রায় এই পাগল মনোহরাকে নিয়ে সাধন করতে সাহস করেন নি, তাকে আহারে-বিহারে নানা সামগ্রীতে সন্তুষ্ট করে নিজের বিলাস-সঙ্গিনীতে পরিণত করে তাকে আটকে রেখেছিলেন। ধারণা ছিল যোগিনী তুষ্ট হয়েই তাকে ধরা দিয়েছে। তার দয়াতে সব হবে।

তা হয়েছিল। সোমেশ্বর রায় তখন মহলের পর মহল কিনেছিলেন। রবিনসন সাহেবকে টাকা ধার দিয়ে তার কুটীর লাভ থেকে লাভ পেয়েছিলেন। কলকাতায় একজন সায়েব অ্যাটর্নীকে টাকা ধার দিয়ে তার টণ্ডী হয়েছিলেন। কিন্তু কোন বিভূতি তিনি পান নি।

মেয়েটা বেঁচে ছিল বছর তিনেক। তিন বছর সোমেশ্বর উন্মত্ত ছিলেন তাকে নিয়ে। বীরেশ্বরের জন্মের পর সে মারা যায়। অনেক দেওয়ার সঙ্গে সে তাঁকে আরও একটি সামগ্রী দিয়ে গিয়েছিল, সে হল সোমেশ্বরের ভ্রাত্যনারীর উপর একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ! এদিকে তাঁর রুচি আগে ছিল না। আগে বাঈজী রেখেছেন, বাড়ীতে সেবাদাসী রেখেছেন কিন্তু

ভ্রান্ত্যনারীতে রুচি ছিল না। এবার হল এই রুচি। রাজকুমারী কাত্যায়নী এক কন্যা, এক পুত্রের পর স্বামীকে দিয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা। যা ইচ্ছা করুন, তিনি তাঁর পুত্র-কন্যা এবং গৃহের গৃহিণীত্ব নিয়েই পরিতুষ্ট।

রামব্রহ্ম লিখেছিলেন—শুধু ব্যভিচারের জন্য যোগিনীকে লইয়া থাকার জন্য তিনি ভ্রষ্ট হইলেন, পাপগ্রস্ত হইলেন। তিনি স্বমুখে এই কথা আমাকে বলিলেন, এই পাপেই আমি ডুবিলাম। এই পাপ হইতে উৎপন্ন ব্যাধি হইতেই আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছি। অনন্ত নরকেও আমার বোধ হয় স্থান হইবে না। আপনি যথোচিত যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া ইহার প্রতিকার করিবেন। তান্ত্রিকের নিকট ঋণ আমি শোধ করিয়াছি। বিমলাকান্তকে অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছি। কিন্তু মনোহরা যোগিনীকে লইয়া যে পাপ করিয়াছি ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে জানি না!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে কি ভেবেছিলেন, মনে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা জানি না। তাঁর নিজের জীবনে সোফিয়া পর্বের মধ্যে এর কোন প্রভাব পেয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে আমি যেন দেখেছিলাম। বিমলা থেকে বীরেশ্বর তিন বছরের ছোট; এই তিন বছরের মধ্যেই সোফিয়া এসেছিল তাঁর জীবনে। তবে সব ক'খানি চিঠি পড়ে তাঁর মনে পড়েছিল পাগলাবাবাকে, তার নিদর্শন আছে। এবং এ চিঠিগুলির প্রতিটি অক্ষর তাঁর সত্য মনে হয়েছিল। তিনি আকুল হয়ে পত্র লিখেছিলেন কমলাকান্তকে। কমলাকান্ত তাঁর কাছে রত্নেশ্বর; তিনি তাঁকে রত্নেশ্বর বলেই পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রও আছে, এই দেখ। পড়ি শোন।

প্রাণাধিকেষু,

অসংখ্য কোটি আশীর্বাদ এবং স্নেহচুম্বনপূর্বক শ্রীমান রত্নেশ্বর বাবাজীবন অত্র পত্রে তোমাকে লিখি যে, ছেদী সিং এবং অত্র রায়রাজবাটীর পুরোহিত পূজ্যপাদ ন্যায়রত্নমহাশয় প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, তুমি সম্প্রতি শ্রীশ্রীকাশীধাম হইতে দীর্ঘকাল পর কার্যব্যপদেশে শ্যামনগর বাটী আগমন করিয়া তত্র অবস্থান করিতেছ। নীলকর জন রবিনসন সম্প্রতি শ্যামনগর ঠাকুরপাড়ায় কুঠী পত্তন করিয়া তত্রস্থ জমিদার সরকারবাবুদিগের সহিত সহযোগ করতঃ ওখানকার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অপরাপর প্রজাদিগের উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেছে, বলপূর্বক প্রজা সকলের ধান্য জমির ধান্যাদি ফসলসমূহ ভাঙিয়া দিয়া নীল বপন করাইতেছে। এমন কি রায়বাটীর জামাতা দৌহিত্রের জমিতেও জবরদস্তিপূর্বক নীল বপন করিয়া তোমাদিগের ভাগদার জোতদের নির্যাতন, অপমান করিয়াছে, তৎসংবাদসমূহ অবগত হইয়া প্রতিকারার্থ তুমি কাশীধাম হইতে আসিয়াছ। উত্তম করিয়াছ। এতাদৃশ উৎপীড়ন, জবরদস্তি শুধুমাত্র অর্থক্ষতিকারকই নয়, ইহা মর্যাদা-হানিকর ও অপমানজনক। অবশ্যই ইহার প্রতিবিধান প্রয়োজন। কিন্তু বাবাজীবন, অত্র বাটী—যাহা তোমার বাটী—তথায় না আসিয়া শ্যামনগরে আসিয়া ওঠা তোমার কি উচিত হইয়াছে? এবং নিরাপদ হইয়াছে? ইহাতে আমি মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিলাম, মর্মস্থলে আঘাত পাইলাম। দীর্ঘকাল তোমাকে নিরীক্ষণ করি নাই। তজ্জন্য বক্ষে তাপ অনুভব করি। আমার তো তুমি ব্যতীত কেহ নাই। যক্ষের মত সমস্ত আগলাইয়া বসিয়া আছি মাত্র।

ছেদীর নিকট অবগত হইলাম এবং শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্নকে তদীয় কন্যা বলিয়াছেন শুনিলাম যে, তুমি কুমার কার্তিকের মত সুন্দর হইয়াছ; রায়বংশের অনুরূপ বীরোচিত আকৃতি হইয়াছে এবং তোমার চোখ এবং নাসিকা অনেকটা আমার মত হইয়াছে। শুনিয়া অবধি চিত্ত, হৃদয় তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমাকে বক্ষে লইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

আমি বজরা পাঠাইলাম, তুমি পত্রপাঠ এই বজরায় স্বীয় বাটীতে চলিয়া আসিবে। আমি ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। বাড়ীঘর চুনকাম করিয়া পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থা করিলাম। আসিবার পূর্বে দ্রুতগামী নৌকায় কাহাকেও অগ্রে পাঠাইবে। এখানে ৺রী মাতার স্থানে এবং ৺রাজরাজেশ্বরের স্থানে বিশেষ পূজা দেওয়া হইবে। নহবৎ বাদ্যের ব্যবস্থা করিব।

সর্বশেষে যাহা লিখিতেছি তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ছেদী বলিল—তোমার সঙ্গেই তোমার ভালো-মা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভবানী দেবী তদীয়া পিতৃদেবসহ কাশীধাম হইতে আগমন করিয়াছেন এবং শ্যামনগরে তোমাকে নামাইয়া তিনি অন্যত্র কোথাও গমন করিয়াছেন। ছেদী তাহার কোন ঠিকানা, নিশানা অবগত নহে। অবগত হইলে আমি নিজেই গমন করিতাম। তুমি তাঁহাকে মদীয় এই নির্দেশ জানাইবে যে, তিনি যেন অত্র বাটী আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আমার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি আসিলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিব এবং অত্র বাটীতে তাঁহাকে লইয়া আসিব। তাঁহাকে বলিবে, তিনি আগমন করিলেই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমি কলিকাতায় যাইব। তথায় আমি এক পাগলাবাবাকে জানি—সম্ভবতঃ তাহাকে দেখিলে তাঁহার এতদিনের ব্রত উদযাপিত হইবেক। তুমি পত্রপাঠ এই বজরাতে বাটী চলিয়া আসিবে।

ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীবীরেশ্বর রায় দেবশর্মণঃ

*　　　　*　　　　*

বীরেশ্বর রায় বাড়ী সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমিদারী সেরেস্তার খাতায় খরচ লেখা আছে, ইমারত খাতে খরচ; শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর ওরফে কমলাকান্ত রায় ভট্টাচার্য আসিবেন বিধায় সমুদয় ইমারৎ সংস্কার চুনকাম ইত্যাদি করা হয়, তাহার জন্য ঝিনুকের চুন পোড়াই খরচ একদফা চার টাকা পাঁচ আনা পাঁচ গণ্ডা।

চাপরাসী, দারোয়ান, পাইকদের পাগড়ির জন্য লাল শালু খরিদ। এমনি অনেক খরচ সে সময় রায় এস্টেটে হয়েছিল। যাতে যে কেউ হোক বলবে, বীরেশ্বর রায় সেদিন মনের সকল সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হয়তো বা তিনি মনে মনে অভিযোগ করছিলেন ভবানী এবং বিমলাকান্তের উপর। কেন তারা তাঁকে বলে নি এতদিন? তারা তো এসব পরিচয় অনেক দিন আগে জেনেছে! সে সময় জানালে তো সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যেত। যেদিন কলকাতায়—মহেশচন্দ্র ভবানীকে কলকাতায় বিমলাকান্তের কাছে নিয়ে সব কথা প্রকাশ করেছিলেন—সেই দিন!

রত্নেশ্বর তাঁর সন্তান, প্রথম সন্তান।

দিদি বিমলার জন্য সেদিন এ-সত্য গোপন করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা তিনজনে। তিনি, বিমলাকান্ত এবং ভবানী। আর জানত বিমলা, সে নিজে চোর! সে গত। আর জানতেন তাঁর বাবা। সোমেশ্বর রায়। তিনিই এ সংবাদ গোপন করে রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন—বিমলা গত হোক, ও বেশীদিন বাঁচবে না। তারপর তুমি পোষ্যপুত্র নিয়ে ফিরে নিও।

বিমলাকান্তও প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

তাঁর এইসব চিন্তার কথার আভাস আছে তাঁর চিঠিতে। কাশীতে বিমলাকান্তকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় সমস্ত চিঠি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কাশীতে বিমলাকান্তকে এই অনুযোগ করেই চিঠি লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়। এবং তাঁকে লিখেছিলেন—"আপনি আমার কাছে পুত্র ঋণে আবদ্ধ। তাহা পরিশোধ করিতে আপনি আসিবেন। অবিলম্বে আসিবেন। তাহাতে সরকারী কর্ম না থাকে, কর্ম পরিত্যাগ করুন। আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন, তিনি আমার কনিষ্ঠা সহোদরা। তাহাকে লইয়া আসুন, ৺পিতাঠাকুর তাঁহার ঋণ পরিশোধার্থে অর্ধেক সম্পত্তি নামে রত্নেশ্বরকে দিলেও তাহা আপনার, আপনাকেই তাহা দিয়া গিয়াছেন। তাহা অবশ্যই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমার হৃদয় অধৈর্য পীড়িত হইয়া নিয়ত অশান্ত অধীর। আপনি অবিলম্বে আসুন। এবং আপনার পক্ষে আরও গুরুতর প্রয়োজন এই যে, সম্ভবতঃ আমি মহাসাধক ভবদীয় পিতৃদেব ও মদীয় শ্বশুরমহাশয়কে জানি। তিনি অদ্যাপি জীবিত। পত্রপাঠ চলিয়া আসুন।"

চিঠিখানা রেখে সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় কলকাতায় লোক পাঠিয়েছিলেন, জরুরী পত্র লিখেছিলেন সেখানকার নায়েব দেওয়ানকে।

"আপনি পত্রপাঠ 'বহুবাজার' গিয়া সোফিয়া বাঈজীর সন্ধান করুন। তাহার ওখানে পূজনীয় পাগলাবাবা আছেন কিনা সন্ধান লউন। যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া জানবাজার বাটীতে আনিয়া পরম যত্নে রাখিয়া সেবা করিবেন। যদি না আসেন তবে সদাসর্বদা বহুবাজারের বাটীর উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। যেন কোথাও চলিয়া না যান।

যদি সোফিয়ারা ঐ বাটীতে না থাকে, তবে তাহারা এখন কোথায় বাস করিতেছে, পাগলা-বাবাই বা কোথায় বাস করিতেছেন, বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার সন্ধান করুন। দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিতে হইলে তাহাও করিবেন। অত্র কর্মে অর্থব্যয়ের জন্য চিন্তা করিবেন না। যত টাকা খরচ হয় করিবেন। সহস্র, পাঁচ সহস্র কোনমতে মালিকের মতের জন্য চিন্তিত হইবেন না!"

বীরেশ্বর রায়ের আকৃতি, উল্লাস সম্ভবতঃ বর্ষার কাঁসাইয়ের বন্যার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। পরিচয় তার সব কিছুতে রয়েছে। জমা-খরচের খাতায় একটা খরচ রয়েছে। তার মধ্যেও রয়েছে পরিচয়। বিবিমহলের জন্য আসবাব খরিদ। প্রত্যাশা তিনি অনেক করেছিলেন, এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কিন্তু কমলাকান্ত আসেন নি। ফাইলে চিঠি রয়েছে কমলাকান্তের। বজরা ফিরে এসেছিল। বজরা থেকে নেমে এসেছিল খানসামা কর্মচারী কৃষ্ণ সরকার, রাঁধুনী বামুন, আর চারজন চাপরাসী। এসে নীরবেই বোধ করি চিঠিখানা বীরেশ্বর রায়ের হাতে দিয়েছিল। এই সেই চিঠিখানা সুলতা।

বজ্রের মত চিঠি!

অশেষ সন্মানাস্পদেষু, মাননীয় মহাশয়,

ভবদীয় পত্রপ্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিভ্রম ও বিভ্রান্তিতে পড়িলাম। আপনি প্রাণাধিক ইত্যাদি বহু সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া আমাকে অবিলম্বে কীর্তিহাট যাত্রা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি বহু চিন্তা করিয়া এবম্বিধ আচরণের হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। ভাবিতেছি, এই কলিকালে কি দ্বাপরযুগের ধনুর্বক্ত পর্বের ভূমিকা হইতেছে? মহাশয়ের সহিত প্রবল প্রতাপ মহারাজ বংশের তুলনা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি গরীব ব্রাহ্মণসন্তান। আমি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতে পারি না।

মহাশয়, কোন্ মুখে কি করিয়া এমত সুন্দর বাক্যগুলি লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। আপনি আমার মাতুল, ইহা আমার ভাগ্যের দোষ। আমি রায়বংশের দৌহিত্র, আমার রক্তে আপনাদের রায়বংশের রক্তের সংস্রব আছে ইহাতে আমি জ্বালা অনুভব করি। রায়বংশ ধনীর বংশ, কিন্তু তাহাদের পাপের সীমা নাই। এসব কথা আমি জানিতাম না। বীরপুরের ছত্রী গোপাল সিংহ প্রাচীন লোক, সে এখানে আসিয়া আপনার পিতা-পিতামহের কুৎসা করিয়া গেল। এবং স্বয়ং আপনি তাহারি প্রমাণ। আপনি অত্যাচারী, আপনি মত্তপ, আপনি লম্পট; মুসলমান বাঈজী রাখিয়া তাহাকে লইয়া কলিকাতার বসতবাটীতে উল্লাস করেন; আপনি নিজের সতীসাধ্বী দেবীতুল্যা পত্নীকে বিতাড়িত করিয়াছেন। মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণসন্তান, সামান্ত ব্যক্তি। তবে আমার পিতা দেবচরিত্র ব্যক্তি। পিতামহ শুনিয়াছি মহাসাধক ছিলেন। আপনার সহিত আমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক অনেক দিন পূর্বেই ছিন্ন হইয়াছে। আমার পিতাকে আপনি একরূপ বিতাড়িত করিয়াছেন। আমাকেও করিয়াছেন। আপনার সহিত কোন সম্পর্কই আমার নাই। উক্ত কীর্তিহাটের পুরী আপনার নানাবিধ পাপপুরীতে পরিণত হইয়াছে। ওই পুরীতে আপন স্বত্বের বলে যেদিন প্রবেশ করিতে পারিব সেইদিন যাগযজ্ঞ দ্বারা সমস্ত শুদ্ধ পবিত্র করিয়া প্রবেশ করিব। তৎপূর্বে নহে। আপনার বজরা ফিরাইয়া দিলাম।

আপনি আমার ভালো-মা কোথায় আছেন জানিতে চাহিয়াছেন। তাহা আপনি পাইবেন না। তিনি আজ জীবনে তপস্যা সার করিয়াছেন। সমগ্র কাশীর লোকে তাঁহাকে সতী-মা বলিয়া ডাকে। তাঁহার মুখের দিকে কেহ চোখ তুলিয়া তাকায় না। আপনার মত পাপীর স্পর্শমাত্রে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি দয়া করিয়া তাঁহার কোন খোঁজ করিবেন না।

নীলকর জন রবিনসন সাহেবের সঙ্গে যাহা করিবার তাহা আমিই করিব। তবে যাহাতে রায়বংশের ভাগিনেয়ের মর্যাদাহানি হয় এমন কিছু করিব না, তাহাতে নিশ্চিত থাকিবেন। আমি মূর্খ নহি। সুতরাং অতঃপর এ লইয়া ভবদীয় শিরঃপীড়ার কারণ না ঘটিলে কৃতার্থ হইব। পরিশেষে নিবেদন ইতি।

—নিবেদক

—শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্মা (আমার নাম রত্নেশ্বর নহে)।

সুরেশ্বর বললে—

চিঠিখানার মধ্যে ছিল বজ্রের আঘাত।

নির্মম আঘাত তিনি পেয়েছিলেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করেছিলেন তা বলতে পারব না। তবে ঘটনার স্রোত তখন দ্রুত বইতে শুরু করেছে।

ঠিক চারদিন পরের লেখা একখানা চিঠি দপ্তরের মধ্যে রয়েছে। বীরেশ্বর লেখেন নি। বীরেশ্বর রায়কে লিখেছেন তাঁর দেওয়ান ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য। তিনি দিন-পনের আগে মহল সফরে বেরিয়েছেন। ওই নতুন পত্তনী নেওয়া মহলদিগরে। সেসব মহলে অনেক কাজ। লাট কুতুবপুরের জমিদারী কাছারীতে নিজের কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহলে মহলে।

সে আমলে জমিদারদেরও নিজেদের আকার-আয়তন মত চতুরঙ্গবাহিনী ছিল। ষোল কাহারের পাল্কি, বর্কন্দাজ—যারা দস্তুরমত বড় পাগড়ি-কুর্তা এবং নাগরা জুতো পরে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে চলত; এরা অধিকাংশই ছিল হিন্দুস্থানী ডন-বৈঠক করা, ঘিউ-রুটি খাওয়া শরীর। নিত্যনিয়মিত কুস্তি করত এরা। তার সঙ্গে এদেশী লাঠিয়াল পাইক। কালো রঙ, পাকা বাঁশের মত শরীর, আঁটসাঁট করে হাঁটু পর্যন্ত খাটো কাপড, গায়ে জমিদারবাড়ীর দেওয়া ইউনিফর্ম ফতুয়া, মাথায় লাল শালুর পাগড়ি, কাঁধে একখানা গামছা। হাতে চার হাত লম্বা এদেশী লাঠি। আর থাকত দুজন ঘোড়সওয়ার হরকরা; এরাও বর্কন্দাজদের সামিল, তবে এদের বিশেষ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে যাওয়া-আসা। জরুরী চিঠি নিয়ে জমিদারী কাছারীতে আসা এবং তার উত্তর নিয়ে যাওয়া। এছাড়া গরুর গাড়ীতে আমীন এবং জরীপের সরঞ্জাম, তার সঙ্গে হিসাবনিকাশনবীস মুহুরী দুজন-তিনজন। আরও যেত রসুইয়ে বামুন, চাকর। সরঞ্জামেরও সমারোহ ছিল; রান্নার বাসন, বড় কড়াই, হাতা, বড় হাণ্ডা, সতরঞ্জি, তাকিয়া, চাদর, রূপা-বাঁধানো হুঁকো। তার সঙ্গে ডাবা-হুঁকো। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, মাহিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। কল্কে তামাক ঝুড়িভর্তি। আর সঙ্গে চলে গজেন্দ্রগমনের সঙ্গে তালে তালে ঘণ্টা বাজিয়ে রাজহস্তীর মত জমিদার-হস্তী। কাছারী পৌঁছে দেওয়ান সরজমিনে তদারকের প্রয়োজন হলে হাতীর পিঠে থাকেন। এই হাতী ঘোড়া গরুরগাড়ীর রথ এবং পদাতিক দিয়ে চতুরঙ্গবাহিনী।

উদ্দেশ্য ছিল, সমারোহ দেখিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই ত্রাস এবং সম্ভ্রম সঞ্চার করা।

নূতন মহলদিগরে প্রজাদের বাকী খাজনা আদায়, খাজনা বৃদ্ধি, পতিত জরীপ এবং পতিত জমি ভেঙে জমি তৈরীর ব্যবস্থা। তার সঙ্গে আছে মাঠের মধ্যে খাস পতিত সামিল সিচের পুকুর পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা; জমিদার কিছু টাকা দেবেন, বাকিটা বেগার ধরে কাটানো। নদীর ধারের মহলে নদীর বন্যা রোধের জন্য বাঁধ তৈরী। দেবস্থান মেরামত, দরকারমত দু-চার বিঘা জমি গ্রাম্য-দেবতার সেবার জন্য দান ইত্যাদি মহৎ কর্মও ছিল এর সঙ্গে। গ্রাম্য কলহ-বিবাদের বিচার করা হত।

চতুরঙ্গবাহিনী কাছারীতে এলে গ্রাম কলরবে মুখর হয়ে উঠত। নিত্য দেড় মণ দু মণ চাল রান্না হত। গ্রামের দরিদ্রজনেরা আসত, পাত পেতে বসে খেত, কুমড়োর ছক্কা, বেগুনের

অম্বলসহযোগে ডাল-ভাত খেয়ে হরিবোল দিয়ে উঠে যেত। এ-হরিবোল জমিদারের জয়ধ্বনি। তাছাড়া গ্রামের সদ্‌গৃহস্থ মণ্ডলদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হত। স্বয়ং দেওয়ান দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতেন।

এবারের আয়োজনে ঘটা ছিল অনেক বেশী। এবার মণ্ডলান তৌজী বীরপুরের কাছাকাছি গ্রামের কাছারীতে দেওয়ানের কাছারী পড়েছে।

বীরপুর মণ্ডল প্রজা গোপাল সিং ছত্রীর এলাকা। সে-গ্রামে আজও খাজনা আদায়ের দপ্তর পড়ে নি। কথাবার্তাও না। যা হচ্ছে আদালত মারফত। এবার কাছাকাছি কাছারীতে স্বয়ং দেওয়ান এসে বসে কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব রচনা করছেন।

স্বয়ং বীরেশ্বর রায়ের আসবার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন ছেদী সিং আসার পর সে-মত পরিবর্তন করে তিনি দেওয়ান আচার্যকেই পাঠিয়েছেন। তিনি কমলাকান্তকে পত্র লিখে বজরা পাঠিয়ে রায়বাড়ীর রঙ ফিরিয়ে মেরামত করে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় এল ওই বজ্রের মত পত্রোত্তর।

ঠিক তার চার দিন পর এল দেওয়ান আচার্যের এক পত্র। পত্র নিয়ে এসেছে ঘোড়সওয়ার হরকরা। সে-পত্র কমলাকান্তের ওই পত্রের পর যেন বজ্রাঘাতের বিদ্যুৎ এবং গর্জনের পর তার আগুন-জ্বলে-ওঠার চেহারা নিয়ে দেখা দিল।

দেওয়ান আচার্য লিখেছেন—হঠাৎ একটা জরুরী সংবাদ পেয়ে না জানিয়ে তিনি থাকতে পারলেন না। তাই সওয়ার হরকরা মারফত পাঠাচ্ছেন। আজই সন্ধ্যার সময় তিনি সংবাদ পেয়েছেন—বীরপুরের গোপাল সিং ছত্রী শ্যামনগর গিয়েছিল কমলাকান্তের কাছে। কমলাকান্ত শ্যামনগরে এসেছেন এ-সংবাদটা এ-অঞ্চলে রটে গেছে। সেখানে নীলকুঠীর সাহেবের সঙ্গে মামলা লড়বেন বলে গুজব খুব জোর হয়ে উঠেছে। গোপাল সিং ছত্রি খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিল, আজ ফিরে এসে নাকি গ্রামে প্রচার করেছে যে, কমলাকান্ত তাঁর তরফ থেকে তার মণ্ডলান স্বীকার করে নেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি নালিশ দায়ের করছেন মেদিনীপুর আদালতে মামা বীরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে। এবং প্রত্যেক মহলে ঢোলসহরত করে প্রজাদের জানিয়ে দেবেন যে, যারা বীরেশ্বর রায়কে ষোল আনা খাজনা দেবে, তারা নিজের দায়িত্বে দেবে। কমলাকান্ত সমুদয় সম্পত্তির আট আনা অংশের মালিক, তিনি তাঁর অংশের খাজনা নিজে আদায় নেবেন। বীরপুরের গোপাল সিং কাল বীরপুরে গ্রামদেবতার কাছে বলি দিয়ে পুজো দিয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে দশখানা ঢাক নিয়ে সারা গ্রাম তোলপাড় করে বলেছে—এবার বীরেশ্বর রায়কে দেখ্ লেঙ্গে। নাকে ঝামা ঘষব। গোটা সম্পত্তি যাতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস যায় তার চেষ্টা করছে কমলাকান্ত।

দেওয়ান আচার্য দেখে গিয়েছিলেন—বীরেশ্বর শ্যামনগর থেকে কমলাকান্তকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে কীর্তিহাটে আনবার জন্য বজরা পাঠাচ্ছেন। পত্রের খসড়া তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বীরেশ্বর রায় খসড়া পড়তে দেননি, পড়ে শুনিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—সম্ভবতঃ ভবানী দেবীর কথা এবং পাগলাবাবার কথা তাঁকে জানতে দিতে চান নি। যেটুকু তিনি কমলাকান্তকে লিখেছিলেন, সেইটুকুই পড়ে শুনিয়েছিলেন। তারপর

এই খবরে দেওয়ান আচার্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, তিনি লিখেছেন—তার খানিকটা তোমাকে পড়ে শোনাই সুলতা, বোধ হয় মুখে বলার চেয়ে ভাল হবে।—

বীরপুরের গোপাল সিং শ্যামনগর গিয়া কমলাকান্তের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছে। এবং তাঁহার কাছ হইতে আশ্বাস লইয়া ফিরিয়াছে। গোপাল সিং নাকি কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কমলাকান্তবাবু মহোদয়ের তরফ হইতে ঢোল সহরত করিয়া পরোয়ানা জারী করিতেছেন যে, প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়কে খাজনা প্রদান করিবে, তাহারা নিজের দায়িত্বে প্রদান করিবে। তাঁহার তরফ হইতে তাহা ওয়াশীল দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না। এবং বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়ের সহিত বন্দোবস্তমত কোন বৃদ্ধিই মঞ্জুর করিবেন না।

মিশ্র বলিলেন—তিনি লাট কুতবপুরের সকল গ্রামেই সকল প্রজার কাছেই এবম্প্রকার কথাবার্তা শ্রবণ করিয়াছেন। সম্ভবত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে দিবার চেষ্টা করিবেন।

সুতরাং অবিলম্বে মেদিনীপুরের আদালতে খোঁজ লওয়া আবশ্যক এইরূপ কোন মামলা দায়ের হইয়াছে কিনা। এবং শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভায়াজীবনের সঙ্গে একটা রফা প্রয়োজন। বিবাদের ক্ষেত্রে গোপাল সিংহের সহিত তাহার যোগাযোগ অতীব ক্ষতিকর হইবেক। আরও শুনিলাম—শ্রীযুক্ত কমলাকান্তবাবু কীর্তিহাট মোকাম আসিতেছেন না। শ্যামনগর এখান হইতে সন্নিকট। মাত্র ক্রোশ-পনের দূর। শুনিতেছি সেখানে শ্রীকমলাকান্ত ধর্মঘট করিয়া সরকারবাবু ও রবিনসন সাহেবের সহিত ঘোরতর বিবাদের সৃষ্টি করিতেছে।

অদ্য ভোর-ভোর সওয়ার যাত্রা করিতেছে। দ্বিপ্রহর বা তৃতীয়প্রহর নাগাদ পৌঁছিবে। আমাকে অবিলম্বে আপনার আদেশ জানাইবেন, আমি অতঃপর কি করিব।

শ্রীশ্রী৺রীমাতার চরণাম্বুজে এবং শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরের নিকট মালিকের সর্ববিধ কল্যাণ কামনান্তে ইতি—

নিবেদক ভবদীয় আশ্রিত
শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র আচার্য

শেষে তোমাকে সম্বোধনটা শোনাই, না'হলে অসম্পূর্ণ থাকবে জমিদারের পরিচয়।

মহামহিম মহিমার্ণব, প্রবলপ্রতাপ, বহুজন প্রতিপালক, অশেষ গুণান্বিত, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর রায় ভূস্বামী কীর্তিহাটস্থ বরাবরেষু।

* * *

অজাতশত্রু বাপবিম্বিসারকে বন্দী করে রাজা হয়েছিলেন। ঔরংজীব পিতা শাজাহানকে বন্দী করে রেখেছিলেন আগ্রা ফোর্টে। সেসব রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন বাপ বা উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ মদ্যপ, অপব্যয়ী, ব্যভিচারী হলে ছেলে বা উত্তরাধিকারী সরকারে দরখাস্ত দিয়ে প্রার্থনা করত যে, উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজ ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য অপব্যয়ী মালিকের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে 'কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে' নেওয়া হোক। তার নজীর তখন হয়েছে। কিছুদিন আগে বর্ধমান জেলার বনওয়ারিবাদ রাজবাড়ীর রাজাবাহাদুর এক মুসলমান বাঈজী নিয়ে কলকাতায় প্রমত্ত জীবনযাপন করতেন বলে তাঁর

ছেলে নালিশ করে সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে দিয়েছিল। পুরনো রাজা মাসোহারা নিয়ে কলকাতায় থাকেন। এইসব নজীর সংগ্রহ করেছিলেন কমলাকান্ত।

বীরেশ্বর রায় তাতে ভয় পান নি। ভয় পাবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তবু তখনও তিনি মত্ততায় অধীর। ক্রুদ্ধ হয়েও ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারেন নি। তিনি রত্নেশ্বর রায়কে লিখেছিলেন—

কল্যাণবরেষু,

তোমার উদ্ধত স্পর্ধিত পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। এবং মনে মনে শঙ্কিত হইলাম যে, তোমার এবম্বিধ উক্তির জন্য নরকেও তোমার স্থান হইবে না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলে এই প্রকারই হইয়া থাকে। ইহার জন্য তোমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। তুমি কাহাকে কি বলিয়াছ তাহা জান না।

গোপাল সিং রায়বংশের অবমাননাকারী; তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার পক্ষে ইহা যে কত বড় পাপ তাহা তুমি অবগত নহ।

তোমার সহিত পত্রালাপেও আমার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছে। তথাপি স্নেহনিম্নগামী; এসব উন্মার্গগামিতা পরিত্যাগকরতঃ তুমি এখনও আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বরং তোমার ভালো-মাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহাতে তোমার পাপ হইয়াছে কিনা। আমার বিশ্বাস তাহা তুমি কর নাই। তিনি কখনই এবম্প্রকার কার্য ও উক্তি অনুমোদন করিতে পারেন না। ইহা ব্যতীত শুনিতেছি, তুমি আমার নামে মামলা করিতে মনস্থ করিয়াছ। মহলদিগরের দোরবস্ত প্রজা সকলকে রায়সরকারে খাজনা দিতে নিষেধ করিয়া চোলসহরত করিবার কথা কর্ণে আসিতেছে। এ-কার্য করিলে তোমার আত্মঘাত করা হইবে। আমি আদালতে প্রমাণ করিয়া দিব যে, তুমি ৺সোমেশ্বর রায়ের কন্যা—বিমলাবালা দেবীর গর্ভজাত সন্তান নহ, শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত ভট্টাচার্যও তোমার জন্মদাতা পিতা নহেন। জালিয়াতি বা জাল করিয়া নয়, শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত এবং তদীয়া ভগ্নী শ্রীমতী ভবানী দেবীকেই সাক্ষী মান্য করিব। তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

তুমি সাবধান হইবে। নিজেকে সম্বরণ করিবে। তোমাকে এসব কথা লিখিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অথবা তোমার অপরাধ কি? ইহা তোমার পিতৃ-মাতৃ উভয় বংশের উপর নিদারুণ অভিশাপের ফল। আমি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি অন্তত তোমার ভালো-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কর। তুমি তোমার ভালো-মাকে বল—আমি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীবীরেশ্বর রায় দেবশর্মণঃ

চিঠি নিয়ে গিয়েছিল একজন সওয়ার বর্ক-অন্দাজ। নদীর পথ অনেক ঘুরপথ। তাতে অনেক দেরি লাগবে। এ যাবে সোজা পথে, নদী পার হতে হবে, রূপনারায়ণ। তা হোক, খেয়া আছে। বড়জোর তিন দিন লাগবে। কিন্তু ততদিনে কর্মফেরেই হোক আর অদৃষ্টচক্রেই

হোক, সে একটা নিষ্ঠুর পাক খেয়েছে। গোটা শ্যামনগর তখন আগুন লেগে পুড়ে গেছে।

সওয়ার যখন গ্রামে পৌঁছুল, তখনও অনেক ঘরের খড়শূন্য কাঠ ধোঁয়াচ্ছে। কমলাকান্তের ঘরখানায় শিকল দিয়ে বন্ধ করে একেবারে চারকোণে আগুন দিয়েছিল। ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিল সে। আর এমনি করে আগুন দিয়েছিল ঠাকুরদাস পালের ঘরে। বাকি গ্রামটায় একসঙ্গে অনেক ঘরে আগুন দিয়েছিল। ফলে কেউ কারু সাহায্য করতে পারে নি। কমলাকান্তের গোটা পিঠটা পুড়ে গেছে। ঠাকুরদাস পালের সর্বাঙ্গ এখানে-ওখানে পুড়েছে। সে কমলাকান্তকে আগলে তার কাছেই শুতো। সে-ই কোনরকমে জানালা ভেঙে কমলাকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওদিকে ঠাকুরদাস পালের বাড়ীতে তার স্ত্রী-পুত্র পোড়া-চালের তলায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গেছে।

কমলাকান্তকে আশ্রয় দিয়েছেন বিমলাকান্তের জ্ঞাতিরা। ঠাকুরপাড়ায় ঠাকুরদের ভিটের উপর নতুন তৈরী বাংলোটায় রবিনসন সাহেব মদ খেয়ে বন্দুক কাঁধে নিয়ে পায়চারি করছে এবং মধ্যে মধ্যে উড়ন্ত কাক-চিল মেরে আনন্দ করছে।

গোটা শ্যামনগর পুড়ে গেছে। যুগলপুরে দুখানা মৌজা—শ্যামনগর, রাধানগর; মিয়াঠাকুরদের ঠাকুরপাড়া ছিল শ্যামনগরেরই অন্তর্গত কিন্তু শ্যামনগর থেকে একটু দূরের শ্যামনগরেরই একটা আলাদা চক ছিল ওটা। তার পাশে পাকপাড়া আর একটা চক।

শ্যামনগরই সব থেকে বড় বসতি। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কয়েকঘর বৈদ্য, তাছাড়া নবশাকদের পাড়া, গোপপাড়া, তেলিপাড়া, তামুলিপাড়া, মাহিষ্যপাড়া—অধিকাংশই সেকালের সদ্‌জাতি। এই শ্যামনগর বলতে গেলে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত পুড়ে গেছে। অকস্মাৎ আগুন লেগে পোড়ে নি, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কুঠিয়াল জন রবিনসন। আগুন লাগিয়েছে নাকি বীরপুরের ছত্রী বদমাস গোপাল সিং। এবং কমলাকান্ত এই আগুনে পুড়ে জখম হয়েছে, আর ঠাকুরদাস পালের স্ত্রী-পুত্র ঘরের পোড়াচাল চাপা পড়ে মারা গেছে। তাছাড়া গোয়ালে গরু পুড়েছে, ছাগল পুড়েছে, গৃহস্থের উঠোন-চাটা কুকুর-বেড়ালও পুড়েছে। দশ-পনের জন কিছু কিছু পুড়েছে, আর হাত-পা পুড়িয়েছে অনেক লোক।

পৃথিবীতে ঘটনার গতিপথ বিচিত্র। মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট আবহাওয়ার খবরে বলতে পারে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার খবরে বলছি—কাল শুকনো যাবে আবহাওয়া অথবা মেঘলা যাবে। কিন্তু মানুষের মনের গতি অতি বিচিত্র, কোন যন্ত্রেই তাকে মাপা বা ধরা যায় না।

ছত্রী গোপাল সিং এসেছিল বীরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমলাকান্তের পিছনে আশ্রয় নেবার জন্য।

কমলাকান্ত কাশী থেকে শ্যামনগর এসেছিলেন শুধু নিজের জমি উদ্ধার করবার জন্যেই নয়, তিনি নিজেও এসেছিলেন বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। কথাটা তাঁর নিজের মনে মনেই ছিল, ঘুণাক্ষরে বিমলাকান্তকে বা ভালো-মাকে জানতে দেন নি।

কমলাকান্ত রত্নেশ্বর রায় হয়ে ডায়রী রাখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ডায়রীর প্রথম খণ্ডটা একটু বিচিত্র। পৃষ্ঠার দুটো দিক—প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি ডায়রী শুরু করেছিলেন, যেদিন তিনি

বীরেশ্বর রায়ের পোষ্যপুত্র হয়ে রত্নেশ্বর রায় হলেন সেদিন থেকে; দুয়ের পৃষ্ঠায় তিনি তাঁর জীবনের পূর্বকথা লিখেছিলেন। তারই মধ্যে আছে তাঁর অকপট মনের প্রকাশ।

নিজের বংশ-পরিচয়—যে বংশ-পরিচয় তাঁর কাছে তাঁর বাল্যকাল থেকে সত্য বলে জানা ছিল তাই দিয়েছেন। যতটুকু কথা মনে পড়ে তা লিখেছেন। তার মধ্যে রয়েছে—'আমার বাল্যকাল, তখন আমার চার বছর বয়স—আমার মামা বীরেশ্বর রায়কে দেখে বড় ভয় হত। আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকতেন যে আমি পালাতাম, পালাবার জন্য কান্না শুরু করতাম। এমন ছবি দুটো-চারটে আমার মনে যেন গেঁথে রয়েছে।' তারপর কলকাতার কথা লিখেছেন। বছর-দুয়েক কলকাতায় ছিলেন। এরই মধ্যে ভবানী তাঁর বাবাকে নিয়ে কলকাতা এসেছেন—তিনি তাঁকে 'ভালো-মা' বলে ডাকতেন। তাঁর কোলেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। 'ভালো-মা'র প্রতি ভালবাসা ছিল বাপ বিমলাকান্তের চেয়েও বেশী। ভালো-মাকে পেয়ে যেমন খুশী হয়েছিলেন, তেমনি ক্রোধ তাঁর বেড়েছিল মামার উপর। সেই বয়সেই এটুকু বুঝেছিলেন যে, 'ভালো-মা' ওই মামা বীরেশ্বর রায়ের ভয়েই চলে এসেছেন। তারপর কাশী। কাশীর জীবনের অনেক ঘটনা আছে। সেখানে দুর্দান্তপনা করেছেন, ওখানকার বাঙালী ছেলেদের নেতৃত্ব করেছেন, কুস্তি লড়েছেন, গঙ্গায় সাঁতার কেটেছেন, হৈ-হৈ করেছেন, ভালো-মায়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছেন, বাপের সঙ্গে সন্ন্যাসী দেখতে গিয়েছেন; আবার আদালতে গিয়েছেন। কোম্পানীর সাহেবদের বাড়ীতে ও ক্যান্টনমেণ্টে গিয়েছেন বাবার সঙ্গে। তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলেছেন। পড়াশুনা করেছেন, সংস্কৃত-ইংরাজী পড়তেন। বাংলা পড়াটা তখন খুব জরুরী ছিল না। বাবা পড়াতেন সংস্কৃত, ভালো-মায়ের বাবা দাদামশাই মহেশচন্দ্র পড়াতেন ইংরাজী।

তার সঙ্গে দিন দিন তাঁর আক্রোশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই মামার উপর। তখন জেনেছেন সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র হিসেবে তিনি মাতামহের উইলসূত্রে রায়বাড়ীর সম্পত্তির অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী, দেবোত্তরের সেবাইত। তাঁর বাবা বিমলাকান্ত সমস্ত ত্যাগ করে এসেছেন কিন্তু সে ত্যাগ করবার অধিকার তাঁর নেই। আইন জেনেছেন। সে আইন-বলে তিনি তাঁর মদ্যপ বাঈজীবিলাসী মামাকে সমস্ত বিষয় এবং দেবত্র থেকে অপসারিত করতে পারেন। কিন্তু বিমলাকান্ত এবং তাঁর ভালো-মাকে তিনি এ-মনের কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি। তিনি জানতেন, তাঁরা তাকে তিরস্কার করবেন, বাধা দেবেন।

ডায়রীর এই বিবরণের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে: "একদা আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—সে একটি পাষণ্ড; মহাপাপী। ঈশ্বরকে বলিহারি যে তিনি এমন জঘন্য কদর্য মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত করেন না!

ভালো-মা ঘরের ভিতরে ছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—তুই কাহাকে এ কথা বলিতেছিস রে?

আমি বলিলাম—বলিতেছি আমার মাতুল মহাশয়কে। তোমার স্বামী কথাটা জিভে আটকাইয়া গেল।

ভালো-মা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। তাহাতে নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র

মনে হইল। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—তোর জিহ্বা খসিয়া যাইবে। অনন্ত নরকে তোর স্থান হইবে না। তোর চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইলেন। তারপর ক্ষিপ্তের মত স্বীয় ললাটে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—ফাটিয়া যাউক, ফাটিয়া যাউক, আমার এই মন্দ ললাট ফাটিয়া যাউক!

অতঃপর সে এক তুমুল কাণ্ড। তিনি জলগ্রহণ করিলেন না। মদীয় পিতৃদেব তাঁহার বাসাবাটী হইতে আসিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। আমি অধোবদন হইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু আমার মনের সঞ্চিত ক্রোধ আরও যেন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া ভালো-মা এবং পিতৃদেবের আদেশে আমাকে সারাদিন উপবাস করিতে হইল। এই নিন্দায় আমার জিহ্বা কলুষিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের নির্দেশক্রমে অহোরাত্র আমাকে ওই উপবাসী অবস্থায় শ্রীহরি শ্রীহরি - হরি শ্রীরাম শ্রীরাম শ্রীরাম জপ করিতে হইল।

তাহা করিলাম। ভালো-মায়ের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। তিনি আমার গর্ভধারিণীর অধিক। দেবী অপেক্ষাও পবিত্রা এবং পূজনীয়া। তাহার সঙ্গে পিতৃনির্দেশ অবশ্যই পালন করিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিলাম সুযোগ পাইলেই কলিকাতা যাইব। এবং মামলা দায়ের করিয়া এই বীরেশ্বর রায়ের দম্ভ চূর্ণ করিব। প্রতিশোধ লইব। শুধু বীরেশ্বর রায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিলাম। যেন আমার পিতৃদেব এবং ভালো-মাতা হইতে দীর্ঘায়ু হন তিনি। তখন আমি আমার এই আক্রোশ ক্ষোভ মিটাইব।"

হঠাৎ সুযোগ এল। বিমলাকান্ত এবং ভালো-মা বর্তমানেই কমলাকান্ত বাংলাদেশে ফিরিবার সুযোগ পেলেন। চিঠি পেলেন ঠাকুরদাস পালের। "জমিতে সায়েব জবরদস্তি নীল চাষ করাইতেছে। আমি আর চাষ করিতে পারিব না। আতপের অভাবে ঠাকুরের ভোগ হইবে না। প্রতিকার যাহা হয় করিতে আজ্ঞা হয়।" বিমলাকান্ত বাধ্য হয়ে চিঠি দিয়ে কমলাকান্তকে শ্যামনগর পাঠালেন। শ্যামনগরের জমি জন রবিনসনের নীল চাষের গ্রাস থেকে উদ্ধার করবার জন্য। নিজে ছুটি পেলেন না। আদালতের কাছ থেকে তিনি তখন কমিশরিয়েটের কাজ পেয়েছেন।

জন রবিনসনকে পত্র দিলেন বিমলাকান্ত। ওদিকে রায় এস্টেটে গিরীন্দ্র আচার্যকে পত্র দিলেন। রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থকে পত্র দিলেন। ডাকযোগে কলকাতায় বীরেশ্বর রায়কেও পত্র দিতে তিনি ভোলেন নি। কমলাকান্তকে প্রতিজ্ঞা করালেন, বল তুমি সেখানে গিয়ে তোমার মামার সঙ্গে ঝগড়া করবে না?

কমলাকান্ত বললেন—ঝগড়া আমি করব না কিন্তু তিনি যদি করেন!

—করলেও তুমি সহ্য করবে।

কমলাকান্ত এর উত্তর দিতে চান নি।

রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতে চাহি নাই। এ প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশে আসিবার আমার কোনরূপই আগ্রহ ছিল না। কারণ আমার শ্যামনগর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য পৈতৃক জমি নীলকরের হাত হইতে উদ্ধার করা নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কীর্তিহাটের সম্পত্তি। আমাকে পরিত্রাণ করিলেন ভালো-মা। আমি উত্তর দিবার পূর্বেই

তিনি মধ্যস্থলে আসিয়া কহিলেন—না, তিনি তাহা করিবেন না!

আমি বলিলাম—যদি করেন ?

তিনি বলিলেন—তাহার জন্য চিন্তা নাই। আমি দেশে যাইতেছি, তোর সঙ্গেই যাইব। তিনি কলহ করিলে তুই আমাকে বলিবি, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।

—কি ব্যবস্থা করিবে ?

—আমি তোকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিব—এই আমরা আসিয়াছি, কি করিবেন করুন।

আমি বলিলাম—না—না—না। তাহা আমি পারিব না।

ভালো-মা বলিলেন—উত্তম, তাহাও তোকে করিতে হইবে না! শুধু আমাকে জানাইবি—তিনি ঝগড়া করিতেছেন।

আমি সুযোগ গ্রহণ করিলাম। বলিলাম—তাহাই হইবে। ভালো-মা শ্যামনগরের ঘাটে আমাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার পিতার সঙ্গে। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন আছে, বারো বৎসরের ব্রত। বারো বৎসর পূর্বে গঙ্গাসাগর তীর্থের নিকট এক জাগ্রত কালীমন্দিরে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বারো বৎসর অন্তে সেই মন্দিরেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। যাইবার সময়ও বলিয়া গেলেন—আমার চরণ স্পর্শ করিয়া বল তিনি ঝগড়া করিলে কিছু করিবার পূর্বে আমাকে না জানাইয়া কিছু করিবে না।

সঙ্কল্প ছিল এই প্রতিজ্ঞার সুযোগই আমি লইব। পিতা প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন—বল তুমি মাতুল বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে কলহ করিবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করি নাই, তৎপূর্বেই ভালো-মা মাঝখানে পড়িয়া বলিয়াছিলেন—না, তিনি তাহা করিবেন না। সুতরাং আমার কলহ করিতে বাধা নাই ইহা আমি জানিতাম। সেই সুযোগই গ্রহণ করিলাম। কীর্তিহাটের পত্র লইয়া বজরা আসিতেই আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম, সাদর পত্রের উত্তরে বজ্রসমতুল্য পত্রোত্তরে আঘাত হানিলাম। তিনি কলহ করেন নাই, ভালো-মাকে তো তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই!”

সুরেশ্বর বললে—সেদিন শ্যামনগরে এসে কমলাকান্তের অবস্থা আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি। আমার সঙ্গে মেলে। সেটেলমেণ্টের বুঝারতের প্রথম দিন: যেই আমি কুড়ারাম রায়ের পাঁচালীর কথা উল্লেখ করে গোচর আর বসতবাড়ী লাখরাজ বলে স্বীকার করে নিলাম, অমনি গোটা গ্রামের মানুষ আমাকে ধন্য ধন্য করে আমাকে তাদের পরম আশ্রয় করে তুললে। আমি তাই বিশ্বাস করলাম। স্ফীত হলাম।

কমলাকান্তকেও তাই বলে মেনে নিয়েছিল শ্যামনগরের লোক। প্রথম দিনই সে জন রবিসনসনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। বিমলাকান্তের চিঠিখানা বাংলোর ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল, জন রবিনসন চিঠিখানা পড়ে খুশী হয়েই বেরিয়ে এসে তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিল—আশ্চর্য্য তো! তুমি বীরার মত দেখতে, তুমি বিমলাবাবুর ছেলে? I am so glad to see you young man!

বিমলাকান্তের চিঠিতে বেশী কিছু ছিল না, তিনি লিখেছিলেন—আমার ছেলেকে তোমার

কাছে পাঠাচ্ছি। তার পরিচয়পত্র এটা। আশা করি আমাকে তোমার মনে আছে। সামান্ত কাজের জন্ত তাকে পাঠালাম, তার কাছে সব শুনবে।

কমলাকান্তও ভদ্রতা করে কয়েকটা কথা বলেছিল। জন রবিনসন বলেছিল—বল, কি করতে পারি? নিশ্চয়ই তোমাদের জমির কথা। ওয়েল, আজ নয়, কাম টু-মরো। আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা করব। কিন্তু কিছু খাবে না? এ কাপ অফ টী?

ধন্তবাদ দিয়ে কমলাকান্ত বলেছিল—নিশ্চয়; খুব আনন্দের সঙ্গে খাব।

হেসে রবিনসন বলেছিল—বস, বস। এত খুশী হলাম আমি যে, হিন্দু গোঁড়ামি তোমার মধ্যে নেই। তোমার বাবা বিমলাবাবু আমাদের ওখানে আসত, তখন সে ছেলেমানুষ, কখনও এক গ্লাস জল খেতো না।

এইটুকুতেই প্রথম দিনেই গোটা শ্যামনগর মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ওঃ, কি খাতির করেছে কুঠিয়ালসায়েব! হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে আদর কত! চা খাইয়েছে। যেটা ওই দে-সরকারদেরও বলে না। গ্রামের ভট্টাচার্যেরা অবশ্য সায়েবের ওখানে চা খাওয়ায় দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি। সাহসের কথায়, ইংরিজীতে কথা বলার পারঙ্গমতায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা ক'রে বলেছিলেন—ও-ও তো নিজে মস্ত জমিদার। কাশীতে শিক্ষা। তার উপর রায়েদের রক্ত আছে। বীরেশ্বর রায়কে ডেকে লাটসাহেব দেখা করে। চেহারা দেখছ না! নরাণাং মাতুলক্রম।

ঠাকুরদাস খুশী হয়েছিল সব থেকে বেশী। সে বলেছিল—বাপ জিন্দে ছেলে হয়, দাদাঠাকুর আমার মামা জিন্দে ভাগ্নে।

সন্ধ্যেবেলা গ্রামের সকল লোক এসে তার বাড়ীতে বসে তাকে বলেছিল—দেখ ভায়া, তোমার কাছে আমরা একবার এলাম।

খুশী হয়ে কমলাকান্ত বলেছিলেন—আসুন। ঠাকুরদাসদা, যে-সতরঞ্জি এনেছি কাশী থেকে, সেইটেই পাতো। বসুন।

গ্রামের প্রবীণ তিনি, কমলাকান্তের সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, তিনি বলেছিলেন—ভায়া, সাহেব তো তোমার জমি ছেড়ে দেবে। কিন্তু গ্রামের লোকের কি হবে? দেখ গ্রামের মধ্যে কেউ ধনী হলে, শিক্ষিত হলে সকলে তার মুখের দিকে ভরসা করে চেয়ে থাকে। ধনী শিক্ষিত যিনি, তিনিও লোকের মুখের দিকে তাকান। তোমাদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতে পারলে তো সাহেব এবার হাতে মাথা কাটবে।

তারপর বলেছিলেন—সাহেবের অত্যাচারের কথা। জান ভাই, বেটা মহিষাসুরের মত লম্পট। মেয়েদের ইজ্জত পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তুমি আমাদের ছেড়ে মিটমাট করো না। আমাদের নিয়ে যা করবার হয় কর। না-হয় এক কাজ কর না। তুমি কীর্তিহাটের অর্ধেক অংশের শরিক, তুমি আমাদের সব জমিজেরাত কিনে নাও। আমাদের বরং তোমার মহলে জায়গা দাও। এখানে তুমি সাহেবের সঙ্গে ফয়সালা কর।

তরুণ কমলাকান্ত স্ফীত নিশ্চয় হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া তিনি শহরের শিক্ষায়-দীক্ষায় অন্ত ধরনের মানুষ। তার উপর তিনি জেদী, দুর্দান্ত—তাঁর দেহে বীরেশ্বর রায়ের রক্ত. তাঁর

প্রকৃতি জন্মগত ধাতুর জন্য উগ্র অনমনীয়। তিনি বললেন—এ-কথা বলতে হবে কেন ঠাকুরদা, এর জন্যেই আমি কাশী থেকে আসি নি! এ তো ডাকে চিঠি লিখলেই হত! আপনাদের ভরসায় আমি এখানে এসেছি। আপনাদের ছেড়ে আমি মিটমাট করব! তা কখনও করব না।

তাঁরা সকলে একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে উঠে গিয়েছিল।

পরদিন কমলাকান্ত সাহেবের সঙ্গে কথামত দেখা করতে গিয়ে তাই বলে এল এবং ঝগড়া করেই চলে এল।

জন রবিনসন তাঁকে বললেন—ওয়েল ইয়ং ম্যান, আমি তোমায় অর্ধেক জমি নীলচাষ থেকে রেহাই দেব। নট অল। দে-সরকার জমিদার বললে—তোমাদের ল্যাণ্ডই হল বেস্ট ল্যাণ্ড। ওল্ড রায়বাবু—ইয়োর ম্যাটারন্যাল গ্র্যাণ্ডফাদার, ভেরী শ্রুড ম্যান, সে সান-ইন-ল'র জন্যে বেছে বেছে বেস্ট ল্যাণ্ড কিনেছিল। হাফ ছেড়ে দেব আমি।

মনে মনে তেতে উঠেছিলেন কমলকান্ত। কিন্তু নিজের কথা বাদ দিয়ে বলেছিলেন—বাট হোয়াট এ্যাবাউট আদার পিপ্‌ল্? অন্য সব লোকদের কি হবে? আমি আমার জন্যে কিছু বলব না, অন্যদেরও অর্ধেক জমি ছেড়ে দাও। সকলের ভাল জমিতে তুমি জবরদস্তি নীল লাগাতে বাধ্য করছ। তা করলে তো হবে না।

চমকে উঠেছিল জন রবিনসন।

দেশে তখন নীলকরের অত্যাচার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। হরিশ মুখার্জি বলে একজন নেটিভ খুব কড়া কড়া কথা লিখছে। এখানে লেফ্‌টন্যাণ্ট-গভর্নর গভর্নর-জেনারেলের কাছে দরখাস্ত করছে। ছেলেটা সেই সুরে কথা বলছে। শহর থেকে এসেছে ইংরিজী-জানা ইয়ং ম্যান। জন রবিনসন চমকে উঠল। তার উপর ছেলেটা বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে। কীর্তিহাটের অর্ধেক অংশের মালিক। এর আওয়াজ তো ব্ল্যাঙ্ক কার্টিজের আওয়াজ নয়।

জন রবিনসন চমকে উঠে বলেছিল—হোয়াট?

—অন্য লোকেদের কি হবে?

জন রবিনসন বলেছিল—আই সী, ভয় দেখাচ্ছ আমাকে?

—নো। বলছি—এ মহা অন্যায় করছ তুমি। অত্যাচার করছ। এটা না করে অর্ধেক জমি ওদেরও ছেড়ে দাও। ওদের ফেলে আমি তোমার এই অনুগ্রহের অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া —এ আমি নেব না।

জন রবিনসন হাসি থামিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হুঁ! I see. You are a chela of Haris Mukherjee.

কমলাকান্তের প্রকৃতিও উগ্র ছিল, তিনি ভয় পান নি, বলেছিলেন—No. I am not anybody's chela.

—Then What are you? Who taught you all these things?

—আমি কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর অর্ধেকের মালিক। যে সোমেশ্বর রায়ের টাকাতেই তোমার বাপ ব্যবসা করেছিল, মাসে মাসে সুদ গুনতে তোমরা, তিনি আমার মাতামহ। I

know all these things.

রবিনসন রেগে উঠে দাঁড়িয়েছিল।—you say so ?

—Yes, I say so. কীর্তিহাটের এলাকায় তোমার কুঠী আছে। এস্টেটের টাকা সব শোধ হয়েছে কিনা জানি না। হরিশ মুখার্জির চেলা নই আমি।

জন রবিনসন চীৎকার করে বলেছিল—বোয়, হামারা চাবুক লে আও।

মুহূর্তে কমলাকান্তও উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নেমেছিলেন জমিতে এবং দ্রুতপদে চলে এসেছিলেন। রবিনসন হা-হা শব্দে হাসতে লেগেছিল।

গ্রামে ফিরে সে-গ্রামের সকলকে ডেকেছিলেন এবং রবিনসনের সঙ্গে লড়াইয়ের বীজ পত্তন করেছিলেন সেইদিনই।

সুরেশ্বর বললে—এখানে একটা কথা বলি সুলতা। সেটা হল—বামুন, বদ্যি আর কায়স্থ—এই তিনটে জাত সেকালে জমিদারী সেরেস্তায় বড় খারাপ জাত ছিল। তার সঙ্গে মুসলমান। সহজে এরা বশ মানত না। রাজা-জমিদার এদের হজম করতে পারে নি। তার সঙ্গে ছত্রী। তবে বাংলাদেশে তারা খুব কম। জমিদারীর বাজারে যেসব মৌজায় এই তিন জাতের বেশী বাস, সে-সব গ্রামের দর কিছু সস্তা। শ্যামনগর সেই ধরনের গ্রাম। ঠাকুর-মিয়াদের জমিদারী যেদিন দে-সরকাররা কেনে, সেদিন এঁরা ঢাক বাজিয়ে পুজো দিয়েছিলেন সর্বরক্ষেতলায়। দে-সরকার যেদিন সুদের দাবী করেছিল, সেদিন গ্রামসুদ্ধ চড়াও হয়েছিল দে-সরকারের নতুন জমিদারী-কাছারীর আটচালায়।

কমলাকান্তকে পেয়ে এরা কোমরে বল পেয়েছিল। বিশেষ করে কমলাকান্ত যে দম্ভ করে বলে এসেছে—আমি কীর্তিহাটের এস্টেটের আট আনার মালিক, তাতে ভরসা পেয়ে তাদের মনের আগুনের উপর পড়া ছাই উড়ে গিয়ে নতুন করে গনগনিয়ে উঠেছিল। সুতরাং বিবাদটা পাকতে দেরি হয় নি।

পথ একটা স্থির হয়েছিল, তাতে জমিদারের সঙ্গে লড়াই শুরু হল আগে। দে-সরকার রবিনসনকে ডেকে এনে বসিয়েছে; সে-ই এখন টাকা দিচ্ছে, সুতরাং মূলে আঘাত দেওয়া হল আগে। ওদিকে রবিনসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমলাকান্ত তাঁর নতুন শেখা ইংরিজীবিদ্যায় ফলাও করে দরখাস্ত করলেন হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট থেকে কমিশনার, লাটসাহেব পর্যন্ত। ওদিকে দে-সরকারদের সঙ্গে ধর্মঘট করে খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হল।

দে-সরকারের বাড়ী রাধানগর—সেখানে অধিকাংশই কায়স্থ, কায়স্থেরাও চুলবুল করতে লাগল, কিন্তু দে-সরকার সুকৌশলে ব্যাপারটাকে কায়স্থদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং অপর জাতের জোট বেঁধে, জাত নিয়ে ঝগড়ায় পরিণত করেছিলেন। ফলে কায়স্থেরা যোগ দিতে ইচ্ছে থাকতেও সরে রইল।

সুরেশ্বর বললে—জাত নিয়ে ঝগড়া যে কি, তা তো তোমাকে বোঝাতে হবে না। এ দেশটাই হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ে ভাগ হয়ে গেল।

সুলতা বললে—ইয়োরোপে জু-কৃশ্চানের ঝগড়া, সার্ব-স্লাভের ঝগড়া অনেক উদাহরণ আছে, তুমি বল—কথাটা অবিশ্বাস করছি না। ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের ঝগড়া নেই-নেই

করেও থেকে গেছে। বাবা বলেছিলেন—সুরেশ্বর পিছিয়েছে বোধ হয়, তোকে বিয়ে করলে দেবোত্তরের সেবায়েৎ-স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে বলে।

সুরেশ্বর বললে—চতুর দে-সরকার এই জাতিতত্ত্বের চাল চালতে ভোলেন নি। রবিনসনের কুঠীতে অনেক কায়স্থের চাকরি করে দিয়েছিলেন। চতুর লোক ট্যারা দে-সরকার। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও তুলেছিলেন—পথে-ঘাটে দেখা হলে বামুনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মুখে-বুকে ধুলো বুলোতে হবে এটা কি রকম? সেইটে আমি করিনে, সেই ওদের রাগ।

তবুও একটা দল বিরূপ ছিল, কিন্তু ধর্মঘটে যোগ দেয় নি।

শ্যামনগরে ব্রাহ্মণেরা সদ্গোপ এবং অন্তদের বারণ করেছিলেন—কোন কায়স্থকে দেখে মাথা হেঁট করবিনে। খবরদার!

ঠাকুরদাস পাল তাদের নেতা, কমলাকান্তের চেয়ে বয়সে বড় হয়েও অনুগত লক্ষ্মণ, সে হরিধ্বনি দিয়ে বলেছিল—হরি-হরি ভাই!

সোৎসাহে হরিধ্বনিও উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে এসেছিল বীরপুরের গোপাল সিং। গোপাল জানত বিমলাকান্তকে এবং কমলাকান্তকে তাড়িয়েছেন বীরেশ্বর রায়। চতুর বিষয়ী গোপাল সিং কমলাকান্তের আগমনবার্তা শুনেই এখানে এসেছিল, বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে কমলাকান্তের মত দুর্ভেদ্য ঢালের পশ্চাতে আশ্রয় নেবার জন্যে।

বিষয় হল মজার বস্তু, কমলাকান্তকে উত্তেজিত করে কোনরকমে খাড়া করতে পারলে বীরেশ্বরের ডান হাতখানাই ভেঙে দিতে পারবে।

কার্যকারণে ঘটনাও এই মুখে চলছিল। বীরেশ্বর রায়ের পাঠানো বজরা এল, লোক এল চিঠি নিয়ে, কমলাকান্ত চিঠির উত্তরে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে চিঠি লিখে বজরা ফিরিয়ে দিলেন। গোপাল উৎসাহিত হয়ে উঠল। তার কাজ ফতে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অতি উৎসাহে হঠাৎ একটা কথায় ঘটনার স্রোত ফিরে গেল। অতি চাতুর্যের সঙ্গে সে একই নিশ্বাসে কখনও জন রবিনসন এবং দে-সরকারদের সঙ্গে ঝগড়ায় কমলাকান্তকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে বসেছিল।—

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—

"গোপাল সিং লোকটি দুর্দান্ত সাহসী লোক। তাহার অসাধ্য কর্ম নাই। সে আমাকে ধর্মঘটে এবং রবিনসন সাহেবের সঙ্গে বিরোধে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলিল—আপনি বলেন বাবা-সাহেব—ব্রিফ বলেন, মামলা হ'লে টাকা খরচ করবেন—আমি উদের দেখে লিই। গোপাল সিংয়ের দল আছে বাবা, উ দল নিয়ে সে সব পারে। বিশুবাবু ডাকাইতি করত, নীলকুঠী সে অনেক লুটেছে, সো বাবা হামিও পারে। ব্রিফ বলেন—মামলাতে খরচ যোগাইবেন, বাস্, দিব শালা লুচ্চা আংরেজবাচ্চাকে—।

"দন্তের উপর দন্ত স্থাপন করিয়া সে ডান হাতখানা তলোয়ারের মত চালাইয়া দিল। অতঃপর বলিল—টাকা বাবাসাহেবের ছালা ছালা গো! ওই মামা—আপনের মামা কংস মামা আছে গো! হাঁ! উসকে হঠিয়ে দিন, আপনার সম্পত্তির ভাগ আউর টাকা লিয়ে লিন। আপনি তো রাজা গো। দেখবেন তখুন ই সাহেবটো আপনার পাশ টাকা লিয়ে

যাবে আউর বলবে—ঘুট মর্ণিং বাবুসাব, সেলাম বাজাইবে। হাঁ! ইখানে উ সাহেবের জবরদস্তি হামি রুখবে। ই বাত হামি দিলাম। আপনি মামলা করেন আপনার সম্পত্তির ভাগের লিয়ে। ঢেঁরা পিটাইয়ে দিন তামাম তৌজিতে কি বীরেশ্বর রায়কে খাজনা দিবে তো হামি উ উশুল দিবে না। তাহার কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি। সে সত্য কথাই বলিয়াছে। আমার এই অত্যাচারী নৃশংস মাতুলের হাত হইতে অন্ততঃ আমার প্রাপ্য অংশ উদ্ধার করিতে হইবে। ইহা আমার কর্তব্য। ইহা ধর্ম। না করিলে আমি মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারি না। এবং রবিনসন ও দে-সরকারদের অত্যাচার হইতে শ্যামনগরের অধিবাসীদের যদি বাঁচাইতে না পারি, তবেই বা আমি মনুষ্যপদবাচ্য কিসে?"

সুরেশ্বর বললে—এর পরই ঘটনার স্রোত বিচিত্রভাবে ঘুরে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় কমলাকান্তের বাড়ীতে গ্রামের লোকেদের জমায়েৎ হবার কথা। আগের দিন ষষ্ঠীপুজো ছিল। সেই পূর্বকাল থেকে ষষ্ঠীপুজো সর্বাগ্রে হয় ব্রাহ্মণদের। জমিদার ব্রাহ্মণ হলে এবং গ্রামের লোক হ'লে তাঁর পুজো ব্রাহ্মণদের মধ্যে আগে হয়। কিন্তু জমিদার ব্রাহ্মণ না হ'লে তাদের বাড়ীর মেয়েদের অপেক্ষা করতে হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহিণীদের পূজা হ'লে তবে হয় তাঁদের পূজা। দে-সরকার জমিদারী কেনার পর প্রথম বৎসর এ নিয়ে একটা কাণ্ড হয়েছিল; ব্রাহ্মণ-গৃহিণী ও কন্যারা তাঁদের নাকঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা দে-সরকারকে মেনে নিতে হয়েছিল, উপায় ছিল না। এবার সকালবেলাতেই দে-সরকারের গোমস্তা শেখজী রবিনসন সাহেবের পাইক নিয়ে এসে ষষ্ঠীতলা ঘেরাও করে বসেছিল। এবং বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘিরে রেখে দে-সরকার এবং তাঁর আত্মীয়বন্ধু বাড়ীর মেয়েদের পুজো শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অন্য কাউকে পূজা করতে দেয় নি।

কমলাকান্ত পর্যন্ত সেখানে গিয়েছিলেন প্রতিবাদ করতে। সঙ্গে ছিল ঠাকুরদাস এবং ছত্রী গোপাল সিং, আর ছিলেন কয়েকজন মাতব্বর ব্রাহ্মণ।

গোমস্তার সঙ্গে বাদানুবাদ কিছু হয় নি। কুঠীর লাঠিয়ালরা, সাহেবের চাকরেরাই মহড়া নিয়েছিল। তারাই বলেছিল—জমিদারের বাড়ীর পূজা হবে, তবে অন্যের পূজা হবে, তার আগে নয়। সাহেবের হুকুম আছে।

বিনা লাঠির জোরে তাদের হঠবার হুকুম ছিল না। হঠলেও বিপদ ছিল রবিনসন কুঠিয়ালের চাবুকের। কমলাকান্ত ভাবছিলেন, কিন্তু প্রবীণ ব্রাহ্মণেরা সব দিক বিবেচনা করে সরেই এসেছিলেন। সেইদিনই গোপাল সিং যে-বন্ধনে বেঁধেছিল কমলাকান্তকে, অতি উৎসাহে বেমক্কা টান দিয়ে কমলাকান্তকে চমকে দিলে; কমলাকান্তও ক্রুদ্ধ হয়ে টান মেরে বাঁধনটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

কমলাকান্ত বসে প্রতিকারের কথা ভাবছিল। গোটা গ্রামটাই আহত হয়েছে এ-অপমানে। যারাই আসছিল, বসছিল, তাদের সকলেরই ছিল এক কথা। জমিদার মাথার উপর পা দিচ্ছে, ধর্ম-সমাজ পর্যন্ত মানছে না।

তারই ভিতর থেকে কখন যে দে-সরকারদের কুৎসা আরম্ভ হয়েছিল কেউ বুঝতে পারে নি। গোপাল তার মধ্যে ফোড়ন দিয়ে যাচ্ছিল, তার ফোড়নের উপকরণের সবটুকুই জমিদারের

অত্যাচারের নামে বীরেশ্বর রায়ের কুৎসা।

দে-সরকারদের নিন্দা, তাদের অধর্ম-আচরণ, কৃপণতা, ছোট নজর থেকে দে-সরকারের ট্যারা-চোখে এসে উপস্থিত হল। তারপর তার পুত্রের গণ্ডমূর্খত্বের কথা। তার থেকে এল দে-সরকার-গৃহিণীর নাকের নথে ; এরই মধ্যে কে বললে—সরকারের কন্থেটার ঢঙ দেখেছ! স্বামী ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার জন্যে কোন দুঃখ আছে, খেদ আছে!

একজন বললে—ওরা তো বলে, মেয়ের ছেলে হ'ল না বলে জামাই বিয়ে করেছে, তাই দে-সরকার কন্থেকে বাড়ী এনে রেখেছে ; বলেছে—মেয়ে আমার সতীন নিয়ে ঘর করবে না। কিন্তু আসল ব্যাপার তাড়িয়ে দিয়েছে। সে নাকি সাতখানা কাণ্ড।

কমলাকান্ত বলেছিলেন—থাক না ওসব কথা। ও নিয়ে আমাদের দরকার কি?

গোপাল বলে উঠেছিল—দরকার আছে বাবাসাহেব। আদালতে সরকারকে হাজির করতে পারলে ওই তো বরম্ বাণ। হামাদের উকিল জেরা করবে কি—তুমার বেটী ঘরে আছে কেনো সরকারবাবু? অঁা? সরকার জরুর বলবে কি—বেটী হামার সতীন লিয়ে ঘর করবে না, তাই হিঁয়া থাকে। উকিল দিবে এক ধমক—ঝুট বাত্! ফলানা আদমীর সাথ আপনের বেটীর লটঘট হোয় নাই? সব গোলমাল হইয়ে যাবে সরকারবাবুর। হাঁ। উ সব বিলকুল খবর যোগাড় করো বাবা।

সকলে হেসে উঠেছিল। কমলাকান্ত তিক্ত হয়েও কথাটা ভেবে দেখছিলেন।

গোপাল নিজের কথার জের টেনে বলে চলেছিল—হামি বাবা একদফে বীরেশ্বর রায়কে হাজির করাইয়ে ই জেরা তো জরুর করাই কি, রায়বাবু আদমী লোক বোলে কি আপনে রাণীসাহেবা ভাগ গিয়েছে, কিসকে সাথ গিয়েছে আউর কাঁহা গিয়েছে? অ্যাঁ?

মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়ে গিয়েছিল। কমলাকান্ত চমকে উঠেছিলেন, অসহ্য মর্মযন্ত্রণায় ; কথা কটা যেন তাঁর বুকের ভিতরে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। মনে হ'ল গোপাল চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত আংরা ধরে তাঁর বুকের ভিতরে টিপে ধরেছে।

—এ্যা-ও! বলে একটা বুকফাটানো হুঙ্কার আপনি তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এবং লাফ দিয়ে উঠে তিনি গোপালের গালে মেরেছিলেন প্রচণ্ড একটা চড়।

গোপাল চমকে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা মজলিস। প্রথমটা কেউ বুঝতেও পারে নি এর মধ্যে হল কি? গোপাল হতভম্ব হয়ে কমলাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কমলাকান্ত বলেছিলেন—মুখ ভেঙে দেব তোমার। জিভটা ছিঁড়ে নেব!

এরপর যা হবার তাই ঘটল। কথা দু-চারটে আরও হয়েছিল, কিন্তু সে থাক। গোপাল নিজের পাগড়িটা—যেটা কমলাকান্তের চড় মারার ঝটকায় পড়ে গিয়েছিল, কুড়িয়ে নিয়ে নীরবে হনহন করে চলে গিয়েছিল।

সেইদিনই আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেটা সন্ধ্যের সময়। কমলাকান্তের বাড়ীর দাওয়ায় গ্রামের মজলিশ বসেছিল। আলোচনা ওই আলোচনা। কমলাকান্ত হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখার্জিকে পত্র লিখেছে—রবিনসনের অত্যাচারের কথা জানিয়েছে, তাই পড়ে শোনাচ্ছিল, এমন সময় জন তিন-চার চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে ছুটে এসে বললে—দে-সরকারের পালকি

যাচ্ছে। তার ছেলে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ী। ষষ্ঠীতে যায় নি, আজ যাচ্ছে।

সমস্ত আসরটা মুহূর্তে একাগ্র এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পালকি হাঁকিয়ে সদম্ভে চলে যাবে ?

কমলাকান্ত বলেছিলেন—ক'জন চাপরাসী আছে রে ?

—পাঁচজন-ছ'জন হবে।

—আর বেহারা আটজন নিয়ে তের-চৌদ্দজন।

চট করে ঠাকুরদাস উঠে এসে বলেছিল—তা থাক। তুমি হুকুম দাও, আমি ওর ছেলেকে পায়ে হাঁটিয়ে এখানে এনে দি !

—মারামারি করবি না ?

—না-না-না। তিনসত্যি করছি। তুমি শুধু হুকুম দাও। দেখ না কি করি আমি !

—কোন অভদ্রতা করবি নে, শুধু পালকি থেকে নামিয়ে আনবি ! দাঙ্গা করবি নে, সে হবে কি করে ?

—দেখ না ! গাঙের ঘাটের পাশের জঙ্গল থেকে বড়মেয়ার দুটি হাঁক ছাড়ব শুধু। বলেই সে ক'জন সাকরেদকে ইসারা দিয়ে ছুটে চলে গেল। পিছনে পিছনে জন-পনেরো সাকরেদ। ছুটে বেরিয়ে গেল। গোটা মজলিসটা মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি কমলাকান্তের সম্পর্কে দাদামশাই—বয়সে ষাট পার হয়েছেন—তিনি পর্যন্ত খি-খি শব্দে হেসে বলেছিলেন—তাহলে জলদি যা, জলদি ! দেখ তো কেউ পালকি কত দূরে ?

কমলাকান্ত ঠিক বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করেছিল—কি বলুন তো ?

—দেখ না নাতি, দেখ না ! ঠাকুরদাস অনেক রকম পারে হে। দেখ না !

ইতিমধ্যেই দূরে পালকির বেহারাদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে আলোর ছটা বাড়ল, মশাল হাতে মশালচীর পিছনে দে-সরকারের ছেলের পালকি। সামনে পিছনে তিনজন-চারজন লাঠিধারী বরকন্দাজ। মাথায় লাল শালুর পাগড়ি। মজলিসটা স্তব্ধ হয়ে গেল। কমলাকান্তের মনে লেগেছিল। তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"আমি কীর্তিহাটের রায় এস্টেটের মালিক, আমার তুলনায় এই ব্যক্তিটা একটা ক্ষুদ্র ব্যক্তি। সে এইভাবে লোকলস্করসহ পালকি চাপিয়া চলিয়া গেল, আমি আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম। এবং মনে হইল, ইহার জন্য দায়ী বীরেশ্বর রায়, আমার মাতুল। এমন হিংসা, এমন জটিল চরিত্রবিশিষ্ট মনুষ্য আমি দেখি নাই। আমাকে আমার অধিকার উদ্ধার করিতেই হইবে। এবং এই শ্যামনগর-রাধানগর-যুগলপুর লাট খরিদ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।"

তখন আসরে চলেছে দে-সরকারদের ভবিষ্যৎ ভবিতব্যের কথা। প্রবীণতম ভট্টাচার্য বলছেন—অতি দানে বলি বদ্ধঃ, অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি দর্পে হত লঙ্কা, সর্বমত্যন্তম-গর্হিতম। এই কায়স্থ কুলকজ্জলের তাই হয়েছে। একসঙ্গে অতিমান এবং অতিদর্প। এ সহ্য হবে না !

আঘাত তাঁদেরও লেগেছিল।

—সম্মুখে দেবস্থান, ব্রাহ্মণদের মজলিস চলছে, একেবারে একটা সম্ভাষণ না করে চলে

গেল! পালকি থেকে না নামিস, মুখ বাড়িয়ে দেবতাকে প্রণামটা তো করলে পারতিস!

হঠাৎ একটা প্রবল কোন জান্তব গর্জনে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল, দু-চারজন চমকেও উঠেছিল। পরক্ষণেই হেসেছিল সকলে। কমলাকান্তও চমকে উঠেছিলেন।

—কি? বাঘ?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হুঙ্কার। ওদিকে কতকগুলো লোকের চিৎকার শোনা গেল।—বাঘ-বাঘ-বাঘ! সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রান্তেই বাঘ-তাড়ানো টিন বেজে উঠল।

বাঘ? এখানে বাঘ আছে। চিতাবাঘ। মধ্যে মধ্যে দু-একটা গেলেদা বাঘও এসে পড়ে, একথা রত্নেশ্বর শুনেছেন।

বুড়ো ভটচাজ হেসে উঠে বলেছিলেন—সাবাস, সাবাস, সাবাস! কমলাকান্তের এবার মনে হল ঠাকুরদাস উঠে যাবার সময় বলে গেছে, 'বড়মেয়ার' দুটি ডাক! তবে কি! তিনি বললেন—ঠাকুরদাস?

—হ্যাঁ। ফুটো হাঁড়ি-মালসায় মুখ ভরে অবিকল ডাকতে পারে। তবে আজকের ডাক মোক্ষম!

ঠিক সেই মুহূর্তে পালকিবেহারা চাপরাসী মশালচী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে মজলিসের মানুষগুলি দেখে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

বৃদ্ধ ভটচাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল?

একজন সভয়ে বললে—বাঘ! ডোরা বাঘ, একবারে ঘাটের মুখে জঙ্গল থেকে হাঁকড়ে উঠল মাশায়, জঙ্গল একেবারে ঝড়ে নড়ার মত নড়ে উঠল!

—বস বস বাবাসকল বস। একটু করে জল খাও। লাঠিগুলি রাখ। বাবু কোথায়?

একজন চাপরাসী বললে—বাবু ওই পালকির মধ্যে। কি হবে?

—হবে, বস। হচ্ছে।

ঠিক ঐই সময়েই দূরে ঠাকুরদাসের গলা পাওয়া গেল। সে হেঁকে বলছিল—দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!

বলতে বলতেই দে-সরকারের ছেলেকে একরকম জড়িয়ে ধরে নিয়ে এসে হাজির হল। বললে—ওঃ, এ্যাই বড় বাঘ, একটু হলেই ঝাঁপ দিত। বাপ, হাঁকাড় কি? আমরা ওখানে ছিলাম। তা বেয়ারা-বরকন্দাজরা পালকি ফেলে চলে এল, বাবুমাশায় দেখি পালকির মধ্যে প্রায় বেহুঁস। বড়া খারাপি হয়ে গিয়েছে। কোন রকমে ওনাকে এই নিয়ে আসছি। ছোঁড়াগুলান হৈ-হৈ করে বাঘের পেছোনে টিন বাজাচ্ছে। এই লেন। বসেন বাবুমাশায়, বসেন। এক ঘটি জল দেন।

দে-সরকারের ছেলের পোশাক-পরিচ্ছদ ধুলোয় নষ্ট হয়েছে। ঠাকুরদাস তাকে পালকি থেকে বের করবার সময় সুকৌশলে মাটিতে একটা আছাড়ও খাইয়েছিল।

প্রবীণতম ভট্টাচার্য বলেছিলেন—বস বাবা, না তার আগে ঘরে দেবতা রয়েছেন প্রণাম কর; ব্রাহ্মণেরা রয়েছেন, পায়ের ধুলো নাও। এ হল বাবা দেবতা ব্রাহ্মণকে অবহেলা উপেক্ষার ফল। কলিকাল হলেও এক পাদ ধর্ম তো এখনও আছে! এমন করে দেবতা

ব্রাহ্মণকে তুম কোন হ্যায় বলে চলে গেলে এমনি করেই হুঙ্কার দেয়। বাঘে দেয়, ভালুকে দেয়! কখনও কখনও বিনা মেঘে বাজও হাঁকড়ে ওঠে বাবা!

সুলতা হেসেছিল এবার। বলেছিল—সেকালের রসজ্ঞান তো বিচিত্র!

—সেকালটাই বিচিত্র ছিল সুলতা। সুরেশ্বর হাসলে। তবে একালেই কি আমরা কম যাই! কলকাতার একটা ইলেকশনে দেখেছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের বাড়ীর সামনে একদল সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম করে বলছিল—অমুকচন্দ্র অমুক। আর দল সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁড়ি হাতে নিয়ে ভুম করে ভেঙে দিচ্ছিল। অর্থাৎ নাম করলে হাঁড়ি ফাটে।

সুলতা হেসে বললে—জানি।

সুরেশ্বর বললে—ও কথা থাক। এখন শুনে যাও যা ঘটল। এই রসিকতার মাশুল কি দিতে হল, তাই বলি।

—দে-সরকারের ছেলে একটু স্থূলকায় কিন্তু জমিদার কায়স্থের ছেলে, তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দেবতাকে এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে বলেছিলেন—আমি যাই এবার। এ উপকার মনে থাকবে আমার।

বেয়ারারা পালকিখানা আনতে গিয়ে সেটাকে পায় নি। সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে পথের উপর পড়েছিল। ঠাকুরদাস বলেছিল, তাহলে বাঘটা বোধ হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দিয়েছে।

এর পর বিনা বাক্যব্যয়ে পায়ে হেঁটে দে-সরকারের ছেলে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল।

কমলাকান্ত সারাক্ষণ চুপ করেই বসেছিলেন। বিদায়ের সময় শুধু বলেছিলেন—আপনার বাবাকে বলবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার পিতা শ্রীবিমলাকান্ত তাঁর মহলে একটা জোত রাখেন বটে, কিন্তু আমি এখনও প্রজা নই আপনাদের। আমি কীর্তিহাটের আট আনা অংশের মালিক। আমিও জমিদার। বলবেন।

দে-সরকারের ছেলে চলে গিয়েছিলেন।

তার দশ দিন পর, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শ্যামনগরে আগুন লাগল। শ্যামনগরে তখন জোট বেশ জমাট বেঁধেছে। সকলে সাবধানে চলাফেরা করে। গ্রামের মোড়ে মোড়ে পাহারা দেয়। দেখে জমিদারের বা রবিনসনের লোক আসছে কিনা। দু দিন পর অবশ্য দে-সরকারের ছেলে অনেক বরকন্দাজ সঙ্গে করে পালকি হাঁকিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছে। সেদিন রাস্তার ধারে কেউ ছিল না। কিন্তু কোথায় কোন অন্তরাল থেকে ক্যানেস্তারা বাদ্য হয়েছিল। এই পর্যন্ত।

হঠাৎ দশ দিন পর তৃতীয় প্রহর রাত্রে যখন সব মানুষ একটা শেষরাত্রের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন গ্রামে আগুন লাগল। সে আগুন একটা পরিকল্পনা করে লাগানো আগুন। যাকে আগুনের বেড়াজাল বলে তাই।

প্রায় সব কটি ঘরে একসঙ্গে আগুন লাগল। যেন কেউ কারু সাহায্যে যেতে না পারে। এবং কমলাকান্তের কোঠাঘরে চার কোণে আগুন লাগল। এবং ঘরের দরজায় শিকল তুলে তালা দিয়েছিল একটা। কমলাকান্তের কাছে ঠাকুরদাস শুয়ে থাকত। ঠাকুরদাস কোঠাঘরের জানলা ভেঙে বের হবার পথ করেছিল। তখন মাথার উপরের চাল পুড়ে খসে পড়েছে ভিতরে। কমলাকান্ত উপুড় হয়ে পড়ে গেছেন। পিঠ তাঁর ঝলসে গেছে। ঠাকুরদাসই তাঁকে কোন

রকমে টেনে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল নিচে। ওদিকে তখন ঠাকুরদাস পালের বাড়ীতে তার স্ত্রী-পুত্র সকলে পোড়া চালের তলায় চাপা পড়েছে। তার বাড়ীতেও ঠিক তালা শিকল লাগিয়ে চার কোণে আগুন লাগানো হয়েছিল।

আগুন লাগিয়েছিল গোপাল সিং। হুকুম ছিল রবিনসনের।

গোপাল সিং কমলাকান্তের কাছে চড় খেয়ে তা হজম করে নি। সে গোপাল সিং, তা সে করে না। সে শ্যামনগর থেকে চলে আসতে আসতে ফিরে গিয়েছিল কমলাকান্তের শত্রু রবিনসন এবং দে-সরকারের কাছে। রবিনসন নিতান্ত ইতর ইংরেজ হলেও ইংরেজ, সে যা করবার নিজে সোজাসুজি করতে চেয়েছিল। কিন্তু চতুর দে-সরকার গোপাল সিংকে দেখিয়ে বলেছিল—গোপালকে ভার দাও সাহেব। তার থেকে জবরদস্ত লোক তোমার নেই। আর গোপালও তো তোমার কুঠীর কাজে ভর্তি হচ্ছে। দাও, ওকেই ভারটা দাও।

গোপালের দম্ভ স্ফীত হয়ে উঠেছিল এবং ধূমায়িত আক্রোশটাও বাতাস পেয়ে উঠেছিল জ্বলে। সে নিজে হাতে শোধ নেবে। সে বলেছিল—চুপ করে থাকেন সাহেব, ক'টা দিন চুপ করে থাকেন। আমি আমার সাকরেদদের নিয়ে আসি। দোহাই আপনের, কুচ্ছু করবেন না। আমি লাল ঘোড়ার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে দিব। আপনা কুটীকে বারেন্দেমে কুর্সী পর বইঠিয়ে আরামসে, দেখবেন লাল ঘোড়াকে ঘোড়দৌড়।

গোপাল হেঁকে বলেও গেছে। হামার নাম গোপাল সিং!

* * *

সওয়ার খবর নিয়ে ফিরে এল।

বীরেশ্বর সংবাদটা শুনে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বেঁচে আছে? তুম আপনা আঁখ সে দেখা?

—নেঁহি হুজুর। মুলাকাত আমার সঙ্গ হয় নি। চিঠিও ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বীরেশ্বর রায় অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে চেতনা হয়েছিল। কিন্তু চোখ লাল, দৃষ্টি বিহ্বল। তার সঙ্গে বিকারের মত প্রলাপ।

মেদিনীপুর থেকে ইংরেজ ডাক্তারসাহেব এসেছিল। ডাক্তারসাহেব বলেছিল—ব্রেন কন্‌জেশন হয়েছে। যারা মদ খায়, তাদের হয়। আবার কোন মানসিক আঘাত থেকেও হয়। মনে হচ্ছে অবস্থা খারাপ। গিরীন্দ্র আচার্য মহল থেকে ফিরে এসেছেন খবর পেয়ে। তিনি এসেই সাহেব ডাক্তার আনিয়েছেন।

সাহেব ডাক্তারের কথা শুনে পরামর্শ করে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন, গিরীন্দ্র আচার্য লোক পাঠালেন কমলাকান্তের কাছে। মাতুলের অবস্থা তাঁকে জানানো আবশ্যক। সেও অসুস্থ। তবু যেমন করে হোক তাঁর আসা আবশ্যক। বজরা তাঁরা পাঠান নি সাহস করে।

পাঁচ দিনের দিন একখানা ছিপ এসে লেগেছিল কাঁসাই-এর ঘাটে। নৌকা থেকে নেমে এসেছিলেন মহেশচন্দ্র এবং ভবানী।

লোকে প্রথমটা চিনতে পারে নি।

পারবে কেন? সাধারণ লোকে রায়বাড়ীর বধূ ভবানী দেবীকে দেখে নি। সেটা পর্দার যুগ।

সুলতা, প্রৌঢ়া রাণী কাত্যায়নীকে একটা চৌদ্দ বছরের ডোমেদের ছেলে অবাক-বিস্ময়ে গাছের উপর থেকে দেখছিল বলে তার কি শাস্তি হয়েছিল বলেছি। সেই যুগ। তার উপর বধূ ভবানী দেবীকে তারা জানত রাজরাণী, এবং তাঁকে না দেখলেও তাঁর রাজরাণীর উপযুক্ত বসন-ভূষণের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। এ মেয়ে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের। ভূষণের মধ্যে হাতে দু গাছি শঙ্খ ছাড়া কোন ভূষণ ছিল না; আর পরনে একখানি লালপেড়ে শাড়ী। তবে রুখু চুলের রাশি এবং চোখের দৃষ্টিতে তারা বিস্মিত হয়েছিল। চিনতে পারে নি।

ভবানী দেবী এসে ঢুকেছিলেন কালীবাড়ীতে।

লোকজন তখন ব্যস্ত। বাবুর অসুখ। একটা চাপা আশঙ্কা সকলের বুকে এবং চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। লোকজন অনেক তবু গুঞ্জনের কলরবও ছিল না।

ভবানী দেবী নাটমন্দিরে প্রথম প্রণাম সেরে, নাটমন্দির থেকে মায়ের মন্দিরের বারান্দায় উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গড়িয়ে পড়েছিলেন। একেবারে নিস্তব্ধ নিথর হয়ে পড়েছিলেন কিছুক্ষণ।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন ছিলেন তখন রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে। মায়ের মন্দির খোলাই ছিল; দর্শনার্থীর জন্য খোলা রাখার নিয়ম ছিল। পরিচারক ঘুরছিল এদিক-ওদিক, সে ভোগের যোগাড়-যন্ত্র করছিল। সে হাতে একটা বড় গাড়ু নিয়ে গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে চলেছিল ভোগশালা থেকে মন্দির পর্যন্ত। এই পথে মায়ের ভোগ আসবে। নাটমন্দির থেকে লোকজনেরা সরে যাচ্ছিল, ভোগে দৃষ্টি পড়বে তাদের। সে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল ওই বারান্দায় লুটিয়ে পড়া মেয়েটিকে দেখে।

—কে গো? ও গো, কে গো, তুমি বাছা? ওঠো ওঠো। মায়ের ভোগ হবে, ভোগ আসবে ওঠো।

উত্তর দেন নি ভবানী দেবী, নিস্পন্দ হয়ে পড়েই ছিলেন। পরিচারক আবার ডেকেছিল, ও গো মেয়ে! আরে এ যে নড়ে না! কি বিপদ?

নাটমন্দিরে একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। তিনি বোধ করি নিদারুণ সংশয়ের মধ্যে মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, কি হবে, কি ঘটবে এর পর! এবার তিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পরিচারককে বলেছিলেন—ওঁকে ডেকো না বাবা, ওঁর হ'লে উনি আপনি উঠবেন।

মহেশচন্দ্র সে আমলের শহরবাসী ইংরিজী-জানা মানুষ। লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁর কথায় পরিচারক একটু দমে গিয়ে বলেছিল—মায়ের যে ভোগের সময় হল।

—তা হোক। মা তো! একটু না-হয় দেরিই হবে সন্তানের জন্য!

কথাটা শুনে পরিচারক হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে কি করবে বুঝতে না পেরে গাড়ুটা হাতে ধরে দাঁড়িয়েই ছিল। ঠিক এই সময় রাজরাজেশ্বরের মন্দির থেকে ন্যায়রত্নমশাই মায়ের

মন্দিরে এসে পড়েছিলেন। রাজরাজেশ্বরের চত্বরের দরজা পার হয়েই তিনি মহেশচন্দ্রের কথাগুলি শুনতে পেয়েছিলেন। পরিচারকের কথাও—শেষ কথা—শুনেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন সে একটু বিব্রত।

—মায়ের যে ভোগের সময় হল।

উত্তরে শুনলেন—তা হোক। মা তো! একটু না হয় দেরিই হবে সন্তানের জন্য!

ভাল লাগল। কিন্তু হল কি? তিনি পরিচারককে ডেকে বললেন, কি হল হরিচরণ?

—আজ্ঞে, একটি মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মায়ের দরজার সামনে। ডাকলে সাড়া নেই। উঠতে বলছি, তা উনি বলছেন—

ন্যায়রত্ন ততক্ষণে এসে পড়েছেন সামনে। দেখলেন সাষ্টাঙ্গে প্রণতা ভবানী উপুড় হয়ে পড়ে আছে, পিঠের উপর রাশীকৃত রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে; নিথর নিস্তব্ধ। একটি প্রগাঢ় আত্মনিবেদন যেন ধ্যানে সমাহিত হয়ে গেছে। তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

—কোন মানসিকের জন্য এসেছেন বুঝি? তিনি এবার ফিরে তাকালেন মহেশচন্দ্রের দিকে। তিনি চমকে উঠলেন, যেন চেনা মুখ। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তাঁর বিস্ময় অপরিসীম হয়ে উঠেছিল। দু-পা এগিয়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—মহাশয়ের নাম?

—নাম? মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বলে আঙুল দেখিয়ে ভবানীকে দেখিয়ে বললেন—খবরটা পেয়ে আর থাকতে পারলে না, ছুটে এসেছে।

ফিরে ভবানীর দিকে তাকালেন ন্যায়রত্ন।

মহেশচন্দ্র বললেন—বারো বছর ব্রহ্মচারিণীর ব্রত নিয়েছে, এই আর এক পক্ষ বাকী। তবু এল। পারলে না থাকতে!

ন্যায়রত্ন বোধ হয় সোরগোল তুলতেন। মহেশচন্দ্র বারণ করে বললেন—না। সোরগোল তুলবেন না। সে খুব খারাপ হবে!

ন্যায়রত্ন এবার এগিয়ে গিয়ে ভবানী দেবীর মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন—মা!

ভবানী দেবীর সাড়া ছিল না। তিনি ওখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তিনি পরিচারকের হাতের গাড়ুটা নিয়ে গঙ্গাজল ঢেলে মাথায় ছপছপ করে ঝাপটা দিয়েছিলেন। আর ডেকেছিলেন—মা-মা-মা!

সোরগোল উঠেই গেল আপনা থেকে। গিরীন্দ্র আচার্য ছিলেন বাড়ীর মধ্যে, বীরেশ্বর রায়ের শোবার ঘরের বারান্দায়। মেদিনীপুরের একজন দেশী ডাক্তার রয়েছেন। ঘরের মধ্যে। বীরেশ্বরের খাস চাকর জলধর বসে আছে মাথার শিয়রে। মাথা কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলপটি চলছে অহরহ। একজন চাকর বাতাস দিচ্ছে। রায়বাড়ীর কবিরাজমশাই বসে আছেন, আচার্যের পাশে। নাড়ী দেখছেন তিনি। সারা অন্দরে এক পায়রার ডাক ছাড়া কোন ডাক শোনা যায় না। নিষেধ আছে জোরে কথা বলতে। কথাবার্তা ফিসফিস করে; অথবা অতি মৃদুস্বরে চলছে, তাও দুটো-চারটে। পুকুরের ধারে জলের উপর ঝুঁকে-পড়া কুলগাছ থেকে পাকা কুল মধ্যে মধ্যে ঝরে পড়ার সঙ্গেই তার তুলনা হয়। মধ্যে মধ্যে একটি দুটি টুপ-

টুপ শব্দ।

এরই মধ্যে গিরীন্দ্র আচার্য কালীবাড়ীর সোরগোলের সাড়া পেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন—কি হ'ল?

ঠিক এই সময়েই উঠল শাঁখের শব্দ। তিনি দ্রুতপদে নেমে এলেন। ভেবেছিলেন কমলাকান্ত এসেছেন।

তিনি নিচে নাটমন্দিরে এসে দেখলেন, সমস্ত সেরেস্তাখানা, চাকর-বাকর, লোক-লস্কর সব ভিড় করে চারিপাশে দাঁড়িয়ে গেছে। সব স্তব্ধ, শুধু একটা ঠেলাঠেলি চলছে। মধ্যে মধ্যে দারোয়ানেরা হেঁকে সাড়া তুলছে। খবরদার! খবরদার! খবরদার!

ভিড় ঠেলে তিনি জিজ্ঞাসা করতে করতেই এলেন—কি? কি? ব্যাপার কি?

একটি কথা—রাণীমা!

—রাণীমা? রাণীমা কে?

—আজ্ঞে রাণীমা! সতীরাণী বউ!

—সতীরাণী বউ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বুকের ভিতরটা ধক-ধক করতে শুরু করেছিল আচার্যের। আশঙ্কা না আনন্দ তিনি বুঝতে পারেন নি। বারো বছরেরও বেশী—তের বছর পূর্ণ হবে এই বর্ষায়। এতকাল পর? তবে এটা তিনি জানতেন, বীরেশ্বর রায় আজও তাঁর সন্ধান করেন। এত বড় এস্টেটের দেওয়ান, এস্টেটের খুঁটিনাটি, জমিদারীর জোত-জমাই শুধু তাঁর নখদর্পণে নয়, খোদ মালিকের প্রতিটি কর্মের সংবাদ তিনি রাখেন। পা ফেললে আওয়াজ শুনে বলতে পারেন, মালিক কোন্ মেজাজে কি বলতে আসছেন।

সেদিন ছেদী ফিরে আসবামাত্র বীরেশ্বর রায় চঞ্চল হয়ে উঠে বিষয়কর্ম সমস্ত ঠেলে ফেলে তাঁদের একটি কথায় বিদায় দিয়ে, ছেদীকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে পাহারা রেখে ঘরে ঢুকে-ছিলেন। একটি প্রহর দরজা খোলেন নি। তারপর যখন বের হলেন, তখন যেন অন্য মানুষ। সেইদিনই তিনি কমলাকান্তকে পরম সমাদরে যেন আর্ত হয়ে আসতে বলে চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে একটা রহস্যের আভাস তিনি পেয়েছিলেন।

একটা কৈফিয়ৎ অবশ্য মিলেছিল ন্যায়রত্নের কাছে। তিনি সোমেশ্বর রায়ের পাপের কথা, শ্যামাকান্তের কাছে তাঁর অপরাধের কথা চিঠি লিখে বীরেশ্বরকে জানিয়েছেন, একথা ন্যায়রত্ন তাঁকে বলেছিলেন; এবং বলেছিলেন, বীরেশ্বরের মন সম্ভবতঃ এই কারণেই পাল্টেছে। কমলা-কান্ত শ্যামাকান্তের পৌত্র। প্রায়শ্চিত্ত করবার সুমতি সেই কারণেই।

তবু এই বিষয়ী মানুষটির মন এতে সন্তুষ্ট হয় নি। তিনি ছেদীকে ডেকে কথাবার্তার মধ্যে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করেছেন। ছেদী বুদ্ধি তাঁর থেকে বেশী ধরে না। তবু বিশেষ কিছু জানতে পারেন নি। তবে আভাস একটা পেয়েছেন।

কাশীতে বিমলাকান্ত আবার বিবাহ করেছে তা জেনেছেন। আর পেয়েছেন এক সতীমায়ের খবর। ছেদী বলেছে—তিনি সাকসাৎ দেবী। তপস্যা করেন। এই সতীমাঈজীই

বিবাহ দিয়েছেন বিমলাকান্তের। কমলাকান্তকেও তিনি খুব কৃপা করেন। বাবুজী, বেটার মাফিক। এমন কি সতীমাঈ তীরথ করতে এসেছেন, যাবেন গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, এসেছেন বিমলাকান্তের সঙ্গে। কিন্তু সতীমাঈ যে কে তা তিনি প্রশ্ন করেন নি। কাশীধাম তপস্যার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। এই কলিতে ঈশ্বরসন্ধানী তপস্বী-তপস্বিনীদের আশ্রয় ভূমি। সুতরাং কাশীতে সতীমাঈর আবির্ভাব তাঁর বিষয়ী মনের উপরেও এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলে নি। এমন কি রায়বাড়ীর ভেসে-যাওয়া সতীরাণী বউয়ের সঙ্গে কাশীর সতীমাঈজীর নামের মিল সত্ত্বেও এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, তাও তাঁর মনে হয় নি। এই মুহূর্তেও তা তাঁর মনে হচ্ছিল না। তিনি নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়েই এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন। ভিড় থেকে বেরিয়েই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, একটি মেয়ে মন্দিরের দরজার সামনে নতজানু হয়ে বসে আছেন, দরজায় দাঁড়িয়ে রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন তাঁর হাতে মায়ের নির্মাল্য দিচ্ছেন। পরিচারক তখনও হাতে শাঁখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে ধরে তার পাশে বসে আছেন একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ। তার মুখের এক দিকটা দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনে হল—দেখা মুখ, এবং মুহূর্তেই বুঝলেন ভবানী দেবীর পালক-পিতা, মহেশচন্দ্র। গিরীন্দ্র আচার্য এসে মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন।

ন্যায়রত্ন নির্মাল্য মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন—চিরায়ুষ্মতী ভব।

প্রণাম করলেন ভবানী দেবী। ন্যায়রত্ন গিরীন্দ্র আচার্যকে দেখতে পেলেন এবার, এবং বেশ দীপ্তমুখে বললেন—আর ভয় নেই আচার্যমশায়। বারো বৎসর তপস্যা করে রায়বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী ফিরেছেন। মা প্রসন্ন। বীরেশ্বর অচিরে সুস্থ হবেন।

ভবানী দেবী প্রণাম করে উঠে ফিরে তাকালেন; গিরীন্দ্র আচার্যের নাম শুনেই তাকালেন। এবং উঠবার চেষ্টা করলেন।

আচার্য তাঁর মুখের দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছিলেন; শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, রুক্ষ চুলের রাশি সে মুখখানিকে ঘিরে আশ্চর্য রূপ এবং মহিমা দিয়েছে। ঠোঁট দুটি শুষ্ক। কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য উজ্জ্বল। ভবানী দেবী একটু ট্যারা। চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্নাচ্ছন্নতা রয়েছে যেন। অথবা কোন ভাবনায় সে দৃষ্টি সমাহিতের মত মগ্ন। মধ্যে মধ্যে সচেতনতা দেখা দিচ্ছে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে কাটা মেঘের ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত সূর্যালোকের মত। আচার্যকে দেখে দেখে সেই মুহূর্তে তেমনি এক ঝলক সচেতনতার আলো ফুটে উঠেছে। তিনি এতক্ষণে অনবগুণ্ঠিত মাথার উপর কাপড়ের আঁচল টেনে দিলেন।

সামাজিক এবং বিষয়ী মানুষ আচার্যের মনে মুহূর্ত পূর্বেও শত প্রশ্ন একটা ভয়ার্ত জনতার মত একসঙ্গে যেন কোলাহল শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে শান্ত শুধু হল না, লজ্জিত হয়ে তারা লুকিয়ে পড়ল মনের কোণে কোণে। আচার্যের ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল; একটা আবেগ তাঁর বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তিনি বললেন —আসুন মা!

শুধু বৃদ্ধা মাসীমা, রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর এক জ্ঞাতি ভগ্নী যিনি এখন রায়বাড়ীর অন্দরে পোষ্যমহলে কর্তৃত্ব করেন এবং দেবমন্দিরে মেয়েদের কৃত্যগুলি সম্পন্ন করেন এবং করান, তিনি এগিয়ে এসে বললেন—এত দিন পর কি দেখতে এলে মা? একদিন-আধদিন নয়, সাড়ে

বারো বছর পার হয়ে গেল, লোকে জানে, আমরা জানি, তুমি জলে ডুবে মরেছ, সেই তুমি ফিরে এলে আজ কি মনে করে বল দিকি? সম্পত্তি? বলি ও আচার্য।

আচার্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কথা শুনে, নিজের নাম শুনে সচেতন হয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—চুপ করুন আপনি! জিভ আপনার খসে যাবে। কাকে কি বলছেন? জানেন সারা কাশীধাম ওঁকে বলে সতীমাঈ! পথে চলে যান, লোকে পথের ধুলো কুড়িয়ে নেয়! ছেদী—ছেদী কই? ছেদী!

ছেদী অনেকক্ষণ এসে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল লাঠিতে ভর দিয়ে, সে বললে—হুজুর! হামি আপনা আঁখ সে দেখিয়েছি হুজুর, দেওতা, মাঈজী হামার দেওতা আছেন! হুজুর, হামার বাবুজী মাঈজীর পতা করতে কাশী পাঠাইয়েছিলেন। উনকে চিট্টি হামি হামারা হুজুরকে উ রোজ হাতে দিলম, বিলকুল সব বললম। বাবুজীর আঁখ সে আঁশু নিকাল গৈলি হল!

ভবানী দেবী মৃদুস্বরে বললেন—ছেদী! চুপ কর তুমি। খুড়োমশায় আপনি বলুন, আমাকে পথ দিতে। আমি ভিতরে যাব।

তারপর তিনি মাসীমাকে বললেন—অপরাধ আমার হয়েছে মাসী। কিন্তু উনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তিনি আমাকে আসতে লিখেছেন। তাঁর হুকুমেই আমি এসেছি।

আচার্যের দিকে একখানা চিঠি তুলে ধরে বললেন—এই পড়ে শোনান, ওঁরা যদি শুনতে চান। উনি কমলাকান্তকে লিখেছিলেন। তার মধ্যেই আছে! শেষখানার শেষছত্রটা পড়ুন।

আচার্য পড়লেন—"তুমি তোমার ভালো-মাকে বল, আমি তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।"

পড়া শেষ হওয়ামাত্র ভবানী দেবী চলে গেলেন রাজরাজেশ্বর মন্দিরে, সেখানে প্রণাম করে এসে অন্দরের মুখে দাঁড়ালেন, বললেন—আমাকে পথ দিন। বললেন মাসীমাকে, কিন্তু সকলে দু পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিলেন।

পরিচারক আবার শাঁখ বাজালে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে কেউ একজন হুলুধ্বনি দিয়ে উঠেছিল, একজন শুরু করতেই সব মেয়েরাই দিয়েছিল। উলু-উলু শব্দে নাটমন্দির হেসে উঠল যেন।

একজন কেউ বলেছিল—করছ কি? সবাই কি থম্ব হয়ে গেল নাকি। জলধারা দিয়ে নিয়ে যাও, জলধারা দাও।

আচার্য বলেছিলেন—ওহে পরিচারক, করছ কি? এস আমার সঙ্গে এস। তিনি ভবানীকে থামতে বলেন নি, তাতে পিছু-ডাকা হবে; একটু ত্বরিতপদে তাঁকে পাশ কাটিয়ে আগে এসে বলেছিল—আমি আগে যাই মা। মহেশবাবু, আপনি আসুন।

সিঁড়ি পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে আচার্য বলেছিলেন—তাঁর দেওয়ানী ভঙ্গীতে—আর নয়। এখান থেকে সব ফিরতে হবে। কেউ না। বরকন্দাজ কোথায়? মহাবীর! সিঁড়ির মুখে খাড়া থাক। কেউ না উপরে যায়। একটি শব্দ না হয়। হাঁ?

—হাঁ হুজুর

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, এ সমস্ত বিবরণ আছে রত্নেশ্বর রায়ের প্রথম ডায়রীখানায়, যে খানার এক পিঠে আছে দৈনন্দিন দিনলিপি, ওই পোষ্যপুত্র হিসেবে বাপ-মায়ের কোলে ফিরে আসার দিন থেকে, আর আর এক পিঠে আছে তাঁর বিগত জীবনের বিবরণ। তারই মধ্যে এই দিনটির সমস্ত ঘটনা তিনি বিশদভাবে লিখেছেন। শুনে লিখেছেন অবশ্য। কারণ তিনি তখনও শ্যামনগরে পিঠের পোড়া ঘা নিয়ে শুয়ে। এবং তখনও তিনি তাঁর আত্মপরিচয় জানেন না।

তাঁর পুড়ে জখম হওয়ার কথা কীর্তিহাটের বরকন্দাজ ফিরে এসে বলেছিল বীরেশ্বর রায়কে, ওদিকে স্ত্রী-পুত্রহারা আহত ঠাকুরদাস কমলাকান্তের ভালো-মাকে খবর দিতে ভুলে যায় নি। শ্যামনগর তখন পুড়ে গেছে। প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে তাদের ধর্মঘটের ঘট মাটির ঘট থেকে পাথরের ঘট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, রাধানগরের কায়স্থদের মধ্যে এই ঘটনায় দে-সরকারদের জ্ঞাতিদের নেতৃত্বে দু ভাগ হয়ে গেছে। যারা এতকাল জ্ঞাতি, স্বজাতি এবং স্বগ্রামবাসী বলে মুখে চুপ করেছিল, তারাও সদলে এসে শ্যামনগরে এসে ব্রাহ্মণ মাতব্বরদের কাছে বলে গেছে যে, তাঁদের সঙ্গেই তারা রইল, আজ থেকে দে-সরকার জ্ঞাতি, স্বজাতি হয়েও আমাদের শত্রু! ঘরে শিকল দিয়ে আগুন লাগিয়ে ব্রহ্মহত্যা! হে ভগবান! ওই ম্লেচ্ছ কঠিয়ালের সংসর্গে এসে পিশাচ হয়ে গেছে লোকটা!

শুধু রাধানগর নয়, এই খবরটা এমন একটা চেহারা নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়েছিল যে, আট-দশখানা গ্রামের মানুষ এসে বলে গিয়েছিল, আমরাও আছি। এসব গ্রামের দু-তিনখানায় জন রবিনসনের নীল অভিযান চলেছিল। বাকী গ্রাম এসেছিল প্রাণের দরদ, দুঃখে।

শ্যামনগর পুড়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য একটা বাহুবলের সৃষ্টি হয়েছিল। ঠাকুরদাস পাল, বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ভটচাজমশায়কে ডেকে বলেছিল, একটি কাজ করতে হবে বাবাঠাকুর; কমলাকান্তদাদার ভালো-মায়ের কাছে আমি যে তিন সত্যি করেছি, ওর অসুক-বিসুক, বিপদ কিছু হলেই আমি তাকে খবর দোব। তা তেনাকে যে একটা খবর দিতে হয়। উনি কাশীর সতীমা, কাশীতে লোকে বলে দেবতা। আমার মহা অপরাধ হবে!

—কোথায় খবর দেব? উনি কোথায় আছেন?

—সে আমাকে বলে গিয়েছেন বাবাঠাকুর। আমাদের জানা থানেই আছেন। আমাদের ঠাকুর মিয়াদের হজরতপুর-গুলমহম্মদ শরীফের ঈশেন কোণে পাগলী কালীমায়ের থান আছে, তিনি সেখানে আছেন। কাশী থেকে স্বপনাদেশ পেয়ে এসেছেন, স্বপন হয়েছে নাকি ওইখেনেই তেনার কি বেরতো আছে, শেষ হবে। বলে গেছেন, বাবাঠাকুর, মিয়াসাহেবের কাছে গেলেই তিনি লোক দিয়ে আমার কাছে পৌছে দেবেন। রাজরোষের উপর দেবরোষ হলে সব্বনাশ হবে বাবাঠাকুর। আমার নরক হবে।

বৃদ্ধ ভটচাজ বলেছিলেন—আজ লোক পাঠাচ্ছি, ভাবিস নে তুই। ওরে আমরাও যে ভাবছি। এ করলাম কি? বিমলাকান্তের একমাত্র পুত্র রে; রূপে কার্তিক, গুণে বৃহস্পতি। তার এ দশা তো আমাদের জন্যে। নইলে সে কীর্তিহাটের জমিদার, বিমলাকান্তের সঙ্গে সাহেবের আলাপ, সে তো তার জমি ছেড়েই দিতে চেয়েছিল। আমাদের জন্তেই মিটমাট করে

নি। ঝগড়া করেছে সাহেবের সঙ্গে। আমরাও যে মাথায় মাথায় ভাবছি—বিমলাকান্তকে এ সংবাদ দেব কি করে ?

তারপর হঠাৎ বলেছিলেন—ওরে তুই যা বলছিস তাতে ওই সতীমাটি দেবতাই বটেন রে। নইলে এই যোগাযোগ হয় ? যোগাযোগটা তো তিনিই করে দিলেন। শুনেছি, বুড়ো ঠাকুর মিয়া আজও বেঁচে আছেন। বয়ঃক্রম পঁচাশী, হয়তো বেঁচে আছেন এই আজকের জন্যে। তিনি ফিরিঙ্গী কোম্পানীকে খাজনা দিতে হবে বলে যুগলপুরের মত লাট ইস্তবা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যাবার দিন আমরা বামুনরা সর্বরক্ষেতলায় পুজো দিয়েছিলাম ঢাক বাজিয়ে। ঠাকুর মিয়া কানে আঙুল দিয়ে নৌকায় চেপে চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছেও একখানা পত্র দেব রে, বলব হজরতের বংশ আপনারা ঠাকুরসাহেব, আপনারা এককালে সিদ্ধযোগী ছিলেন। তা আপনাদের কাছে অপরাধের ফল ফলেছে। আমরা আপনাদের নজরানা, সেলাম আপনাকে জানালাম। আমাদের ক্ষমা করবেন !

সুলতা, এইখানটা পড়ে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। হয়ত এটা সেকালের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, যা বলবে সবই। তবু ভাল লেগেছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসলে সুরেশ্বর।

সুলতার মুখেও একটি করুণ হাসি ফুটে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—যাক। সেইদিনই লোক চলে গিয়েছিল ছোট একখানা ছিপ নিয়ে। ভাটির মুখে যাওয়া। বোধহয় এক দিনেই পৌঁছেছিল। ভালো-মা ফিরেছিলেন, তিনদিনের দিন। একখানা লম্বা ষোল দাঁড়ের ছিপে এসে পৌঁছেছিলেন ; দাঁড়িদের সবাই ছিল গোয়ান। ছিপখানা ঠাকুর মিয়ার নিজের ছিপ।

সুলতা প্রশ্ন করলে—ঠাকুরসাহেব কিছু লেখেন নি ?

—না ! তবে নাকি ভালো-মাকে বলে দিয়েছিলেন, মা, তুমি ভটচাজদের বলিয়ো, কবরের মুখে পা বাড়াইছি। দিল্লীর বাদশাহের শাজাদাদের ফিরিঙ্গীরা শুনেছি নাকি শড়কের উপর ফটকে ফাঁসি লটকাইয়া রেখে দিছে ; কবর দিতে দেয় নাই তিনদিন। এই রসুলপুরের মোহনা দিয়া বাদশাহকে জাহাজে করে রেঙ্গুন পাঠাইয়া আটক রাখছে। শুনে কেঁদেছি। আল্লায়তলা আর রসুলে আল্লা পয়গম্বরের কাছে কইছি—খতম কর জিন্দিগী, পার কর ; কবরে ফরমান পাঠাও। তা আজ ভটচাজের চিঠিখানা পেয়ে মনে হচ্ছে—এই, এই চিঠ্যি দরখাস্ত পাবার তরেই আল্লা আমারে জীবিত রাখছিলেন। বলিয়ো, দিল সাফা করে ছিয়ে খোসলে আমি সব মাফ করে গেলাম।

আর একশো টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন নতুন ঘর করবার জন্যে।

ভবানী দেবী যখন দুদিন পর এসে পৌঁছেছিলেন, তখন কমলাকান্তের ফাঁড়া কেটেছে, ফোস্কাগুলো কিছু বসেছে, কিছু ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা করছে বিষ্ণুপুরের ভাণ্ডারীরা। তখন এদেশে নানান চিকিৎসা ছিল; এ্যালোপাথি তখনও কলকাতা এবং বড় বড় শহর ছাড়া বড়-একটা হয় নি। বৈদ্য ছিলেন বড় বড়। বিচক্ষণ বৈদ্য। তা ছাড়া ছিল নানান স্বপ্নাদ্য ওষুধ। যার পরমায়ু আজও ফুরোয় নি। পেনিসিলিন উঠেছে। ১৯৫৩ সালে

অনেকটা সুলভও হয়েছে, তবু চাঁদসীর, মা মনসার স্বপ্নাদ্য চিকিৎসা বেঁচে আছে। পাঁজির পাতা ওল্টালে আরও অনেক এমন চিকিৎসার বিজ্ঞাপন পাবে। বিষয়পুরের ভাণ্ডারীরা জাতে নাপিত, তাদের কুলধর্ম ক্ষৌরি তারা করত না। ঘা ফোড়ের চিকিৎসা করত। তাদের ওষুধ নাকি অব্যর্থ ওষুধ ছিল। সেই চিকিৎসা চলছে। কমলাকান্ত তিনদিনেই ফাঁড়া কাটিয়েছেন, ঠাকুরদাসের পোড়া তাঁর থেকে বেশী। সে তখনও খুব কাতর!

বীরেশ্বর রায়ের প্রথম চিঠিখানা পুড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় চিঠিখানা ভালো-মা পেয়েছিলেন। সেখানা এসেছিল শ্যামনগর যে রাত্রিতে পোড়ে তার পরদিন। চিঠিখানা পড়ে চমকে উঠেছিলেন তিনি। চিঠিখানা পড়েছি, তোমার মনে আছে, কমলাকান্তের সেই বজ্রের মত পত্রখানা পেয়ে এবং আচার্যের চিঠিতে গোপাল সিংয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগের সংবাদ জেনে তিনি লিখেছিলেন, "তোমার স্পর্ধিত পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম এবং শঙ্কিত হইলাম যে, এবম্বিধ পত্রের জন্য তোমার নরকেও স্থান হইবে না!

চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ওরে, তুই তাঁকে কি লিখেছিলি রে? কমলাকান্ত? কি লিখেছিলি তাঁকে?

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন, "প্রথমে নির্বাক রহিলাম। ভালো-মা সব পত্রখানি পাঠ করিলেন। মধ্যে মধ্যে অংশ বিশেষ পড়িয়া উচ্চ কণ্ঠেই তাহা বলিতেছিলেন, 'তোমার সহিত পত্রালাপ করিয়া আমার মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা হইতেছে।' এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিলেন—'ওরে, তুই কি এমন কথা লিখিয়াছিস রে?' আমি নিরুত্তরই ছিলাম। আবার পড়িলেন "তোমার ভালো-মাকে বলিবে আমি ব্যাকুল হইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

তিনি পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কমলাকান্ত! কি লিখিয়াছিস বল?"

সে কণ্ঠস্বর শুনে কমলাকান্ত—রত্নেশ্বর রায় চমকে উঠেছিলেন। লিখেছেন—"বজ্রের মত কঠোর। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, আমি ভস্ম হইয়া যাইব।"

রত্নেশ্বর বলেছিলেন সব। ভয় পেয়েই বলেছিলেন। ভালো-মা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন। এরই ঘণ্টা দুয়েক পর কীর্তিহাটের সওয়ার এসেছিল গিরীন্দ্র আচার্যের পত্র নিয়ে। বীরেশ্বরের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা! কমলাকান্তের পুড়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন!

তখনও গোরানদের ছিপ ঘাটে বাঁধা ছিল।

সেই ছিপেই তিনি রওনা হয়ে চলে এসেছেন কীর্তিহাট।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেই আছে—ভালো-মা, আমার গর্ভধারিণী, সতীশিরোমণি শ্রীমতী ভবানী দেবী ইষ্টদেবীকে এবং সৌভাগ্যশিলা রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তদীয় পদতলে উপবেশ করিলেন পুরানের সাবিত্রীর মত!

সেইদিনই শেষরাত্রে পিতা বীরেশ্বর রায়ের জ্ঞান হইল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষ। স্বামীর শিয়রে বসিয়াছিলেন মাতৃদেবী। ভৃত্যেরা তালবৃন্ত দিয়া ব্যজন করিতেছিল। গৃহের মধ্যে চিকিৎসক বসিয়া ঢুলিতেছিল। বাহিরে দেওয়ান, কবিরাজ প্রভৃতি নিদ্রিত হইয়াছে। আমার মাতারও কখন চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি

কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—তুমি কে? তুমি—!

দেখিলেন নির্নিমেষ নেত্রে স্বামী তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

তিনি করুণ হাস্যসহকারে বলিলেন—আমি আসিয়াছি। আমি তোমার ভবানী!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় এরপরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রত্নেশ্বর?

—ভালো আছে। কিন্তু এখনও ঘা শুকোয় নি! ভাল হলেই আসবে!

—না। কালই আমাকে কলকাতা নিয়ে চল। পথে তাকে তুলে নেব। কলকাতায় চল। পাগলাবাবাকে বের করতে হবে। তিনিই তিনি। আমি চিনতে পারিনি। আমি কলকাতায় যেতে চাই। তাছাড়া আমাকে ভাল হতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে সমস্ত বিশদভাবে লিখেছেন এবং তারপর শপথ করে লিখেছেন—আমার সতীসাবিত্রীর মত জননীকে যাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা লিখিয়া রাখিলাম। যাহারা কটু বলিয়াছে তাহাদিগকে আমি ক্ষমা করিব না। কখনও না। তাহা হইলে অনন্ত নরক হইবে আমার। পিতার ওই মাসীটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মাসোহারা দিয়া কাশী পাঠাইব। এখানে রায়বাড়ীর অন্দরে 'কর্তামা' সাজিয়া বিচরণের শেষ করিব।

আর জমিদারী গ্রহণ করিলাম, এখন আমার প্রধান কর্ম গোপাল সিংহের দমন! সে আমার এই জননীকে কুৎসিত বাক্য বলিয়াছে। এক চপেটাঘাতে সে দমিত হয় নাই। সে আমাকে পুড়াইয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছে, গোপাল সিংহ ধ্বংস যজ্ঞের সকল সমিধ প্রস্তুত। এবার অগ্নি প্রজ্বলিত করিব।

"প্রথমেই পিতৃদেব আমার পৃষ্ঠদেশের ক্ষত দেখিতে চাহিলেন।" রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে। ব্রাকেটে লেখা আছে—তখনও তাঁহাকে মাতুল বলিয়াই জানিতাম।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে—আর তিনদিন পর কীর্তিহাট থেকে বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে নিয়ে বজরায় কলকাতা রওনা হয়েছিলেন। সঙ্গে লোকজন, ডাক্তার-বৈদ্য, সেবক-কর্মচারীর কথা অনুমান করতে পার। বর্ণনা করব না। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় তার বর্ণনা করেছেন। তিনি অজ্ঞাতবাস থেকে জয়ী হয়ে যৌবরাজ্যে আপন অধিকারে প্রথম পদার্পণ করলেন, রায়বাড়ীর খাস বজরায়, যার নাম ছিল 'কীর্তিহাট।' এ বজরা তৈরী করিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, তখন কুড়ারাম রায়ের 'ললিতা' পুরনো হয়েছে। সে বজরা কমলাকান্ত জ্ঞান হয়ে প্রথম দেখলেন। তার বিশদ বর্ণনাই করেছেন।

কীর্তিহাট থেকে আসবার পথে হলদীর মোহনার কাছাকাছি গুলমহম্মদ শরীফ, হজরতপুরে বজরা লাগিয়ে ভবানী দেবী নায়েব আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন ঠাকুরসাহেবের কাছে, সঙ্গে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। উপঢৌকনও পাঠিয়েছিলেন। কমলাকান্তের জন্য কলকাতা থেকে আসবাব আনিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়, তার মধ্য থেকে একখানা উৎকৃষ্ট গালিচা পাঠিয়েছিলেন। গালিচাখানা বড় নয়, একজনের আমীরী চালে বসবার মত। তার সঙ্গে তার উপযুক্ত মসলন্দ অর্থাৎ তাকিয়াও ছিল। আরও কিছু ছিল,—একটা হাতীর দাঁতের কাজকরা মেহগনি কাঠের বই রেখে পড়বার কাঠা, একটি রূপার সামাদান, কিছু আতর এবং একটি ছোট সোনার রেকাবিতে কিছু মেওয়া ফল।

আচার্য গিয়ে ঠাকুরসাহেবকে সেলাম করে সব সামনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আমার মালিকের খুব অসুখ, মা তাঁর শিয়রে বসে আছেন, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মা তাঁর ঠাকুরসাহেব বাপজীকে এইগুলি পাঠিয়েছেন।

ঠাকুরসাহেব অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—বা রে নসীব বাঃ! খেল বটে তোর। কদিন আগে শ্যামনগরের বামুনরা চিঠির মারফত পাওনা বকেয়া সেলাম নজরানা মিটিয়ে দিয়েছে। আজকে কীর্তিহাটের রায়বাবু পাঠালে আমারে খেলাত। কিন্তু নিয়া করব কি?

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—ওই গালিচায় বসে নামাজ করবেন, ওতেই বসে এই তেকাঠার উপর কোরান শরীফ রেখে এই সামাদানে আলো জ্বেলে পড়বেন। এই মেওয়া ফলক'টি আপনি খাবেন!

ঠাকুরসাহেব ভবানী দেবীর পরিচয় পেয়েছিলেন এই সেদিন, যেদিন ওই গোয়ানদের ছিপে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাট যান!

কয়েকটা লোক কয়েকটা নতুন কাপড়ের গাঁট এনে নামিয়ে দিয়েছিল, এখানকার লোকেদের জন্য পাঠিয়েছেন ভবানী দেবী।

ঠাকুরসাহেব তখন আশী পার হয়েছেন, তবু সমর্থ মানুষ ছিলেন। খুব সমর্থ লাঠি হাতে গ্রাম ঘুরতেন রোজ। তখনও পাখোয়াজ বাজাতেন, সূচে সুতো পরাতে পারতেন এবং তাঁর মত মিহি সেলাইয়ের কাজ নাকি ঠাকুরবাড়ীর বিবিসাহেবরাও করতে পারতেন না।

ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—চল, আমি যাই, বাপজানকে আমাদের সিদ্ধাই আছে, তার দোয়া দিয়া আসি!

হেঁটেই গিয়েছিলেন তিনি নদীর ঘাট পর্যন্ত। একটা ডুলি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। বজরার কামরায় ঢুকেই তিনি বলেছিলেন—কুছ ডর নাই বাপজান! আমার ফকীরির ইমান আর পিতিপুরুষের সিদ্ধাইয়ের যদি কিস্মত থাকে তবে তুমি এই নদীর বাতাসেই ভাল হয়ে উঠবা। আর এই আমার মা জননী, ইনি সতী, ইনি দেবতা বাবা। ইয়ার তপস্যা সি কখুনও বরবাদ হয় না। সাবিত্রির কথা জানি বাবাজান, আমি পড়েছি, জানি। বাবা জান, যিবার খরা খুব কড়া হয়, সূয্যির তেজে যিবার দুনিয়া ফাটে, সিবার বর্ষা নামে তুফানে। তুমাদের বারো বছরের ছাড়াছাড়ি, মার এমুন তপস্যা, মিল হবার সময় এমন তুফান না হলে হয় বাবা!

আশীর্বাদ করে চলে এসেছিলেন। বীরেশ্বর রায়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু মন্ত্রতন্ত্রও পড়ে দিয়েছিলেন। ভবানী দেবী তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। বৃদ্ধ চোখের জল ফেলে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আবার ঘুরে গিয়ে দরজায় দাড়িয়ে বলেছিলেন—একটা বাত বলব বাবা?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বলুন। হুকুম করুন।

—হুকুম রাখবে বাবা?

—সাধ্য ভোর কসুর করব না!

ভিতরে ঢুকে বলেছিলেন—নফরেরা বাইরে যা তো বাবা। আর কামরার দরজাটা বন্ধ

করি দিস।

তারপর বলেছিলেন—তামাম শ্যামনগর পুড়ায়ে দিলে ওই বেটা ফিরিঙ্গী। তোমার ভাগ্নাকে ঘরে শিকল দিয়া পুড়ায়ে মারবার চেষ্টা করলে! তুমি তার শোধ লিবে না? পারবে না।

আশ্চর্য ঠাকুরসাহেব, শান্ত ফকীরের মত মানুষ, চোখ দুটো তাঁর ধক-ধক করে জ্বলে উঠেছিল। বলেছিলেন—কলিজায় আমার বড়া লেগেছে বাবা। লাট যুগলপুর আমাদের সিদ্ধাইয়ের বকশিস, জাতের দাম। বাবা, ফিরিঙ্গীকে এনে ঠাকুরদের চোট্টা নফর আজ পুড়ায়ে দিলে। আমি কিছু করতে পারলাম না। তুমি পারবে না শোধ লিতে?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—তাঁর চোখ দুটোও জ্বলে উঠেছিল—মনে এ আমার ছিল, তার উপর আপনি ফরমায়েস করলেন, তামিল জরুর হবে!

—সাবাস সাবাস! দিল আমার খুস করে দিলে!

তিনি চলে গিয়েছিলেন।

শ্যামনগরের ঘাটে বজরা এসে লেগেছিল। তার আগেই ছিপ এসেছিল খবর নিয়ে। স্বয়ং ভবানী দেবী পত্র লিখে কমলাকান্তকে আদেশ করেছিলেন প্রস্তুত থাকতে। কঠোর নির্দেশ ছিল তাঁর। লিখেছিলেন—"আদেশ অমান্য করিলে তুমি মাতৃহত্যার পাতকী হইবে। পিতৃহত্যার পাতক অর্শিলেও আশ্চর্যের হইবে না। দাদা বিমলাকান্ত তোমার মুখদর্শন করিবেন না!"

কমলাকান্ত বীরেশ্বর রায়ের অসুখের সংবাদে এবং শ্যামনগরের এই দুর্ঘটনায় নিজেও অনুতপ্ত এবং হয়তো নিঃসহায় বোধ করছিলেন। তিনি আদেশ অমান্য করেন নি। শ্যামনগরের ঘাটে আসেন নি; লোক রেখেছিলেন। এবং নিজে বাড়ীতে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঘাটে এসে জুটেছিল গোটা শ্যামনগর। বীরেশ্বর রায় এ সারা অঞ্চলে তখন গল্পের মানুষ। বজরা, ভাউলে নৌকো, ছিপ নিয়ে সে একটি ছোটখাট নৌবহর ঘাটে যখন লেগেছিল, তখন এ অঞ্চলের মানুষের বিস্ময়ের সীমা ছিল না!

গিরীন্দ্র আচার্য ঘাটে নেমে গ্রামের প্রধানদের নিয়ে কমলাকান্তকে আনতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে লোক-লস্কর নিয়েই গিয়েছিলেন। কমলাকান্ত জ্ঞাতি ভট্টাচার্যদের বাড়ীতে ছিলেন, সেদিন তখন প্রস্তুত হয়ে তাঁদের পাকা দেবমন্দিরের বারান্দায় বসে ছিলেন।

ডুলি আনানো ছিল। দুখানা ডুলি।

কমলাকান্ত ঠাকুরদাস পালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ঠাকুরদাস দাদা কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে!

আচার্য হেসে বলেছিলেন—বেশ তো বাবুজী; শুধু ঠাকুরদাস কেন গো, শ্যামনগরের দশ-বিশজন-পঞ্চাশজন যত জন খুশি নিয়ে চল না! তোমার হুকুম! অমান্যি করে কার সাধ্যি।

সমবেত লোকজনেরা দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠেছিলেন! কমলাকান্ত একটু লজ্জা পেয়েছিলেন। ডায়রীতে লিখেছেন—"দেওয়ানজীর এবম্প্রকার উক্তিতে আমি গৌরব এবং

লজ্জা উভয়ই অনুভব করিলাম।

দেওয়ান আচার্য কমলাকান্তকে নিয়ে রওনা হবার সময় কীর্তিহাটের বিচক্ষণ কর্মচারী বলু ঘোষ এবং দুজন পাইককে রেখে এসেছিলেন ; বিমলাকান্তের পোড়া বাড়ীর চাল বর্ষা চালানোর মত মেরামতের জন্য। এবং ঠাকুরদাস পালের বাড়ীর মাথা ভেঙে নতুন দেওয়াল চড়িয়ে মজবুত করে তৈরীর জন্য। বর্ষার পর ইট পাড়িয়ে বিমলাকান্তের বাড়ী পাকা হবে। সুতরাং কোন রকমে বর্ষা কাটানোর মত করে রাখা হবে। ক্রোশ দুয়েক দূরে কুতুবপুরের কাছারী, কীর্তিহাটের এলাকা, সেখানকার কাছারীর সমস্ত সাহায্য এখানে আসবে। আর প্রধানদের ডেকে শ্যামনগরের লোকেদের বাড়ীঘর মেরামতের জন্য দু হাজার টাকা দিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন—এ হ'ল কমলাকান্তবাবুর প্রণামী। বলতে গেলে এক রকম আগুনটা তাঁর ফুঁয়েই জ্বলে উঠেছে! টাকা কর্মচারীর কাছে রইল। তাঁরা যাকে যা দিতে বলবেন, বলু অর্থাৎ বলরাম ঘোষ তাকে তাই দেবে। এছাড়া কাঠ তাঁরা কুতুবপুর জঙ্গল থেকে পাবেন।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—ইহাতে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। অনুভব করিলাম—হ্যাঁ। আমি জমিদার।

আচার্য আর একটি কথা বলেছিলেন, কমলাকান্তকে—বাবুজী, সকলের কাছে বলুন, আপনার বাড়ীর বিগ্রহকে সাক্ষী করে বলুন—এই নিগ্রহের প্রতিকার না করে শ্যামনগরে আর ঢুকবেন না। লাট যুগলপুর আপনার এই গৃহদেবতার নামে কিনে, সেবায়েৎ হয়ে এ গ্রামে ঢুকবেন। আপনি ব্যাঘ্রশাবক, শৃগালের অত্যাচার নিবারণ করা আপনার ধর্ম। ইজ্জৎ।

একাল হলে রত্নেশ্বর রায় তা পারতেন না। কিন্তু সেকালে তিনি তা পেরেছিলেন। ডায়রীর পাতায় মোটা মোটা করে লিখেছেন কথাগুলি।

তারপর লিখেছেন—ওই কথা।

ডুলিতে চড়িয়া ঘাটে আসিলাম। শ্যামনগরের সমস্ত লোক আসিয়া আমাকে বিদায় দিল। আমি বিজয়ীর মত আসিয়া বজরায় আরোহণ করিলাম। ওই প্রতিজ্ঞা করিয়া মনের সকল গ্লানি আমার মুছিয়া গিয়াছিল। বজরায় উঠিতেছি এমন সময় পিছন হইতে ঠাকুরদাস দাদা বলিল—দাদাঠাকুর, শালা সাহেব! ঘোড়ায় চড়িয়া ওই দেখ, অনেকটা দূর হইতে দেখিতেছে। দেখিলাম—তাহার কথা সত্য, অনেকটা দূরে জন রবিনসন ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিতেছে! পিঠে কাঁধের উপর বন্দুকের নলটা উঁচু হইয়া আছে। আমি গ্রাহ্য করিলাম না। বজরায় আরোহণ করিলাম। মাতাঠাকুরাণী বজরার কামরার দরজার মুখে পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই তিনি আমাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—না। আগে আমাকে নহে, আগে তাঁহাকে। আয়! সুসজ্জিত কামরার অভ্যন্তরে বিছানার উপর মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি দরজার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন। বুঝিলাম, আমারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আমার দৃষ্টি আনত হইল। গভীর লজ্জা এবং অনুশোচনা অনুভূত হইল! শালপ্রাংশু মহাভুজ রাজসদৃশ আকৃতি, তাহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয়ের দীপ্ত দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি অগ্রসর হইয়া চরণে প্রণতঃ হইতে উদ্যত হইতেই তিনি আদেশ করিলেন—অগ্রে তোমার পৃষ্ঠের ক্ষতস্থান

দেখাও! দেখি!

—না, আগে প্রণাম করুক।

—প্রণাম! তাই হোক। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী! তাই কর, তোমার ভালো-মায়ের আদেশই শিরোধার্য কর!

প্রণাম করে উঠে এবার অপরাধীর মত হেসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায়, প্রস্তর মনুষ্য, লোকে বলত পাথরে গড়া মানুষ। সে কি দেহে, কি মনে! সেই মানুষের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল!

রত্নেশ্বর রায় কিন্তু সেদিনও স্পর্শ করতে পারেন নি অন্তর্নিহিত এই পাথর ফাটানো ভোগবতী উৎসটিকে।

সুরেশ্বর বললে—তিনি মানে রত্নেশ্বর রায় খুব বিস্ময় বোধ করেছিলেন, কলকাতায় ঘাটে পালকিতে চড়েই বীরেশ্বর রায় ওখানকার প্রধান কর্মচারী ঘোষকে ডেকে প্রথম যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সেই কথা শুনে।

ভবানী দেবীর সামনেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সোফিয়ার ওখানে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ হুজুর!

—খোঁজ পেয়েছ?

—না, হুজুর। তিনি ওখানে নেই। চলে গিয়েছেন!

—কোথায় গিয়েছেন?

—তা ওরা জানে না বললে।

—কে বললে? সোফিয়া নিজে?

—না হুজুর, বাঈ এখন কারু সঙ্গে দেখা বড় করে না। অনেক কষ্টে ওর মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বললে। বললে—তিনি চলে গিয়েছেন, তারা কোন পত্তা জানে না!

ভবানী দেবী শুনছিলেন। পাশে রত্নেশ্বর রায়ও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিলেন এবং ভাবছিলেন—তিনি ভুল করেছেন এসে!

"আমি তখন ভাবিয়াছিলাম—আমি মহাভ্রম করিয়াছি; পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ ভাবিয়া কণ্টকময় শিংশপা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছি। আর ধিক্কার দিয়াছিলাম ভালো-মাকে। মনে পড়িয়াছিল পুরানের গল্প, এক সতী তদীয়া মহালম্পট কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীর আদেশে তিনি ওই পাপাচারী স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন। দারুণ অন্ধকারের মধ্যে পথিপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন এক ঋষির অঙ্গে উক্ত পাপাচারীর পা ঠেকিবামাত্র পাপস্পর্শে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি তাঁহাকে অভিপাশ দেন যে, সূর্যোদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে, রে মহাপাপী, তোর মৃত্যু ঘটিবে। সতীশিরোমণি নাকি সদর্পে বলিয়াছিলেন—অন্ধকারে অজ্ঞানতাবশতঃ সঙ্ঘটিত এই অপরাধের জন্য তুমি আমার স্বামীকে অভিশাপ প্রদান করিলে। আমি তোমাকে প্রত্যাভিশাপ দিব না। তবে ইহাও বলিব যে, যদি আমি সতী হই, তবে এই রজনীরও আর কখনও অবসান হইবে না। সূর্য উদিত হইবে না। শেষে অবশ্য দেবগণের মধ্যস্থতায় সর্পও মরে নাই, যষ্টিও

ভগ্ন হয় নাই, সতী এবং ব্রাহ্মণ উভয়ের মহিমাই রক্ষিত হইয়াছিল; দিব্যদেহ ধারণ করিয়া দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সতী তাঁহার স্বামীকে লইয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের বাক্য রক্ষিত হইয়া রজনীশেষে সূর্য উদিত হইয়াছিল, সৃষ্টিও রক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রকারের সতীত্ব-মহিমা-কীর্তন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই এদেশের সর্বনাশ করিয়াছেন! ভালো-মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। এবং যখন তিনি নিজে প্রশ্ন করিলেন, তখন আমার অশ্রদ্ধা জন্মিল।

ভবানী দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে—আমি চিঠি লিখে সোফি বাঈকে ডেকে পাঠাব? হয় তো আমি ডেকে পাঠালে আসবে, আর বলবেও!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি চিঠি লিখবে?

—হ্যাঁ। তুমি লিখলে ভয়ে না আসতে পারে। আমি লিখলে আসবে। অন্ততঃ আমার ভরসা পাবে সে। লিখব তোমার অসুখ খুব।

একটু ভেবে বীরেশ্বর বলেছিলেন—দেখ!

বাড়ী এসে ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থার মধ্যেও এ কথাটা ওঁদের দুজনের একজনও ভোলেন নি। চিকিৎসক এসেছিলেন দুজন, একজন বড়-সাহেব ডাক্তার এবং একজন বড় কবিরাজ। অসুখের উপশম বারো আনাই হয়ে গিয়েছিল; চার আনা অবশিষ্ট ছিল। মাথার যন্ত্রণা ছিল না কিন্তু বাঁ হাত এবং বাঁ পা অবশ হয়ে গিয়েছিল, সেটা তেমনিই আছে। ডাক্তার বলেছিলেন—প্যারালিসিস। কবিরাজও তাই বলেছিলেন।

ডাক্তারী মতেই ওষুধের ব্যবস্থা হল। পূর্ণ বিশ্রামের কথা দুজনেই বলে গেলেন। সুরা, মাংস ইত্যাদি বন্ধ! আর ব্যবস্থা হ'ল মালিশের। সে মালিশের তেল দিয়েছিলেন কবিরাজমশাই।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা বসে ভবানী দেবী পত্র লিখেছিলেন সোফিয়া বাঈকে। লিখেছিলেন—"রায়বাবুর খুব অসুখ। বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে আমি নিজে পত্র লিখছি, তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা কর।"

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—দাঁড়াও আগে খোঁজ করি।

—খোঁজ?

—হ্যাঁ। খোঁজ। জানি, সোফি এখন অন্য কার কাছে রয়েছে। এরা তো—। হেসেছিলেন। হাসিতেই বাকী অংশটা বলা হয়ে গিয়েছিল। ঘোষকে ডাকতে বল। জলধর, ঘোষকে ডাক।

ঘোষ এসে মাথা চুলকে বলেছিল—বাঈ এখন কোন বড়লোক বা আমীরের বাঁধা নেই। মানে—। অন্যরকম হয়ে গেছেন। ওই কাজ করে না। তবে গান-বাজনার বায়না হলে যায়। তাও নাচে-টাচে না। বৈঠকী গায়ে! সেও খুব বড় আসরে। নাহ'লে বাড়ীতে থাকে, কি সব জপতপ করে। ওই পাগলাবাবার পর থেকে আর এক রকম হয়ে গেছে।

—হুঁ! একটু চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিয়ে আসতে বলেছিলাম। সেটা দেওয়া হয়েছিল? আমার এই একটা হয়েছে দেখছি—

কথাবার্তা সব ঠিক মনে পড়ছে না।

ঘোষ বলেছিল—হ্যাঁ নিয়েছিল। তবে বাঈ নিজে নয়—বাঈসাহেবার মা নিয়েছিল।

রত্নেশ্বরে ঘৃণা জন্মাচ্ছিল। শুধু বীরেশ্বর রায়ের উপরেই নয়, ভালো-মার উপরেও চিত্ত তার বিমুখ হয়েছিল। বাঙালীর ছেলে, ইংরিজী শিখেছেন, সে কালের আধুনিক; রামমোহন রায়ের বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের হাওয়ায় নিশ্বাস নেন, তাঁর সহ্য হয় নি এই ধরনের লজ্জাহীন ব্যবহার। বাড়ীতে মহেশচন্দ্র রয়েছেন, মহেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্য ছিল; তার সঙ্গে মতে তাঁর মিলত, তাঁর কাছে গিয়ে বলেও তিনি খুশী হন নি। তিনি বলছিলেন—এ নিয়ে কোন ঔৎসুক্যপ্রকাশ তোমার উচিত হবে না ভাই।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আপনি ভালো-মাকে বারণ করুন:

—না। সে অধিকার আমার নাই।

রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"অতঃপর আমি এই বাড়ীতে থাকিয়াও তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করাই স্থির করিলাম। তাঁহারা যে দিকটায় ছিলেন সে দিকটা ত্যাগ করিয়া একেবারে পশ্চিমের অংশটায় বাসস্থান স্থির করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এও স্থির করিলাম মাতুল মহাশয় একটু সুস্থ হইলেই সমস্ত সম্পত্তি ইত্যাদি আমার অংশমত পৃথক করিয়া লইব। তিনি এক্ষণে একরূপ অক্ষম হইলেন, তাহাকে বলিব—তিনি তাঁহার অংশের মালিকানার পাওয়ার অব এ্যাটর্নী আমাকে প্রদান করুন। তাঁহার খরচপত্রাদি সমুদয় যথাবিধি আমি সরবরাহ করিব। এবং তাঁহার সন্তানাদি যদি অতঃপর হয় তবে তাহাদিগকে যথাসময়ে বুঝাইয়া দিব। এবং শর্ত করাইয়া লইব যে, উৎসব আনন্দ ব্যতিরেকে ভদ্রাসন বাটী মধ্যে কোনপ্রকার অনাচার করিতে কেহই পারিবেন না। প্রয়োজন হইলে এমতে একটি বাগানবাটী ক্রয় করা যাইতে পারে।

সেইরূপ ব্যবস্থাদি করিয়া লইয়া আমি একদা জানবাজার বাটীর সেরেস্তাখানায় আসিয়া বসিলাম। বলিলাম—আগামীকল্য হইতে আমি আসিয়া কাছারীতে বসিব। আমার বসিবার ঘর ও আসবাবাদির ব্যবস্থা করুন!

পিতা কাশী হইতে আসিবেন। তাহার পূর্বেই আমি শক্ত হইয়া বসিতে চাই। অন্যথায় পিতাকে আমার আশঙ্কা আছে। তিনি বলিবেন—বীরেশ্বর বর্তমানে কদাপি তাহা হইতে পারে না।

তিনি পিতা। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যান যে সম্পত্তির মালিক তিনি নহেন, মালিক আমি। তিনি আমার বাল্যকালে আমার ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিলে আমি বালককালে অনেক সুখে থাকিতে পারিতাম।

সুখছাড়াও আমার কর্তব্য আছে। ভগবান সে কর্তব্য অর্পণ করিয়াই এই রায়বংশের অর্ধেকের মালিক করিয়া আমাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন! রায়বংশের মর্যাদা, ধর্ম, দেবতার তুষ্টিসাধন আমার অবশ্য কর্তব্য।"

পরদিন থেকে তাই হয়েছিল সুলতা।

কাছারীতে রত্নেশ্বরের বসবার ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল—বীরেশ্বর রায়ের ঘরে—তাঁরই আসন

তাঁর বসবার জন্ম নির্দিষ্ট হয়েছিল। পাশে তক্তাপোশের উপর বসেছিলেন গিরীন্দ্র আচার্য। বীরেশ্বর রায় তাঁকে যেতে দেন নি।

গিরীন্দ্র আচার্য তাঁকে সম্ভাষণ করে বলেছিলে—এস, ভায়া এস। বাবুজীর হুকুম হয়েছে এই ঘরে এই আসনে তুমি বসবে। কাগজপত্রে সই করবে। যা বুঝতে না পারবে তা আমাকে বলবে। আমি বুঝিয়ে দেব তোমাকে!

প্রথমদিনই আচার্য তাঁকে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের আনন্দময়ী দেবোত্তরের অর্পণনামা এবং সোমেশ্বর রায়ের ট্রাস্ট দলিল পড়তে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এই দুখানা থেকেই কাঠা-মোটা বুঝতে পারবে। আর সম্পত্তির আয়ব্যয় বিলিব্যবস্থা সবই পাবে। পড়। কাল দেখাব, ওঁদের নিজের নগদ টাকা কারবারে হিসেবপত্র। মজুত টাকা, কত লগ্নী, তার সুদ। এবং তাই থেকে হাল পর্যন্ত কত সম্পত্তি আবার কেনা হয়েছে, তার বিবরণ তৈরীই আছে, তা দেখাব।

সম্পত্তি অনেক। তোমরা রাজাতুল্য ব্যক্তি! সরকারের কাছে একটু ধরাপাড়া করলেই খেতাব পাবে। কতবার বলেছি তোমার মাতুলকে, তা তিনি তো এতকাল একরকম পাগলই ছিলেন! এবার মামাকে বল তুমি। তুমি বললে না করিবে না। একটা খেতাব না-হলে মানাচ্ছে না!

বলতে বলতেই উঠে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন আচার্য। ঘরখানা থেকে কাছারীর বারান্দা দেখা যাচ্ছে, সেখানে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। একজনকে চিনতে পেরেছিলেন রত্নেশ্বর। সে পিক্রস গোয়ান। জোসেফ পিক্রস। ভালো-মাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল শ্যামনগর।

আচার্য তাদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে, তাদের বসিয়ে, উপরতলায় চলে গিয়েছিলেন। বুঝতে বাকী ছিল না যে, তিনি বীরেশ্বর রায়ের কাছে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত তার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এ কি কথা? তাকে এই কর্তার আসনে বসিয়ে রেখে আচার্য চলে গেলেন উপরে। তাকে কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন না। তা হ'লে তো এ সঙ সাজা!

তিনি হরকরাকে বলেছিলেন—ডাক্ ওই লোকটাকে।

পিক্রস এসে তাঁকে সেলাম ক'রে হেসে বলেছিল—আরাম হয়ে গেলেন হুজুর? আচ্ছা আচ্ছা, মাদার মেইরীর কৃপা, মেহেরবানী!

—কি খবর তোমাদের? কি জন্তে এসেছ?

আবারও হেসে পিক্রস বলেছিল—এত্তালা ভেজলাম বড়া হুজুরের কাছে! একটা কাম আছে।

—কি কাম? বল!

—উ তো বড়া হুজুরকে কাম। উন্‌কে পাশ শুনবেন!

—হুঁ!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বাইরে এসে উপরে উঠে গিয়েছিলেন। একেবারে বীরেশ্বর রায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। বাইরে দাঁড়িয়েছিল চাকর জলধর, আর একজন হরকরা। তিনি তাদের গ্রাহ্য না-করে দরজা টেনেছিলেন। জলধর সভয়ে

বলেছিল—হুজুর—

নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কি ?

—নায়েববাবু কি পরামর্শ করছেন, বলেছেন—

তার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় মেড়ে তিনি ডেকেছিলেন—ভালো-মা !

চড় হজম করেই জলধর বলেছিল—মা ও ঘরের মধ্যে নাই হুজুর।

—নাই ? একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে সে এবার একটু জোরেই দরজা ঠেলে ওই ভালো-মাকেই ডেকেছিলেন। ভালো-মা।

ভিতর থেকে আচার্য বলেছিলেন—আসছি। কয়েক মুহূর্ত পরেই আচার্য দরজা খুলে দিয়ে তাকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—এক্ষুনি তোমাকে ডাকবার কথা হচ্ছিল !

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর, তাঁর আর রাগ বা অভিযোগ করবার কারণ ঘটে নি !

বীরেশ্বর রায় তাকে বলেছিলেন—বস ! পাখাখানা নিয়ে মাথায় হাওয়া কর।

রত্নেশ্বর তাই করেছিলেন।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—যে কথা হচ্ছে তা তোমার মা—মানে ভালো-মাও জানবেন না। জানব আমরা তিনজন—আমি তুমি আর দেওয়ান খুড়োমশাই।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। একটু ভয়ও হয়েছিল।

—শোন! জন রবিনসনকে আমি শাস্তি দিতে চাই! দেওয়ানী মামলা তার নামে দায়ের হয়েছে, কিন্তু তাতে এর শোধ হবে না! আমি ওকে—।

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর। কি করতে চান বুঝতে তাঁর বাকী থাকে নি। মুহূর্তে একটা দুরন্ত ভয় যেন তাঁকে চেপে ধরেছিল।

বীরেশ্বর রায় তা বুঝেছিলেন। বলেছিলেন—ভয় পেয়ো না। জমিদারিধর্ম বড় কঠিন। এটা একরকম রাজধর্ম। দুষ্টকে শত্রুকে দমন করতেই হবে। না-পারলে জমিদারী চলবে না। দেওয়ানী মামলা করেছি, ওর কাছে আমরা আজও হাজার বিশেক টাকা পাব। কিন্তু তাতে অনেক দেরী লাগবে। একটা দাঙ্গা বা—। দাঙ্গার চেয়ে গোপনে ওকে—। লোক পেয়েছি।

রত্নেশ্বরের শরীর হিম হয়ে আসছিল! গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

এবার আচার্য বলেছিলেন—আমি বলছি, তাতে অনেক হাঙ্গামা হবে। কোনরকমে প্রকাশ পেলে গভর্নমেণ্ট হুজ্জোতের বাকী রাখবে না। এই সবে মিউটিনী গেল। তেতে আছে। আমি বলি—বেটার তো নানান বাতিক আছে। মেয়েমানুষ, শীকার, টোপ ফেলে কাবেজে নিয়ে এসে বেটাকে এমন করে দিক যাতে কাজের বাইরে যায়! সব থেকে ভাল হত, বিশুবাবুর দলের মত দল থাকলে। কুবী মেরে দিয়ে জখম করে দিয়ে চলে যেত। এরা তা পারবে না। দলটল এদের ঠাকুরসাহেব ভেঙে দিয়েছেন।

এই সময় ঘরে ঢুকেছিলেন ভবানী দেবী। তিনি এতক্ষণ পূজায় ছিলেন পাশের ঘরে। ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—আমি পূজোয় বসে সব শুনছিলাম। কিন্তু দুদিনও কি তর সইছে না তোমার ? ভাল হয়েই ওঠো!

—না। তুমি জান না—

—জানি!

—রত্নেশ্বর যদি জীবন্ত পুড়ে মরত—

—তা যখন হয় নি, তখন যদি হ'ত বলে রোগ বাড়িয়ে ফল কি?

—না। সে আমি ভুলতে পারছি না।

—ওসবের ভার খুড়োমশায়ের হাতে দাও, রত্নেশ্বরকে নিয়ে উনি যা-হয় করবেন। এসবে আমি দুঃখ পাই। সহ্য করতে পারিনে। তবু জেদ যখন তোমার যাবে না, তখন সর্বনাশা পাপ না করে খুড়োমশাই যা বলেন তাই কর! বিপদ ডেকে আনা হবে। পাপ হবে।

—টাকা বিপদ কাটিয়ে দেবে। আর পাপ? না—তাও হয় না। রাজ্য করতে গেলে বিদ্রোহী দমন করতে হয়। শত্রুকে ধ্বংস করতে হয়। রাজধর্ম জমিদারিধর্মে তাতে পাপ অর্শায় না। আইন বাঁচাতে পারলেই হ'ল।

কথাটা কতক্ষণ চলত' তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সমস্তকিছুর মোড় ফিরে গেল পালকির বেহারাদের হাঁকে।

ভবানী দেবী বললেন—থাক এখন ওসব কথা। পালকি এল। সোফিয়া বোধ হয় এল! জলধর, দেখ তো বাবা কে এল পালকিতে?

জলধর বারান্দায় ঝুঁকে বললে—বাঈ সাহেবা।

ভবানী দেবী বললেন—তুই নিচে যা রত্ন।

আচার্য সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। রত্নেশ্বরকে বললেন—এস বাবুজী ভায়া। এস—। আমরাই যা হয় করব।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। রত্নেশ্বর বেরিয়ে এসে বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলে—ভালো-মা!

ভবানী দেবী সাড়া দিয়েছিলেন—কি?

—আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমাকে একলা বলতে চাই।

বীরেশ্বর রায় বললেন—ভিতরে এস। বাইরে একলা বলা হয় না। যাও পূজোর ঘরে যাও!

পূজোর ঘরে গিয়ে ইচ্ছে করে বীরেশ্বর রায়কে শুনিয়েই একটু উচ্চকণ্ঠে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—এ আমার আর সহ্য হচ্ছে না ভালো-মা।

—কি?

—এই সোফি বাঈকে ডেকে আনছ—

—তুই অন্তত এ কথাটার মধ্যে থাকিস নে। তুই নিচে যা।

—তুমি একে পাপ মনে করছ না? আশ্চর্য!

এঘর থেকে বীরেশ্বর থেকেছিলেন—সতীবউ!

ভবানী ব্যগ্রভাবে বলেছিলেন—ওরে, আমি তোকে মিনতি করছি। রত্ন। তোকে মিনতি করছি!

—সতীবউ!

—যাই।

—যাই নয় শোন ; রত্নেশ্বর, তুমিও শোন। নইলে আমাকেই কোনরকমে বিছানা ছেড়ে উঠবে হবে।

ভবানী এ ঘরে এসে বলেছিলেন—ও যাচ্ছে। এখুনি যাচ্ছে। রত্ন।

বীরেশ্বর বললেন—না। তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে, আর শ্বশুরমশাই যেখানা লিখেছিলেন, চিঠি দুখানা ওকে পড়তে দাও।

—পড়তে দেব ?

—হ্যাঁ পড়তে দেবে। দাও। দাও।

ভবানী দেবী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে চিঠি দুখানা বের ক'রে রত্নেশ্বরের হাতে দিলেন।

বীরেশ্বর বললেন—চিঠি দুখানা তুমি নির্জন ঘরে পড়ে শেষ করে আমাদের কাছে এস। যাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে। তোমার জানার সময় হয়েছে। যাও। এখন সোফি এসেছে, তার সঙ্গে আমাদের কথা আছে কিছু, সেরে নিই!

রত্নেশ্বর পাশের ঘরে গিয়েই পড়তে বসলেন চিঠি দুখানা।

সোফিয়া এল। কিন্তু সে সোফিয়া নয়। এ যেন আলাদা মানুষ। পেশোয়াজ পায়জামা নয়—ঘাঘরা কাঁচলী ওড়না নয়, নাকে হীরার নাকচাবী নাই—কপালে টিকলী নাই। কানে ঝুল মাকড়ী নাই, গলায় চিক নাই। হার নাই। হাতে বাজুবন্ধ, কঙ্কন নাই, সাদা-মাটা হিন্দুস্তানী ঢঙে লালপাড় শাড়ী পরে এসেছে, গায়ে মুসলমানী কাঁচুলী আছে; চুলে বেণী নাই, চুল এলানো এবং বেশ ভালো করে আঁচড়ানোও নয়। চোখে সুরমা আছে, মুখে পান জর্দাও আছে। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে সোফিয়ার তা এক নজরেই বোঝা যায়।

ঘরে ঢুকেই সে শয্যায় আধশোয়া অবস্থায় বীরেশ্বর রায়কে দেখে কয়েক মুহূর্ত যেন স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিল। সে বিশ্বাস করতে পারেনি নিজের চোখকে। তসলিম জানাতেও ভুলে গিয়েছিল।

ভবানী দেবী তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন—এস।

সোফিয়া বলেছিল—রুস্তমের মত বাবুজীর এমন হাল হয়ে গেছে!

ঘরখানা ছিল নিস্তব্ধ। সোফিয়া মৃদুস্বরে বললেও—বীরেশ্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন—দুনিয়া ভর একটিই হাল সোফি। সব কুছ বদল যাতা হায়।—সোফি বিবি ভি বদল গয়ি-হায়।

এতক্ষণে সে তসলিম জানিয়ে বলেছিল—হাঁ হুজুর—ই বাত ঠিক হায়।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—এঁকে চিনতে পারছ ?

—হাঁ হুজুর। হুজুরাইনকে আমি দেখবামাত্র পহছান লিয়া! ওঁর পরওয়ানা পেয়েই আমি এসেছি। পরওয়ানা না-পেলেও দেখলেই আমি চিনতে পারতাম। উ তসবীর— ? ওই তো।

সে ভবানী দেবীকে বারবার তসলিম জানিয়েছিল।

ভবানী দেবী একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—বস।

—আপ খড়ি হ্যায়। আগে আপনার তশরিফ রাখতে হুকুম হোক।

—আমাকে বসতে হবে?

—জরুর। না-হ'লে আমি বসতে পারি? আমি তওয়ায়েক—নবাব বাদশা আমীর লোকের পরসতার থাকত—আমি তাও নই। আপনি হুজুরাইন। আগে আপনি বসুন।

রত্নেশ্বর রায় তখন পাশের পূজোর ঘরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পত্র দুখানা পড়ে যাচ্ছেন। ভবানী দেবী লিখেছেন—মৃতবৎসা রোগাক্রান্তা বিমলা নিজের মৃত্যুরোগাতুর ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে, নিস্তব্ধ ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে নিজের ঘরের দরজা খুলে, বেরিয়ে এসে ভবানী দেবীর ঘরে ঢুকেছেন। ঘরে তখন বীরেশ্বর রায় বোনের সাড়া পেয়ে কোণে আলমারির আড়ালে লুকিয়েছেন। ভবানী দেবী ঘুমের ভান করে পড়ে আছেন। বিমলা নিজের ছেলেকে শুইয়ে রেখে রত্নেশ্বরকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

রত্নেশ্বর কমলাকান্ত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে কমলাকান্ত বড় হয়ে দেখতে হ'ল বিমলাকান্তের মত। মাথা তাঁর ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

হ্যাঁ, মুখের চিবুকের গড়ন, কপালের গড়ন, লম্বা ঢঙ—এ বিমলাকান্তের মতই বটে। শুধু নাকের ডগা এবং চোখের দৃষ্টি তাঁর বীরেশ্বর রায়ের মত। সারা দেহের কাঠামো তাঁর রায় বংশের মোটামোটা হাড় এবং শক্ত গাঁথুনিতে গাঁথা। রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন, স্থূলতা—"আমার মনে হইতে লাগিল—যেন সমস্ত ভূমণ্ডল থর-থর করিয়া কম্পিত হইতেছে। আকাশমণ্ডল হইতে নক্ষত্রসমূহ কক্ষচ্যুত হইয়া দিগ-দিগন্তরে ছুটাছুটি করিয়া কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। আমি দিবা না রাত্রি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সম্যক উপলব্ধি হইতেছে না। কখনও ক্রোধ হইতেছে এতকাল যাহাকে মাতা বলিয়া জানিতাম সেই বিমলা দেবীর উপর। আমার মাতৃবক্ষ হইতে তিনি আমাকে কাড়িয়া লইয়াছেন। কখনও ক্রোধ হইতেছে আমার প্রকৃত পিতামাতার উপর। আমাকে তাঁহারা কাড়িয়া লইতে দিলেন। চক্ষে দেখিয়াও নীরব রহিলেন!

"এতদিনে বুঝিতে পারিতেছে, আমাকে—এতদিন আমার পিতা বলিয়া যাঁহাকে জানিতাম তিনি—কেন বিমলা দেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে দিতেন না। আমাকে বলিতেন ইহা তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন—আমার শ্রাদ্ধ তুমি করিবে। কমলাকান্তকে করিতে দিবে না। তাহাতে তাহার অমঙ্গল হইবে। আমার উপনয়নের সময় নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির নাম তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন।

"কারণ এতদিনে বুঝিলাম। এতদিনে সব বুঝিলাম।"

সে তিনি পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা লিখেছেন।

সুরেশ্বর বললে—হবারই কথা। এ তো সাধারণ ঘটনা নয়। এ তো একটা এত বড় গাছ—তাকে শেকড়সুদ্ধ তুলে নদীর এক তীর থেকে আর এক তীরে এনে নতুন করে

লাগানোর মত ব্যাপার। গাছ হলে বাঁচত না। মানুষ বলেই সম্ভবপর হয়েছে।

সুলতা বললে—রাগ করো না, একটা কথা বলব। আমি সোস্যালিস্ট বলে বলছি না। বলছি একেবারে সাধারণ মানুষ হিসেবে। ব্যাপারটা যদি একটু ইতর-বিশেষ হ'ত—ধর—যদি তাঁর আসল বাপ-মা রায়বাড়ীর আশ্রিত দরিদ্র দম্পতি হতেন—এবং তারপর এতটা বয়সে—এই সত্য জানিয়ে তাঁর বাপ-মা তাঁকে নিজের ছেলে বলে দাবী করতেন—তা হ'লে এটা তাঁর সহ্য হত কিনা সন্দেহ।

সুরেশ্বর বললে—রাগ সত্যি করব না সুলতা। খুব খাঁটি কথা বলেছ। সংসারে বিমলাকান্তের মত মানুষ দু-চার জনের বেশী হয় না—যাঁরা সব স্বার্থ অনায়াসে ত্যাগ করে দুঃখকে মাথায় তুলে নিতে পারেন। রত্নেশ্বর রায় তা ছিলেন না। বিমলাকান্তের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর রক্ত তাঁর মধ্যে ছিল না। সামলে নিতে তাঁকে বেশীক্ষণ লাগে নি। তিনি এরই মধ্যে এঘরে সোফিয়া বাঈয়ের সঙ্গে বীরেশ্বর রায়ের যে কথা হচ্ছিল তা শুনে মনে রেখেছিলেন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এ সত্য আমি অস্বীকার করব না। তবে চরিত্রেও তিনি খুব শক্ত মানুষ ছিলেন—অত্যন্ত শক্ত। আমার মনে হয়েছে, তন্ত্র সাধনা যদি সত্য হয় তা হলে শ্যামাকান্ত যা পারেন নি, তা তিনি পারতেন। প্রখর বুদ্ধিজীবী। তন্ত্র সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তা বলব পরে। বলব কেন, ডায়রী থেকে পড়ে শোনাব।

সোফি বাঈ পাগলাবাবার কোন খবর দিতে পারে নি।—তিনি অকস্মাৎ একদিন বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি।

সোফি বলেছিল—বাবুজী হুজুর, আপনি যেদিন বাবাসাহেবকে জখম করে দিয়ে চলে এলেন, উসকে বাদ—পুরা ছ মাহিনা—উনি মুর্দার মত পড়ে থাকতেন। না খানা, না পিনা, একদম মুংগা—বোবার মত। কভি কভি—আঁ-আঁ—এমনি করে পুকারতেন।

কারুকে দেখে শান্ত হতেন না। সোফি এলে তবে শান্ত হতেন। ওদিকে বাজারময় খবরটা রটেছিল—হিন্দু সিদ্ধযোগীকে মুসলমান করে নিচ্ছে মুসলমান বাঈ। একদিকে মোল্লারা লেগেছিল উঠেপড়ে। তার সঙ্গে সোফি বাঈয়ের মায়েরও উৎসাহের সীমা ছিল না। অন্যদিকে হিন্দুরা ক্ষেপে উঠেছিল।

—বাবুজী, এই সময়ে মিউটিনির হাঙ্গামা না হলে হয়তো একটা 'খারাপ' কিছু ঘটে যেত। আমরা, বাবুজী, বহুবাজার থেকে চলে গিয়েছিলাম ; বড়া মসজেদের কাছাকাছি। পাগলাবাবার তবিয়ৎ এমন বেহাল হয়ে গেল যে, আমরা ভাবলাম—মরে যাবে। আমার মা চাইলে—উনকে বাহার রাস্তার পর ছেড়ে দিত। কিন্তু আমি দিই নি। এক রোজ রাতে বাবুজী, সকলে ভাবলাম আজ রাতে ফকীর জরুর ম'রে যাবে। মাকে উ রোজ কিছুতেই রুখতে পারলাম না—ঘরসে বাহার বারেন্দেমে নিকাল দিলে।—আমিও বাবুজী ওই বারান্দায় এসে তার শিয়রে বসে রইলাম। থোড়া পানি যদি মরবার সময় খেতে চেয়ে না পায় তবে তার চেয়ে গুনা আর হয় না। জাড়ার রাত বাবুজী। তার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে, নিজে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সাধুর ঠোঁট নড়ছিল হরদম, যেন কিছু বলছিল। কিন্তু আওয়াজ ছিল না। আমার কাছে কিছু কস্তুরী ছিল—আর কিছু দাওয়াই ছিল—মকরধ্বজ আমি

থোড়া থোড়া মুখে দিয়েছিলাম।

এমনি সমস্ত রাত বাবুজী। শেষ রাতে আমার থোড়া নিদ এসেছিল। ওদিকে বড়া মসজেদে আজান উঠল। আর তার পরই সাধুজী যেন পুকারে উঠল—মা!—ধরা গলায় খুব ঠাণ্ডা আওয়াজে বললে—মা!

আমি চমকে উঠে ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম—বাবাসাহেব!

বাবাসাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল বাবুজী। সে কি কান্না কি বলব! সে যেন দরিয়াতে তুফান উঠে গেল!

সেই দিন থেকে সাধুজীর ওই হাল কাটল—আবার একটু একটু ক'রে ভাল হয়ে উঠল। আমি হকিম ডেকে দেখালাম। হকিম তাজ্জব বনে গেল। বললে—এ বেঁচে উঠল কি ক'রে? তাজ্জব কি বাত!

বেঁচে সাধুজী উঠল বাবুজী, লেকিন, দুসরা আদমী হয়ে গেল। বহুৎ চুপ-চাপ। যেন পাগল আর নয়।

আমাকে বললেন—বেটী, আমার যা কুছ সঙ্গীতকে মূলধন আছে—তোকে দিয়ে দি, নিয়ে লে। তবে এক বাত আমাকে দে। এই বাত দে কি কসবীগিরি আর করবি না। এই গানা গেয়ে খাবি। আর রোজ সুবাতে উঠে ভজন করবি।

বাবুজী, গলার আওয়াজ উনকে খারাব হয়ে গিয়ে ছিল। ভাঙা তানপুরার মত। তবু আমাকে ভাঙা গলায় গান উনি শেখালেন।

ওদিকে বাবুজী, আমার মা মোল্লাদের নিয়ে মতলব করলে কি উনকে কলমা পড়াবে। আমাদের বদনামী হচ্ছিল—কি আমরা সাধুজীর সঙ্গে থেকে হিন্দু বনে গিয়েছি।

বাবাসাহেব সমঝালেন। এ রোজ আমাকে বললেন—আমি চল যায়েগা বেটী। ধরম সব কুছ এক হ্যায়। লেকিন যো সাধন আমার উ তো আবি তক পুরা হুয়া নেহি। আব হামকো যানে হোগা। তু হামাকে নিকাল দে হিঁয়াসে। হম চলা যাই।

একটু চুপ করে সোফিয়া বলেছিল—লেকিন বাবুজী, উনকে বচানে নেহি সেকা হম। বাঁচাতে পারি নি বাবুজী—আমার আম্মাজান আর মোল্লারা মিলে তাঁকে জোর করে কলমা পড়িয়েছিল।

আমি তার পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম—কিন্তু তিনি বলেছিলেন—কেঁদো না সোফি। আমার জাত নেই। ধুবড়ীর কাছে আমি মুসলমানবাড়ীতে ছিলাম—তারা খুব ভক্তি করত। তাদের ঘরেই খেয়েছি। থেকেছি। জাত আমার নেই। জাত কারুর যায় না। তবে এ আমার নসীব। জলদি জলদি তু আমার যা দেবার তু নিয়ে নে। আমি চলে যাব।

দু মাহিনা পরে বাবাসাহেব চলে গেলেন। কোথায় গেলেন বলে যান নি।

পাশের ঘরে ব'সে সব শুনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। তাঁর ঘৃণার আর অন্ত ছিল না। শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে যেখানে কথা উল্লেখ করেছেন—সেখানেই তাঁর ঘৃণা ক্রোধ যেন

উপচে পড়েছে।

তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, সুলতা—"আমার ইচ্ছা হয় আমার দেহ চিরিয়া শ্যামাকান্তের যে রক্ত আমার মধ্যে আছে—তাহা নির্গত করিয়া দিই। কিন্তু তাহা মানুষের পক্ষে তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ পাপ-রক্তের প্রভাব হইতে আমারই পরিত্রাণ কোথায়? কি করিয়া জগতে আত্মরক্ষা করিব তাহার কূল-কিনারা দেখিতেছি না।"

সোফিয়া আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্য উঠেছিল। যাবার আগে কয়েকটি কথা হয়েছিল—সেই কথা ক'টি শুনে রত্নেশ্বর বেশী বিচলিত হয়েছিলেন। ভবানী দেবী বলেছিলেন—ডেকে পাঠালে আবার আসবে তো?

তসলিম জানিয়ে সোফি বলেছিল—আমি হুজুরের বাঁদী। যখন ডাকবেন আসব।

—তাঁর খবর পেলে জানাবে?

—খবর? জরুর জানাব। তবে—গোস্তাকি মাফ হলে বলি—

—বল।

—খবর আপনার কাছে আসবে।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভবানী দেবী।

—আপনার জন্যে বাবাসাহেব কাঁদতেন।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ। বোধ হয় তিনি আপনাকেই খুঁজছেন।

এতক্ষণে বীরেশ্বর বললেন—তোমাকে তিনি কি বলেছিলেন, বল।

—বলেছিলেন—হু জু রা ই ন—তাঁর বেটী! পহলে দিন—উনার তসবীর দেখে—ওহি লিয়ে তিনি এমন চীৎকার করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন···হুজুরাইনের মায়ের তসবীর। কিন্তু হুজুরাইনের ছ'টা আঙুল—তাঁর ছ'টা আঙুল ছিল না। আর বলতেন—ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে তাঁর গুনার শেষ হবে না। বলতেন—হুজুর তিনি ঝুটা বাত কখনও বলতেন না। বলতেন—সোফি তুমি আমাকে বল বাবাসাহেব আমি তোমাকে বলি বেটী! তবু কভি কভি দিলের মধ্যে তুফান উঠে যায়। আমার অন্দরে এক শয়তান আছে—সে বলে —কেন? দুনিয়াতে ও হল ঔরৎ আর তুমি হলে মর্দানা। কেঁও বাপ বেটী কেঁও। তার টুঁটি টিপে ধরি। বলি—মর যা—তু মর যা! কিন্তু সে মরে না। ডরকে মারে লুকিয়ে যায়। আবার সুবিস্তা পেলেই বেরিয়ে আসে। ইস সে রেহাই আমার সেই বেটী দিতে পারে। রায়বাবু বলেছে—সে মরে নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—বলতে পার ও কোথায় আছে? সে বেঁচে আছে। আমাকে তাকে খুঁজতে হবে। তার দেখা পেলেই আমার আন্দরের শয়তান মরবে। আমাকে বেটীর মত পিয়ার করতেন। আমার আম্মা এর জন্যে নারাজ ছিলেন। আমাকে একলা পেলে বলতেন এসব কথা। এসব বাত তোকে বেটী বলে বলছি সোফি। আর কাকে বলব? তুই যদি পারিস তো রায়বাবুকে বলিস। দোসরা কাউকে বলিসনে। বলিস—আমি তার কাছে মাফ চাচ্ছি। তবে আমার বেটী—সে সাক্ষাত দেবী।

কথাগুলি শুনে চমকে উঠেছিলেন—রত্নেশ্বর। সন্দেহ তাঁর গোড়া থেকেই হচ্ছিল যে, যে

তান্ত্রিক পাগলাবাবার কথা হচ্ছে, এর সঙ্গে শ্যামাকান্তের সংস্রব আছে। সোফিয়া যখন প্রথম আসে তখন সে সন্দেহ করেছিল বীরেশ্বর রায়ের লালসাকে। তারপর চিঠি দুখানা পড়ে তাঁর এই পরিচিত চেনা পৃথিবী চুরমার হয়ে গেল, তিনি ভাবছিলেন এই বিচিত্র কথা আর শুনছিলেন সোফিয়া বাঈয়ের কথা। প্রায় নিঃসন্দেহই হয়েছিলেন যে, সোফিয়া বিবি যে পাগলাবাবার কথা বলছে, সে-ই হয় তো শ্যামাকান্ত। এবং বীরেশ্বর রায় ও ভবানী দেবী এই প্রয়োজনেই সোফিয়াকে ডেকেছেন। শেষ কথা কটিতে তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন। এই হতভাগ্য ধর্মত্যাগী নারীলোলুপ তান্ত্রিকই শ্যামাকান্ত। তার মাতামহ।

কয়েক মুহূর্তে ভেবে নিয়েছিলেন তিনি। অনেক ভেবেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে ভবানী দেবীকে ডেকে বলেছিলেন—ভালো-মা। মা!

ভবানী তখন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সোফিয়াকে বিদায় দিচ্ছেন। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—রত্ন?

—ওঁকে একটু দাঁড়াতে বল মা।

—দাঁড়াতে বলব?

—হ্যাঁ। বলেই নিজে এগিয়ে গিয়ে সোফিয়াকে সেলাম করে বলেছিলেন—মাতাজী, মেহেরবাণী ক'রে যদি একটু অপেক্ষা করেন। একটু!

সোফিয়া তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল সেই বিয়ের আসরের বীরেশ্বর রায় হুজুরকে।

—আমার কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

সোফিয়া এবার বলেছিল—সাহেবজাদা, তুমি মাতাজী বলে আমাকে সালাম জানালে। বেটা, তোমার উপর আল্লাহতলার মেহেরবানী বর্ষাক। বল বেটা কি বলছ?

—একটু বসতে হবে।

ফিরে এসে বসেছিল সোফিয়া। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আমার বাবুজীর এই বেমার। তা ছাড়া আমার বাবুজীকে তো আপনি যানেন—আমীর মানুষ। গানা বাজানা ওঁর দিলের পিয়ারা চীজ। আপনি ওঁকে দিনের পর দিন গান শুনিয়েছেন। খুশী রেখেছেন। এখন উনি একলা পড়ে থাকেন। ওঁর মেজাজ দিল ঠিক থাকে না। তা আপনার কাছে আমার আর্জি, আপনি যদি—যেমন ওঁকে গান শোনাতেন দিল খুস রাখতেন—তেমনি ভাবে দিন আসেন—থোড়া কুছ গান শোনান—তা হলে বড় ভাল হয়। আমি মাতাজীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। আর আপনি আমার মাতাজীর সমান—আপনি আজ বেকার হয়ে কে কবে মজলিসে গানা বাজানার জন্যে ডাকবে তার জন্যে তাকিয়ে থাকবেন—এতে আমাদের ইজ্জতও যায়। যা তন্‌খা আপনার মিলত—তাই মিলবে! পালকি যাবে। নিয়ে আসবে আপনাকে। আমি আপনার জন্যে মোকাম ঠিক করে দেব। সেই মোকামে থাকবেন। দারোয়ান ভি থাকবে—ক'উকে দিক্ করতে দেবে না!

তাঁর কথা শুনে সোফিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল তাঁর মুখের দিকে। ভবানী দেবী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বলতেও কিছু পারেন নি সোফিয়ার সামনে। নিজের কানকে

তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সোফিয়ার কথা কাশী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল। সে সময় মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর যে সব কথা বলত, তা মনে করে আজকের এই কথার অর্থবোধ তাঁর হয় নি। আজই সোফিয়া এই ঘরে আসবার ঠিক আগেই সে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছে—"ভালো-মা, এইসব অনাচার, এ আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি একে পাপ মনে করছ না?" সেই রত্নেশ্বর এ-কি বলছে?

বীরেশ্বর রায় শুনেই যাচ্ছিলেন, একটি কথাও বলেন নি।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতৃদেব নীরবে সমস্ত শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান। তিনি আমার মনের কথা যথার্থ অনুমান করিলেন এবং কহিলেন—তুমি উত্তম কহিয়াছ। সোফির নিকট আমি ঋণী রহিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহার গান আমাকে পাগল হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছে। আজ প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলে অন্যায় হইবে। এবং জীবনে গীত-বাদ্যের আনন্দের প্রয়োজন আছে। আজ সোফিকে দশজনের মজলিসে গান করিয়া বাঁচিতে হইলে তাহাও এ বাটীর পক্ষে অপমানজনক। সোফি, তুমি বাবুজীর কথা রাখিলে আমি খুবই খুশী হইব। কোন অনুশোচনা থাকিবে না। তোমারও জীবনে সাধু সংস্পর্শে পরিবর্তন হইয়াছে। নিত্য বা 'মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভজন শুনাইবে—উচ্চাঙ্গের গীত শুনাইবে। ইহা আমারই বাসনা।"

ভবানী দেবীকে বোধ করি কোন ইঙ্গিতও করে থাকবেন। তিনিও বলেছিলেন—আমিও খুব খুশী হব সোফিয়া।

সোফিয়া একটু অভিভূত হয়েছিল। সত্যই, শুধু গানবাজনার উপর নির্ভর করার জন্য তার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। চোখে জল এসেছিল তার, সে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে বলেছিল—হুজুরাইন যখন বলেছেন তখন তাই হবে। হুজুরাইন বলেছেন—বাবাসাহেব ছোটা হুজুর বলেছেন—আমি কি তা অমান্য করতে পারি? যেমন বলবেন, তেমনিই হবে।

ভবানী দেবী অন্যরকম বুঝেছিলেন। তিনি সোজা অর্থেই ধরেছিলেন—বীরেশ্বর রায় যা বলেছেন তাই। আজ সোফিয়াকে অর্থের জন্য কষ্ট পেতে হচ্ছে, সুতরাং রায়বাড়ী থেকে মাসোহারার ব্যবস্থা করলে রত্নেশ্বর। বাপের জমিদারী আমীরী ইজ্জত বজায় রাখলে। কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙল। সোফিয়া চলে যেতেই বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিলেন—তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আমি খুব খুশী হ'লাম রত্নেশ্বর। ভালোই করেছ। কথাটা আমার মনেও হচ্ছিল। কিন্তু তোমার মাকে না জানিয়ে, না বুঝিয়ে কথাটা বলি নি।

রত্নেশ্বর স্থিরদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—কথাটা প্রকাশ পেলে রায় বংশের কলঙ্কের আর বাকী থাকবে না।

এবার চমকে উঠেছিলেন ভবানী দেবী। বুঝতে পেরেছিলেন ছেলের মন। তিনি বলে-ছিলেন—আবার চাপা দিবি রত্নেশ্বর? একবার চাপা দিয়ে—

বাধা দিয়ে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ মা, চাপা দিতে হবে। এমন কি এরপর রায় বংশেরও আর কেউ যেন জানতে না পারে—তার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি তো আজ বারো বছর চাপা

দিয়ে এসেছ মা। তুমি তো ওঁকে জানাতে পারো নি। সাধারণ ঘর হ'লে হ'তো মা। রায়-বাড়ী তো তা নয়! কথাটা প্রকাশ পেলে ওই গোপাল সিংয়ের মত লোক দেশময় মুখে মুখে বে-ইজ্জত ক'রে বেড়াবে। মহাভারতের যুগ এটা নয়। তাই বা বলছি কেন? কর্ণের কথাটা ভেবে দেখো।—সারাটা জীবন সূতপুত্র পরিচয়েই থেকে গেলেন—কোন দিন মাকে মা বলতে পেলেন না। মা কুন্তী—তিনিও ছেলেকে ছেলে বলতে পারেন নি। কর্ণের মৃত্যুর পর ছেলেদের বলেছিলেন—কর্ণের তর্পণ করো, উনি তোমাদের বড় ভাই। আজ তাও চলবে না। চাপা দিতেই হবে। উনি মুসলমান হয়েছিলেন—এ প্রকাশ পেলে রায়বাড়ীর ছেলেমেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না।

এছাড়া এর নজীর রায় বংশে তখন সোমেশ্বর রায় স্থাপিত করে গেছেন। যে লোকটা জলমগ্ন পাগলাবাবার সন্ধান করতে গিয়ে ফেরে নি—সে বাঘের পেটে যায় নি—তাকে সরিয়ে ফেলেছিলেন সোমেশ্বর। কারণ, লোকটা কেঁদেছিল।

*   *   *

যাক পাগলাবাবার কথা বলি।

এর ছ মাস পরে একখানা চিঠি এসেছিল নবদ্বীপ থেকে। শ্যামাকান্ত রায়ের শেষ পত্র। নবদ্বীপের 'পোড়া মা' তলায় শ্যামাকান্ত আশ্রয় নিয়েছিলেন। সোফিয়ার বাড়ী থেকে চলে গিয়ে ওই পোড়া মা তলায় পথের ধারে একটা গাছতলায় বাসা বেঁধে জীবনের শেষ ক'দিনে তিনি কি সাধনা করেছিলেন, তা তিনি বলতে পারেন। সাধনার ক্রিয়াকর্ম কেউ কিছু দেখে নি। তবে ওই আধপাগলের মত মানুষটি বসে থাকতেন। কেউ দিলে খেতেন, না দিলে খেতেন না। মাত্র ভোরে একবার তাকে গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেতো। ঘাট থেকে স্নান করে ফিরতেন। গঙ্গার ঘাটে যাওয়া কেউ বড় একটা দেখে নি।

যে লোক চিঠি নিয়ে এসেছিল—সে সাধারণ সামান্য লোক। চিঠি দিয়ে বলেছিল—আজ্ঞে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। না গেলে হয়তো দেখা হবে না।

সুরেশ্বর বললে—চিঠিখানার কথা বলেছি তোমাকে, সুলতা। সাধারণ সুস্থ মানুষের লেখা বলেই মনে হয়।

তিনি তখন সুস্থও হয়েছিলেন। চিঠিখানা পড়ে মনে হয় তিনি যেন ভবানী দেবীর ফেরার কথাও জানতেন।

তখন বিমলাকান্ত কলকাতায় এসেছেন। কাশীর চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছেন। সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেন নি; তবে টাকা তিনি কয়েক হাজার নিয়েছেন। টাকাটা বিমলা দেবীর নামে বিষয়ে খাটছিল। কলকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করেছেন। তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে যান নি।

গিয়েছিলেন ওঁরা পাঁচজন। বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, বিমলাকান্ত, মহেশচন্দ্র আর সোফিয়া। রত্নেশ্বর রায় যান নি। যাবার তাঁর উপায় ছিল না। তিনি তখন মামলার আসামী। রাধানগরে দে-সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি পড়েছিল। ডাকাতেরা টাকা-কড়ি বিশেষ নিতে পারে নি, তবে দে-সরকারকে নির্মমভাবে মারধর করে ডান হাতখানা ভেঙে দিয়েছে, আর

বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। কুঠীয়াল জন রবিনসন তখন নেই। সে খুন হয়েছে—তার নিজের লোকের হাতে।—একজন ফিরিঙ্গী এসে তার কাছে চাকরি নিয়েছিল। দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত লোক, রবিনসন সাহেবের নামডাক শুনে এসেছিল। ইংরেজ ফিরিঙ্গী নয়। পোর্টুগীজ ফিরিঙ্গী।

তখন শ্যামনগরের প্রজাদের জোট জমাট বেঁধেছে। তারা ধর্মঘট পেতে দে-সরকারদের খাজনা বন্ধ করেছে। রবিনসন সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করছে। একেবারে সোজা আইন-আদালতের পথ। তার জন্য তদ্বির-তদারক মামলা পরিচালনা করছে কীর্তিহাটের এস্টেটের কর্মচারীরা। বিমলাকান্তের বাড়ীতে বিমলাকান্তের নামের আড়ালে তাদের সেরেস্তা বসেছে। পাইক-লাঠিয়াল আছে। বিচক্ষণ মামলাবাজ গোমস্তা আছে। ওদিকে হুগলীতে একটা বাড়ী কিনে সেখানে আর একদফা সেরেস্তা। সেখানে একজন নীল-কুঠীর পুরনো কর্মচারীকে মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল করা হয়েছে। হুগলীর সব থেকে বড় উকিলকে নিযুক্ত করা আছে। সাব-ডিভিশন আরামবাগে আর একদফা সেরেস্তা।

এসব হয়েছে দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের পাতা ছক অনুযায়ী। তবে খেলে যাচ্ছেন রত্নেশ্বর রায়।

পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আচার্য বলেন—মার খেয়ে যাও ভাই। কিস্তী দিক, তুমি ঢেকে দিয়ে চল। সময় হলে উঠকিস্তী, পরকিস্তী একসঙ্গে হবে।

দে-সরকারদের বাকি খাজনার মামলা চলছে; মামলার সমন আসছে কিন্তু জারী হচ্ছে না। প্রজাকে পায় না। বাড়ীতে লটকে জারী করবে তার সাক্ষী মেলে না। তারপর সমন জারী হলে নানান বিচিত্র আপত্তি পড়ছে। সিধে সরল বাকি খাজনার মামলা—চলছে তো চলছেই। অবশেষে ডিগ্রী হচ্ছে। ওদিকে মুন্সেফকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সদরে আপীল হচ্ছে। সমস্ত যুগলপুর লাটে শ-পাঁচেক জমা।

সুরেশ্বর বললে—জমা বুঝতে পারছ সুলতা?

হেসে সুলতা বললে—টেনেন্সী বলছ তো! তা জানি।

—হ্যাঁ টেনেন্সী জান, তা জানি, কিন্তু ওর এদেশী নাম জমা। তাই বলছি। এই ধরো না সন-তারিখের মত। আজ কোন্ তারিখ কোন্ সাল জিজ্ঞাসা করলে আমিও বলব, তুমিও বলবে—আজ পঁচিশে নভেম্বর নাইন্টিন ফিফ্‌টি-থ্রি, বাংলা সনটি যদি বা সাত বছর যোগ করে, ছ'শো বছর বাদ দিয়ে তেরশো ষাট সালের হদিস করতে পারি, তবু তারিখটা কোনমতেই বলতে পারব না। জমা বলতে ক্রেডিট কথাটাই মনে পড়বে।

—মেনে নিলাম। এখন বল—রত্নেশ্বর রায়ের কথাটা বল। রত্নেশ্বর রায় জমিদারীতে বসেই ফৌজদারী মামলার আসামী কেন হলেন, সেইটেই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তুমি বলছিলে রত্নেশ্বর রায় রায়বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে খুন করিয়েছিলেন। আবার বলছ—জমিদারী গদিতে ছ'মাস বসতে না বসতে ফৌজদারী মামলার আসামী হলেন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষের সংজ্ঞাটির জন্যে কৌতূহলের আমার শেষ নেই।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ সুলতা, আমার বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ রায়বংশে। বীরেশ্বর রায়

পথনির্দেশ করছেন, আচার্য দেওয়ান তাঁর পাশে পাশে চলছেন, শেখাচ্ছেন লড়তে হবে, লড়াই ছাড়া রাজত্ব চলে না। এবং লড়তে হলে লড়বে শক্তের সঙ্গে, সবলের সঙ্গে। তাতে যেমন চাই শক্তি এবং সাহস, তেমনি চাই বুদ্ধি এবং কৌশল। একটা কথা এই সঙ্গে বলে নিই—বীরেশ্বর রায় যে পালোয়ান রেখেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর হুকুমে রত্নেশ্বর রায়কে কুস্তী করতে হয়, প্যাঁচ শিখতে হয়। ঘোড়ায় চড়তে হয়।

ওই প্রথম দিনই যে হজরৎপুরের পিক্রুজ একজন পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে নিয়ে এসেছিল, সেই লোকটা পিক্রুজের কাজিন। কস্টেলো পিক্রুজ। গোয়ার লোক। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসত। থাকত। এই লোকই রবিনসনের কাছে গিয়ে কাজ নিয়েছিল। কিছুদিন সাহেবের হুকুম তালিম করে সাহেবের সঙ্গে শীকার খেলে প্রিয়পাত্র হয়ে হয়ে উঠেছিল তার। হঠাৎ তার কাছে এল হজরতপুরের পিক্রুজ, একটি মেয়েকে নিয়ে। ফিরিঙ্গী মেয়ে—কটা চোখ, কটা চুল, কটা রঙ এবং খানিকটা বর্বরা। হজরতপুরের পিক্রুজের সৎবোন ; গোয়ার ফিরিঙ্গী পিক্রুজের বাক্‌দত্তা বধূ। নাম তার মার্থা।

এ সবটাই সুকৌশলে সাজানো বাঘশীকারের 'বেইটে'র মত। বাঘ ঠিক এল, শিকারীর লক্ষ্য অব্যর্থ, বাঘ ম'ল।

রবিনসন একদিন ফিরিঙ্গী পিক্রুজের অনুপস্থিতিতে মার্থার ঘরে ঢুকল। মার্থা চীৎকার করলে। তার সঙ্গে লড়াই করলে। অথচ সেই তাকে ইসারায় ডেকেছিল। পিক্রুজ ছুটে এল। লাফ দিয়ে পড়ল রবিনসনের ঘাড়ে, এবং তাকে শেষ করে দিয়ে চলে গেল মার্থাকে নিয়ে ; গঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে।

পুলিশের হুলিয়া হ'ল—মার্থাকে তারা পেলে, কিন্তু ফিরিঙ্গী পিক্রুজকে পাওয়া গেল না।

পোর্টুগালে যাওয়ার জাহাজের টিকিট কেনার দাম খরচ পড়ে আছে রায়বাড়ীর খাতায়। একটা মোটা টাকাও খরচ পাওয়া যায় দাতব্য খাতে। কাকে কি বৃত্তান্ত তা লেখা নেই।

এটা ঘটল তিন মাসের মাথায়। মার্থা জবানবন্দী দিলে। সাহেব পিক্রুজের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল, সে চীৎকার করে উঠেছিল। কস্টেলো পিক্রুজ কোথায় ছিল—সে ছুটে এসে সাহেবকে আক্রমণ করে। সাহেবও তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু পিক্রুজ গোড়াতেই পড়েছিল তার ঘাড়ে। সে তাকে ছুরি মেরে তাকে অর্থাৎ মার্থাকে নিয়ে পালায়। শ্যামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতায় মার্থাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই সে যে কোথায় চলে গেছে মার্থা তা জানে না।

মার্থার পক্ষে বড় কাউন্সেল নিযুক্ত করেছিল হজরতপুরের পিক্রুজ। ব্যাপারটা সাদা চামড়া আর কটা চামড়ায় বলে খুব বেশীদূর এগোয় নি। মার্থার কাউন্সেলও ছিল একজন খাস বিলিতী সাহেব। রবিনসনের ইতিহাসটাও নারী সম্পর্কিত ব্যাপারে খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। এর আগে একটি ব্রাত্য নারীহত্যার অভিযোগ হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। মামলাতে তার কিছু হয় নি। কিন্তু প্রথম কুঠী তার ফেল পড়েছিল এইজন্যে। সুতরাং কোনক্রমেই রায়বাড়ীর জমা-খরচের খাতা পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে পুলিশের মনে হয় নি।

তাছাড়া রায়বাড়ীর হাতে আর একটা জোরালো প্রমাণ ছিল রবিনসনের বিরুদ্ধে খার বাবদ

বিশ হাজার টাকার একটা ডিগ্রী। যেটা উত্তরাধিকারী অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রহীন রবিনসনের মৃত্যুতে প্রায় দিকভ্রান্ত হয়েছিল জারীর পথে। রবিনসনের উত্তরাধিকারী স্থির না হওয়া পর্যন্ত ডিগ্রী জারী স্থগিত রাখতে হয়েছিল। মৃতের উপর জারী হবে ডিগ্রী, নয় তার উত্তরাধিকারীর উপর। সুতরাং রবিনসনের মৃত্যুতে রায়বাড়ীর সমূহ ক্ষতি। তবে তা দেখাতে হয় নি। বলেছি তো এ-পথেই হাঁটে নি পুলিশ।

তারপরই মাসখানেক পর দে-সরকারদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, মারধর ক'রে তার ঘর জ্বালিয়ে দিলে। দে-সরকারের ডান হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিলে। জ্বলন্ত মশালের বাড়ি মেরে সারা মুখখানা ছিঁচকে পোড়া করে দিয়ে গেল।

দে-সরকার এজাহারে পুলিশের কাছে বললেন—তিনি দেখেছেন, কমলাকান্ত ভট্চাজকে একটু দূরে বাড়ীর ফটকের সামনে তাকে ঘোড়ার উপর দেখেছেন।

সুরেশ্বর বললে—সব দেশের জমিদারীতেই বোধ হয় আছে। তবে বাংলাদেশের জমিদারীর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা অনেকগুলিই আছে। দু-একটা ঘটনা গল্প হয়ে আজও চলিত আছে মুখে-মুখে। জমিদারী চালনায় এগুলি সে-আমলের সিংহকীর্তি। অন্তত, তাই লোকে বলত, সমাজে মানত।

মুসলমান আমলে কাজী ছিল, বিচারও ছিল, কিন্তু ইংরেজের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড ছিল না। প্রজার কাছে খাজনা আদায়ের জন্য হপতম পঞ্চম আইন করেছিল কোম্পানী কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমিদারদের মুখে পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আট-ঘোড়ার গাড়ীতে ক্রিমিন্যাল আইনের কাঁটা-লাগানো লাগাম পরিয়ে দস্তুরমত পোষা আরবী ঘোড়ায় পরিণত করেছিল। হপতম পঞ্চম তুলে দিয়ে সিভিল স্যুটের মুন্সেফী আদালত দেখিয়ে দিয়েছিল। এবং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড চালু করে জমিদার-প্রজাকে এক গোয়ালে পুরেছিল। তবু তারা এই কাঁটা-লাগাম ছিঁড়ে দুর্দান্তপনা করছে ইচ্ছামত।

একটা ঘটনার কথা বলি—হেস্টিংস সাহেবের প্রিয়পাত্র কান্ত প্রথম হলেন বাবু তারপর রাজা। বহু লক্ষ টাকা আয়। কান্তবাবুর চতুর্থ পুরুষ কৃষ্ণনাথ। নাবালক অবস্থায় মালিক হয়েছিলেন বিষয়ের। স্টেট গিয়েছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডসে। কৃষ্ণনাথকে খাসা ইংরিজী শিখিয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাঁকে রাজার মেজাজ তৈরী করে দিয়েছিলেন। প্রচুর মদ্য, হৈ-হল্লা, ইয়ার-বন্ধু, কুকুর-বন্দুক-পিস্তল এসব দিয়ে রাজত্বের খেলাঘর সাজিয়ে দিতে কসুর করেন নি। তার সঙ্গে রাজোচিত পোশাক এবং ডেকরেশন। তরুণ কৃষ্ণনাথ দিলদরিয়া লোক, তেমনি মেজাজ। একবার বাড়ীতে যাত্রাগান হচ্ছে। উনি অবশ্য দেখছিলেন না। উনি বাইরে প্রমোদভবনে ছিলেন। সেখান থেকে রিটায়ারিং টাইমে অন্দরে যাচ্ছেন। সঙ্গে চোপদার চলেছে, মশালচি চলেছে। যাবার পথ ওই আসরের পাশ দিয়ে। আসরে তখন নারদমুনি হরিগুণগান করছেন। রাজার রঙদার চোখে সাদা চুল-দাড়ি পরা মুনিকে খুব ভাল লাগল। চোপদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—কৌন হ্যায় উয়ো ?

চোপদার বললে—নারদমুনি হুজুর !

—নারদমুনি ? আচ্ছা। উ তো আচ্ছা আদমী হ্যায়। বলে ঘুরলেন। কুর্শী আনিয়ে

সব লোকের সামনে বসলেন এবং হুকুম করলেন—আউর এক নারদমুনি লাও!

অধিকারী সন্ত্রস্ত, ছুটে সাজঘরে গিয়ে আর একজনকে পাকা চুল-দাড়ি পরিয়ে নিয়ে আসরে নামালেন।

হুকুম—আউর লাও। আউর লাও।

শেষ পর্যন্তও দশ-বারোজন লোক—মেয়েদের চুলে সফেদা মাখিয়ে সাদা করে পরিয়ে আসরে এনে নামিয়ে দিলে। রাজা খুব খুশী হয়ে একশো টাকা ইনাম দিয়ে চলে গেলেন।

এই কৃষ্ণনাথের হাতের হাজার-পাঁচেক টাকা দামের আংটি চুরি গেল, সন্দেহ হল চাকরের উপর। সুতরাং তাকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু ভুলে গেলেন ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড অনুযায়ী ও-অধিকার তাঁর নেই। এমন প্রহার করলেন যে, চাকরটা মরে গেল।

বহরমপুরের এস ডি ও খুশী ছিলেন না মহারাজ কৃষ্ণনাথের উপর। লোকটিও ছিলেন গণ্যমান্য বংশের। কিন্তু সে-খাতির কৃষ্ণনাথ করতেন না। তিনি ওয়ারেণ্ট বের করলেন; কৃষ্ণনাথ তার আগে কলকাতা পালালেন। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে কলকাতা তার কেল্লা নয়। মুসলমান আমলে রাজাদের মাটির কেল্লাগুলোর পাঁচিল আর ফটক সব ভেঙে দিয়েছে কোম্পানী। কলকাতাতে কোম্পানীর খাস ডেরা। কোথায় যাবেন? কৃষ্ণনাথ যে-খেলনাটা পেয়েছিলেন কোম্পানীর কাছে—পিস্তল—গ্রেপ্তারের ভয়ে সেই পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

তবু বাংলা দেশের জমিদারেরা হটেন নি। সুচতুর ভাবে আইনের সুঁচের সুতোর ছিদ্র দিয়ে উটে চড়ে পার হয়ে যেতেন।

রবিনসনের পর দে-সরকার। গোপাল সিংহের পর্ব শুরু হয়ে গেছে তখন। মামলা-মোকদ্দমা চলছে তখন। বাঘ-নেকড়ে মারার পথ আর ইঁদুর ধরা কি মারার পথ এক নয়। দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের এক-খানা পত্র আছে। তিনি রবিনসনের মৃত্যুর পর কীর্তিহাট থেকে লিখেছিলেন কলকাতায়। লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। আচার্য বীরেশ্বর রায় এবং রত্নেশ্বরকে কলকাতার রেখে চলে এসেছিলেন কীর্তিহাট। হজরতপুরের পিক্রুস মারফৎ ওই কস্টেলো পিক্রুসকে তিনিই নৌকো করে হজরতপুর পর্যন্ত এনে নামিয়ে দিয়েছিলেন। কস্টেলো ওখান থেকেই ফিরে গিয়ে উঠেছিল শ্যামনগরে। চাকরি নিয়েছিল রবিনসনের। কস্টেলো পিক্রুস উধাও হয়ে গেল তার কাজ সেরে, খবর পেয়ে দেওয়ান জানালেন—"যে পাপ-বৃক্ষটির কাণ্ড কায়স্থ এবং তস্য শাখা ফিরিঙ্গী, তাহার শাখাটি ছেদিত হইয়াছে। অতঃপর কাণ্ডটির ব্যবস্থা হইতেছে। এই বৃক্ষে ছত্রি মূষিকটি আশ্রয় লইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে গর্তে আশ্রয় লইতে হইবে। চিন্তা করিবেন না, সকল ব্যবস্থাই হইতেছে। তবে এক্ষণে বাবু রত্নেশ্বর ভায়াজীবনকে লইয়া এখানে আসা প্রয়োজন। ইস্কুল পত্তনের যে আয়োজন হইতেছে, ওই আয়োজনের খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এখানে আনয়ন করিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হউক। তাহাতে বিশেষ সুফল ফলিবে বলিয়া মনে করি। আমি উক্ত রাত্রেই কাণ্ড ছেদন করাইব।"

* * *

সুরেশ্বর বললে—হয়তো কুটিলতম রাজনীতির খেলা খেলেছিলেন দেওয়ান। নবাব-বাদশার

দরবার হলে ইতিহাসে এ-ঘটনা পড়ে বিস্মিত হ'ত লোকে।

ব্যবস্থা হয়েছিল—ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মেদিনীপুরের কালেক্টরসাহেব বাহাদুর; সন্ধ্যায় উৎসব হবে। নৃত্য-গীত এবং উচ্চাঙ্গসঙ্গীত।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে বীরেশ্বর-রত্নেশ্বর হাজির থাকবেন। ওদিকে সেই রাত্রে শ্যামনগরে দে-সরকারের বাড়ীতে পড়বে ডাকাত। শুধু আগুন দিলে কাজটা সোজা হত, কিন্তু তাতে শ্যামনগরের লোকের উপর সন্দেহ পড়তে পাবে। সেইজন্যে হবে ডাকাতি, যার উদ্দেশ্যটা হবে লুঠতরাজ। প্রতিহিংসা প্রতিশোধ বলে চালানো যাবে না।

ঘটনার কয়েকদিন আগে একটা ফৌজদারী হয়েছিল গোপাল সিংহের সঙ্গে। সামান্য ঘটনা নিয়ে ফৌজদারী। ইঁদুর গোপাল সিং তখন মামলায়-মামলায় উত্ত্যক্ত। শ্যামনগরে বিমলাকান্তের একজন পাইক রাধানগর গিয়ে সামান্য কথায় খপ করে চেপে ধরেছিল গোপাল সিংয়ের হাত; গোপাল তাকে ঘায়েল করে বসল। এবং ঘায়েল করে তার হুঁশ হল—সে পুলিশ কেসে পড়েছে। সে হ'ল ফেরার।

রাধানগরে দে-সরকারের তখন সেই ছিল ভরসা। গোপাল পালাল পুলিশের ভয়ে। নির্বান্ধব দে-সরকার সারারাত্রি মালা জপ করে গোবিন্দ ভরসা করে দিনযাপন করছিলেন।

আচার্য এ-কার্য সমাধা করবার জন্য লোক এনেছিলেন দক্ষিণ কাঁথি অঞ্চল থেকে। বাংলাদেশে এমন দল তখন অনেক ছিল। যারা চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত। বিশু ডাকাতের নাম জান। বিশ্বনাথ ঘোষ ডাকাতি করতেন বড় বড় বাড়ীতে, অনেক নীলকুঠিও লুঠেছেন। লোকে বলত বিশুবাবু। কোম্পানী সোজা পথে তাকে ধরতে পারে নি। দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েছিলেন। হাণ্টারসাহেব লিখে গেছেন—

Biswanath Babu exercised his vocation in broad daylight, sending previous notices of his designs to those he intended to plunder."

বিশুবাবুর মত মহৎ ডাকাত চিরকাল দুর্লভ কিন্তু এই ধরনের দুঃসাহস অনেক দলের তখন ছিল। এত বড় একটা জমিদারপক্ষ সহায় পেয়ে তারা দে-সরকারের মত কৃপণ জমিদার-মহাজনের বাড়ী লুঠতে, জ্বালাতে, বলতে গেলে এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। ছকা ব্যবস্থা। তারা হানা দেবে, হৈ-হৈ করে ঘাঁটি পাতবে। শ্যামনগরের লোকে উঠবে, সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে নিজেদের এলাকায়।

গ্রামের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে ডাকাতি-চুরি হয় না। এক্ষেত্রে তার অভাব হয় নি, দে-সরকার বাড়ীর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ তারা পেয়েছিল। রাত্রি দুপুরের পর ডাকাতের দল—সে প্রচণ্ড চীৎকার করে মশাল জ্বালিয়ে হানা দিয়ে পড়ল, তখন কান্না উঠল দে-সরকারের অন্দরে, কিন্তু সে চীৎকার মানুষ সাড়া তো দেয়ই নি, দে-সরকারের ভগবানও সাড়া দেন নি। ডাকাতদের তিনজন এসেছিল ঘোড়ায় চেপে।

মেয়েদের উপর ডাকাতেরা নির্যাতন করে নি। তারা গায়ের গহনা খুলে দিয়েছিল হুকুমমত। কিন্তু দে-সরকারের ছেলে এবং দে-সরকারকে বাইরে টেনে এনে জলন্ত মশাল দিয়ে পিটে ছিঁচকা পোড়া করে দিয়েছিল। এবং ভেঙে দিয়েছিল একখানা হাত। তবু দে-সরকারকে

বাহাদুরি দিতে হবে। টাকা কোথায় আছে তিনি বলেন নি। ছেলে একটা জায়গা জানত, সেটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

এই সময়েই ফটকের বাইরে ঘোড়ার উপর দেখা গিয়েছিল তরুণ রত্নেশ্বর রায়কে। মাথায় পাগড়ি, মুখে একটা ফেটা বাঁধা, পরনে ব্রিচেস কোট—

তিনি ডেকে বলেছিলেন—প্রাণে মেরো না। পোড়ামুখ নিয়ে বাঁচতে দাও।

তারপর আর তাঁকে কেউ দেখে নি।

এ-কাজটি রত্নেশ্বর নিজের মতে ও বুদ্ধিতে করেছিলেন। বীরেশ্বর রায়কে বলেন নি। এমন কি দেওয়ান আচার্যও সময়ে জানতে পারেন নি। তবে রত্নেশ্বর শক্ত করে ঘাঁটি বেঁধে কাজ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় এবং আচার্য দেওয়ান ডাকাতির দিন ইস্কুলের ভিত্তিস্থাপনের ব্যবস্থা এবং রাত্রে নৃত্য-গীত এবং বৈঠকী গানের ব্যবস্থা করেছিলেন 'এ্যালিবি' রাখবার জন্যে। ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরা উপস্থিন থাকবেন। তাঁরা নিশ্চয় বলবেন—সে কি? আমরা সেখানে সে-রাত্রে উপস্থিত—কীর্তিহাটে। সারাদিন সেখানে ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান, রাত্রে উৎসব। তাঁরা ডাকাতি করাচ্ছেন সেই রাত্রে—এ কি করে সম্ভবপর হতে পারে?

রত্নেশ্বর এই সুযোগ নিলেন।

তিনি মজলিসে সাহেবদের আপ্যায়ন করছিলেন। ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সোফিয়া বাঈয়ের বৈঠকী গান সবে শেষ হয়েছে। সোফিয়া বাঈ সন্ধ্যায় বসে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক তার অপরূপ গানে মজলিশকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর গানের পর আসরে উঠে দাঁড়িয়েছিল দুজন তরুণী খেমটাওয়ালী। বাছাই করে কলকাতার সেরা খেমটাওয়ালী আনা হয়েছিল। রূপে, কণ্ঠস্বরে, নৃত্যদক্ষতায় তারা অপরূপা। ঠিক এই সময় বাপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি অবসন্নের মত বসে পড়েছিলেন।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়, তাঁর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং অন্যান্য অতিথিরাও উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন নি। গোটা আসরটাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রায়বংশের উত্তরাধিকারী —এমন সুন্দর সুপুরুষ মার্জিতরুচি তরুণটির প্রতি দৃষ্টি সকলেরই আকৃষ্ট হয়েছিল। বীরেশ্বর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে রত্নেশ্বরের হাত ধরে বলেছিলেন—কি হল, রত্নেশ্বর?

—মাথা ধরেছে, তার উপর হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

বীরেশ্বর তাকে হাতে ধরে তুলে একখানা আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। একজন পাংখা-বরদার একখানা ছোট হাতপাখা নিয়ে তাঁর মাথায় হাওয়া করতে শুরু করেছিল। একজন এনেছিল গোলাপজলের বোতল। রত্নেশ্বর হাতে মাথা ধরে কিছুক্ষণ বসে থেকে হেসে বলেছিলেন সাহেবকে—I am very sorry sir that I have disturbed the whole show.

—Are you alright now?

কাঁচুমাচু করে রত্নেশ্বর রায় বলেছিলেন—সুস্থ হয়েছি অনেকটা, তবে ঠিক সম্পূর্ণ সুস্থ হই নি। যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একটু বিশ্রাম করি গিয়ে। আমার একটা শিরঃপীড়া

আছে, তাতে অনেক সময় প্রায় অজ্ঞানের মত পড়ে থাকি। তবে ভয়ের কিছু নেই।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর বাপকে বলেছিলেন—একটুও চিন্তা করবেন না আপনি। আপনি বসুন। আমি একটু শোব।

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে বলেছিলেন—কেউ যেন আমাকে না ডাকে। ভবানী দেবী পূজায় ছিলেন। পূজা সেরে উঠে এসে ছেলেকে আর পান নি। পেয়েছিলেন একটা চিরকুট। তাতে লেখা ছিল—আজ আতসবাজী পুড়বে আমি দেখতে যাচ্ছি। বাবা আর দেওয়ানজী ছাড়া কাউকে বলো না। কোন ভয় নেই। ভোর হবার আগেই ফিরব।

গোপনে তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। দু'জন সওয়ার বরকন্দাজ এবং সঙ্গে একটা বাড়তি ঘোড়াও তিনি নিয়েছিলেন।

শ্যামনগরের পথ দুটো, একটা নদীর পথ। সেটা অনেক ঘুরপথ। একটা ত্রিভুজের দুটো বাহুর মত কাঁসাই আর ভাগীরথী ধরে এক নদীপথ, অন্যটা ত্রিভুজের কর্ণের মত একটা স্থলপথ। কিন্তু দুর্গম। এই পথটাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। নদীপার ছিল পথে, সেখানেও বন্দোবস্ত তিনি করে রেখেছিলেন—পারের নৌকা অপেক্ষা করছিল। মাইল-তিরিশেক পথ, মাঝে কুতুবপুরের কাছারী। সেখানে ঘোড়া বদল করে নিয়ে উঠেছিলেন শ্যামনগর, ডাকাতি তখন চলছে, মশাল দিয়ে পিটছে কর্তা দে-সরকারকে।

তিনি গিয়ে ডেকে বলেছিলেন—প্রাণে মেরো না। ছিঁচকেপোড়া মুখে নিয়ে বেঁচে থাকতে দাও।

তিনি আসবেন এ-খবরটা কাজের কাজী যারা তারা জানত, বলা ছিল। তারা তাঁকে ঘাঁটিতে ঢুকতে আটকায় নি।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরেছিলেন। দু'দিকে ষাট মাইল পথ। যেতে-আসতে ঘণ্টা-আষ্টেক লেগেছিল। কীর্তিহাটে যখন ফিরেছিলেন, তখন বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, দেওয়ান আচার্য জেগে পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

ভবানী দেবী তিরস্কারের আর বাকি রাখেন নি। বীরেশ্বর রায় গম্ভীরমুখে স্তব্ধ হয়ে বসে-ছিলেন। আচার্য হাঁফ ছেড়ে কয়েকবার মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন—বড্ড ছেলেমানুষী করেছ দাদুসাহেব। বড্ড ছেলেমানুষী। না-না-না, আমাদের না জানিয়ে এরকম ভাবে—না-না-না।

তবে পরে একান্তে তাকে বলেছিলেন—সাবাস দাদুসাহেব। তুমি যা করলে—এ একটা দেখালে বটে। হ্যাঁ, বুকের পাটা আছে তোমার। বুদ্ধিও খেলিয়েছ বটে। সাবাস, সাবাস! তবে এরকম আর করো না।

একটু ভেবে বলেছিলেন—তবে ভাই কাল সকালেই তোমাকে কলকাতা চালান করব সাহেবদের সামনে। রাত্রে অসুখ বেড়েছে, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে। বুঝেছ?

হেসে রত্নেশ্বর বলেছিল—ঠিক আছে, আমি তৈরী।

—কষ্ট হবে না তো! সারারাত্রি তিরিশ কোশ ঘোড়া হাঁকিয়েছ।

—না। বলেন তো কালই নমুনা দেখিয়ে দিতে পারি।

—থাক। তাতে আর কাজ নেই।

পরের দিনই সাহেবদের বিদায় দিয়ে বীরেশ্বর রায় ছেলেকে নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুশী হয়ে বলেছিলেন—স্কুলটা তাড়াতাড়ি শেষ কর মিস্টার রায়। স্কুলের ফাউণ্ডেশন আমি পত্তন করলাম। ওপনিং দেখে যেতে চাই। এবং আমার ইচ্ছে আমিই সেটা করি।

বিদায়ের সময় রুপোর রেকাবীর উপর পঁচিশখানা মোহর সবিনয়ে তুলে ধরেছিলেন বীরেশ্বর, সাহেব সকলের সামনেই রেকাবখানাসমেত, সেটা নিয়ে দিয়েছিলেন আর্দালীর হাতে। তাছাড়া রুপোর কর্ণি এবং আরও অনেক উপহার ছিল, অন্য সাহেবরাও বাদ যান নি। সকলেই সেলামী নিয়ে রায়বাবুর সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই রত্নেশ্বরের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। রত্নেশ্বর অসুস্থ এবং রাত্রে অসুখ বেড়েছে এ-কথাটা আচার্য এসে প্রথমেই জানিয়েছিলেন সাহেবদের। বিবিমহলে এসে সকালবেলাতেই সাহেবের সঙ্গের কেরানীকে বলেছিলেন—হুজুরকে একটু বলে দেবেন, কর্তার আসতে একটু হয়তো দেরি হবে। রত্নেশ্বরবাবুর অসুখটা বেড়েছে। ডক্তোর-কবিরাজে বলছে—সাধারণ শিরঃপীড়া নয়, একটু জটিল মনে হচ্ছে। বলছে—কলকাতায় নিয়ে যাওয়া ভাল।

কথাটা কেরানী যথাসময়ে পেশ করেছিল হুজুরের সামনে, এবং তার মিনিট-কয়েকের মধ্যেই বীরেশ্বর রায় এসে হাজির হয়ে দেবীর জন্য বিরক্তি জন্মাবার পূর্বেই দেবীর জন্য মার্জনাভিক্ষা করেছিলেন।

সন্ধ্যার মুখে বজরা রওনা হয়েছিল কলকাতা।

কলকাতায় এসেও রত্নেশ্বর বড় সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। রত্নেশ্বরের শিরঃপীড়া—অহরহ যন্ত্রণা। ডাক্তার রোজ আসছেন, দেখছেন, মোটা ফি নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রে কোন দিক থেকে কোন হদিস পাচ্ছেন না। ওষুধ আসে, ফেলে দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় হুগলী থেকে এল পুলিশের পরোয়ানা। দে-সরকারের বাড়ীর ডাকাতির সময় রত্নেশ্বর রায়কে নিজে দেখেছেন—মাথায় পাগড়ি এবং মুখে ফেটা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও চিনেছেন বলে এজাহার করেছেন দে-সরকার এবং তাঁর ছেলে।

সুরেশ্বর বললে—একটা গল্প বোধ হয় তুমিও শুনেছ সুলতা; এক ব্রাহ্মণ বিধবার বাড়ীতে কি একটা পুজো ছিল। ষষ্ঠী পুজো কি সত্যনারায়ণ ধরনের কিছু। কিন্তু বুড়ী পুজুরী না-পেয়ে গঙ্গারঘাট গেছল পুরুতের সন্ধানে। হাইকোর্টের জজ সার গুরুদাস গঙ্গাস্নান সেরে ঘাটে উঠেছেন, বুড়ী তাঁকে গিয়ে ধরেছিল—ও বাবাঠাকুর, আমার এই পুজো দয়া ক'রে করে দাও। তা সার গুরুদাস বামুন হিসেবে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নি। বুড়ীর বাড়ী গিয়ে পুজো করে দিয়েছিলেন। বুড়ী তাকে বলেছিল—বাবা তুমি দারোগা হয়ো।

তার অর্থ টা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এখানে মেদিনীপুরের সাহেবরা সেলামীর চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন। রূপোর থালাসুদ্ধ মোহরগুলো পকেটে পুরেছিলেন।

সুতরাং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের 'এলিবি'র সূচীছিদ্র দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে গেলেন রত্নেশ্বর। তার উপর সার্টিফিকেট ছিল কলকাতার সাহেব-ডাক্তারের। একটি কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত বাবু রত্নেশ্বর রায় তাঁর চিকিৎসাধীনে রয়েছে। তাকে স্থানান্তরিত করা এখন অতীব বিপজ্জনক। আচার্য দেওয়ান মোটা জামীন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওদিকে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লোক ছুটেছিল চিঠির জন্য। রত্নেশ্বর রায় ঘটনার তারিখে সমস্ত দিন তাঁর চোখের সামনে ছিলেন এবং অত্যধিক পরিশ্রম করেছিলেন, যার ফলে সন্ধ্যার পর সম্ভবতঃ নটা নাগাদ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রত্নেশ্বর রায়ের অসুখ বৃদ্ধি পায় এবং ঐদিনই চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়। এ সমস্তই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে।

বাবু রত্নেশ্বর রায়কে ওই তারিখের কোন ঘটনার জন্য দায়ী করা অসম্ভব। এবং তাঁর মত একজন উচ্চশিক্ষিত মার্জিতরুচি তরুণ যুবকের পক্ষে এমন কাজ কখনও সম্ভবপর নয়।

যে ব্যক্তি এমন কথা বলেছে সে আক্রোশবশতঃ মনের ভুলেই চোখে ছায়াবাজীর মত কিছু দেখেছে। অথবা ইচ্ছাকৃত আক্রোশবশতঃই এমন কথা বলেছে।

এই চিঠিতেই রত্নেশ্বর রায় সব দায় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

পাগলাবাবার চিঠি নিয়ে লোক এসেছিল এরই মধ্যে। তখনও রত্নেশ্বর আদালত থেকে দস্তুরমত নথিপত্রে লিখিতভাবে খালাস পান নি। তিনি কলকাতাতেই শয্যাশায়ী হিসেবে ঘরের মধ্যে সেরেস্তাখানা পেতে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ বুঝছেন। সুতরাং তাঁর যাওয়া হ'ল না।

আইনের এই দায়ের বন্ধনে বাঁধা না থাকলে এই যাওয়া নিয়ে হয়তো সমস্যা দাঁড়াত। রত্নেশ্বর রায় যেতে চাইতেন না। এ নিয়ে একটা সংঘর্ষ বাধাও বিচিত্র ছিল না।

তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"আমি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষাও লাভ করিয়াছি। আমি এদেশের প্রাচীনকালের মানুষের মত অন্ধবিশ্বাসী নহি। তন্ত্রও আমি পড়িয়াছি। কিন্তু বীরাচার বা কামাচার বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহার ফল যে যাহাই পাইয়া থাকুক তাহা পশু বা জন্তুধর্ম। তাহা কখনও মানবধর্ম হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে-কোন কর্মসিদ্ধি দুই উপায়েই সম্ভবপর, সৎপথে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সেই মত কর্ম করিয়াও সিদ্ধ করা যায়; আবার অসৎ উপায়েও করা যায়। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যুদ্ধ জয়, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে মামলায় ডিগ্রি ইহা হামেশাই হইতেছে। যে-উপায়ে রবিনসনের উপর শোধ তোলা হইল, যে কৌশলের পথে আইনকে ফাঁকি দিয়া দে-সরকারের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলাম তাহা আইনসম্মত পথ নহে। কিন্তু ইহা বিষয়ব্যাপার এবং বাস্তবজীবনের ব্যাপার। কিন্তু যাহা ধর্ম যাহা ভগবৎতত্ত্ব ও সাধনা তাহা মানবের বিবেকবিরুদ্ধ অশুদ্ধ ক্লেদাক্ত পথে কখনওই সমর্থনীয় নহে। ইহাকে ধর্ম-অনুসারেই পাপ বলিতে হইবে। মহাপাপ—ঘৃণ্য কর্ম—বিবেকবিরোধী চিন্তা! শক্তিকে আমরা মাতৃরূপে অর্চনা করি। চণ্ডীতেই আছে—জগতের নারীজাতিই তাঁহার প্রতিভূ। নারী লইয়া ব্যভিচার করিয়া বিশ্বজগতের মাতৃরূপিণী

শক্তিকে যে ব্যক্তি বন্দিনী রক্ষিতার মত আয়ত্তাধীনে পাইতে চায়, সে ব্যক্তি নরকের কৃমিকীটের তুল্যই ঘৃণ্য। নরকের কৃমিকীট বিষ্ঠার মত কদর্য অভক্ষ্য বস্তু আহার করে; মানুষ তাহা করিতে গেলে তাহাতে তাহার অপঘাত অপমৃত্যু ঘটে। সে প্রেত!"

দীর্ঘ দু পৃষ্ঠা ধরে লিখেছেন তাঁর মনের চিন্তা। এবং বাপ মা এবং বিমলাকান্তের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন—তাঁরা কেন গেলেন, কোন মুখে গেলেন তা বুঝলাম না। রায় বংশ—ভট্টাচার্য বংশের স্মৃতি থেকে এই মহাপাতকীর নাম সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত।

* * *

পাগলাবাবা নবদ্বীপে পোড়া-মা তলার কিছুটা দূরে এক পাশে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, বিমলাকান্ত, মহেশচন্দ্র এবং সোফিয়া কলকাতা থেকে বজরা করে গিয়েছিলেন নবদ্বীপ। তবে যথাসাধ্য আত্মগোপন করে ছিলেন। মনে তাঁদেরও কিন্তু ছিল। পাগলাবাবার সবকিছুই তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ওই কলমা পড়ে মুসলমান হওয়াটা তাঁরা স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। সেই কারণে পথে বজরা থেকে নেমে নৌকো নিয়েছিলেন। বজরা বাঁধা ছিল শান্তিপুরের ঘাটে। নৌকো কলকাতা থেকেই সঙ্গে গিয়েছিল। নবদ্বীপে সাধারণ মনস্কামনা পরিপূরণার্থীর মত যেন ওই সিদ্ধ পাগলাবাবার কাছে এসেছেন, এই পরিচয় দিয়েছিলেন। গঙ্গার ঘাট থেকে গিয়েছিলেন পদব্রজে। বীরেশ্বর রায়ের জন্য একখানা গরুরগাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কারণ তাঁর পক্ষাঘাতের পঙ্গুত্ব সম্পূর্ণরূপে তখনও সারে নি।

পাগলাবাবার নবদ্বীপেও খ্যাতি হয়েছিল। অনেক লোক তাঁর কাছে আসত, এখানে তাঁর নাম পাগলাবাবা ছিল না। লোকে তাঁকে 'মা-বোলা বাবা' বা মা-বোলা ফকীর বলত। ফকীর মানে তিনি কলমা পরে মুসলমান হয়েছেন এ কথাটা গোপন ছিল না। প্রকাশ তিনি নিজেই করেছিলেন।

কারুর সঙ্গে কোন কথাই বলতেন না। মৌনী। শুধু মধ্যে মধ্যে বুকফাটানো করুণ আর্তনাদে ডাকতেন—মা, মা, মা! চোখ দিয়ে ধারা গড়াতো! বহুলোক আসত, ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত, প্রশ্ন করত, কিন্তু তিনি থাকতেন নীরব নিস্পন্দ। গভীর রাত্রে ভাঙা গলায় গান শুনেছে লোকে। তাও তাতে ভাষা নেই। একাক্ষরা গান। মা-মা-মা। মা-মা-মা-মা-মা। মা!

লোকে পয়সা দিয়ে যেত। পড়ে থাকত, তিনি কুড়োতেন না। খেতেন শুধু ফল! কিন্তু এ সত্ত্বেও দু-তিনজন ভক্ত তাঁর জুটেছিল। এদের কাছেই সামান্য কথাবার্তা বলতেন। তাও একান্তে। এদেরই তিনি বলেছিলেন—তিনি মুসলমান, তাঁর উচ্ছিষ্ট যেন হিন্দু কেউ না খায়; কেউ যেন তাঁকে প্রণাম না করে! তিনি হিন্দুই ছিলেন—কিন্তু মায়ের কোপে বিপাকে পড়ে তাঁর হিন্দু জাত গিয়েছে।

রত্নেশ্বর রায়ের কাছে বর্ণনা করেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর লিখে রেখেছেন নিজের ডায়রীতে।

তাঁর ওই ভক্তরাই ব্যবস্থা করেছিল সাক্ষাৎকারের। তারাও জানত না 'মা-বোলা' ফকীরের

সঙ্গে এঁদের সম্পর্কের কথা। এবং সোফিয়া বাঈই ওঁদের মুখ রক্ষা করেছিল। ভক্তরাও বুঝেছিল এবং তারাও যাদের যাদের বলেছিল তারা জেনেছিল সোফিয়াই তাঁর আপনজন। সোফিয়ার সে সময়ের বেশভূষা সাদাজমি লালপেড়ে শাড়ী, এলো চুল, এবং প্রসাধনবর্জিত সাজ-সজ্জা কারুর মনে কোন সংশয়ই জাগতে দেয় নি। তারা ভেবেছিল সোফিয়াই ফকীরের বেটী আর এঁরা তাঁর প্রসাদধন্য ভক্ত!

দিনের আলোতে নয়, রাত্রে তাঁরা গিয়েছিলেন।

"যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে।" বীরেশ্বর রায় এই কথাটাই বলেছিলেন। উঠবার শক্তি তখন তাঁর ছিল না। তিনি সোফিয়াকে দেখে খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন—এসেছিস মা! বস্।

দীর্ঘকাল পরে হ'লেও মহেশচন্দ্রকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছিলেন, বলেছিলেন—মহেশ! আঃ বাঁচলাম!

জামাই বীরেশ্বর রায়, পুত্র বিমলাকান্ত, কন্যা ভবানীকে দেখে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—লজ্জায় আমি ম'রে যাচ্ছি। দুঃখের আর আমার পার নেই। সামনে কত জন্ম ধ'রে যে অন্ধকার, কতকাল যে অমাবস্যা তা জানি না। কিন্তু আজ লজ্জা আমার তার থেকে অনেক বেশী অনেক বড়। তোমাদের লজ্জা দিলাম। তোমাকে বিমলাকান্তকে।—তবে—।

তবে আমি তো সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি। সম্বন্ধ তো নেই তোমাদের সঙ্গে। তবু ক্ষমা—ক্ষমা চাচ্ছি।

ভবানী এবার এসে তাঁর মাথার শিয়রে ব'সে তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিলেন, এবং ডেকেছিলেন—বাবা!

তাঁর মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিলেন শ্যামাকান্ত। থরথর করে চিবুক ঠোঁট কেঁপেছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার স্থির হয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন—না।

তারপর বলেছিলেন—সেও মরে গেছে। আমি প্রেত।

ভবানী বলেছিলেন—না। বারো বছর আমি সংসার স্বামী ত্যাগ ক'রে আপনার জন্যে তপস্যা করেছি। আপনি ভালো হয়েছেন, জ্ঞান ফিরেছে। এবার আপনি আপনার তপস্যার ফল পাবেন, সিদ্ধি পাবেন।

শ্যামাকান্ত আবার ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—না। নরক হবে আমার। আমি দেখতে পাচ্ছি। কত জন্ম যে ঘুরতে হবে তা জানি না। হ্যাঁ, তবে সেই দারুণ প্রহার আর করে না। গলাটা টিপে ধরে না। তবে সিদ্ধি-মুক্তি ও অনেকদূর। দক্ষিণেশ্বরে এক জন্ম-সিদ্ধ সাধক আমাকে বলেছে। লোকে তাকে এখনও চেনে নি। অল্পবয়সী পাগল পাগল মানুষ। ওখানে থাকে। পুজুরীর ভাই। সে আমাকে বলেছে। পাগলামীটা সেই সারালে। * সেই প্রহার থেকে মুক্তি দিলে। সে বললে—করেছিস কি পাগলাবাবা, মাকে মা চিনলি না—মেয়েছেলে বলে চিনলি রে! মা বলে ডাক। মা বলে ডাক। মা-মা বলে কাঁদ। কিন্তু—

ঘাড় নাড়লেন শ্যামাকান্ত, অর্থাৎ হ'ল না। বললেন—পারলাম কই? আবার ঘাড় নেড়ে বললেন—পারলাম না তো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এই সোফিকে প্রথম 'মা' বললাম। বাবা, মনে হল—সব বিশ্বসংসার মধু হল—পূর্ণিমার আলোয় ঝলমল করে উঠল। মনে হল সব তাপ জুড়িয়ে গেল। বাবা, কিছুক্ষণ পর আবার সোফির মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা ধ্বক ক'রে উঠল। কই মা? মা কেন হবে। যুবতী রূপসী নারী। সেই মোহিনী গো। মজার কথা কি জান—সোফি লজ্জা পেলে। চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালে। মনকে আমি শাসন করলাম। বললাম—মা—মা। ওরে মা!

চুপ করে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। কিছুক্ষণ পর বললেন—তাই চলছে সারাজীবন। আজও। আজও বাসনা। সে মোহিনী হয়ে ওই মেয়ের মধ্যে থেকে অহরহ ভোলাচ্ছে। কত জন্ম যে লাগবে তা জানি না। এই মরব। আজই মরব। রাত্রে অমাবস্যা লাগবে—ওই লাগবে আর মরব। ভয় করছে। মা মা বলে ডাকছি। কিন্তু মধ্যে মনে হচ্ছে আসছে জন্মে—আসছে জন্মে—বাসনা যেন পূরণ হয়। সিদ্ধি যেন পাই!

ভবানীকে দেখতে বাসনা ছিল। রায়বাবুর ঘরে ভবানীর ছবিকে তার ছবি বলে ভুল করেছিলাম। দেখি নি ওকে—তাই জানিয়েছি। কিন্তু মহেশ ওর বিয়ে কেন দিলে! না দিলেই ভাল করতে। আমার তো শুধু ওই বাসনাই ছিল না। রাজা হবারও বাসনা ছিল। আমারই বংশ হ'ল তো! যদি আমার পাপ আশ্রয় করে?

ওই প্রশ্ন করেই চুপ করেছিলেন শ্যামাকান্ত, আর কথা বলেন নি!

এই কথাই রায় বংশের গুপ্ত কথা! আর এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে রায় বংশের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে।

ভবানী দেবীর পিতা, বিমলাকান্তের পিতা—শ্যামাকান্ত মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়ের আপন পুত্র হয়েও পোষ্যপুত্র। সেও গুপ্ত কথা। সোমেশ্বর রায় অভিশপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সেই ব্রাত্যনারী মনোহরা বিলাসও গুপ্ত কথা।

হঠাৎ চুপ করে গেল সুরেশ্বর। তারপর বললে—শ্যামাকান্তের শেষকৃত্য হিন্দুমতে হয় নি। ভবানী দেবী বা বিমলাকান্ত অশৌচ পালন করেন নি। তাঁর শেষকৃত্য করেছিল সোফিয়া!

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মনুষ্যগণকে মানুষ হইতে দেবতা করে না। পিশাচ করিয়া তোলে। ধর্মবুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া পাপবুদ্ধি গোটা মানবসমাজকে, বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজকে, অন্ধকারের প্রেত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাকে আমি প্রশ্রয় দিব না। আমি জ্ঞানের আলোক হাতে লইয়া বিচরণ করিব।

যে পাপ আমাদের বংশকে আশ্রয় করিয়াছে, বলিয়াছেন ভ্রান্ত তান্ত্রিক, তাহাকে মুছিয়া দিব। ইহাই প্রতিজ্ঞা করিলাম।

একটু চুপ করলে সুরেশ্বর। অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়েছে বোধহয়। ডাকলে—রঘু!

রঘু এসে দাঁড়াল। সুরেশ্বর বললে—একটু চা খাওয়া।

সুলতা বললে—বাবু তোমার আজ খেয়েছেন রঘু? না, না-খেয়ে শুধু চা খেয়েই যাচ্ছেন? না খেয়ে থাকলে খাবার দিয়ো। আমি রয়েছি, খাওয়াব। রাত্রের জন্যে কি করছ?

রঘু বললে—উ তো অর্চি দিদি করছেন। সে বহুত্ কিছু করছেন।

সুরেশ্বর বললে—সে কি? কি করছে?

—পহেলে তো লুচি মান্‌সো আর মাছ বানাইবেন বললেন। তারপর বললেন—না লুচি না, ঘি-ভাত বানাইবেন। বিরিজ দাদাসাহেব ভি বললেন কি হাঁ—ঘি-ভাত বানাও অর্চি। জিমিদারী গেইলো তো আজ ভোজ লাগানা!

—কি কাণ্ড! যেমন অর্চি তেমনি ব্রজদা! অর্চি তো কাউকে নাড়তে ছুঁতে দেবে না। সে তো একাই সব করবে!

রঘু বললে—হাঁ, জলখাবার ভি উনহি বানাইয়ে ফেললেন। হামাকে বললেন দিবার জন্মে। থোড়া কুছ বাকী আছে। ঘিউ মে'চুড়া ভাজছেন। হামি চা বানাই? চা না কফি বানাইব?

অর্চনা নিজেই ঘরে ঢুকল, তার দু-হাতে দুখানা প্লেট। নামিয়ে দিয়ে বললে—খাও!

সুরেশ্বর বললে—তুই এসব শুরু করেছিস কি? আমাকে বললি সন্ধ্যের মন্ত্র স্মরণ সেরেই এখানে এসে বসবি; তারপর এইসব শুরু করেছিস? ঘি-ভাত কে করতে বললে?

বাধা দিয়ে অর্চনা বললে—ব্রজদার সাধ হ'ল যে! বললে—অর্চি, তুই যখন কোমরে আঁচল বেঁধে তরকারী রাঁধবার জন্মে হাতা-খুন্তিই ধরবি তখন ভাল ক'রেই ধর। বেশ জুত্ করে রান্নাবান্না কর। বললাম—বেশ তো কি খাবে বল? বললে—দেখ জমিদারী উঠল, তার অনারে একটা ফিস্ট হয়ে যাক। গুষ্টীর সকলে থাকলেই ভাল হ'ত তা ওই কমলেশ্বর খুড়ো দিলে সব তেতো ক'রে! তা ছোট করেই হোক—ঘি-ভাত, মাংস-মাছ-দই-মিষ্টি—ভাজা। এই বেশ হয়ে যাবে। খাইনিও অনেকদিন! দেখ ব্রজদা তোর ভাঙা দেউলে রায়বাড়ীতে জন্মেও খেয়েছে প'রেছে ভাল। ওতে খেদ নেই আমার। এখন তো অন্ধ ফকীর। দিনরাত মালা জপি, বলি পার কর—পার কর। আজ কেমন ঘোর লেগেছে। মনে হচ্ছে শেষ জমিদারীটা করে নি। গানের আসর পাতলে ভাল হত—তা সে হবে না থাক। খাওয়া-দাওয়াটা কর!

একটু হেসে অর্চনা বললে—কি করব? বললাম—তাই করছি। ব্রজদা বসে আছে, মাংস চড়িয়ে এসেছি, সে ব'সে ব'সে ডিরেকশন দিচ্ছে। এতে সর্বনাশ সর্বনাশ করছ কেন? তোমরা কাহিনী বলছ শুনছ—বল, শোন—আমি এর মধ্যে সব করে ফেলছি!

সুলতা অর্চনাকে দেখছিল, নিবিষ্টচিত্তে এই মেয়েটিকে দেখছিল। সুরেশ্বর একটু আগে বলেছে তাকে যে, অর্চনা বিধবা হবার পর বি-এ পাশ করেছে। সংস্কৃত নিয়ে এম-এর কোর্স শেষ করে রেখেছে। কিন্তু অর্চনার কোথাও তার পরিচয় সে খুঁজে পাচ্ছে না। বেশভূষায় রকমেসকমে সেই সনাতন বাঙালী মেয়ে; একটু আগে দেখেছে একখানা মটকার কাপড় সাদামাটা ঢঙে প'ড়ে তার উপর সেই পর্দার চাদর গায়ে জড়িয়ে কালীমায়ের পুষ্প এনে মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে সন্ধ্যে করতে গেল। এখন একখানা নরুনপাড় কাপড় পরেছে, সায়া ব্লাউস আছে কিন্তু সে নেহাতই লজ্জা-নিবারণ মাত্র, তার মধ্যে কোন সৌন্দর্য নেই। কাপড়খানায় সেকেলে বাঙালীমেয়ের মত হাতের হলুদ তেলের দাগ লেগেছে। শরীর থেকে মসলার একটা

গন্ধও উঠছে।

সুলতার দৃষ্টির সঙ্গে হঠাৎ তার দৃষ্টি মিলতেই অর্চনা বললে—কি দেখছেন এমন ক'রে বলুন তো!

হেসে সুলতা বললে—আপনাকেই দেখছি।

—আমাকে? আমার মধ্যে কি খুঁজছেন? পুরুষেরা বেহায়া। কিন্তু আপনি তো তা নন।

—এমন অসাধারণ আপনি, কিন্তু কিছুতেই ধরা যায় না, আশ্চর্য সাধারণ সেজে রয়েছেন।

অর্চনা বললে—ও নিয়ে তর্ক পরে করব। তর্ক করতে গেলে রান্না নষ্ট হবে। ব্রজদা মাংস রান্নার ডিরেক্টার, গন্ধ শুঁকে ডিরেকশন দিচ্ছে, এক্ষুনি হাতা দেবার গন্ধের ইসারা পেলে হয়তো নিজেই হাতা ধরতে উঠবে, চোখে একরকম দেখতেই পায় না। হয়তো হাত-পা পোড়াবে। কিন্তু ডাকবে না।

সুরেশ্বর বললে—তা হলে তুই যা—। ব্রজদা এমন অদ্ভুত হয়ে গেল!

অর্চনা যাবার জন্যে ঘুরেছিল, কথাটা শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। বললে—ব্রজদা কি বলছিল জান? অদ্ভুতই বটে ও।

—কি বলছিল?

—বলছিল—অর্চনা, আমার মধ্যে মধ্যে মনে হয় কি জানিস? আমি বললাম—কি? তো বললে—দেখ আমিই সেই শ্যামাকান্ত, বুঝলি ওই যে পতন হল—মরল। নরক ভোগ করে সে ঘুরছে। দু-তিন জন্ম পরে আবার রায়বংশে এসেছি। তেমনি চেহারা। গান গাইতেও পারি। তেমনি ব্যভিচারী ছিলাম। তেমনি রাজ্যসম্পদ ভোগের বাসনা। এই দেখ, মারটাও কেমন খেলাম দেখ, অন্ধ হয়ে গেলাম। এখন জপ করছি দিনরাত, কিন্তু করলে হবে কি, মেয়ের গলার সাড়া শুনলে জপ ভুল হয়ে যায়! অনুশোচনারও শেষ নেই, কামনারও অন্ত নেই!

সুলতা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আপনারা এইসব বিশ্বাস করেন না কি?

অর্চনা হেসে বললে—বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি বলুন? এ আবার পৃথিবী নয় জন্মান্তর। না হয় নাই মানলুম জন্মান্তর। কিন্তু ফ্যামিলী ক্যারেকটার? হেরিডিটি? ব্রজদা যা বলেছে, তাতে এ বংশের সবাই শ্যামাকান্ত। ওই যে বসে সুরোদা—। ও সমস্ত জীবনটা একরকম তপস্যা করে মেয়েদের থেকে দূরে থেকেছে। আপনাকে ভালবেসেছিল, সে যে কি ভালবাসা আমি জানি। আপনি হয়তো নাও জানতে পারেন। সেই সুরোদা হঠাৎ একদিন কুইনীকে দেখে পাগল হয়ে গেল। যখন সুরোদা রায়বংশের সব কথাই বলছে তখন এ কথাও বলবে। আমি খানিকটা আগে বলে দিয়ে যতিভঙ্গ, ছন্দোভঙ্গ করে গেলাম!

রঘু কফির কাপ হাতে ঘরে ঢুকল এবং বললে—বিরিজবাবু ডাকছেন আপনাকে।

—ওই! আমি চললাম! আমাকে ব্রজদাকে কফি দিয়ে আসিস রঘু। ঠাণ্ডা হলে গায়ে ঢেলে দেব কিন্তু।

অর্চনা চলে গেল।

সুরেশ্বর খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিল। সুলতা কফিটা তুলে নিয়ে বললে—তুমি খাও। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে আমি বুঝতে পারছি।

—উহুঁ, তুমি ঠিক করেছ। কফিটা জুড়িয়ে যাবে।

—ভাল হবে, কোল্ড কফি হবে।

সুরেশ্বর কফিটা নামিয়ে রাখলে কিন্তু খাবারটা টেনে নিলে না, অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সুলতা বললে—ভাবতে বসলে যে।

—হ্যাঁ ভাবছি। ভাবছি অর্চনা একটা কথা বলে গেল। বলে গেল কুইনির কথা। হ্যাঁ সুলতা, কুইনীর উপর একটা আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সে আর্টিস্টের আকর্ষণ একটি সুন্দর রূপের উপর। কুইনী রক্তমাংসের মানবী, সুতরাং বলব না ফুলের উপর আকর্ষণের মত। তবে তা ছাড়াও একটা কথা আছে। কুইনীর কাছে আমার দেনা ছিল।

সুলতা তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে অতুলকাকার এবং মেজদিদির কনভিকশন হয়ে গেল, আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে বাড়ী ফিরলাম। রাত্রে হ্যারিস এল। বলেছিলাম তোমাকে সে যেন একটা সমন নিয়ে এল।

পরদিন ছবি আঁকব ভাবছিলাম, এমন সময় সে আবার এল হিলডার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে, এলিয়ট রোডের বাড়ীর একখানা ঘরের উপর আর কুইনীর উপর তার অধিকারের দাবী নিয়ে; আমি কথা দিয়েছিলাম, বিরক্ত হয়ে নিজেই গেলাম গোয়ানপাড়া। সেখানে হিলডা হ্যারিসের মুখের উপর যে জবাব দিলে, তাতে কুইনীর মায়ের পিতামহীর কলঙ্ককথা প্রকাশ ক'রে দিলে—বললে ঠাকুরদাস পালের ছেলে গোপাল পাল ভায়লেটকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারই জরিমানাস্বরূপ ওই বাড়ীখানা রায়বাহাদুর তাকে দিয়েছিলেন। দলিলে লেখা আছে—ওই বাড়ী ভোগ করবে ভায়লার গর্ভের প্রথম সন্তান। এবং তারই ছেলেমেয়েরা। ভায়লার বিয়েও দিয়েছিলেন, তাকে টাকা দিয়েছিলেন। হ্যারিস অন্যবংশের ছেলে। মনে আছে তোমার। কিন্তু আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। মাথা হেঁট করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম, কুইনীর মাতামহ গোপাল পালের সন্তান নয়, গোপাল পাল নিজের জন্যে ভায়লাকে নিয়ে পালান নি। তিনি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র রায়বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ মডার্ন ব্যক্তি দেবেশ্বর রায়ের জন্য। রায়বংশের কলঙ্ক ঢাকা দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর সেটাকে গোপালের উপর চাপিয়ে। আমি জানতাম বলেই লজ্জা পেয়েছিলাম। কুইনীও এসব কথার উল্লেখে স্বাভাবিকভাবেই লজ্জিত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সে এককথায় হ্যারিসকে দৃঢ়স্বরে 'না' জবাব দিয়েছিল। যার অর্থ আমি যাব না তোমার সঙ্গে এবং ঘরের অধিকারও দেব না, দুইই। বলেই চলে গিয়েছিল সেখান থেকে। আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফিরবার পথে ওই ছবিখানা কল্পনা করতে করতে ফিরেছিলাম। ওই পরপর উপরে উপরে তিনখানা মুখ।

প্রথমটা শ্যামাকান্তের, তার উপরেরটা সোমেশ্বরের, তার উপরেরটা দেবেশ্বরের। তারও উপরে অনেক মুখ চাপানো যায় সুলতা, আমার বাবার জ্যেঠার জাঠতুতো ভায়েদের, ব্রজদার,

কার নয়, সর্বশেষ, ধনেশ্বর কাকার সেই দৈত্যাকার অর্ধোন্মাদ ছেলেটির।

পুরুষ এবং নারীর এই দেহবাদের খেলা মানুষের জীবনে পাপ স্বীকৃত হয়েছে কতকাল তা জানিনে। এবং মানুষের জীবনে যখন থেকে ভালবাসা এসেছে বিবাহ এসেছে, তখন থেকে ব্যভিচার সত্যিই পাপ—এতবড় লজ্জাও নেই আর এতবড় ধ্বংসের বীজও আর নেই। কিন্তু পাপ বলে যত সে বর্জন করতে চেয়েছে, তত সে-পাপ তাকে আশ্রয় করেছে বিচিত্রপথে। ধর্মের ছিদ্রপথে, শক্তি ও সম্পদের সিংহদ্বার দিয়ে। রাজা-বাদশাদের ঘরে হাজার দরুণে ক্রীতদাসী থাকত, লুঠে-আনা বাঁদী থাকত। ধনশালীদের ঘরেও কম থাকত না। আবার নিছক ডাকাত বোম্বেটেরাও কম যেত না। রায়বংশে এই দুটো পথ দিয়ে প্রবেশ করেছে এই পাপপ্রবৃত্তি। একে আমি সমর্থন করব কি ক'রে? এবং হয়তো ওই গোয়ানপাড়াতে শাড়ীপরা কুইনী আমার মনের মধ্যে এ প্রবৃত্তির স্পন্দন তুলেছিল। তাই যেন রায়বংশধর বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম। বাড়ী এসে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী খুলে পড়তে বসেছিলাম। আগাগোড়া পড়ে জানতে চেয়েছিলাম সব।

সারাটা দিন কিছু খাই নি। ১৯৩৭-এর জানুয়ারী মাস। শীতটা একটু বেশীই ছিল। রঘুয়া স্নান করবার তাগিদ দিলে বলেছিলাম—না স্নান করব না। বড় শীত পড়েছে। আর শরীরটাও খারাপ-খারাপ করছে। ভাত-টাতও খাব না। চা আর পাঁউরুটি দিয়ে যা এখানে; এখানেই খাব।

রঘুয়া চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল। ওটা ওর স্বভাব। যে কথা মনোমত হয় না তার প্রতিবাদ করে না, কিন্তু কথাটা মেনে চলেও যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি বলেছিলাম—কি?

—ডাকডারবাবুর কাছে লোক ভেজি?

—না। সে ওবেলা হবে'খন।

—কুইনিন খেয়ে নেন—ইটার সাথ—। সে হুইস্কির বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আমি সেদিন শিউরে উঠেছিলাম সুলতা। না।

ধর্ম সম্পদ শক্তি তিন যখন ব্যভিচারে প্রমত্ত করে মানুষকে তখন ওই বস্তুটাই তার প্রথম উপকরণ। না—। খাব না।

পড়তে শুরু করেছিলাম রায়বাহাদুরের ডায়রী। এই সময় আর একজন এলেন—কালীবাড়ীর পূজক। চরণোদক এবং নির্মাল্য নিয়ে এসেছেন রায়বাড়ীর সবচেয়ে মোটা শরীক এবং সম্পদশালী বংশধরটিকে দেবার জন্য।

এটার ব্যবস্থা করেছিলেন মেজদি। তিনি ধমকে বলে এসেছিলেন—রায়বাড়ীর অন্ত শরিকেরা ঠাকুরবাড়ী গিয়ে পাতা পেড়ে খেয়ে আসে। ও যায় না। সকলের সঙ্গে ওর তুলনা চলে না। ওকে নিত্যি এসে দিয়ে যাবেন—চরণোদক পুষ্প!

কথাটা মানতেন পূজকেরা। শুধু ভয়েই নয় খানিকটা শ্রদ্ধাও ছিল। আমি কীর্তিহাটে আসবার পর থেকে; দেবসেবার জন্তে মেজদিদি অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠাকুরদের অভাব মিটেছিল।

আমি পূজককেও বলেছিলাম—না।

তারপরই বলেছিলাম—মানে, ওই তাকে রেখে যান, পরে আমি খাব। পুষ্প মাথায় ঠেকাব। এখনও স্নান করি নি, বাসি কাপড় ছাড়া হয় নি।

ধর্ম্মের উপরে আমার সেদিন হুইস্কীর চেয়েও বেশী ভয় হয়েছিল। শুধু ভয় নয়, বিরাগ—তীব্র বিরাগ আমার মনে জেগে উঠেছিল। সম্পত্তি পূর্বপুরুষের, দেবতা তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। তাছাড়া মনে পড়েছিল ভবানী দেবীকে। তাই ঘৃণা করতে পারি নি। মানুষের জীবনের বিষ বলতে পারি নি। নইলে—তাই সেদিন বলতাম উচ্চ কণ্ঠে এবং সম্পত্তি দেবোত্তর নইলে বলতাম—আর এক পয়সাও দেব না আমি পুজোর জন্যে।

একটানা পড়ে গিয়েছিলাম রত্নেশ্বর রায়ের দিনলিপির মধ্যে তার বংশকথা। রায়বাহাদুর বংশকথা শেষ করেছেন শ্যামাকান্তের মৃত্যুতে। তারপর রায়বাড়ীর বিবরণ রায়বাহাদুরের দৈনন্দিন ডায়রীতে তারিখে তারিখে লিখে গেছেন।

যখন শেষ করলাম বংশকথা তখন বেলা অপরাহ্ণও পার হচ্ছে। অভিভূত চিত্ত নিয়ে উঠেছিলাম। চোখের উপর ভাসছিল শ্যামাকান্তের মৃত্যুদৃশ্য। কানে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম শ্যামাকান্তের শেষ কথাগুলি।

বিশ্বের মহাশক্তিকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি সনাতনী নারীরূপে। যিনি হবেন তাঁর ভোগ্যা তাঁর দাসী। কি ভয়ঙ্কর বাসনা, কি নিঃসীম স্পর্ধা।

প্রচণ্ড আঘাতে বারবার আহত হয়েছেন—শক্তি বাঘিনীর শিকার নিয়ে খেলার মত নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে, বারবার তিনি মা বলতে চেয়েছেন, গড়িয়ে পড়তে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর কামার্ত শক্তি পিপাসার্ত চিত্ত বারবার 'না' বলেছে। মৃত্যুকালেও তিনি অকপটকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন! বলে গেছেন আবার তাঁকে আসতে হবে বাসনা পূর্ণ করতে। মহেশচন্দ্রকে বলে গেছেন—ভবানীর বিবাহ দিয়ে অন্যায় করেছ। তার গর্ভের সন্তানসূত্রে বংশেও এই বাসনা অর্শাবে!

রায়বাহাদুর দৃঢ়সংকল্প করেছিলেন, তাঁর বংশপরিচয়ের শেষে রয়েছে—আমি এ পাপকে মুছে দিয়ে যাব!

কিন্তু তা হয় নি!

বেদনা ভারাক্রান্তচিত্ত যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রঘুকে ডেকে বলেছিলাম—ওই ছত্রিঘরে ইজিচেয়ার পেতে দে। নিজে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম ছত্রিঘরে। শীতের অপরাহ্ণে সন্ধ্যার সেদিন আকাশটা গাঢ় লাল হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা হতে তখনও আধঘণ্টা দেরী, কিন্তু সূর্য তখনই যেন আবীরের থালার মত হয়ে উঠেছে। ছত্রিঘরের মাথা থেকে পশ্চিমদিক অবারিত। একটা শালবন আছে। তার ওপারে দিগন্ত একেবারে কাঁসাইয়ের বাঁকের ওপার পর্য্যন্ত দেখা যায়।

ছত্রিঘরে চেয়ার পেতে ওইদিকে তাকিয়ে মনটা খানিকটা প্রীত হল। নিজে ছবি আঁকি—রঙের নেশা ধরল। আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের মত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল বললে অর্থহীন কাব্য করা হবে। এবং তা ভাবিও নি। তবে চোখজুড়োনো লালচে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন

খানিকটা সুস্থ হল।

কেমন জান—খুব একটা তীব্র শোকার্ত ক্ষোভ শান্ত হয়ে এলে যেমন হয় তেমনি। রঘুকে বললাম—কফি করে নিয়ে আয়।

মনে পড়ল মেজদিকে—তিনি থাকলে একটা সহজ সান্ত্বনা দিতে পারতেন। হয়তো বলতেন—ওরে তুই ভুল বুঝেছিস—শ্যামাকান্ত মুক্তি পেয়ে গেছেন, সিদ্ধি পেয়েছেন—ছেলের মতই মা তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

না-হয় বলতেন—ওরে ভাই, জগৎশুদ্ধই ওই চলছে রে। কম আর বেশী। বেশ তো, তুই না-হয় এর প্রায়শ্চিত্ত কর। মুক্তি দে রায়বংশকে! দীক্ষা নে—মা ভাব জগৎ-সংসারকে।

রামকৃষ্ণদেবের কথা বলে বলতেন—স্বয়ং পরমহংসদেব ঠাকুর শ্যামাকান্তের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। ও কি মিথ্যে হয়!

না-হয় একটা লাগ-সই রসিকতা করতেন।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। পায়ের শব্দটা নরম। তার সঙ্গে কাপড়ের খসখস শব্দ। দেখলাম অর্চনা এবং তার পিছনে কেউ!

অর্চনা সেই কাল রাত্রে মেজদিদির জন্যে কেঁদে চলে গেছে। তার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধের সংবাদটাও দিয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম—তুই ভাবিসনে, জগদীশ কাকার কাছে গিয়ে আমি তাঁকে বলে এর ব্যবস্থা করব। ওই বউ-মরা দারোগা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে দেব না। আমি সম্বন্ধ করব—টাকাকড়ি যা লাগে ভার আমার। কিন্তু আজ সারাটা দিন তা মনে পড়ে নি। রায়বংশের পুরুষদের পাপের কথা ঘেঁটেই দিন শেষ করেছি। হয়তো তাই বলতে এসেছে। জগদীশকাকার অন্দরে কথাটা নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে।

একনজর দেখেই আমি মুখ ফেরালাম। সামনের দিকে তাকিয়ে বললাম—আয়!

অর্চনা বললে—তোমার শরীর না কি ভাল নেই? স্নান কর নি—সারাদিন খাও নি?

বুঝলাম রঘু বলেছে। কথাটা স্বীকার করে নিয়েই বললাম—হ্যাঁ।

—গোয়ানপাড়ার কুইনী এসেছে। আমার কাছে গিয়েছিল। তোমাকে কি বলবে।

—কুইনী?

—হ্যাঁ। এই তো আমার সঙ্গে।

এবার উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম—পূর্বমুখে, ওরা পশ্চিমদিকে মুখ করে ছত্রিঘরে ঢুকেছে। অর্চি আগে, কুইনী পিছনে একটু দূরে। সম্ভ্রম করে অর্চির সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে নি। আমার সম্মতির অপেক্ষা করছে। তাতে ছত্রির ছাদের ছায়াটা ওর মুখে বা গায়ে পড়ে নি, আকাশের লাল রঙের প্রতিফলন পড়েছে। শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে বড় চমৎকার লাগল। ওবেলার মত নয়, এবেলা সে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। কৃশ্চান ঘরের মেয়ে, ওরা আমাদের বাঙালী হিন্দুদের থেকে আগেই ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে। ১৯৩৭ সালে তখনও আমাদের মেয়েরা কাপড় পরার এ ভঙ্গি আটপৌরে ক'রে তোলে নি। এমন রুখু চুল তখনও রেওয়াজ হয় নি। কিন্তু ওদের সমাজে এটা তখন আটপৌরে ব্যাপার।

তাছাড়া রূপ শুধু চোখই দেখে না, মনও দেখে। আমার মনটাই সেদিন কুইনীর উপর মমতাচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ওর সঙ্গে যেন রক্তের আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। পরিপূর্ণ গোধূলি আলোর একটা বিশেষ রূপ আছে, যাকে বলে 'ক'নে-দেখা আলো'। কালো মেয়েও নাকি এ আলোয় সুন্দরী হয়ে ওঠে। তাই হয়েছিল কুইনী।

অর্চনা বললে—এস কুইনী!

কুইনী বললে—নমস্কার স্যার।

—কি খবর কুইনী? হ্যারিস কি আবার গোলমাল জুড়েছে?

—না স্যার। সে চলে গেছে।

—এস ভেতরে এস।

বসতে দেবার আসন ছিল না, আমি হেঁকে বললাম—রঘু দুখানা বেতের চেয়ার আন।

অর্চি বললে—আমি যাচ্ছি। পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর খাবার কি আছে দেখি। রঘু বলেছে তুমি সারাদিন দু-টুকরো পাউরুটি খেয়ে আছ। শরীর খারাপ তবু ডাক্তার ডাকতে দাও নি। আমি বুঝতে পারছি—মেজদির দুঃখ নিয়ে মাথা ভার করে মন খারাপ করে বসে আছ। পুরনো কাগজ ঘাঁটছ, কি খুঁজছ তুমিই জান।

সে চলে যেতে যেতে বললে—কুইনী যা বলবে তা তোমাকে গোপনে বলবে। তার জন্যেই আমার কাছে গিয়েছিল। তুমি বল কুইনী, আমি ভিতরে যাচ্ছি। কথাটা তুমি সেরে নাও।

বুকটা ধ্বক ক'রে উঠল। গোপনে কুইনী কি বলবে? সে কি জানে তার সঙ্গে রায়-বংশের সম্পর্কের কথা? তার মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। সে দৃষ্টি তার রূপ দেখবার দৃষ্টি নয়, তার মন দেখবার দৃষ্টি!

কুইনী কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা পুরনো বড় খাম বের করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি ওগুলো কুইনী?

কুইনী মৃদুস্বরে বললে—এলিয়ট রোডের বাড়ীর দলিল আর তিনখানা চিঠি আছে এর মধ্যে। মা আমাকে মরবার সময় দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি প'ড়ে দেখবেন।

হাতে ক'রে নিয়েও আমি বললাম—হ্যারিস যদি চলে গিয়ে থাকে তবে দলিল দেখার কি দরকার আছে? যদি মামলা-মকদ্দমা করে তখন দেখব বরং!

কুইনী মৃদুস্বরে কথা বলছিল, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েছিল পূর্ণ দৃষ্টিতে। কোন সঙ্কোচ—যে সঙ্কোচ দরিদ্রের থাকে ধনীর কাছে, নারীর থাকে পুরুষের কাছে, তার একবিন্দু ছিল না তার দৃষ্টিতে। সে বললে—কিন্তু পড়ে দেখলে আমি খুশী হব!

—বেশ তাহ'লে পড়ব।

—তাহ'লে আমি যাই!

—সে কি? অর্চি আসুক।

—না। আমি যাই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, ওপারে যেতে হবে। দেরী হয়ে যাবে। আমি অর্চিদিদিকে ব'লে যাব।

সে চলে গেল—আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। শীতের সন্ধ্যের মুখটায় সূর্য অত্যন্ত দ্রুত অস্ত অস্ত যায়। ওই অস্তমান সূর্যকে সামনে রেখেই সে চলে গেল কাঁসাইয়ের গর্ভে নেমে। পিছন দিক থেকে একটা শিলুটের ছবির মত মনে হচ্ছিল। অর্চনা এসে বললে—আর বাইরে না। এর মধ্যেই কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। ভেতরে এস, ঠাণ্ডা লাগবে। কি দেখছ?

আঙুল দেখিয়ে বললাম—কুইনী যাচ্ছে। শিলুট ছবির মত।

অর্চনা বললে—মেয়েটা ওদের পাড়ায় খাপ খায় না।

—কি ক'রে খাবে। ও শিক্ষিত। তা ছাড়া ও তো বাঙালীই। তারপর যে কথাটা জিভের ডগায় এসে পড়ল তা বলতে গিয়ে থমকে গেলাম। বলতে গেলাম ও বাঙালীই শুধু নয়, ওর মধ্যে রায়বাড়ীর রক্তের সংশ্রব আছে।

আমার থমকে যাওয়াটা এত সুস্পষ্ট যে তা অর্চনার নজর এড়ায় নি। সে বললে—আর কি বল তো?

উত্তর খুঁজে যা পেলাম সে আর্টিস্টের উত্তর, বললাম—মেয়েটি বড় ভাল মডেল।

—মডেল? মানে ছবির?

—হ্যাঁ। ফিগারটি বড় ভাল। গোধূলির আলোয় ও দাঁড়িয়েছিল দেখেছিলি?

—দেখেছিলাম। কিন্তু ওসব মতলব ছাড়। কেলেঙ্কারির বাকী রাখবে না লোকে।

—বলেছিলাম—না। সে মতলব নেই। চল।

অর্চনা যে বলে গেল সুলতা, আমি কুইনীকে একদিন দেখে পাগল হয়ে গেলাম, সে ধারণার বীজ এইদিনটির এই ঘটনা। তবে—।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—তবে একেবারে সত্য নয় এও আমি বলব না! সত্য কিছুটা আছে বৈকি। নইলে ওর ঋণশোধের জন্যে এতখানি হয়তো আমি করতাম না!

—ঋণ? সুলতা প্রশ্ন করলে।

সুরেশ্বর বললে—রায়বংশের বা আমার পিতামহের ঋণ!

—সেদিন যে পুরনো খামটা আমার হাতে সে দিয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যের পর সেখানা থেকে বের করেছিলাম তার মধ্যে যা আছে সব। একখানা দলিল। দলিলদাতা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। গ্রহীতা ভায়োলেট পিক্রুস যা দান করেছেন সে হল এলিয়ট রোডের বাড়ী।

দলিলখানায় বিশেষ কিছু নেই। বাড়ীটি ভায়োলেট পিক্রুসের প্রথম গর্ভজাত সন্তান রোজারিও পিক্রুসের সন্তান সন্ততিরা পাবে। ঈশ্বর-না-করুন যদি রোজারিও বা তার সন্তানের বংশ না থাকে তবে ওই বাড়ী কৃশ্চান আইনমতে তার অন্ত উত্তরাধিকারী পাবে। দানের কারণ হিসেবে লিখেছেন—ভায়োলেট পিক্রুসের পিতা পিক্রুস এবং তার ভাই পিক্রুস একসময় বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায়কে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।

সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ছত্র। এর মধ্যে ফাঁক আছে। সে ফাঁক মারবার বা গোপন করবার

জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। ফাঁকটা এই স্থূলতা যে, ভায়োলেটের বাপ-ভাইয়ের উপকারের মূল্য হিসেবে যে বাড়ী দান করছেন, সে বাড়ী ভায়োলেটকে দান করছেন না কেন বা তার গর্ভে রোজারিওর পরে যারা আসবে তারাই বা পাবে না কেন? গোপাল পাল বা ঘোষের নাম দলিলে নেই।

এরপর ছিল দুখানা চিঠি।

একখানা রায়বাড়ীর এটর্নীর চিঠি। তিনি ভায়োলেটকে লিখছেন—রোজারিও পিক্রুসের মা হিসেবে। লিখছেন—"ম্যাডাম, তোমার ছেলে রোজারিও পিক্রুসের লেখাপড়া এবং শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের জন্য আমার মক্কেল মিঃ ডি রায় (জানবাজার-বাসী) সর্তসাপেক্ষে মাসিক একশত টাকার ব্যবস্থা করেছেন। এবং আপনার নিজের জন্য আজীবন মাসিক পঞ্চাশ টাকারও ব্যবস্থা ক'রে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। রোজারিও পিক্রুস সম্পর্কে শর্ত এই যে, রোজারিওকে কোন উপযুক্ত মিশন স্কুলে পড়তে হবে, থাকতেও হবে স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংএ বা অপর কোন উপযুক্ত মিশন বোর্ডিংএ। এই খরচ সে তার আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত পাবে। কোন কারণেই লেখাপড়া ছেড়ে দিলে এ খরচ সে পাবে না। আপনার সম্পর্কে কোন শর্ত নেই। আপনি এই ৫০ টাকা বৃত্তি আজীবন পাবেন। আপনি রোজারিও পিক্রুসকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আপিসে এলে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হবে।"

দ্বিতীয় পত্রখানা—আমার ঠাকুরদা দেবেশ্বর রায়ের নিজের হাতে লেখা এবং লিখেছিলেন ভায়োলেট পিক্রুসকে।

সোজা ভায়োলেট সম্বোধন। ম্যাডাম নয়, প্রিয় নয়—My dear madam তো নয়ই। শুধু—ভায়োলেট!

তোমার পত্র পেয়েছি। রোজারিও লেখাপড়া ছেড়েছে সেই কারণে তার মাসিক খরচ বন্ধ হয়েছে। এই শর্তেই তাকে খরচ দেওয়া হ'ত। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ভায়লেট যে, রোজারিও সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও সে এই বয়সেই এমন দুর্দান্ত হয়ে গেল। তাকে শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি করে তুলতে আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি, এ মনে করেও সান্ত্বনা পাচ্ছি না। তোমার সম্পর্কেও তাই ভায়োলেট। আমি তোমার সম্পর্কেও সকল খবর রাখি। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে একদিন তুমি সত্যই আমাকে ভালবেসেছিলে। এবং আমিও সে-সময়ে তোমাকে ভালবাসতাম। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভুলতে পারি না যে, তুমি এবং আমি পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ভালই করেছি। না-হলে দুজনেই নিষ্ঠুরতর যন্ত্রণা ভোগ করতাম। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না। তবুও এক্ষেত্রে এই কথাটা ছাড়া আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না যে, ঈশ্বর যা করেন তা' মঙ্গলের জন্যেই করেন। তোমার আজকের দুঃখদুর্দশা এ সবই তোমার কর্মফল। এর দায় বিন্দুমাত্র আমার নেই। তবু পুরনো দিনের কথা স্মরণ ক'রে এ মাস থেকে তোমার ৫০ টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০০ টাকা করে দিলাম।

রোজারিওর প্রতি কর্তব্য আমি অবশ্য অস্বীকার করব না। সে লেখাপড়া করলে না। আমি খবর নিয়েছি শিক্ষকেরা তার সম্পর্কে কোন আশা করেন না। এবং তারা তাকে ইস্কুলে রাখতেও রাজী নন। এক্ষেত্রে আমি মনে করি তাকে এই সময় থেকেই কাজের মধ্যে টেনে

আনা উচিত। কাজ করতে করতে সে কাজের মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তুমি তাকে আমাদের রে এ্যাণ্ড কোম্পানী—সোয়ালো লেন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো, আমি তাকে চাকরী দেব। সে এখন মাসে ৮০৲ টাকা পাবে। এবং তাকে বলে দিয়ো, কাজে গাফিলতি হলে কাজ থেকে কোম্পানী যে কোন মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

পুরনো কটিদিনের স্মৃতিকে মনে করে তোমাকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

আরও একখানা চিঠি ছিল। সেখানা রে এ্যাণ্ড কোম্পানীর অফিসের চিঠি। চিঠিখানা মিসেস পিক্রুসের নামে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

"মিস্টার রোজারিও পিক্রুসের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। সে আমাদের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল। কোম্পানী তার এই অকালমৃত্যুর কথা বিবেচনা করে তার একমাত্র কন্যার ভরণপোষণ এবং পড়াশোনার জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। তুমি এর জন্য অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা কর।"

*   *   *

চিঠি ক'খানা পড়ে আমি বিস্মিত হলাম সুলতা।

রায়বংশের সঙ্গে সম্পর্কের কথা কুইনী জানে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল কি জান? মনে হয়েছিল এই চমৎকার মেয়েটি কুইনী আমার আপনার লোক। বারবার তাকে মনে পড়েছিল।

সুলতা, কুইনীকে প্রথম দেখেছিলাম মাস কয়েক আগে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে হিলডার সঙ্গে। তখন সে ফ্রক পরত। নিতান্ত কিশোরী মেয়ে। তার কোন আকর্ষণই ছিল না। তারপর এতদিন পরে আগের দিন এবং আজ তাকে দেখলাম, সে শাড়ী পরেছে। একটা নারীত্বের আকর্ষণ এসেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে মোহে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে ছুটতে চায়, সে মোহ তখনও তার ছিল না।

অর্চনা বলে গেল, তাকে একদিন দেখেই আমি পাগল হয়েছিলাম, সেটা ঠিক নয়। ওটা ওর ভুল ধারণা।

সেদিন রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি সুলতা! শুধু এই কথাটাই মনের মধ্যে ঘুরেছিল। কথার সঙ্গে কুইনী। বারবার তাকে মনে পড়েছিল। যতবার মনে করেছি ততবার অপরাধীর মত লজ্জাবোধ করেছি। মেয়েটি ওই দলিল এবং পত্র দুখানা দিয়ে কিছু না বলে চলে গেল। কিন্তু তার মধ্যে কিছু বলে গেল নিশ্চয়। সেটা কি—তা বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হ'ল আমি যেমন একটি মমতা অনুভব করলাম, তেমনি কিছু বোধ থেকেই সে দিয়ে গেল! পরক্ষণেই মনই প্রতিবাদ করলে—না,—প্রচ্ছন্নভাবে তিরস্কার করে গেল। ঘৃণা জানিয়ে গেল। হয়তো কোন দাবী জানিয়ে গেল।

শেষপর্যন্ত শেষেরটাই মনে হল। তাই তো স্বাভাবিক। আমার থেকে ধনী যারা তাদের আচার-আচরণ বংশের ইতিহাসের আলোচনা তো ঘৃণার সঙ্গেই আমিও করে থাকি। তবে কুইনীই বা করবে না কেন? এটা সর্বকালের মনের কথা—কিন্তু একালে মন যেন উগ্র হয়েছে।

আগের কালে একথা মনেই থাকত। নালিশ জানালে ভগবানের কাছে জানাতো। একালে হয়তো সরাসরিই নালিশ জানিয়ে গেল মেয়েটি।

এরই মধ্যে একটা যেন পরিত্রাণের পথ পেলাম। পথটা সহজ, এই সংসারের প্রচলিত পথ। অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ। এ ছাড়া আর পথই বা কি?

একবার মন হ'ল কিছু টাকা কুইনীকে দেব। বলব—এটা তোমার পাওনা রায়বাড়ী থেকে, তুমি নাও।

আবার মনে হল—না। টাকা নয়, কুইনী যাতে সত্যি মানুষ হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করব। ম্যাট্রিক পাশ করুক। হিলডা বলছিল, ওকে মেদিনীপুর ক্রশ্চান মিশন গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দেবে, সেখানে খরচ লাগলে দেব। আর মায়ের নামে গার্লস স্কুলের বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে—সেটাকে তাড়াতাড়ি ওপেন করিয়ে দিই। কুইনী ম্যাট্রিক পাশ করলে ওই স্কুলে চাকরি দেব।

কলকাতায় ক্রশ্চান সমাজে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগে বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন। তাঁদের সমাজ আলাদা। তাঁরা বাঙালীই। আর একটা সমাজ আছে—এলিয়ট রোডের এলাকাতেই এদের ভিড়—তারা ক্রশ্চান, কিন্তু বাঙালী নয়, ভারতীয়ও নয় আবার ইংরেজও নয়। সেখানে গিয়ে যেন কুইনী হারিয়ে না-যায়। ভেবে ঠিক করছিলাম পরের দিন সকালে উঠেই যাব গোয়ানপাড়ায়, কুইনীকে ডেকে বলব—কুইনী, তোমার কাছে আত্মীয়ের দাবী নিয়েই কয়েকটা কথা বলব। তুমি শোন!

সকালে উঠেই শুনলাম রাত্রে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। অতুলকাকার এবং মেজদিদির মামলায় সরকারী পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল ছত্রিদের ছেলে শিবু সিং, তাকে কেউ জখম করেছে। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে তাদের গ্রামের ধারে একটা জঙ্গলের মধ্যে। তার ডান হাতের কব্জির নিচে থেকে আঙুল সমেত হাতখানা প্রায় সম্পূর্ণ কেটে গেছে—সামান্য মাত্র চামড়ায় লেগে আছে।

শিবু সিং রাত্রে শৌচে উঠেছিল। ওদের বাড়ী গ্রামের প্রান্তে। বাড়ীর পরেই একটা পুকুর, সেই পুকুর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে শৌচে বসেছিল। এ ধরনের আক্রমণের ভয় তখন যথেষ্ট ছিল মেদিনীপুরে। গোটা মেদিনীপুরে পেডি, ডগলাস বার্জ মার্ডার কেসে সরকার সাক্ষী পান নি।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার পুলিশের কথামত সাক্ষী দেন নি বলে ট্রাইবুন্যাল ব্যর্থ হয়েছে। আর একটা কেসে নাড়াজোল খাঁ রাজাদের এক কর্মচারীর ছেলে সাক্ষী ছিল, কিন্তু রাজাসাহেবের নির্দেশে ছেলের বাপ তাকে উল্টো কথা বলিয়ে কেস নষ্ট ক'রে দিয়েছে। সেই মেদিনীপুরে, শিবু সিংয়ের বাপ সরকারী দফাদার হরি সিং পদোন্নতির লোভে আর রায়বাবুদের ওপর বংশগত আক্রোশের বশে ছেলেকে উত্তেজিত করে সাক্ষী দিইয়ে, এ সম্পর্কে চিন্তিত এবং সতর্ক ছিল না, তা নয়, খুব সতর্কই ছিল। ছেলের সঙ্গে হরি সিং পাহারা দিতেও এসেছিল। এবং দাঁড়িয়েছিল জঙ্গলের বাইরে একটু দূরে।

হঠাৎ ছেলের চিৎকার শুনে বাপ ছুটে যখন গেল তখন জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল

কেউ। পিছন থেকে দেখেছে, চিনতে পারে নি। শিবু তখন পড়ে কাতরাচ্ছে; তার হাতখানা পড়ে আছে মাটির ওপর।

আর পড়ে আছে একখানা কুকরীর খাপ। আনকোরা নতুন। সেই খাপখানা নিয়ে পুলিশ এসেছে ওবাড়ী। খাপের চামড়ার ওপর কালী দিয়েই মালিক নাম লিখেছে শখ ক'রে; নামটা জগদীশ্বর রায়।

সুলতা, জগদীশ্বর কাকার কথা বলেছি। অর্চনার বাবা; সবে দুদিন ফিরেছেন তীর্থ থেকে। কোন তীর্থ থেকে শখ ক'রে তিনি কুকরী কিনে এনেছিলেন, এবং খাপটার উপর নিজেই শক্ত কলমে কালী বুলিয়ে বুলিয়ে নাম লিখেছিলেন। এ খাপ্ সেই খাপ্।

বুকটা আমার কেঁপে উঠল সুলতা।

দুটি নাম এবং অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে একসঙ্গে জেগে উঠল। জগদীশ্বর কাকার কুকরীর খাপ! অর্চনা তাঁর মেয়ে। অতুলের সহকারিণী! তারপর অসংখ্য প্রশ্ন। কিন্তু সে-সব প্রশ্ন ঢাকা দিয়ে অর্চনাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠল বড় হয়ে। তাই বা কেন, ওই প্রশ্নটাই একমাত্র প্রশ্ন হয়ে উঠল। এবার ওকে বাঁচাব কি ক'রে? এ কাজ কে করেছে সে জানে ওই সর্বনাশী মেয়েটা এবং কুকরীটা যে সেই বের করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না আমার।

অর্চনা পুরনো শ্যাওলাধরা রায়বাড়ীর মেয়ে হয়েও এ-কালের মেয়ে। অতুলের সহযোগিনী হিসেবে যা করেছে তা জানি আমি। সেদিন রাত্রে ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে আমাকে খাস কাছারীর কোথায় কি লুকোনো আছে তা বলে দিয়েছিল, সে সব মনে পড়ল আমার। মন থেকে সব মুছে গেল, ছুটে গেলাম ভিতর বাড়ী।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, একজন ইনস্‌পেকটার এসে বসে আছেন। সঙ্গে একদল দশ-পনেরজন কনেস্টবল। চতুরঙ্গ-বাহিনী নিয়ে আসবার সুযোগ হয় নি। ভোরবেলা খবর পেয়ে হরি সিংহের বাড়ী এসে সমস্ত দেখে, শিবুকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই, ওই খাপটায় জগদীশ্বর রায়ের নাম পেয়েই সরাসরি চলে এসেছেন। জগদীশ্বর রায়কে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন। তার যে ছেলে কটার বারো বছরের বেশী বয়স তাদেরও ছাড়বেন না।

এ বাড়ীকে বিশ্বাস নেই। শুধু ছেলেরাই নয়, এ বাড়ীর গৃহিণীও এতে জড়িয়ে আছেন, এ প্রমাণিত হয়ে গেছে।

শিবু তার এজাহারে বলেছে যে, আমি শৌচে বসেছি সেই সময়ে ঝোপের ভিতর থেকে একজন মুখে ফেটা বাঁধা লম্বা রোগা লোক বেরিয়ে আসে, আমি তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকি, তখন লোকটা হাত তুলেছে উপরে চমকে দেখলাম হাতে একটা দায়ের মত কিছু চক্‌চক্ করছে। মাথায় মারবে বলে লক্ষ্য করেছে দেখে আমি ডান হাতখানা তুলে ছিলাম রুখ্‌বার জন্য—আঘাতটা পড়ল হাতের উপর। আমার চিৎকারে বাবা 'কি হ'ল' বলে ছুটে আসতে আসতে লোকটা এদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তাকে চিনতে আমি পারি নি। তবে লোকটি অল্পবয়সী ছেলেছোকরা নয়, বয়স হয়েছে, আর তার গায়ে মদের গন্ধ ছিল।

বিবরণ প্রায় বারো আনা জগদীশ্বর রায়ের সঙ্গে মিলে যায়। তবে জগদীশ্বর কাকা রোগা নন, তার শরীর এখন যে রকম, তাতে তাঁকে স্থূলকায়ই বলা যায়!

এ ছাড়া আরও একটা জায়গায় গরমিল হচ্ছে। সেটা হ'ল এই যে, গতকাল সকালবেলা থেকেই রায়বাড়ীর বড় মেজতরফ অর্থাৎ শিবেশ্বর রায়ের প্রথমপক্ষের সন্তানদের কেউই বাড়ীতে নেই। তাঁরা সকালে এখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। বাড়ীতে নেই। তাঁরা গেছেন তাঁদের মামার বাড়ী। হাওড়া জেলায় 'বাগনান' স্টেশনে নেমে মাইল দেড়েক পথ; প্রাচীন জমিদার বাড়ী; তাদের বাড়ীতে 'রটন্তী কালী' পূজা হয় সমারোহ ক'রে।

হয়তো তুমি জানো না সুলতা, রটন্তী কালীপূজা হয় মাঘ মাসের প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ছিল ঘটনার দিন।

ধনেশ্বর কাকা এবং জগদীশ্বর কাকার মামাতো দুই ভাই শুধু জমিদারসন্তান নন, তাঁরা সরকারী চাকরিতে দিকপাল ব্যক্তি। বড় ভাই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর, ছোটভাই আর্মিতে ডাক্তার হিসেবে মেজর হয়েছিলেন। দুজনেই বসবাস করেন কলকাতায়, কিন্তু রটন্তী কালীপূজায় তাঁরা সপরিবারে আসেনই আসেন। এই কালী-পূজার উপর তাঁদের অচলা ভক্তি। রায়বাহাদুর—মেজর সে যাই হয়ে থাকুন—তা এই মায়ের কৃপায়, এ বিশ্বাস তাঁদের হিমালয়ের মত দৃঢ়। তাঁদের জীবনে নজীর আছে, যে যখনই তাঁরা বিপদে পড়েছেন, তখনই এই দেবতাটি তাঁদের কৃপা করেছেন। সেই কৃপায় তাঁরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। এবং যেবারই কোনপ্রকারে কোন অঙ্গহানি বা অবহেলা হয়েছে সেইবারই তাঁরা বিপদে পড়েছেন।

ছোটভাই মেজর সাহেব একবার বলেন, পেশবারে তখন পোস্টেড তিনি, তাঁর পুজোর তারিখ ভুল হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন সববার আসতে পারতেন না, কিন্তু পূজার দিনে নিরম্বু উপবাস করতেন। তারিখ ভুলের জন্য তাঁর উপবাস করা হয়নি। তাঁর ডায়রীর নোট অনুযায়ী উপবাসের কথা পরের দিন। ওখানে একটু গোলমাল হয়। ত্রয়োদশী সংযুক্ত চতুর্দশী, আর পূর্ণিমা সংযুক্ত চতুর্দশী নিয়ে গোল বাধে। যাই হোক, মেজর সাহেব তখন মেজর নন, ক্যাপ্টেন। রাত্রে সেদিন তাঁর জীবনসঙ্কট হয়েছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ যাক, আমি সঠিক জানিনে, কিন্তু তিনি সেই সঙ্কটে মায়ের নাম জপ করেই পরিত্রাণ পান। এবং পরে দাদার চিঠিতে জানতে পারেন, সেইদিনই গিয়েছিল মায়ের পূজা। এবং একটি বলি নাকি দ্বিচ্ছেদ হয়েছিল!

রায়বাহাদুরেরও এমন অভিজ্ঞতা অনেক।

শুধু তাঁরাই নন, কীর্তিহাটে শিবেশ্বর রায়ের প্রথমপক্ষের তিন সন্তান ধনেশ্বর জগদীশ্বর-সুখেশ্বর এঁদেরও পক্ষ থেকে সেখানে বলি হয়। এবং দৌহিত্র হিসেবে পূজাতে সঙ্কল্পও হয়ে থাকে। এঁদের তার জন্য অর্থনৈতিক চিন্তা করতে হয় না, বলি ও ভোগের খরচ আসে তাঁদের মাতামহের দেওয়া জমি ও জমিদারীর আয় থেকে। বৎসরে পাঁচশো টাকা মুনাফা আজও তাঁরা পেয়ে থাকেন। জমির উৎপন্ন ধান থেকেও টাকা পান। এই রটন্তী কালীপূজার সময় গিয়েই তাঁরা মুনাফার টাকা এবং ধানের ভাগ নিয়ে বিক্রী করে টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরেন। আগে সপরিবারে যেতেন, এখন মেয়েদের এবং ছোট ছেলেদের নিয়ে যান না। যারা শক্ত সমর্থ হয়েছে, যারা অসুবিধা ভোগ করতে পারবে তাদের নিয়েই যান। তাই বারো বছরের বেশী

বয়সের ছেলেদের নিয়ে তাঁরা কাল সকালে চলে গেছেন। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে বড় মেজ তরফের মেয়েরা ছাড়া কেউ নেই।

থাকবার কথা, শিবেশ্বর ঠাকুরদার দ্বিতীয়পক্ষের দুই ছেলের, তাদেরও একজন কমলেশ্বর, গাঁজাখোর, চোর, সেও দাদাদের সঙ্গে গেছে। রটন্তী পুজোর ভোজ খেতে। আছে একা বিমলেশ্বর। মুখচোরা শান্ত কুনো লোক বিমলেশ্বর কাকা। বিশ্বসংসারের কাছে নিজেকে অপরাধী অক্ষম জ্ঞান ক'রে ঘরের কোণেই বাস ক'রে। আর মালা জপ করে, ত্রিসন্ধ্যা পূজা করে। বৈষ্ণবধর্মে তার দীক্ষা। মাছ খায় না, মাংস খায় না, গলায় কণ্ঠও প'রে। চৈতন্য-চরিতামৃত পড়ে নিয়মিতভাবে। এক হাজার আটবার পড়বার সঙ্কল্প তার, তার মধ্যে দুশো বার পড়া হয়ে গেছে। সে ঘরের কোণেই বসে আছে পুজোর আসনে।

ইনস্পেকটর নায়েবকে ডেকে তার সামনে জগদীশ্বর কাকার ঘর সার্চ করেছেন। খুড়ীমাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্চনাকেও করেছেন। অর্চনা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। জগদীশ্বর কাকার বন্দুকটা পড়ে আছে তক্তাপোশের ওপর, লাইসেন্সটাও পড়ে আছে। তার সঙ্গে বহু পুরানো একখানা সরকারী চিঠি। লাইসেন্সটার সঙ্গে পিন দিয়ে গাঁথা রয়েছে। চিঠিখানায় মেদিনীপুরের ডি-এম জগদীশ্বর রায়ের অসমসাহসের প্রশংসা ক'রেছেন একটা নরখাদক বাঘ মারার জন্য এবং লিখেছেন—সরকার এর জন্য খুশী হয়েছেন এবং তোমাকে একটা ডি-বি-বি-এল ব্রিজলোডিং গানের লাইসেন্স দিচ্ছেন।

আমি যেতেই ইনস্পেকটর বললেন—কি মশাই? আপনি কিছু জানেন নাকি?

কণ্ঠস্বর কঠিন দুর্বিনীত। কুটিল ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ এবং বাঁকা।

বললাম—কিসের?

—জানেন না কিছু, ন্যাকা সাজছেন না? শিবুকে কোপালে কে?

বললাম—না।

—কাল রাত্রে কি করেছেন? কোথায় ছিলেন?

—বাড়ীতে।

—বাড়ীতে? তাহলে এ বাড়ীর কুকরী নিয়ে ভূতে কুপিয়ে এল নাকি?

বললাম—বলতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু না-জানলে কি করে বলব?

—আপনারা জানেন। আপনাদিগে বলতে হবে। বলাব আমি।

ভিতরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছিল। কিন্তু কি করব? একলা আমি হলে হয়তো জবাব দিতাম। মার খেতাম। মারতে পারতাম না। কিন্তু জবাব দিয়ে মার খেয়েও অন্ততঃ তৃপ্ত হতাম যে সহ্য করি নি, নির্যাতন ভোগ করেছি। কিন্তু সামনে আমার ওই সর্বনাশী অর্চনা। তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে! মাটির উপর দৃষ্টি রেখে দরজার একটা বাজুতে ঠেস দিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্সপেকটর কুকরীর খাপটা সামনে ধ'রে বললেন—কি লেখা রয়েছে চামড়ার উপর কালী দিয়ে, পড়ুন। এই লেন্স দিয়ে দেখুন। কি এটা?

—জগদীশ্বর রায়, কীর্তিহাট!

—এটা ওখানে গেল কি করে? বলুন কি করে গেল? বলুন? বলনা খুকী—অর্চনা, অর্চনা তোমার নাম, বল না কাকে দিয়েছ তোমরা? কে চেয়ে নিয়ে গেছে? বল? সুরেশ্বরবাবু? বাড়ীতে তো কাল থেকে লোক দুজন, ও বাড়ীতে ইনি। আর এ বাড়ীতে ওই বিমলেশ্বর—কুনো কাদার তাল লোকটা। ওর দ্বারা এটা হয় না। লোকটা মদ খায় না, বৈষ্ণব মানুষ। শিবু মদের গন্ধ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস এটা এই এঁরই কাজ, নিজে করেন নি, টাকা-পয়সা আছে। মদ খান ছবি আঁকেন, নিজের এতখানি ক্ষমতা হবে না, তবে পারেন, টাকাপয়সা খরচ করে লোক দিয়ে করাতে পারেন। ওই অতুলেশ্বরের আর তার মায়ের কেসে টাকা জলের মত ঢেলেছেন। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার আনিয়েছেন। এ কীর্তি ওঁর। কুকরীর খাপটা না-পেলে কথা ছিল, ভাবতাম দলের কারুর কীর্তি। কিন্তু এই খাপ বলছে এ এই বাড়ীর কারুর কীর্তি!

হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল অভদ্র সয়তানটা—এই অর্চনা!

চমকে উঠল অর্চনা।

—বল। বল। বল বলছি!

আমি থাকতে পারলাম না আর। আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলাম—ওরই সমান চীৎকার করে বলে উঠলাম—ভদ্রভাবে কথা বলুন বলছি!

—হোয়াট? বিকট চীৎকার করে উঠল ইনসপেকটরটা!

আমি অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললাম—আপনি এই দেশেরই লোক, হয়তো ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা বৈদ্য হিন্দু। ভদ্রবংশের সন্তান আমরা—

—চোপ্ চোপ্ চোপ্—। ওসব বাক্যি বাসী হয়েছে, ওসব রাখ্—সত্যি কথা বল। নইলে বুটশুদ্ধ তোর বুকে চড়ে নাচব। আর এই রুল—তাকাল সে অর্চনার দিকে।

শিউরে উঠেছিলাম। অর্চনা থরথর করে কাঁপছিল। দুহাতে শক্ত ক'রে সে দরজার বাজু চেপে ধরলো। ঠিক এই সময় সুলতা, যা ঘটল, তার মত বিস্ময়কর ঘটনা আমার জীবনে বোধহয় ঘটে নি!

পিছন দিক থেকে একটি মৃদু কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হল—ওরা নয় ইনসপেকটর বাবু, আমি—আমি শিবুকে কুপিয়েছি।

চমকে ফিরে দেখলাম—দাঁড়িয়ে আছে বিমলেশ্বর। লম্বা রোগা মানুষটি, হাতে তার একটা কুকরী। কুকরীটা নামিয়ে দিয়ে বললে—এই নিন সেই কুকরীটা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই। ইনস্পেকটর পর্যন্ত।

বিমলেশ্বর বললে—কাল সকালে যখন মেজদা'রা বাগনান গেল, যখন বউদি, অর্চনা ওঁদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছিল, তখন ফাঁক পেয়ে ঘরে ঢুকে আমি কুকরীটা চুরি করে এনেছিলাম। এনেছিলাম এই জন্যে। মদ আমি খাই নি জীবনে। আমার বষ্টুম মন্ত্র। কিন্তু ওই গোপাল সিং-এর নাতি হরি সিংয়ের বেটা আমাদের বাড়ীর পাইকের বাচ্চা, আমাদের ইস্কুলে ফ্রিশিপে পড়ত, যে ভাবে আমার মায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে জেল খাটালে, সেটা—।

হঠাৎ চুপ করে গেল সে!

আমরাও সকলে চুপ করে রইলাম। কারুর কথা বলবার শক্তিও যেন ছিল না। একটা শব্দে আমাদের সে ভাবটা কাটল। দেখলাম—অর্চনা মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে। সম্ভবতঃ চেতনা হারিয়েছে; এই অবস্থা আর সহ্য করতে পারে নি।

মেজখুড়ীমা ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অর্চনার পাশে বসে ডাকলেন—অর্চনা! অর্চনা।

অর্চনার সাড়া ছিল না। ইনস্‌পেকটর বললে—সেন্সলেস হয়ে গেছে। মুখে চোখে জল দিন।

বিমলেশ্বর অর্চনার এই অবস্থায় বিচলিত হন না। সে বললে—আমি দেশটেশ বুঝি না; স্বাধীনতা টাধিনতা নিয়েও আমি মাথা ঘামাই না। আমি ভগবানকে ডাকি, আর ঘরের মধ্যে থাকি। কারুর অনিষ্টে নেই ইষ্টেও নেই। কিন্তু হরি সিংয়ের বেটা শিবু সিং, যার ঠাকুরদার বাবা গোপাল সিংকে আমার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর পথের ভিখিরী করে সাজা দিয়ে একটা ভাঁড় দিয়েছিলেন হাতে। দয়া করে জমিজেরাতও কিছু দিয়েছিলেন। তার এই শয়তানি, রায়বংশের গিন্নীর হাতে দড়ি পরানোর শয়তানিতে, আমার মনে বুকে আগুন জ্বলেছিল। ব'সে ব'সে ঘরে ভেবেছি আর কপালে ঘা মেরেছি। পরশুর আগের দিন খবর এসেছিল, মায়ের জেল হয়েছে। সুরেশ্বর তখনও ফেরেনি। পরশু সারাদিন যত ভেবেছি, তত পাগল হয়েছি। রাত্রে তুলসী-মালা ফেলে দিয়েছি। কালী মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলেছি, মা, তোমার শরণ নিলাম। তুমি বল দাও, সাহস দাও। কাউকে কিছু বলি নি। মনে মনে সঙ্কল্প করেছি শোধ নেব। আগের রায়বাড়ী হলে বরকন্দাজ পাঠাতাম, ধরে আনত বাপ-বেটাকে। কাছারীর থামে বেঁধে চাবকাতাম। ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতাম। ঘরে আগুন লাগাবার কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাতে ওদের মেয়েছেলেগুলো কষ্ট পেত। ঘর আবার নতুন হত। ভুলে যেত। তাই মনে মনে বিচার ক'রে ওই শিবুকেই সাজা দেব ঠিক করে-ছিলাম। খুন—খুনই করে ফেলব। নয় এমন জখম করব যে, যেন সারাজীবন মনে থাকে। রাত্রে বাবাকে স্বপ্ন দেখেছি! কাল সকালে উঠে ভেবেছিলাম জগদীশদার বন্দুকটা চুরি ক'রে গুলি করে মারব বেটাকে। সকালে যখন দাদারা বাগনান গেল, তখন মেয়েছেলেরা সব নিচে, ঘরখানা খোলা পড়ে ছিল, আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু বন্দুকটা নিতে গিয়ে নিলাম না। এতবড় জিনিসটা সামলাব কি করে? আর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ হবে। চোখে পড়ল নতুন কুকরীটা রয়েছে মেজদা'র বিছানার তলায়। ওইটেই বের ক'রে নিয়ে এলাম। লুকিয়ে রাখলাম। সারাদিন কালীমন্ত্র জপ করলাম। সন্ধ্যের সময় স্ত্রীকে বললাম—আমি যাচ্ছি বলরামপুর বাবাজীর আখড়ায়, ওখানে আজ কীর্তন হবে, ফিরতে রাত্রি হবে আমার। এখন যেতে হবে আটদিন। অষ্টাহ নামগান। স্ত্রী সন্দেহ করে নি। মধ্যে মধ্যে যাবার মধ্যে বলরামপুর যাই আমি। কালীমায়ের প্রসাদী কারণ সন্ধ্যেবেলা বড়দা খায়। আজ বড়দা নেই। আমি সেই প্রসাদটা খাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস হয় নি চাইতে। গোয়ানপাড়ায় চোলাই মদ মেলে। দু একজন গোপনে চোলাই ক'রে বিক্রী করে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বড়দা'র নাম ক'রে মদ এনে মাকে নিবেদন করে খেয়ে গিয়েছিলাম। লুকিয়েছিলাম হরি

সিংয়ের বাড়ীর পাশের পুকুরপাড়ের জঙ্গলে। মতলব করেছিলাম, এমনি ক'রে লুকিয়ে থাকব, একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন—একদিনও কি খিড়কীতে হাত-পা ধুতেও বের হবে না! আমার ভাগ্য ভাল যে, সেইদিনই বের হল। হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে হরি সিং আর আগে আগে শিবু। শিবু এসে শৌচে বসল পাশের জঙ্গলটাতেই। আমি সট্ করে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকলাম। তারপর—!

চুপ করলে বিমলেশ্বর।

নীরবে স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেলাম সবাই। সে সেই অতি কুৎসিত অতি অশ্লীল ইনস্পেকটর পর্যন্ত। ওদিকে ততক্ষণে অর্চনার জ্ঞান ফিরেছে। সে স্থির অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছে বিমলেশ্বরের কথা!

বিমলেশ্বর বললে—আমার রক্তমাখা জামাটা আছে। সেটা নষ্ট করতে পারি নি। সেটাও আমি এনে দিচ্ছি।

এতক্ষণে ইন্সপেক্টর বললে—না। দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে আমি যাব। ঘরটা সার্চ করব। একলা আপনাকে যেতে দেব না। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি নি। আপনাদের বাড়ীর নাড়ী নক্ষত্র আমরা সংগ্রহ করেছি। আপনি এ কাজ পারেন এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। কিন্তু। একটু হেসে বললে—মানুষ সব পারে। কিছু অসাধ্য নাই।

সুরেশ্বর চুপ করলে। তারপর বললে—বিমলেশ্বরকে হাতকড়ি দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে বিমলেশ্বর—সুরেশ্বর, দাদারা কেউ নেই, কমলেশ্বরও নেই, তোমাকেই বলে যাচ্ছি, ওরা রইল। দেখো একটু। ওরাও তোমার সঙ্গে একই বংশ। আর আমার জন্যে মিথ্যে উকীল-টুকীল দিয়ে টাকা খরচ ক'র না। আমার কোন আপশোস নেই। আমি রায়বাড়ীর বেইজ্জতির শোধ নিয়েছি।

* * *

বিমলেশ্বরকে নিয়ে গেল, আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন অভিভূত আমি জীবনে হই নি। বিমলেশ্বরের স্ত্রী এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিমলেশ্বরের স্ত্রীকে আজকেই যাকে ভাল করে দেখা বলে, তা প্রথম দেখলাম। বিমলেশ্বর ব্রজদার বয়সী। হয়তো দু-তিন বছরের বড়। কাকীমা আমার থেকে বয়সে ছোট। বর্ধমান শহরের উকীলের মেয়ে। শুনেছিলাম শক্ত কঠিন মেয়ে। বিমলেশ্বরের অংশমাফিক টাকা-কড়ি, ধান-পান, তিনি বুঝে নিতেন। বাইরে বের হতেন না, অন্তরালবর্তিনী থেকেই এ কাজ করে যেতেন। বিমলেশ্বরকে যে কথার যন্ত্রণা-গঞ্জনা দিতেন, সে নাকি বিমলেশ্বর ছাড়া কারুর সহ্য করার শক্তি ছিল না। তাঁর বড় মেয়ে তার বয়স বছর বারো, সেই ছিল তাঁর সেক্রেটারী থেকে পাইক বরকন্দাজ পর্যন্ত সবকিছু। নিজে পর্দা একটু বেশী মানতেন। জগদীশ্বর কাকা যে জগদীশ্বর কাকা, তার স্ত্রী থেকেও বেশী মানতেন তিনি।

তিনি আজ বাইরে এসে দাঁড়ালেন, মাথার ঘোমটা মাথার মাঝখানে তুলে দিয়ে। তিনি কাঁদেন নি। প্রথমেই এসে কঠিন ভাষায় অর্চনাকে বললেন—হল-হল? তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হল মা?

অর্চনা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কি বলছেন উনি? উনি কি অর্চনার সঙ্গে যোগাযোগের কথা জানেন?

তাড়াতাড়ি আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—খুড়ীমা। সর্বনাশ হয়ে যাবে! খুড়ীমা! রায়বংশের। বুঝতে পারছেন না এ কথা ছড়ালে। বাকীটা বলতে পারলাম না।

আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে বললেন—আমি উকীলের মেয়ে, আমি বুঝি! থাক। বলে তিনি গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব? ফিরে চলে আসব? না, আর একটু বুঝিয়ে বলে আসব! কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে কয়েকটা কথা বলাই স্থির করে ডাকলাম—খুড়ীমা!

বিমলেশ্বরের মেয়ে শোভনা কাঁদছিল। খুড়ীমা বললেন ভিতর থেকে, আসতে বল্ ভেতরে।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম, এসে তিনি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়েছেন, কাঁদছিলেন বোধহয়। তখনও চোখ মুছছিলেন। উঠে বললেন—কিছু বলছ বাবা?

—বলছি খুড়ীমা!

—বল?

—যে কথাটা আপনি বলছিলেন খুড়ীমা—অর্চনার নাম ক'রে—

—সে তো সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ করেছি বাবা। আমি বুঝি। তিনিও আমাকে একথা বুঝিয়ে গেছেন। কাল শেষরাত্রে যখন ফিরে এলেন ওইসব করে, তখন চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিলাম। উনি মুখ চেপে ধরে বলেছিলেন—চেঁচালে এখুনি আমি নিজে মরব। সমস্ত কথা শুনে আমি কুকরীটা, রক্তমাখা জামাটা, কাপড়খানা সব নষ্ট করতে বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন—খাপটা হাত থেকে পড়ে গেছে বর্ধমানের বউ। ওটা যদি পায়, তাহলে বিপদ হবে। মেজদার ঘাড়ে দায় গিয়ে পড়বে। অর্চনা ধরা পড়বেই। কিন্তু তা তো হতে দেব না আমি। তবে আর শিবুকে মেরে এলাম কেন? সেই, ছোটমায়ের জেলের কারণ বলেই তো! এ যে তার থেকেও সর্বনাশ। রায়বংশের কুমারী মেয়ে, পদ্মফুল; লোকে বলে—সতীবউরাণী ঘুরে এসেছেন। এগুলো থাকবে। দরকার হলে বের করে দিতে হবে প্রমাণ হিসেবে। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে বললেন—কিন্তু ও ক্ষমা আমি করতে পারব না বাবা। চিরজীবনে পারব না। এ কাজ উনি নিজে করতেন কিনা জানি না। ইন্সপেক্টর ঠিক বললে—মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। উনি সেই গোড়া থেকেই; এই কথাটা নিয়ে মধ্যে মধ্যে—হায়রে কপাল, আর আমরা এমন অপদার্থ যে ব্যাঙে লাথি মেরে গেল, তাই সইতে হল? ছোটমায়ের অতুলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে হরি সিংয়ের বেটা শিবু সিং? নিজে থেকে থানায় গিয়ে বলে এল! আমরা তার কিছু করতে পারলাম না! বলতেন আর ডাকতেন, হে রাজরাজেশ্বর, তুমি তো এখনও রয়েছ রায়বাড়ীতে! মা-কালী, তুমিও তো রয়েছ মা। এর বিচার তোমরা করবে না? অতুল ছোটমা রাজদ্রোহ করেছে, তোমাদের বিচারে শাস্তি হয় তো প্রাপ্য, হয়েছে শাস্তি

হোক। কিন্তু এই নেমকহারাম, এই অকৃতজ্ঞ শিবু সিং-এর বিচার কর! রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় ওর প্রপিতামহকে শেষ করে দিতেন; তাকে রক্ষা করেছিলেন সতী বউরাণী। তার এই প্রতিদান? এর বিচার করবে না?

বাবা, একদিন অর্চনা বারান্দায় যেতে যেতে বোধহয় শুনেছিল, সে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে—ন'কাকা, চুপ কর, আর লোক হাসিও না। চুপ কর! কথাগুলো শুনলে লোকে হাসবে!

উনি অবাক হয়ে চুপ করে গেলেন, আমিও গেলাম বাবা! উনি বললেন—কেন অর্চনা?

হেসে অর্চনা বললে—সে কি হাসি বাবা, দেখলে মরা-মানুষের অঙ্গেও জালা ধরে। বললে—রাজরাজেশ্বর কি তোমার দারোয়ান না বরকন্দাজ, যে শিবু সিংকে তোমার হুকুমে ঘাড় ধরে লাঠিপেটা করতে যাবে? না মা-কালী রায়বাড়ীতে নবাবী আমলের তাতারিণী প্রহরিণী যে, তলোয়ার হাতে শিবুকে কাটতে ছুটবে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! দুঃখ হয়েছে, ভগবান দুঃখ দূর কর। ভগবান ঝাড়ু হাতে জমাদারের মত দুঃখের জঞ্জাল সাফ করতে আসবেন, সুখ রয়েছে আরও সুখ দাও, তো ভগবান ঝুড়ি ভর্তি আরও সুখ মাথায় করে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হবেন। চারটি খেতে দাও, পরতে দাও কি এই জন্যে? যারা নিজের দুঃখ নিজেরা দূর করতে পারে না, তার দুঃখ ভগবানের বাবা এসেও ঘোচাতে পারে না। বলি হ্যাঁ ন'কা, খাবার সময় তো নিজে যোগাড় করে এনে রেঁধে-বেড়ে হাতে তুলে খাও। তা দুঃখ নিজের হাতে ঘোচাতে পার না কেন? অপমানের শোধ তাই বা নিজে নিতে পার না কেন?

অবাক বাবা—, অবাক হয়ে গেলাম! উনি বললেন—তুই তো মিথ্যে বলিসনি অর্চনা! কথা তো ঠিক! কিন্তু শিখলি কার কাছে?

বললে কি জান? বললে—তুমি যে গোবিন্দের পূজো কর—সেই ঠাকুরের কাছ থেকে। মহাভারত পড়, পুণ্যের জন্যে পড়। ভাব তো কুরুক্ষেত্রের কথা; ঠাকুর তো দেহধারী, তখন—তিনি তো ইচ্ছে করলেই পাণ্ডবদের অপমানের প্রতিকার করতে—তাঁর চক্রকে ডেকে বললেই পারতেন—যাও চক্র, কৌরবদের সবংশে ধ্বংস করে দাও। কে আটকাতো বল? কিন্তু তিনিও তা করেন নি, পাণ্ডবরাও তা বলে নি। পাণ্ডবরা যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করেছে—অপমানের শোধ নিয়েছে।

বলে আর দাঁড়ায় নি তখন—চলে গিয়েছিল। আমি বাবা তখনও ভাবতে পারিনি—এর ফল এই হবে। বরং ভালই মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল এই যে ওর উঠতে-বসতে ঠাকুর আর ঠাকুর, যা করেন তিনি, এটা যদি এতে ঘোচে তো ঘুচুক। জান তো কোন কাজ করতেন না, যা করতাম আমি। উনি বছরে গোটা কুড়ি টাকা খরচ করে লটারীর টিকিট কিনতেন। যতবার বলেছি—কিছু কর, তা করেন নি! ভেবেছিলাম—অর্চনার কথায় যদি এই ঘোরটা কাটে তো কাটুক!

এরপর বাবা অর্চনার কাছে উনি যেতেন। ডেকে কথা বলতেন। আমি কান দিই নি। অর্চনা বলছে বলুক!

কাল দুপুরে, রান্নাঘর থেকে দেখলাম—অর্চনা একটা কালো কিছু হাতে ক'রে ঘরে ঢুকল

—কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি—অর্চনা নিজে কুকরীটা ওঁকে দিয়ে গিয়েছিল। হয়তো উনি চেয়েছিলেন তা' হতে পারে। তবে দিয়ে গিয়েছে ও। ওই সর্বনাশী।

আমি খুব বিস্মিত হই নি! কুকরী অর্চনা বের করে দিয়েছে—এ সন্দেহ আমার গোড়া থেকে। কিন্তু অর্চনা যে—তার বুকে আগুনও জ্বালিয়েছে, এ সন্দেহ হয়নি। অর্চনার এই নতুন চেহারায় আমি ভয় পেলাম!

খুড়ীমা বললেন—আমি ওকে অভিশম্পাত দেব বাবা সুরেশ্বর। দেখো তুমি, ও যেমন একটা নিরীহ মানুষের এমন সর্বনাশ করলে—আমার কপালে এমন করে আগুন জ্বালিয়ে দিলে, এর ফল ওকে পেতে হবে। ও জীবনে সুখী হবে না। বিয়ের বাসরে বিধবা হবে। হয়তো নিজের স্বামীর মৃত্যুর হেতু হবে ওই। এই আমার মত—আমার মত—দুঃখ ওকে পেতে হবে।

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বলুন। মনের ক্ষোভটা বেরিয়ে যাক! পরে যা হয় হবে—এখন পুলিশের হাত থেকে অর্চনা বাঁচুক।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন—তোমার অনেক টাকা আছে সুরেশ্বর। আর সম্পত্তি সমস্ত পত্তনী দরপত্তনী হয়ে তোমার হাতে। তুমি ওই সিংদের উচ্ছেদ করবে—বল! এর শোধ নেবে!

কি করব? বললাম—করব।

বিবিমহলে ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম, মনে হচ্ছিল এই অভিভূত অবস্থা থেকে বুঝি কোনদিন মুক্তি পাব না। এই রায়বাড়ীর মধ্যে থেকে কিছু একটা; কিছু একটাই বলি কেন, তার ভালো-মন্দ সব কর্মের ফল একটা অজগরের মত কোন গর্ত থেকে বেরিয়ে আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। এ থেকে বোধহয় আমার আর মুক্তি নেই। শ্যামাকান্তের, সোমেশ্বরের, বীরেশ্বরের, রত্নেশ্বরের, দেবেশ্বরের, আমার জ্যেঠামশাইয়ের, বাবার সব কর্মফলের স্বাদ কেউ যেন আমার বুকে বসে আস্বাদন করাচ্ছে। শুধু তাই বা কেন, ব্রজদার কর্মফলের স্বাদ গ্রহণ করে তার দামও আমাকে মাথায় ব'য়ে দিয়ে আসতে হয়েছে।

ভাগ্য নিয়তি এ মানতাম না। আজও মানি না। তবে কর্মফলের ফলভোগ করতে হয় এবং বংশানুক্রমে সে বহুদূর প্রসারিত, এ-কথা আর না মেনে পারি না। সবিস্ময়ে সেদিন ভাবছিলাম গোপাল সিংয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা হচ্ছিল, ওই অর্চনা মেয়েটার জন্যে। এ-মেয়েটাও এই পাকচক্রে জড়িয়ে পড়েছে। পুড়ে ছাই না-হয়ে যায়। ন কাকীমা ওকে অভিশম্পাত দিলেন। অভিশম্পাতে কিছু হয় না, কিন্তু কর্মচক্রের ঘুরপাকের পাকই শুধু নেই, ওর একটা নেশাও আছে। সে-নেশা কি ছাড়বে ও?

ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার নায়েব এসে ঢুকল। বললে—বিমলেশ্বরবাবুকে হাতকড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে গোটা গ্রামটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সামনে দশজন কনেস্টবল, পিছনে দশজন।

কি বলব! চুপ ক'রে রইলাম। নায়েব বললে—উদ্দেশ্য ভয় দেখানো। সরকারের তরফে

সাক্ষী দিয়েছিল শিবু, তাকে জখম করার ফল দেখ। শিবুর বড ভাই তাদের সঙ্গে যাচ্ছে আর বলছে—দেখ বাবা, গোপাল সিং ছত্রির অপমানের শোধ দেখ!

কথাটা যেন খচ ক'রে বুকে এসে বিঁধল স্থলতার। গোপাল সিংয়ের অপমানের শোধ! কিন্তু গোপাল সিংয়ের অপরাধ!

হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যেন ডাকলে—সুরেশ্বর রয়েছ?

নায়েব বললে—দয়াল ভট্টচাজমশায়। শুনলাম উনি দেখে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদেছেন। বোধহয় এই কথাই বলতে এসেছেন।

বললাম—যান, নিয়ে আসুন।

প্রায় আশী বছরের বৃদ্ধ। এখনও বেশ সবল আছেন। নিজে এখনও সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যান। তিনি এসেছেন।

একা তিনি নন, আমাদের জ্ঞাতি উরু ভটচাজ, তিনিও এসেছেন।

দয়াল ভটচাজ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের জ্ঞাতিভাই। বয়সে অনেক ছোট। রায়-বাহাদুরের মেজ ছেলে শিবেশ্বর রায়ের বন্ধু। বয়সে বড় ছেলে দেবেশ্বর রায়ের থেকে দু'-চার বছরের বড়। কিন্তু দেবেশ্বর রায় ছিলেন সে আমলের এলিট, ইংরিজীতে অতিপারঙ্গম, সাহেবী মেজাজের মানুষ। আর আভিজাত্য-গৌরবে অতি উচ্চশীর্ষ। সম্পদের এবং বংশ-গৌরবের উচ্চপীঠ থেকে কখনও মাটিতে নামতেন না। বাল্যবয়সে গোপাল পালের সঙ্গে যে প্রীতি হয়েছিল, সেটা ঠিক প্রীতি নয়, ভক্তের প্রতি দেবতার বাৎসল্যের মত প্রেম। কীর্তিহাটের লোকেরা তাঁর নাগাল পেত না। তাই তাঁদের বয়সীরা সকলে আশ্রয় করেছিল শিবেশ্বর রায়কে। দয়াল ভটচাজেরা বংশানুক্রমে রায়বংশের গুণমুগ্ধ, প্রেমমুগ্ধ। সে কুড়ারাম রায় ভটচাজের আমল থেকে। দয়াল ভটচাজের প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় ভটচাজের অনুগত জ্ঞাতিভাই হিসেবে তাঁর সম্পত্তির তদ্বির-তদারক করতেন। কুড়ারাম রায় ভটচাজ তাঁকে বেতন দিতেন। তাছাড়াও তাঁকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গল, রায় যদুরামের দেওয়া লাখরাজ ছিটমহল, চিতারং-এর আবাদী জমির সবটুকুই তাঁকে দিয়ে যজমান-সেবী ব্রাহ্মণ থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে। একে জ্ঞাতি, তার উপর উপকৃত এই পরিবারটি দয়াল ভটচাজ পর্যন্ত চারপুরুষ ধরে রায়বাড়ীকে সম্ভ্রম ও মমতা দুই নিয়ে আঁকড়ে ধরে আছেন। কখনও রায়বংশের নিন্দা শুনতে পারেন না। তাঁদের দুঃখের দিনে তার ভাগ নিতে এগিয়ে আসেন সর্বাগ্রে। আজ দয়াল ভটচাজ এসেছেন। সঙ্গে উরু ভটচাজ এসেছে। উরু ভটচাজ ধনেশ্বর রায়ের বন্ধু, থিয়েটার-পাগল, নিঃসন্তান, উল্লাসময় মানুষ। শিবেশ্বর রায়ের আমলে ধনেশ্বরের সঙ্গে থিয়েটার করেছেন। আমোদে-প্রমোদে-উল্লাসে শিবেশ্বর রায়ের সঙ্গী। সেই প্রীতির সম্পর্কটুকু তিনি ভুলতে পারেন না, তিনিও এসেছেন।

:

সুরেশ্বর বললে—বড় মিষ্ট লেগেছিল তাঁদের সেদিন। আত্মীয়তা যে এত মধুর, এর আগে ঠিক অনুভব করিনি। মেজদি, অর্চনা আমার জ্ঞাতি আত্মীয় নয়, ওরা আমার আপনজন।

সম্ভ্রম করেই সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম—আসুন। বসুন! চেয়ার এগিয়ে দিতে পা বাড়িয়েছিলাম। নিজেই চেয়ার নিয়ে বসে দয়ালদাদু বিনা ভূমিকায় কিছু বলতে উদ্যত হয়েও বলতে পারলেন না। তাঁর ঠোঁট-দুটো কাঁপতে লাগল।

উরুকাকা কথা বললেন—বললেন—ঠাকুরদা সেই তখন থেকে কাঁদছেন। বিমলেশ্বরের কোমরে দড়ি বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে—। ওঃ, সে বড় মর্মান্তিক দৃশ্য, ওঃ।

দয়ালদাদু বলে উঠলেন—কাঁদতে কাঁদতেই বললেন—এই কি দেখতে পারা যায়!

—ওঃ! ঠিক বলেছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা কাঁদছে। কাঁদবে না। রায়বংশের ছেলে। কীর্তিহাট—কীর্তিহাট রায়বংশের কীর্তিতে। তার বংশধর, তাও বিমলেশ্বরের মত ধর্মপ্রাণ ছেলে। ওঃ! কালের কি কুটিল গতি। অতুলকে ধরে নিয়ে গেল, মেজখুড়িমাকে নিয়ে গেল। লোকে গৌরব করেছে। সাবাস রায়বংশ। দেশের স্বাধীনতার জন্যে—ওঃ! আর এ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম আমি। ভাল লেগেছিল, লোকে বিমলেশ্বরের জন্যে কাঁদছে।

দয়ালদাদু বললেন—জামিনের চেষ্টা করবে না ভায়া? তুমিই তো বলতে গেলে রায়-বংশের পঞ্চপ্রদীপের একটি জলন্ত প্রদীপ। আর তো সব প্রদীপে তেল ফুরিয়েছে।

বললাম—হ্যাঁ, করব।

—বিমলেশ্বর নাকি বারণ করেছে?

—তা করুন। ম্লান হেসে আমি বললাম—তিনি আমার টাকা খরচের কথা ভেবেছেন, কিন্তু আমার সে শুনলে চলবে কেন?

উরুকাকা বললেন—শুধু তাই নয় ভায়া, এর শোধ তোমাকে নিতে হবে। হাঁা।

দয়ালদাদু বললেন—যেমন ক'রে রায়বাহাদুর নিয়েছিলেন শোধ। ওঃ, ঋণের শেষ আর রণের শেষ এ রাখতে নেই। নিষেধ আছে। রায়বাহাদুর তা রাখতেন না। ক্ষুরধার বুদ্ধি। তেমনি বিচার! রণের শেষ তিনি রাখতেন না। কিন্তু তাঁর ভালো-মায়ের হুকুম। কি করবেন তিনি। গোপাল সিংয়ের স্ত্রী এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে নাটমন্দিরে। দয়াময়ী সতী-বউরানী—তিনি প্রার্থী ফেরাতেন না। কি করবেন? থেকে গেল রণের শেষ। বীরেশ্বর রায় হুকুম করলেন—থাক। সতীবউরানী অভয় দিয়েছে। থাক। তবে চোখের সামনে এনে রাখ। নজর রাখবে। থাক—বাঘ-ভালুক খাঁচায় পুরে রাখা জমিদারীর একটা অঙ্গ। থাক।

উরুকাকা বললেন—হাঁা। গোপাল সিং একটা বাঘ ছিল। এটা ঠিক। হরি সিংয়ের মত সাপ নয়।

* * *

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের জমিদার. জীবনের প্রথম কাজ শ্যামনগরের প্রতিশোধে দে-সরকারদের ঘরপোড়ানো। ট্যারা দে-সরকারের হাত ভেঙে দেওয়া। তখনও তিনি পোষ্যপুত্র হয়ে নিজের বাপমায়ের সন্তান হয়ে খাঁটি মালিক হন নি।

জন রবিনসনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল পিক্রুস। করিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর রায় জমিদারী পেয়ে জমিদার হিসেবে প্রথম বোঝাপড়া করেছিলেন গোপাল সিংহের সঙ্গে।

তাঁর ডায়রীর যে অংশে পূর্বকথা লেখা ছিল তার শেষ কথা গোপাল সিংয়ের কথা। লিখেছিলেন—"এবার গোপাল সিং ধ্বংসযজ্ঞ। সমিধ প্রস্তুত। আমি জমিদার হইয়া তাহাতে আহুতি দিব।"

এই কথাতেই পূর্বকথা শেষ। তারপরই আরম্ভ হয়েছে তাঁর দিনলিপি ডেলী ডায়রী। সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা। ১২৬৪ সাল। সেদিনের ডায়রী লিখতে গিয়েও তিনি গোপাল সিংয়ের কথা ভুলতে পারেন নি।

সেদিন বীরেশ্বর রায় যজ্ঞ করে রত্নেশ্বরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় এই অনুষ্ঠানে বিরাট উদ্যোগ করেছিলেন। জীবনের এতদিনের সমস্ত দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা অশান্তির স্তূপকে বোধহয় এই যজ্ঞে জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিলেন।

উৎসব তখনকার দিনে যতরকম হতে পারে, করেছিলেন; কবিগান, খেমটা নাচ, বাঈনাচ, যাত্রাগান, পাঁচালী, আতসবাজী, রায়বেঁশের নাচ, তারের খেলা—কোন কিছু বাদ দেন নি।

সোফিয়া বাঈ এসেছিল। সোফিয়া বাঈ কিন্তু বাঈ হিসেবে আসেনি। সে এসেছিল সত্যকারের আত্মীয়ের মর্যাদা নিয়ে। সে কালটা ছিল বিচিত্র; গোপন পর্যন্ত ছিল না যে এই সোফিয়া বাঈই বীরেশ্বর রায়ের অনুগৃহীতা। এ মর্যাদা তাকে দিয়েছিলেন ভবানী দেবী স্বয়ং।

রত্নেশ্বর রায় কিন্তু এর মধ্যেও গোপাল সিংকে ভোলেন নি। লিখেছেন—"এই অনুষ্ঠানে গোপাল সিং আইসে নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

দেওয়ানজী গিরীন্দ্র আচার্য অনেক চিন্তা ক'রে এই অনুষ্ঠানেই একটি বিশেষ পর্ব যোগ করেছিলেন। রত্নেশ্বর বীরেশ্বর রায়ের আমমোক্তারনামার বলে এই অনুষ্ঠানেই সমুদয় খাস-মহালের মণ্ডলদের আহ্বান করেছিলেন। আগামী বৎসরের সদর পুণ্যাহের দিন ধার্য করে-ছিলেন এই দিনেই। মহলের হাটের ডাক, ঘাটের ডাক, জলকর ফলকর বনকর বাৎসরিক বন্দোবস্তির ব্যবস্থা ক'রে মৌজা বীরপুরেও ঢোলশহরৎ করে জানিয়েছিলেন বীরপুরের মণ্ডলান বন্দোবস্ত এই সময়েই হবে।

বীরপুর বন্দোবস্ত নেওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত গোপাল সিংকে নাকচ করবার জন্য অনেক খরচ করে যে বিস্তৃত জাল ফেলেছিলেন, তা প্রায় বাতিল বা নাকচ হবার সম্ভাবনা ছিল এতে। তবু তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন! কারণ এপর্যন্ত হাজার দরুনে যে সব বাকী খাজনার মামলা দায়ের হয়েছিল, তাতে বীরপুরকে মণ্ডলান তৌজি হিসেবে স্বীকার করা হয় নি। এই ঢোল-শহরতে 'মণ্ডলান' প্রথা স্বীকার করেছিলেন রায়েরা। তবে এতে গোপাল সিংকে আসতে হবে কীর্তিহাটে!

রত্নেশ্বর রায় তখন নতুন—তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হবে এতে?

—মণ্ডলান স্বত্ব ডাক হবে। অন্য লোকেও ডাকবে।

—যদি নিজে না আসে? অন্য লোক পাঠায়?

—বেনাম ডাক—নেব না। লিখে দিয়েছি। তা ছাড়া আমাদের সে রাইট আছে বাবুজী!

বলে বই খুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—এই পড়ে দেখ—

"Their power to summon and if necessary to compel the attendance of their tanents was maintained."

আচার্য বলেছিলেন—হাত আমাদের লম্বা বাবুজী—খেলতে পারলেই হল। তোমার মাতুলের দোষ কি জান, বড় জেদী আর একগুঁয়ে। ওই যে ধরেছেন মণ্ডলান স্বত্ব স্বীকার করব না, তো করবই না! দেখ না আমি কি করি।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—শুনেছি বীরপুর মৌজার চার পাঁচখানা গ্রামের লোক, তার খুব বাধ্যও বটে, আবার বাঘের মত ভয়ও করে; কে ডাকতে আসবে তার সঙ্গে টোক্কর দিয়ে?

* * *

কথাটা মিথ্যে শোনেন নি রত্নেশ্বর। গোপাল সিং শ্যামনগরে গিয়ে তাঁর কাছে চড় খেয়ে শোধ নেবার জন্য দে-সরকার এবং রবিনসনের কাছে যে আস্ফালন করেছিল তা কতখানি সত্য তা যাচাই করে নিয়েছিলেন রত্নেশ্বর!

বীরপুরের গোপাল সিং সত্যই বিচিত্র চরিত্রের মানুষ!

হয়তো সে আমলটাই বিচিত্র সুলতা! সে আমলে দুচারখানা গ্রামের মধ্যে এমনি ধরনের এক-একজন লোক ছিল। যারা ছিল গ্রামের সর্বেসর্বা প্রধান। তারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয়, তারা সম্পত্তিশালী দুর্ধর্ষ লোক। চোর-ডাকাতকে শাসন করত, আবার আশ্রয় দিত, ধরে এনে বেঁধে মারত, আবার দারোগা ধরতে এলে তাকে লুকিয়ে রাখত। মামলায় টাকা দিয়ে সাহায্য করত, সাজা হয়ে গেলে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে জেলে যেত এই মানুষদের ভরসায়! দুর্বৎসরে খেতে দিত, সুবৎসরে কষে আদায় ক'রে নিত। দারোগাকে সেলাম করত। কনেস্টবলকে 'তুম্' বলত। রাইটার আর জমাদারকে বলত—ইয়ার। মাসে মাসে খাসী, বড় মাছ, ঘি, চাল, দুধ, তরকারী সাজিয়ে একটা ক'রে ভেট পাঠাতো! নিজে দিত না, পরের কাছ থেকে নিয়ে দিত। সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করত, তুকতাকের কবচ মাদুলী নিত, শঙ্খনির্মাল্য নিত। কাপড় কম্বল দিয়ে বিদায় করত। কিন্তু ধর্মালোচনা করত না—শুনত না! মামলায় মিথ্যা বলত। দিনকে রাত করত, দরকার হলে খুন করাত; আবার বাত দিলে বলত জাত দিলাম। বাত রাখতে পারলে জাত থাকবে, নইলে বাতের সঙ্গে জাতও যাবে। কাউকে রক্ষা করব বললে প্রাণ দিয়ে যথাসর্বস্ব পণ করে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করত।

অধিকাংশেরই বিচার ছিল খেয়াল মত; বুদ্ধি তাদের ছিল না তা নয়, কিন্তু বুদ্ধির সবটাই ছিল কুটিল। ওই খেয়ালের বিচারকে সমর্থন করতে প্রয়োগ করত। মদ খেত, গাঁজা খেত; রক্ষিতা রাখত; রক্ষিতা থাকত ঘরেই। আবার উন্মত্ত হলে ও পাপে সীমা থাকত না।

আইন এরা মানত' না। নিজের এলাকায় নিজের আইন তৈরী করত। জমিদারদের ক্ষুদে সংস্করণ। জমিদাররা এদের জন্যেই এমন হয়েছিল, না, জমিদারদের অনুকরণে বা তাদের থেকে বাঁচবার জন্য এমন হয়েছিল, তা বলতে পারব না সুলতা। সেটা অনুসন্ধান ক'রে

দেখতে পার। হয়তো বা সে কালের এইটেই ছিল রাষ্ট্রের চরিত্র, সমাজের চরিত্র, মানুষের চরিত্র।

গোপাল সিংয়ের কথা বলি।

গোপাল সিং বীরপুর মৌজায় বাঘ ছিল। বাংলাদেশের মাটির মানুষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ মাহিষ্য এদের থেকে কিছু স্বতন্ত্র—ভুলতে পারত না সে ছত্রি। গ্রামের শ্রেষ্ঠ জমিটুকু ছিল তার। স্বচ্ছল সংসার। সম্পদ টাকাকড়ি কত ছিল বলা কঠিন কিন্তু ধান ছিল তার প্রচুর। একটা পুকুরের চারি পাড়ে খড়ের 'বড়' অর্থাৎ মোটা দড়ি পাকিয়ে তারই বেড় দিয়ে তৈরী গোলায় বাঁধা থাকত। কেউ বলে একশো কেউ বলে দেড়শো গোলা পুকুরটাকে ঘিরে, সে এক আশ্চর্য শোভার সৃষ্টি করত।

উঠত ভোরে, তারপর ডন বৈঠক দিয়ে ছোলা গুড় আর সদ্যদোওয়া ফেনাশুদ্ধ দুধ খেয়ে, লম্বা ছিলমে গাঁজা খেয়ে, মাথায় মুরেঠা বেঁধে গায়ে আংরাখা পরে, বেরিয়ে এসে একটা পাক দিয়ে আসত মাঠে। হেঁটে যেত না, যেত ঘোড়ায়। ভাল দেশী ঘোড়া ছিল তার। পাঞ্জাবী-দের কাছে কিনত। তারপর এসে বসত দলিজার তখতপোশে। মণ্ডলান তৌজি বীরপুরের মণ্ডল সে, তার সেরেস্তা ছিল, সেরেস্তা অবশ্য জমিদারের নামাঙ্কিত। থোকা থেকে সকল কাগজপত্রেই লেখা থাকত জমিদারের নাম। রসিদ 'চেক'-এতেও থাকত জমিদারের নাম জমিদারের শীলমোহর। তবে হুকুম ছিল তার। তার হুকুমে গোমস্তা কাজ করে যেত। 'রোকা' যা দিত তাতে তার দস্তখত থাকত জমিদারের মণ্ডল গোপাল সিং ছত্রি।

তখতপোশে বসে আবার খেত গাঁজা তারপর মদ। শুধু মদ গোপাল সিং কখনও খেত না। গাঁজা খেয়ে মদ খেতো। বলতো—বাবা, কালী মায়ের বেটা আমি। নেশা করি মাকে মনে দেখবার লেগে। তা নিচে পাতি বাবাকে, তারপর তার উপর খাড়া করি মাকে। মা তখুন জিভ বার ক'রে হাসে।

সবই ছিল তার প্রকাশ্য ব্যাপার। জীবনে যা অপ্রকাশ্য তা তার স্বার্থের ব্যাপার বিষয় ব্যাপার।

গ্রামের প্রজারা এসে বসে থাকত। তাদের নালিশ শুনত। জরিমানা আদায় করত। ভেট নিত। কেউ আনত খাসী কেউ আনত তরকারি, সে শাক পর্যন্ত ; কেউ আনত ঘি কেউ দুধ। খাজনা আদায় হ'ত। দরখাস্ত জানাতো।

দলিজার কাজ সেরে গোপাল সিং স্নান করতে যেত পুকুরে ; ঝাঁপিয়ে পড়ত কুমীরের মত। প্রচুর সাঁতার কেটে উঠত। তারপর কালীমা গোবিন্দজী থেকে ষষ্ঠীমাকে প্রণাম ক'রে এসে খেতে বসত। সে খাওয়াও নাকি একটা পর্ব ছিল। মাছের মাথা ভিন্ন খাওয়া হ'ত না। এবং পাঁচ পোয়া চালের ভাত সে খেতো। তার সঙ্গে ছোলার দাল। তারপর ঘুম। টানা সন্ধ্যে পর্যন্ত। সন্ধ্যের সময় উঠেই নেশা-যোগ। আগে বাবার ভোগ তারপর মায়ের ভোগের প্রসাদ পেয়ে সন্ধ্যার মজলিশ। সে গ্রামশুদ্ধ লোক। সে দুপুররাত্রি পর্যন্ত। তারপর অন্দরে। তিনটি বিবাহ ছিল—তার উপর ছিল রক্ষিতা দাসী!

কিন্তু এই সব নয় গোপাল সিংয়ের। বর্ষার সময় গোপাল সিংয়ের আর এক রূপ ছিল।

পাঁচখানা গ্রামের লোক আসত তার দলিজায়। বর্ষার ধান ফুরিয়েছে, চাষের সময় ধান চাই।

'গাঁজার নেশার পাটার উপর মদের নেশার বিগ্রহ চড়িয়ে' গোঁফে তা দিতে দিতে গোপাল সিং প্রশ্ন করত—কোন গ্রামের রে তোরা বেটারা ?

—পাঁচপাড়ার আমরা সিংমশায় !

—কতজনে নিবি কত ধান চাইরে শা—রা ! হিসেব ক'রে বল।

—হিসেব ক'রে এনেছি সিংমশায়। চার পৌটী ধান আমাদের চাই।

মানে একশো ষাঠ মন !

গোপাল বলত—দেখ তো দাশজী, কোন কোন গোলায় পুরো এক এক পেটি ধান আছে ?

দাশজী গোমস্তা বলে দিত নম্বর।

গোপাল বলত—যা এই এই নম্বরের গোলা চারটে ভেঙে ধান নিয়ে যা। খড়ের বড় তুলে রেখে যা।

তারা চলে যেত খুশী হয়ে। আর একদল এসে দাঁড়াত—আমরা সাওতা থেকে এসেছি। প্রণাম।

—তোদের কত চাই ?

—আমাদের লোক কম, দু পৌটী চাই।

—শা-লোক কম কেনে রে ? বেশী হয়ে যা না। আমি বারণ করেছি। দুটো তিনটে বিয়ে কর। বলে দাও দাশ দুটো গোলার নম্বর।

আবার অন্য গ্রাম আসত। তারা নম্বর জেনে নিয়ে চলে যেতো। 'বাখ-রের' খড়ের দড়ি খুলে ধান তুলে গাড়ী বোঝাই করত ; খড়ের দড়ি সযত্নে জড়ো করে রেখে যেত গোপাল সিংয়ের চাষবাড়ীতে। মেপে দেখার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু কম হ'ত না কখনও। আবার ধান উঠলে মাঘ মাসের শেষ থেকে শুরু করে গোটা ফাল্গুন ধানবোঝাই গাড়ী আসত। গ্রামের লোকেরা প্রণাম ক'রে বলত—আমরা পাঁচপাড়ার লোক ধান এনেছি।

—এনেছিস শা—রা। বেশ করেছিস। যা, যে বাখার ভেঙেছিলি সেই বাখারে ধান তুলে বড় বেঁধে দিয়ে যা। পুরো এনেছিস ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আসল সব আছে। তবে বাড়ি পুরো দিতে পারছি না সিংমশায়, এবার ফলন খারাপ।

—কত বাকী থাকল লিখে দিয়ে যা।

সিংয়ের তরফেও কেউ ধান মেপে নিত না।

শুধু এই নয়, গোপাল সিংয়ের আর এক চেহারা ছিল। বিবাদী সম্পত্তি দখল নিতে সাহায্যের জন্য লোক আসত। বিবাদী জমি দখল দিয়ে দিতে হবে সিংজী।

—কোথাকার গো ?

—নসীমপুরের।

—কার সঙ্গে, ফৌজদারি ?

—নসীমপুরের সাহাদের সঙ্গে।

—ওরা কাকে আনবে ?

—শুনছি—গোপ গাঁয়ের গোপদের।

—তারা গোপ ? শা—মরদ বটে !

—আপনাকে যেতে হবে।

—যাব। দুশো টাকা লিব।

—আজ্ঞে—

—ভাগ্‌রে শা—ভাগ। আজ্ঞেতে নেই গোপাল সিং। হাঁ বললে আছে ! আধা টাকা রেখে যা। আধা টাকা গিয়ে আগে লিব—তারপরে নামব। মামলা খরচা শা—তোদের।

তাই ঠিক দিনে যেত গোপাল। কাটাকাটি ক'রে মিনিট পনেরোর মধ্যে দু চারটেকে ঘায়েল ক'রে তাদের ভাগিয়ে দিয়ে চলে আসত। দুচার লাঠি খেয়েও আসত। কিন্তু জখম হয়ে মাটি সে নেয় নি কখনও। ফৌজদারি মামলায় আসামী হত। কিন্তু বিচিত্র এ্যালিবি রেখে যেতো, যার জোরে অধিকাংশ সময় বেরিয়ে আসত।

কেউ আসত শত্রুর উপর শোধ নিতে হবে।

—কি করতে হবে ?

—শিক্ষা দিতে হবে।

—বাবা লিখাপড়ি জানি না আমি। মারধর জানি। জান লিতেও জানি। বাকী কি করতে হবে বল ?

—ঘা কতক উত্তম মধ্যম।

—শা—, হাত লিব না পা লিব না কান কেটে লিব তাই বল্‌। হাত পা ভাঙতে লিব একশো টাকা, কান কেটে লিতে দেড়শো !

জান নিতে হবে বললে বলত—কি করেছে তুমার ? বেটী বহু বহেন কারুকে বাহার করেছে ? তুমার কারুর জান লিছে ? সি হলে পর লিতে পারি। রাখো পানশো। নাম বলো। হদিশ বলো। সাতদিনের অন্দরে লাশ মিলবে মাঠে, না তো ঘাটে, না তো রাস্তার উপর ! না-হলি ভাগো !

ঘরে আগুন দিতে হলে পাঁচ দশ টাকা।

পথের মধ্যে লোকের সামনে কান মলে দিতে হলে পঁচিশ টাকা। তার সঙ্গে দুটো থাপ্পড় দিতে হলে আরও দশ টাকা। তার সঙ্গে গাঁজা মদ !

এও সব নয়। এমন যে গোপাল, থানায় তার খাতির খুব। খাসী মাছ ঘি তরকারি দুধ, মধ্যে মধ্যে টাকা, এ গোপাল দিত। কিন্তু তাই সব নয়। তার এলাকার কোন আসামীকে তার সাহায্য ভিন্ন পুলিশ ধরতে পারত না।

কিছুদিন আগে, শ্যামনগর পুড়িয়ে আসার পরই একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেকথা লোকের মুখে গল্প হয়ে উঠেছিল। সকালে দলিজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল থানার নতুন রাইটার, সঙ্গে দুজন কনেস্টবল। গোপাল সিং তাকে দেখেই 'আরে—আরে—আরে—'বলে পরম আগ্রহভরে এসে বলেছিল—চামারী সিং, কাহা জায়েগা ভাইয়া ? ই বাবু ?—

—আপনার ইলাকায় এলম সিংজী। ইনি নৌতুন জমাদার! বলে সে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল রাইটারবাবুর সঙ্গে।

গোপাল তাকে সাগ্রহে আহ্বান করেছিল তার বাড়ীতে। আসেন—আসেন। বসেন। তামাকুল পিয়েন। সরবত আন, পান আন, মদ আন। খাসী এনে কাট!

রাইটারবাবুটি পুরানো বন্ধু। সিংজীর সঙ্গে অনেক মদ্য পান করেছেন। তাঁর মারফতে অনেক ঘুষ নিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি কান দেন নি। তিনি আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—না। একজন ফেরারী আসামীর সন্ধানে এসেছি। খবর পেয়েছি সে এসেছে। আমাকে যেতেই হবে।

—আরে বসেন মশাই। উ শালাকে হামি হাজির করে দিব। কেনে ভাবছেন আপনি। বসেন, মৌজ করেন। মদ খান। রাত মে যা চান তাই দিব। কাল সকলে শা—কে লিয়ে মজেসে চলিয়ে যাবেন।

কিন্তু মুন্সীসাহেব শোনেননি। চলে গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন সন্ধ্যে নাগাদ—অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে—শূন্য হাতে।

গোপাল আবার তাকে পাকড়েছিল। বসেন-বসেন। ই কি বাত! এই রাতে ফিরবেন, না খানা, না পিনা। তা হয় না মশা।

মুন্সীবাবু অগত্যা ছিলেন। সম্মুখে রাত্রি, পথও অনেকটা এবং ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত দুই-ই ছিলেন সকলে।

গোপাল তাদের সমাদর করে মদ্য, মাংস, খিচুড়ি, মাছের মুড়ো খাইয়ে বিছানা করে শুতে দিয়েছিল। একটি যুবতীও দিয়েছিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন মুন্সীবাবু। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরের মেঝেটা জলে ভিজে উঠেছে, বিছানা ভিজেছে এবং বাইরে থেকে কারা হুড় হুড় করে জল ঢালছে জানলা দিয়ে।

মেয়েটা একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালটা ছিল শীতকাল। মুন্সীবাবু ভিজে বিছানায় শুয়েছিলেন, তাঁর কাপড়-জামাও ভিজে গেছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘরে পা দিতে গিয়ে কাদায় পা দিয়েছিলেন, মাটির মেঝে জলে ভিজে কাদা হয়ে উঠেছে।

এ কি?

মেয়েটা জবাব দিয়েছিল—সিংজী।

—সিংজী?

—হ্যাঁ, সিংজীর লোকেরা জানালা দিয়ে জল ঢালছে।

—কেন?

—তা জানি না।

মুন্সীসাহেব দরজায় এসে খিল খুলে দরজা টেনে দেখেছিলেন, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তিনি তারস্বরে চীৎকার করেছিলেন—সিংজী। সিংজী। গোপাল সিং বাবু। ও মশায়!

বাইরে অট্টহাস্য বেজে উঠেছিল। হা-হাঁ-হা! কেমন মজা!

এটা গোপালের কৌতুক। তার রসরসিকতা এইরকম। কিন্তু শেষ রক্ষা করেছিল

গোপাল। দরজা খুলে ভিজে মুন্সীকে বের করে শুকনো কাপড় পরিয়ে শুকনো ঘরে শুকনো শয্যায় শুতে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সকালে উঠেই মুন্সীসাহেব তাঁর ফেরারী আসামীকেও হাজির পেয়েছিলেন। গোপাল সিংয়ের লোকেরাই তাকে লুকিয়ে ফেলেছিল মুন্সী যেতে যেতে, আবার তারাই তাকে হাজির করে দিয়েছে মুন্সীজী উঠতে উঠতে।

গোপাল মুন্সীকে বলেছিল—এই লেও বাবা, তোমার আসামী। লিয়ে যাও। কিন্তু বাবা, গোপাল সিংকে ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাইও না। গোপাল ঘোড়া আছে না—হাঁতী আছে, উঁট আছে। ডিঙানো যায় না। বললাম—বস বাবা, মৌজ করো। শুনলে না। তাই হাতের খেল দেখিয়ে দিলম।

আসামীটাকে বলেছিল—যা রে শালা যা। বুরা কাম করিয়েছিস, সাজা লিতে হবে। আজ না লিস, কাল লিতে হবে। তা বা চলে যা। তোর 'বালবাচ্চা জরু অরু' রইল। আমি রইলম। খানে মিলবে, পরনের কাপড়া মিলবে। সো সব কুছ আমি দিব। যা।

* * *

এই গোপাল সিং।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের প্রথম দিনের ডায়রী দশ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। অনুষ্ঠানের উৎসবের বিবরণ থেকে মায়ের কোলে ফিরে আসার আবেগময় মনোভাবের বর্ণনার সঙ্গে গোপাল সিংয়ের কথা অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

—সে যদি নাই আসে। তবে কি করবেন? কে ডাকবে? এই গোপালকে কে শক্র করবে? অথচ মণ্ডলান তৌজী স্বীকার দোষ হয়ে যাচ্ছে। রত্নেশ্বর দেওয়ানকে চিন্তিতভাবেই কথাগুলো বলেছিলেন।

হেসে গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—বাবুজী, লোক আছে। ডাকবার লোক আমার হাজির আছে।

—হাজির আছে?

—কে?

আচার্য ডেকে বলেছিলেন—ভগবান মণ্ডলকে ডাক তো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক দীর্ঘকায় প্রায় সাড়ে ছ' ফুট লম্বা অনুপাতে শীর্ণকায় এক প্রৌঢ় এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিল।

ভগবান মণ্ডল অবস্থায় গোপাল সিংয়ের সমকক্ষ লোক। কিন্তু নির্বিরোধী। এতকাল পর্যন্ত গোপালের অনুগতই ছিল। সে যা বলেছে, তাই মেনেছে। কিন্তু আর মানবে না। সে ডাকতে প্রস্তুত আছে। কীর্তিহাটের জামাই সে। আচার্য তার শ্বশুর-শ্যালকদের দিয়ে তাকে জাগিয়েছেন। মণ্ডলান তুমি নাও। মাথা হেঁট করে কতকাল থাকবে?

ভগবান রাজী হয়েই এসেছে এখানে।

গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—ফৌজদারি হবেই। গোপাল ছাড়বে না। ওতেই সে জালে পড়বে। ভগবানকে সামনে রেখে লড়বে আমাদের লোক। গোয়ানদের আমি ঠিক করে রেখেছি। এই সমারোহের মধ্যেই বীরেশ্বর রায় গোয়ানদের বসতের জায়গা দিয়েছিলেন ওই সিদ্ধপীঠের জঙ্গলের পাশে খানিকটা দূরে ওই লালমাটির ডাঙার উপর। একেবারে কাঁসাইয়ের

ধারে। হিলডার বাবা পিক্রুস ওদের সর্দার। পিক্রুস তখন পঁচিশ-তিরিশ বছরের জোয়ান। রবিনসনের মৃত্যুর পর পুলিশ তার উপর নজর রেখেছে। সে রায়বাবুর আশ্রয়ে এসেছিল বাঁচবার প্রত্যাশায়।

গোপাল সিং কিন্তু আসে নি। একটা গুজব কেমন করে রটেছিল যে বীরেশ্বর রায় প্রতিজ্ঞা করেছেন গোপাল এলে তাকে ধরে কালীমায়ের স্থানে নরবলি দেবেন। বিচিত্রভাবে গুজব নিজের গড়ন নিজে নেয় সংসারে। গুজব রটেছিল বীরেশ্বর রায়ের নিরুদ্দিষ্টা সতী বউ বারো বছর কালী সাধনা করেছেন। তার উদ্‌যাপন হবে নরবলি দিয়ে। গোপাল সেই বলি।

কথাটা সেকালে অবিশ্বাস্য ছিল না। নরবলি তখনও ছিল। তান্ত্রিকেরা দিত গোপনে শ্মশানে, লোকালয় থেকে দূরে ; ডাকাতেরা বড় ডাকাতি করবার আগে অনেক সময় নরবলি দিত। জেদের ক্ষেত্রে জমিদারেরাও নরবলি দিয়েছে। নিজে গোপালও বলি হিসেবে নরবলি না-দিক, নরহত্যা কয়েকটা করেছে, তার মধ্যে একটাকে নরবলিই বলা চলে। ছিরুদাসকে সে কালীপূজার রাতে অন্ধকার মাঠে এক কোপে কেটেছে। কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে শিবপুরের ছিরুদাস একসময় দুর্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল—মানত' না সে কাউকেই। সম্পত্তিবান লোক, লোকে বলত একদল ডাকাত তার অধীনে আছে। বর্তমানে গোপাল সিং যা করে তাই সে তখন করত। বলতে গেলে গোপালের গুরুও সে বটে এবং গোপাল তাকে খুন করেই তার গদীতে বসেছে তাও বটে। স্থানীয় সম্পত্তিবান ব্রাহ্মণ কায়স্থ গন্ধবণিক তালুকদার পত্তনীদার এবং সৎগৃহস্থেরা ছিরুদাসের ঔদ্ধত্যে পীড়িত এবং লাঞ্ছিত দুইই হয়েছিলেন। শেষে তাঁরা একজোট হয়ে প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হয়ে কাণ্ডটা করেছিলেন। গোপাল তখন নবীন যুবক। গন্ধবণিক তালুকদার লোকাই চন্দ হয়েছিল জোটের মাথা। সেদিন কালী পুজো। লোকাই চন্দের বাড়ীতে সেদিন গোপাল হাজির ছিল। নেমন্তন্নে গিয়েছিল। রাত্রি দুপুরে পুজো। লোকাই চন্দ উপোস করে বসেছিল। গোপালও বসেছিল কাছে। ওই কথাই হচ্ছিল। গোপাল বলেছিল—হামি পারি চন্দবাবু!

—তুমি পার? হেসে বলেছিল—এত সোজা নয় গোপাল!

—না পারলে দুয়ো দিবেন। ছত্রি থেকে গোপাল খারিজ হয়ে যাবে!

মাথায় কারণের ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকের মাথাতেই হচ্ছিল কথাবার্তা। এমন সময় একজন পাইক এসে বলেছিল—ছিরুদাস এসেছে।

—ছিরু দাস।

—হ্যাঁ। কালপুজোর খবর করতে এসেছে। নেমন্তন্নপত্ত করেছিলেন।

—নিয়ে আয়। না—আমি যাচ্ছি।

উঠে যাচ্ছিল চন্দ, গোপাল বলেছিল—হামাকে একটা তলোয়ার দিবেন? কি দাও? ঘরেই ক'খানা রামদা আর তলোয়ার সাজানো ছিল।

—গোপাল।

—দিয়া দেখেন।

—কিন্তু আমার গ্রামের মধ্যে নয়।

—ঠিক আছে। তাই হোবে।

—দেখে নিয়ে যাও!

—হামি এই দরজা দিয়ে নিকলে যাচ্ছি। একটুকুন দেরী করবেন।

ছিরু দাস চাষীর ছেলে, দুর্দান্তপনার জোরে সম্পত্তিবান হয়ে সে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাবানদের গায়ে-গা-দিয়ে বসবার শখে একজন অনুচর সঙ্গে ক'রে কালীপূজার দিন সন্ধ্যে থেকে তত্ত্বতল্লাস করতে বেরিয়েছে। সে দাঁড়িয়েছিল কালীমূর্তির সামনে। চন্দ তাকে অতিথি হিসেবেই আহ্বান করেছিল। আপ্যায়িতও করেছিল। কয়েক পাত্র কারণ পান করে উঠেছিল ছিরু দাস।—উঠলাম চন্দমশায়!

চন্দের মনে দ্বিধা হচ্ছিল। অতিথি এসেছে! তার উপর গোপাল একলা গেল যদি না-পারে, তবে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

চন্দ বলেছিল—আজ থাক না দাস।

—আজ্ঞে না। ওইটি আজ্ঞে করবেন না। বাড়ী আমাকে ফিরতেই হবে। অনেক শালা তক্কে আছে। আমি বাড়ী নাই জানলে বাড়ী মেরে দেবে। তাছাড়া গুরুর বারণ আছে—বাইরে রাত আমি কাটাব না। মানুষ ঘুমোয়—না—মরে। পরের বাড়ীতে ঘুম আর যমের দুয়োরে মাথা দেওয়া দুই সমান।

চন্দ বলেছিল—তবে সঙ্গে লোক দি, অপেক্ষা কর।

নিজের হাতের লাঠির মধ্য থেকে একটা ধারালো চকচকে গুপ্তি বার করে বলেছিল——"যাঁহা ছিরু দাস তাঁহাই ভীমপুর"। এই আমার দোসর। আপনাদের আশীর্বাদে মানুষ তো মানুষ ভূত প্রেত পিশাচে ছিরুকে পথ ছেড়ে দেয়।

বলে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল। গ্রাম পার হয়েই বিস্তীর্ণ মাঠ একটা। ছিরু চলে যাওয়ার আধঘণ্টাও হয় নি—মাঠ থেকে একটা চীৎকার উঠেছিল। সে চীৎকার ভীষণ চীৎকার। চমকে উঠেছিল চন্দ। কি হল?

গোপাল ধরা পড়ল? মরল? সে ভাবছিল লোক পাঠাবে কি পাঠাবে না। হঠাৎ ছুটে এসে পড়েছিল ছিরু দাসের সঙ্গের লোকটা।—চন্দমশায়!

চন্দ আবার চমকে উঠেছিল।—কি হল?

হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা বলেছিল—সর্বনাশ হয়ে গেল হুজুর। মাঠের মধ্যে একটা গাছের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল একটা দানোর মত কি! তারপর—

—তারপর কি?

—একখানা দা দিয়ে—

—কি? কি?

—দাস মশায়কে এক কোপ। তারপর আমাকে। আমার হাতে মশাল ছিল। আমি লাঠী ধরতেই পারলাম না। দাসমশায়ও গুপ্তি খুলতে পারলে না। আমার হাতে কোপ লেগেছে। মশাল পড়ে গিয়েছে। সে দাসমশায়ের বুকে বসে কোপাচ্ছে।

লোকজন গিয়েছিল হৈ হৈ করে। স্বয়ং চন্দ্র গিয়েছিল। হৈ হৈ সেই করিয়েছিল। গোপাল জানে, সেটা চন্দ্রমশায়ের ইশারা। গোপাল তখন অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে দূরে চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে হেসে উঠে সেই জনহীন মাঠে বলে উঠেছিল—জয়কালী!

পরদিন পরিচ্ছন্ন পোশাক প'রে মুরেঠা বেঁধে এসে চন্দ্রকে নমস্কার করে বলেছিল—আপনার বাড়ীতে কালীপুজো হয়েছে কাল। পেসাদ লিতে এলম।

চন্দ্র খাতির ক'রে বসিয়ে বলেছিল—এস—এস—এস। প্রসাদ সর্বাগ্রে তোমার হে! তুমি সাধক! বস!

কথাটা গোপালের মনে পড়েছিল। গোপাল সেইজন্তে আসে নি। তবে উকীল সে পাঠিয়েছিল! উকীল মজবুদ উকীল—মহিষাদল স্টেটের নায়েব। মহিষাদলের কাছারীতেও সে গিয়েছিল। রাজাবাহাদুর তাকে তিরস্কার করেছিলেন। গোপালের বিবরণ তাঁর অজানা ছিল না। বীরেশ্বর রায় তাঁর সঙ্গে যে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি শীলদের সঙ্গে মিট-মাটের জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কাছে গিয়েছিলেন, রাজাবাহাদুরকে যে-কথা বলেছিলেন, সবকিছুই তাঁর কানে এসেছিল। এবং শ্যামনগরে সে দে-সরকার এবং রবিনসনের সঙ্গে হাতমিলিয়ে গোটা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে এবং রত্নেশ্বরকে পুড়িয়ে মারবার জন্য ঘরে শিকল দিয়ে বন্ধ করেছিল, তাও জানতেন।

তিনি বলেছিলেন—আমার উচিত এখান থেকেই তোমাকে বেঁধে কীর্তিহাটে পাঠানো। যাও তুমি, আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও! আমি একটি কথাও তোমার জন্তে বলব না বলতে পারব না!

গোপাল অসহায় বোধ করেছিল প্রথমটা। তারপর সে নিজেকেই নিজে বলেছিল, কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়।

তারপর ধরেছিল নায়েবকে। রাজাসাহেব এ নিমন্ত্রণে নিজে যাবেন না, তবে তাঁর আশীর্বাদী লৌকিকতা নিয়ে যাবে তাঁর সদর নায়েব। সেই নায়েবকে ধরেছিল গোপাল এবং কবুল করেছিল—খেন্না কোনরকমে ঘর ঢুকাংয়ে দিন নায়েববাবু, আমি একশো টাকা কবুল করছি আপনের নজরানা!

* * *

সেদিন গোপাল নিজে এলে কি হ'ত বলা কঠিন! সেদিন রায়বাড়ীতে দেবতা-মন্দির থেকে, কাছারী থেকে অন্দর পর্যন্ত পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের একটি অতিপ্রসন্ন বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

নাটমন্দিরে হয়েছিল পোষ্যপুত্র গ্রহণের যজ্ঞ। বিমলাকান্ত অশ্রুসজল চক্ষে দান করেছিলেন কমলাকান্তকে, দান গ্রহণ করেছিলেন বীরেশ্বর এবং ভবানী দেবী। জল সকলের চোখ থেকেই গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরাও কেঁদেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরাও কেঁদেছিলেন।

যজ্ঞশেষে অন্দরে লক্ষ্মীর ঘরের সামনের দরদালানে রায় পরিবারের সকলে রত্নেশ্বরকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

প্রথমেই আশীর্বাদ করেছিলেন একসঙ্গে যুগলে বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী।

সেই কাত্যায়নী দেবীর বোন বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা বসে বলে দিচ্ছিলেন ক্রমপর্যায়! এ আর এক মানুষ। বীরেশ্বর রায় পুত্রের হাতে দিয়েছিলেন নিজের হাতের হীরের আংটি। ভবানী দেবী দিয়েছিলেন একসেট সোনার বাসন।

ভদ্রমহিলা বলেছিলেন—ওমা! বাটি যে খালি গো। ওতে বাটি ভরে দুধ দাও। তুমি মা। দাও দাও। ওগো দুধ আন—দুধ আন। সন্তান নিচ্ছ—মা—ও কি সোনায়-দানায় মেলে? মেলে মায়ের দুধে। একবাটি দুধে তোমার মাই থেকে গেলে একফোঁটা মিশিয়ে দাও। না-থাকে, ওই ঘরে যাও, গিয়ে দুধে মাইয়ের বোঁটা ঠেকিয়ে দাও! তারপর মুখে অন্ন দাও দুটি। ওই অন্নপ্রাসন হল। হ্যাঁ। তারপর দুজনে বস। বীরেশ্বর আর তুমি। বউমা, তুমি ছেলেকে আগে কোলে নাও। উঠে বস ভাই রাজাবাবু নাতি আমার, রায়বংশের এ কুল ও কুল দুকুলের শিবরাত্রির শলতে—মায়ের কোলে উঠে বস। মায়ের কোলে এলে তুমি। বা-বা-বা—কি মানিয়েছে দেখ! মা দুর্গার কোলে কাতিক! যশোদার কোলে গোপাল বলব না মা, গোপাল বড় নিষ্ঠুর, মাকে কাঁদিয়েছিলেন। মা কৌশল্যার রামচন্দ্র। এই ঠিক। ফিরে এল হারানিধি, এসে রাজপাটে বসবে! দুঃখ হচ্ছে কি জান—সীতা নাই! আঃ, আজ সীতা থাকলে কি হ'ত? আঃ, যাত্রায় গান শুনেছিলাম—অযোধ্যার প্রজারা কাঁধে ভার নিয়ে গান গেয়েছিল—'আয় ভাই ভার নিয়ে যাই অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।' এ ঠিক তাই!

কে ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠেছিল—তুমি তো রয়েছ ঠাকুমা, সীতা হয়ে বাঁয়ে ব'স না! আনন্দের টলমল সরোবরে যেন দমকা বাতাসে একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠেছিল। মেয়েরা সব হেসে উঠেছিল খিল খিল করে। বীরেশ্বর রায়ের মত দুর্দান্ত পুরুষের সামনেও তাদের হাসতে ভয় হয় নি!

বীরেশ্বর রায় নিজেও মৃদু মৃদু হেসেছিলেন।

ঠাকুমাটি বলেছিলেন—কে লা?

কেউ সাড়া দেয় নি। ঠাকুমা বলেছিলেন—এ নিশ্চয় অঞ্জনা! ও নহলে কে বলবে এমন কথা। মর—মর—মর। আমায় মানাবে না ভাবিস বুঝি? ওলো, আমি রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর মাসতুতো বোন্। আমাদের গায়ের রঙ সোনার মত, রূপ আমাদের লক্ষ্মীর মত! সাজলে এখনও নাতিকে ভোলাতে পারি! মরণ!

আবার হাসির রোল উঠেছিল। ঠাকুমা বলেছিলেন—থাম, হাসিস নে, শুভকর্ম হয়ে যাক। বউমা, এইবার ছেলেকে চুমু খাও, খেয়ে তুমি বীরেশ্বরের কোলে দাও। নাও বাবা বীরু, কোলে নাও ছেলে, তোমার বংশধর—তুমিও চুমু খাও।

—এইবার নাতি, তুমি বস ভাই মা-বাবার সামনে কোলের কাছে। আমরা পাঁচজনে আশীর্বাদ করি। প্রথমে আমি!

বলে ধানদূর্বার সঙ্গে একটি মোহর দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। একখানি রূপোর থালায় মোহর সাজানো ছিল, বীরেশ্বর সেখানা ছেলেকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— প্রণাম কর। প্রণামী দাও।

রত্নেশ্বর রায় ঠাকুমাকে পাঁচখানা মোহর দিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

পিছন থেকে সেই কণ্ঠস্বর আবার শোনা গিয়েছিল—সুদশুদ্ধ নগদ বিদেয় ঠাকুমা! সকলে আবার হেসে উঠল। এবার বেশী। যেন হাওয়াতে বর্ষার এলোমেলো মাতন লেগেছে। এবং কালটাও যেন ভরা-ভর্তি বর্ষা বলে মানিয়ে গেছে বড় ভাল।

ঠাকুমা মুখঝামটা দিয়ে বলেছিলেন—মর মর মর। এমন মুখ যদি না-হবে তো এমন কপাল হবে কেন তোর?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—কেন ঠাকুমা, কপালটা আমার মন্দ কিসে বল। ফক্কাপুরের রাজরাণী, খুদকুঁড়োতে পেট ভরাই, রাত্রে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, বাড়ীর পাঁদাড়ে ঝোপে-ঝাড়ে শেয়াল ফৌজ পাহারা দেয়। রাজা আমার হবুচন্দর, খায়দায় কাঁসী বাজায়; কপাল আমার মন্দ কিসে বল?

বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, রত্নেশ্বর সকলেই এই মেয়েটির খোঁজে কৌতুক এবং কৌতূহলভরে তাকিয়ে দেখেছিলেন। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পায় নি। মেয়েটি পিছনে আত্মগোপন ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—মেয়েটি কে মাসীমা?

—আমারও বটে তোমার মায়েরও বটে ভাইয়ের নাতনী। আমার আপন ভাই। তোমার মায়ের তা হলে মাসতুতো ভাই। তাহলে দেখ তোমার মামাতো ভায়ের বেটী। তোমার ভাইঝি সম্পর্কে, নাম হল অঞ্জনা। ওদের গেরামে অঞ্জনাঠাকরুণ কালীমা আছে, তার দোর ধরেই হল ওই বেটী। তা আমাকে মধ্যে মধ্যে নেকে চিঠি, তোমাদের খবর নেয়; এবারে তুমি রাজসূয় অশ্বমেধ করছ বাবা, দেশদেশান্তরের লোক এল। প্রজাসজ্জন, তালুকদার, পত্তনীদার, বড় বড় নোক, হাকিম হুকিম, তা আমিও ওকে নিকেছিলাম—আসবি—অবশ্যি অবশ্যি আসবি। চোখের সাথক ক'রে যাবি।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—বেশ করেছেন মাসীমা। উচিত করেছেন। বলা তো আমাদেরই কর্তব্য ছিল। তা আমরা তো ঠিক জানতাম না! বেশ করেছেন।

বীরেশ্বর রায় ভবানীকে বলেছিলেন—তুমি খবর করো!

এদিকে আশীর্বাদ একের পর এক হয়েই চলেছিল। রত্নেশ্বর প্রণাম ক'রে অন্ত সকলকেই এক মোহর ক'রে প্রণামী দিয়ে চলেছিলেন!

আশীর্বাদের পালা শেষ হ'তেই এসেছিল প্রণামের পালা। রত্নেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে যারা ছোট তারা এবং দাসীরা ভিড় করে এসেছিল এগিয়ে। হঠাৎ ঠাকুমা বলেছিলেন—অঞ্জনা কই? ও অঞ্জনা? তুই তো বড় লো! আয় আয়। কাল তো হিসেবে হল তুই সাতদিনের বড়! আয় না লো!

এবার এগিয়ে এল অঞ্জনা। বললে—না ঠাকুমা, প্রণাম আমি নিতে পারব না। আমি সাতদিনের বড়, উনি আমা থেকে চৌদ্দ আঙুল মাথায় উঁচু। আমি মনে মনেই বলছি—ভগবান মঙ্গল করুন। মা কালী রক্ষে করুন আপদে বিপদে। জমিদার আছেন রাজা হোন। বলেই সে এগিয়ে এসে প্রথম প্রণাম করেছিল বীরেশ্বর রায়কে। একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, সুন্দর মুখশ্রী, মাথায় একরাশ ফোলা কোঁকড়া চুল, নাকটি একটু খাটো, চোখ দুটি অপরূপ

সুন্দর ; একটু রোগা দেখাচ্ছে। পরনের কাপড়খানা পোশাকী কিন্তু পুরনো। হাতে দুগাছি শাঁখা আর বাঁ হাতে নোয়া। একটু শীর্ণ। দেহে পরিচ্ছদে অভাব যেন প্রকট হয়ে রয়েছে।

বীরেশ্বর তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন—সুখী হও মা। কিন্তু প্রণাম নেবে না কেন রত্নেশ্বরের ? সম্বন্ধে বড়।

—না—না মামাবাবু। না। বলে সে ভবানীর পায়ে প্রণাম করেছিল। ভবানী দেবী তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বলেছিলেন—ছেলেপুলে কি মা ?

বলে উঠলেন ঠাকুমা।—তবে আর বলছি কি মা। ছেলেপুলে হয় নি।

বীরেশ্বর বললেন—প্রণাম কর রত্নেশ্বর।

রত্নেশ্বর সর্বাগ্রে কয়েকখানা মোহর তুলে নিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হল। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে এসে হেঁট হয়ে অঞ্জলি পেতে বললে—দিন হাতে দিন। সোনা পায়ে রাখবার ভাগ্যি আমার নয়। আর প্রণাম ওই হল। রাজাবাবুর কোন দূরসম্পর্কের গরীব বোন, রাণী কাত্যায়নী দেবীর মাসতুতো বোনের খুড়তুতো ভাই তার নাতি। কথায় বলে 'সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউ-এর বোনঝি জামাই'। দিন।

বলে অঞ্জলি পেতে মোহর কটা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিল—বাবু রত্নেশ্বরকে রাজা কর ঠাকুর। ধনে পুতে সংসার ভ'রে দাও।

কণ্ঠস্বরে তার এমন আন্তরিকতা যে সকলে তার কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর সম্পর্কে ছোটদের প্রণামের পালা তারপর দাসীদের। কুটুম্ব সজ্জন—গ্রামের জ্ঞাতিদের মেয়েরা—দল বেঁধে এসেছিল। এবং তারা ভিড় করে ঠুক্‌ঠাক্ প্রণাম শুরু করে দিয়েছিল। এতক্ষণে রত্নেশ্বর সহজ হয়ে উঠেছিলেন। হাসিমুখে প্রত্যেকের হাতে একটি করে গিনি দিয়ে তাদের বিদায় শেষ করেছিলেন।

তারপর বাড়ীর দাসদাসীরা।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—বেলা তিন পহর হয়ে গেছে। তোমরা একসঙ্গে প্রণাম কর। তোমাদের সকলে প্রত্যেকে পাঁচ টাকা করে পাবে।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—আমার সঙ্গে আয় রত্ন। একটা কাজ বাকী আছে। আয়। বলে বলেছিলেন—মহাবীর, এখন কেউ যেন না আসে!

বীরেশ্বর রায় তখন প্রায় সুস্থ, শুধু একটা পা একটু টেনে চলতে হয় ; লাঠি নিতে হয়েছে। তার সঙ্গে তিনি রত্নেশ্বরের কাঁধের উপর ভর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেলেন। দোতলায় এই মহলে তিনি ভবানী এবং রত্নেশ্বর ছাড়া কেউ থাকে না। আর একজনকে ভবানী দেবী নিয়ে এসেছেন, সে হল সোফি বাঈ। বিবিমহল বিশিষ্ট অতিথিতে ভর্তি। বাইজীর দল, খেমটার দল, সেসব অন্য জায়গায় থাকে। সোফিকে ভবানী এখানে একখানা কোণের ঘরে থাকতে দিয়েছেন। বীরেশ্বর রায় কিছু বলেন নি। রত্নেশ্বর বলেছিল—লোকে কি বলবে ?

ভবানী বলেছিলেন—কি বলবে ? বলবার কি আছে। আমার বাপের শেষকৃত্য আমি করতে পারি নি, ও করেছে। তারপর ছ' বছর ও ওঁর সেবা করেছে। এতেও যদি ওর থাকলে নিন্দে হয়, তবে সে নিন্দে মাথায় ক'রে নিতে হবে। তাছাড়া ওর আচার-আচরণ

খাওয়া-দাওয়া কোনটেতে কোন নিন্দের কি আছে বল ? তুই কি ভেবেছিস রত্ন, মাসোহারার নাম করে ওর মুখ-বন্ধের জন্যে বেঁধে রেখেছিস ? ছি !

রত্নেশ্বর আর কথা বলেন নি। সোফি বাঈ সেইদিন থেকেই রায়বাড়ীর তনখা নিয়ে জানবাজারেই কাছাকাছি একটা বাড়ীতে থাকে। নিত্য সন্ধ্যার সময় আসে, বীরেশ্বরের সামনে মেঝেতে বসে থাকে, ভবানী দেবী বসে থাকেন বীরেশ্বর রায়ের বিছানায় ; কথাবার্তা বলেন। গল্পগুজব করেন। তারপর একখানা গান গেয়ে চলে যায়। বেশভূষা করে না সোফিয়া। হিন্দুস্থানী মেয়েদের ঢঙে লালপেড়ে শাড়ী পরে। আভরণের মধ্যে হাতে দুগাছি বালা, চুল সাধারণত এলোই থাকে। কোন কোন দিন বেণী রচনা করে সাধারণ একটা খোঁপা বাঁধে।

স্কুলের বনিয়াদ পত্তনের সময় একবার সে এসেছিল। সেবার বীরেশ্বর তাকে নিয়ে এসেছিলেন, সাহেবদের এদেশী খাঁটী গান গেয়ে শোনাবার জন্যে। এবার ভবানী নিয়ে এসেছেন। তাঁদের স্বামীস্ত্রীর জীবনের শুভকর্মে সোফিকে তিনি বাদ দিতে পারবেন না। এবং প্রথমে বিবিমহলে জায়গা দিয়ে তাঁর মনটা খুঁতখুঁত করেছিল তাই তিনি এক কোণের একখানা ঘরে তাকে এনে রেখেছেন।

তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রান্না সোফিয়ার একজন হিন্দু দাসী করে নেয়। দেবতার প্রসাদও খায়। খায় না শুধু মাংস প্রসাদ। এমনিতেও সে মাছ মাংস পেঁয়াজ এসব খায় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে গেলেন ভবানী নিজের ঘরে। বললেন—বস। তারপর নিজে গিয়ে ডাকলেন সোফিকে।

সোফি উপরতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরদালানে এই অনুষ্ঠানপর্বটি দেখছিল। ভবানী এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে নিয়ে এসে বললেন—বেটাকে আশিস করো সোফি।

—আমি ? বুকে হাত দিয়ে অসীম বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—আমি ?

—হ্যাঁ। তুমি! বাবুজীর তুমি সেবা করেছ। বহুৎ সেবা করেছ। আমার পিতাজীর তুমি শেষ কাজ করেছ। তুমি আমার বহেন সোফি। আমার বেটা সে কি তোমার বেটা নয় ? তোমার আশিস না নিলে তো ওর আশিস পুরা হবে না সোফি!

সোফি অকস্মাৎ চোখ বন্ধ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে দুটি জলের ধারা নেমেছিল চোখ থেকে। তার চোখ খুলে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে হেসে বীরেশ্বরকে বলেছিল—মালিক, আপনিও কি এই হুকুম করছেন ?

বীরেশ্বরও বোধহয় আবেগে বিচলিত হয়েছিলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। মুখ না-ফিরিয়েই তিনি বললেন—আমার কলেজার কথা ভবানী জানে সোফি!

সোফি এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—বহুরা! বেটা বলব ? বলেছিল রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর সারাজীবন চরিত্র সম্পর্কে সজ্ঞানে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সকল রকমের ছুৎমার্গ পরিহার করে চলেছেন। কিন্তু সেদিন তিনিও আবেগে অভিভূত হয়েছিলেন, তাঁর মনকে তিনি কঠোর কঠিন ক'রে রাখতে পারেন নি। তিনি মুখে উত্তর দেন নি, হাঁটুগেড়ে বসে ওই মুসলমানী বাঈয়ের পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকিয়ে মাথা হেঁট করেছিলেন আশীর্বাদের জন্যে। সোফিয়া তার

মাথায় ডান হাত ঠেকিয়ে অন্য হাতখানি উপরে তুলে চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলেছিল—মেরি জিন্দিগী সফল হো গয়ি। আল্লা মেহেরবান, আমার এই বেটাকে তুমি দুনিয়ার বাদশা করে দিয়ো।

তারপরেই সে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে।

* * *

বিকেলে হয়েছিল বাইরের লোকেদের সঙ্গে সম্ভাষণ। নায়েব আচার্য এইদিনেই পুণ্যাহের দিন স্থির করেছিলেন। কালীবাড়ীর বারান্দায় বীরেশ্বর রায়ের পাশে বসে রত্নেশ্বর রায় পুণ্যাহের টাকা গ্রহণ করবেন স্থির ছিল।

পুণ্যাহ সাধারণতঃ বৎসর শুরু না হলে হয় না। চৈত্র মাসে আখেরী গেলে তবে পুণ্যাহের কথা। কিন্তু সে প্রথা লঙ্ঘন করে আচার্য দোলের দিন পুণ্যাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেছিলেন—আমরা চৈত্র কিস্তির রাজস্ব দাখিল ক'রে দাখিলা নিয়েছি কালেক্টরীতে। সুতরাং সম্পত্তিতে তো আমাদের স্বত্ব আগামী বছরেও বজায় আছে। প্রজাদের সঙ্গে বছরের হিসেব-নিকেশ চৈত্রতেও শেষ হবে না। চলবে। সুতরাং পুণ্যাহ করব, তাতে কার কি বলবার আছে?

বিকেলে বীরেশ্বর ক্লান্ত ছিলেন বলে নিচে নামেন নি। তিনি সন্ধ্যার পর নামবেন। রত্নেশ্বর একলা বসেই পুণ্যাহের 'সেহা' ও টাকা নিচ্ছিলেন। পাশে গিরীন্দ্র আচার্য বসে 'সেহা' অর্থাৎ মহালদিগরের নামধাম ইত্যাদি মিলিয়ে নিয়ে টাকা গুনে রত্নেশ্বর রায়ের হাতে দিচ্ছিলেন এবং দুজন নায়েব বসে সেহাগুলিতে এস্টেটের মোহর ছাপ দিয়ে মণ্ডলদের ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। এবার পুণ্যাহের টাকার সঙ্গে আরও একদফা টাকার আমদানি ছিল। সেটা রায়বংশের নতুন উত্তরাধিকারী রত্নেশ্বর রায়ের নজরানা। মণ্ডলেরা নজর দিয়ে প্রণাম করছিল। একজন কর্মচারী লিখে যাচ্ছিল নজরনাদাতা প্রজার নাম ও পরিমাণের অঙ্ক। ওদিক থেকে আর একজন বিদায় করছিল মণ্ডলদের। প্রত্যেককে কাপড় চাদর এবং নগদ টাকা দিয়ে বিদায়। টাকা রাখা হচ্ছিল রূপোর খড়াতে!

পুণ্যাহ আরম্ভে ঢাক বেজে থাকে—আবার শেষেও বাজে। ঢাকের অগ্রাধিকার বজায় রেখেও রসুন চৌকি বাজবার ব্যবস্থা। পুণ্যাহের আমদানি শেষ হলেই টাকার ঘড়া নিয়ে গিয়ে কালীমায়ের বেদীর নিচে রাখা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজবার কথা।

কিন্তু আচার্য হাত তুলে ঢাক বাজাতে নিষেধ করে হেঁকে ঘোষণা করে বললেন—কাল সকালে মহল দিগরের খেয়াঘাট বা সরকারী নয়, আর হাট, তার সঙ্গে বার্ষিক জলকর আর বনকরের পাতা মহল, কয়লা মহলের ডাক হবে। যারা ডাকবে তারা যেন উপস্থিত হয়। আর একটা কথা, এবার পুণ্যাহে সব মহলের পুণ্যাহের টাকা এসেছে। আসে নি একমাত্র মওলান তৌজি বীরপুরের টাকা! সুতরাং এই মওলান তৌজির মণ্ডল আর মণ্ডল থাকতে চায় না বা অক্ষম। কাজেই কাল ওইসব ডাকের সঙ্গে এই বীরপুরের মণ্ডল পদ ডাকের ওপর বিলি করা হবে। সর্বাগ্রে ওই মণ্ডলানের ডাক হয়ে তবে অন্য ডাক হবে। নে, এবার বাজা। না। দাঁড়া। সন্ধ্যের পর রাজরাজেশ্বর প্রভুর মা আনন্দময়ীর দোল খেলা হবে। তারপর রাত্রে

হবে কীর্তন গান। আর কৃষ্ণযাত্রা। বাজী পুড়বে। ব্যাস—হয়েছে, নে, বাজা।

ঢাক বাজতে শুরু করেছিল।

সমস্ত কিছুর মধ্যে আনন্দ এবং উল্লাসের একটা স্রোত বইছিল, তার মধ্যে একটি অন্তঃস্রোত বইছিল বা গভীর একটি ঘূর্ণি আবর্তিত হচ্ছিল, যেটির লক্ষ্য হল গোপাল সিং।

বহুজন অর্থাৎ বহুপ্রজার ছোটখাটো দরবারও আছে। বাকী খাজনা পড়ে গেছে, কিছু মাফ চাই। না-হলে পেরে উঠছে না। দু' একজন অতি নাতোয়ান প্রজা বাকীটা সবই মাফ চায়। কেউ এসেছে—তার একটি মালের পুকুর আছে, সেটি সে সেলামী দিয়ে নির্দায় বা মোকররী মৌরসী করে নিতে চায়।

কেউ চায়—জমিদারের খাস পুকুর বন্দোবস্ত নিতে।

কেউ চায়—তার বাপ জমিদারের খাস পতিতে গাছ লাগিয়েছিল সেই গাছগুলির ছাড় নিতে। হুজুরের দয়া হলে যদি তলস্থ জমিটুকুও পায় তবে সে একটি বাগান করবে। ছেলেরা আম কাঁঠাল খাবে।

দু' চারজন এসেছে—দেবতা প্রতিষ্ঠা করবে তার জন্য পাকা ইমারতের অনুমতি চাই।

অনেক ব্রাহ্মণ এসেছেন, তাঁদের কারুর আছে টোল, কারুর আছে দেবসেবা, তাঁরা জমিদার দপ্তর থেকে বৃত্তিপ্রার্থী। কেউ-কেউ দু-চার বিঘা জমিপ্রার্থী। বাউল-বৈরাগীরাও এসেছে, তারা মহাপ্রভুর সেবা করে, আখড়া স্থাপন করেছে। সেবার জন্য দু-চার বিঘা জমি তারাও চায়। তবে তারা ব্রাহ্মণদের মত নিষ্কর চায় না, খাজনা দেবে, তবে সেলামী দিতে পারবে না।

গোমস্তাদের মধ্যেও প্রার্থী আছে, তারা তহবিল তছরূপ করেছে, মামলা হচ্ছে না হবে, তার থেকে তারা অব্যাহতি চায়।

কুম্ভকারেরা এসেছে—জমিদারের খাস জায়গায় মাটি নিতে, খাজনা দিতে হয় সেটা মাফের অনুমতি হোক।

মেদিনীপুরে মাদুরের অনেক কারিগর আছে। তারা মাদুরের কাঠির চাষ করে জলা জায়গায়, বিলে, পুকুরে, তার খাজনা লাগে, সেটা মাফ করা হোক।

কোন গ্রামের লোকের আর্জি—তাদের গ্রামে পানীয় জলের অভাব, পুকুর একটি কাটিয়ে দেওয়া হোক।

কোন গ্রাম চায় গ্রামের সরকারী দেবস্থানের উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য।

গুজব রটেছে, এবার বীরেশ্বর রায় কল্পতরু হয়েছেন, ফেরাবেন না কাউকে। ওই নতুন বংশধরের হাত দিয়ে যে যা চাইবে দেবেন।

এরই মধ্যে গোপাল সিংয়ের ব্যাপারটি শুধু ক্রুর-কুটিল। দেওয়ান আচার্য দীর্ঘাকৃতি ভগবান মণ্ডলকে চোখে চোখে রেখেছেন। সে এসে উঠেছে তার শ্বশুরবাড়ীতে, কিন্তু দুবেলা তার খাবার নিমন্ত্রণ রায়বাড়ীতে। জলখাবার বা দেবতার প্রসাদ উপলক্ষ্য করে মিষ্টান্ন ফল-মূল ভগবানের শ্বশুরবাড়ীতে ভগবানের জন্য পাঠান হচ্ছে মায় ভাল তামাক, টিকে পর্যন্ত পাঠাতে ভোলেন নি তিনি। একজন অতি সাধারণ লোককে তিনি ভগবানের শ্বশুরবাড়ীর সামনে

মোতায়েন রেখেছেন ভগবানের উপর নজর রাখবার জন্য। ভগবান যেন না পালায়। কয়েক-বার তাকে ডেকে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সে সাহসে ঠিক আছে কিনা। এবং সাহসও তাকে দিয়েছেন।

এবেলা পুণ্যাহ শেষ হতেই বীরেশ্বর রায়ের ঘরে রত্নেশ্বরকে বসিয়ে ভগবানকে ডেকে পাঠালেন। এ ঘরের দারোয়ান এখন ছেদী সিং, সে কাটা পা নিয়ে একটা চওড়া টুলের উপর মস্ত মুরেটা বেঁধে বসে থাকে; হুকুমমত বাইরের লোককে দরজা ছেড়ে দেয়। আচার্য বললেন —ছেদী, খুব লম্বাসে এক আদমী, সমঝা—কালাসে—আয়েগা, পাইক লে আয়েগা, উস্কা খাতির দেখলাবে। আঁর বলবে, চলে যাইয়ে মণ্ডলজী, ছোটা হুজুর তো আপকা লিয়ে বৈঠা হ্যায়। আঁ? উসকা পাশ হামলোকের কাম হ্যায়। উ লেনে হোগা। সমঝা!

—হ্যাঁ হুজুর। সমঝ লিয়া! খাড়া হো যাঁউ?

—না-না। খাড়া কেন হোগা? ওতনা নেই। তবু ওরই মধ্যে সমঝাচ্ছো না? থোড়া খাতির! হঁ!

বলে হেসে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে রত্নেশ্বরকে বুঝিয়ে ছিলেন, কি বলতে হবে!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—ভগবান নেবে। আপনি ভাববেন না। আমি তাকে বোঝাবার জন্যে ঠাকুরদাস দাদাকে লাগিয়ে রেখেছি! ঠাকুরদাসদের সঙ্গে কুটুম্বিতে আছে।

একটু হেসে আচার্য বলেছিলেন—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী সাহেব। আপনার বুদ্ধি রাজবুদ্ধি। জানেন একটা কথা আছে, কাঁটার মুখে শান দিতে হয় না, কাঁটা আপনার ধার নিয়েই গজায়; তেমনি রাজা জমিদারের ছেলেকে রাজবুদ্ধি শেখাতে হয় না, ও নিয়েই জন্মায়।

রত্নেশ্বর ভগবানকে কথা দিয়েছিলেন—তুমি শুধু সামনে দাঁড়াও ভগবান। যা করবার আমি করব। টাকা লোক সব আমার। কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে।

উপু হয়ে বসে হাতজোড় করে ভগবান বলেছিল—আমি ঠিক আছি হুজুর। আজ পঁচিশ বছর এই মনে-মনে জপছি। এই দ্যাখেন।

বলে হাঁটুর উপরে কাপড়টা তুলে দেখিয়েছিল, উরুতের উপর একটা দাগ। কাটা দাগ।

—ওটা কি?

—গোপাল আমাকে কুপিয়েছিল হুজুর। তখন আমার জোয়ান বয়স। গোপালও তখন জোয়ান, আমরা হাম জুটী। প্রথম প্রথম আমি মশায় ওর ডান হাত ছিলাম। আমার বাবার অবস্থা ভাল ছিল খাতির করত। একবার বাবু, আমার জেঠার জমি কিনলে পাঁচ কাঠা, জেঠার কন্যেদায়ের সময়। তার সঙ্গে আমাদের এক কিত্তে জমি, হুজুর, দো ডাকলে রা কাড়ে, সে কিত্তেটার অর্ধেক আর পাঁচ কাঠা জমির সঙ্গে রাতারাতি আল কেটে এক করে দিলে। আমি সামলাতে পারি নাই, মশায় ছুটে গিয়ে ওকে বলেছিলাম—ডাকাত কোথাকার?

ও মশায় হেঁসো দিয়ে কেটে তাল খাচ্ছিল। সেই হেঁসোটা খপ করে বসিয়ে দিলে এইখানে। ছ মাস বিছানায় পড়েছিলাম। কিন্তু কি করব? রাজাদের প্রিয়পাত্র। দারোগা-মুন্সীর সঙ্গে খাতির। মুখ বুজে আজ এই পঁচিশ বছর পড়ে আছি। সয়ে যাচ্ছি। এবার

আপনকার মত বল পেয়েছি, আমি পিছুব কেন ?

—মেয়েছেলে সব নিয়ে এসেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সবাই এসেছে।

—দেখ, আমার ধারণা, খবরটা পৌঁছুবামাত্র ও খেপবে। ঘরে আগুন লাগানো ওর একটা ঝোঁক। শেকল দিয়ে আগুন দেয়। সেই জন্যে বলছি। ঘর পুড়লে আমি ঘর করে দেব। বুঝেছ। আমি লোক বল দেব!

—গরু-বাছুর ? তার ব্যবস্থা ?

সে ম্যানেজারবাবুর কহত মত কাল ভোরে আমার লোকেরা চরাবার নাম করে নিয়ে যাবে মাঠে, আপনকার কুতুবপুরের কাছারীর চাপরাশীরা ধরে নিয়ে যাবে কাছারীতে।

ঠাকুরদাস বসেছিল তার পিঠের কাছে। পৃষ্ঠবলের মত। ঠাকুরদাস সেই কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত বরাবর রত্নেশ্বরের সঙ্গে আছে। শুধু শ্যামনগরের শোধের সময় তাকে কলকাতায় এক রকম আটক রাখা হয়েছিল। আসতে দেওয়া হয়নি। সে সঙ্গে থাকলে এ্যালিবি সত্ত্বেও বিপদের সম্ভাবনা ছিল। শ্যামনগর ফিরতেও দেন নি আচার্য। বলতেন—কত্তার হুকুম নাই। তুমি যাও, গিয়ে হুকুম নিয়ে এস।

কিন্তু সে ভরসা ঠাকুরদাসের হত না। এবার সে এসেছে এবং শ্যামনগরের অভ্যাগত ভট্টাচার্যদের জ্ঞাতিদের এবং অন্যান্য লোকেদের দেখা-শুনার ভার তার উপর! শ্যামনগরে ধর্মঘট আজও অব্যাহতভাবে চলছে। গত আট মাস ধরে একটি পয়সা আদায় পায় নি দে-সরকার। ওদিকে রবিনসনের দেনার ডিক্রিতে ঠাকুরপাড়ার কুঠী ক্রোক হয়ে আছে। ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয় নি বলে আজও নীলামে ওঠে নি। ঠাকুরদাসের স্ত্রী-পুত্র গেছে। সংসারে কেউ নেই। ঘরের মমতা বলতে ঘর আর জমি ছাড়া কিছু নেই। সে বেশ আছে। এবং তারও প্রতিজ্ঞা—শ্যামনগর দে-সরকারদের হাত থেকে কীর্তিহাটে না-আসা পর্যন্ত সে শ্যামনগর ফিরবে না।

এ বাড়ীতে সমাদরের মধ্যে সে ভাল আছে। অনেক কিছু বুঝেছে। গোপাল সিংয়ের উপর ক্রোধ তার কম নয়। রবিনসন গেছে, দে-সরকার ঘায়েল হয়েছে, এবার গোপাল সিং। সে রত্নেশ্বরের কথা মত ভগবান মণ্ডলকে ভজিয়েই চলেছে।

সে এবার বললে—দাদাবাবু, আপনি একবার কর্তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন কাকা মশায়ের। ওঁর একটা কথা। বুঝলেন না—তা হলেই বাস!

গিরীন্দ্র আচার্য একটু হেসে বললেন—কেন হে ঠাকুরদাস, শালগ্রামের আর ছোট-বড় আছে নাকি ? তোমাদের বুড়ো শিব জলে থাকেন সম্বছর, চৈত্তির মাসে তুলবার সময় দেখা যায়, অনেক বাচ্চা শিব হয়েছে। বাচ্চা হলে কি হবে তারাও শিব। উনি বলছেন—

—আজ্ঞে না। তবে কত্তার চরণের ধুলো মাথায় নিলে বুকে বল হবে। কত বড় প্রতাপ! এই আর কি! একবার কাছ থেকে চোখে দর্শন। আর দুটো বাক্যি।

রত্নেশ্বর হেসে বললেন—বেশ তো। তুই যা তো ঠাকুরদাস দাদা, দেখে আয় তো কি

করছেন উনি। মাকে বলে আয়, একবার আমি যাব একজনকে নিয়ে। ওঁর সঙ্গে কটা কথা আছে!

উপরের দক্ষিণের বারান্দায় বীরেশ্বর তখন আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। ঘুমিয়েছেন এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে কাঁসাইয়ের ওপারের পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। আজ জীবনের সব বিক্ষোভ যেন মিটে গেছে। সাম্রাজ্যে যেন সম্রাট হয়ে বসেছেন। কিন্তু বাঁ পাখানা দুর্বল হয়ে গেল।

সামনে কয়েকখানা চিঠি পড়ে ছিল। কলকাতা থেকে এসেছে। তার মধ্যে একখানা চিঠি লিখেছেন বন্ধু কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখে এসেছিলেন বীরেশ্বর রায়। কলকাতায় ফিরে অসুস্থ অবস্থার জন্ম দেখা করতে পারেন নি। কোন খবরও দেন নি। এসব কথা জানাতে কেমন সঙ্কোচবোধ করেছিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তাঁকে চিঠি লিখে যতটা জানানো সম্ভবপর তা জানিয়েছেন।

সিংহ তাঁর চোখা কলমে অল্প কয়েক ছত্র লিখেছেন।

"রায়মহোদয়, পত্রযোগে ভবদীয় বিবরণে চমৎকৃত হলেম। কাশীধামের বিখ্যাত সতীমাতা আপনার হারানো সহধর্মিণী! এ আশ্চর্য কাণ্ড। তার কথা অনেক শুনেছি মশায়। এমন কি ত্যাঁদড় রাম মল্লিক—তাঁর নাম করতে গদগদ হয়ে ওঠে। বলে তাঁর চলে যাওয়ার পথ থেকে ধুলো কুড়িয়ে পুরিয়া করে নিয়ে এসেছে! পরিহাস করছি নে মশায়, মহিলাটির বিবরণ অন্যের কাছে শুনে শ্রদ্ধা হয়েছে। যাক আপনি ভাগ্যবান। একটা অঙ্গ কমজোরি হয়ে যাওয়ার কল্যাণে তিনি ফিরেছেন, এখন অঙ্গটাকে অক্ষম করে বসে থাকুন অন্তত তার ভান করুন। তিনি সচলা হয়ে পাশে বসে সেবা করুন। তারপর ভাগ্নেকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন, এও উত্তম কথা। কলকাতায় এলে দেখব তাকে। এই উপলক্ষ্যে তার জন্য একটি সোনার ঘড়ি পাঠালেম। বলবেন—জমিদারবাড়ীর ছেলেরা দশটার আগে বিছানা ছাড়ে না; হুতোমপ্যাঁচা বলে—এতেই তাঁদের সর্বনাশ। বাবাজীকে ঘড়ি ধরে চলতে বলবেন, সাতটার আগেই যেন বিছানা থেকে ওঠেন। বলবেন—ভূগোলে যাই লেখা থাক, লোহিত সাগর পূর্ব দিকে, সেটা যেন তিনি কলম্বাসের মত ভোরে উঠে আবিষ্কার করেন।"

তিনি তাকিয়ে আছেন পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের দিকে। ভাবছেন কথাটা সিংহকে লিখতে হবে। লিখবেন—"আমি কিন্তু দিবানিদ্রান্তে পশ্চিম দিকে লোহিতসমুদ্র দেখিলাম।"

ভবানী দেবী বসেছিলেন ঘরের মধ্যে, তার সামনে বসে আছেন মাসিমা নিস্তারিনী দেবী।

ঠাকুরদাস ভিতরের দিকের বারান্দায় দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ডাকলে—মা।

—কে?

—আমি ঠাকুরদাস মা।

—ঠাকুরদাস? রত্নের কাজ শেষ হল?

—হয় নি। পুণ্যের ঘড়া আনা বাকী আছে। মায়ের অর্চনা হচ্ছে।

—সে তো সন্ধ্যের পর হবে। তুমি একবার আসতে বল তো তাকে।

—তিনি পাঠালেন মা—

—তাকে পাঠিয়ে দাও বাবা, আমি শুনব তার কাছে আমারও জরুরী দরকার আছে।

ঠাকুরদাস তাড়াতাড়ি রত্নেশ্বরের ঘরে এসে বললে—মা তোমাকে খুঁজছেন, যাও!

রত্নেশ্বর এসে দাঁড়াল। ভবানী দেবী ঘরে একলা বসেছিলেন, তখন নিস্তারিনী দেবী চলে গেছেন।

—আমাকে ডেকেছ?

—হ্যাঁ এ সব কি হচ্ছে তোর?

—কি মা?

—মাসীমা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন। বলছিলেন—তিনি শুনেছেন, তাঁকে নাকি তুই তাড়িয়ে দিবি প্রতিজ্ঞা করেছিস? কেন? আমাকে সেদিন ওই কথা বলেছিলেন বলে? আমার শাশুড়ী যদি থাকতেন তিনি যদি বলতেন? কি করতিস তুই?

রত্নেশ্বর অন্য দিন হলে প্রতিবাদ করতেন, মনে-মনে ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু আজ তা হলেন না। মনটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একটু হেসে বললেন—তাড়িয়ে দেব বলি নি। ঠিক করেছিলাম মাসোহারা দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেব। এ বাড়ীর গিন্নীগিরিটা ঘুচিয়ে দেব।

—না। উনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।

রত্নেশ্বর অত্যন্ত সহজভাবে বললেন—তা থাকুন। তুমি বলছ নিশ্চয় থাকবেন। কিন্তু ওঁকে বললে কে?

—বলেছেন যেই হোক। বলেছেন ন্যায়রত্নমশায়। উনি শুনেছিলেন ম্যানেজারবাবুর কাছে। কিন্তু ওসব হবে না!

—হবে না। ঠিক আছে। আমার নিজের মনটাও আজ খুঁত-খুঁত করছে দুপুরবেলা থেকে। উনি সেই তখন আশ্চর্য সুন্দরভাবে সব করালেন। আর কি সুন্দর কথাগুলো বললেন। আমি মা আশ্চর্য হয়ে গেছি। ভাবছিলাম, হ্যাঁ রায়বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম চালাবার জন্যে ওঁর মত গিন্নী না হলে চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলামও প্রতিজ্ঞা করেছি, ভাঙব কি করে! তা ভালই হল তোমার হুকুম!

ভবানী দেবী বলছিলেন—উনি আরও বলছিলেন অঞ্জনার জন্যে। ওর স্বামীকে একটা চাকরি দিয়ে ওকে এখানে রাখার কথা। মেয়েটির বড় খারাপ অবস্থা। বড় দুঃখ। ওকে তোকে বলতে বলে গেলেন।

রত্নেশ্বর বললেন—বেশ তো, তুমি বললে তাই হবে। তোমার ওই মাসশাশুড়ীটির পর এমনি একটি অন্দর-সুপারইনটেনডেণ্ট তো একজন লাগবে। অঞ্জনা মেয়েটি তা পারবে। হয়তো ঠাকুমার থেকে ভাল পারবে! উনি কোথায়?

—উনি? মৃদু ধমকে উঠলেন ভবানী। একটু চুপ করে থেকে চুপিচুপি বললেন—জানিস, তুই ওঁর কথা হলেই উনি-তিনি বলে সারিস, তিনি মনে দুঃখ পান। চাপা মানুষ, বলেন না। মধ্যে মধ্যে আমাকে বলেন—রত্ন এখনও আমাকে তোমার মত নিতে পারলে

না। নিলে না।

—কেমন লজ্জা করে। বেধে যায়!

—না। বাধবে কেন? যা, উনি বারান্দায় বসে আছেন, তামাক খাচ্ছেন।

রত্নেশ্বর এগিয়ে গিয়ে দরজা থেকেই ডাকলে—বাবা!

—রত্নেশ্বর! এস!

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, তাই বলছিলাম, মনে মনে হিংসা, ক্রোধ যতই থাক, সেদিন যদি গোপাল আসত আর আবেদন জানাতে পারত, তবে কি হত ঠিক বলা যায় না। সমস্ত রায়-বাড়ীতে সেদিন সন্তোষের একটি পরিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল; ক্ষোভ যা কিছু ওই গোপালকে নিয়ে। না আসাতে এ পক্ষের সে ক্ষোভ আরও বেড়েছিল।

রায়বাড়ীর এত বড় উৎসব সমারোহের মধ্যে গোপাল সিং সম্পর্কে বিদ্বেষ ও আক্রোশের অন্তঃশীলা স্রোতটি কোথাও একবার অযথা এঁকে-বেঁকে যায় নি, সোজা বেয়ে গিয়েছিল ক্যানেলের খালের মত।

রচনাটি দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের। মহিষাদলের নায়েব ওকালতি করেছিল গোপালের জন্য। দেওয়ান আচার্য বলেছিলেন—ও কথাটা বল না হে। কত টাকা দিয়েছে গোপাল? টাকাটা তাকে ফিরে দিয়ো। আমি তোমাকে দেব ও টাকাটা।

সে আর কথা বলে নি।

পরদিন সকাল থেকে কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ হয়ে চলেছিল। প্রথমেই ছিল একদিকে দানপর্ব, অন্যদিকে ডাকপর্ব।

কাছারীতে হচ্ছিল হাট-ঘাট, জলকর, বর্ণকরের ডাক। আর ঠাকুরবাড়ীতে চলছিল দান।

'ডাক'-এর কাজ চালাচ্ছিলেন দেওয়ান আচার্য। তবে প্রথমেই বীরসিং মৌজার 'মণ্ডলান' ডাকের সময় নিজে বীরেশ্বর রায় এসে বসেছিলেন একবার। সেটা এসেছিলেন আচার্যের কথায়। ভগবানের মনোভাব বুঝে তিনি বলেছিলেন—ওই সময়টায় খোদ মালিক মানে আপনি বসলে ভাল হয়। বল পাবে।

বীরেশ্বর রায় আগের দিন সন্ধ্যার সময় রত্নেশ্বরের কথায় ভগবানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সাহসও দিয়েছিলেন। আচার্য হুঁশিয়ার লোক, তিনি তবুও ওই অনুরোধ করেছিলেন, এবং বীরেশ্বরও এসে বসেছিলেন। বীরপুরের মণ্ডলান পদের ডাক ডাকতে একটি মাত্র লোক, ভগবান মণ্ডল। সে এসে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুর যদি অনুমতি দেন তো; আমি ডাকতে পারি!

বীরেশ্বর হেসে বলেছিলেন—তুমি তো ভগবান মণ্ডল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হুজুরের বীরপুরেরই প্রজা!

—বেশ তো। ডাক! গোপাল তো আসে নি! ডাক।

মানুষ মাত্রেই আপন সাধ্যভোর চতুর। ভগবানও সাধ্য চাতুর্যের সঙ্গে দশের সম্মুখে তাঁর অভয় এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল। বলেছিল—ডাকতে হুজুরের অভয়

চাই, আশ্রয় চাই। নইলে আমি সামান্য লোক, চাষী মানুষ, আমি পারব ক্যানে?

বীরেশ্বর বলেছিলেন—নিশ্চয়। সে তুমি পাবে বইকি! নিশ্চয় পাবে। আমার কর্মচারী যাবে, পাইক-বরকন্দাজ দরকার হলে তাও পাবে। সবই পাবে। ডাক।

ভগবান এক ডাকেই পেয়েছিল মৌজা বীরপুরের মণ্ডলান পদ। বীরেশ্বর রায় তার নজরানা না নিয়ে ডাক মঞ্জুর করে উঠে চলে গিয়েছিলেন অন্দরে। তারপর কাজ চালিয়েছিলেন আচার্য।

ওদিকে নাটমন্দিরে রত্নেশ্বর বসেছিলেন দুজন নায়েবকে নিয়ে, তিনি মহালের দেবস্থান মেরামতি বা নির্মাণ খরচা দান ও প্রার্থীদের কাউকে কিছু জমি, কাউকে বার্ষিক বৃত্তি, কাউকে পুকুরের ছাড়, কাউকে বাগান করবার অনুমতি মঞ্জুর করছিলেন। এ সবের ফর্দ কর্মচারীরা আগে থেকেই করে রেখেছিল, তাতেই তিনি সই করে দিচ্ছিলেন।

প্রহর খানেক, প্রহর দেড়েকের মধ্যেই এ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরম্ভ হয়েছিল লোকজনের জন্য উৎসব। সে নানারকম।

অন্যদিকে চলছিল আর এক বড় সমারোহের আয়োজন। তৃতীয় দিনে সব বিশিষ্ট বড় বড় লোকের শুভাগমন হবে। সাধারণ লোকজন অনেকই চলে যাবে। তারপর হবে বিশিষ্ট অতিথি আপ্যায়ন। তমলুকের এস-ডি-ও আসবেন, কাঁথীর এস-ডি-ও আসবেন। মেদিনীপুরের ডি-এস-পি তিনটে মুন্সেফী কোর্টের মুন্সেফ, পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর, উকীলমোক্তাররা আসবেন।

কাল সকাল থেকে বারোটার মধ্যে সকলে এসে পড়বেন। এর মধ্যে মেদিনীপুরের সদর এস-ডি-ও আসছেন সস্ত্রীক পুত্র-কন্যা নিয়ে, তাঁদের নিয়ে আসছেন বীরেশ্বরের খুড়তুতো দাদা দেবপ্রসাদ ঘোষাল এবং বউদি জগদ্ধাত্রী দেবী। ওঁরাই অনুরোধ করেছিলেন সদর এস-ডি-ও রাধারমণ চ্যাটার্জিকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করতে। রাধারমণবাবু দেবপ্রসাদবাবুর ভায়রা-ভাই; জগদ্ধাত্রী দেবীর পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছেন। তাঁরা কীর্তিহাটের কথাবার্তা শুনে কীর্তিহাট আসবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জগদ্ধাত্রী দেবী এবং দেবপ্রসাদবাবু এই কারণেই প্রথম দিন আসতে পারেন নি, তাঁরা ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

সুরেশ্বর বললে—আচার্য পাকা শিকারীর মত ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই হ্যারিসের মত; সে যেমন শিকারীর জন্যে মাচা বেঁধে তাকে সেখানে বসাবার আগে জানোয়ারের ট্র্যাকটির ডাইনে-বাঁয়ে, এখানে-ওখানে ডালের টুকরো ফেলে রেখে জানোয়ারটিকে সোজা নিয়ে আসে মাচানের সামনে, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

গোপাল সিংকে জানোয়ার আমি বলছি নে, তবে গোপাল সিংকে বাঘ বলব। নর-ব্যাঘ্র। বিক্রম তার বড়, ক্রোধ তার অসংহত, বুদ্ধি-বিবেচনা কম এবং তাকে সে অবহেলাই করে। কতকগুলো চাতুরী তার জানা আছে, তাই সে অভ্যাস করে রেখেছে। তার অতিরিক্ত বুদ্ধির খেলা যেখানে, সেখানে সে হেরে যায়। প্রবীণ বাঘের মত চতুর, সাবধানী—চেনা পথ ছাড়া অচেনা পথে হাঁটে না। কিন্তু এবার আচার্য তার খাদ্য নিয়ে টান মেরে ছেড়ে দিতেই সে বেরিয়ে এল। ঠিক পথে পথে এল।

আচার্য জানতেন আসতে হবে।

বীরপুরের মণ্ডলান ডাকের কথা তার কাছে পৌঁছুবামাত্র সে ক্ষিপ্ত হবে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কিছু একটা করবেই। সম্ভাবনাটা ছিল ভগবানের উপর ঝাঁপ দেবে। ভগবান সপরিবারে কীর্তিহাটে। আজ সকালেই তার গরু-বাছুর মাঠে যাবার কথা, কুতুবপুরের সীমানা বরাবর। সেখানে কুতুবপুরের কাছারীর পাইক-বরকন্দাজরা গরুগুলোকে ঘেরাও করে কাছারীতে পুরবে। নিস্ফল আক্রোশে গোপাল ভগবানের জনশূন্য বাড়ীতে আগুন দিয়ে দোল-পার্বনের মেড়াপোড়া বা বহ্ন্যুৎসব করবে। হয় তো কুতুবপুর পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। কাছারীও পুড়তে পারে।

তিনি কীর্তিহাটেও সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

তারপরই গোপাল পড়বে শিকারীর মাচার সামনে।

পরদিন সকালে এখানে সাহেব-সুবার আগমন হবে। তাঁদের সামনেই আসবে খবরটা। গোপাল সিংহের গতরাত্রির কীর্তির রিপোর্ট।

সরকারী সাহেবদের একটা ডিউটি হল অত্যাচারী জানোয়ার শিকার করা!

সুবিধা আর একটু প্রশস্ত হয়ে গেল। সেটা হল মেদিনীপুরের সদর এস-ডি-ও রাধারমণ-বাবুর জন্যে। তিনি আত্মীয়। দেবপ্রসাদবাবুর ভায়রা-ভাই। সদর এস-ডি-ও ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কালেক্টারকে জানাতে পারবেন।

এত বড় উৎসবের মধ্যে বিচিত্রভাবে গোপাল সিংকে নিয়ে তাঁরা যে জাল রচনা করেছিলেন, কেউ অনুমানও করতে পারে নি যে, সে জাল আশী বছর পরে পর্যন্তও বিস্তৃত হয়ে রইল এবং তাতে পড়বে এবার গোপাল সিংয়ের কেউ নয়, রায়বাড়ীর এক ছেলে এবং এক মহিমাময়ী বিধবা বধূ। রত্নেশ্বরেরই পুত্রবধূ!

*   *   *

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"সে দিন গোপাল সিংয়ের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই আমার ছিল না। নানা চিন্তা হইতেছিল।"

কখনও ভাবছিলেন—যা আমরা ভাবছি, তা যদি গোপাল না করে। যদি সে ধীর হয়ে অপেক্ষা করে। তারপর? তারপর ভগবানের সঙ্গে মিটমাট করে নেয়! যদি! চমকে উঠে ভেবেছিলেন—যদি ভগবান গোপালের বেনামদারই হয় গোড়া থেকে? তাহলে তো হেরে গেলাম!

অন্ততঃ এক বছরের জন্য হেরে গেলাম। গোপাল তার বেনামদার ভগবানকে সামনে রেখে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াবে, আর বলবে—আরে বাবা, হামি গোপাল সিং! হামি শিয়ালকে মানে না বাবা। রায়বাবু! উ লোকেরা শিয়াল আছে। তাহলে এক বৎসর অন্ততঃ কীর্তিহাট অঞ্চলে মুখ দেখানো চলবে না।

পথ আছে। গোয়ানরা আছে। ওরা সব পারে। কলকাতায় লোক মিলবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রত্নেশ্বর।

ফাল্গুনের শেষ। কীর্তিহাট অঞ্চলের লালমাটি ফাল্গুনেই উত্তাপ আকর্ষণ করে। খেয়ে

বিছানায় শুয়েও ভাবছিলেন। টানা-পাখা চলছিল। তখন চিন্তার মোড়টা ফিরেছে। তখন ভাবছিলেন—খবরটা এতক্ষণে নিশ্চয় পৌঁচেছে বীরপুর। এতক্ষণে কেন? আগেই পৌঁচেছে। আচার্যের হুকুম আছে কুতুবপুর কাছারীর উপর যে, বেলা এক প্রহর বাদে, ভগবানের গরু-বাছুর আটক করার পরই, বীরপুর মৌজার ডাকের কথা চাউর করে দেবে।

খবর গোপাল পেয়েছে। সে ভগবানের বাড়ী পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে নিস্ফল আক্রোশে। বাড়ীতে কিম্বা হয় তো পথে পথে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে! ভাবছে কি করবে? অনেক কিছু করতে পারে গোপাল। অসাধ্য কর্ম তার কিছু নেই। এই আজ রাত্রে, এখানে নানা উৎসব। কাল কীর্তন-কৃষ্ণযাত্রা গেছে। আজ খেমটা নাচের আসর পড়বে। বারোটার পর শুরু হবে যাত্রাগান। বাইরে সামিয়ানা খাটিয়ে বড় একটা আসরে কবিগান, চম্পাবতীর গান চলবে। লোক আজ অনেক জমবে। গোপাল হয়তো চলে আসবে এই সুযোগে। একটু ভোল পাল্টে এলে কে চিনবে। মুখে গামছার ফেটা বেঁধে—!

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম নয় তন্দ্রার মত!

সে তন্দ্রার মধ্যে গোপাল সিং রত্নেশ্বর রায়কে ছাড়ে নি, অথবা রত্নেশ্বর তাকে ছাড়েন নি। স্বপ্ন বা তন্দ্রার মধ্যে কল্পনায় তিনি ছদ্মবেশী গোপাল সিংকে দেখেছিলেন ভিড়ের মধ্যে। সে যেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রায়বাড়ীর দোতলার দিকে তাকিয়ে আছে ক্রুদ্ধ কুটিল দৃষ্টিতে। তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন—পাকড়ো! পাকড়ো। ওই-ওই! তিনি বুঝতেও পারছিলেন এটা সত্য নয়, স্বপ্নের মত কিছু, তবু জেগে উঠতে পারছিলেন না। জাগিয়ে দিলেন ভবানী দেবী। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন—রত্ন! রত্ন!

এতক্ষণে উঠে বসেছিলেন রত্নেশ্বর এবং লজ্জিতও হয়েছিলেন। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন—এমনভাবে চেঁচাচ্ছিলি কেন? স্বপ্ন?

হেসে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হ্যাঁ। দেখছিলাম, শয়তান গোপাল সিং এসে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীতে রাত্রে থাম বেয়ে উঠবার মতলব করছে।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—তোকে যে গোপাল সিংয়ের আক্রোশ পেয়ে বসল রত্ন!

ঠিক সেই সময়ে দরজায় দাঁড়িয়ে একটি তরুণী মেয়ে বলেছিল—খুড়ীমা।

—আন! ভিতরে এস!

মেয়েটি ঘরের ভিতরে ঢুকল, হাতে একটি রূপোর গেলাস। দরজার মুখে বাইরের আলো-কে পিছনে রেখে দাঁড়িয়েছিল বলে রত্নেশ্বর তাকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু ঝি সে নয়, এটা বুঝতে পেরেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে?

—অঞ্জনা!

—ও!

—বড় কাজের মেয়ে। বড় ভাল। ওকে আজ সকালে বললাম—তুমি এখানেই থাক। বুঝলে! আপন বাড়ীই ভাববে। তা বললে—খুড়ীমা, যে বাড়ীতে থাকি, সে বাড়ীর খড়ের চালে খড় নেই, শুয়ে চাঁদের আলো দেখি, রোদের তাপে পুড়ি। এত বড় বাড়ী, আপনার ভাববার মত ভাবনা কোথায় পাব? বরং ভাবনা হবে এমন বাড়ীতে থাকব কেমন করে।

বললাম—থাকবে ওই আপনার ভেবে। ভাবতে পারলে ও ভাবনা হবে না। বললে—কি করতে হবে আমাকে? বললাম—মাসীমার সঙ্গে থেকে শিখে নাও সব। মাসীমা আর ক'দিন। পরে সব তুমি করবে। বললে—বেশ। বিকেলবেলা সরবৎ তৈরী করে এনেছে নিজে থেকে। বললে—দেখুন তো খুড়ীমা, কেমন হয়েছে? করে আনলাম আপনাদের জন্যে। কি চমৎকার করেছে, কি বলব! বাবু খেয়ে তারিফ করলেন। চমৎকার হয়েছে! তোর জন্যে আনতে বললাম—নে, খেয়ে দেখ!

—দাঁড়াও, মুখে জল দি!

সত্যই সরবৎটুকু চমৎকার লাগল। স্বাদ তো বটেই, ঘোল এবং চিনির সঙ্গে আমআদার স্বাদ ও গন্ধ; এবং আরও কিছু আছে। সরবৎটুকুতে গাঢ় এবং মিষ্টি গন্ধ দিয়েছে। আম-আদার গন্ধকে ছাপিয়ে উঠছে গন্ধ!

মুখে দিয়ে খানিকটা খেয়ে রত্নেশ্বর বললে—তাই তো!

কাশী অঞ্চলে সরবতের চল খুব, তরিবৎও খুব। কাশীতে মানুষ রত্নেশ্বর আবার চুমুক দিয়ে আবার বললে—আতর? কিসের আতর?

ভবানী দেবী বললেন—আমিও বুঝতে পারিনি। কিন্তু উনি ঠিক ধরেছেন।

—কিসের গন্ধ বল তো? রত্নেশ্বর তাকিয়েছিলেন অঞ্জনার মুখের দিকে।

এতক্ষণে কালকের সেই বাক্‌পটু অঞ্জনা বেরিয়ে এল। চুপ করে মিষ্টি হাসিমুখেই সে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণে। বললে—তা শুনে আপনি কি করবেন? তারপর একটু হেসেই বললে—বউদি এলে বরং শিখিয়ে দেব। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—তার তো দেরী আছে। এখন গরমকালটায় সরবৎটা তৈরি করিয়ে খাব।

—তার জন্যে তো আমি রইলাম। আমি করে দেব। শুধু এই সরবৎ কেন, আরও জানি। দেখবেন কাল খাওয়াব।

—কিন্তু গন্ধটা কিসের? খুব চেনা মনে হচ্ছে।

—মুচকুন্দ ফুলের। জ্যাঠামশাই ঠিক ধরেছেন। মুচকুন্দ ফুল সকালবেলা ঘোলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, তাতে গন্ধটা মিশে গিয়েছে। তারপর সরবতের সময় পাঁপড়ী বেটে মিশিয়ে দিয়েছি।

ভবানী দেবী প্রসন্ন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ, এবার তিনি বললেন—রান্নার মশলা বড় কথা নয়, বড় কথা হাত। রান্না হয় হাতের গুণে। অঞ্জনার হাতই সুন্দর। জানিস, সকালবেলা পুজোর উয্যুগ করেছিল। সে যে কি পরিপাটী করে ফুলগুলি থরে থরে রেখে বেলপাতাগুলি বেছে থালা সাজিয়ে দিয়েছিল, মনে হচ্ছিল থালাখানি সামনে নামিয়ে দিলেই পুজো হয়ে যাবে। মা হাত বাড়িয়ে ধরে নেবেন।

অঞ্জনা গ্লাসটি তুলে নিয়ে চলে গেল। ভবানী দেবী বললেন—বড় ভাল মেয়ে রে। অনেক গুণ ওর।

রত্নেশ্বর হেসে বললেন—একটু বেশী কথা বলে।

—তা বলে। কিন্তু কথা কইতে জানে। কথাতেও মধু আছে।

—না। শুধু মধু না, একটু টক স্বাদ আছে।

—ওর স্বামীকে একটা চাকরি করে দে। উনি তোকে বলতে বলেছেন।

হয়তো অঞ্জনার স্বামীর চাকরি হয়ে যেত কিন্তু বাইরে থেকে বীরেশ্বরের ডাক এল—রত্নেশ্বর!

সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন গিরীন্দ্র আচার্য।—বাবুজী!

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রত্নেশ্বর। বুঝলেন কোন খবর এসেছে। গোপাল সিংয়ের খবর।

—যাই। বলে উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ভবানী দেবীও তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। তাঁর উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। স্বামী-পুত্রকে ফিরে পেয়ে সংসার জীবনে সম্রাজ্ঞীর মত ফিরে এসেও তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। এসব তাঁকে বড় পীড়িত করে। কিন্তু 'না' বলতেও পারছেন না। এত বড় জমিদারী, রাজার মর্যাদা, এসব রাখতে গেলে এ না করেই বা উপায় কি?

খবর গোপাল সিংয়েরই খবর। কিন্তু কল্পনার বাইরে চলে গেছে। গোপাল সিং নিজের স্ত্রী এবং পুত্রকেই মারাত্মকভাবে জখম করেছে। এবং নিজের ঘরে আগুন দিয়েছে; সেই আগুন এই ফাল্গুনের দুপুরে তার ঘরকেই পোড়ায় নি—গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে; গোটা মৌজা বীরপুরেই লেগেছে। মৌজা বীরপুর এখনও পুড়ছে। গোপাল সিং ফেরার।

খবর এনেছে কুতুবপুর কাছারীর সওয়ার বরকন্দাজ। ঘটনাটা ঘটেছে এইভাবে। বেলা এক প্রহরের সময়, গোপাল সিং মাঠ থেকে ফিরে, শিবকে গাঁজা ভোগ দিয়ে তার প্রসাদ নিয়ে, মা-কালীকে কারণ নিবেদন ক'রে সবে প্রথম পাত্র প্রসাদটি পেয়েছে এমন সময় সদরের নির্দেশমত কুতুবপুর কাছারীর একজন বরকন্দাজ ঢেঁরাদার নিয়ে বীরপুর মৌজার মণ্ডলান পদের নতুন মণ্ডল ভগবানদাস মণ্ডলের নাম ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছিল—"আজ থেকে নতুন ডাক যোতাবেক বীরপুরের নতুন মণ্ডল হল ভগবানদাস মণ্ডল। পুরানো মণ্ডল গোপাল সিং-এর মণ্ডলান খারিজ।"

গোপাল ঢেঁড়ার শব্দ শুনেই চমকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে হাতের লাঠিটা নিয়েই ছুটে বেরিয়েছিল পথে।

কৌন শালারে! কার এতনা বড়া ছাতি আর কলেজা বীরপুরে এসে গোপাল সিংহের বিনা হুকুমে ঢেঁড়া পেটে ডুগ ডুগ আওয়াজ তুলে। কার গর্দানায় দুটো মুণ্ড, কৌন শূয়ারের বাচ্চার চারটে হাত—। হঠাৎ ডুগ ডুগ আওয়াজ থেমে গেল। একটা গোলমাল উঠল। গোপাল আরও জোরে ছুটল।

পথে দেখা হয়েছিল নিজের ছেলের সঙ্গে। ছেলে তখন শুনেছে। সেও গর্জাচ্ছে। ফুঁসছে। কিন্তু সে গোপাল সিংয়ের মত নয়; সে অনেকটা স্থিরমস্তিষ্ক। সে ভাবছিল—কি করবে। ঢেঁড়াদারকে আর বরকন্দাজকে ভাগিয়ে দিলেই কি জিতবে তারা? ভাগাতে হবে, ভাগাবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শুধু ভাগাবে? না, মারপিট করবে? ভেবেচিন্তে সে রক্তারক্তি বা অস্ত্র হাঙ্গামা না ক'রে এগিয়ে গিয়ে ঢেঁড়াদারের ডুগডুগিটা ছিনিয়ে নিয়ে বরকন্দাজকে ধমক দিয়ে বা গায়ের জোরে ভাগিয়ে দেওয়াটাই ঠিক করে, এগিয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে ছিল নিজেদের ক'জন অনুগত লোক। ঢেঁড়াটা ছিনিয়েও নিয়েছিল, বরকন্দাজের সঙ্গে দু'-চার লাঠির ঠোকাঠুকি হয়েছিল এবং শেষে তার পাগড়িলাঠি কেড়ে নিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিল।

আচার্যের নির্দেশ ছিল মার খেয়ে এস, মেরে আসামী হয়ে এসো না।

ঠিক এই সময়ে গিয়ে পড়েছিল পাগলা হাতীর মত গোপাল সিং।

কেয়া হুয়া ?

সমস্ত শুনে ঠাস করে ছেলের গালে মেরেছিল এক চড়। হারামীর বাচ্চা, কুত্তার কুত্তা, শুধু ঢেঁড়া কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলি ? শালা বরকন্দাজের জানটা নিলি না রে—বাঁদীর বাচ্চা !

ছেলের বয়স চল্লিশের কাছে। সে বলেছিল—গালাগালি করো না, ঘরে চল ! মগজ গরম করলে কাম হয় না। মগজ গরম করে বুড়বুকেরা।

আবার চড় তুলেছিল গোপাল তার গালের উপর। ছেলে খপ করে হাত ধরে রুখে দিয়েছিল। তারপর বাপ-বেটায় শুরু হয়েছিল হাত-কাড়াকাড়ি। ওদিকে বিপদের আশঙ্কা করে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল গোপালের বড়-স্ত্রী, বড় ছেলের মা। সে এসে পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল—নেহি, নেহি, নেহি। শুনো, শুনো বাবু শুনো—নেহি।

গোপালের পৈশাচিক ক্রোধ উঠেছিল জ্বলে, সে ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে, তার বুকে চেপে বসে টিপে ধরেছিল তার গলা। এমন ছেলে যার পেটে হয়, তার মরাই ভাল। মেরেই ফেলবে সে।

ছেলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, সে বাপকে ধরে টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল—ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো।

গোপাল এবার স্ত্রীকে ছেড়ে মাটি থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে মেরেছিল ছেলের মাথায়। লোহার বোলো লাগানো লাঠি। সে লাঠির ঘায়ে ছেলের মাথা ফেটে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল তার মুখ-বুক সমস্ত। ছেলে কয়েক মুহূর্ত পরেই ধড়াস করে পড়ে গিয়েছিল মাটির উপর।

ওদিকে তখন লোক জমায়েত হয়েছে প্রচুর, গ্রামের প্রায় সকল লোক ছুটে এসেছে চীৎকার শুনে। তারা আর থাকতে পারেনি। তারা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গোপালের উপর এবং তাকে আটকে ফেলেছিল। গোপাল তাদের কুৎসিত গালাগালি করে হুকুম করছিল—ছোড়্ ছোড়্ হারামীরা—ছোড়্ রে—শালা লোক, ছোড়্ ! উসকো জান লেগা আমি। আমার মানইজ্জত বরবাদ করে দিয়েছে ওই লেড়কা। ওকে মেরেই ফেলব আমি।

সে তখন উন্মত্ত—বিকারগ্রস্ত। হাতে আটক পড়ে সে থু-থু করে থুথু ছুড়তে আরম্ভ করেছিল।

গোপালের অন্য ছেলেরা এবং মাতব্বরেরা পরামর্শ করে তাকে ধরে এনে একখানা ঘরের মধ্যে পুরে শিকল-তালা দিয়ে বন্ধ করেছিল। এবং বড় ছেলের ও গোপালের স্ত্রীর সেবার দিকে মন দিয়েছিল। গোপালের স্ত্রী অজ্ঞান হয়েছিল অনেকক্ষণ। বড় ছেলের মাথার ক্ষতটা গভীর এবং শঙ্কাজনক। সে-ও অজ্ঞান। রক্তস্রাব হচ্ছিল প্রচুর। জনকয়েক মাতব্বর বড় ছেলের

ক্ষতস্থানে বিশল্যকরণী গাঁদার পাতা লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করতে না পেরে কাপড় পুড়িয়ে চুন মিশিয়ে 'করালী' প্রলেপ তৈরী করে লাগাবার ব্যবস্থা করছিল।

আর বড় ছেলের ছেলে, সে আঠারো-উনিশ বছরের নতুন জোয়ান, সে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গোপাল সিংকে অভিশম্পাত করছিল।

ঘরের ভিতর গোপাল সিংও নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাচ্ছিল। হঠাৎ উত্তপ্ত উন্মত্ত মস্তিষ্কে শয়তান জেগে উঠেছিল। ঘরের মধ্যে পেয়েছিল চকমকি—শোলা। আর পেয়েছিল চোলাই-করা মদের বোতল। তাই নিয়ে সে ষাট বছর বয়সেও কসরৎ করে উঠেছিল ঘরের ভিতরের সাঙায়। সাঙায় দাঁড়িয়ে ঘরের চালের বাখারীর কাঠামো ভেঙে খড় ছাড়িয়ে চালের উপর উঠে মদটা ঢেলে দিয়েছিল চালের খড়ের উপর, তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল চালের মাঝখানে।

এ-কাজ সে নিঃশব্দে করে গিয়েছিল। প্রথমটা কারুর নজরে পড়েনি। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই গোপাল উল্লসিত চীৎকার করে বলেছিল—যা সব ছাই হয়ে। যা সব জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে। যা—।

কাউকে চালে উঠতে দেয়নি। যে উঠবে, তাকে সে দাও দিয়ে কোপাবে বলে ভয় দেখিয়েছিল।

স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল লোকেরা।

গোপাল জ্বলন্ত খড় টেনে বের করে ছুঁড়তে শুরু করেছিল চারিদিকে। জ্বলে যাক বীরপুর। ছাই হয়ে যাক। সব শালা বেইমান।

ফাল্গুনের দুপুরে রাঢ় অঞ্চলে এলোমেলো তপ্ত হাওয়া বয়। সেই হাওয়াটা তখন উঠেছে। আগুন বাতাসে ছুটতে লাগল।

গোপাল সিং এক সময় ধপ করে পথের উপর লাফিয়ে পড়ে ছুটল। সে বুঝতে পেরেছিল—গ্রামের লোকেরা এমনকি নিজের বাড়ীর লোকেরাও আজ তার শত্রু। তাকে ধরতে পারলে তারা তার হাতে-পায়ে বেঁধে ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবে। একবিন্দু করুণাও আজ আর তার জন্যে কোথাও কারুর মনেই নেই। এই আগুনেই সব পুড়ে গেছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সে পালিয়েছে। পথ ধরে বেরিয়ে মাঠে পড়ে মাঠে-মাঠে ছুটে পালিয়েছে।

গোটা বীরপুর এখনও জ্বলছে। ফাল্গুনের দুপুর—রাঢ়ের এলোমেলো গরম হাওয়া আগুনের সঙ্গ পেয়ে দুরন্ততর বেগে মাতামাতি করে নাচিয়েছে আগুনকে। জ্বলন্ত ঘরের খড় শিখার বেগে আকাশে খানিকটা উপরে উঠে হাউইয়ের আগুনের মত বেঁকে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এর ঘরে, ওর ঘরে; কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চালগুলোও জ্বলে উঠেছে। পথ-ঘাট পুকুরের জল পোড়া খড়ের টুকরোয় ছেয়ে কালো হয়ে গেছে।

লোক অভিশম্পাত দিচ্ছে গোপাল সিংকে।

আর কাকে দেবে? গোপালের স্ত্রীর গলা থেকে এখনও কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠছে। ছেলের এখনও জ্ঞান হয়নি। গোটা গ্রামে ঘরের আশ্রয় নেই। কামাখ্যা মায়ের মন্দির পাকা; একটা পাকা নাট-মন্দিরও আছে, সেইখানে আশ্রয় নিয়েছে গোপালের পরিবারবর্গ। বাকি

লোকেরা গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা গোহত্যা হয়ে গেছে। গরু পুড়ে মরেছে। বেড়াল-কুকুর তা-ও পুড়েছে।

বেঁচে আছে গোপালের পুকুরপাড়ের ধানের বাখার। ওইগুলোই লোকে চেষ্টা করে বাঁচিয়েছে। তাও, সমস্ত বাখারের খড়ের চাল তুলে ফেলে বাঁচাতে হয়েছে। কতকগুলো বাখার খুলে ধানের রাশি ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে। না বাঁচিয়ে উপায় ছিল না। নইলে লোকে খাবে কি ? ?

দেওয়ান আচার্য কথা শেষ করে বললেন—এমনটা হবে ঠিক ভাবিনি। তবে কাজ শেষ। গোপালের চিতা গোপাল নিজে জ্বালিয়েছে। আমাদের আর কিছু করতে হবে না। শুধু থানাতে খবরটা পাঠাতে হবে। সে কুতুবপুর কাছারী থেকে গিয়েছিল—আমি পাঠিয়ে এসেছি।

শুনছিলেন তিনজন—বীরেশ্বর রায়, ভবানী দেবী, রত্নেশ্বর রায়। বীরেশ্বর আলবোলা টানছিলেন কিন্তু কখন যে নলটা রেখে দিয়েছিলেন বা হাত থেকে খসে পড়েছিল, তার খেয়াল ছিল না। কথা শেষ হতেই তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডানহাতখানা বাড়িয়ে নলটা হাতড়ালেন। চাকর মহেন্দ্র দূরে দাঁড়িয়েছিল, সে এসে নলখানা তুলে দিল তাঁর হাতে।

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—মা গো!

বীরেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হুঁ।

—কি করলে বল তো ?

—কি ? একটু হাসলেন বীরেশ্বর।

আচার্য বললেন—আমরা কি করলাম বলুন মা ? আমরা আইনের পথ ছাড়া চলি নি। যা করেছে সে নিজেই করেছে।

—করেছে, কিন্তু—।

—না মা, কোন কিন্তু নেই। আমরা কিছু করিনি। বলুন!

—বাঘের খাঁচায় মানুষকে ঢুকিয়ে দিলে বাঘ মানুষটাকে মারে, ছিঁড়ে ফেলে। বাঘই মানুষটাকে মারে খুড়োমশাই। কিন্তু তাতে বাঘের পাপ হয় না। পাপ মানুষেরই হয়।

বীরেশ্বর রায় হাতের নলটা ফেলে দিয়ে বললেন—মানুষ তো একরকম নয়, সতী বউ। মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে। রাজা আর প্রজা, জমিদার আর রাইয়ত এক নয়। রাজাকে মধ্যে মধ্যে বাঘের খাঁচায় মানুষকে ফেলে দিতে হুকুম দিতে হয়। কাশীতে তো কোম্পানী রাজ্য রাখতে মিউটিনীর সময় কি করলে চোখে দেখেছ। ছেদীর কটা নাতীকে গুলী করে মেরে দিয়েছে। ছেলেদুটোকে ফাঁসি দিয়েছে। ছেদীর ঠ্যাঙটাই কাটা গেছে। রাজধর্ম একটা আলাদা আছে। রাম রাবণকে সাজা দিতে গোটা বংশটাকে ধ্বংস করেছিলেন। ওখানে সাধারণের সঙ্গে বিচার চলে না। আপনি এক কাজ করুন।

আচার্য তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

বীরেশ্বর বললেন—কুতুবপুর কাছারীতে আজ রাত্রেই লোক পাঠান—কুতুবপুরের কাছারীর খাসজোতের সমস্ত খড় বীরপুরের প্রজাদের দেওয়া হবে। যা কাপড় এসেছে এখানে বিতরণের

জন্যে তার কিছু কাপড় পাঠিয়ে দিন। কাপড়চোপড় পুড়ে গিয়ে থাকবে। ধান-চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। গরীবদের দশ-পাঁচ টাকা দাতব্য—আর গৃহস্থ প্রজা যারা ঋণ চাইবে, তাদের ঋণ দেওয়া হবে।

রত্নেশ্বর রায় মুখে একটি কথাও বলেননি। যা ভেবেছিলেন লেখা আছে তাঁর ডায়রীতে।

"এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমি কল্পনা করি নাই। গোপাল সিংয়ের উপর কঠিন ক্রোধ ও আক্রোশ সত্ত্বেও এমন পরিণতিতে আমি বিমূঢ় এবং বেদনাহত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পিতৃদেব সুকৌশলে কস্টেলো পিক্রসকে দিয়া জন রবিনসনকে হত্যা করাইয়াছিলেন। আমি প্রথমটা ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করিয়া সবিস্ময়ে দেখিয়াছিলাম।"

অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে তখন সারা বাংলায় একটা বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল, তার সঙ্গে রবিনসনের নারী-লোলুপতার জন্য একটা ঘৃণা জমে উঠেছিল মানুষের মনে। নারীহত্যাও সে করেছিল। তাছাড়া যার কান্নায়-দুঃখে এই ক্ষোভ আক্রোশ সত্ত্বেও মানুষ এতটুকু দুঃখ পায় এমন কেউ তার এ-পৃথিবীতে ছিল না।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—"এমন পাষণ্ডের এই পরিণাম মানুষের কৌশলে সংঘটিত হইলেও, ভাবিয়াছিলাম ইহাই বিধাতা-নির্দিষ্ট দণ্ড। ঐ মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত হইলে আরও খুশি হইতাম কিন্তু এই পরিণামেও কোন দুঃখ পাই নাই।

"দে সরকারকে দণ্ড আমি নিজে দিয়াছি। তাহাতেও আপশোস করি নাই। কখনও করিব না। কারণ, সে গোটা শ্যামনগর পুড়াইয়াছিল, আমাকে পুড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল; আমি তাহার ঘর পুড়াইয়া দিয়াছি। ডাকাতেরা তাহার অধর্মসঞ্চিত অর্থ লইয়াছে, কিন্তু তাহার বাড়ীর নারী-শিশুদের অঙ্গ স্পর্শ করি নাই। হাতটা ভাঙিয়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, লোকটা স্বহস্তে জাল করিত। কিন্তু গোপাল সিংয়ের ক্ষেত্রে এ কি হইল? গোপাল সিং নিজে মরিলে কোন দুঃখ হইত না। কিন্তু এ কি হইল? নিজের পুত্রকে সে হত্যা করিল? শুনিতেছি সে বাঁচিবে না। লোকটা পাষণ্ড দুর্দান্ত, সে আমার মাতার অপমান করিয়াছে। রবিনসন ও দে সরকারের হুকুমে সে-ই শ্যামনগরে আগুন জ্বালাইয়াছে, আমার পৃষ্ঠদেশে পোড়ার দাগ এখনও সামান্য ঘর্ষণে জ্বালা করে। কিন্তু তবু মন হায় হায় করিতেছে।"

ভবানী দেবী বলেছিলেন—বাঘের খাঁচায় লোক ফেলে দিলে বাঘ তাকে হত্যা করে কিন্তু হত্যার পাপ বাঘের তাতে একবিন্দু নেই, পাপ সবটাই মানুষের।

এই কথাটাই অমোঘ মনে হয়েছিল রত্নেশ্বরের। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল—"একদিন জমিদার আমি হইব, ইহা জন্মমাত্রেই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তাহা মনে মনে জানিয়াও এমন কল্পনা কখনও করিতে পারি নাই। অত্যাচারী বলিয়া রায়বংশকে ঘৃণা করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, জমিদার হইয়া আমি আদর্শ জমিদার হইব।"

বীরেশ্বর রায় ভবানীকে বলেছিলেন—মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে সতীবউ। রাজা আর প্রজা, জমিদার আর রায়ত এক নয়। রাজার হাতে শাসনের ভার আছে। রাজাকে মধ্যে মধ্যে বাঘের খাঁচায় মানুষকে ফেলে দিতে হুকুম দিতে হয়। রাজধর্ম আলাদা। মিউটিনি

দমন করতে কোম্পানী কাশীতে বালকদেরও গুলী করে মেরে ফেলেছে। রাম রাবণকে সবংশে বধ করেছিলেন।

কথাটা শুনে রত্নেশ্বর যেন পড়তে পড়তে একটা আশ্রয় পেয়েছিলেন। ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতার উত্তর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তাহার বাক্যই যেন আশ্রয়-দণ্ড হইয়া আমাকে আশ্রয় দিল। আমি বল পাইলাম। পিতৃদেব ঠিক কথা বলিয়াছেন। রাজধর্মের মতই জমিদারধর্মও স্বতন্ত্র। ইহা দুর্বলের জন্য নহে। দুষ্টকে দমন করিতে গিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য পাপ করিয়াছি মনে হইলে জমিদারী আসনে বসা চলিবে না। দৃঢ় হইতে হইবে।

"তবে আজ হইতে ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতঃপর যাহাই করিব, তাহা আইনসম্মত প্রকাশ্যপথে করিব। জমিদারী ধর্মে আইনই ধর্ম। সেখানে যাহা ঘটিবে, তাহার জন্য আমার কোন আপশোসের কারণ থাকিবে না।"

সুরেশ্বর বিষণ্ণ হেসে বললে—তাও পারেননি তিনি। তিনি ঠাকুরদাসদাদাকে পিক্রুসকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন। এবং তার আগেও আরও একটা হত্যা তিনি করিয়েছিলেন। সে-ও অবশ্য তিনি দুষ্টকে দণ্ড দিয়েছেন।

সুলতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—সে কে?

—সে? সে একজন গোয়ান চাপরাসী। রায়বাড়ীর অন্দরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সন্দেহে তাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

চমকে উঠল সুলতা। রায়বাড়ীর অন্দরের সঙ্গে?

—হ্যাঁ। ওই অঞ্জনা মেয়েটির সঙ্গে।

সুলতা বললে—ওঃ!

সুরেশ্বর বললে—তোমাকে বলব কি সুলতা, ওই কীর্তিহাটের বিবিমহলে বসে আমি জমিদার হলাম বাধ্য হয়ে। আমাকে তুমি জানতে। একালের মানুষ। আমি একালের সত্যকেই বড় করেই কাজ করছিলাম। আমার স্বার্থের চেয়ে মানুষের দাবীতে প্রজার দিকটাই বড় করে দেখেছি। কিন্তু আমারও মনে হয়েছিল শোধ নিতে শিবু সিংয়ের উপর। শোধ না নিলে আমার অন্যায় হবে। ধর্মচ্যুত হব আমি। আমার ইজ্জত আর থাকবে না। রত্নেশ্বর রায়ের কাল—১৮৫৯ সাল। আমার কাল ১৯৩৭ সাল। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। রায়বাড়ীর ছেলে অতুল জেলে। কুমারী মেয়ে অর্চনা, সে তাতে জড়িয়ে পড়েছে। মেজঠাকুমাও জেল খাটছেন। সে সময়ে প্রজাপীড়ন কতটুকু করতে পারা যায়? যতটুকু যায়, ততটুকু করেছি আমি। সুলতা, আমি শিবু সিংহের ফ্রি-শিপ বন্ধ করতে পারিনি—করিনি। কিন্তু বোর্ডিং ফ্রি-শিপ বন্ধ করেছিলাম। হরি সিংয়ের সঙ্গে কয়েকটা মামলাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সময়ে সুমতি হয়েছিল। চেতনা হয়েছিল এই ডায়রী পড়ে। নিবৃত্ত হয়েছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—বাংলাদেশে, তাই বা কেন, পৃথিবীতে জমিদার এমন একজনও নেই বা হয়নি যে প্রজা দমনের নামে মানুষকে পীড়ন করেনি। ও হয় না।

গোপাল সিংয়ের ধ্বংস পর্ব, আচার্য দেওয়ান এটার নাম দিয়েছিলেন গোপালমেধ যজ্ঞ, শেষ হতে বেশী দিন লাগেনি। মাস-তিনেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। গোপাল সিংয়ের ফাঁসী হবার কথা। কারণ, গোপালের ছেলে ওই রাত্রেই মারা গিয়েছিল। থানায় তার খবর এবং এজাহার দিয়ে এসেছিল কুতুবপুর কাছারীর নায়েব। গোপাল তখন পালিয়েছে। কিন্তু বিচিত্র কথা কি জান, গোপালকে ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচালেন ভবানী দেবীর অনুরোধে বীরেশ্বর রায়।

পরের দিন ভোর রাত্রে ভবানী দেবী উঠে স্নান সেরে মন্দিরে এসেছেন, মঙ্গলারতি হচ্ছে মায়ের; তাঁর সামনে হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসল আপাদমস্তক চাদর ঢাকা একটি মেয়ে।

গোপাল সিংয়ের কনিষ্ঠা পত্নী। তার দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে এসেছে রায়বাড়ীর সতী বউরানীর কাছে।

—রানীমাঈ ভিখ্‌সা।

ভোরবেলা তখন আবছা অন্ধকার রয়েছে। নাটমন্দিরে একটা পঁচিশ-বাতি সে-আমলের ঝোলানো কেরোসিনের চিমনী জ্বলছে। গোটা নাটমন্দিরে অল্পকিছু লোক। সারারাত্রি প্রায় উৎসব চলেছে। রাত্রি তিনটে নাগাদ উৎসবের বাতি নিভেছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকেদের কাছে-পিঠের লোকের বাড়ী, দূরান্তরের লোকেরা এখানে-ওখানে রায়বাড়ীর চারিপাশে এবং সামিয়ানা খাটানো আসরের উপর শুয়ে আছে। হুকুম ছিল—কোন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েছেলে থাকলে তাদের যেন ঠাকুরবাড়ীতে জায়গা দেওয়া হয়। এ-মেয়েটি কখন এসেছে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরবাড়ীর নাট মন্দিরেই আশ্রয় নিয়েছিল। উৎসবমত্ত রায়বাড়ীর কারুরই ঠিক খেয়াল নেই।

সতী বউরানী আরতির পর মন্দির থেকে নামছেন, এরপর যাবেন, গিয়ে পূজোতে বসবেন।

নাটমন্দির এবং মন্দিরের মাঝখানে, যেখানে হাড়িকাঠ পোতা আছে, সেইখানে তিনি নামবামাত্র এই অবগুণ্ঠনবতী এসে নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বসল। ভবানী দেবীর পিছনে ছিল অঞ্জনা এবং তাঁর দাসী-দামিনী। বাকি রায়বাড়ীর অধিবাসিনী কুটুম্বিনীরা সব তখন ঘুমিয়ে আছে। দারোয়ান-চাপরাসীরা ঢুলছে। পুরুষদের মধ্যে ন্যায়রত্ন এবং পরিচারক ছাড়া আর কেউ নেই।

এই আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত অবগুণ্ঠনাবৃতা মেয়েটিকে এমনভাবে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে প্রথমটা ভবানী দেবী ভেবেছিলেন, সে দেবীকে প্রণাম করছে। তিনি সরে দাঁড়ালেন সম্মুখ ছেড়ে। কিন্তু মেয়েটি বললে,—রানীমাঈ, ভিখ্‌সা।

অস্ফুটপ্রায় স্বর, কিন্তু তার মধ্যেও কাতরতার অন্ত ছিল না। বুকফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন বেরিয়ে এল।

চমকে গিয়ে পিছিয়ে এলেন ভবানী দেবী। এই শেষরাত্রে এমন অকস্মাৎ সামনে নতজানু হয়ে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কে তাঁকে ভিক্ষা চাচ্ছে?

একলা তিনি চমকে ওঠেন নি, অঞ্জনা এবং দাসীটিও চমকে উঠেছিল। ন্যায়রত্ব মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে এসে সন্ত পা দিয়েছেন, তিনিও চমকে উঠে বলেছিলেন—কে?

পরিচারক তাড়াতাড়ি নেমে এসে বলেছিল—কে গো? কে? কে তুমি!

ভবানী দেবী তখন নিজেকে সামলেছেন, তিনি পরিচারককে বলেছিলেন—তুমি সরে যাও। দেখছ না, মেয়েটি ঘোমটা দিয়ে রয়েছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে। তুমি সর।

ভবানী দেবী মেয়েটির জোড়করা হাত-দু'খানির রঙ এবং তার হাতের রূপোর মোটা কাঁকনির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, সে ভাল ঘরের মেয়ে এবং ঠিক এ-দেশের নয়। ভিখ্‌সা কথাটা তাঁর কানে ঠিক সুরটি তুলেছিল।

পরিচারক সরে গেলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কে বাছা?

—আমি ভিখ্‌সা মাংতে এসেছি রানীমাঈ।

—বল, কি ভিখ্‌সা চাও?

—আমার বাচ্চাদের বাপের জান। আমার সিঁথির সিঁদুর। দুনিয়ায় কেউ রাখতে পারবে না বলছে লোকেরা, কিন্তু আমি জানে রানীমাঈ, আপনি পারেন। আমি শুনিয়েছি, আপনি আপনার স্বামীকে বাঁচাইয়েছেন। কালীমায়ী আপনার বাত শুনেন।

অঞ্জনা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল, সে বললে—তোমার স্বামীর কি হয়েছে বল। কোথায় বাড়ী বল। কি নাম?

ভবানী দেবী বলেছিলেন—থাক। তুমি আমার সঙ্গে ভিতরে এস।

তিনি তাঁকে অন্দরে নিচের তলায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে বলেছিলেন—কোথা থেকে এসেছ মা? বীরপুর থেকে?

ঘোমটাশুদ্ধ মাথাটা নড়ে উঠেছিল—হ্যাঁ।

—বুঝেছি তা। তোমার ভিখ্‌সা ভিখ্‌সা শুনেই বুঝেছি। তার উপর তোমার হাতের রঙ, মোটা কাঁকনি। কতক্ষণ এসেছ?

—রাত পহেলা প্রহরে বয়েলগাড়ী জুড়ে সঙ্গে আদমী নিয়ে বেরিয়েছি মায়ী, শেষরাতে এসে পঁহুছুলাম।

—গোপাল সিংয়ের ছেলে কেমন আছে?

—মরে গেছে মায়ী।

—তার মা কি তুমি?

না-এর ভঙ্গিতে মাথাটা নড়ে উঠল।—না। তারপর বললে—উ বড়কী আছে।

—হুঁ। সে? সে কি করছে?

—উকেও জখম করেছে মায়ী। তার উপর—। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটি।

একটু স্তব্ধ থেকে ভবানী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—গোপাল সিং?

—সে যে কোথায় ভেগেছে মাঈজী, সেই জানে।

—হুঁ।

-কাল পুলিশ এসেছিল মাঈজী। ইজাহার নিয়ে গেল, বড়ী বেটার লাস ভি আটকে

রেখেছে। আজ সুবায় নিয়ে যাবে। লোকে বলছে উসকা ফাঁসী হোয় যাবে মায়ী। আপনি বাঁচান। মায়ী আপনি বাঁচান।

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—আমি কি ক'রে বাঁচাব মা? রায়বাড়ী তো কিছু করে নি; যা ক'রেছে তার ফল ফলে গেছে। গোপাল সিং রায়বাড়ীর পাইক বরকন্দাজ খুন করলে ত আমি চাপা দিতে বলতাম। কিন্তু গোপাল রাগের বশে নিজের ছেলেকে—। ওঃ!

গোপালের স্ত্রী বলেছিল—মাঈজী, আজ সারা গাঁওয়ের লোক তার উপর খাপ্পা হয়ে গিয়েছে। তাকে পেলে হয় তো ছিঁড়ে ফেলবে, আরও খুন খারাবি হবে; তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে লোকে তাকে খুঁজছে। এক তুমি বাঁচাতে পার। বাঁচাও তুমি। মায়ী আমার বালবাচ্চারা ছোট।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে।

—কিন্তু আমি কি করব বল?

—তা আমি জানি না মায়ী। তবে তুমি পার। তোমার পতিকে তুমি সাবিত্রীর মত বাঁচিয়েছ। মা কালীর সঙ্গে তোমার বাতচিত হয়। এ আমাকে সবাই বলছে।

—কি বলছে?

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—মাঈজী, সবাই বলছে কালীমায়ীর রোষে সিংয়ের এই হাল হয়েছে। তোমার মত সতীকে সে কটু বলেছিল তারই সাজা দিয়েছে মা। তুমি খুশী হলেই—মাফ্ করলেই সে বাঁচবে!

ভবানী বলেছিলেন—মা, আমি কোনদিন তাকে শাপশাপান্ত করিনি। তবু তুমি বলছ, আমি অন্তর খোলসা করে বলছি—মা, গোপালকে বাঁচাও, মা, গোপালকে বাঁচাও। মা, গোপালকে বাঁচাও। আর—

একটু চুপ ক'রে থেকে ভেবে বলেছিলেন—আর আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের হুজুরকে, গোপালকে বাঁচাবার কোন পথ আছে কিনা! তাঁরা কিছু পারেন কিনা? যদি থাকে তবে নিশ্চিন্ত হও—তা আমি করব।

গোপালের স্ত্রী মেঝের উপরে হাত রেখে বসেছিল, সে হাতখানা মেঝের ধুলোতেই বুলিয়ে নিয়ে নিজের কপালে ঠেকিয়েছিল!

ভবানী দেবী বলেছিলেন—কিন্তু তুমি তো কাল থেকে কিছু খাওনি মা!

কপালে হাত দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বউটি বলেছিল—থোড়া পানি পিয়েছি মায়ী। আর কিছু কি খাওয়া যায়?

—যায় না। কিন্তু তবু খেতে হয় মা। কিছু খাও তুমি। তারপর নিজের ঝি দামিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—দামিনী তোর উপর এর ভার রইল! কিছু খাওয়া ওকে। আর, এ বাড়ীর কারুকে পরিচয় দিসনে যে গোপাল সিংয়ের স্ত্রী। মানুষ শত্রু হলে বড় নিষ্ঠুর; তার ওপর—

একটু ম্লান হেসে বলেছিলেন—বড়লোক হলে তখন আর তার শেষ থাকে না। তারপর

অঞ্জনাকে নিয়ে ওপরে চলে এসেছিলেন।

* * *

পূজোর ঘরে ঢুকবার আগে চাকর মহিন্দরকে ডেকে বলেছিলেন—বাবু উঠলেই আমাকে ইশারায় জানিয়ো। দেওয়ানজী কাছারীতে এলেই তাঁকে খবর দিয়ো কোন কাজ যেন আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে না করেন। রত্ন হয়তো উঠে থাকবে, তাকে ব'লো আমার আশীর্বাদ না নিয়ে যেন বাইরে না বের হয়। কোন হুকুম না দেয়। সে যেন কলকাতার জ্যেঠামশাই আর তাঁর ভায়রাভাইয়ের দেখাশোনা করে। অঞ্জনা তোমার উপর ভার রইল জগদ্ধাত্রী দিদির আর ওঁর বোনের।

গতরাত্রে এরই মধ্যে বীরেশ্বরবাবুর খুড়তুতো দাদা দেবপ্রসাদ এসেছেন, জগদ্ধাত্রী বউ এসেছেন, সঙ্গে এসেছেন সস্ত্রীক স-পুত্রকন্যা তাঁর ভায়রাভাই, মেদিনীপুর সদরের এস-ডি-ও রাধারমণবাবু।

তাঁরা ওদিকের মহলের দোতলায় আছেন। লোকজন চাকর দাসী সবই সেখানে মোতায়েন আছে, তবুও নিজেরা দেখাশোনা না করলে আতিথ্যে ত্রুটি হবে।

বীরেশ্বর, রত্নেশ্বর, দেওয়ান আচার্য—কারুর সাহায্যই কিন্তু ভবানীর প্রয়োজন হয় নি। কার্যোদ্ধার তিনি নিজেই করেছিলেন। স্বামী পুত্র কাউকে একটি কথাও বলতে দেন নি।

তিনি পূজোর আসনে বসে অন্তরের সঙ্গে ডেকে দেবতাকে বলেছিলেন—গোপালকে তুমি রক্ষা কর মা। ওই মেয়েটির কাছে আমার মুখ রক্ষা কর।

তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। স্তবের সঙ্গে প্রার্থনা শেষ ক'রে তিনি প্রণাম সেরে চোখ খুলেই দেখেছিলেন জগদ্ধাত্রী দেবীকে। জগদ্ধাত্রী তাঁর সম্পর্কে বড় হলেও তাঁর সখী, বয়সে তিনিই বছর দুয়ের বড়।

জগদ্ধাত্রী দেবী কখন এসে তার পূজোর আসনের খানিকটা দূরে বসেছিলেন। চোখাচোখী হতেই জগদ্ধাত্রী বলেছিলেন—তোর পূজো করা সার্থক! কতক্ষণ বসে আছি। খেয়াল নেই। চোখ থেকে জলের ধারা আর থামে না!

ভবানী হেসে চোখ মুছে বললেন—না ভাই, সাড়া ঠিক পাই নি।

—এমনি করে রোজ কাঁদিস?

—কাঁদি। কোন কোন দিন মনের দুঃখ জানাই আর কাঁদি!

—মনের আবার দুঃখ কি তোর এখন?

—সংসারটাই দুঃখে ভরা ভাই। আর নিজের দুঃখই কি সব?

—তা বটে।

—সুরবালা উঠেছে? রাত্রে কোন অসুবিধে হয় নি?

—অসুবিধে? বাপরে! মুখের কথা না-খসাতে পাঁচটা লোক ছুটে আসছে। তা ছাড়া ওই অঞ্জনা মেয়েটি। একেবারে হাজির হয়ে আছে। সুরো উঠেছে, সে মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, তোর ধ্যান দেখে চলে গেল। আমাকে রেখে গেল!

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবানী দেবী। বললেন—আমি যাচ্ছি। পূজোর কাপড় ছেড়ে,

পুজোর হাত রত্নেশ্বরের মাথায় দিয়ে, ওঁর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি।

—না। তোর সঙ্গে কথা এখানেই বলবে সুরবালা। তুই পুজোর আসনে বসে থাকবি ও বলবে।

—কেন? কি ব্যাপার? দোহাই তোর, আমি ভাই সিদ্ধটিদ্ধ নই। কি ফ্যাসাদ মা। তারপরই একটা কথা মনে ক'রে এক নিশ্বাসেই বললেন—তা ছাড়া ওঁর কর্তা তো শুনেছি সাহেবী মেজাজের মানুষ, বাড়ীতে সাহেবী কেতা; সুরোবালাও তো মেমসাহেব হয়ে উঠেছিল শুনেছি, ওঁদের এসব বাতিক কেন?

হেসে জগদ্ধাত্রী বললেন—সে-সব উল্টে গেছে। এখন মাদুলী-কবচ পরে। মাঝখানে রাধারমণের ঝগড়া লেগেছিল ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে, দারুণ ঝগড়া। চাকরি যায় যায়। হঠাৎ কার পরামর্শে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে দিয়ে যাগযজ্ঞি করিয়ে খুব ফল হয়েছে। সাহেবটা ঘোড়া থেকে পড়ে খোঁড়া হয়ে বিলেত চলে গেল; রাধারমণের চাকরি যাওয়া দূরের কথা উন্নতি হ'ল। বাঁকড়ো ছোট জেলা, সেখান থেকে মেদিনীপুরে এস-ডি-ও হয়ে এল। লালমুখের পোস্ট এটা, বাঙালীকে দেয় না; তা ওকেই দিলে। এখন ভক্তিটক্তি খুব। তার ওপর মেয়ে বড় হয়েছে; তেরো পার হতে চলেছে। সাহেবী মেজাজ নামের জন্যে ভাল বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে না। মুখটিপে হাসলেন জগদ্ধাত্রী দেবী। বললেন—তা না হ'লে নিজে যেচে চিঠি লিখে আমাদের সঙ্গে ক'রে তোর বাড়ী এসেছে!

ভবানী স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আভাস তিনি পেয়েছেন।—মেয়ের বিয়ে?

প্রশ্নটা করবার আগেই জগদ্ধাত্রী দেবী মৃদুস্বরে বললেন—ওই এসেছে ওরা! অঞ্জনার সঙ্গে বাড়ী ঘুরে, ছাদে উঠে গ্রামটা দেখে এল। জানবাজারের বাড়ী দেখেছে একদিন।

তারপরই উচ্চকণ্ঠে বললেন—আয় সুরো আয়। আমি বসিয়ে রেখেছি।

ভবানী দেবী ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এবং দেখলেন বারান্দায় দরজার ঠিক মুখেই অঞ্জনা এবং তার পিছনে সুরবালা ও তার বড় মেয়ে স্বর্ণলতা ঘরে ঢুকছে। হেসে ভবানী বললেন—আসুন!

অঞ্জনা তাড়াতাড়ি একখানা গালিচা এনে বললে—মামীমা, আপনি মেঝেতে বসেছেন! উঠুন উঠুন এখানা পেতে দি!

সুরবালা সরাসরি বললেন—আমার স্বর্ণকে এনেছি আপনার কাছে। ওকে এই আপনার পুজোর আসনের সামনে আপনার হাতে দিতে এসেছি। ওকে আপনাকে নিতে হবে। বলুন, পুজোর আসনে ব'সে বলুন নিলেন!

মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু রূপ যেন একটু উগ্র। রঙ উগ্র, চোখের দৃষ্টি একটু খটখটে, হয়তো মেজাজ একটু উগ্র হবে। মেয়েটি একটু ডাগরই হয়েছে। তাঁর মনে পড়ল রত্নেশ্বরকে।

রত্নেশ্বরও সেদিক থেকে বিয়ের বয়স পার হয় হয় বয়সে পৌঁচেছে। কুড়ি বছরে পা দেবে। রত্নেশ্বরের বিয়ের কথা এতদিন বিমলাকান্ত বলেন নি, বীরেশ্বর বলেন নি, বলেন নি ঠিক এই দিনটির জন্যে। এ দিনটি না পার হলে বিবাহের আসরে হয় অধর্ম ক'রে মিথ্যা বলতে হত না-হয়, রায়-বাড়ীর গুপ্তকথা প্রকাশ পেত।

বিবাহের সম্প্রদানের আসরে বলতে হবে—ভরদ্বাজ আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য প্রবরস্য—কুড়ারাম দেবশর্মণঃ প্রপৌত্রং—সোমেশ্বর দেবশর্মনঃ পৌত্রং—বীরেশ্বর দেবশর্মণঃ পুত্রম। কিন্তু তা বলবার উপায় ছিল না। রত্নেশ্বর এতদিন বিমলাকান্তের পুত্র বলে পরিচিত ছিল! সত্য বললে রায়বংশের যে কথা—যে মর্মান্তিক সত্য—নবদ্বীপে শ্যামাকান্তের কবরের নিচে চাপা পড়েছে—তা প্রকাশ হয়ে পড়ত!

রত্নেশ্বরের সঙ্গে ভালই মানাবে।

সুরবালা বলেছিলেন—মেয়ে আমার অসুন্দর নয় ভাই। তাছাড়া আপনার রত্নেশ্বর শুনেছি ভাল লেখাপড়া করেছে। কাল রাত্রে উনি তো কথাবার্তা বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লেখাপড়া খুব ভালবাসে। আমার মেয়েকেও লেখাপড়া শিখিয়েছি। বাংলা তো ভালই জানে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা মুখস্থ। ইংরিজীও বেশ ভাল জানে—উনি শিখিয়েছেন। ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক একেবারে মুখস্থ। ইস্কুলে দেবার জন্যে উঠ্‌বন্দী, তা আমি দিতে দিই নি। তা হ'লে আর ব্রাহ্ম না হয়ে উপায় থাকত না।

ভবানী ভাবছিলেন। মনের মধ্যে রত্নেশ্বর, তারপর বীরেশ্বর তারপর মনে হল রাধারমণবাবু এস-ডি-ও ; তারপরই চকিতে মনে পড়ে গেল অবগুণ্ঠনাবৃতা একটি মেয়ে, তারপর মনে পড়ল গোপাল সিংয়ের নাম। আবার মনে পড়ল রাধারমণবাবু এস-ডি-ও!

সুরবালা বলেছিলেন—আমরা অবিশ্যি চাকরে। আপনারা মস্ত জমিদার। রাজা লোক। তবু এ বিয়েতে অগৌরব হবে না আপনাদের!

ভবানী বলেছিলেন—আমি ভাই পণ নেব!

—দেব। আমাদের সাধ্যমত দেব। বলুন কি নেবেন ?

—মেয়ে-জামাইকে কি দেবেন সে আপনারা জানেন। যা দেবেন তাই অনেক। তবে আমি মা, আমাকে পণ দিতে হবে!

—বেশ তো! বলুন। হুকুম করুন!

—সে ভাই, মেয়ের বাপকে বলব। পণ নেব আমি তাঁর কাছে।

* * *

সুরেশ্বর বললে—ভবানী দেবী তাঁর ভাবী বৈবাহিকের কাছে পণ নিয়েছিলেন—গোপাল সিংয়ের মামলা থেকে মুক্তি! তিনি বলেছিলেন—ওর স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি। গোপালকে বাঁচাতে যা করবার করব।

রাধারমণবাবু অভিভূত হয়েছিলেন ভবানী দেবীর করুণা দেখে। তিনি বলেছিলেন—লোকটা পাষণ্ড, অতি দুর্দান্ত, সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর লোক। এবার নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছে। এসব লোকের সাজা হওয়াই উচিত। তবু আপনি যখন বলছেন, তখন আমা থেকে যতটুকু হয় করব আমি। আসল হাত আপনাদের। আপনারা যদি, মানে বীরেশ্বরবাবু যদি, বীরপুরের লোকেদের সামলান, তারা যদি সাক্ষী না দেয়, তা হ'লে খালাস পেয়ে যাবে! আমি বলব যাকে যা বলবার, মানে তদন্তের সময় তারা যাতে চোখ বুঁজে তদন্ত ক'রে যায়, তা বলব।

ভবানী বলেছিলেন—ওঁকে আমি বলেছি।

সে এর আগেই হয়ে গেছে। বীরেশ্বর রায়ও ভবানীর কথায় গোপালকে ক্ষমা করেছিলেন। রাধারমণবাবুর সঙ্গে একথা হবার আগেই তিনি স্বামীর কাছে একথা বলে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—সতীবউ, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই! তাই হবে, দিলাম!

ভবানী তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন তাঁর পায়ের উপর।

বীরেশ্বর সমাদর ক'রে তাঁর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওঠ, কেঁদো না। তুমি করুণাময়ী। তবে একটা কথা আছে।

মাথা তুলে বসেছিলেন ভবানী দেবী।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তার স্ত্রীকে বল, সর্ত হ'ল গোপাল সিংকে আসতে হবে। হাটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইতে হবে! অন্যায় বলছি?

ভবানী বলেছিলেন—না। অন্যায় বলনি। তা করতে হবে বইকি! মামলা-মকদ্দমা এ সবই তাকে মেটাতে হবে। নিশ্চয় হবে। কিন্তু তুমি রত্নেশ্বরকে বল! সে হয়তো কথা শুনতে চাইবে না!

—তোমার কথা শুনতে চাইবে না?

—তুমি বুঝতে পার না?

একটু চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা পারি! রত্নেশ্বর আমার থেকেও জেদী। আমার চেয়ে সে শক্তিতেও বড়। আচ্ছা, তাকে বলব আমি।

ভবানী বলেছিলেন—আমি যাই, তোমার কাছে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

—একটু বস। তুমি বড় দূরে দূরে থাক। এতকাল পর ফিরে এসেও কাছে এলে না। ব্রত করেছিলে, তা শেষ হয়েও শেষ হ'ল না। ব্রতধর্ম নিয়েই থেকে গেলে।

ভবানী তাঁর কাছে একটু সরে বসে বলেছিলেন—রত্নেশ্বরের বিয়ে হোক, তাকে সব ভার দিয়ে চল আমরা তীর্থ বেড়িয়ে আসি।

—খুব ভাল বলেছ। খুব ভাল বলেছ। এখন সুবিধাও হল, রেলগাড়ী হয়ে গেল। পথের কষ্ট নেই। তাই যাব! শুধু তীর্থ নয়, আগ্রা লক্ষ্ণৌ দিল্লী এসবও দেখে আসব। আগ্রায় তাজমহল দেখব। তুমি তাজমহল দেখো, আমি তোমাকে দেখব!

হঠাৎ একটা শব্দে তাঁদের বাক্যালাপে ছেদ পড়েছিল। দরজার ওপাশে রান্নাঘরের মেঝের উপর একটা কিছু যেন পড়ে গিয়ে শব্দ হয়েছিল।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে?

ভয়ার্ত ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এসেছিল—আমি! অঞ্জনা!

ভবানী দেবী বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। অঞ্জনার শ্যামবর্ণ মুখও ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, সে একখানি পরাতের উপর বীরেশ্বর রায়ের প্রাতঃরাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেওয়ালে

ঠেস দিয়ে। পরাত থেকে জলের গ্লাসটা কি ক'রে মেঝের উপর পড়ে গেছে। সে পরাতখানা নামাতেও পারছে না, জলের গ্লাসটা নিয়ে কি করবে তাও বুঝতে পারছে না।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—পড়ে গেল গ্লাসটা ? কি ছিল ওতে ?

—জল ! কোনরকমে উত্তর দিয়েছিল অঞ্জনা।

—তা যাক। ওটা তুমি আমাকে দাও, দিয়ে, যাও নতুন গ্লাসে জল নিয়ে এস। না, মহেন্দ্রকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দিয়ো। তুমি বরং রত্নেশ্বরকে গিয়ে বল, সে যেন এখুনি এ ঘরে আসে। একটু পর ! ওর খাওয়াটা হয়ে যাক। বুঝেছ !

ঘাড় নেড়ে—হ্যাঁ—জানিয়ে অঞ্জনা চলে আসতে পেরে বেঁচে গিয়েছিল। সে খাবারের পরাত নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল, কর্তা-গিন্নীর কথার সাড়া পেয়ে। ভাবছিল সাড়া দিয়ে ঢুকবে কি না ; এই মুহূর্তেই কানে এসেছিল বীরেশ্বরের গাঢ়স্বর এবং সেই গাঢ়স্বরের ওই গাঢ় কথা ক'টি—একটু বস'। তুমি বড় দূরে দূরে থাক। কতকাল পর ফিরে এসেও কাছে এলে না।

রত্নেশ্বরের সমবয়সী অঞ্জনা, রত্নেশ্বর থেকে কয়েকদিনের বড়। সেদিন বলেছিল—সাত-দিনের বড়। কিন্তু না, ঠিক হিসেবে আটদিনের বড়। সে হিসেবটা হয়েছিল রত্নেশ্বরের জন্মদিন ধ'রে নয়, বিমলার মৃত সন্তানের জন্মদিন ধ'রে। বয়স তার উনিশ পার হচ্ছে। তার উপর সন্তান হয়নি। এবং বিচিত্র চরিত্র, দারিদ্র্য এবং বাউণ্ডুলে স্বামীর উপেক্ষার মধ্যেও কৌতুক আর পরের ঘরের আনন্দ উল্লাসের ভাগ নিয়ে সে শুধু বেঁচেই নেই, সংসারে বিচরণ করে বেড়ায় চঞ্চল পদক্ষেপে। দশের সম্মুখে কোনরকমে পদক্ষেপের সে চাঞ্চল্য সংযত হয়, কিন্তু একা হলে আর রক্ষা থাকে না। সেদিন সেই মুহূর্তে ওই ভেজানো দরজার এপাশে একলা ওই রান্না-ঘরটিতে দাঁড়িয়ে কর্তা এবং গৃহিণীর এই গাঢ় কথাবার্তা শুনে তার অন্তরের কৌতুক-সরসতা উছলে উঠেছিল। সে নীরবে দাঁড়িয়ে আড়িপাতার মত শুনতে আরম্ভ করেছিল তাদের কথাগুলি। তন্ময় হয়ে শুনছিল। যখন বীরেশ্বর বলেছিলেন—তাজমহল দেখতে যাব, সেখানে তুমি দেখবে তাজমহল আর আমি তাকিয়ে থাকব তোমার মুখের দিকে। তখন তাঁর কৌতুক-সরসতা প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল দমকা বাতাসের মত। হাসি চাপতে গিয়ে মুখে কাপড় চাপা দেবার জন্ম হাত খোলা পায় নি ; ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের কাপড়ে মুখ গুঁজতে গিয়ে নড়ে উঠেছিল হাতে ধরা পরাতখানা এবং গ্লাসটা গিয়েছিল সশব্দে মেঝের উপর পড়ে। লজ্জার এবং ভয়ের আর অন্ত ছিল না।

বড়লোকের বাড়ীতে আগন্তুক দরিদ্র আত্মীয়দের অবস্থা বড় নিদারুণ। চাকরদের চেয়েও মর্মান্তিক। তার উপর সন্থ একদিন আগে তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ভবানী দেবী তাকে নিজের কাছে রেখেছেন, তার সব ভার নিয়েছেন, বাউণ্ডুলে স্বামীকেও চাকরি দেবেন বলেছেন। চোখের উপর এ বাড়ীর ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ খেলা দেখেছে। গোপাল সিং-এর খবরের মধ্যে এদের বিক্রম দেখেছে, বীরেশ্বর রায়ের গাম্ভীর্য দেখেছে, ফলে একটা নিদারুণ ভয়ও তার অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত ছায়ার মত জমে উঠেছে। সেটা তাকে হাঁ ক'রে গিলতে এসেছিল সেই মুহূর্তে। কেঁপে উঠে সে কোনরকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল; ঠেসটা

না পেলে হয়তো পড়ে যেত।

ভবানী দেবী এসে তাকে তিরস্কার করলেন না, তাকে অব্যাহতি দিয়ে বললেন—মহেন্দ্রকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দাও। আর তুমি রত্নেশ্বরকে বল, সে যেন কর্তার সঙ্গে এখুনি দেখা করে।

সে বাঁচল। বেঁচে গেল। রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দাটা হাল্কা পায়ে পার হয়ে ডানদিকে আর একটা রান্না-ঘরে বেঁকে সে খানিকটা ছুটে নিল আনন্দে এবং কৌতুকে। কিন্তু আবার থমকে গিয়েছিল রত্নেশ্বরের ঘরের সামনে এসে। রত্নেশ্বরকেও তার ভয় হয়ে গেছে ওই বীরেশ্বর রায়ের মতই। তারই বয়সী, তার থেকে সাতদিনের ছোট এই আত্মীয়টি শুধু লম্বায় চওড়াতেই নয়, চোখের চাউনিতে, কথায়-বার্তায়, তার থেকে ওজনে অনেক ভারী। নিজেকে সংযত করেই সে ঘরে ঢুকেছিল।

কিন্তু রত্নেশ্বর তাকে আশ্চর্য হাল্কা এবং প্রসন্ন মেজাজে স্নেহসরস কণ্ঠে বলেছিলেন—কি সংবাদ?

রত্নেশ্বরও বিবাহের কথার সংবাদটা শুনেছেন। তাঁর মেজাজে তখন দোলা লেগেছে। তিনি প্রসন্নমনেই ছিলেন এবং অঞ্জনার মতই কাউকে খুঁজছিলেন যার কাছে তিনি অসঙ্কোচে সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি বাইরে বের হবার জন্যে পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এবং এই কথাই ভাবছিলেন।

চাকরদের কাছে এ সংবাদ অসঙ্কোচে সংগ্রহ করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে বোন বউদি অথবা ঠাকুমা দিদিমারাই গুপ্তচরের কাজ করবার যোগ্য পাত্রী। কিন্তু তেমন কেউ ছিল না। তাই অঞ্জনাকে দেখে তিনি তার মধ্যেই সেই প্রত্যাশিত জনটিকে পেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে—।

সুরেশ্বর বললে—তাই বা কেন সুলতা, উচ্ছ্বসিত উল্লাসের সঙ্গেই আহ্বান এবং প্রশ্ন করেছিলেন—কি সংবাদ?!

পৃথিবীতে এমন কতকগুলো জায়গা আছে, যে জায়গাগুলোতে ধ্বনির প্রতিধ্বনি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে সাড়া দেয়। অনেক খিলেনওলা বাড়ীতে একটা কে শব্দ বললে প্রতিধ্বনিতে সাতটা আটটা কে পরপর স্পষ্ট হয়ে বেজে বেজে যায়। অঞ্জনার প্রকৃতি চরিত্র ঠিক এমনি ধরনের। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া বাজে। রত্নেশ্বর রায়ের এই হাল্কা মেজাজের সুপ্রসন্ন ওই কি সংবাদ প্রশ্নটির প্রতিধ্বনি মুহূর্তে উত্তর হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তার মুখ থেকে। তার নেভানো কৌতুকসরস চিত্তদীপটি দপ করে জ্বলে উঠেছিল। সে বলেছিল—সংবাদ, সুসংবাদ! মিষ্টি খাওয়ান।

—মিষ্টি? তা খাওয়াব। কিন্তু সংবাদটা আগে বল!

—আপনার বিয়ে।

—বিয়ে!

—হ্যাঁ। কনে তো দেখা দিতে এসেছে!

—শুনেছি।

—দেখেছেনও!

—দূর থেকে।

কৌতুকময়ী মেয়েটি মুহূর্তে রঙ্গময়ী হয়ে উঠে চুপিচুপি বলেছিল—কাছ থেকে দেখতে চান না কি ?

—উঁ ? কাছ থেকে দেখা ? না—। এতটা থাক। কিন্তু তোমাকে খুঁজছিলাম।

—কেন ?

—মেয়েটি মানুষ কেমন যাচাই ক'রে বলতে পার ?

—পারি! কি যাচাই করতে হবে বলুন!

—এখন হবে না। বলব তোমাকে। বুঝেছ। আমি এখন একটু বেরুব। সরকারী হাকিমরা আসবেন। বিবি-মহলে যাব। পরে, দুপুরবেলা একটু অবসর ক'রে এস।

—আসব! কিন্তু এখন বাইরে যাবেন না। কর্তাগিন্নী ডাকছেন আপনাকে। বসে আছেন।

—বাবা মা দুজনে ডাকছেন ? কেন ?

—তা জানিনে। আসুন এখন। এমনিতেই কথায় দেরী হয়ে গিয়েছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার বিয়ের আনন্দে!

—আমার বিয়ের কথায় তোমার এত আনন্দ ?

—হবে না। কত ধুমধাম হবে। কিন্তু আসুন!

পথে যেতে যেতে অঞ্জনা বলেছিল—বাবাঃ যে বিপদ হয়েছিল—।

—কি বিপদ ?

—সে সেই দুপুরবেলা বলব!

বাপ মায়ের ঘরের সামনে এসে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকলেন রত্নেশ্বর। —মা!

উত্তর দিলেন বীরেশ্বর।—এস।

তার পোশাকপরিচ্ছদ দেখে বললেন—বেরুচ্ছ কোথাও ?

—হ্যাঁ, বিবিমহলে যাব।

—হ্যাঁ দেখে এস। সমস্ত বন্দোবস্ত নিজে দেখা উচিত। রাজকর্মচারী আসবেন। এঁরা হলেন সাপ, গোখরো সাপ, বাঁশী বাজিয়ে যতক্ষণ মনোরঞ্জন করে রাখতে পারবে ততক্ষণ বেশ তালে তালে দুলে দুলে নেচে যাবেন। যেমনি তাল কাটবে কি তার প্রতি একটু অন্যমনস্ক হবে, অমনি ছোবল দেবেন। চাণক্যের শ্লোকেই আছে—রাজকুলকে বিশ্বাস করো না। অবশ্য এবার রাধারমণবাবু রয়েছেন বাড়ীতে, তিনি আত্মীয় হয়ে এসেছেন, আত্মীয় হতেও চাচ্ছেন। তাঁর জন্যে অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার হবে। তবু দেখে এস। নিন্দারই বা কিছু থাকবে কেন। যাবার সময় বিবিমহল হয়ে যাও, ওঁদের সঙ্গে দেখা করে কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করে যাবে। দেবব্রত দাদা আছেন, জ্যেঠাইমা আছেন, ওঁদের প্রণাম যেমন করবে, তেমনি রাধারমণবাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করবে।

—যে আজ্ঞে। ওঁদের কাছ হয়েই যাচ্ছি।

—বস, আর একটা কথা আছে। তোমার জননী একটি কঠিন ভিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন একজনকে। ভোরবেলা মঙ্গল আরতির সময় একজন স্ত্রীলোক প্রার্থী তাঁর পায়ে ধ'রে ভিক্ষে চেয়েছেন—উনি মায়ের সামনে দেব বলেছেন।

রত্নেশ্বর ভুল বুঝলেন। তিনি ভাবলেন, ভোরবেলা সম্ভবতঃ রাধারমণবাবুর স্ত্রী বিয়ের কথা তুলে ভবানী দেবীর কথা আদায় করছেন। সেই কথা বলছেন বাবা। তিনি হেসে বললেন—কথা দিয়েছেন মা, তখন কথা কি আছে। দিতে হবে!

ভবানী দেবী এবার কথা বললেন—গোপাল সিংয়ের স্ত্রী এসে হাত জোড় ক'রে আমাকে বললে—আমার স্বামীকে বাঁচাও মা! এ এক তুমি পার। আমি তাকে কথা দিয়েছি রত্ন। মেয়েটি বলছে—গোপালের ফাঁসী হয়ে যাবে। তার বড় ছেলে মারা গেছে, বাঁচেনি। বড় স্ত্রী মর-মর। গাঁয়ের লোক ক্ষেপে গিয়েছে গোপালের উপর। পুলিশ এসেছে, তাকে খুঁজছে। সে ফেরার।

বীরেশ্বর রায় বললেন—আমাকে উনি বলতেই আমিও তুমি যা বললে তাই-ই বলেছি, তবে সর্ত রেখেছি, গোপালকে এসে ক্ষমা চাইতে হবে প্রকাশ্য কাছারীতে। মণ্ডলান দাবী নিজে থেকে নাকচ করতে হবে। তা ছাড়া যেখানে যা জবরদখল ক'রে রেখেছে সব ছাড়তে হবে!

মুখ নিচু করে রত্নেশ্বর শুনে যাচ্ছিলেন কথাগুলি। ক্ষণেক্ষণে তাঁর কপাল কুঁচকে উঠছিল। গোপাল সিংকে ক্ষমা করার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। রাগ হচ্ছিল তাঁর মায়ের উপর! ক্ষমা করবেন তিনি গোপালকে? গোপাল তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিল, তা তো তিনি না-জানা নন। গোপাল তাঁকে ঘর-বন্ধ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচাতে হবে? একি সত্য যুগ না ত্রেতা যুগ না দ্বাপর যুগ? শিবি রাজা আশ্রিত পায়রাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন বাজপাখীকে। জীমূতবাহন নাগকে রক্ষা করতে গড়ুরের আহার হতে গিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ ক্ষমা করেছিলেন পুত্রঘাতী বিশ্বামিত্রকে। এটা কলি যুগ!

ভবানী ছেলেকে নীরব দেখে বলেছিলেন—কি তুই চুপ ক'রে রইলি যে?

—কি বলব? তুমি কথা দিয়েছ, বাবা তাই মেনে নিয়েছেন, এর ওপর আমি আর কি বলব? তবে—

—কি?

—তবে এতে আমাদের করবার কি আছে? আমরা বাঁচাব বললেই তো বাঁচানো যাবে না। এ তো এখন কোর্টের হাতে। এ যে খুনের মামলা দাঁড়াবে! বাদী তো আমরা নই।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা নই। কিন্তু কেসের সাক্ষীর মালিক আমরা। বীরপুরের সাক্ষী বীরপুরের প্রজারা। আমরা যা বলাব, তাই তারা বলবে। তা ছাড়া সরকারী মহলকেও আমরা একটু আধটু ব'লে কয়েও দিতে পারব বই কি! ব্যাপারটা তোমাকে নিয়েই জটিল হয়েছে বেশী। তোমাকে, সে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল—

—যদি তাই হ'ত, তা হ'লে কি গোপালকে বাঁচাবার কথা বলতে পারতেন! মা এ কথা দিতে পারতেন?

—না। তা পারতাম না। কিন্তু তা যখন হয় নি রত্ন, তখন ক্রোধ তোমার সম্বরণ করাই

উচিত।

ভবানী বলে উঠলেন—ওরে তোর—তোর বাপের এতে কল্যাণই হবে। বুঝলি, দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে। বল তো কি কাণ্ড হল? লোকটা নিজের ছেলেকে খুন ক'রে বসল'। তোদের ওপর রাগে! তা ছাড়া রত্ন, তুই ফিরে এলি আপনার অধিকারে। তোর বিয়ে দেব। তুই সংসারী হয়ে জীবন আরম্ভ করবি। আজ দয়াধর্ম ক'রে আশীর্বাদ কুড়িয়ে নে বাবা। লোকে ধন্য ধন্য করুক।

বীরেশ্বর বললেন—আরও একটা কথা আছে রত্ন, আজ গোপালকে রক্ষা করলে লোকে বলবে—এরা শুধু মারতেই পারে না, ইচ্ছে করলে এরা বাঁচাতেও পারে!

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন—"শেষ কথা দুইটাতে আমার ক্ষোভ অপসারিত হইল! নূতন সংসারজীবনে প্রবেশ করিব, এই সময় গোপাল সিং-এর ওই অল্পবয়সী স্ত্রীটির এবং তাহার বালকপুত্র দুইটির অশ্রুজলে অবশ্যই আমার কল্যাণ হইবে না। ইহা অপেক্ষাও মূল্যবান কথা বলিয়াছেন পিতৃদেব। তাঁহার বিবেচনা বুদ্ধি এবং বিচারবোধ যতই দেখিতেছি ততই বিস্মিত হইতেছি। সত্যই তো, লোকে বলিবে—রায়বাবুরা ইচ্ছা করিলে শুধু মারিতেই পারেন না; ইচ্ছা করিলেই বাচাইতেও পারেন। বুঝিতে পারিয়া বলিলাম—ঠিক বলিয়াছেন। আমার আর কোন ক্ষোভ রহিল না। গোপালকে রক্ষা করাই এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য।"

*   *   *

রত্নেশ্বর এবার উঠবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন। ভবানী বলেছিলেন—আর একটু ব'স। গোপালের স্ত্রীকে ডাকি, তাকে তোরা বাপবেটায় একটু আশ্বাস দে। আর কথাগুলোও বল!

গোপালের স্ত্রী এসে প্রায় হাউ-মাউ করে কেঁদেছিল। সে কান্নায় রত্নেশ্বর স্থির থাকতে পারেন নি, কিন্তু বীরেশ্বর রায় অবিচলিত ছিলেন। রত্নেশ্বরের চোখে জল এসেছিল। তিনি তা গোপান করতেই জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় স্থির হয়ে বসে গড়গড়ার নল টেনেই গিয়েছিলেন। গোপালের স্ত্রীকে তার কান্নার বেগ কমে এলে বলেছিলেন—শোন বাছা, কতকগুলো কথা আমি ব'লে নি। স্থির হয়ে শোনো!

একে একে সর্তগুলি বলে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

মণ্ডলান তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

বীরপুরের সমস্ত জবর-দখল সম্পত্তি ছাড়তে হবে।

কীর্তিহাটের কাছারীতে এসে কসুর স্বীকার করে মাফ চাইতে হবে।

এবার বল, তুমি গোপাল সিংকে রাজী করাতে পারবে?

দীর্ঘ ঘোমটাটানা ছত্রির মেয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—হ্যাঁ। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে পেয়েছিল অঞ্জনাকে। তাকে বলেছিল—রাণী মাঈজীকে একবার ডেকে দাও।

ভবানী দেবী উঠে এসেছিলেন, সে ভবানী দেবীকে বলেছিল—সে রাজী না-হলে আমি আর আসব না। রাজী হলে আমি নিজে তাকে নিয়ে আসব!

এতে মত শুধু দেন নি দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য !

তিনি সব শুনে বলেছিলেন—এ কি করছেন বাবা বীরেশ্বর ?

বীরেশ্বর রায় চুপ করে ছিলেন—উত্তর দিতে পারেন নি !

ভবানী দেবী বলেছিলেন—মায়ের সামনে আমি কথা দিয়েছি দেওয়ান কাকা।

আলোচনাটা হয় তো আরও কিছুক্ষণ চলত কিন্তু মহিন্দর চাকর খবর নিয়ে এসেছিল—দেবব্রতবাবু, রাধারমণবাবু হাকিমসাহেবকে নিয়ে বাবুর কাছে আসছেন !

দেওয়ান আচার্য একটি কথা বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন—তা'হলে আমি যাই। ওঁরা আসছেন। ওদিকে অনেক কাজ ! আপনারা হুকুম করছেন, আপনারা মালিক ; আপনারা যা বলছেন তাই হবে। তবে—। একটু চুপ করে থেকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—সাপের মাজা ভেঙে ছেড়ে দিলে কিছুদিন পর আবার ভাঙা মাজা জোড় খায়। তখন সে সাপ হয় কালসাপ !

বলতে বলতেই—কই ভায়া কই ? বলে দেবব্রতবাবু সাড়া দিয়েছিলেন।

—এস, দাদা এস !

—হ্যাঁ, মহিন্দর বললে—তুমি একটু পর আসছ। তা রাধারমণ বললেন—সেটা ওঁকে কষ্ট দেওয়া হবে, ওঁর হাঁটতে কষ্ট হয়, বাঁ পা এখনও টেনে চলতে হয় ; চলুন আমরাই যাই। রাধারমণও এসেছেন। তোমার বউদি, সুরবালা, সুরবালার মেয়ে স্বর্ণ, ছেলে মণীন্দ্র সকলে এসেছি আমরা।

বীরেশ্বর বিছানা থেকে নেমে উঠে দাঁড়ালেন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য। ভবানী তাঁর লাঠিটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

—আসুন—আসুন—আসুন !

দেওয়ান আচার্য বেরিয়ে চলে গেলেন।

* * *

রাধারমণবাবু বসেই বললেন—এ তো আপনারা রাজত্ব গড়ে তুলেছেন বীরেশ্বরবাবু !

বীরেশ্বর রায় হেসে বললেন—পূর্বপুরুষ করে গেছেন। আমাদের ভাগ্যে আমরা ভোগ করেছি।

—তা করুন। রাজারা—রাজাদের ছেলেরা তাই করে। কিন্তু অনেক কীর্তি করেছেন। ভারী ভাল লাগল ! আপনার রত্নেশ্বরও খুব উপযুক্ত, খুব যোগ্যতা। He is a brilliant boy—আপনার দেওয়ান আমাকে বলছিলেন।

রত্নেশ্বর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। প্রণামাদি আসবামাত্র হয়ে গেছে।

রাধারমণবাবু বললেন—কে একটা দুর্দান্ত দুষ্ট লোক নাকি ভারী উপদ্রব শুরু করেছে। বলছিলেন আপনার দেওয়ান। শুনলাম আপনাদের ওপর রাগে সে না কি নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছে, বাধা দেওয়ায় তার নিজের ছেলেকে মাথায় মেরেছে এমন ক'রে যে খুন হয়ে গেছে ! আমি সব বলব আপনাদের এস-ডি-ওকে ! পুলিশকে একটু কড়কে দেবেন। ওরা সব পারে ! এসব লোকের চরম সাজা হওয়া উচিত। আমি শুনে খুশী হলাম কেন জানেন ?

আপনারা বেআইনী জবরদস্তি কিছু করেন নি! আপনারা আইনের পথেই চলেছেন! গভর্নমেণ্টও এইটে চাচ্ছেন।

বীরেশ্বর বললেন—কিন্তু বড় মর্মান্তিক হয়ে গেল ব্যাপারটা। বিশেষতঃ আমার গৃহিণীর মনে বড় লেগেছে। তিনি বলছেন—মণ্ডলানটা এইভাবে—

বাধা দিয়ে রাধারমণবাবু বললেন—নো—নো—নো স্যার, নো। আপনারা ঠিক করেছেন। খুব ভাল কাজ করেছেন। জানেন না বোধহয়, গভর্নমেণ্ট ভূমিস্বত্ব আইন সংশোধন করছেন। তাতে প্রজাদের অনেক সুবিধে হবে। বড়লাটের কাউন্সিলে আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনা চলছে।

রত্নেশ্বর বললেন—Mr. Currie মুভ করছেন!

To amend the law relating to the recovery of rent in the Presidency of Fort William in Bengal. ?

—তুমি খবর রাখ! বাঃ! হ্যাঁ ওটা অনেকদূর এগিয়েছে। মোটামুটি

it is meant for improving the position of the raiyats of Bengal.

দুটো জিনিস নির্ঘাৎ—একটা হল—

the abolition of the Zaminders. Power to compel the attendance of their raiyats.

আর হাজির করতে বাধ্য করতে পারবেন না জমিদাররা। Second হল বারো বছর একনাগাড় প্রজা জোত ভোগ করলেই অকুপেন্সী রাইট হয়ে যাবে। বারো বছরের উপর মণ্ডলান স্বত্বের মণ্ডলকে তালুকদারী যদি দেয় ওই বারো বছরের দাবীতে তাহ'লে আপনাদের মুস্কিল হবে। বীরপুরের case-এ ঠিক ক'রেছেন আপনারা। এরপর মণ্ডলান আয়মাদারী এসব আর থাকবে না। আপনাদের দেওয়ানের ফারসাইট আছে। খুব ভাল ব্যবস্থা করেছেন!

ওদিকে জগদ্ধাত্রী সুরবালা স্বর্ণলতা ভবানী দেবীকে ঘিরে পাশের ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু ওঁদের কান ছিল এ-ঘরে। সুরবালাই বললেন—ধান ভানতে শিবের গীত। এখানে এসেও সেই গভর্নমেণ্ট গভর্নমেণ্ট আর আইন আর আইন। দেখ তো কাণ্ড! বল না—জগদি!

জগদ্ধাত্রী দেবী উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—ও মশাই সাহেবমানুষ। মেমসাহেব যে মেজাজ খারাপ করছেন! বলছেন কুটুম্ববাড়ীতে এসে সাহেবী মেজাজটা ভুলতে পার না। ধান ভানতে শিবের গীত গাও যে! এলে মেয়ের বিয়ের কথা নিয়ে, এসে এসব হচ্ছে কি?

রাধারমণবাবু অপ্রতিভ হলেন। বললেন—সে ধর না হয়েই গেছে দিদি। যখন এসেছি, তখন বীরেশ্বরবাবুর মত রাজা লোক প্রার্থীকে ফেরাবেন কি বলে?

রত্নেশ্বর আর দাঁড়ালেন না। বললেন—আমি তা হলে এখন আসি। ওঁরা সব আসবেন, আমি দেখে আসি ব্যবস্থা সব ঠিকমত হ'ল কিনা!

যাবার সময় ফিরে ওঘরে স্বর্ণলতার দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করেও পারলেন না।

* * *

খুশী কথাটা ঠিক যেন লাগসই হচ্ছে না সুলতা। সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় তাঁর

ডায়েরীতে যে কথাটা ব্যবহার করেছেন সে কথাটা একালে প'ড়তে গিয়ে আমারও মনে হয়েছে বড্ড যেন বাড়াবাড়ি করেছেন, তরুণ রত্নেশ্বর। তবে ঊনবিংশ শতকের ঊনষাঠ সালে ভাষার ঢঙটাই ওইরকম ছিল। যুগটাই ঈশ্বর গুপ্তের যুগ। এদিকে কালীপ্রসন্ন সিং হুতোমপ্যাচার নক্সায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা রত্নেশ্বর রায়ের মত চরিত্রের মানুষের পছন্দ না হবারই কথা। তিনি লিখেছেন—"অহো! এই জগত-সংসারে প্রেম কি দুর্লভ আনন্দদায়িনী সামগ্রী। ইহা অনন্ত অপার আনন্দসুধা রসের অফুরন্ত নির্ঝরধারা। অকস্মাৎ যেন শরবিদ্ধ হৃদয়—ভূতল বিদীর্ণ হওত প্রবল উৎসধারায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া আমার তাপিত নবযৌবনকে নিষিক্ত করিয়া দিতেছে। আমার জীবনযৌবন যেন প্রখর গ্রীষ্মসন্তাপিত পত্রহীন বৃক্ষের মত এই রস অভিসিঞ্চনে পত্রপল্লব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। পল্লবাগ্রভাগে পুষ্প উদ্গমের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি সে অনেক কথা তিনি লিখেছেন। তাই বলছি কানের সাদামাটা 'খুশী' শব্দটা বোধহয় রত্নেশ্বর রায়ের মনের অবস্থা বোঝাবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেটা আর খুঁজে হায়রান হব না সুলতা, তুমি বুঝে নিয়ো। তিনি লিখেছেন—তাঁর গান মনে পড়েছিল।

গানে রত্নেশ্বরের অধিকার দুদিক থেকে। সংসারে হেরিডিটির সত্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। পিতৃকুলে বীরেশ্বর রায় গান-বাজনার চর্চা করেছিলেন। মাতৃকুলে শ্যামাকান্ত ছিলেন সিদ্ধ-গায়ক। ভবানী দেবীও গানে জন্মগত অধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন। রত্নেশ্বরের স্নায়ুশিরায় অস্থিমজ্জায় মস্তিষ্কে বুদ্ধিতে বোধে সঙ্গীতবোধ ও তার ব্যাকরণের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার বংশসঞ্চিত গুপ্তধনের মতই রাখা ছিল। ওই মধ্যে মধ্যে কখনও এমনি উল্লাস আনন্দে কদাচিৎ গুঞ্জন করেছে। সেদিনটি তার মধ্যে একটি দিন। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর বংশ বিবরণের মধ্যে যা পেয়েছি তাতে কখন গান গেয়েছেন এমন কথা লেখেন নি। তাঁর দিনলিপি আরম্ভ হয়েছে মাত্র দুদিন আগে থেকে। ওই দোলের দিন, পোষ্যপুত্র হিসেবে মা-বাপের কোলে ফিরে আসার দিন থেকে। তার তৃতীয় দিনে রত্নেশ্বর বিবাহ সম্ভাবনাতেই শুধু নয় ভাবী বধূটিকে বাড়ীতে চকিত চাহনিতে দেখে বিবিমহলে যাবার পথে গুনগুন ক'রে বসন্তরাগ ভেঁজেছিলেন। পিছনের বরকন্দাজ তাতে হাসে নি, সে বাবুজী সাহেবের গান শুনে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। বিবিমহলে রত্নেশ্বর রায় যখন দেখাশোনা করছিলেন, তখন বরকন্দাজটি আর একজন বরকন্দাজকে বলছিল—আরে ভাই, বাবুজী সাহেব এমন গানা জানেন কি বলব তোমাকে!

রত্নেশ্বর কথাটা শুনেছিলেন। এবং নিজেকে সতর্ক করেছিলেন—"অন্যায় করিয়াছি, নিজের অজ্ঞাতসারে গান গাহিয়া ফেলিয়াছি। গানের পথে বিপদ আছে রায়বংশের।"

বিবিমহলে তখন ঝাড়াই মোছাই হয়ে গেছে। ভবানী দেবীর প্রত্যাবর্তনের পর বীরেশ্বর রায় বিবিমহলে বাস করেন নি। বংশের অন্দরে বাস করছিলেন। বিবিমহলের ফার্নিচার তখন এখানে এবাড়ীতে এসেছে। তার জায়গায় রত্নেশ্বর আসবেন বলে যে সব নতুন ফার্নিচার এসেছিল কলকাতা থেকে, গদী আঁটা চেয়ার সোফা মার্বেল টপ টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, বড় বড় আয়না, নতুন গালিচা সেইসব দিয়ে বিবিমহল সাজানো হয়েছে। হয়েছে ক' মাস আগেই, সেই ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন স্থাপনের সময়। সেগুলো ঝাড়ামোছা এবং একটু এদিক ক'রে

সাজানো এইসব কাজ হচ্ছিল সে দিন। কুইন ভিক্টোরিয়ার, প্রিন্স এ্যালবার্টের ছবি টাঙানো হয়েছে; তার সঙ্গে বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপ ক'খানা টাঙিয়ে সাজিয়েছে। এ-সব কাজের জন্য কলকাতা থেকে সাহেববাড়ীতে কাজকরা একজন বেয়ারাকে আনা হয়েছে। সেই সব বরাতমত করাচ্ছে। রত্নেশ্বর নিজে প্রত্যেক ঘরের ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়েই ওখান থেকে ফিরছিলেন; নিচে এসে দেখলেন দেওয়ান আচার্য তাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। বললেন —বাবুজী সাহেব, আমি তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি ভাই!

রত্নেশ্বর বললেন—বলুন।

—বলব কি? তুমি তো সব জান। এ তুমি বলে ক'য়ে বন্ধ করো।

—কি?

—গোপাল সিংয়ের সম্বন্ধে যে হুকুম হল সে হুকুম তুমি ওল্টাতে পার। ওল্টাও ভাই। নইলে জমিদারী চলবে না। অন্ততঃ আমি তো চালাতে পারব না।

রত্নেশ্বর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তা কি ক'রে হয়! মন তাঁর অন্যরকম হয়েছিল, তিনি সায় দিতে পারলেন না। বললেন—তা কি ক'রে হয় বলুন? মা কথা দিয়েছেন, খোদ কর্তা পর্যন্ত গোপাল সিংয়ের স্ত্রীকে ডেকে কথা দিলেন। সে কথা এখন না বলবেন কি ক'রে?

আচার্য বললেন—আমি তা হ'লে বাবুজী সাহেব, এই কাজকর্মগুলি চুকে গেলেই কাজ থেকে ছুটি নেব।

—ছুটি নেবেন!

—হ্যাঁ। এরপর আমি আর কাজ করতে পারব না। আমার মুখ থাকবে না। কথায় বলেও আচার্য তৃপ্তি পান নি, কথা শেষ ক'রে ঘাড় নেড়েছিলেন—না।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"মুহূর্তে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আচার্য দেওয়ান আমাদের কথাও শুনিতে চাহিতেছেন না। এবং ভাবিতেছেন, রায়বাড়ীর তিনিই হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনি না হইলে রায় এস্টেট চলিবে না, অচল হইয়া পড়িবে। আমি বলিলাম—বেশ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা পিতৃদেবকে বলিব।" কথাটা আর সেই মুহূর্তে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি; পালকির বেহারার হাঁক শোনা গিয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে একজন নায়েব ছুটে এসে খবর দিয়েছিল—হাকিমরা এসে পড়েছেন!

রায়বাড়ীতে হাকিমদের সম্বর্ধনা সেদিন রায়বাড়ীর সৌভাগ্যে কুটম্বিতার আসরে পরিণত হয়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সদর এস-ডি-ও রাধারমণবাবুর কন্যার বিবাহের সম্বন্ধের আসরে পরিণত হয়েছিল। ধুতিচাদর পরা রাধারমণবাবু তমলুকের এস-ডি-ও গুপ্ত সাহবকে বলেছিলেন—আজ কিন্তু আমরা রায়বাড়ীতে গভর্নমেণ্ট অফিসিয়েল নই মিস্টার গুপ্তা। আমরা আজ কন্যাপক্ষ। আপনারা শুনে নিশ্চয় খুশী হবেন যে আমার মেয়ে স্বর্ণলতার সঙ্গে বীরেশ্বরবাবুর পুত্র রত্নেশ্বরের বিয়ের সম্বন্ধ আজ পাকা হয়ে গেল!

অল্পবয়সী ইংরেজ ডি-এস-পি জোনস এসেছিল শীকারের লোভে। কথাটা শুনে সে উল্লসিত হয়ে বলেছিল—তা হলে তো এ শুভকর্মে আমাদের বরকনের কল্যাণ কামনা ক'রে কিছু পান

করা উচিত।

এ কথায় রাধারমণবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—সম্ভবতঃ তিনি আমার সম্মুখে মদ্যপান করতে সঙ্কোচবোধ করেছিলেন।

বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বরকে বলেছিলেন—তুমি তা'হলে ওদিকে গিয়ে কাজকর্মগুলি দেখ রত্নেশ্বর!

অবশ্য তার আগেই পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে। কীর্তিহাটের রায়বংশের উত্তরাধিকারীকে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন বীরেশ্বর রায় এবং তাঁর সঙ্গে রাধারমণবাবু তাঁর গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। সরকারী হাকিম তিনি—তিনি রত্নেশ্বরের গুণের কথা তাঁদের সামনে তুলে ধরেছিলেন সুন্দর কৌশলের সঙ্গে।

প্রথমেই বলেছিলেন—রত্নেশ্বর রায় কাশীতে ছিলেন মিউটিনির সময়। নিজের চোখে সব দেখেছেন। আমাকে বলছিলেন কাল; এমন সুন্দরভাবে বললেন এবং এমন বিচার ক'রেছেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এবং আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দেখে। সমস্ত ব্যাপারটা এ্যানালিসিস ক'রে অল্প কথায় সমস্ত কথাটা বলে দিলেন। বললেন—এটা হল ইণ্ডিয়ার ধর্মান্ধতার সঙ্গে ইউরোপীয়ান সিভিলিজেশনের লাস্ট ফাইট। এটাকে আলোর সঙ্গে অন্ধকারের লড়াই বলা যেতে পারে। ইণ্ডিয়ার ভাগ্য ভাল যে আলোর জয় হয়েছে। এ্যাণ্ড—: এইটেই আমার সব থেকে ভাল লেগেছে; উনি বললেন—আলোই জেতে চিরকাল অন্ধকার হারে।

রত্নেশ্বর নিজের ডায়রীতে লিখেছেন—"এরূপ কথা আমি বলিয়াছিলাম ইহা সত্য কিন্তু এমন চমৎকার করিয়া বলি নাই। এবং ইহার সঙ্গে নির্বিচারে বালকবৃদ্ধকে হত্যা করার নিন্দাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ভাবী শ্বশুরমহাশয় এই কথাগুলি বলিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে কোম্পানীর তরফের অত্যাচার বৃত্তান্ত বলা উচিত হইবে না।"

ওখান থেকে ফেরার পথে রত্নেশ্বর দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ভাবী বধূকে। রায়বাড়ীর আলসের উপর বুক রেখে দুটি মেয়ে বোধহয় কীর্তিহাট গ্রাম দেখছিল। তার একজন অঞ্জনা অন্যজন স্বর্ণলতা; স্বর্ণলতাকে তিনি খুব ভাল ক'রে না দেখলেও তিনি তাঁকে চিনতে ভুল করেন নি। কারণ এমন মেয়ে রায়বাড়ীর জ্ঞাতি কুটম্বের মধ্যে কেউ ছিল না।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রত্নেশ্বর ... লিখেছেন—"বিবিমহল ও রায়বাড়ীর খাসমহলের মধ্যবর্তী যে কলমের বাগান, সেই বাগানে প্রবেশ মুখে উক্ত নারীমূর্তিদ্বয়কে দেখিয়া চিনিলাম এবং পুলকিত হইলাম। অঞ্জনার পার্শ্ববর্তিনী ওই স্বর্ণাভ-বর্ণা কিশোরীটি যে স্বর্ণলতা ব্যতিরেকে অন্য কেহ হইতে পারে না ইহাতে আমার সংশয় ছিল না। আমি একটি বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। হৃদয় অভূতপূর্ব ভাবাবেশে আবিষ্ট হইল। সম্ভবতঃ তাহারা আমাকেও দেখিয়াছিল। কারণ তাহারা সরিয়া গেল। আমিও সরিয়া আসিলাম এবং লজ্জিত হইলাম। ছি—ছি—ছি, যদ্যপি কেহ দেখিয়া ফেলে! লোকে হাস্য করিবে। আমি তাড়াতাড়ি তত্রস্থান হইতে দ্রুতপদে কাছারীর মুখে চলিলাম। আমার সঙ্গে বরকন্দাজ

আমাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটু বিলম্ব হইলে সম্ভবতঃ গোলমাল হইত। যাহা হোক কাছারীতে আসিয়া বসিয়া মহাবীর সিংকে আজ্ঞা করিলাম যে, কেহ যেন এখন না আইসে। আমি বসিয়া স্বর্ণলতার সঙ্গে আমার ভাবী মিলিত জীবনের একটি সুখ-কল্পনার চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিতে বসিলাম।

"অকস্মাৎ মনে হইল অঞ্জনাকে বলিয়াছি দ্বিপ্রহরে আমার নিকট আসিবার জন্য। স্বর্ণলতার অন্তরের পরিচয় সম্যক জ্ঞাত হওনের জন্য কিছু প্রশ্ন করিব। কিন্তু কি প্রশ্ন করিব? প্রশ্ন একটি। আমাকে তাহার পছন্দ হইয়াছে তো? কিন্তু তাহা কি অঞ্জনাকে সরাসরি বলিতে পারিব? অঞ্জনা একটু প্রগলভা। লজ্জাবোধ হইতেছে।"

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর একটি ছোট কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি তার ডায়রীর মধ্যে আছে।

কন্যার হইবে বিয়া ঘটকেরে আনাইয়া
পিতা কয় বাখানিয়া
পাত্র চাই ইন্দ্রের মতন
মাতা কহে বুদ্ধি নাই ইন্দ্র সাথে চন্দ্র চাই
খানিক কুবেরও চাই
রাজরূপ তার সাথে ধন।
ঘটক নাড়িয়া মাথা কন্যারে শুধায় কথা
এবে তুমি বল মাতা
এর সাথে আর কারে চাই?
কন্যা ভাবে মনে মনে হায় বলিব কেমনে
ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে যেন—পাই।

অঞ্জনার হাতে এই ধাঁধাটি দেবেন। স্বর্ণলতাকে সে বলবে—এই শেষ ছত্রে ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে কাকে চাই এই ফাঁকটি তুমি পূরণ করে দাও না ভাই! উত্তরটা আমি ভাই বুঝতে পারছি না!

অঞ্জনা লেখাপড়া জানে না, কিন্তু তা' বলে মূর্খ বলতে যা বোঝায় তা নয়। সেকালে লেখাপড়া না জেনেও পুরাণে কাব্যে রঙ্গরসিকতায় সে পারঙ্গমা ছিল। ছড়া, পাঁচালী, কৃত্তিবাসী-কাশীদাসী রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ মুখস্থ ছিল। আওড়াতে পারত। রীত তরিবৎ তাও সে ভালই জানত। লেখাপড়া না জানলেও অশিক্ষিতা ছিল না। সে একবার শুনে বলেছিল—কি—কি—কি আর একবার পড়ুন তো!

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—সুলতা—"অঞ্জনার প্রশ্নে আমি কৌতুকবোধ করিলাম। বুঝিলাম সে বুঝিতে পারে নাই। আমি তাহাকে আবার একবার পড়িয়া শোনাইলাম। সে এবার খুক খুক শব্দে হাসিয়া ফেলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসি রোধ করিতে চাহিল।"

রত্নেশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন—হাসলে যে?

অঞ্জনা বলেছিল—এ তো খুব সোজা।

—সোজা? কই বল তো শুনি—।

—আর একবার পড়ুন।

রত্নেশ্বর পড়েছিলেন—

"ঘটক নাড়িয়া মাথা
কন্যারে শুধায় কথা
এবে তুমি বল মাতা এর সাথে
আর কারে চাই?
কন্যা ভাবে মনে মনে
হায় বলিব কেমনে—
ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের সঙ্গে যেন—

অঞ্জনা বলে উঠেছিল—"রত্নেশ্বরে পাই।"

বলে খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছিল।

রত্নেশ্বর শঙ্কিত হয়ে উঠে বলেছিলেন—চুপ—চুপ। বাইরে কে কোথায় শুনতে পাবে!

সাক্ষাৎকারটি পূর্বের বন্দোবস্ত মত দুপুরবেলা নির্জনে রত্নেশ্বরের ঘরে হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর গ্রামাঞ্চলে একটা বিশ্রামের সময় আসে। তখন সকলেই একটু আধটু গড়ায়।

সুরেশ্বর বললে—কি শীত কি গ্রীষ্ম—দুপুরের পর একটু গড়ানো এদেশের পক্ষে প্রয়োজন কি না সে কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলতে পারেন। শুনেছি গান্ধীজীও নাকি গড়িয়ে থাকেন। ওঁর কোমরে যে পকেট ঘড়িটা আছে তাতে এলার্ম বাজে; ওই আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পর সেটা বাজুক না বাজুক ঠিক উঠে পড়েন। তবে গ্রামের লোকে—নিতান্ত গরীবের ঘর ছাড়া সবাই ঘুমোয়। ১৯৩৭ সালেও ঘুমুতে দেখেছি আমি। ওর মধ্যে প্রয়োজন ছাড়া বোধহয় আভিজাত্যও আছে। আমারও ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

সুলতা হেসে বললে—জানি আমি, আজ দুপুরেই টেলিফোন করেছিলাম। রঘু আমাকে বললে—লালবাবু নিদ যাচ্ছে দিদিমণি। কাল রাতভর আপনা সাথ গল্প করিয়েছেন আজ তো বহুৎক্ষণ নিদ যাবেন। দুপহর বেলা নিদ না-গেলে তবিয়ৎ খারাব হোয় উনকা। আমি বললাম—থাক তাহলে, ডেকো না।

সুরেশ্বর হাসলে। বললে—রঘুও ঘুমোয়। তবে টেলিফোনের রিঙ শুনে বোধ হয় জেগে উঠেছিল। ওরও এ রোগ ধরেছে কীর্তিহাটে। দুপুরবেলা সারা গ্রামে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুমপাড়ানি মাসী এসে আঁচল বিছিয়ে বসেন।

—সেদিন, মানে, ১৮৫৮ সালের ফাল্গুন মাসের দুপুর বেলাটায় সবাই গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আগের দুদিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব গেছে। সারা রায়বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। রায়বাড়ীর কার্নিশে কার্নিশে অনেক পায়রা থাকত; আজও আছে; সেগুলো পর্যন্ত বাসায় বুক পেতে ব'সে থাকে; মধ্যে মধ্যে এক-একটা শব্দ ক'রে, তাও ক্ষীণ।

রত্নেশ্বর তাও লিখেছেন ডায়রীতে। তাঁর সেদিন ঘুম আসে নি। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা

আসছিল কিন্তু পায়রাদের ওই ডাকেই চট্ চট্ করে সে তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে ভাবনা হচ্ছিল—অঞ্জনা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। দু চারবার খাট থেকে নেমে পায়চারী করেছেন; বার দুই বাড়ীর ভিতরের দিকের বারান্দার দরজা ফাঁক ক'রে তাকিয়ে দেখেছেন অঞ্জনা আসছে কি না। আবার দরজা বন্ধ ক'রে এসে বিছানায় উঠে হেলান দিয়ে বসছিলেন।

লিখেছেন—"প্রেমজনিত উদ্বেগ সম্বরণ করা অতীব কঠিন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি এখনও তিনটা বাজে নাই। খাওয়া-দাওয়া আড়াইটা পর্যন্ত শেষ হয়। সুতরাং মাত্র অর্ধঘণ্টা পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে মাত্র, অথচ আমার মনে হইতেছে অন্তত দুই তিনঘণ্টা কাল আমি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি।"

তারপর একসময় অঞ্জনা ঠিক এল। সন্তর্পণে দরজাটি খুলে গেল—এক ঝলক আলো ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকল অঞ্জনা এবং দরজাটি বন্ধ ক'রে এগিয়ে কাছে এসে বললে—বাবা! সবার চোখে ঘুম আছে, ঠাকমার চোখে ঘুম নেই। দিব্যি দেখি নাক ডাকছে, দেখে যেই উঠি অমনি দেখি বুড়ী ওঁ—আঁ শুরু করে দেয়। চোখ খুলে তাকিয়ে বলে—কিলা উঠলি যে? বিকেল হয়ে গেল না কি? একবার বললাম—ঘাটে যাব। তা বলে—না। আর একটু পরে যাস। এখন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এই রাজসূয় যজ্ঞি। তিভুবনের নোক চারিদিকে। সোমত্ত মেয়ে—কোথা কে থাকে! যাসনে—শো! কি করব? এই এতক্ষণে ঘুমুলো। আস্তে আস্তে উঠে এসেছি। নেন—কি হুকুম বলুন!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—খুব সাবধানে করতে হবে! বুঝেছ?

—বুঝেছি বলুন।

—একটি ধাঁধা দেব। যেন তোমাকে ধাঁধাটি দিয়েছি আমি। বুঝেছ?

—হ্যাঁ।

—তুমি মনে কর ধাঁধাটি বুঝতে পার নি এই ভান দেখিয়ে স্বর্ণলতাকে ডেকে বলবে—ভাই, তুমি তো লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে, এই ধাঁধাটি পূরণ করে দেবে?

—ধাঁধা? কি ধাঁধা? বলুন।

—কাগজে লিখে দিয়েছি। না-হলে তোমার ভুল হয়ে যাবে।

—আমাকে শোনাবেন না? আমি তো পড়তে জানি না।

পড়ে শুনিয়েছিলেন রত্নেশ্বর। অঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল—কি—কি কি? আর একবার পড়ুন তো! বলে মুখে কাপড় চাপা দিয়েছিল। সে ধাঁধাই হোক আর ছড়াই হোক তার মর্মটা অনায়াসে বুঝেছিল। হাসিও পেয়েছিল কৌতুকে।

ধাঁধাটা শুনে অঞ্জনা বলেছিল—ও তো সোজা। উত্তর—"রত্নেশ্বরে পাই"। বলে খিল-খিল ক'রে হেসে উঠেছিল।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—চুপ—চুপ—কে শুনতে পাবে।

অঞ্জনাও সতর্ক হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেছিল—ওই আমার দোষ। হেসে ফেলি। মা বলত—দুষমনের হাড়ে তৈরী দাঁত-না-হ'লে এমন ক'রে সবতাতেই কেউ হাসতে পারে না! ওতেই মরবি—তুই ওতেই মরবি!

রত্নেশ্বর ডায়েরীতে লিখেছেন—"অঞ্জনার বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর মুহূর্তে গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই দরিদ্র অথচ উল্লাস এবং সদাহাস্যময়ী মেয়েটির হাস্য কেহ সহ্য করে না। স্থির করিলাম ইহাকে পরবর্তীকালে স্বর্ণলতার সঙ্গিনী করিয়া দিব। এবং আমি ইহাকে সত্যকারের আপন জনের মতই সমাদর সম্ভ্রম করিব।"

অঞ্জনা চিঠিখানা হাতে ক'রে বলেছিল—তা হ'লে আমি যাই। আপনার কনেকে দেখিয়ে জবাব এনে দেব। তার যা বুদ্ধি সে ঠিক জবাব লিখে দেবে!

—কিন্তু বলে দি একটা কথা। উত্তরে কোন মানুষের নাম হবে না।

—মানুষের নাম হবে না?

—না। তোমার জবাব হয় নি। রত্নেশ্বরে পাই লিখলে হবে না। লিখতে হবে দেবতার নাম।

—দেবতার নাম?

—হ্যাঁ। ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এঁদের সঙ্গে মানুষের নাম কি চলে? ওখানে দেবতার নাম দিতে হবে। যেমন রামচন্দ্রে পাই নয়তো মহেশ্বরে পাই নয়তো নারায়ণে পাই।

আবার মুখে কাপড় চাপা দিলে অঞ্জনা। আবার তার হাসি পেয়েছে।

রত্নেশ্বরও হেসে বললেন—আবার হাসি পেলে কিসে?

—যদি স্বর্ণলতা লেখে—মহেশ্বরে পাই!

—বেশ তো, আমি শিবের মতই হব তাহলে?

—পারবেন?

—কেন? পারব না কেন?

—শিব শ্মশানে মশানে ফেরে; গাঁজা ভাঙ খায়। ভূত নিয়ে ফেরে। আপনি এই রাজ অট্টালিকা ছেড়ে এমন হ'তে পারবেন? আরও অনেক চাই—বুড়ো হ'তে হবে, মাথায় জটা মুখে দাড়ি; মা গো! সে হতে পারবেন না আপনি।

রত্নেশ্বর হেসে ফেললেন। মেয়েটা এমন যে, সব কিছুকেই হাস্যকর করে তুলতে পারে। শিবের শিবত্ব বোঝে না, বুঝলেও সে-সব বাদ দিয়ে তার সকৌতুক দৃষ্টিতে শিবের পাকা চুল দাড়ি জটা এবং ভাঙ খাওয়াটাই সব হয়ে ওঠে! তিনি বললেন—তা হোক। তুমি ওকে দিয়ো তো! দেখি না কোন দেবতা ওর পছন্দ!

অঞ্জনা চলে গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তখন রত্নেশ্বর উঠে মুখ হাত ধুচ্ছেন, সন্ধ্যের উৎসব আজ বিশিষ্ট উৎসব। আজ হবে বাঈজীর নাচ। এখুনি নিচে নেমে কাছারীতে গিয়ে বসবেন। খবরাখবর নেবেন।

চাকর রূপোর গ্লাসে ডাবের জল এনে ত্রিপয়ের উপর রেখেছে। রেকাবীতে মসলা-পান। মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়বেন।

অঞ্জনা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

রত্নেশ্বর লিখেছেন—"তাহার মুখ সহাস্য; এবং কৌতুকে চোখ দুটি উজ্জ্বল। দেখিয়াই বুঝিলাম সে এই অল্পসময়ের মধ্যেই ধাঁধার উত্তর লইয়া আসিয়াছে। আমার অন্তর মন উদ্‌গ্রীব

হইয়া উঠিল উত্তরের জন্ত। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে এসব কথা বলিতে নাই। কি করিয়া জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। শুধু কহিলাম—আইস। কোন সংবাদ আছে কি ?

অঞ্জনা চতুরা, সে বলিল—"এই যাঃ আমার যে ভুল হইয়া গেল।"

অঞ্জনা চাকর গোবিন্দকে বলেছিল—গোবিন্দ, যাও তো নিচে ঠাকুমার কাছে যাও। বলো ছোটবাবুর জন্তে পান সাজা আছে, বড়বাবুর রেকাবিতে পান আছে, তার পাশেই ছোট রেকাবি আছে, তাতে যে পান সে পান ছোটবাবুর। সে রেকাবিটা নিয়ে এস তো।

গোবিন্দ চলে গেলে অঞ্জনা বলেছিল—পান সেজেছে স্বর্ণলতা। আমি আলাদা করে আপনার জন্তে রেখে দিয়েছি।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি গোপন করে অঞ্জনা বলেছিল—খুব চালাক, খুব চালাক মেয়ে। আমি পান সাজছিলাম। আপনার হুকুম তামিল করতে গিয়ে আজ এবেলার পান সাজা হয় নি। পান সাজছি আর ভাবছি, কি ক'রে যাই, কি ক'রে বলি। হঠাৎ আমার ভাগ্যি ; ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল চুপ ক'রে। আমি পান সাজছি দেখে কাছে এসে বললে—পান সাজছ ? বললাম—হ্যাঁ। এ পান কর্তাবাবুর, সতী বউরাণীর আর ছোটবাবুর। এ পান আমি সাজি। তারপর বললাম—এসেছ ভালই হয়েছে। একটা ধাঁধার উত্তর করে দিতে পার ? বললে—ধাঁধা ? কি ধাঁধা ? পাড়াগাঁয়ের ধাঁধা ভাই আমি জানি না। বললাম—না ; এ ভাই ছোটবাবুর তৈরী করা ধাঁধা। বললে—ছোটবাবু কে ? বললাম—রত্নেশ্বরবাবু ! মুখটা লাল হয়ে উঠল, বললে—উনি বুঝি তোমাকে ধাঁধা দেন উত্তর করতে ? বুঝেছেন ? মনে—মনে—।

মুখে আবার একবার কাপড় চাপা দিয়ে সামলে নিয়ে বললে অঞ্জনা—আমি বললাম—না, আমি ভাই সম্পর্কে ওঁর সাতদিনের বড় দিদি। কিন্তু ওঁরা ভাই বড়লোক, রাজা লোক, আর ভালমানুষ, তাই আমি পোষ্য হলেও চাকর মনে করেন না, সম্বন্ধটার মান রাখেন। আজ ওঁকে ডেকেছিলেন সতী বউরাণী জ্যেঠাইমা, আমি ডাকতে গেলাম। দেখলাম একমনে কাগজে লিখছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—কই অঞ্জনাদি, একটা ধাঁধার উত্তর দাও তো! আমি ভাই পারলাম না। লেখাপড়াজানা পণ্ডিত লোক। বললাম—লিখে দিন ভেবে বলব। এই দেখ! বলে কাগজখানা দেখালাম। তা পড়ে হেসে বললে—বল না, তোমার যে দেবতা পছন্দ তার নাম। আমি বললাম—আমার তো হয়ে গিয়েছে। এ জন্মের ঢাক বেজে গিয়েছে। কোন দেবতা ধারে কাছে ঘেঁযে না। তুমি বল। তো বললে—কাকে ছেড়ে ভাই কাকে চাইব বল! তেত্রিশ কোটি দেবতা। একে ছেড়ে ওকে চাইলে অন্তজনে রাগ করে। তার থেকে ভাই একজনের মধ্যে সব দেবতাকেই চাই। বুঝেছ! ওখানে উত্তর হবে 'সব দেবে' চাই! হেসে বললে—আমাকে বলো, কি বললেন তোমার ছোটবাবু। তারপর বললে—তোমায় তো দেখছি অনেক পান সাজতে হবে। আমি কয়েকটা সেজে দেব ? বলে পান সাজতে বসল। খিলি আষ্টেক পান সেজে দিয়ে উঠে গেল।

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন ডায়েরীতে—"উত্তর পাইয়া সত্য-সত্যই আমি পরাজিত হইলাম। সুকৌশলে 'সব দেবে' লিখিয়া আমাকে ঠকাইয়া দিয়াছে। নারী চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয় ;

বুঝিতে পারিলাম না তাহার পছন্দ কি! কিন্তু পান যখন সাজিয়া দিয়াছে, তখন বিবাহে তাহার আগ্রহ আছে ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।"

অঞ্জনা রত্নেশ্বর রায়ের সম্মুখে হাত পেতে বলেছিল—আমার বকশিশ।

—বকশিশ! বকশিশ কি আপনারজনকে দেয়? তুমি কি দাস-দাসী? তুমি সম্পর্কে আমার সাত দিনের বড় দিদি।

—দিদি না ছাই! সাত দিনের বড় আবার বড়। আর রাজাবাবুর দিদি কি গরীব হয়? আমি আপনাদের দাসী না হই পোষ্য। চাকরে মাইনে পায়। আত্মীয় পোষ্যরা পেটভাতার পোষ্য।

রত্নেশ্বর রায় আবেগে বিচলিত হয়েছিলেন—সেই বিচলিত মনে দুই হাতে অঞ্জনার পাতা অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানি চেপে ধরে বলেছিলেন—না-না-না! তোমার সম্মান এ সংসারে আমার মত, আমার যে বউ আসবে তার মতই হবে।

অঞ্জন বলেছিল—হাত ছাড়ুন। আমার পাতা হাত ভরে গিয়েছে।

রত্নেশ্বরের ডায়রিতে আছে—"অঞ্জনাও আনন্দে পুলকের-থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, আমি তাহার হস্ত দুইখানি ছাড়িয়া দিতেই সে সেই হাত মাথায় বুলাইয়া বুকে ধরিয়া চঞ্চল পদে প্রস্থান করিল।"

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, বিবাহস্বপ্নে বিভোর তরুণ রত্নেশ্বর রায় সেদিন ঠিক বুঝতে পারেন নি যে কি ঘটল। বুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। সে কথা পরে বলবার সময় হলে বলব তবে তার ছবি আমি এঁকেছি। এই দেখ সে ছবি।

তরুণ রত্নেশ্বর রায় একটি দীর্ঘ শ্যামাঙ্গী মেয়ের হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের কোণে যেন জল-বিন্দুর আভাস! দুজনেরই প্রফিলের ছবি। মেয়েটির চোখটি বড় সুন্দর, আর মাথায় একরাশি কোঁকড়ান চুল, ফুলে ফেঁপে পিঠের দিকে পড়ে রয়েছে, তাতে একটি ঢং এসেছে, যেটা ঠিক এদেশী নয়, অনেকটা সেকালের ইজিপশিয়ান মেয়েদের চুলের মত।

সুলতা ছবিখানা দেখে বিস্মিত হল। মনে হল এই মেয়েটির ছবি যেন আর কোথাও আছে, এই সব ছবিগুলোর মধ্যে। সে উঠে এসে ছবিখানার কাছে দাঁড়াল। তারপর চোখ ফিরিয়ে বাকী ছবিগুলো দেখতে গিয়ে আটকে গেল, পাশের ছবিখানার দিকে।

কোন একজন ভয়ঙ্কর-দর্শন লোকের ছবি। দাঁতে-দাঁত টিপে লোকটা একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপকে ধরে আছে! লোকটা যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, পাথর কেটে গড়া একটা মূর্তি। সুলতা সবিস্ময়ে বললে—এ ছবিটা?

সুরেশ্বর বললে—ও ছবিটা গোপাল সিংয়ের। ওই গোপাল সিং।

—এই গোপাল সিং! কিন্তু এমন করে একটা সাপকে ধরে রয়েছে কেন?

—বলছি সুলতা। এই খবরটা সেদিন ঠিক এমনিভাবেই অর্থাৎ এই মুহূর্তটিতেই এসেছিল রায়বাড়ীতে। রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমি অঞ্জনার গমনপথের দিকেই দৃষ্টিপাত করতঃ তাহার কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। এমত সময় বাহিরের বারান্দার দিক হইতে বদ্ধ

দরজার ওদিক হইতে কে ডাকিল—হুজুর!

—কে?

—হামি, মহাবীর সিং।

এদিকের দরজা দিয়ে তখনই পানের রেকাবি হাতে ঘরে ঢুকেছিল তাঁর খাস চাকর গোবিন্দ। গোবিন্দ রেকাবখানা তাঁর সামনে নামিয়ে দিতেই সাগ্রহে দুটি পান তুলে মুখে পুরে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—দরজা খুলে দে!

দরজা খুলতেই মহাবীর সেলাম করে জানিয়েছিল—বড়া হুজুর আপনে কহলেন কি উনকে সাথ ভেট করনে কো লিয়ে!

—আচ্ছা। যাচ্ছি। বল গিয়ে আসছি আমি।

কথার মধ্যেই এসে ঘরে ঢুকলেন ভবানী দেবী। রত্নেশ্বর—

—মা!

—আমার কথার কোন দাম রইল না রে? আমি মা আনন্দময়ীর সামনে যে কথা বললাম সে-কথা থাকবে না! ঠোঁট দুটি তাঁর কাঁপতে লাগল।

সবিস্ময়ে রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—কেন মা?

—কুতুবপুরের কাছারীর লোকেরা গোপাল সিংকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছে।

—কে বললে?

—কুতুবপুরের কাছারীর লোক খবর এনেছে।

—সে কি? আমি তো সকালেই লোক পাঠিয়েছি কুতুবপুর!

* * *

ব্যাপারটা লোক পৌঁছুবার আগেই ঘটে গেছে। আগে থেকেই কুতুবপুর কাছারীতে যে হুকুম ছিল সেই অনুযায়ী ঘটেছে।

সুরেশ্বর বললে—আগে তোমাকে বলেছি সুলতা, কীর্তিহাটের বিচক্ষণ দেওয়ান ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, বীরপুর মৌজার মণ্ডলান স্বত্ব ভগবান মণ্ডল ডাক নিয়েছে, এ সংবাদ যে মুহূর্তে গোপাল পাবে, সেই মুহূর্তে গোপাল খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত দুর্দান্ত ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ঝাঁপ দেবে। তাঁর হুকুম ছিল যে, বেলা এক প্রহরের পরই কুতুবপুর কাছারীর বরকন্দাজ ঢেঁড়াদার নিয়ে বীরপুরের পথে-পথে এই ঘোষণা জারী করবে। এবং গোপাল সিংয়ের কানে কোন রকমে পৌঁছে দিয়ে পালাবে। যদি পালাতে না-পারে, যদি গোপালের হাতে জখম হতে হয় তবে রায় এস্টেট থেকে খেসারত পাবে, মোটা টাকা। সে আমলে একশো টাকার দাম অনেক, এ আমলের হাজার টাকা থেকেও বেশী। আরও আন্দাজ ছিল এই যে, গোপাল তালাবদ্ধ ভগবানের বাড়ীতে আগুন দেবে। কিম্বা দল জুটিয়ে এসে লুট করবে। হুকুম ছিল, সঙ্গে সঙ্গে থানায় এত্তেলা দেবে। থানায় বন্দোবস্ত করা ছিল। থানার দারোগা, জমাদার, মুন্সীবাবুদের সঙ্গে গোপালের দহরম-মহরমের কথা অজানা ছিল না কারুর; দেওয়ান তারও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একদিকে এস-ডি-ও, ডি-এস-পিকে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন কীর্তিহাটে, তার সঙ্গে ইন্সপেক্টারবাবুও বাদ যান নি। ওদিকে দারোগা,

জমাদার, মুহুরীবাবুদের খুশী করবার ভার দিয়েছিলেন কুতুবপুরের নায়েবকে। সে তা করেছিল। ঘটল সবই, কিন্তু গোপাল সিং যা করলে, তা সকলের অনুমানকে অতিক্রম করে গেল। দেওয়ান আচার্য যে-মুহূর্তে খবর পেলেন যে, গোপাল বড় ছেলে এবং বড় স্ত্রীকে জখম করে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে ছুটে পালিয়েছে, ফেরার হয়েছে, সেই মুহূর্তেই সওয়ার পাঠিয়েছিলেন কুতুবপুরের নায়েবের কাছে যে, কাছারীর সমস্ত লোকজন নিয়ে খোঁজ করে গোপাল সিংকে ধর, পুলিশের হাতে দাও। যারা ধরবে, তারা একশো টাকা বকশিশ পাবে। অবশ্য সকলে মিলে।

খবরটা কুতুবপুর গিয়ে পৌঁছেছিল সন্ধ্যার পর। ওদিকে কুতুবপুর, বীরপুর, এবং আশপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামে এই ঘটনাটা নিয়ে আলোচনার শেষ ছিল না। আজকের এই ঘটনাটিতে সকল লোকের মনই বিরূপ হয়ে উঠেছিল এই দুর্দান্ত লোকটির উপর। তার সঙ্গে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মজলিসে খবর আসছিল, গোপাল সিংকে দেখা গেছে কোন জঙ্গলে অথবা কেউ যেতে দেখেছে জনহীন মাঠের মধ্য দিয়ে। অথবা গোপাল সিংয়ের কোন অনুচরের বাড়ীতে। কেউ বলে ওই গ্রামে, কেউ বলে সে গ্রামে। থানার দারোগা তখন গোপালের বাড়ীতে পৌঁছে এজাহার নিচ্ছেন। তার ছোট বউ গরুর গাড়ী চড়ে রওনা হয়েছে কীর্তিহাট সতীরাণী মায়ের উদ্দেশে। ওদিকে কুতুবপুরের কাছারী থেকে বরকন্দাজ পাইকের দল একশো টাকা বকশিশের উত্তেজনায় সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়েছিল গোপাল সিংয়ের সন্ধানে। হাতে মশাল, লাঠি, সড়কি। তবে হুকুম ছিল, জীবিত গোপাল সিংকে ধরতে হবে। গোপাল ফাঁসিকাঠে ঝুলে তার জীবনের মাশুল দিয়ে যাবে এই ছিল সর্ববাদীসম্মত রায়।

শুধু জমিদারের রায় নয়, মানুষের রায়ও ছিল তাই। সরকারের রায়ও তাই।

হিটলার নিজে আত্মহত্যা করেছে, তাতে বিজয়ী পক্ষ তৃপ্ত হয় নি। বিচার করে তাকে তারা মৃত্যুদণ্ডই দিত। কিন্তু বিচার হয় নি বলে ক্ষোভ থেকে গেছে। তোজো আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি। তাকে বাঁচাবার জন্য বোধহয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সার্জনরা ছুটে এসেছিল এবং তাকে বাঁচিয়েছিল। বাঁচিয়েছিল তাকে বিচার করে ফাঁসি দেবার জন্যে।

* * *

হতভাগ্য গোপাল সিং নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল একবার। কিন্তু তার ভাগ্যে তা সফল হয় নি। তার মস্ত বড় ভুল হয়েছিল! নেশায় কালীসাধক গোপাল সিং ছুটে পালাবার সময় মায়ের নেশা বাবার নেশার একটাও সঙ্গে নেয় নি। যে নেশাটা করেছিল এই দুর্ঘটনার আগে, সেটা ছেড়ে গিয়েছিল বিকেল হতে-না-হতে। নেশা যখন ছুটল তখন দুরন্ত ফাঁসির ভয় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে-ভয়কে সে চিরদিন ব্যঙ্গ করে ফাঁকি দিয়ে এসেছে, সেই ভয় সেদিন যেন তাকে পিছন থেকে আচমকা জাপটে ধরে হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিল এইবার!

সুরেশ্বর বললে—দুর্দান্ত গোপাল সিং শুনেছি, ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠ ভেঙে ছুটেছিল। বেলা দুপুর; চৈত্র মাস তখন। দু-চারজন লোকে তাকে দেখেছিল। এবং বিস্ময়ের তাদের সীমা ছিল না।

সিংজী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে! কেন? কি হল?

গোপালের গ্রাম তখন অনেকটা পিছনে। প্রায় ক্রোশ-দুয়েক। যেসব লোক দেখেছিল, তার ঘটনার কথা তখনও জানতে পারেনি। এমনকি দু ক্রোশ দূর থেকে বীরপুরের খড়ের চালের আগুনের ধোঁয়া বা গ্রামের লোকের চীৎকারও শুনতে পায়নি।

তারা সভয়ে সরেই গিয়েছিল। গোপাল সিং ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তার সামনে পড়া মানে ছুটন্ত পাগল মহিষের সামনে পড়া। সামনে পড়লে সে বারকয়েক ক্ষুরের আঘাতে মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাথা নিচু করে শিং সোজা করে তাকে বিঁধে গেঁথে নেবে—তারপর ফেলে দেবে ছুঁড়ে। এবং বারবার গুঁতিয়ে তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে চলে যাবে।

একজন তার সামনে পড়েছিল। সে তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু গোপাল তাকে আঘাত করেনি, তাকে হুঙ্কার ছেড়ে শাসন করেনি, সেও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর পাশ কাটিয়ে আবার সামনে ছুটেছিল।

সে পালাচ্ছিল।

রায়বাহাদুরের ডায়রীতে আছে, গোপাল তাঁর কাছে বলেছিল—ধরা পড়বার ভয়ে সে পালাচ্ছিল।

কিন্তু না। আমি ডায়রী পড়ে তার ছবিটা মনে মনে কল্পনা করেছি। ধুলায় ধূসর তার সর্বাঙ্গ। চোখদুটো বিস্ফারিত। আতঙ্কিত দৃষ্টি তাতে। হাতে আত্মরক্ষার উপযুক্ত একটা লাঠিও নেই। সব ফেলে দিয়েই সে পালিয়েছিল গ্রাম থেকে। সে পালাচ্ছিল নিজের কাছ থেকে।

সংসারে মানুষের মধ্যে যে চরমতম দুর্ধর্ষ, হার্ডেনড ক্রিমিন্যাল, সে পশুই হয়ে যায়। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকে শুধু একটি জায়গায়। সে হল তার মমতার মধ্যে।

সেই মমতার ঘর রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে ধ্বসিয়ে উপরের ছাউনি আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিয়ে সে যখন পালাচ্ছিল, তখন তার পশুত্বের হিংসা ওই ঘরভাঙা মানুষটার কাছেই ভয় পেয়ে পালাচ্ছিল।

গোপাল রায়বাহাদুরকে বলেছিল —হুজুর, পানির জন্মে ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, ভুখে পেটে যেন আগুন জ্বলছিল, কিন্তু ডরকে মারে—কোন গাঁওয়ে ঢুকি নাই—ঢুকতে পারি নাই।

লোকালয়ে সে ঢুকতে পারেনি। কার কাছে যাবে? কি করে বলবে—আমার ছেলেকে আমি খুন করে ফেলেছি, আমাকে বাঁচাও, একটু লুকিয়ে থাকবার জায়গা দাও! খুন সে নতুন করেনি। কিন্তু এমন দুর্বল, এমন অসহায় সে কোনদিন হয়নি। সে লোকালয়কে দূরে রেখে এসে ঢুকেছিল তিন ক্রোশ দূরের একটা জঙ্গলে। তখন রাত্রি নেমেছে। রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করে একটা বড় বটগাছে উঠে মোটা ডালের খাঁজে লুকিয়ে বসেছিল। ঘুম তার হয়নি, কাঁদতেও সে পারেনি, সন্ধ্যেবেলা থেকে একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আশপাশের গ্রামগুলো থেকে কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠেছে, গ্রামের হরিনাম-সংকীর্তন শুনে চমকে উঠেছে। গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁক শুনে শুধু চমকেই ওঠেনি, তার যে-বুক কখনও কাঁপেনি, সে-বুকখানাও ধড়ফড় করে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা

এসেছে, সে বসে বসে ঢুলেছে এবং দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে উঠেছে। রাত্রিশেষে ভোরের পাখীর ডাক শুনে জেগে উঠে সব অবসাদ কাটিয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমেছিল। কিন্তু যাবে কোথায় ?

গোপাল নিজেই পরে বর্ণনা করেছিল সেদিনের কথা। রত্নেশ্বর রায়ের কাছেই করেছিল।

বলেছিল—বাবুজী, ভোরবেলা পাখিগুলো ঘন ঘন একসঙ্গে কলকল করে ডাকে। সে-ডাক যেন মুসাফিরখানায় ভোরবেলা—উঠো উঠো উঠো চলো চলো ডাকের মত। আমার মনে হয়েছিল বাবুজী, যেন তামাম দুনিয়ায় 'ধরো ধরো পাকড়ো পাকড়ো' আওয়াজ উঠে গিয়েছে। আধা-ঘড়ি একঘড়ির মধ্যে দুনিয়া আলো হয়ে যাবে, লোকজন জেগে উঠবে। গরুর রাখালেরা গরু নিয়ে মাঠে আসবে, এই জঙ্গলের ধারে ধারে গরু চরাবে ; কাঠুরেরা কাঠ কাঠতে আসবে, মেয়েলোক শুকনো ডাল ভাঙতে পাতা কুড়োতে আসবে। আমি যাব কোথায় ? হাতে আমার কিছু ছিল না বাবুজী। হাতের লোহার বোলোওয়ালা ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়েছি ; স্রিফ দু হাত ছাড়া আমার কিছু নেই কাছে ; আমাকে ধরতে এলে আমি করব কি ? লড়ব কি দিয়ে ?

মনে হল—মরে যাই। নিজে থেকে মরে যাই। মাথার মুরেঠা খুলে পড়ে গিয়েছে, আছে এক পরনের কাপড়, সেই কাপড় গাছের ডালে বেঁধে ফাঁস বানিয়ে ঝুলে পড়ি। কিন্তু তাও পারিনি হুজুর! নিজেই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমার নিজের ভয় দেখে। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হ'লে পারতাম। তখন মনে মনে হচ্ছিল—এই জঙ্গল ধরে কোনরকমে পালিয়ে যাব, যাব একেবারে গঙ্গার ওপারে ; সুন্দরবনের কোন গাঁওয়ে গিয়ে একদম ভোল পাল্টে কুঁড়ে বেঁধে থাকব। খাটব খাব। কিন্তু এ দিনের বেলা এ জঙ্গল থেকে বেরুনো হবে না।

গোপাল সিংকে এ-অঞ্চলে না চেনে এমন আদমী নেই। দেখলেই চিনবে আর চিনলেই লোকে হৈ-হৈ করবে। এত রোজ ধরে গোপাল যে জুলুম-জবরদস্তি করেছে, তার আক্রোশ আজ গর্ত খুঁড়ে বেরকরা সাপের মত বেরিয়ে পড়েছে। ফণা তুলে দুলছে।

মনে পড়ে গিয়েছিল—জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা মন্দির আছে। বটগাছ উঠে মন্দির-টাকে ফাটিয়ে দিয়েছে, তবুও গাছের শিকড়েই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

* * *

ওদিকে জঙ্গলের বাইরে তখন শোরগোল উঠেছে। সন্ধ্যের মুখে সে যখন এই জঙ্গলে ঢোকে তখন দূর থেকে কেউ দেখেছিল। তখনও এতবড় খবরটা তার কাছে পৌছায় নি। খবরটা এসেছিল রাত্রে। তারপর প্রহরখানেক রাত্রে কুতুবপুর কাছারীর পাইকবরকন্দাজ এবং তাদের সঙ্গে গোপালের উপর যাদের আক্রোশ তাদের একটা দল গ্রামে এসে পৌছেছিল।

লোকটি বলেছিল—গোপাল সিং সন্ধ্যের মুখে ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে আমি দেখেছি। কিন্তু খবরটা তো শুনি নাই। ভাবলাম গোপাল সিং তো, তার তো হাজার কাজ, সেই কোন কাজে এই ভরসন্ধ্যেতে জঙ্গলে ঢুকছে। ব্যস্ত-সমস্ত দেখে হেঁকে বলতেও সাহস হয়নি—"সিং মশায়, এই সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলে কোথা যাবেন ?"

তার কথা শুনে গোটা দলটি গাঁয়ের ভিতর অপেক্ষা ক'রে শেষরাত্রে রওনা হয়ে এসে এই সকালেই জঙ্গলের মুখে হাজির হয়েছে। শোরগোল উঠছিল তাদেরই।

গোপালের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবার উপায় ছিল না। গাছে উঠে ব'সে থাকতেও ভরসা পায় নি। গাছে উঠলে অসহায়। তীর মারবে বাঁটুল মারবে। সে যথাসম্ভব দ্রুতপদে এসে হাজির হয়েছিল ভাঙা মন্দিরটার সামনে। বটগাছের ডালপালায় ঢাকা মন্দিরটা পেয়ে সে যেন বেঁচে গিয়েছিল, এক কোণে সে লুকোবে। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা সাপের খোলস দরজার মাথার একটা ফাটল থেকে লম্বা হয়ে ঝুলে রয়েছে। কিন্তু সে লহমার জন্যে। গোপাল সাপকে ভয় করে না; গোপাল শুধু লাঠীবাজ দাঙ্গাবাজ খুনখারাবিবাজ নয়, সে আরও অনেক কিছু পারে—সাপ ধরতে পারে, সাপের ওঝা, ভূত প্রেত পিশাচ তাড়াতে পারে; তার হাতে তাবিজ আছে, জড়িবুটি আছে, ওসবের ভয় তার নেই। ভয় তার মানুষকে।

সে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজার পাশের একটা কোনায় উপু হয়ে চুপ করে বসেছিল। লোকজন এলেও দরজার মুখ থেকে সামনের কোণ দুটো খালি দেখে ফিরে যাবে।

কিন্তু—; গোপাল বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে (পরবর্তীকালে), কিন্তু মানুষের পাপ যব পুরা হয়ে যায় বাবুজী তখন ভগবান নারাজ হন, তিনি নারাজ হলে পার কারুর নেই। গোপালের পাপ সে-রোজ পুরা হয়েছিল, ভগবান নারাজ। কোণে বসে থাকতে থাকতে গোপাল চমকে উঠেছিল একটা গোঙানি শুনে। সাপের গোঙানি। বাপ, সে কি গোঙানি!

যেন কাল গর্জাচ্ছে। সতর্কদৃষ্টিতে আওয়াজের জায়গাটা আন্দাজ করে তাকিয়েছিল দরজার মাথার দিকে। হাঁ। ঠিক দরজার খিলানের মাথায় বটের শিকড়ে ফাটানো একটা ফাটল থেকে একটা বড় ব্যাঙের মুখের মত মুখ আর তার দুটো পলকহীন কালো চকচকে চোখ দেখতে পেয়েছিল সে। তার মুখ থেকে চেরা জিভের দুটো কাঁটা লকলক্ ক'রে খেলছিল আগুনের শিখার মত।

সাপকে ভয় করে না গোপাল, কিন্তু বে-কায়দায় পড়েছে সে। সাপটাই আছে কায়দার জায়গায়। মাথার উপর! মাটির উপর সামনা-সামনি লড়া যায়। কিন্তু মাথার উপর দুষমন থাকলে তাকে লড়াই কি ক'রে দেবে।

গোপালের মনে পড়েছিল সে ঠিক এই কায়দায় ছিরুদাসের ঘাড়ের উপর গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে এককোপে ঘায়েল করেছিল!

এক উপায়, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পালানো। সাপটা অনেক উঁচুতে। ছোবল দিতে পারবে না। তাই করবার জন্য সে তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে সাপটা নামতে শুরু ক'রেছে। গোপাল পিছিয়ে এসে বসে তৈরী হয়েছিল সাপটাকে ধরবার জন্য। মাটিতে পড়ে ছোবল দেবার জন্য ঘাড় তুললেই তার ডানহাতও পাশ থেকে ছোঁ দেবে। চেপে ধরবে তার গলা। চোয়ালের নিচে। লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হবে না। সে বিশ্বাস তার ছিল। লক্ষ্য করছিল সে সাপটাকে, সরসর করে পলেস্তারা ওঠা দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে। বিরাট

গোখরো ! আয় বাপ ! দুহাত এক করলেও এতবড় ফণা হয় না !

ওদিকে তখন মন্দিরের সামনে লোক। তারা গোপালকে দেখে হৈহৈ করে এগিয়ে এসেও থমকে গিয়েছিল—আয় বাপ !

সাপটা ফণা তুলেছে, তুলেছে গোপালের দিকে নয়, পিছনে দরজার কাছে মানুষের সাড়া পেয়ে ওদিকে ফণা তুলে গর্জন করে দাঁড়িয়েছে।

গোপাল এ সুযোগ ছাড়েনি। খপ করে সে ডান হাত দিয়ে ছোঁ মেরে সাপটার চোয়ালের নিচে সজোর মুঠিতে চেপে ধ'রে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল লেজটা, যেন সেটা তার হাত জড়িয়ে ধরতে না পারে। এতটুকু ভুল তার হয় নি। নিখুঁত পরিকল্পনায় সাপটাকে ধ'রেছিল। তারপর পা দিয়ে চাপা লেজটা বাঁ হাতে ধ'রে সে বেরিয়ে এসেছিল মন্দির থেকে।

তার তখনকার সে মূর্তি দেখে এতগুলো বরকন্দাজ-পাইক গ্রামের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারা ভয় পেয়ে স'রে এসেছিল। দাঁতে দাঁতে সজোরে চেপে নিষ্ঠুর মুঠিতে সে সাপটাকে ধরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল মন্দিরটার ভাঙা দাওয়ার উপর। তার হাতের পেশী-গুলো ফুলে উঠে দেখাচ্ছিল পাথরের টুকরোর মত।

সাপ বড় পিছল জীব। গোপাল সিংয়ের মুঠো থেকে মুখটা সঙ্কুচিত করে যত সে পিছলে বেরুবার চেষ্টা করছিল তত শক্ত হচ্ছিল গোপালের মুঠো এবং সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল।

চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরুতে চাচ্ছিল যেন। লোকে অবাক হয়ে দেখছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ গোপালই বলেছিল—কেউ হাতিয়ার দিয়ে কেটে দাও দুষমনের মাঝবরাবর। তারপর হামি ছুঁড়ে ফেলব। এমনি ফেলব তো সয়তান ফের শির উঠাকে তাড়া লাগাবে।

বরকন্দাজ রামপূজন চৌবে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের তলোয়ার দিয়ে সাপটাকে দু টুকরো করে দিতেই গোপাল বাঁ হাতের লেজের অংশটা পায়ের কাছে সেখানে ফেলে দিয়ে ডান হাতে ধরা মুখের অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দূরে।

তারপর বলেছিল—লে পাকড়ো। বলে সে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল সেই দাওয়ার উপর !

এ অংশটা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—রামপূজন চৌবে। তারপর তারা গোপালকে ধরে এনেছে কুতুবপুরের কাছারীতে। ঘোড়া হাঁকিয়ে রামপূজনই এসেছে কীর্তিহাট।

গোপাল সিং ধরা পড়েছে। পাকড়েছে বাঁচতে গেলে সেই।

ভবানী দেবী স্বামীর কাছে বসে ছিলেন। তিনি ছুটে এসেছেন ছেলের কাছে, ওরে, মায়ের সামনে আমি কথা দিয়েছি। সে কথা আমার থাকবে না ?

রত্নেশ্বর বললেন—সে কি ? তাই হয় ? তোমার কথা থাকবে না ? এখনি লোক পাঠাব। বাবা কি বললেন।

—তিনি তোকেই ডাকছেন।

বীরেশ্বর রায় হুকুম দিয়েছিলেন—গোপালকে যেন পুলিশে দেওয়া না হয়। বা তার কোন অনিষ্ট না করা হয়। কাছারীতেই তাকে আটক রাখ। ঘোড়সওয়ার গিয়েছিল হুকুম নিয়ে।

কিন্তু তার আগে একজন পাইক চলে গিয়েছিল রণপায় চড়ে। পাঠিয়েছিলেন আচার্য দেওয়ান।

তিনি বুঝেছিলেন মামলায় আর গোপালের কিছু হবে না। তিনি হুকুম পাঠিয়েছিলেন সেখানকার নায়েবকে—"যে কোন অজুহাতে পার গোপালকে যেন শেষ করিয়া দেওয়া হয়। সদর হইতে যে হুকুমই যাউক না কেন, তুমি এ কার্য অবশ্য অবশ্য সমাধা করিবে। আমি শপথ করিয়াছি গোপালকে শেষ করিতে না পারিলে আমি ব্রাহ্মণ হইতে খারিজ। তুমি আমার জাতি রক্ষা করিবে।"

সুরেশ্বর বললে—বৃটিশ আমলাতন্ত্রের কথা অনেক শুনেছ সুলতা কিন্তু জমিদারী সেরেস্তার আমলাতন্ত্রের কথা জান না। বাংলাদেশে জমিদারদের অপকর্মের বারো আনার দায় এই আমলাদের।

একটা কথা প্রচলিত আছে—'মাটি বাপের নয় মাটি দাপের। মাটি কেনা যায় টাকাতে কিন্তু মাটি দখল হয় লাঠিতে।'

এ কথার সৃষ্টিকর্তা কে তা কেউ জানে না। তবে এই কথাটা জমিদারদের শিখিয়েছে এই আমলারা।

দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যের মুখে এ কথা দিনে অন্তত দশবার উচ্চারিত হ'ত। সুকৌশলে তাঁরা জমিদার আর প্রজাকে দুপাশে সরিয়ে রেখে এই লাঠিখেলার আসর পেতে রাখতেন। তবে একটা কথা বলব—তাঁরা কাজ ক'রে গেছেন নিজের ভেবে। দেওয়ান আচার্য রায় এস্টেটকে ছোট থেকে বড় ক'রে তুলেছিলেন—

কথায় বাধা পড়ল—

—অতীত কথায় ছেদ টেনে দিলে রঘু।

রঘু চাকর এসে দাঁড়াল।—খাবার তৈয়ার হল। দিদিমণি পুছলেন কি খাবার দিবেন? ও ঘরে ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা শব্দ হল। সুলতা নিজের হাতঘড়িটা দেখে বললে—সাড়ে দশটা!

সুরেশ্বর বললে—আরও আধঘণ্টা পর। গোপাল সিংয়ের কথাটা শেষ করে নি, কি বল সুলতা?

সুলতা গোপাল সিংয়ের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, তাই শেষ কর!

সুরেশ্বর বললে—ছবিটা তোমার ভাল লাগছে!

—ছবি তোমার সবই ভাল সুরেশ্বর। আর ছবির টেকনিক কি স্ট্যাণ্ডার্ড বিচার তো আমি করছি না। আমি তোমার গল্প শুনে গল্পের মানুষটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি। তার সঙ্গে ভাবছি রায়বাড়ীর কথা, সেকালের কথা।

হেসে সুরেশ্বর বললে—সে-কাল এ-কালের কাছে বিচিত্রই বটে। সব কালই তাই।

—আমি ভাবছি কি জান? গোপাল সিং আত্মহত্যা করতে পারলে না?

—সে আমিও ভেবেছি। কিন্তু পারে নি। আত্মহত্যার একটা ক্ষণ থাকে, সে ক্ষণটা পেরিয়ে গেলে আর পারে না। এটা সব কালের কথা। সে ক্ষণটা কখন পার হয়ে গিয়েছিল

তা বলতে পারব না। তবে গোপাল একটা কথা বলেছিল, বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে কিছুদিন পর। তখন সে রায়বাড়ীর পোষমানা মানুষ। বলেছিল—ছেলেকে মাথায় লোহার বোলো বসানো লাঠিটা মেরে স্ত্রীর বুকে চেপে ব'সে গলা টিপে ধ'রেছিল—লোকজনে তাকে ছাড়াতে এসে আক্রমণ করেছিল। সে কি হল তা বুঝতে পারে নি। মাথায় তখন আক্রোশের আগুন। সেই আগুনেই সে নিজের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল লোকেদের ভয়ে। লোকেরা যারা তার ভয়ে কাঁপত তারাই তাকে ধ'রে ওই আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। এমনটা কখনও ভাবতে পারে নি। তাই তাদের এই চেহারা দেখে হঠাৎ কেমন ভয় লেগে গেল। ওদিকে বড় পুত্রবধূ কেঁদে উঠল—মরে গেছে, মরে গেছে। 'একি হ'ল এ কি করলে' ব'লে। আমি সেই ভয়ে ছুটে পালালাম। তারপর সাপটা যখন ফণা তুলে দাঁড়াল মন্দিরের মধ্যে তখন যে কি ভয় হল বলতে পারব না; আমি তার কামড় খেয়ে মরতে পারতাম। কিন্তু ভয়ে পারলাম না। সেটাকে ধরে ফেললাম। মরতে পারলাম না! নিজে মরতে পারব না, ফাঁসি দিয়ে মারবে সরকার তাই মারুক। কিন্তু গোপাল মরল না। ভবানী দেবী তাকে বাঁচালেন। আচার্য দেওয়ান তাকে খুন করবার গোপন হুকুম পাঠিয়েছিলেন তাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

* * *

বীরেশ্বর রায় সন্ধ্যাবেলা খোদ রত্নেশ্বরকে পাঠালেন গোপালকে বাঁচাতে। রণপা চেপে একজন পাইক কুতুবপুর কাছারী গেছে, দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য তাকে পাঠিয়েছেন। খবরটা বীরেশ্বর রায়ের কানে চুপিচুপি তুলে দিয়ে গেল দেওয়ানের সহকারী সদর নায়েব বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী। বীরেশ্বর রায় তাকে বিদায় ক'রে দিয়েই ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—তুমি নিজে যাও রত্নেশ্বর। না-হলে তোমার মায়ের বাক্য রক্ষা হবে না। আচার্য যা ব্যবস্থা করেছেন তাতে কাল সকালেই তাঁর দেবতার সামনে দেওয়া বাক্য ব্যর্থ হবে। অপরাধ হবে, মাথা হেঁট হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই দেওয়ানের হাতে গিয়ে আমাদের বাঁধা পড়তে হবে। আমাদের কাছারীতে গোপালকে বেঁধে এনে রেখেছে। খুনের দায় আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমাদেরই দায়ে ফেলতে পারে। যে চাকর, মনিবের হুকুমের বিপক্ষে যায় তাকে বিশ্বাস নেই। তুমি নিজে চলে যাও। গোপালকে বাঁচাতেই হবে।

তারপর নিজের মনেই যেন বলে উঠেছিলেন—"আমার জাত রক্ষা কর।" মনিবের জাত যাক তাতে ক্ষতি নেই, চাকরের জাত বাঁচুক. জাত! চাকরের জাত!"

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতৃদেবের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। প্রচণ্ড ক্রোধ তাঁহার হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। এবং চিন্তান্বিত হইলাম। কারণ কবিরাজ ডাক্তার সকলেই তাঁহাকে ক্রোধ করিতে নিষেধ করিয়াছে। এমন ক্রোধ তাঁহার এই কয়মাসে আমি কখনও দেখি নাই। বাল্যকাল মনে পড়িতেছে। যখন তাঁহার সম্মুখে গেলেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন। বলিতেন—লইয়া যা, উহাকে এখান হইতে লইয়া যা। আজিকার ক্রোধ অন্যরূপ। প্রাণপণে ক্রোধকে চাপিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি অবিলম্বে প্রতিকারার্থ কুতুবপুর গমন করিব।"

—কুতুবপুরের নায়েব যদি গোপালকে দেওয়ানের পত্র পেয়ে শেষ করেই থাকে তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে তুমি পুলিশের হাতে—। না পুলিশের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ভবিষ্যতে প্রজাশাসনের জন্য বে-আইনী কিছু করতে হয় তা করতে ভয় পাবে কর্মচারীরা। তুমি তাকে বেঁধে এখানে পাঠাবে। কাল সকালে তুমি ফিরে আসবে। আমার উৎকণ্ঠার সীমা রইল না।

* * *

কুতুবপুরের নায়েব বিচক্ষণ লোক। দেওয়ান আচার্যের পত্র পড়ে তার খটকা লেগেছিল। "সদর হইতে যে হুকুমই আসুক না কেন, তুমি এ-কার্য অবশ্য অবশ্য করিবে।" কথাটায় সে থমকে গিয়েছিল; "সদর হইতে যে হুকুমই আসুক না কেন—?" তা' হ'লে সদর থেকে অন্যরকম হুকুম আসবে বা আসছে। আচার্যের হুকুমই আগে পৌছেছিল। দেশী বাগ্দী পাইক রণপা চড়ে গেছে। রণপা, তুমি নিশ্চয় বোঝ স্থূলতা; সে কালের 'রণপা' ভাল ঘোড়ার সমান যেত, এমন কি পাকা রণপা-দার হলে তার থেকেও জোরে যেতে পারতো। তা ছাড়া ঘোড়ার পথ সড়ক ধ'রে আর রণপা'র পথ মাঠে মাঠে নাকের সোজা। রণপার একমাত্র বিপদ কাদায় জলে। কিন্তু মাসটা তখন চৈত্রের শেষ, সুতরাং কাদা জলের বাধাবিঘ্ন তখন পাবার কথা নয়।

বীরেশ্বর রায়ের হুকুমবাহী সওয়ারও খুব দেরীতে পৌছয় নি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌছেছিল। হুকুমনামা পড়ে তিনি তখন ভাবছিলেন কি করবেন!

তখন গোটা বীরপুরের লোক ভেঙে এসেছে কাছারীতে। একদিনে একটি ঘটনায় বীরপুর বিজয় সম্পূর্ণ। গোপাল সিং বাঁধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কুতুবপুরের কাছারীতে এসে হাজির হয়েছে। আনুগত্য জানাতেই এসেছে। এমন কি যে সব দুর্ধর্ষ লোক গোপালের ডান হাত বাঁ হাত বা হাতের আঙুল ছিল তারাও এসেছে। শুধু কীর্তিহাটের জমিদারের ভয়েই নয়, গোপালের এই নিষ্ঠুরতম কৃতকর্মের আঘাত কেউ সহ্য করতে পারে নি, এই ঘটনার পর বিমুখ হয়েছে সবাই।

এরই মধ্যে রাত্রি একপ্রহরের সময় রত্নেশ্বর রায় সদলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কাছারীর সামনে।

* * *

প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়—গোপাল সিং কোথায়?

নায়েব বুঝতে পেরেছিল প্রশ্নের অর্থ। সে বলেছিল—আছে হুজুর। বেঁধে রেখে দিয়েছি। না-হলে তো তাকে আটকানো যায় না! হয়তো দরজা ভেঙে আবার হাঙ্গামা করে—

—ঠিক করেছেন! কি বলছে সে?

—কিছু না, মড়ার মত পড়ে আছে। বোবা হয়ে গিয়েছে। প্রথম কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করেছিল। কিন্তু তারপর চুপ হয়ে গিয়েছে।

—ওর বাড়ীর লোকেরা? তারা আসেনি?

—কে আসবে ? বড়ছেলে মরেছে ; বড় স্ত্রী এখনও পড়ে আছে। এমন ক'রে গলা টিপে ধরেছিল যে এখনও জল খেতে পারছে না। ছোটবউ আছে, তার বয়স অল্প, সে কাছারীতে আসে নি। বড়ছেলের দুই ছেলে, তাদের উঠতি বয়স, তারা বলে—পেলে ওর জান নেবে। কে আসবে!

—চলুন, আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আর একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করুন। এক্ষুনি। আমি রাত্রেই ফিরব। গোপালকে নিয়ে যাব কীর্তিহাট। কোথায় গোপাল ?

গোপাল কাছারীবাড়ীর কয়েদঘরে হাতে পায়ে বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। ঘরখানার তালাবদ্ধ দরজায় দুজন সমর্থ-শক্ত জোয়ান মোতায়েন ছিল। রত্নেশ্বর ঘরের দরজায় আসতেই তারা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

তালা খুলে রত্নেশ্বর ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তাকে ডেকেছিলেন—গোপাল সিং!

নায়েব বলেছিলেন—গোপাল সিং, ছোট হুজুর নিজে এসেছেন। গোপাল!

বিশালকায় গোপাল সিং হাতে পায়ে বাঁধা অবস্থায় মাটির উপর পড়েছিল, ধুলা মাখা সর্বাঙ্গ, পরনের কাপড়, গায়ের আংরাখা এখানে ওখানে ছেঁড়া ; মাথার বাবরী চুল, গালপাট্টা গোঁপ ধুলোয় জট বেঁধে গেছে। অসাড় নিস্পন্দ। মুখখানা আলোর দিকে ঘোরালে গোপাল সিং ; রত্নেশ্বর রায় দেখলেন, গোপালের মুখ আঘাতের চিহ্নে ক্ষতবিক্ষত। কপালে কয়েকটা ক্ষতচিহ্নের উপর কালোরঙের কিছু জমাট বেঁধে আছে। বুঝলেন, গোপাল নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত হয়েছে।

তিনি এগিয়ে গেলেন।

সুরেশ্বর বলতে বলতে থেমে গেল।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকালে। দেখলে সুরেশ্বরের চোখ চক্‌চক্ করছে। কোন একটা উত্তেজনায় সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

সুরেশ্বর তার দিকে থেকে মুখ সরি: নিয়ে একটু বেঁকে মাটির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন কিছু ভাবছে।

হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বললে—মাফ করো সুলতা, গোপাল সিংয়ের কথা বলছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ১৯৩৭ সালের সেই দিনের কথা। বিমলেশ্বর রায়কে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে। তারা দেখালে, ইংরেজের রাজসাক্ষীর উপর জুলুম করার ফল দেখো। এ যারা করবে, তাদের দশাও এই হবে।

কিন্তু তার সঙ্গে শিবুর বাবা গোপালের পৌত্র হরি সিং দফাদার যে কুৎসিৎ আস্ফালন ক'রে বেড়ালে, সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে রায়বাড়ীর ঊর্ধ্বতন প্রত্যেক জনকে গাল দিয়ে বেড়িয়েছিল পুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে।

কথাগুলো বলছিল সে বিমলেশ্বরকে।

—ডাকো—তোমার বাবা শিবেশ্বর রায়কে ডাকো। তার বাবা সেই সব-সে বড়া বদমাস, সেই তুমাদের বাঘে গরুতে একঘাটে জলখাওয়ানো—সেই রায়বাহাদুর রায়বাবুকে ডাকো। তার

বাবাকে ডাকো। রাখুক তোমাকে আজ। আঃ, আজ আমার বুকটা ঠাণ্ডা হল। হাঁ—আগুন মে জল পড়লো। আমার দাদো গোপাল সিংকে হাতে পায়ে বেঁধে কুতুবপুর কাছারীর কয়েদখানায় ধূলো আর গর্দার উপর ফেলে রেখেছিল। জমিদার! হাতে মাথা কাটে। যাও, আজ তুমি যাও, রায়বাহাদুরের বাহাদুর পোতা, বেটার বেটা তুমি যাও—হাজত ঘরে হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে থাকো গোপাল সিংয়ের মতন! হা—হা করে হেসে বলেছিল—আজ শোধ হইল। হাঁ কলেজা ঠাণ্ডা হইল। হাঁ—হাঁ বাবা, এখুন কি হয়েছে। তুমিদের ঘর পড়বে ইট খসবে নীলাম হবে। আমি কিনব। হাঁ আমি কিনব। আমার শিবুকে সরকার বিলাত পাঠাবে। ব্যালিস্টার হবে। বহুৎ টাকা রোজগার করবে—সে কিনবে। আর তুমাদের বহু বেটী আসবে, আর আমার দাদি যেমন করে রায়গিন্নীর পা ধ'রে কেঁদেছিল তেমনি করে কাঁদবে। ঘর থেকে তাড়াও না সিং সাহেব। ঘর থেকে তাড়াও না।

লোকে পুলিশের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল। সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ নেব। কিন্তু পারি নি। কথাটা মনে হলে আজও শরীরে জ্বালা ধরে আমার। চুপ করলে সুরেশ্বর। কিছুক্ষণ পর বললে—থাক—। জবানবন্দীতে এসব কথার ঠাঁই নেই। গোপাল সিংয়ের ওই অবস্থা দেখে কিন্তু তরুণ রত্নেশ্বর রায় বিচলিত হয়েছিলেন।

তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখেছেন—"প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায় উৎপাটিত বটবৃক্ষের মত ধুলিধুসর হইয়া পড়িয়াছিল। নায়েবের কথা শ্রবণ করিয়া সে সেই বন্ধন অবস্থার মধ্যেই মুখ ফিরাইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।"

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—গোপাল সিং!

হেসে গোপাল বলেছিল—আমাকে বেঁধে পুড়াইয়ে মারবেন, না, কালীমায়ের ঠাঁই কাটবেন?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না গোপাল। আমার যে-ভালোমায়ের অপমান করায় আমি তোমাকে চড় মেরেছিলাম সেই ভালোমা আমার তোমাকে ক্ষমা করেছেন, বলেছেন তোমাকে বাঁচাতে হবে। আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি।

রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপাল স্তম্ভিত হইয়া গেল! কোন বাক্য তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। আমি আবার বলিলাম—গোপাল! আমি মিথ্যা বলি নাই। আমি তোমাকে কীর্তিহাট লইয়া যাইব। অদ্য রাত্রেই অল্পক্ষণের মধ্যেই রওনা হইব। তোমার কনিষ্ঠা স্ত্রীও তোমার সঙ্গে যাইবে। ভালোমা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সে পরশু রাত্রেই কীর্তিহাট গিয়া ভালোমায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিল।"

এতক্ষণে গোপাল চীৎকার করে উঠেছিল—বাবুজী!

রত্নেশ্বর চমকে উঠেছিলেন। ক্রুদ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু আত্মসম্বরণ ক'রে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—গোপাল!

গোপাল আর কথা বলে নি, ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না—না—না।

—তুমি যাবে না?

—না রাবুজী, যাব। জরুর যাব। আমি বলছি—না, কুছু না!

—তুমি সারাদিন কিছু খাও নি। কিছু খাও।

—পানি পিয়েছি বাবুজী।

—পানিতে তেষ্টা যায়, ক্ষিদে যায় না গোপাল, কিছু খাও।

—কুছু খাব? বহুৎ খাইয়েছি ছোটা হুজুর, বহুৎ খাইয়েছি। জোয়ান বেটার মাথা ভেঙে কাঁচা কাঁচা খাইয়েছি।

একটু চুপ ক'রে ছিলেন রত্নেশ্বর রায়। তারপর বলেছিলেন—যা হ'য়ে গেছে তার উপায় নেই গোপাল সিং! তবু বাঁচতে হলে খেতে হয়—খাও কিছু। আমি তোমার ছোট স্ত্রীকে খবর পাঠাচ্ছি। সে আসবে। সেই তোমাকে খাওয়াবে।

গোপাল সিংয়ের কনিষ্ঠা পত্নী খবর পেয়ে এসে গোপালকে সত্যিই খাইয়েছিল। গোপাল কি খেয়েছিল জান সুলতা? সের খানেক দুধ। কিন্তু তার আগে সে রত্নেশ্বর রায়ের কাছে হুকুম নিয়েছিল, এক ছিলম গাঁজা খাওয়ার।

বলেছিল—নেশা না করলে কিছু মুখে রুচবে না ছোটা হুজুর! মদ খাব না। মদ খেলে খুন চাপে। গাঁজা! গাঁজা পিবার হুকুম না-দিলে খেতে পারব না!

* * *

কীর্তিহাটে পৌঁছে গ্রামে ঢুকবার আগে গোপাল সিং একবার চঞ্চল হয়েছিল। হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠেছিল—না—না—না। ছোটা রায় হুজুর!

ঘোড়ার উপর রত্নেশ্বর রায় তখন অনেকটা এগিয়ে কীর্তিহাটে ঢুকছেন। তখন ভোররাত্রি; মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উৎসব হয়েছে। সেরাত্রে রাজকীয় অতিথিদের উপস্থিতিতে বাঈ নাচ, খেমটা নাচ হয়েছে। উৎসব শেষ হবার পর লোকজন ঘুমিয়েছে। পরপর তিনরাত্রি জাগরণের ঘুম। গ্রাম স্তব্ধ।

রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"আমি কাঁসাইয়ের বাঁধের উপর ঘোড়ার রাশ টানিয়া দাঁড়াইলাম। গোপাল সিং-এর গাড়ী অনেক পিছনে পড়িয়াছে। তাহাকে ফেলিয়া আমি গ্রামে ঢুকিলাম না। কারণ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি করুণাময়ী মদীয় মাতাঠাকুরাণী গোপাল সিংয়ের নিরাপত্তার জন্য জাগিয়া আছেন। আমি একাকী গেলেও তিনি মানিবেন না। তদপেক্ষা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই ভাল।"

কাঁসাইয়ের ওপারে এসেই গোপাল চীৎকার শুরু করেছিল। সওয়ার এপার থেকে এসে খবর দিয়েছিল রত্নেশ্বর রায়কে। রত্নেশ্বর রায় অত্যন্ত তিক্তমনেই ফিরে ওপারে গিয়ে রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি? চীৎকার করছ কেন?

গোপাল বলেছিল—আমাকে কেটে এই নদীতে গেড়ে দিন রায়বাবু, আমাকে হাত-পা বেঁধে লিয়ে যাবেন না। মারিয়ে ফেলেন আমাকে। আমি গোপাল সিং—আমি—

এবার সে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল ছোটছেলের মত।

দীর্ঘঅবগুণ্ঠনবতী গোপালের স্ত্রীও হাত জোড় করেছিল রত্নেশ্বরের সামনে।

রত্নেশ্বর কয়েক মুহূর্ত ভেবে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই হুকুম দিয়েছিলেন।

ভোররাত্রিতে তাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন কীর্তিহাটের কাছারীবাড়ীর সামনে। সেদিনও

তখন মঙ্গলারতি হচ্ছে। ভবানী দেবী মন্দিরের দাওয়ায় মায়ের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। আরতি শেষ হতেই রত্নেশ্বর তাঁর সামনে এসে বলেছিলেন—গোপালকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি মা!

—এনেছিস! বলেই হাত জোড় করে দেবীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমার মুখ রেখেছিস মা। রায় সংসারের মুখ যেন এমনি করে চিরদিন রাখিস, মা!

* * *

সুরেশ্বর থামল এইখানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কটা টান দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—১৯৩৭ সালে সেদিন রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর ঠিক এইখানে এইভাবেই থেমেছিলাম সুলতা। মনে হয়েছিল পরলোক যদি থাকে তবে সেখানে ভবানী দেবীর আত্মা আজ কি বলছেন, কি করছেন?

একটা ছবি মনে রূপ নিয়েছিল এক-মুহূর্তে।

মনে মনে অনেক সময় এমন হয়। মনের প্রশ্নের উত্তর ঝট করে একটা ছবি হয়ে জেগে ওঠে।

ঠাকুরদাস পালের মৃত্যু বিবরণ পড়ে তোমার এমনি একটা ছবি ভেসে উঠেছিল মনে। প্রশ্ন জেগেছিল—একথা যখন জানবে সুলতা তখন সে কি করবে? কি বলবে?

যে ছবিটা জেগে উঠেছিল সেটা আজ মনে করতে পারি। তুমি যেন স্থির বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ আর দুটি জলের ধারা চোখের কোণে টলটল করছে। নেমে ঝ'রে পড়বে ব'লে।

তেমনি সেদিন ভবানী দেবীর যে ছবিটা মনে জেগেছিল, সেটা কতবার ভেবেছি আঁকি কিন্তু আঁকা হয় নি। ভবানী দেবী যেন দু'হাতে মুখ ঢেকেছেন লজ্জায় অনুশোচনায়।

আমার কানের কাছে গুঞ্জন করে উঠেছিল অর্চনার কথাগুলি। বিমলেশ্বর কাকার স্ত্রীর কাছে যে কথাগুলি ওবেলা শুনেছিলাম, সেই কথাগুলি। "রাজরাজেশ্বর কি রায়বাড়ীর পেয়াদা না মাকালী তাতারিণী প্রহরিণী যে দিনরাত তোমাদের হুকুম তামিল করবে?"

সেইদিন আমি কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর খাঁটি মালিক, জমিদারবংশের সন্তান, খাঁটি জমিদার হয়ে উঠলাম। স্থির করলাম, এর শোধ আমি নেবই নেব। গোপাল সিংয়ের পৌত্র দফাদার হরি সিং, তার ছেলে শিবু সিং। তাকে শাস্তি দিতে গিয়ে বিমলেশ্বর কাকা পারলেন না। উল্টে অপমানের বোঝা ভারী হল। এর শোধ আমি নেব।

বীরেশ্বর রায় তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে যে-ভুল করেছিলেন, সে ভুলের সংশোধন করব।

গোপাল সিং সেদিন ভোরবেলা কালী মন্দিরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে বলেছিল—মাইজী, আপনেকে আমি খারাব বাত বলেছি, আমার পুরা সাজা হইয়েছে। ছোটা হুজুরকে আমি পোড়ায়ে মারবার জোগাড় করেছিলম, তার ভি সাজা হামার মিলিয়েছে। দুনিয়া তিতা হয়ে গেলো মাইজী। পাপী, হমি বহুৎ পাপ করিয়েছি মা! হামার সাজা হইয়েছে। আমাকে মাফ্ করেন মা, আমাকে মাফ্ করেন আপনে!

ভবানী দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—কিন্তু তোমাকে তো শাপশাপান্ত আমি

করি নি বাবা!

—না মাইজী, আপনে দেবী, সাক্ষাত দেবী। সে আমি জানে। তব্ ভি বলেন—মাফ্ করলেন! বুক আমার পুড়িয়ে গেলো মাঈ। খাক হইয়ে গেলো!

ভবানী দেবী বলেছিলেন—মাফ তোমায় করেছি, তোমার স্ত্রীকে মায়ের সামনে কথা দিয়েছি। তবু তুমি যখন বলছ; তখন আবারও বলছি, এই মায়ের সামনে বলছি—মাফ তোমাকে করলাম।

—মাঈজী, আমার ইজ্জৎ—

—বেশ। সে কথাও দিচ্ছি গোপাল। বেইজ্জৎ তোমার হবে না। তবে কর্তাবাবু যা বলেছেন তা শুনেছ তুমি?

—হ্যাঁ মা।

—বেশ; বেইজ্জৎ তুমি হবে না। পুলিশের হাত থেকেও তুমি বাঁচবে। সে সব ব্যবস্থা আমি করেছি বাবা। তোমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি বলেই নয়, তোমার কৃতকর্মের এই ভয়ঙ্কর ফল দেখে আমি কেঁদেছি। তোমাদের ছোট হুজুরের বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে হচ্ছে এ জেলার সদরের ডেপুটি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে। আমি তাঁকে বলেছি—তিনিও আমাকে কথা দিয়েছেন। তুমি বেঁচেছ। তিনি বাঁচিয়েছেন।

গোপালকে তিনিই বাঁচিয়েছিলেন। বেইজ্জতি হয় নি, কটু কথাও বলেন নি বীরেশ্বর রায়। এতটার কারণ বোধহয় দেওয়ান আচার্যের ওই চিঠি। আচার্যকে অপদস্থ করবার জন্যই তিনি এতটা করেছিলেন। প্রথম ক'দিন বীরেশ্বর রায় গোপালের সঙ্গে দেখাও করেন নি। তাকে থাকতে দিয়েছিলেন, দু-মহলা প্রকাণ্ড অন্দরের এক প্রান্তে চাকরদের ঘরে।

রায়বাড়ীতে তখন রায়বংশের লোক মাত্র তিনজন। কর্তা-গৃহিণী এবং পুত্র। আত্মীয়-স্বজন যারা বারো মাস থাকত, তাদের সংখ্যা তখন দশজন। উৎসব উপলক্ষ্যে আর অনেক আত্মীয় এলেও মোটমাট চল্লিশের বেশী হয়নি। বাইরের লোকজনের সামনে যাতে গোপালের অপমান না-হয়, যাতে দেওয়ান আচার্যের হাত সহজে না পৌঁছায় তারই জন্যে স্থান দিয়েছিলেন বাড়ীর ভিতর।

রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে—"পিতৃদেবের দূরদর্শিতায়, আশ্চর্য বুদ্ধিতে আমি নিত্য চমৎকৃত হইতেছি। অন্দর মহলে গোপাল সিংহ ও তদীয় পত্নী পুত্রকে স্থান দেওয়া আমার মনোমত হয় নাই। তাঁহাকে একথা নিবেদন করিতেই তিনি বলিলেন—তুমি এখনও বালক রহিয়াছ। তুমি দেওয়ান আচার্যকে সম্যক চিনিতে পার নাই। দেওয়ান আচার্য না-পারেন এমন কর্ম নাই। অন্যত্র রাখিলে তিনি সহজেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবেন। আমি চমৎকৃত হইলাম। এ কথা আমার মনে হয় নাই। তিনি বলিলেন—রবিনসন সাহেবকে যে সুন্দর সুকৌশলে পর্তুগীজ স্ত্রীলোকের দ্বারা বশীভূত করিয়া এক পর্তুগীজ দ্বারাই শেষ করিল, তাহা স্মরণ কর। এখানে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করাইয়া দশ-বিশজন লোক দ্বারা তেমন কিছু করিলে কি করিবে!"

রাজকর্মচারীরা বিদায় নিয়েছিলেন পরের দিন। সদর এস-ডি-ও রত্নেশ্বর রায়ের ভাবী

শ্বশুর আরও একদিন ছিলেন। বিবাহ পাকাপাকি স্থির হয়ে গেলে তিনি গেলেন।

রাধারমণবাবুর সামনেই গোপালকে ডেকে তিনি তাকে বলেছিলেন—রায়বাড়ীর গিন্নীমা তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমার সে সব অপরাধের কথা আমি তুলব না। তোমার নিজের শাস্তি তুমি নিজে নিয়েছ, কিম্বা ভগবান দিয়েছেন, তার ওপর আমার হাত নেই। এখন শোন, যা বলছি। একথা তোমার স্ত্রীকে বলেছি। সে রাজী হয়েই মেনে নিয়েছে। বীরপুরের তোমার জোতজমার বেশীর ভাগ জবরদখল। সে সমস্ত তোমাকে ইস্তফা দিতে হবে। যা তোমার নিজস্ব, তা পাবে তোমার বড় ছেলের ছেলেরা আর তোমার বড় স্ত্রী। বীরপুরে তুমি বাস করতে পাবে না। তোমাকে বাস করতে হবে নতুনহাটে, কীর্তিহাটের পাশেই, নতুন গ্রাম পত্তন করেছি সেখানে। সেখানে তোমাকে দশ বিঘে জমি, একটা বাড়ী, একটা খিড়কীর ডোবা—এই তোমাকে দেব, পাইকান বন্দোবস্ত করে। রায়বাড়ীর কাছারীতে তোমাকে রোজ সকালে আসতে হবে। সেলাম দিয়ে যাবে। দূরে চোখের বাইরে তোমাকে যেতে দিতে পারব না। রায়বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে এ বাড়ীতে আসবে, মোতায়েন থাকবে. রাজী আছ?

গোপাল চুপ করেই থেকেছিল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে নি।

রাধারমণবাবু বলেছিলেন—নীচে আমার দারোগা হাজির আছে। রাজী থাকিস তো বল। না-থাকলে দারোগা নিজের কাজ করবে।

গোপাল রাধারমণবাবুর দিকে তাকিয়েছিল, সে তাঁকে চিনত না; তার কপালে ভ্রূকুটি জেগেছিল।

বীরেশ্বরবাবু বলেছিলেন—উনি মেদিনপুরের এস-ডি-ও।

গোপাল এবার মাথা হেঁট করে বলেছিল—জান যখন ভিখ মেঙেছি হুজুর, তখন বিলকুল মেনে লিয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—হ্যাঁ। আপনি আমাকে বাঁচাইলেন। বীরপুর ঢুকবার মুখ আমার নাই। আর আপনের তাঁবেদারী ছাড়া দুসরা কোন কাম—সেও ভি আমি পারবে না। বিলকুল মেনে নিলম!

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ। আমার তাঁবেদারী ছাড়া তুমি কোথাও গিয়ে বাঁচবে না। দেওয়ানজীর হাত থেকে—।

বলেই তিনি থেমে গিয়েছিলেন। চাকরকে ডেকে বলেছিলেন—দেখ ছোট নায়েব কাগজ-পত্র নিয়ে ওপাশে বসে আছে। ডাক তাকে।

নায়েব এলে বলেছিলেন—কাগজপত্রে টিপ ছাপ নিয়ে নিন।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, গোপাল সিংকে রক্ষা করতে গিয়ে, হারাতে হল দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্যকে।

আচার্য দেওয়ান পরের দিনই এসে বলেছিলেন—আমার বয়স হল বাবা; এদিকে তোমাদের সংসারেও আর ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নাই। ছোটবাবু ভায়া এরই মধ্যে বেশ বুঝে নিয়েছেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। এবার আমি ছুটি চাচ্ছিলাম।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—রত্নেশ্বরের বিয়ে বৈশাখে। এই সময় কি আপনার যাওয়া চলে ?

গিরীন্দ্র আচার্য বলেছিলেন—বেশ ; তারপর যেন আমাকে আর বেঁধে রেখো না বাবা। শরীর বড় ভেঙেছে আমার।

বীরেশ্বর অবলীলাক্রমে বলেছিলেন—না। ১লা জ্যৈষ্ঠ অষ্টম। ২রা জ্যৈষ্ঠ আপনি খালাস। আপনাকে আটকানো উচিতও হবে না। কারণ রত্নেশ্বর আপনাকে নিয়ে ঠিক চলতে পারবে না। আমার সঙ্গেই ওর সব মত মেলে না। কাল রাধারমণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এই গোপালের কেস নিয়ে কথা। উনি বলেছিলেন—বীরেশ্বরবাবু এ পথে জমিদারী চালান আর চলবে না। ইংরেজ জাত বড় কঠিন জাত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাওয়ার। কিন্তু ওরা আইনকে বড় মানে। বিচারের সময় জজেরা ইংরেজ গভর্নমেণ্টেরও খাতির করে না। জমিদারীর ধারা পাল্টান মশাই! রত্নেশ্বর বললে—আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি, বেআইনি প্রজাশাসন—এ আমি কীর্তিহাট এস্টেট থেকে তুলে দোব। আপনার সঙ্গে ওর বনবে না! আমি ভাবছিলাম! আমিও আর হস্তক্ষেপ করব না, আপনাকেও বলব, দেওয়ান কাকা, এবার আমাদের সব ছেড়ে দিয়ে বসে-বসে দেখাই ভাল। তা আপনি নিজেই বলছেন।

সুরেশ্বর বললে—গোপাল সিংয়ের কথা এখানেই শেষ। গোপাল সিং এরপর বেঁচে ছিল কম দিন না, দশ বছর। ১৮৬৯ সালে রত্নেশ্বরের ডায়রীতে আছে—"আজ গোপাল সিং মারা গেল। এস্টেটের একজন হিতৈষী লোককে হারাইলাম। লোকটি অতীত কালে যাহাই করিয়া থাক, শেষ জীবনে সে সত্য-সত্যই সজ্জন ব্যক্তি হইয়াছিল ; মদ্যপান ছাড়িয়াছিল, বৈষ্ণব হইয়াছিল। কীর্তন শুনিতে-শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিত। অনুতাপ করিত। নেশার মধ্যে গঞ্জিকা সেবন করিত, কিন্তু তাহাতে তাহার ক্ষতি হয় নাই। অবগত হইলাম যে, সে মৃত্যুকালে হরি-হরি জপ করিতে-করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। আরও অবগত হইলাম যে, তাহার পুত্রকে রায়বাড়ীর আশ্রয়ে সদ্‌ভাবে অনুগত থাকিয়া জীবন নির্বাহ করিতে বলিয়াছে। বলিয়াছে—এ কাল বড় কঠিন কাল, সে কাল গিয়াছে। ছোট রায়হুজুর ধার্মিক লোক। বিদ্বান পণ্ডিত লোক। আইন বোঝেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে উন্নতি হইবে। সুখে থাকিবে। তাঁহাদের সহিত সর্ত মানিয়া চলিবে। উনি না থাকিলে আমি বাঁচিতাম না। ফাঁসিকাঠে ঝুলিতাম। গোবিন্দ আক্রোশে তোদেরও রাখিত না, শেষ করিয়া দিত। বাঁচিলে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইত। গোবিন্দ শেষ পর্যন্ত কালাপানিতে মরিয়াছে। ওপথে হাঁটিস না।"

গোবিন্দ সিং গোপালের বড় ছেলের বড় ছেলে। বড় নাতি। বাপের মৃত্যুর জন্যে তার সব আক্রোশ পড়েছিল গোপালের উপর। বীরেশ্বর রায় বিচার করে গোপালের ন্যায্য সম্পত্তিটুকু রেখে বাকী সবই—যা মণ্ডলান স্বত্বের মালিক হিসেবে দখল করেছিল,—সে-সব কেড়ে নিয়েছিলেন, এবং বীরপুরের সম্পত্তি গোপালকেও দেন নি, দিয়েছিলেন ওই গোবিন্দ সিংকে। বলতে গেলে, খেসারত হিসেবে তাকে দিয়েছিলেন। এতেই গোবিন্দ সিং রায়হুজুরের বিচারের সুনাম করে সব আক্রোশ ফেলেছিল তার পিতৃহন্তা পিতামহের উপর। সে নাকি শপথ করেছিল, ঠাকুরদার জান সে নেবেই। এবং এতে তাকে উৎসাহিত করেছিল তার

পিতামহী ; গোপালের বড় স্ত্রী। আরও একজন এতে তাকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। সে লোকটি হচ্ছে রায়বাড়ীর পুরনো দেওয়ান গিরীন্দ্র আচার্য।

গিরীন্দ্র আচার্যকে দেওয়ান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায় ; ওই ২রা জ্যৈষ্ঠই সরিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে নিজের মুঠি থেকে ছাড়েন নি। রায়বাড়ীতে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর দেওয়ানী কালের হিসেব-নিকেশ দাবী করে দায়ী করেছিলেন বিশ হাজার টাকার জন্য। টাকাটার হিসেব মেলে নি। শেষে তার কাছে দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে বলেছিলেন—এটা আমি লিখিয়ে নিলাম, কিন্তু এ আমি আদায় কখনও করব না। আপনি এস্টেটের অনেক খবর জানেন, আপনার কাছে তার নমুদও আছে। এটা আমি তার জন্য হাতে রাখলাম। আর আপনার চিঠি আছে, সেটাও দেখিয়ে রাখি, সেটা আপনি এই সেদিন কুতুবপুরের নায়েবকে লিখেছিলেন—"সদর হইতে যে হুকুমই যাউক না কেন, যে কোন অজুহাতে গোপালকে শেষ করিয়া দিবে। আমার জাতি রক্ষা করিবে।"

গিরীন্দ্র আচার্য হেসেছিলেন। বলেছিলেন—ও আমি জানি, বাবুজীভাই চিঠিখানা গোড়াতেই নায়েবের হাত থেকে নিয়েছেন, সে খবর আমি জানি। বেশ তাই হল।

আরও বলেছিলেন—দেখ বাবা, নোকরী, গোলামী লোকে করে পেটের জন্যে। তবে পেটের জন্যে কখনও মুনিবের ক্ষতি করি নি। মুনিব মেরে খেলে আজ কীর্তিহাটের অন্ততঃ অর্ধেকটাই পেটে পুরতে পারতাম। তা আমি করি নি। তোমাদের কি আয় ছিল, কি আয় হয়েছে, তা তুমি জান। সে আমিই করেছি। পাপপুণ্য বাছি নি। তার অনেক নজীর আছে। পাবে সেরেস্তা খুললে। তিরিশ বছরে তিরিশটা জান খতম করিয়েছি, হয়তো বেশীই হবে। যারা বিরোধিতা করেছে তাদেরই, হয় হাতে, নয় ভাতে, মেরে রাজ্য নিষ্কণ্টক করে দিয়েছি। বীরপুর নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিলাম তোমাদেরই জন্যেই। ভুল হয়েছিল, মাকালীর সামনে বলেছিলাম, গোপালকে খতম না করি তো আমি বামুন থেকে খারিজ। তবে, ভেবো না, তোমাদের দৌলতে অনেক করেছি আমি, আমি তোমাদের অনিষ্ট করব না। এই উপবীত ছুঁয়ে ইষ্ট দেবতার নামে হলপ নিয়ে বলছি।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—এ হ্যাণ্ডনোট আমি আপনার বউমা সতী বউয়ের কাছে রেখে দিচ্ছি, তাহলে হবে তো?

—বাস-বাস-বাস। এ আর কথা কি আছে।

—আর একটা কথা বলি।

—বল।

—একখানি মহল আপনাকে পত্তনী বা দরপত্তনী প্রণামী দিতে চাই। আর আপনি শেষ জীবনটা মেদিনীপুরে ল' দপ্তরের ভার নিয়ে বসুন। দেওয়ানীতে যা পেতেন তাই পাবেন। অপরের কাজকর্মও করতে পারবেন। আপনার প্রতিজ্ঞার আর একটা বাকী আছে, শ্যামনগর এখনও রায় এস্টেটে আসে নি।

হেসে আচার্য বলেছিলেন—সে এই আষাঢ় বা আশ্বিন কিস্তিতেই হয়ে যাবে বাবা, ভেবো না। তাছাড়া, দে-সরকাররা মহাল রাখতে পৌষ মাসে একটা হ্যাণ্ডনোট কেটেছে, চৈত্র মাসে

একটা হ্যাণ্ডনোট কেটেছে হুগলীর মহাজনের কাছে। সে হ্যাণ্ডনোট দুখানা আমি চোটা দিয়ে কিনবার কথাবার্তা পাকা করেছি। ওরা দুখানা হ্যাণ্ডনোটে আট হাজার নিয়েছে, সুদ মাসিক শতকরা একটাকা, আমি বলেছি, সুদসমেত আট হাজার আর ধরাট দু হাজার দিয়ে হ্যাণ্ডনোট আমি কিনব। তারা রাজী। কিনেই আষাঢ়ের আগে নালিশ ঠুকে দিলে আর সামলাতে পারবে না, টাকাও পাবে না। শ্যামনগর ঘরে ঢুকে যাবে। আমাকে খালাসই দাও। আমার আর খুব ইচ্ছে নেই!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা হয় না দেওয়ানকাকা। কারণ আমাকে অবসর নিতেই হবে। রত্নেশ্বরকে ভার দিয়েছি, তাকেই সব ছেড়ে দিতে চাই। ওর সঙ্গে আপনারই মতে শুধু বনবে না নয়, হয়তো আমার সঙ্গেও বনবে না। আমি হস্তক্ষেপ করতে গেলে ও অসন্তুষ্ট হবে। আমি কলকাতায় না-হয়, সতী বউ বলছে—কাশী চলে যাব। ওর মাথার উপর লোক চাই। ওর শ্বশুর অবশ্য এস-ডি-ও, সরকারের ঘরে মুরুব্বির জোর ভালই হয়েছে। কিন্তু কি জানেন, বিষয়বুদ্ধি এঁদের নাই। এঁরা শুধু সরকার চেনেন, খেতাব চেনেন, কিন্তু সম্পত্তি বাড়ানো, সম্পত্তি রক্ষা কি করে করতে হয়, তা জানেন না। রত্নেশ্বর এরই মধ্যে বলছে—নতুন কাল, নতুন কাল। সব ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

* * *

সুলতা তখনও গোপাল সিংয়ের সেই দুই হাতে সাপ ধরা ছবিখানা দেখছিল। ছবিখানা তার আশ্চর্য ভাল লেগেছে।

সুলতা দেখতে দেখতে বললে—দাঁড়াও সুরেশ্বর, গোপাল সিংয়ের ছবিখানা একটু দেখি। আশ্চর্য বোল্ডনেস রয়েছে ছবিখানার মধ্যে।

সুরেশ্বর বললে—ও ছবিখানা শুধু গোপাল সিংয়ের ছবি নয় সুলতা; ওখানার গোপাল বাংলার সেকালের দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তির প্রতীক। সে শক্তি স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু ওরই চাপে সাধারণ মানুষগুলো চাপ বেঁধে, জমাট বেঁধে একটা শক্তি ছিল। তারা গোপালকে বেঁধে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

সুলতা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, সেটুকু চমৎকার ফুটেছে!

সুরেশ্বর বললে—১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত গুনতিতে পঁয়ষট্টি বৎসর কাল সুলতা; পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট থেকে ১৮৫৯ সালে নতুন ভূমিস্বত্ব সংস্কার আইন। এর মধ্যে জমিদারদের প্রশ্রয় দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, এই দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তিকে ইংরেজ শেষ করলে। তারপর হল নতুন আইন। তার আগে সুলতা, ১৭৫৭ সাল থেকে ৮ বছর পর ১৭৬৫ সাল, পলাশীর যুদ্ধ থেকে মীরকাসেম নবাবের পালা শেষ করে, বাদশাহের কাছে দেওয়ানী নিলে। ৬৫ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল গুনতিতে ২৮ বছর, ধরতে পার তিরিশ-বত্রিশ-এর মধ্যে বাংলা দেশে নবাবী পালার পর জায়গীরদারী শেষ করে জমিদারী পালায় ফেলেছিল। রাজারা-মহারাজারা খেতাবটা রেখে জমিদারীই স্বীকার করে ইংরেজ রাজত্বের বনিয়াদ পোক্ত করেছিল। একদিকে করেছিল কোম্পানী সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টকে শক্ত, অন্যদিকে এদেশের দুর্ধর্ষ মানুষ,

যারা বর্গীর হাঙ্গামা পুইয়ে বেঁচেছে, গিরিয়া, পলাশী তারপর কাটোয়া-গিরিয়া-উধুয়ানালার বিপর্যয় মাথায় করে বেঁচেছে, বিশু ডাকাতের মত ডাকাত যারা নীলকুঠী লুঠ করে, নীল বাঁদরের অত্যাচার নিবারণ করতে চেয়েছে, যারা কুটিল মহাজনদের মেরেছে, যারা জমিদারদের সঙ্গে লড়েছে, তাদের শক্তি এমনিভাবে নাগপাশে বেঁধে জব্দ করতে বসল নতুন আইন।

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।"

কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্য এল ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে। সাম্রাজ্যবাদের ভোল বদল হল দুনিয়া জুড়ে; ক্ষাত্র সাম্রাজ্যবাদের বদলে বৈশ্য সাম্রাজ্যবাদ। ইয়োরোপের সব জাতের ধাতই তাই। ইংরেজ তখন বিশ্ববিজয়ী হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য বদ্ধ-পরিকর।

'বৃটিশ এম্পায়ার এস্টাব্‌লিশড বাই ল'।

সে রাজত্বে মানুষের এতশক্তি তার সহ্য হবে কেন। তাকে শেষ করে দিতেই হবে। ওই সব কথাই বলতে চেয়েছি ওর মধ্যে। ছবিখানা সত্যিই বোল্ড হয়েছে।

ছবিখানার দিকে নিজে কিছুক্ষণ দেখে, বললে—১৮৫৯ সালে নতুন আইন পাশ হল, গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল তাই দিয়ে জমিদারকেও বাঁধলে। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের কনট্রাক্ট সই করে জমিদার ভেবেছিল, রাজার সঙ্গে কনট্রাক্ট বলে আমরাও রাজা। প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কিন্তু ইংরেজ তা ঘুচিয়ে দিলে। এবার স্পষ্টাক্ষরে বলে দিলে—না, প্রজারা শুধু সরকারের প্রজা, তোমাদের সঙ্গে কনট্রাক্ট, তোমরা খাজনা আদায় করবে। তা থেকে সরকারের দেয় দিয়ে বাকীটা পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ করবে!

১৮৫৯ সাল থেকে বাংলার প্রজাশক্তির সঙ্গে গণশক্তি শ্রান্ত ঘুমন্ত; উঠল প্রথম ১৯২১ সালে। বিচিত্র কথা কি জান, গুনতে গিয়ে উত্তর পেয়েছি ৬২ বছর। আবার ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদ ৩২ বছর।

সুলতা হেসে বললে—হঠাৎ ছবির মারফৎ জবানবন্দী দিতে গিয়ে যে রিসার্চ তত্ত্ব এনে বসলে? ওটা গবেষকদের হাতে ছেড়ে দাও। ওরকম গবেষণা একবার ১৮৫৭ সালে হয়েছিল, সেটা ফলে নি। আবার প্রত্যাশা ছিল—১৯৫৭-তে। কিন্তু তার দশ বছর আগে ১৯৪৭-এ ইংরেজ দেশ ছেড়েছে, স্বাধীনতা এসেছে। এসব চেতাবুনীওলাদের পক্ষে ভাল। তোমার কোন কাজে লাগবে না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—দেখ, পথের ধারে খড়ি দিয়ে ছক এঁকে অদৃষ্ট গণনা কিম্বা রবিবারে সাপ্তাহিক রাশিফল লেখার বাসনা আমার নেই। সেজন্যে বলি নি। তবে কীর্তিহাটে বসে বসে ভাবতে ভাবতে এটা আমার চোখে পড়েছিল। তাই বললাম! এখন ফিরে যাচ্ছি ১৮৫৯ সালে।

গোপাল সিং এবং গোপাল সিংয়ের দৃষ্টান্তে মিউটিনির পর ইংরেজের শক্তির আতঙ্কে অন্য গোপালেরা দুরন্ত গোপাল থেকে সুবোধ গোপাল হয়ে গেল।

শুধু প্রজারাই নয়, ১৮৫৯ সালের আইনে, যে হাতে মিউটিনি দমন করেছিল ইংরেজ, নিঃশেষিত-শক্তি প্রজার মাথায় সেই হাতে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে, সেই হাতেরই তর্জনী উল্টে

জমিদারকেও শাসন করলে। জমিদারেরা পাল্টাল; পাল্টাতে বাধ্য হল।

তাদের কাছে ইংরেজ শুধু মিউটিনি দমনকারী শক্তিই নয়। ইংরেজ তার আগেই ক্রিমিয়ান ওয়ার জিতেছে। এদেশের লোকে মধ্যে মধ্যে কল্পনা করত, খাইবার পাস হয়ে রুশ পল্টন আসছে; কখনও কখনও ইণ্ডিয়ান ওসেনে রুশ রণতরীর গুজব উঠত। এ সবকিছুর স্বপ্নকে তাসের ঘরের মত সে ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং তাদেরও শঙ্কিত এবং সাবধান না হয়ে উপায় ছিল না।

তার সঙ্গে আর একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। কিসের থেকে বা কোন ঐতিহাসিক কারণে না কোন বিচিত্র অভিপ্রায়ে দেশের মধ্যে একটা নতুন স্রোত বইতে শুরু করল।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর এসেছেন, মাইকেল এসেছেন, বঙ্কিমের পদধ্বনি নিকটতর হয়েছে। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন এক ব্রাহ্মণ সন্তান। রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে পঞ্চবটীর তলায় রাত্রে বসে থাকেন, ঘুরে বেড়ান।

সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের মাতামহ শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় যে ধর্মসাধনার বিকৃতিতে শুধু নিজের জন্যে নরকের দ্বার উন্মুক্ত করেই যান নি, গোটা দৌহিত্র বংশের মধ্যে তাঁর বাসনার পাপ বীজ পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলেন, সে ধর্মসাধনার পথেই গদাধর চাটুজ্জে স্বর্গের দ্বারমুক্তির পথ খুলতে চলেছেন।

১৮৬০ দশকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

নবজাতকের কান্নার মধ্যে দেবেন ঠাকুরের বাড়ীতে এক নবজাতকের স্বর শোনা যাচ্ছে। ওদিকে মধ্য কলকাতার দত্তবাড়ীতে বাজছে আর এক নবজাতকের কণ্ঠস্বর।

রবীন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁদের সঙ্গে ও পিছনে আরও অনেক সুলতা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সুলতা বললে—সে নাম অনেক সুরেশ্বর! সেসব আমি জানি!

—জান না, একথা আমি কখনই বলিনে। আমি বলছি, এই যে স্রোত, এই যে ধারা, সেটা আর যাই হোক, সেটা ইংরেজের ভয়ে আসে নি। তবে যদি বল—ইংরেজ শাসন সেকালে দুষ্ট ছেলে শাসন করা কটন ইস্কুল, সেই ইস্কুলে পড়ে শাসনের ভয়ে দেশে ভাল স্রোত এসেছিল, তবে তাই না হয় হল। কিন্তু সেটা সেকালের উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে এসেছিল। সেটা রত্নেশ্বর রায়ের মধ্য দিয়ে রায়বংশে তিনি আনতে চেয়েছিলেন। শুধু কীর্তিহাটের রায়বংশেই নয়, অনেক জমিদারবংশেই এসেছিল।

তাই, বীরেশ্বর রায় যে দেওয়ান আচার্যকে বলেছিলেন—রত্নেশ্বর বলছে, সেরেস্তাকে সে ঢেলে সাজাবে। পুরনো আমল আর চলবে না, সেটা তিনি মিথ্যে বলে আচার্যকে সরাতে চান নি। সে সত্যকে তিনি রত্নেশ্বরের সঙ্গে অল্প কথাবার্তা বলেই বুঝছিলেন।

সেটা রত্নেশ্বর রায় করেছিলেন। অন্তত: করতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটি পেরেছিলেন, একথাও আমি বলব।

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আবার বলেছিল—পরবর্তীকালে দুটি হত্যা তিনি করিয়েছিলেন, তবুও তিনি আইন এবং ধর্মকে বড় করেই চলেছিলেন, একথা কেউ

অস্বীকার করতে পারবে না। অন্যে কেউ জানত না। অন্ততঃ সাধারণ লোকে কেউ এ ধরতে পারে নি, বুঝতে পারে নি। তাঁর ডায়রী পড়ে আমি বুঝেছি, জেনেছি—আমিও তা বলতে পারব না। তার আগে—।

তার আগে আমি গোপাল সিংয়ের জীবনটা শেষ করে নি। এমন একটি ঘরেলাগা আগুন বা বনে-লাগা আগুনের মত জীবন শেষ দশ বৎসর কেরোসিনের ডিবের নিরীহ আলোর মত জ্বলেছে। সেটা আর চোখে পড়বার মত নয়। আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি।

১৯৩১ সালের সেদিন, যেদিন বিমলেশ্বরকাকাকে ধরে নিয়ে গেল, সেই রাত্রে আমার মনে হয়েছিল, গোপাল নিশ্চয় এই ক্ষোভ তার ছেলেদের বুকের মধ্যে জ্বেলে দিয়ে গিয়ে থাকবে।

নিশ্চয় সে বলে গেছে তার ছেলেকে, ছত্রির ছেলে আমি। আমার শিবটা মাটিতে ঠেকল তো মরণ আমার হইয়ে গেল। বাপের এই মরণের শোধ লিবি।

অবশ্য সে কথার উল্লেখ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে থাকবার কথা নয়। তবে একথা তার মনের মধ্যে থাকলে, নিশ্চয় কখনও না কখনও কোন ঘটনায়, কোন কথায়, কোন আচরণে প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

এরই জন্যে সুলতা, সেদিন অর্থাৎ ১৯৩১ সালে সেদিন রাত্রে আমি রত্নেশ্বর রায়ের দিনলিপিগুলো পাতার পর পাতা উল্টে গিয়েছিলাম, শুধু খুঁজে গিয়েছিলাম একটি নাম। গোপাল সিং। ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত। প্রথম প্রথম প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গোপালের নাম পেয়েছি।

"গোপাল ঠিক কথা মত আসিয়াছিল এবং হেঁট হইয়া সর্বসমক্ষে নমস্কার করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—ভাল আছ? সে বলিল—হ্যাঁ হুজুরের মেহেরবাণীতে ঠিক আছি।

আমি তাহাকে একটি সিকি বকশিসের হুকুম দিয়া হাতে দিয়া বলিলাম—খাজাঞ্চীবাবুকে দাও।

সে আবার নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।"

বছরখানেক ধরেই এটা পেয়ে গেলাম। তারপর আর নিত্য নাম পাই নি। মধ্যে মধ্যে পেয়েছি।

১৮৬৯ সালে পেলাম গোপালের মৃত্যু সংবাদ।

রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন—"আজ গোপাল সিং মারা গেল। মনটা খারাপ হইল। তাহার মৃত্যুতে একজন সত্যকার অনুগত হিতৈষী হারাইলাম।"

শেষ দিকে দেখলাম "গোপাল তাহার পুত্রকে মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছে, যেন রায়বাড়ীর আশ্রয় ছাড়িস না। তাঁহার কৃপাতেই ফাঁসির হাত হইতে বাঁচিয়াছি। এবং তোরাও বাঁচিয়াছিস। নহিলে হয় ভিক্ষুক হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। অথবা যে সব দুর্ভিক্ষ গেল, তাহাতেই সকলে পথের ধারে মরিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত।"

সেদিন এর উত্তর পাই নি।

তবে নিজেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। মানুষ আগ্নেয়গিরি। তার বুকের আগুন কখনও নেভে না। শুধু তাই নয়, মানুষ মরে গেলেও তার বুকের আগুন তার বংশের বুকে

জেলে দিয়ে যায়। সিদ্ধান্ত আমার ভ্রান্ত নয়। ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। ১৯৩৭ সালে পৃথিবীতে এমনি একটা ভয়ঙ্করতম আগ্নেয়গিরি ধোঁয়াচ্ছিল। তখন সারা পৃথিবীতে হিটলারের কথায় বক্তৃতায় সে আগুন লকলক করে শিখা বের করে জলছে।

একটু চুপ করলে সুরেশ্বর।

তারপর বললে—পরে আমি খবর নিয়েছিলাম। জেনেছিলাম, কিভাবে গোপাল সিংয়ের ক্ষোভটা বংশাবলীতে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বিচিত্র পথ সুলতা। বিচিত্র পথ।

গোপালের সঙ্গে গোপালের স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে ঝগড়া হত। সেই ঝগড়ার মুখে তার স্ত্রী বলত—তোমার মত বেইমান আমি দেখি নি। আমাকে তুমি আজ লাথি-ঝাঁটা মারছ। বেইমান তুমি 'পাসর' গিয়েছ যে সেদিন আমি ছত্রির মেয়ে রায়গিন্নীর পা ধরে 'ভিখ মাগোয়ার' ভিখ মেঙে তোমার জানটা বাঁচিয়েছিলাম।"

গোপাল ক্ষেপে গিয়ে মাথা চাপড়ে বলত—বেইমান হামি না। বেইমান তু। তু 'পাসর' গেলে কি তুর লেগে হামি গোপাল সিং এ মুলুকের শের, আজ হামি 'শিয়ার' হয়ে বেঁচে আছি। তুর আর তুর বেটা-বেটীর পেট ভরাবার জন্যে রায়কাছারীতে সেলাম দিয়ে চার আনা, আঠ আনা পয়সা লিয়ে আসি। আজ রায়বাড়ীর চাকরান জমি চষি। চাকর বনে গেলাম, স্রিক তুর আর তুর বাচ্চাদের লেগে।

এর পর সে সবিস্তারে কখনও কখনও বলত—তার দুর্দশার কথা, লাঞ্ছনার কথা। কথাটা ছেলের বুকে প্রবেশ করেছিল এইভাবে।

ছেলের থেকে তার ছেলের বুকে। হরি সিং দফাদার।

হরি সিংয়ের ছেলে শিবু সিং।

তুমি শুনেছ সুলতা, শিবু সিংয়ের কাছে দফাদার হরি সিং ছোরা আর প্যাম্পলেট দেখে তাকে যে মুহূর্তে অতুলেশ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেনেছিল, সেই মুহূর্তে তার বুকের পুরনো কথা নতুন হয়ে জেগে উঠেছিল। আগুন লেগেছিল। সারা রাত হরি সিং শিবুকে গোপাল সিংয়ের অপমানের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তপ্ত করে তুলে তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে দারোগার হাতে দিয়েছিল এবং শিবু সেই আগুনের দহনে গলে হয়েছিল এ্যাপ্রুভার।

গোপাল সিংয়ের কাহিনী শেষ ১৮৬৯ সালে। কিন্তু তার শিকড় থেকে গিয়েছিল। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৯৩৭ সালে তা থেকে [illegible]র গাছ বের হল। এবং ওখানেও শেষ হয় নি। তারপরও তার জের আছে, জের চলছে।

বিচিত্রতরভাবে পরে আর একটা এমনি মরা গাছের শিকড় থেকে গজানো গাছের সঙ্গে জড়িয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত আমাকেই জড়িয়ে ধরেছিল পাকে-পাকে।

১৯৩৭ সালে সেদিন রাত্রে ঘুমুতে পারি নি। সেইদিনই করেছিলাম এই ছবিতে জবানবন্দীর পত্তন।

১৯৩৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী; তারিখটা আমার মনে রয়েছে সুলতা, রায়বাড়ীর জবানবন্দী—কীর্তিহাটের কড়চা আমি আরম্ভ করেছিলাম।

সুরেশ্বর বললে—তার আগেই আমি ঠাকুরদাস পালের অপঘাত মৃত্যুর কথা জেনেছি, তোমার সঙ্গে সম্পর্কের সকল প্রত্যাশায় ছেদ টেনে দিয়েছি। কিন্তু কীর্তিহাটের রায়বংশের হিসেব-নিকেশের বোঝা বয়ে সারাজীবন বেড়াব—এ সংকল্প আমার ছিল না। ভেবেছিলাম—সেটেলমেণ্টের হাঙ্গামাটা মিটিয়ে দিয়ে কোনরকমে এখান থেকে বেরিয়ে পালাব। চিরদিন আমার বদনাম আছে—আমি একজন উদ্ভট খেয়ালী মানুষ; অনেক টাকা আছে আমার, সুতরাং আমি কাল ঘোড়া, ব্ল্যাকহর্স, অবশ্যম্ভাবীরূপে সয়তান হবে আমার সওয়ার। এবং আমি তার চালনায় আমার ক্ষুরে অনেক কিছু—অনেক কোমল বক্ষ—ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে একদা এক অন্ধকার গর্তে পা ভেঙে পড়ে সকল দৌড়ের অবসান করব। রায়বাড়ীর যে-কলঙ্ক ঢাকতে রত্নেশ্বর রায় ঠাকুরদাস পালকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন সুকৌশলে, তা জানায় আমার পক্ষে কাল ঘোড়া হওয়ার বাধা ছিল না। কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে অতুলেশ্বর আর অর্চনা রায়বাড়ীর একটা বিচিত্র, বিস্ময়কর রূপ প্রকাশিত করে দিয়ে বিপদ বাঁধালে। শিবু সিং তারই মধ্যে এসে গোপাল সিংয়ের ঘটনার জের টেনে সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে কেমন করে দিলে। মনে হল কি জান? মনে হল—রায়বংশের কর্মফলের মধ্যে একটা আশ্চর্য দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। মন্দ কর্মের ফল ভাল কাজের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। গিলে ফেলতে চাচ্ছে সকল পুণ্যকে। পুণ্য-বল, ন্যায়-বল করতে হলে অন্যায়ের দেনা শোধ করে তবে করতে হবে।

একটু ভুল হল; তার আগে—মানে শিবু সিংকে নিয়ে বিমলেশ্বরকাকা যে-নতুন দৃশ্যের পটোত্তলন করলে, ২৪শে জানুয়ারী-এর ক'দিন আগে থেকেই ছবি আঁকার কল্পনা আমার হয়েছিল। মনে আছে—আমি বলেছি—কুইনীকে নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিল সেই ফিরিঙ্গী হ্যারিস। হ্যারিসের দাবী কুইনীর ওপর। গোয়ান বুড়ী হিলডা তাকে তার হাতে দেবে না।

মীমাংসা করতে গিয়েছিলাম ছবি আঁকা ফেলে। ছবি আঁকব বলে ইজেলের উপর ক্যানভাস বসিয়ে সবে তুলি ধরেছি, ঠিক এই সময়ে সে পিছু ডাকার মত ডাকলে। বললে—আমি মীমাংসা করে দেবার ভার নিয়েছি, কথা দিয়েছি, আশা করি আমার মত একজন লর্ড-বংশের ছেলে সে-কথা কখনই খেলাপ করবেন না তিনি।

বিরক্ত হয়ে তখনই তুলি ফেলে উঠে গিয়েছিলাম। লোকজন কাউকে সঙ্গে না নিয়েই গিয়েছিলাম গোয়ানপাড়া। সেখানে গিয়ে ঝগড়ার মধ্যে রায়বংশের নাম উঠল। এবং অন্যের কাছে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক, আমার কাছে ধরা পড়ল আসল সত্য। সে-সত্য ইঙ্গিতে আভাসে বলেছি যে, কুইনীর উপর দাবী হিলডাই করুক আর হ্যারিসই করুক, কুইনীর দায় রায়বংশের। আমার পিতামহ দেবেশ্বর রায় তার জন্যে দায়ী। আমি মাথা হেঁট করে চলে এসেছিলাম। মীমাংসা আমাকে করতে হয়নি। কুইনী হ্যারিসের দাবী প্রত্যাখ্যান করে নীরবে চলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, হিলডার দাবী সে মেনে নিলে। কিন্তু পরের দিন এসে সে আমাকে দেবেশ্বর রায়ের চিঠি আর রত্নেশ্বর রায়ের দলিল পড়তে দিয়ে চলে গেল।

আমি দেখতে পেলাম—শ্যামাকান্তের সোমেশ্বরের পাপ রত্নেশ্বরকে ডিঙিয়ে এসে আবার

দেবেশ্বর রায়ের মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। শ্যামাকান্তের পাপ ধর্মের মধ্য দিয়ে সোমেশ্বরের পাপ সম্পদের মধ্য দিয়ে।

মনে মনে ছবির কল্পনা জাগল—তিনখানা মুখ আঁকব। একের উপরে আর একটা। শ্যামাকান্তের মুখের আউট-লাইনের মধ্যে সোমেশ্বরের মুখের লাইন তার উপর দেবেশ্বরের মুখ। তার চারপাশে একটা কালো ধোঁয়াচ্ছন্নতার পরিবেষ্টনী।

১৯৩৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী রাত্রে বিমলেশ্বরকাকা শোধ নিতে গেল শিবু সিংয়ের উপর। ২৪শে দারোগা এসে অ্যারেস্ট করলে। তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে ঘোরালে সারা গ্রাম। দেখলাম ঘাতে-প্রতিঘাতে রায়বংশের কর্মফল আজও স্তব্ধ হয়নি। সে বয়েই চলেছে।

আমার নিজের মনের মধ্যেও অনুভব করলাম সে-স্রোত বইছে। বিমলেশ্বরকাকার স্ত্রী বর্ধমানের কাকী আমাকে শপথ করালেন—এর শোধ আমি নেব।

গোপাল সিংয়ের কাহিনীটা গোটা পড়লাম। রায়বংশের দায়-অপরাধ পেলাম না তা নয়, পেলাম; কিন্তু তার সঙ্গে পেলাম রায়বংশের ক্ষমাগুণেরও পরিচয়। এর পর ছ'মাস ধরে রায়বংশের ইতিহাস তন্নতন্ন করে রায়বংশের জবানবন্দী এবং কীর্তিহাটের কড়চা আঁকলাম ছবিতে। তার মধ্যে শুধু মানুষের অপরাধটাই পেলাম না, আরও কিছু পেলাম। ইতিহাস আমাকে বুঝিয়ে দিলে, একটা কালের গৌরব আর একটা কালের অগৌরব। এক কালের ন্যায়, অন্য কালের অন্যায়। আমি তাকে এড়াতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি, আমি জানি এ-কালে জন্মে তার দৃষ্টিভঙ্গী তার নির্দেশ অস্বীকার করব কি করে?

ঠিক সেই কারণেই সুলতা, গোপাল সিংহের ওই সাপ ধরা ছবিখানা—প্রতীক-ধর্মী হয়ে উঠেছে আপনাআপনি। ওটাতে গোপালের জীবন যেমন আছে, তেমনি আছে বাংলাদেশের একটা কালের ইঙ্গিত। প্রজাশক্তি বাঁধা পড়ল নাগপাশে।

কাল বদল হচ্ছে।

সেটা স্পষ্ট হয়েছে দেখ পরের ছবিতে। সেখানে প্রজার সঙ্গে জমিদার পাল্টাচ্ছে।

সুলতা বললে—ওটা তো রত্নেশ্বর রায়ের টোপর-পরা ছবি—পাশে কনে-মুকুট-পরা কনে। তারপর—ওটা আবার কার বিয়ে?

সুরেশ্বর বললে—ওটা তোমার পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস পালের বিবাহ। বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী—দুজনের বিবাহ একসঙ্গে দিয়েছিলেন। বীরপুরের ভগবান মণ্ডলের শ্যালকের মেয়ের সঙ্গে। কীর্তিহাটের যে রংলাল মণ্ডল অতুলের ডাকা কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, যাঁর ছেলে উকিল হয়েছে, কনে তাঁর পিসীমা। শ্যামনগর পুড়ে যাওয়ার সময় তার স্ত্রীপুত্র সব গিয়েছিল। রত্নেশ্বরকে সেই বাঁচিয়েছিল। সে-কথা ভোলেননি বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবী। রত্নেশ্বরও তাই চেয়েছিলেন।

সুলতা কিছুক্ষণ ছবিখানার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। তারপর পরের ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বললে—এখানা? এ-তো রত্নেশ্বর রায়—সর্বালঙ্কার-ভূষিতা স্বর্ণলতা—

—ওটা নয়, ওর পরের খানা। যেখানায় দেখ রত্নেশ্বর রায় কীর্তিহাটের কাছারীতে

বসেছেন।

—কিন্তু এখানা? এখানায় রত্নেশ্বর রায় আর স্বর্ণলতা দেবী, তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে—।

—ওই অঞ্জনা।

—অঞ্জনা! এই অঞ্জনা?

—হ্যাঁ, এই অঞ্জনা।

—অঞ্জনার ছবি এর আগে তো এঁকেছ?

—হ্যাঁ এঁকেছি। কিন্তু তার কোনটাতেই অঞ্জনা খুব স্পষ্ট নয়। প্রথম আছে ভিড়ের মধ্যে—পুরবাসিনীদের সঙ্গে মিশে। তারপর যেটাতেই আছে, অঞ্জনা হয় পিছন ফিরে আছে, নয় মুখের অতিঅল্প অংশই আছে।

সুলতা একদৃষ্টে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরেশ্বর বললে—কি দেখছ বল তো?

—কিন্তু মনে হচ্ছে এই ছাঁচের মুখ যেন দেখেছি। আরও আছে। বলছ অঞ্জনার মুখ কোথাও পুরো দেখাওনি। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে কার সঙ্গে মিল রয়েছে। কার ঠিক মনে হচ্ছে না।

সুরেশ্বর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তার আর আশ্চর্য কি সুলতা। মানুষ শিল্পীর হাতে আর ক'রকমের ছবি আসবে বল। বড়জোর দুটো-তিনটে-চারটে। পোর্ট্রেট যারা আঁকে, তারা আসল মানুষ দেখে কিম্বা ফটোগ্রাফ দেখে আঁকে। আমাকে তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কল্পনা সম্বল করতে হয়েছে। রায়বংশের রায়দের অয়েল-পেন্টিং ছিল, ফটোগ্রাফ যখন থেকে হয়েছে, ফটোগ্রাফও পেয়েছি। বাকিদের তো সবই কল্পনায় এঁকেছি। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, বিধাতাপুরুষ যে বিধাতাপুরুষ তিনি যখন সৃষ্টি করেন, তখন একটা বংশের মানুষগুলোকে প্রায় একরকমই করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে অন্য বংশের মেয়ে এসে তাদের বংশের ছাপ মিশিয়ে একটু-আধটু পাল্টে দেন মাত্র।

সুলতা ছবিটা তখনও দেখছিল। সে বললে—কিন্তু ছবিটাতে তুমি একটা ঘটনার কথা বলেছ। সেটা কি? ঠিক তো রত্নেশ্বরের বিবাহিত জীবনের মধুচন্দ্রিকা নয়।

—না, তা নয়। ছবিটাতে দেখ নতুন বউ স্বর্ণলতা দেবী ইংরিজী বই হাতে বসে রয়েছেন। এস-ডি-ও রাধারমণবাবু ইংরিজী-নবীশ, তিনি মেয়েকে ইংরিজী পড়িয়েছেন। রায়বাড়ীর যে অন্দর রাজকুমারী বউ-রাণী কাত্যায়নী দেবী পত্তন করে গিয়েছিলেন, সেই অন্দরের হাল বদলাচ্ছে স্বর্ণলতা দেবী থেকে। বীরেশ্বর রায়ের গৃহিণী সতীবউ, ভবানী দেবী মিশনারী ইস্কুলের মাস্টার মহেশ্বরবাবুর পালিতা কন্যা, তিনিও লেখাপড়া জানতেন, শুধু বাংলাই নয়, কিছু ইংরিজীও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তা তাঁর ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর রক্তে এমন কিছু ছিল, যাতে শিক্ষার থেকে সংস্কার বড় হয়ে উঠেছিল। সেটা আবার জন্মগত সংস্কার। বাপের সঙ্গীতবিদ্যার অধিকার জন্ম থেকে নিয়ে জন্মেছিলেন। তার সঙ্গে ধর্ম-পিপাসা। যার জন্যে রাজ্যপাট তাঁকে বাঁধতে পারেনি। রাজরাণী হয়েও তিনি সন্ন্যাসিনীই

থেকে গেছেন আজীবন। রায়বাড়ীর কীর্তিহাটের অন্দরে রাজত্ব চলছিল রাণী কাত্যায়নীর মাসতুতো বোন নিস্তারিণী দেবীর। আর কলকাতায় সোফি বাঈয়ের। রায়বাড়ীর অন্দরের হাল এই প্রথম পাল্টালো রত্নেশ্বর-বধূ স্বর্ণলতা দেবীর পদার্পণে। এস-ডি-ও'র মেয়ে ইংরিজী বিদ্যে ইংরিজী ফ্যাশনের হাওয়া বইয়ে দিলেন সেখানে। অবশ্য যৎসামান্য। ছবিটাতে অঞ্জনা স্বর্ণলতা দেবীর নাম দিচ্ছে। রায়বাড়ীর বউদের আসল নাম ঢাকা দিয়ে পোশাকী নাম বা জমিদারশাহী নামকরণ হত। জাহাঙ্গীর বাদশার হারেমে ঢুকে মেহেরউন্নিসা হয়েছিলেন নূরজাহান বেগম। সাজাহান বাদশাকে বিয়ে করে নূরজাহানের ভাইঝি আরজমলবানু হয়েছিলেন মমতাজ মহল। সেকালে জমিদার-রাজাদের বাড়ীতেও এই রেওয়াজ ছিল। ভবানী দেবীর দেওয়া রত্নবউ নামটা কিছুদিনের মধ্যেই পাল্টে হয়ে গিয়েছিল বিদ্যেবতী বউ। রায়বাড়ীর অন্দরের জ্ঞাতি-পোষ্যমেয়েরা ঠাট্টা করে নামটা দিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত। স্বর্ণলতা দেবী চটেছিলেন। অঞ্জনা মেয়েটির কথা বলেছি সুলতা। তার একটা ছন্দ ছিল নদীর মত। সেটা যেমন সহজ তেমনি সুরেলা। সে এই বিদ্যেবতী নামটা পাল্টে দিয়ে নাম দিয়েছিল—সরস্বতী বউ। সতী-বউয়ের বেটার বউ—সরস্বতী বউ।

সুলতা বললে—এসবগুলি কিন্তু চমৎকার ফুটেছে। গোপাল সিংয়ের ছবিটা বোধহয় সব থেকে বোল্ড। গোপাল সিং নাগপাশের সঙ্গে লড়াই করছে।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুরেশ্বর বললে—ঠিক ধরেছ। রায় এস্টেটের দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত প্রজার রিপ্রেসেন্টেটিভ গোপাল সিং। ওর সঙ্গেই দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত প্রজাকে জবরদস্তি জঙ্গীশাসন শেষ হয়েছিল রায় এস্টেটে। এই দেখ—এই সরস্বতী বউ নামকরণের ছবিখানার পরের ছবিখানায় রত্নেশ্বর রায় সেই নির্দেশই জারী করছেন কাছারীতে।

ওই দেখ, কাছারীর ঘরে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল পড়েছে। গদীআঁটা চেয়ারে বসেছেন রত্নেশ্বর রায়। তাঁর ডানদিকে নতুন দেওয়ান দাঁড়িয়ে। দুপাশে সারিবন্দী কর্মচারী নায়েব-গোমস্তারা। পিতলের তকমা-আঁটা পোশাক-পরা বরকন্দাজরা দরজায় দাঁড়িয়ে।

একটু থেমে বললে—ছবিখানাতে একটু এ্যানাক্রনিজিমের মত দোষ আছে। দেখ, টানা পাখাগুলো একটু বেঁকে রয়েছে অর্থাৎ চলছে। পিছনে বড় তালপাখা হাতে একজন খানসামা। অথচ রত্নেশ্বরের গায়ে হাঁসিয়াদার শাল দিয়েছি। প্রলোভনটা সম্বরণ করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় জাঁকজমক ভালবাসতেন। আর সভা-সমিতি, দরবার, কালেক্টরসাহেবের খাস কামরায় দেখা করবার সময় ছাড়া কখনও চোগা-চাপকান শামলা এসব পরতেন না। পরতেন কোঁচানো ধুতি, সে-আমলের পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির নীচে ফতুয়া কি গেঞ্জি পরতেন না। ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে তাঁর দেহের গৌরবর্ণ ফুটে উঠত। বীরেশ্বর রায় প্রথম যৌবনে বাবরী চুল রেখেছিলেন। পরে কলকাতায় এসে কেটে ফেলেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় গোড়া থেকেই খাটো করে চুল কাটতেন। দাড়ি-গোঁফ দুই কামাতেন। শুধু শাদা পাঞ্জাবিতে কাছারীর দরবারে তাঁর জাঁকজমক-প্রিয় চরিত্র ঠিক প্রকাশ হত না বলেই হাঁসিয়াদার কাশ্মীরী শাল তাঁর গায়ে দিয়েছি।

সুলতা ছবিখানা দেখছিল।

সুরেশ্বর পাশাপাশি তিনখানা ছবিতে রত্নেশ্বরের দৃষ্টি তিন রকম করেছে। শিল্পী সুরেশ্বরকে প্রশংসা না করে পারলে না সে। প্রথম বিবাহমণ্ডপে বর-বধূর ছবিতে রত্নেশ্বরের দৃষ্টি আনন্দোজ্জ্বল, প্রসন্ন হাসি ফুটেছে সে-দৃষ্টিতে। দ্বিতীয় ছবিতে, যেখানে স্বর্ণলতার নামকরণ করছে অঞ্জনা, সেখানে সে-দৃষ্টি অন্যমনস্ক। অঞ্জনা এবং স্বর্ণলতার মাঝখান দিয়ে খোলা দরজায় নিবদ্ধ। দরজার চৌকাঠের মাথা থেকে সরু শাদা একটি দাগ, তাতে যেন একটা কি! তারই দিকে চেয়ে আছেন রত্নেশ্বর রায়। তৃতীয় ছবিখানায় তাঁর দৃষ্টিতে মালিকের দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ, গম্ভীর।

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় সেদিন নির্দেশ প্রচার করেছিলেন—কীর্তিহাট এস্টেট এখন থেকে পুরনো আমল বদলে নতুন আমলে এল। এ আমলে এস্টেট চলবে আইনের পথে। বে-আইনের পথে চলবে না। আইনে যতটুকু আছে, ততটুকু ছাড়া জোরজবরদস্তি বন্ধ।

প্রজার খাজনা বাকি—তার কাছে তাগাদা কর, তারপর নালিশ কর। নালিশী ডিগ্রীর টাকার এক পয়সা মকুব নাই।

আবওয়াবের মধ্যে তহুরী, তলবানা, নজরানা বহাল রইল। এছাড়া কোন মাঙন, কোন আবওয়াব রইল না।

স্বত্বস্বামীত্বের ক্ষেত্রে ফৌজদারী আমরা করব না। তারা করতে এলে আমরা অবশ্যই ঠেকাব। কিন্তু এগিয়ে যাব না।

প্রজাকে মারধর বন্ধ।

কোন প্রজার কোন অন্যায়, কোন পাপ আমি বরদাস্ত করব না। কোন মামলায় হাই-কোর্ট পর্যন্ত না লড়ে আমরা হার স্বীকার করব না। যে-প্রজা এস্টেটের অবাধ্য হবে, তার সঙ্গে সবক্ষেত্রে মামলা হবে। সে খাজনা দিতে এলে নেবে না। তার পথ খোলা। সে আদালতে দাখিল করুক। আমরা অপোসে নেব না। প্রয়োজন হলে প্রতি কিস্তীতে নালিশ হবে। সে চার আনা দাবী হলেও নালিশ হবে।

সে-সব ক্ষেত্রে সরকারী খাস পতিতে সে গরু চরাতে পাবে না। বন্ধ করবে না পথ, আর বন্ধ করবে না ঘাট। তাছাড়া জমিদারের খাস যাকিছু তার একগাছি ঘাস সে পাবে না।

রায় এস্টেটের গোমস্তা, নায়েব, বরকন্দাজ, পাইক প্রত্যেকের বেতন বৃদ্ধি হল। তাঁরা প্রজার কাছ থেকে বে-আইনী কিছু আদায় করতে পাবেন না।

আরও একটা নির্দেশ ছিল—রায় এস্টেটের জমিদারীর মধ্যে যেসব দেবস্থলের মালিক জমিদার, যেখানে দেবস্থলের খরচ জমিদারের দেওয়া দেবোত্তর থেকে চলে, সেখানে পুরোহিত-পূজক অনাচারী হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। তাছাড়াও অনাচারী তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম বাউল-বষ্টুমদের আখড়া এসবও তুলে দেওয়া হবে। এ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

সবশেষে তিনি বলেছিলেন—তোমরা কেউ মনে করো না যে, এটা আমার উদ্ভট খেয়াল কিম্বা খুব একটা সাধু-সন্ন্যাসী-গিরি করছি আমি। এটা হল এই আমলের পথ। আগেকার আমল চলে গিয়েছে। এ-আমল নতুন। আগের আমল ছিল কোম্পানীর আমল; তারা ব্যবসা করতে এসেছিল। তারা লাভ করতে এসেছিল—লাভ হলেই সন্তুষ্ট থাকত; খাজনার

টাকা আদায় তুমি যে করে হয় কর, আমি দেখব না, তুমি আদায় করে আমাকে দাও। বাস্‌। তাদের টাকা জুগিয়ে তুমি যা কর—কর, দেখব না। এখন ইংলণ্ডেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া আমাদের কুইন; মহারাণীর রাজত্ব। তাঁর চোখে সব প্রজা সমান। জমিদার প্রজা, বড়লোক-গরীবলোক সবাই প্রজা, সবাই সমান। তার জন্যে আইন করেছেন, নতুন আইন হচ্ছে—হবে। সেই আইন মেনে চলতে সকলে বাধ্য। আগে ঘুষ চলত, এখনও হয়তো চলছে কিন্তু তা বেশীদিন বোধহয় চলবে না। ইংরেজদের বিচারের মত সূক্ষ্ম বিচার এদেশে ছিল না—এমন সূক্ষ্ম বিচার হয় না। কাজীর বিচার নয়। এ-বিচার অতি সূক্ষ্ম বিচার। প্রজার উপর অন্যায় হলে জমিদার তো জমিদার, প্রজা আদালতে গিয়ে গভর্নমেণ্টের নামে নালিশ করতে পারে। তারপর নতুন লেখাপড়া এনেছে ইংরেজ। লোকের চোখ খুলছে। ইংরেজ এদেশে একরকম ঈশ্বরপ্রেরিত। মস্ত বড় জাত। এতটুকু একটা দেশ—সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে। তার পরাজয় কোথাও নেই। সুতরাং এসব আর চলবে না। আমার শ্বশুরমশাই এস-ডি-ও। তিনি আমাকে বলছিলেন—বাবাজী, তোমাদের এস্টেটের ধারাধরন পাল্টাও। ইংরেজ-জাত বড় কঠিন জাত। সাতসমুদ্র-তের-নদী পার হয়ে এসেছে, জাহাজ করেছে, স্টীমে চলছে। রেল-লাইন পেতে রেলগাড়ীতে তিন মাসের পথ তিন দিনে পৌঁছে দিচ্ছে। বিদ্যুৎশক্তিতে টেলিগ্রাফ করেছে, এখান থেকে দিল্লী খবর যাচ্ছে মুহূর্তে। দেশের হালের বদলের এই শুরু। এই বদলের সঙ্গে যারা বদলাবে, তারাই থাকবে, শুধু থাকবে নয়—উঠবে, দিন-দিন উঠবে, যে না বদলাবে, সে মরবে।

সুরেশ্বর বললে—এই দীর্ঘ বক্তৃতাটির সবটাই তাঁর ডায়রীতে আছে। হয়তো আরও অনেক বলেছিলেন, কি বলেছিলেন জানি না, তবে এটুকু লিখে গেছেন। তার সঙ্গে আরও লিখেছেন—

"ইংরাজ ঈশ্বর-প্রসাদে আজ বিশ্ববিজয়ী। শুধু ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে বলিয়াই নয়—ক্রিমিয়ায় সে বিজয়ী হইয়াছে। যে রুশ-ভীতির কথা লইয়া দেশে অনেক প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিত, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। মধ্যে মধ্যে আফগানিস্তানের আমীরের কথা বলিত। বিশালকায় দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ আফগান সৈন্যের ভয় দেখিত, কিন্তু আফগানিস্তানের আমীর আজ ইংরাজেরই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মদেশে পর্যন্ত ইংরাজ পদার্পণ করিয়াছে। ব্রহ্মের অধীশ্বর আজ রেঙ্গুন হইতে মান্দালয়ে পলায়ন করিয়াছে। ইংরাজ বিশ্ববিজয়ী। তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনা নাই। আজ আইনমত না চলিয়া উপায় নাই। তাহা ছাড়াও পিতামহ সোমেশ্বর রায়ের এবং পিতৃদেবের দৃষ্টান্ত এবং-মাতামহ শ্যামাকান্তের দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া নূতনভাবে নূতন পথে যাত্রা শুরু করিতে আমি বদ্ধপরিকর। শ্যামাকান্তের এবং সোমেশ্বর রায় মহাশয়ের কুৎসিত কুসংস্কার আমি আমার জীবন এবং বংশ হইতে মুছিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। পিতৃদেবের দুর্দান্ত দুঃসাহসের পথ, তাহাও পরিত্যজ্য। আমি ঈশ্বর এবং ধর্মকে মানি না তাহা নয়, কিন্তু ওই শবসাধনা, নারী লইয়া সাধনাকে কুসংস্কার এবং বিকৃত ধর্মাচার বলিয়াই মনে করি। এবং পিতৃদেবের জীবনকেও আদর্শ বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম আমি হইব না, ধর্ম পরিত্যাগ করিব না, কারণ উপায়ও নাই। প্রপিতামহ কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য এই বংশ এবং

এস্টেটের পত্তনই দেবসেবার উপর করিয়া গিয়াছেন। আমি শুদ্ধাচারে বৈদিক ধর্মমতে থাকিব এবং সম্পূর্ণ আইনের পথে চলিব। জমিদারীর ক্ষেত্রে রাজার আইনই একমাত্র ধর্ম।”

*　　　*　　　*

সুরেশ্বর বললে—গোপাল সিংয়ের পৌত্র হরি সিংয়ের উপর শোধ নিতে পথ খুঁজতে আমাকে চিন্তা করতে হয় নি। বিমলকাকা এমন শান্ত লোক হয়েও ভুল করে বীরেশ্বর রায়ের পথ নিয়েছিলেন। আমি রত্নেশ্বর রায়ের নির্দিষ্ট পথ নিয়েছিলাম নির্ভয়ে। ইংরেজ সরকার তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছে কিন্তু পারবে না, আমি তার উপর কিস্তী কিস্তী নালিশ করব। ইংরেজকেই আমাকে ডিগ্রী দিতে হবে। তার আদালতের পেয়াদারা এসে তার যথাসর্বস্ব ক্রোক করবে। সে যাবে কোথায়?

সুলতা, আমার মনে আছে, সেদিন মনে জমিদারীর নেশা লেগেছিল, আমি রঘুকে বলেছিলাম—দে রঘু, বোতলটা দে।

সুলতা বললে—তোমার জমিদারগৌরব পরে শুনব, কিন্তু রত্নেশ্বর রায় দুটো লোককে খুন করিয়েছিলেন বলছিলে। সে জমিদারীর জন্যে নয় বলছ তুমি?

সুরেশ্বর বললে—না সুলতা, জমিদারীর জন্য নয়, যে দুটো খুনই তিনি করিয়েছিলেন তার কোনটাই জমিদারীর প্রয়োজনে করান নি। সংসারে রাম রাজত্বের কথাও আছে, রাবণ রাজত্বের কথাও আছে।

বাঁকা হেসে সুলতা বললে—কি বলছ তুমি? রত্নেশ্বর রায় দুটো খুন করিয়েছিলেন রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসন এবং শূদ্রতপস্বী বধের মত পুণ্যকর্ম ভেবে করেছিলেন?

—কথাটা তুমি অনেকটা ঠিকই বলেছ সুলতা। রামচন্দ্র রাজা না-হলে এ দুটো করতেন না। আমার কথাটা আমি শেষ করি নি; তুমি তার আগেই মন্তব্য করেছ। রামচন্দ্র রাজা না-হ'লে—সীতাকে সতী জেনেও পরের মিথ্যা সন্দেহে নির্বাসন নাও দিতে পারতেন। আর শূদ্রক তপস্যা করার দরুণ অনাবৃষ্টি হয়েছে এর জন্য তাকে শাস্তি তিনি দিতেও পারতেন আবার নাও দিতে পারতেন। অনেক মানুষ আছে যারা রাজা নয় জমিদার নয় তাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীকে হরণের জন্যে—যে হরণ করে তাকে খুন করে, অনেকে আর এক বিয়ে করে দিব্যি সুখেস্বচ্ছন্দে থাকে, আর পাড়ার বা গ্রামের বদমাসকে কেউ কেউ শাস্তি দেওয়ার ভারটা কর্তব্যবোধে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দাঙ্গা-মারপিট করে হাঙ্গামা বাধায় জেলেও যায়। কিন্তু রাজা হলে ওই রামের মতই কাজ না করে উপায় থাকে না।

—তার মানে?

—ধর, ঠাকুরদাস পাল রায়বংশের গোপন পাপের কথা প্রকাশ করব বলে ভয় দেখিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে রত্নেশ্বর রায় সাধারণ লোক হলে তার সঙ্গে হাতাহাতি করতে পারত আবার মুখ বুজে সয়েও যেতে পারত। কিন্তু জমিদার রত্নেশ্বরের ঠাকুরদাস পালের মুখ বন্ধ না ক'রে উপায় ছিল না। ওটা জমিদারী রক্ষার জন্য বা জমিদারীর আয় বাড়াবার জন্য নয়। ওটা জমিদার হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় খুনটাও তাই। একজন গোয়ানকে তিনি কোথায় হারিয়ে দিয়েছিলেন, সে কেউ জানে না।

—রায় বাড়ীর মর্যাদা ?

—রত্নেশ্বর লিখেছেন তাই তাঁর ডায়রীতে। কিন্তু ঠিক তা নয়। অঞ্জনা যদি ভ্রষ্টাই হয়ে থেকেছিল, তাতে রায়বাড়ীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। অথচ এটাকে তিনি তাইই ভেবেছিলেন! ওই ছবিখানা আর একবার দেখ সুলতা। ওই যে বিবাহের ছবির পর, যেখানে রত্নেশ্বর রায়, স্বর্ণলতা দেবী বিদ্যাবতী বউ, এবং অঞ্জনা তিনজন রয়েছে, সেখানার দিকে। অঞ্জনা বলছে—বিদ্যেবতী না—নাম থাকুক সরস্বতী বউ। জ্যাঠাইমা সতী বউ, তার বেটার বউ সরস্বতী বউ। বিদ্যেবতী যেন ঠাট্টা ঠাট্টা। বিদ্যেসুন্দরের বিদ্যে-বিদ্যে।

—মেয়েটি তো লেখাপড়া জানত না বলছ।

—কিন্তু বলেছি ছড়া, পাঁচালী, এসব মুখস্থ ছিল, বিদ্যাসুন্দর সে আমলে খুব চল ছিল। কে তাকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল জানি না। তবে বিদ্যেসুন্দর কারুর কাছে সে শুনেছিল। এখানেই স্বর্ণলতা বলেছিলেন—কর্তা গিন্নীকে ব'লে অঞ্জনাকে আমাকে দাও। ওঁরা তো শুনছি এইবার কলকাতা যাচ্ছেন। তারপর যাবেন পশ্চিম। কাশী গয়া বৃন্দাবন তীর্থ করতে। ওরই মধ্যে রত্নেশ্বর রায়ের ওই গোয়ানটার হারিয়ে যাওয়ার বীজ লুকিয়ে আছে।

সুরেশ্বর বললে—এই দুটো খুনের যা কারণ তা জমিদারীর প্রজাশাসন, প্রজাশোষণ এ সব-কিছুর জন্য নয়, এর কারণ যা তা জীবনে অনেকের ঘটে থাকে হয়ে থাকে। মা-বাপের নামে কেলেঙ্কারী অপবাদ রটনা করলে এ কাজ ক্রোধবশে যে কোন লোক করতে পারে। তবে জমিদার বলে রত্নেশ্বর রায়ের পক্ষে সহজ হয়েছিল, যদি বল স্বাভাবিক হয়েছিল, তবে তাতেও আপত্তি করব না।

আর এই গোয়ানের ব্যাপারটা, ওটাও তাই বলা যায়—তবে ওর আসল কারণটা অন্য, দেখেছ, রত্নেশ্বর রায়ের দৃষ্টি অঞ্জনা এবং স্বর্ণলতার মাঝখানে একটা মাকড়সা ছাদ থেকে সুতো টেনে নামছে সেটার দিকে? দেখ সুতোটা দুলছে, ছাদ থেকে রাইট অ্যাংগেল করে নেমে আসেনি, একটুখানি বেঁকে আছে।

সুলতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—তুমি ওটা বড় ভাল কল্পনা করেছ সুরেশ্বর। মাকড়সাটা অঞ্জনার দিক ঘেঁষে বেঁকে রয়েছে। তুমি—কি—।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ। তাই।

—রত্নেশ্বর সাধুতার আবরণে—

—না, আবরণে নয়। ওটার ইন্টারপ্রেটেশন অন্যে যে যা করবে করুক আমি তা করি নি। তা করব না। কখনও না। রত্নেশ্বর রায় নিজের জীবনে কোন অসাধুতা কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। মানুষ তিনি, তার মনও মানুষের মন, তাঁর মনে যখনই কোনও অন্যায় অসাধু প্রবৃত্তি উঁকি মেরেছে, তখনই তাকে তিনি চাবুক মেরে সার্কাসের ট্রেনার যেমন বাঘ সিংহকে খাঁচায় ঢোকায় তেমনি করেই তাদের পিঞ্জরেতে পুরেছেন। নির্মমভাবে নিজেকে আঘাত করেছেন তিরস্কার করেছেন।

এর ইন্টারপ্রেটেশন আমার কাছে ওই রায়বাড়ীর রক্তে শ্যামাকান্ত এবং সোমেশ্বরের ধর্ম-সাধনায় ভ্রষ্টতার পাপ। শ্যামাকান্ত যেমন শেষ জীবনটা ক্রমাগত নিজেকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত

ক'রে শাসন করতেন, ঠিক তেমনি ক'রেই রত্নেশ্বর রায়ও নিজের অন্তরের মধ্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। এই পাপই বল আর তোমাদের আজকের ইণ্টারপ্রেটেশন অনুযায়ী হেরিডিটিই বল, অথবা এইটেই মানুষের স্বভাবের আসল চেহারাই বল, বলতে পার। কিন্তু আমি তা বলব না।

রত্নেশ্বরের জীবনে এই শাপ বা পাপকে প্রথম উদ্‌বুদ্ধ করেছে এই অঞ্জনা। একটু আগে বলছিলে—অঞ্জনার মুখের ঢঙের মধ্যে, আকৃতির মধ্যে আর কার ছবির যেন ছাপ পড়েছে।

পড়েছে সুলতা, একজনের নয় দুজনের। রায়বাড়ীর কড়চা বা জবানবন্দীতে প্রথম এ মুখের ছাপ পাবে সেই পাগল মেয়েটির মধ্যে, যাকে শ্যামাকান্ত চিনেছিলেন যোগিনী ব'লে। যাকে নিয়ে তিনি কাঁসাইয়ের ওপারের সিদ্ধপিঠের জঙ্গলে সাধনার নামে ব্যাভিচার করেছিলেন। এবং শ্যামাকান্তকে সেই বর্ষার সময় অমাবস্যার রাত্রে দারুণ দুর্যোগে তুফানপ্রমত্তা কাঁসাইয়ের জলে ফেলে দিয়ে সোমেশ্বর তাকে কেড়ে নিয়েছিলেন যোগিনী সাধনা করবেন ব'লে। চল, ওইদিকে চল, তার ছবি দেখবে। মিলিয়ে পাবে। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিন্তু তখন কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

—এই দেখ পর পর দুখানা ছবিতে যে পাগলী এসে রায়বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ধূলিধূসর দেহ, অর্ধউলঙ্গ, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। এর সঙ্গে হয়তো পুরো মিল পাবে না। কিন্তু এইটেতে পাবে। এই দেখ, পাগলাদাবা শ্যামাকান্ত তাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করেছে। স্নান করিয়েছে। নতুন কাপড় পরিয়েছে। মেয়েটি শান্ত এবং তৃপ্ত হয়ে শ্যামাকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আরও দুটো ছবি আছে, এই একটা দেখ সোমেশ্বর রায়ের অন্দরে, সোমেশ্বরের কন্যা বিমলাকে কোলে ক'রে দোলাচ্ছে। কি প্রসন্ন শান্ত মুখ দেখ! আর একটা ছবি, যোগিনী তখন সোমেশ্বরের সাধনসঙ্গিনীর ছদ্মবেশে তাঁর বিলাসসঙ্গিনী হয়েছে, দেখ, এইটেতে যে ছবি আছে তারই সঙ্গে অঞ্জনার মিল রয়েছে পুরো।

সুলতা দেখলে। তাই বটে। দেখলে ভ্রম হয়; মনে হয় বুঝি যোগিনীই দাঁড়িয়ে আছে রত্নেশ্বরের সামনে। একটু ভেবে নিলে সুলতা। কপালে ক'টা রেখা জেগে উঠল। একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—এটা তুমি কেন করলে সুরেশ্বর? অঞ্জনা রায়বাহাদুরের পোষ্য ছিল—হয়তো বা—

—না সুলতা, তা ছিলেন না অঞ্জনা দেবী।

—তা হ'লে দুটো ছবি একরকমের ক'রে তুমি ওই মেয়েটির কি অপমান কর নি?

—না। তুমি রাগ করো না। একটু ভেবে দেখ। এখানে ওই মেয়েটি রায়বংশের কড়চার একটা সিম্বল। আমি যোগিনীর কোন ছবি পাই নি। দেখি নি। অঞ্জনার একটা ফটো ছিল শুনেছি কিন্তু সেটা নাকি রায়বাহাদুর আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে এক জায়গায় তার ছবির আদল পেয়েছি। তাই দেখে অঞ্জনার ছবি এঁকেছি এবং তা থেকেই যোগিনীর ছবিও এঁকেছি। আগে আমার জবানবন্দী শেষ হোক তারপর তুমি রায় দিয়ো। তবুও যদি তর্ক করো তবে কৈফিয়ৎ হিসেবে বলব—বিজ্ঞানস্বীকৃত একটা নিয়মকে আমরা সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করি, সেটা হল একজনের সঙ্গে আর একজনের আশ্চর্য চেহারার মিল। ওটা হয়ে

যায়। এও তাই।

একটু বক্র হাসি সুলতার মুখে ফুটে উঠল।

সুরেশ্বর বললে—তুমি এখনও বিচারক হিসেবে নিরপেক্ষ হতে পারলে না। কিন্তু পরে তোমাকে মত বদলাতে হবে।

—ভাল। বল শুনি!

একটু চুপ ক'রে বোধহয় কিছু ভাবলে সুরেশ্বর তারপর বললে—তাহ'লে তোমাকে রায়-বংশের জবানবন্দীর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে পাঁচ বছর পরে যা ঘটেছিল সেইটেই আগে—এখনই শুনিয়ে দিই। আমি আমার কথায় বলব না। বলব রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর কথা।

সামনের টেবিলের উপর রাখা ডায়রীগুলির গাদা থেকে ১৮৬৪ সালের ডায়রী বেছে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি পোরা চিহ্নিত জায়গাগুলি খুলে দেখতে দেখতে একজায়গায় থামল সুরেশ্বর। বললে—এই পেয়েছি। শোন।

"আমি নিভৃতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অঞ্জনাকে ডাকিয়া কঠিন ভানই করিয়া কহিলাম—এ তুমি কি করিতেছ? এসব কি শুনিতেছি?

অঞ্জনা ভয় পাইল না, সে বলিল—কি শুনিতেছ?

—তাহা তুমি জান না? গোটা অন্দরে কথাটা লইয়া কানাকানি চলিতেছে। লোকে হাস্য করিতেছে!

—কানাকানি চলুক। হাস্য করুক—তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আমি এবার রোষদৃপ্ত কণ্ঠে কহিলাম—অঞ্জনা, তুমি সাবধান হইয়া কথা বলিবে।

অঞ্জনা আশ্চর্য এক হাস্য করিল, যেন জগৎসংসার সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল—কেন? কি করিবে তুমি? মারিয়া ফেলিবে? তোমরা বড়লোক জমিদার, তোমরা সব পার। কিন্তু আমি তাহাতে ভয় করি না। আমি তাহাতে জুড়াইব। তবে একটি দয়া প্রার্থনা করিব। যেন ভাড়াটিয়া লোক দিয়া আমাকে হত্যা করাইয়ো না। তুমি স্বহস্তে আমাকে হত্যা করিয়ো। তুমি বিষ গুলিয়া আমাকে দিয়ো, আমি সহাস্যে তাহা পান করিয়া মরিব। তুমিই আমাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছ, আমি স্বহস্তে লিখিয়া যাইব, আমি স্বেচ্ছায় বিষ পান করিয়া মরিতেছি। ইহার জন্য কেহ দায়ী নয়।

অঞ্জনা প্রগলভা বটে। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক প্রগলভতায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—অঞ্জনা, তুমি পাপিনী। কালসর্পিণীর সহিতই একমাত্র তোমার তুলনা হয়। দুগ্ধ পান করাইয়াও ফল হইল না।

অঞ্জনা এবার যেন আরও উদ্ধত এবং প্রগলভ হইয়া বলিল—হাঁ—হাঁ—আমি কালসর্পিণীই বটে। আমি পাপিনীই বটে। পাপ উদ্দেশ্যেই তোমাদের গৃহে সেবার আসিয়াছিলাম। দরিদ্রের কন্যা, এক দরিদ্রের স্ত্রী, সে দরিদ্র হইলেও ক্ষতি ছিল না, সে পাষণ্ড, সে দুশ্চরিত্র, সে বাউণ্ডুলে। তোমাদের গৃহে আসিলাম উৎসব দেখিতে। ঐশ্বর্য দেখিয়া লোভ হয় নাই তাহা বলিব না। অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল। কিন্তু ততোধিক লোভ হইল তোমাকে দেখিয়া। আবার ভয়ও হইল। তোমার মত গম্ভীর, তোমার মত কঠোরচরিত্র যুবক আমি দেখি নাই।

পিত্রালয়ে, আমার দিকে আমাদের গ্রামের দুশ্চরিত্র যুবকেরা লোলুপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। আমি কৌতুক বোধ করিতাম এবং অহঙ্কারও অনুভব করিতাম। তাহাদিগকে লইয়া কথায় খেলা করিতাম। আমি কালো হইলেও আমার মত মোহময়ী যুবতী দুর্লভ ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। রাজার ঘরে আমি পড়িলে তোমার স্বর্ণলতা অপেক্ষা বহুগুণে মহিয়সী হইতে পারিতাম। তুমি প্রথম আমার দিকে একবার চাহিয়া আর ফিরিয়া চাহ নাই। তারপর তোমার মাতা অনুগ্রহ করিয়া গৃহে স্থান দিলেন। আমি হস্তে চাঁদ পাইবার সুযোগ পাইয়া থাকিয়া গেলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিলাম নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উপর আমার ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া আমি ফেলিয়াছি। তুমি আমাকে, স্বর্ণলতার কাছে সেই ধাঁধা প্রেরণ করিবার জন্য দ্বিপ্রহরে তোমার ঘরে আহ্বান করিলে। আমি মনে মনে হাস্য করিলাম; উৎসাহিত হইলাম। তাহার পর তোমার বিবাহ হইল। তোমার মাতাপিতার সঙ্গে আমার চলিয়া যাইবার কথা। আমি সরস্বতী বউকে ধরিলাম; বলিলাম—ভাই, বউ, জ্যাঠাইমা জ্যেঠামশায়ের নিকট কোন প্রবীণাকে পাঠাইয়া দাও। আমি ভাই তোমাদের যুগলের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন সার্থক করিব। তোমরা শয়ন করিবে, আমি শয্যা রচনা করিব, আমি তোমাকে কেমন করিয়া পুরুষের নাসিকা ফুড়িয়া দড়ি পরাইতে হয় শিখাইব। পান সাজিব। এবম্বিধ নানাপ্রকার তোষামোদ করিয়া তাহাকে দিয়াই তোমাকে বলাইলাম। জ্যাঠাইমাকে বলাইলাম। সঙ্কল্প করিলাম, তোমাকে জয় করিব।

আমি বলিলাম—অঞ্জনা, তুমি থাম। তুমি থাম। এসব কথা বলিলে পাপ হয়, শুনিলে পাপ হয়—তুমি থাম।

অঞ্জনা বলিল—সে তোমার হয়, আমার হয় না। আমাদের মত যাহারা তাহাদের হয় না। যে ভগবান এবম্বিধ অদৃষ্ট দিয়া আমাদের জগতে পাঠান তিনি আমাদের এবম্বিধ চরিত্র দেন। আর তুমি এবং তোমার মত যাহারা শুদ্ধাচারী, তাহারা ভণ্ড, তাহারা কালী কালী হরি হরি জপ করিয়া দন্তে দন্ত টিপিয়া পড়িয়া থাকে, তুষানলে দগ্ধ হয়।

সভয়ে আমি বলিলাম—অঞ্জনা!

অঞ্জনা বলিল—আমি তোমাকে জানি না মনে করিতেছ? তোমার প্রতি পদক্ষেপ আমি চিনি, তোমার মুখ দেখিয়া বলিতে পারি কি তুমি ভাবিতেছ। মুখ খুলিলে বলিতে পারি কি বলিবে। তোমাকে দেখিলে তোমার দৃষ্টি উৎফুল্ল হয় না? আমি থাকিলে সরস্বতী বউয়ের সঙ্গে আলাপনের মধ্যে তোমার উচ্ছ্বাস বাড়ে না? কোনক্রমে আমার হাতে হাত ঠেকিলে তুমি চঞ্চল হও না? সত্য বলিবে!

আমি এবার কঠোর হইয়া বলিলাম—না—না—না!

অঞ্জনা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বিষণ্ণ থাকিয়া বলিল—তুমি মিথ্যা বলিলে।

আমি বলিলাম—না।

অঞ্জনা বলিল—তবে সত্য গোপন করিলে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মত অশ্বত্থমা হতঃ ইতি

গজের মতই কথাটা বলিলে। জমিদার হিসাবে তোমাকে লোকে ভয় করে। মানুষ হিসাবে তুমি আরও ভয়ঙ্কর। হাঁ, অস্বীকার করিব না তুমি অত্যন্ত সতর্ক। তুমি হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়াছ। তোমাকে একাকী দেখিয়া তোমার ঘরে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তুমি কোন-প্রকার ছুতা করিয়া স্বর্ণলতাকে আহ্বান করিতে। বা চাকরকে আহ্বান করিতে! স্বর্ণলতার সম্মুখে তোমার উল্লাসে আমি পুলকিত হইতাম কিন্তু তোমাকে একাকী পাইয়া কাছে ছুটিয়া গিয়াও সভয়ে সরিয়া আসিতাম।

অতঃপর সহসা সে যাহা করিল তাহাতে আমি ভীত হইলাম, চঞ্চল হইলাম। সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—কেন, আমাকে কি এতটুকু ভালবাসা তুমি দিতে পারিতে না? এতটুকু? এক কণা। স্বর্ণলতার উচ্ছিষ্ট এতটুকু? তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইতাম। এই তো সারা দেশময় জমিদারদের দুইটা তিনটা করিয়া স্ত্রী থাকে। রক্ষিতা থাকে। বাড়ীতে আশ্রিতাদের মধ্যে কত সুন্দরী যুবতীকে তাঁহারা অনুগ্রহ করেন। তাহাতে কি ক্ষতি হয়?

—তাহা ছাড়া রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা তোমার যোগ্যই নয়। নামেই লেখাপড়া জানা সরস্বতী বউ। রঙটাই কটা। আমার সঙ্গে তাহার তুলনা! তুমি ভয়ঙ্কর বলিলাম, ভুল বলিলাম। তুমি কাপুরুষ। তুমি পুরুষই নও। তুমি সিংহ নও, তুমি শশক।

আমি কঠোর কণ্ঠে তাহাকে বলিলাম—তুমি দুশ্চরিত্রা! চুপ কর তুমি।

অঞ্জনা তাহাতেও দমিল না। সে বলিল—হাঁ, আমি দুশ্চরিত্রা। অন্ততঃ মনে মনে আমি দুশ্চরিত্রা। তুমি সাধু। তুমি ভয়ঙ্কর। সেই প্রেতিনীর গল্প আছে—যাহারা সুযোগ পাইয়া সুন্দর পুরুষকে আশ্রয় করে তাহাকে চুষিয়া খায়, আমি তাই। সেইরূপভাবেই তোমাকে চুষিয়া খাইবার জন্য তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রহার খাইয়া আমাকে পলাইতে হইতেছে। কিন্তু তুমিও জ্বলিবে। নিশ্চয় জ্বলিবে। এই তেজ তোমার থাকিবে না।

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—অঞ্জনা অঞ্জনা—শোন।

সে চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে বলিলাম—কদাচ এ কার্য করিও না। কদাচ না। তাহা হইলে আমি তোমাকে সত্যই হত্যা করিব।

সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে ফিরিয়া চলিয়া গেল! আমি বুঝিলাম এবার ঔষধ ধরিয়াছে। সে ভীত হইয়াছে এবং বুঝিয়াছে!"

সুরেশ্বর খাতাখানা বন্ধ করলে।

সুলতা বললে—অদ্ভুত মেয়ে।

সুরেশ্বর বললে—বল, কি বলবে এর সম্বন্ধে?

—ওর সম্বন্ধে বলব; হাসলে সুলতা, বললে—তুমি কি বলবে জানি না, আমি বলব—সে চেয়েছিল তার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু পায় নি।

—রত্নেশ্বরকে সে চেয়েছিল, কিন্তু রত্নেশ্বরের কি তার দাবী মেনে আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল?

—রত্নেশ্বর ছাড়াও আর অনেক মানুষ ছিল, যারা রত্নেশ্বর থেকে কম উজ্জ্বল, কম গুণবান

নয়। হয় তো ধনী না হতে পারেন। সে স্বচ্ছন্দ্যে ডাইভোর্স ক'রে তাদের একজনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তা সে করেছিল সুলতা। সে রত্নেশ্বর রায়ের সমস্ত শাসন, সমস্ত বন্ধন অস্বীকার ক'রে কলকাতার জানবাজারের এই বাড়ী থেকে একদিন রাত্রে চলে গিয়েছিল। তখন কলকাতার বাড়ীতে রত্নেশ্বর রায় শীকারের জন্য একজন পোর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে রেখেছিলেন। ওই হ্যারিসের মত চরিত্র। এবং আশ্রয় নিয়েছিল কৃশ্চান চার্চের। যেখানে রত্নেশ্বর রায়ের হাত পৌঁছয় না। যাবার সময় একখানা চিরকুট লিখে গিয়েছিল। 'পাপ তোমার কাছে হারিয়া পলাইতেছে।'

সুরেশ্বর একটু থেমে কথার জের টেনে বললে—এইজন্যেই আমি রায়বাড়ীর পূর্ব-পুরুষের ব্যাভিচার-সঙ্গিনী সেই যোগিনী মেয়েটার চেহারা অঞ্জনার চেহারার আভাস নিয়ে এঁকেছি। অঞ্জনাকে আমি অপমান করতে চাই নি। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।

আরও আছে সুলতা। অঞ্জনার কথাটা তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে তুললে বলে ক্রমভঙ্গ ক'রে বলতে হ'ল। এখন আমার জবানবন্দীর ক্রমে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালে। রত্নেশ্বর রায়ের বিবাহ হল। অঞ্জনাকে স্বর্ণলতাই চেয়ে নিলে শাশুড়ী ভবানী দেবীর কাছে।

শুধু বীরেশ্বর রায় একটু খুঁত-খুঁত করেছিলেন। বলেছিলেন—তাই তো!

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় প্রস্তাবটা শুনে বলেছিলেন—তাই তো!

ভবানী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কেন, তাই তো কেন বলছ!

—তোমার মনে হচ্ছে না? অঞ্জনা এখানে বউমার কাছে থাকবে বলছ?

—আমার কাছে থাকলে আমার সুবিধে হ'ত। তোমার খাবার, সেবার ভারটা ওর উপর দিলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অঞ্জনারও আমাদের সঙ্গে তীর্থ দর্শন হ'ত। কিন্তু বউমার কথাও তো ভাবতে হবে। বউমা বলছেন—ও থাকলে আমি কথা কইবার লোক পাব। ও ভারী মজার মজার কথা বলে। এত বড় বাড়ীতে—চুপ করলেন বউমা। তবে বুঝলাম। কথাটা তুমিও ভাব, এত বড় বাড়ীতে ওই অল্পবয়সী মেয়ে, হাঁপিয়ে উঠবে যে।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—একবার রত্নেশ্বরকে ডেকে দিয়ো। তোমার সঙ্গে তার এ বিষয়ে কোন কথা হয়েছে?

ভবানী দেবী বলেছিলেন—তার সামনেই তো কথা হল। মায়ের মন্দির থেকে এলাম, বউমা, অঞ্জনাও আমার সঙ্গে ছিল। পূজার পর, ভোগের আগে বউমা বললে—আমার শরীরটা কেমন করছে মা। দেখলাম খুব ঘেমে গেছে। বললাম—তুমি চলে যাও, আমি রয়েছি; অঞ্জনা রয়েছে, তোমার চলে গেলে কোন দোষ হবে না। বউমা চলে এল নিজের ঝিকে নিয়ে। ফিরে এসে তোমায় মার চরণামৃত পুষ্প দিয়ে রত্নকে দিতে গেলাম, দেখলাম, বউমা একটু সুস্থ হয়েছেন। ছেলেমানুষ, সায়েবী চালে মানুষ, এসব অভ্যেস নেই। বললাম—এখন সুস্থ লাগছে তো?

রত্ন বললে—ওঃ সে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল যেন। এসে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর বললে—বাবাঃ, পেটের ভেতর আমার হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ভয় করছে। এ

আমি সব সামলাব কি করে ? মা চলে যাবেন ! বললাম—কিন্তু পারতে হবে। না পারলে তো চলবে না। তুমি নিজে চোখে বিয়ের আগে এসে সব দেখে গিয়েছ ! তা সাহস আছে, বললে—পারব বই কি। এসব ভাল লাগছে খুব। কিন্তু কখনও তো করি নি। দেখে ভাল লেগেছিল। এখন সেইসব করতে গিয়ে খেই হারিয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে। কোথায় খুঁত হচ্ছে, কোথায় খুঁত হচ্ছে !

হেসে ভবানী দেবী বলেছিলেন—এর পর যখন অভ্যেস হবে, তখন দেখবে, মা তোমাকে অনবরত হেসে বলছেন, ভয় কি ? ভয় কি বেটী। ওরে আমি যে মা। আমার কাছে খুঁত হয় সন্তানের ! তাছাড়া মাসীমা রইলেন, উনিই এতদিন করে আসছেন, তোমার হাতে-হাতে সব জুগিয়ে দেবেন ; বলে দেবেন। ওই দেখ না, অঞ্জনা সব কেমন অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে।

ভবানী বীরেশ্বর রায়কে বললেন—এই কথাতে রত্নেশ্বরই বললে—তোমার বউমা আমাকে একটা কথা বলছিল।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—কি ?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন স্বর্ণলতাকে—বল না, তুমি নিজেই বল না। আমাকে বললে কি হবে ? খোদ মাকে বল। আমি বলতে পারব না।

—কি বউমা ?

স্বর্ণলতা শাশুড়ীর সামনে ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। রত্নেশ্বর বলেছিলেন—আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি শোন, ও কি বলছে।

তখনকার কালে বউ শাশুড়ীর সামনেও ঘোমটা দিত, এবং চাপা গলায় কথা বলত। অবশ্য ঘোমটা সারা-মুখ-ঢাকা ঘোমটা নয়, কপাল ঢেকে অন্তত ইঞ্চি দুই সামনের দিকে ঝুলে থাকত।

মৃদু কণ্ঠে স্বর্ণলতা বলেছিলেন—বলছিলাম, অঞ্জনা ঠাকুরঝির কথা !

—কি কথা ? অঞ্জনা কিছু বলেছে বুঝি ?

—না, ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে কথাটা সেরেছিলেন নবীনা রায়বধূ।

এবার রত্নেশ্বর ভিতরে ঢুকে এগিয়ে এসেছিল এবং বলেছিল—মা তো আমার বাঘিনী বউ-কাঁটকী শাশুড়ী নয়। বলতে গলা শুকুচ্ছে। ও বলছিল, তুমি চলে যাবে, একলা হবে ও ; এইসব দেবতার কাজ ; ঠাকুমা বলতে গেলে বুড়ী হয়েছেন। এই তো বিয়েতে খেটে মেচে খেয়ে আজ প্রায় মাসের উপর পড়ে আছেন। সেরে গেছেন, তবু উঠতে পারেন না। তার ওপর বাতের ব্যথা। আর ওঁর কথাবার্তা বড় সেকেলে। শুধু সেকেলে নয়, একটু চ্যাটাং-চ্যাটাং। তোমাকেই কি বলেছিলেন, তোমার মনে আছে। তাই বলছিল, অঞ্জনা যদি ওর কাছে থাকত, তো ভাল হ'ত। বলছিল—ঠাকুরঝি যদি এখানে থাকতো তাহলে খুব ভাল হ'ত। সব কাজ দিব্যি করে যেতো দুজনে মিলে, হাসি গল্পের মধ্যে। এই আর কি। কি বল না। ঘোমটাশুদ্ধ ঘাড়টা নেড়েও তো জানাতে পার !

তাই জানিয়েছিলেন নতুন বউ।

ভবানী দেবী হেসে বলেছিলেন— তোমার আমার কথা ছিল আলাদা। শাশুড়ী ছিলেন

না। শ্বশুর ছিলেন, তিনি থাকতেন কীর্তিহাটে, তো তুমি আমায় নিয়ে ছুটতে কলকাতায়। আবার তিনি কলকাতা গেলে তুমি আমায় টেনে আনতে এখানে। ঘোমটা দিতে হত না। সমীহ করবার কেউ ছিলেন না। তার ওপর সে আমলে ঘোরতর সাহেব তুমি।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ। শুধু একটি হুঁ।

ভবানী দেবীর খেয়াল হয়েছিল, এতক্ষণে, তিনি বলেছিলেন—তুমি কি ভাবছ বল তো!

—ভাবছি, তাহ'লে অঞ্জনার স্বামীকেও এখানে রাখতে হবে।

—তা তো কথাই হয়েছে।

—না, এই বাড়ীতেই তার জন্যে নিচেরতলায় সংসার পাতিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটা মদ খায়, যাত্রা করে বেড়ায়, বাউণ্ডুলে। তাহলেও অন্দরেই তাকে থাকতে দিতে হবে।

—কেন? তা করতে হবে কেন? সে তো অঞ্জনাকে নেয় না। গণ্ডা দরুণে বিয়ে। চাকরি অঞ্জনার খাতিরে দিতে আমরা চাচ্ছি, কিন্তু অঞ্জনা বলছিল, কেন মিথ্যে তাকে চাকরি দেবেন জ্যাঠাইমা, সে চাকরি করবার মানুষ! দুদিন পর পালিয়ে যাবে। না হয় কারুর সঙ্গে মারপিট করবে। না হয় মাতলামি করে, আমার লজ্জার আর শেষ রাখবে না। আমাকে দয়া করে কাছে রাখবেন, এতেই আমি বাঁচলাম। এই ঢের। সংসার আমার অদৃষ্ট নয়। আর ও আমি চাইনে। ও কাজ করবেন না। আমি বললাম—দেখি না! তখন বললে—দেখুন! আপনাদের কাছে আমার অপমান নেই; আর সবই বলে রাখছি যখন, তখন আমাকে এর জন্যে দায়ীও করবেন না, আপনারা। এর পর চাকরি দেব বলেছি দেব, কিন্তু বাড়ীতে তাকে ঢুকতে দেব কেন?

—তাহলে অঞ্জনার জন্যে আলাদা বাড়ী করে দিতে হবে।

আলাদা বাড়ীতেই যদি থাকবে, তাহলে এবাড়ীর ওইসব কাজ চব্বিশ ঘণ্টার কাজ, তা হবে কি করে? ধর ভোররাত্রে মঙ্গল আরতি। শয়ন হয় রাত্রি এক প্রহরের পর। তখন শয্যা-ভোগ দেওয়া, তারপর বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া, কারুর অসুখ থাকলে তাকে একবার দেখা।

বাধা দিয়ে বীরেশ্বর বলেছিলেন—তোমাকে কি বলব, বুঝতে পারছি না আমি। আমাকে দেখেও তুমি পুরুষ চরিত্র বুঝলে না ভবানী! পুরুষের মন বহুগামী। তোমার দাদা বিমলা-কান্ত দু-চারটেই হয়। তার বেশী হয় না। তার উপর ভূস্বামী, বলতে গেলে রাজা।

—ছিঃ! বলে উঠেছিলেন ভবানী! তুমি নিজে নিজের মুখে কালী মাখাচ্ছ, মাখাও। জোর করে মাখাচ্ছ। কিন্তু আমি তো জানি। সোফিয়াকে নিয়ে—। থাক ওসব কথা। নিজের ছেলেকে এত ছোট ভেবো না।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—ছোট আমি নিজেকে ভাবিনে কোনদিন। তবে ভয় আমার ওই অভিসম্পাতের, তোমার বাবা—

শিউরে উঠে ভবানী দেবী বলেছিলেন—না। আমি তার জন্য সাধনা করেছি, না তা হবে না।

বীরেশ্বর হেসেছিলেন, বলেছিলেন—ভাল।

কথাগুলো আড়াল থেকে শুনেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। এবং নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন।

বাপের উপর ক্রোধ হয়েছিল তাঁর!

তিনি ডায়রীতে লিখেছেন—"পিতার বাক্যগুলি অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হই নাই। সারাটা জীবনই তিনি অকারণে সকলকে সন্দেহ করিয়া গেলেন। আমার মাতৃদেবী যিনি সাক্ষাৎ দেবী, সারাটা জীবন যিনি তপস্বিনী, তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমার সাধু-প্রকৃতি চরিত্রবান মাতুলকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনি আমার উপর সন্দেহের আশঙ্কা পোষণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? তথাপি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কর্ণকুহর যেন দগ্ধ হইয়া গেল। যিনি সারাটা জীবন একজন বাঈজীকে লইয়া প্রমত্ত থাকিলেন, কি বলিব, অন্তরে অন্তরে সময়ে সময়ে দাবানল সদৃশ অনল-জ্বালা অনুভব করিয়া থাকি, যখন মনে পড়ে সোফিয়া বাঈয়ের মোহ আজও তাহার অন্তরে ঘৃতলোভী অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। সোফি বাঈয়ের পরিবর্তন হইয়াছে অনেক। তাহার চরিত্রের বরং প্রশংসা করি, মদীয় পিতাকে সে প্রায় স্বামী জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতলহরী শুনাইয়া তৃপ্তিদান করে, উত্তম পান সাজিয়া দেয়। তাহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু পিতাকে কি বলিব? এমত চরিত্র ব্যক্তি, এমত সন্দেহ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আমার চরিত্রবল তাঁহাকে এবং সকল জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিব। ওই অভিসম্পাতকে আমি ব্যর্থ করিব। পাপ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

"অঞ্জনা সরস্বতী বধূর নিকটই থাকিবে। এই বাড়ীতেই থাকিবে। এবং চব্বিশ ঘণ্টাই থাকিবে। রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।"

তাই রেখেছিলেন রত্নেশ্বর। অঞ্জনা স্বর্ণলতার কাছেই রইল। আরও মাস তিনেক পর কালীপুজোর পর বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন কলকাতা। সকলেই তাঁর সঙ্গে এসেছিল। রত্নেশ্বর, স্বর্ণলতা এমন কি অঞ্জনা পর্যন্ত।

রত্নেশ্বর বীরেশ্বরের জন্য খুব এলাহি ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিন্দর চাকর যেমন ছিল, তেমনি ছিল তামাক সাজা, কাপড় কোঁচানো, তেল মাখানো, গা-হাত-পা টেপা, সামনে হাজির থাকা ও তাঁর ওষুধ-পত্র ঠিক ঠিক সময়ে দেবার জন্য সে কালের কম্পাউণ্ডারী-জানা একজন লোক নিযুক্ত করেছিলেন; বীরেশ্বরের খাবার ভার ভবানী দেবীর উপর; সোফিয়া তাকে গান শোনাবে। পান সেজে দেবে। আর ভবানী দেবীর পরিচারিকা ছিলেন দুজন। একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা, প্রৌঢ়া বিধবা। আর একজন কলকাতার বড় লোকের বাড়ীর উপযুক্ত একটি ঝি। এ ঝি খুঁজে দিয়েছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীর জ্যাঠাইমা জগদ্ধাত্রী দেবী।

রত্নেশ্বর রায় কলকাতায় এসে প্রায় মাস দুয়েক থেকে ফিরেছিলেন কীর্তিহাটে। কার্তিকের মাঝামাঝি এসে ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে।

পৌষ মাসে কিস্তী আসছে, বাংলা দেশের জমিদারদের পৌষ থেকে চৈত্র চারটে মাস সমারোহের মাস। জমিদারী সেরেস্তায় যত কাজ হয়, তার বারো আনা কাজ এই চারটে মাসে। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের খামারে ধান উঠছে। ধান ঝাড়াই হচ্ছে। পৌষ থেকেই আলু। আখ মাড়াইয়ের মরসুম মাঘ থেকে। তার সঙ্গে ছোলা-মসুর-গম, নানান রবি ফসল। চৈত্রে তিল। এই কটা মাসেই জমিদারীর খাতায় জমার অঙ্ক হাজারে হাজারে।

মহালে মহালে গোমস্তা সেরেস্তা পেতে বসেই থাকবে। পাইকেরা নিত্য প্রজার দরজায় দরজায় তাগিদ দিয়ে ফিরবে।

জমিদারবাড়ীর লক্ষ্মীর ঘরে বড় চৌকো ত্রিশ-চল্লিশ মণ ভারী আয়রণ চেস্টগুলো প্রায় নিত্যই খোলা হবে একবার করে। তাতে টাকা পড়বে ঝঙ্কার তুলে। জমিদারের কাছারী চলবে, সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত, আবার সন্ধ্যের পর থেকে। দশটা-বারোটা যেদিন যেমন। আটটার পর থেকে অবশ্য সেরেস্তায় কর্মচারীরা কলম পেষে, জমিদার বসেন তাঁর আসর ঘরে।

শতরঞ্চের উপর সাদা ধবধবে চাদর; তার উপর পুরু দামী গালিচা, চারিপাশে বড় বড় তাকিয়া। রূপোর আলবোলা, তাওয়া দেওয়া কল্কে; রূপো বাঁধানো হুঁকো, হুঁকোদানের উপর বসানো থাকে।

গ্রামের যাঁরা ওরই মধ্যে সম্ভ্রান্ত, তাঁরা আসেন। নানান আলোচনা হয়। বেশীর ভাগ গ্রামের সমাজ নিয়ে। কোনদিন খোস-গল্প হয়। উচ্চ হাসিতে সব গমগম করে ওঠে।

কোন কোন দিন গানের মজলিস বসে। মধ্যে মধ্যে ওস্তাদ এসে হাজির হন। মাঘ মাসের সারা মাসটা মায়ের সামনে নাট-মন্দিরে ভাগবত পাঠ হয়। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এসে গোটা নাটমন্দিরটা ভরিয়ে দিয়ে বসে।

সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাট যদি কখনও অচির ভবিষ্যতের মধ্যে যাও সুলতা, তাহলে তোমাকে নাটমন্দিরটা দেখিয়ে খুশী হই, তুমিও খুশী হও, তা বলতে পারি। মনে পড়ে গেল বলে, না বলে পারলাম না। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরটার চারদিক ভাগ করা ছিল আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে। কালীমন্দিরে বিরাট বারান্দাটায় বসত ভদ্রঘরের মেয়েরা, তারা বর্ণেও উঁচু। এক পাশটা ব্রাহ্মণ, অন্য পাশটায় বৈদ্য-কায়স্থ থেকে অন্যেরা। চার-পাঁচটা বারান্দাবরাবর লম্বা সিঁড়ি আছে পর পর, গ্যালারীর মত, সেখান পর্যন্ত। তারপর একটা রেলিং, তার এধারে পুরুষ-মহল, সেও ভদ্র উচ্চবর্ণ। আর তিন দিকটায় যাদের এখন নাম হয়েছে হরিজন, তারা এবং মুসলমান, কৃশ্চান।

সুলতা বললে—খৃশ্চান?

সুরেশ্বর বললে—গোয়ানদের ভুলে যাচ্ছ। ওই হিলডা বুড়ীর পাড়ার লোক।

—এরা ভাগবত শুনতে আসত?

—না, ভাগবত শুনতে আসত না; যাত্রা হলে শুনতে আসত, বাঈ নাচ, খেমটা নাচ হলে আসত। আর আসত গল্প শুনতে।

বিস্মিত হয়ে সুলতা বললে—গল্প শুনতে?

—হ্যাঁ সুলতা, গল্প শুনতে। ভাগবত কথকের মত সেকালে গল্প কথক ছিলেন, যিনি গল্প বলতে, আসর পাতলে পনেরো দিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেন একটি গল্প।

—বল কি?

—হ্যাঁ। এঁদের বোধহয় শেষ জনকে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি পাঁচ দিন গল্প বলেছিলেন। এই কীর্তিহাটের ছবির কড়চায় একটা বিশেষ ছবি। গল্পগুলো বেতাল

পঞ্চবিংশতি বা কথা-সরিৎসারের মত। একটা গল্প শুরু করে, তার থেকে ফ্যাকড়া বের করতেন, পাঁচ-ছয়-সাত থেকে পনেরো পর্যন্ত, তারপর শেষ দিনে প্রথম গল্প শেষ হত! কিন্তু সে থাক, এখন ১৮৬০ সালে ফিরে চল। ১৮৫৯ সালের নভেম্বরের প্রথমেই বীরশ্বর রায় কীর্তিহাট থেকে গেলেন কলকাতা ; ব্যবস্থা হল, সদলে যাবেন তীর্থ দর্শনে, চাকর, ঠাকুর, ঝি, সরকার নিয়ে ভবানী দেবী এবং তিনি ঘুরতে যাবেন তীর্থ ; তখন রেললাইন বসে গেছে মোটামুটি। যেখানে হয় নি, সেসব জায়গায় নৌকো কিম্বা পালকি, রয়েল গাড়ী নিয়ে ঘুরবেন। সোফিয়া বাঈ সুদ্ধ সঙ্গে গিছলেন, তিনি দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় তসলীম রাখবেন, আজমীঢ় শরীফ যাবেন।

মনে তাঁর ইচ্ছে আজমীঢ় শরীফ থেকে আর ফিরবেন না।

রত্নেশ্বর রায় ফিরেছিলেন পৌষের দশ তারিখে, ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর।

তিনি অগ্রহায়ণের শেষে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর সস্ত্রীক প্রথম কলকাতায় গিয়ে কলকাতার বড় বড় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন। কারণ বীরেশ্বর রায় কলকাতায় এসে ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বড় বড় বাড়ী যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, নিমন্ত্রণপত্র চলত, তাঁদের নিমন্ত্রণ করে একটা বউভাত করেছিলেন ; যার খরচ আট হাজার টাকা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে নৃত্য-গীতও ছিল, একথা সহজেই, অনুমান করতে পার। এর পর বড় বড় বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ আসতে শুরু করেছিল এ-বাড়ীতে, বর-বধূর। অনেক বাড়ীতে সপরিবার নিমন্ত্রণ। শুরু হয়েছিল জোড়াসাঁকোর জগদ্ধাত্রী দেবীর বাড়ী থেকে। রাণী রাসমণির বাড়ী থেকে উপঢৌকন এসেছিল। ও বাড়ীতে বীরেশ্বর রায় সস্ত্রীক পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে রাণীকে দেখাতে গিয়েছিলেন। জানবাজারের বাড়ীর জমি দানের জন্যও বটে, আর রাণীর মহিমময়ী চরিত্রের জন্যও বটে, তাঁর উপর বীরেশ্বর রায়ের শ্রদ্ধা ছিল অগাধ।

এর মধ্যে আবার নতুন জুড়ি কেনা হয়েছিল। এবার কালো ঘোড়া নয়, সাদা এক জোড়া ওয়েলার, দাম দেড় হাজার টাকা এবং গাড়ীটা ল্যাণ্ডো। সেই গাড়ীতে চড়ে রত্নেশ্বর কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়িয়েছিলেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনও পর্যন্ত অল্প। ছেলেবেলা বালক বয়সে বিমলাকান্তের সঙ্গে এসে বছর খানেক কি তার কম কলকাতায় ছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিলেন কাশী। ফিরেছিলেন দীর্ঘকাল পর ; তখন তিনি যুবা। অনেক কাণ্ডের পর বাপের সঙ্গে পরিচয় এবং পুনর্মিলনের পর রুগ্ন বীরেশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় এসে মাস চারেক ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে পুরো এক মাস তাঁকে জামীনে খালাস থাকতে হয়েছিল। সে সময় তিনি বের হন নি। এবার স্ত্রীকে নিয়ে নতুন ল্যাণ্ডো গাড়ীতে, নতুন সাদা জোড়া ঘোড়ায় জৌলুষ ছড়িয়ে বের হতেন। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং স্ট্র্যাণ্ড রোডের গঙ্গার ধার থেকে লাটসাহেবের বাড়ীর চারিদিক থেকে সিঁথিতে এখন যেটাকে চিড়িয়ার মোড় বলে সেখানে কোন সাহেবের চিড়িয়াখানা পর্যন্ত ঘুরে দেখেছিলেন সেবার। তাঁদের সঙ্গে থাকত অঞ্জনা। তার কাছে থাকত খাবারের কৌটো, জলের কুঁজো, পানের বাটা, কোচ বক্সে কোচম্যানের পাশে মহাবীর সিং দারোয়ান, তার কোমরে সরকারী লাইসেন্সে বলীয়ান তলোয়ার। পিছনে জোড়া-পোশাক পরা সহিস।

তখন কলকাতায় নতুন যুগ। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির পর থেকে ইংরেজের প্রতাপে কলকাতা, যে বনে বাঘ থাকে সেই বনের মত হয়ে অন্য জন্তুর উপদ্রব থেকে শান্ত হয়েছে।

তুমি হয় তো জান, তবুও পুরনো কলকাতার কথা আমার কড়চায় আছে বলেই বলছি, পুরনো কলকাতা ১৮৫৭ সালের আগে খুব শান্ত ছিল না। হুতোমের নক্সায় এর পরিচয় আছে। মোয়, খেলায়, পথে-ঘাটে ১৮৫৭ সালের আগে নানান উপদ্রব ছিল।

সমাচার দর্পণে ১৮৪০ সালের একটা খবরের কথা রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন এই প্রসঙ্গে। বারোয়ারীর পাণ্ডারা নানান অত্যাচার করত। বিশেষ করে সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকলে লাঞ্ছনার সীমা থাকত না।

দর্পণের খবরটা বেহালা সম্পর্কে। সেটা এই—"মান্য সাবর্ণ মহাশয়দিগের যুবা সন্তানেরা বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের ডুলী পালকী দৃষ্টিমাত্রেই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাতে অবাক্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত, তাহাই কহিতেন, তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল টাকা-পয়সা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন।"

সুলতা বললে—মনে পড়েছে, পেটন সাহেব নামে একজন দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট মেয়ে সেজে পালকি চড়ে বেহালায় এসেছিলেন। এরা জবরদস্তি করে পালকির দরজা খুলতেই সাদা গোখরোর মত বেরিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট পেটন।

—হ্যাঁ। পেটন সাহেব সেবার সায়েস্তা করলেও পুরো সায়েস্তা হয় নি। হুতোমের কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৪১ সালে, তাঁর নক্সায় আছে, তাঁর আমলে একবার এক বারোয়ারী-তলার প্রতিমার সিংহ ভেঙেছিল আনবার সময়। সেই সিংহ মেরামতির জন্যে টাকা চাই। তারা পরামর্শ করে আটকে ছিল এক বিশিষ্ট সিঙ্গি মশায়কে। চাকুরে মানুষ। আপিস যাবেন। তাকে পথে আটকে ধরেছিল মায়ের সিঙ্গির পা ভেঙেছে, এখন সিঙ্গি কোথায় পাই, আমাদের উপর স্বপ্ন হয়েছে, আপনাকে এনে বসাতে হবে, মা দুর্গার পায়ের তলায়। সিঙ্গি মশায় মেরামতি খরচ দশ টাকা জরিমানা দিয়ে রেহাই নিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৮৫৭ সালে মিউটিনী দমনের পর ইংলণ্ডেশ্বরী যখন ভারতেশ্বরী হলেন, তখন কলকাতার ওই হাল পাল্টাল! ইংরেজের ভয়ে তখন ফণা গুটিয়ে গর্তে ঢুকেছে সব।

তবু রত্নেশ্বর রায় দারোয়ান ছাড়া যেতেন না কোথাও। প্রয়োজন হলে একজনের জায়গায় দুজন নিতেন।

ডায়রীতে লিখেছেন—"দারোয়ান ইত্যাদি লইয়া অদ্য চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিলাম। দুইজন দারোয়ান লইয়াছিলাম। কলিকাতার এক শ্রেণীর ইতর গুণ্ডা ও উচ্ছৃঙ্খল ভদ্র যুবকের কথা শুনিয়াছি। আমি নিজেও সবল শক্তিমান। কাশীতে থাকিয়া কুস্তী করিয়া দেহ পাকাইয়াছি। কিন্তু কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। সকল জীবজন্তু দেখিয়া নিরাপদে ফিরিলাম। অদ্যকার এই ভ্রমণ বড়ই আনন্দসহকারে উপভোগ করিয়াছি। একটি দৃশ্য দর্শন করিয়া চিত্তে রোমাঞ্চকর ভাবের উদয় হইল। এক জোড়া সবল ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রীর প্রেমলীলা

দেখিলাম, ব্যাঘ্রটি ব্যাঘ্রীকে কামড়াইতেছে, ব্যাঘ্রী তাহাকে থাবা মারিয়া প্রতিহত করিয়া গর্জন করিয়া যেন শাসন করিয়া কহিতেছে, নির্লজ্জ পুরুষ কোথাকার, তোমার কি কোন প্রকার লজ্জাসরম নাই। এই এত লোকজনের সম্মুখে এসব কি হইতেছে।

আমার পার্শ্বেই স্বর্ণলতা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া আমি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে লজ্জায় মুখ নত করিল। আমি অগ্রসর হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, দেখিতেছ। সে বলিল—আঃ।

পিছন হইতে খুক খুক শব্দে কেহ হাস্য করিল। আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম অঞ্জনা হাস্য করিতেছে। সে সব লক্ষ্য করিয়াছে।"

গাড়ীতেও সামনের সিটে বসে অঞ্জনা বারবার মুচকে-মুচকে হাসছিল। স্বর্ণলতা দেবী রাঙা হয়ে উঠেছিলেন।

অঞ্জনা বলেছিল—এই আমি মুখ ফিরিয়ে উল্টো মুখে বসছি ভাই বউ। তাছাড়া ননদদের আড়ি পেতে শোনা চিরকালের। ওরা দেখলেও দোষ নেই, শুনলেও দোষ নেই। ছোটদাদা আমার চকোরের মত চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি ভাই চাঁদ, মেঘের আড়ালের মত ঘোমটাটা সরাও।

সে সত্যিই মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

স্বর্ণলতা সুযোগ পেয়ে রোষকটাক্ষে শাসন করেছিলেন রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর সেই গাড়ীর মধ্যেই হা-হা শব্দে হেসে উঠেছিলেন।

অঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে বলেছিল—লজ্জা ভাঙল ?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—অঞ্জনা, ঠিক বাঘিনীর মত তাকালে রে, হাতে আমায় আবার চিমটী কাটলে।

অঞ্জনাও খিলখিল করে হেসেছিল। এবার স্বর্ণলতাও খুক-খুক করে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছিলেন।

বাড়ীতে এসেই দেখেছিলেন, কীর্তিহাটের খবর এসেছে। সেখানে ফিরতে হবে। সামনে বড়দিন। ভেটের ব্যবস্থা যাবে কলকাতা থেকে। তার কেনাকাটা আছে। এবং ছোট হুজুরকে যেতে হবে, মেদিনীপুরে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। হুজুরের শ্বশুর বলে দিয়েছেন, রত্নেশ্বর যেন আসে। বেয়াই মশাইয়ের কাল গেছে। এখন জেলার কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরমটাই সব থেকে বড় কথা। আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন নতুন কালে নতুন চাল।

তা ছাড়াও বড় খবর ছিল, এবার শ্যামনগরের দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রী করতে রাজী হয়েছে। তারা একবার ছোট হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু কথাবার্তা বলতে চায়।

খবর নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরদাস পাল। বিয়ে করে তিনি চলে গিয়েছিলেন শ্যামনগর। শ্যামনগর বিক্রীর চিঠি তিনি এনেছেন। তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

সুলতা বললে—রত্নেশ্বর নিজের পতনের ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন। মানুষ তাই করে। তবে দোষ তিনি ষোল আনা অঞ্জনার ঘাড়েই চাপিয়ে গেছেন নিশ্চয়।

সুরেশ্বর বললে—বারো আনা তো বটেই। তবে নিজের ঘাড়ে চার আনা নিয়েছিলেন—সে তাঁর ডায়রীতে আছে। সে তোমাকে প'ড়ে খানিকটা শোনালাম। পরে আরও আছে। কিন্তু আমার ক্রম ভেঙো না। ক্রমানুসারে বলে যাই বলতে দাও।

এই যে দীর্ঘ ইতিহাসটি বললাম—এটি কিন্তু সব জেনেছিলাম একদিনে।

১৯৩৭ সালের শেষ জানুয়ারী শীতের দিন, সকালবেলাতেই পুলিশ এসে বিমলেশ্বরকাকাকে ধরে নিয়ে গেল; অর্চনাকে তিনি বাঁচিয়ে কোমরে দড়ি প'রে হাতে হাতকড়ি পরে পুলিশের সঙ্গে গ্রাম ঘুরে দেখিয়ে গেলেন, রায়বংশের ঋণ তিনি শোধ করলেন। ঋণ শোধ করতে তাঁর বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি বিক্রী করেছেন, যে সম্মানটুকু ছিল তা বিক্রী করেছেন—অনুতাপ করেন নি।

কাকীমা আমাকে ডেকে বলেছেন—এর শোধ নেবে, তুমি আমাকে কথা দাও ভাসুরপো!

আমি কথা দিয়েছি। অর্চনা ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। তার কথা বিমলেশ্বরকাকার স্ত্রী, তাঁর জা অর্থাৎ অর্চনার মায়ের কাছেও প্রকাশ করেন নি। তিনি বর্ধমানের উকীলের মেয়ে, তিনি আইন বোঝেন। এবং দেশের অবস্থাটাও বোঝেন।

বাড়ীতে ফিরে এসে আমি গোপাল সিংয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী থেকে। মাঝখানে গ্রামের লোকেরা এসেছেন। প্রত্যেকে সেদিন সহানুভূতি জানিয়ে গেছেন। দয়ালঠাকুরদা—উকুকাকা এসে চোখের জল ফেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে গেছেন—শোধ নিয়ো।

বৃদ্ধ রঙ্গলাল মণ্ডল নিজে আসতে পারেন নি, শরীর তাঁর ভেঙে গেছে। তিনি বাড়ী থেকে বের হতে পারেন না, ওই কংগ্রেসের মিটিং যা অতুলকাকার কাণ্ড তার পর থেকে। রঙ্গলাল মণ্ডলমশায় সভাপতি হয়েছিলেন। পুলিশ যখন লাঠি চালায়, তখন অতুলকাকা নিজের দেহ দিয়ে তাঁকে ঢেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন, তবু আঘাত নিবারণ করতে পারেন নি। একটা লাঠির গুঁতো তাঁর কোমরে লেগে হাড় ভেঙে দিয়েছিল। তাঁকে এ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল, সেরে ওঠার পর প্রায় অক্ষম দেখে এবং বয়স দেখে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। লোকে বলে—তাঁর হয়ে তাঁর উকীল ছেলে একটা বণ্ড গোছের কিছু লিখে দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল বাপকে। অক্ষম রঙ্গলাল বিছানায় শুয়ে থাকতেন আর ওই উকীল ছেলেকে গালাগাল দিতেন। তাঁর বড় ছেলে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল—আমাদের বাড়ীর সামনে বিমলবাবুকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে গিয়ে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। লেফট রাইট লেফট রাইট বলে চেঁচিয়ে কনেস্টবলগুলোকে দিয়ে পা ঠুঁকিয়েছে। বাবাকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছিলাম। তাঁকে তো দেখেছেন—খুব চেঁচান তিনি! এখনও হাউমাউ ক'রে কাঁদছেন। আপনার কাছে পাঠালেন, বললেন—সুরেশ্বরবাবুকে বল গা গিয়ে এর শোধ যেন তিনি নেন।

আমার মনেও ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সেই ক্ষোভের বশেই ডায়রী পড়ছিলাম। বিচার করবার জন্য নয়; দেখছিলাম পূর্বকালের ঘটনার মধ্য থেকে কোথায় কোন ছিদ্রপথ পাওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে আইনের দড়ি পরিয়ে শিবু সিং এবং তার বাপ হরি সিংকে বাঁধতে পারি। কিন্তু পড়তে পড়তে কাহিনীর মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। যে তন্ময়তায় রত্নেশ্বর রায়ের

পূর্বকথা শেষ করে তার দিনলিপিতে এসে পড়ে পৌছুলাম রত্নেশ্বরের বিয়েতে, রায়বাড়ীর জীবননাটকে, অঞ্জনার প্রবেশে এবং বীরেশ্বর রায়ের প্রস্থানে।

সুলতা প্রশ্ন করলে—প্রস্থানে? মানে?

—তার অর্থ বীরেশ্বর রায় আর কীর্তিহাট ফেরেন নি। ওই গেলেন তিনি কীর্তিহাট থেকে কলকাতা। এবং তারপর কলকাতা থেকে তীর্থে।

—তীর্থে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর?

—না। বৈরাগী তিনি ছিলেন না। স্ত্রী ভবানী দেবীর জন্য দেবতার পুষ্প চরণোদক এও তিনি নিত্য খেতেন তাঁর হাতে, তাঁর জন্যেই তীর্থে ঘুরেছেন, দেবমন্দিরে গেছেন, দেখতে গেছেন নিজের আগ্রহে কিন্তু প্রণাম করেছেন স্ত্রীর ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছায় নয়। শুধু গয়াতে গিয়ে পিণ্ড দিয়েছিলেন নিজের আগ্রহে। থাক; এমনভাবে বলার থেকে গুছিয়ে বলি।

*　　　*　　　*

১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের আগেই ফিরলেন তিনি। সরস্বতীবউয়ের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ সুতরাং অঞ্জনার মত একটি চিত্তরঞ্জিনী চতুরা অতি সুকৌশলে তার মধ্যে নিজের ইচ্ছেগুলো সঞ্চারিত করে দিত।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—বিপদে পড়িলাম। কীর্তিহাট হইতে নায়েব এবং মেদিনীপুর হইতে পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় ওখানে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। গিরীন্দ্র আচার্য লিখিতেছেন—দে-সরকার শ্যামনগর বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। এমত সময় স্বর্ণলতা সরস্বতীবউ একরূপ আবদার ধরিয়াছে কলিকাতায় বড়দিন না দেখিয়া যাইবে না। এখানে অবশ্য কলিকাতা দেখিয়া বেড়াইতেছি আনন্দ করিতেছি, আমারও যৎপরোনাস্তি সুখ এবং আহ্লাদ হইতেছে। বিশেষ করিয়া পরিভ্রমণের সময় অঞ্জনা যেরূপ ননদোচিত হাস্যপরিহাসে আমাদের উভয়ের জীবনের আনন্দে চঞ্চল বায়ুপ্রবাহ হিল্লোলিত করিয়া তুলিতেছে তাহাতে সুখ ও আহ্লাদ যেন তরঙ্গিনীর তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু যে সব পত্রাদি পাইলাম তাহার পর আর কি করিয়া থাকা চলে? আমি সামান্য যুবক নহি; আমি কীর্তিহাটের রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারীই বা কেন, আমি অধীশ্বর। অদ্যই পিতা সকল পত্রাদি পাঠ করিয়া আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—।

বড়কর্তা বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বস; যা পত্র এসেছে তাতে তোমাকে দু-তিন দিনের মধ্যে কীর্তিহাট ফিরতে হবে। জরুরী কাজ। বিশেষ ক'রে শ্যামনগর। শ্যামনগর ক্রয় সম্পর্কে যা পত্র দেখছি তাতে মনে হচ্ছে দে-সরকাররা হয়তো বা কিছু কিছু সুবিধে চাইবেন। প্রতিশ্রুতি চাইবেন। হয়তো বা রাধানগর বাদ দিয়ে বাকী বিক্রী করতে চাইবেন। কিম্বা ওঁদের সম্পত্তি জোতজমা নিষ্কর বলে স্বীকৃতি চাইবেন দলিলে। মৌখিক প্রতিশ্রুতিও কিছু চাইবেন বলে মনে হচ্ছে আমার। আচার্য হয়তো দিতে চাইছেন না—চাইবেন না। আমি বলব দেবে। দেওয়া উচিত। তাঁরা নত হয়েই যখন চাচ্ছেন তখন দেবে। এগুলি হল রাজধর্ম। আমাদের দেশেও আছে, অন্যদেশেও আছে। আলেকজেণ্ডার পুরু রাজার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলেন সে তো জান। আমাদের দেশে অজস্র আছে। শাস্ত্রেরও এই নির্দেশ। সুতরাং তাঁরা

শ্যামনগর বিক্রী করছেন এইটেই আমাদের কাছে তাদের হার মানা। আমি হলে ওটা জলের দরে বিক্রী ক'রে দিতাম, কিন্তু যার সঙ্গে ঝগড়া তাকে দিতাম না। অবশ্য—

একটু থেমে হেসে বলেছিলেন—অবশ্য টাঁরা দে-সরকার অর্থগৃধ্ন, অল্পপ্রাণী লোক ; টাকাই তার কাছে সব। টাকা পেলে সে সব সইতে পারে। টাকার জন্যে সে সব করতে পারে। কিন্তু সে বিচার আমরা করব না।

রত্নেশ্বরের মন এতে সায় দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। এতে সম্পূর্ণ একমত আমি। যা আদেশ করলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

—হ্যাঁ। তবে সর্তগুলি যত্নসহকারে খুঁটিয়ে বুঝে দেখো। ওঁদের সম্পত্তি নিষ্কর এ আমরা দেব না। না। তা হতে পারে না। তা হ'লে প্রজা ঠিক হলেন না তাঁরা। মৌরসী ক'রে দিতে পার। খাজনা অন্ততঃ বছরে একটা টাকাও দিতে হবে। বুঝেছ!

—আজ্ঞে বেশ। তাই হবে।

—আর একটা কথা।

—আজ্ঞা করুন।

—দেখ—। শুরু করেও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—বাবা।

—হ্যাঁ বলছি। আর একবার ভেবে নিলাম। ভেবে দেখলাম। দেখ—আমি মনে মনে অভিপ্রায় করেছি যে তুমি সম্পত্তির ছ আনার মালিক হয়েই আছো বাকী দশ আনার মালিক এখনও আমি। তোমাকে আমার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছি। তুমিই সব করছ। কিন্তু—।

চমকে উঠেছিলেন রত্নেশ্বর। কিন্তু পরমুহূর্তেই বীরেশ্বর রায় যে-কথা বলেছিলেন সে কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—দেখ আমি স্থির করেছি—অনেক চিন্তা করেই স্থির করেছি, যে আমার অংশ আমি দানপত্র করে তোমাকে দিয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে চাই।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে রত্নেশ্বর বলেছিলেন—কেন বাবা? আমার কি কোন ত্রুটি—

—না—না। তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। তার জন্য নয়। কথা হল কি জান, এই যে কালটা এল, এটা সম্পূর্ণ নতুন কাল। এ কালের জমিদারী চালনা সে কালের প্রথায় চলবে না। জমিদারীকে যে অর্থে রাজত্ব বলতাম তা আর রইল না। ১৮৫৯ সালে যে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন হ'ল সে আইনে জমিদারের আসল অধিকারই চলে গেল। কীর্তিহাটে যে আদেশ তুমি কাছারীতে জারী করেছ তা খুব কালোচিত হয়েছে। প্রথমটা শুনে আমার ক্ষোভ হয়েছিল। পুত্র সকলেরই সমান রত্নেশ্বর, কিন্তু তুমি আমার কি তা অবশ্যই অনুমান করতে পার। সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাওয়া নিধি। বিচিত্র কৃপায় ফিরে পেয়েছি তোমাকে।

রত্নেশ্বর ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার মনে হইতেছিল আমি যেন স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি, ইচ্ছা হইতেছিল আমার এই হিমালয়তুল্য পিতৃদেবের চরণতলে লুটাইয়া পড়ি।"

বীরেশ্বর বলেছিলেন—মিথ্যা গোপন তোমাকে করব না। তোমার শ্বশুরমশায় কথাটা

বলে গিয়েছিলেন—বেইমশাই কালটা বড় কঠিন পড়ল, আগের কাল গেল। কোম্পানী মানে বেনের দল আর দেশের মালিক রইল না, বৃটিশ ক্রাউন হল মালিক। এবার আর ঘুষের রাজত্ব রইল না। লাভের জন্যে যা খুশী তাই করার কাল রইল না। এবার মহারাণীর রাজত্ব, এ রাজত্বে বামুন চণ্ডাল জমিদার প্রজা ধনী দরিদ্র সব এক আইনের ফাঁসে বাঁধা পড়ল। নতুন এ্যাক্টটা পড়ে দেখুন। তখনও ঠিক আমলে আনি নি। তুমি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে নতুন হুকুম জারী করলে; শুনে একটু লাগল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে না একবার? তারপর এখানে এসে এ্যাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা হল কালীপ্রসন্ন সিংহীমশায়ের সঙ্গে, তিনিও বললেন—আরে মশাই আগের কালে তলবমাত্রে প্রজার হাজিরানা ছিল কম্পালসারি। না এলে আপনি সিপাই পাঠিয়ে প্রজার ঘাড়ে ধ'রে আনতে পারতেন। আর তা পারবেন? অবিশ্যি রামাশ্যামাকে পারবেন। কিন্তু আমাকে পারবেন? আবার রামার পিছনে আমি দাঁড়ালে পারবেন? এ তো মশাই জুতো জামা পরা ঘোড়া হাতী চড়া গোমস্তাগিরি! জমিদারীর আর রইল কি? কথাটা ঠিক। আর ওতে আমার দরকার নেই রত্নেশ্বর। জমিদারী তোমাকে আমি দান করব। কলকাতার বাড়ী, আর নগদ টাকা আমার অংশের চার লক্ষের মধ্যে দু লক্ষ টাকা—এই আমার থাকবে। ওতেই আমি বেড়াব তীর্থ—নানা স্থান। বাস। পরমায়ু আমার বেশী দিন নেই। আমি বুঝতে পারছি। বাকী ক'টা দিন আনন্দ করে কাটিয়ে দেব। আমার অন্তে আমার উইল অনুযায়ী চাকরবাকরকে কাউকে পাঁচশো কাউকে হাজার কাউকে একশো দিয়ে যা থাকবে তার থেকে সোফিয়াকে পাঁচ বা দশ হাজার টাকা এবং জীবন স্বত্বে ওই এলিয়ট রোডের বাড়ী দেব। এবং অবশিষ্ট সবের মালিক হবেন তোমার গর্ভধারিণী।

স্তব্ধ হয়ে সব শুনেছিলেন রত্নেশ্বর।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি আপত্তি করো না। এ তোমার জন্যেই করছিনে আমি। আমার জন্যেই করছি—রায়বংশের জন্য করছি। বুঝেছ। রায়বংশের জন্য। অবশ্য সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের বাইরের যা সম্পত্তি তাও আমি দেবোত্তর করে তোমাকেই তার সেবাইত করে দানপত্র করব। তুমি মালিক হবে সেবাইত সূত্রে। কোন সর্ত আমি আরোপ করব না। শুধু দেবত্র সম্পত্তি রইল দেবতার নামে। তাঁর সেবা চালিয়ে বক্রী আয় তুমি তোমার পছন্দমত খরচ করবে। আমি অপব্যয়ী। আমি বাল্যকাল থেকে ক্রোধীও বটে। এই গোমস্তাগিরির বড়লোকপনা এ আমার সইবে না।

সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে একটি বিস্ময়কর কথা আছে, সুলতা, সেটি বলি। সেটি না বললে রায়বংশের জবানবন্দী কীর্তিহাটের কড়চা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে কথা ভবানী দেবীর কথা।

এই জানবাজারের বাড়ীর বড় হলঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল পিতাপুত্রে। পাশের ঘরটা ছিল ভবানী দেবীর পূজার ঘর—নিজের ঘর। পাশেই ছিল ওদের শোবার ঘর। ওদিকের দক্ষিণ-পূব খোলা ওই ঘরখানা। ভবানী দেবী পূজায় বসে সব শুনেছিলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওঘর থেকে পূজার একটি জবাফুল এবং বিল্বপত্র হাতে ক'রে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

পিতাপুত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। ঠিক গোপন করবার জন্য নয়। তার উপস্থিতিতে ঠিক এইসব কথা যেন স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে কওয়া যেত না।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—মাতৃদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আর তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতকরতঃ পিতৃদেব স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার দিকেই তাকাইয়া রহিলাম। এই পূজার পর তাঁহার যে মূর্তি হইত তাহা এক আশ্চর্য বিস্ময়জনক মূর্তি। মনে হইত তিনি যেন মানবী নহেন কোন অপার্থিব দেবীমূর্তি। তিনি আসিয়া পিতার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেব হস্ত প্রসারণ করিতেই তিনি পূজার জবাপুষ্প ও বিল্বদল তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। পিতৃদেব তাহা মস্তকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া স্বকীয় উপাধানের তলদেশে রাখিলেন। অতঃপর মাতৃদেবী বামহস্তের রৌপ্য ঘট হইতে কুশী করিয়া ইষ্টদেবীর চরণোদক তাঁহাকে পান করাইয়া কহিলেন—তুমি যাহা ধারণা করিয়াছ তাহা কদাপি ফলবতী হইবে না। বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

পিতা কহিলেন—কি মনস্থ করিয়াছি কোন কথা বলিতেছ?

—তোমার উইলের কথা!

—হাঁ। বলিতেছিলাম বটে। তুমি তাহা শুনিতে পাইয়াছ?

—পাইয়াছি। শুনিয়া মন চঞ্চল হইল। কিন্তু মা বলিলেন—চঞ্চল হইস না ইহা কদাপি সত্য হইবে না।

পিতা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—উইল করা হইয়া উঠিবে না?

—না। উইল তুমি করিবে। কিন্তু যাহা মনে করিতেছ তাহা হইবে না। তোমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং অর্থ ভোগ করিবার জন্য ভবানী কদাপি জীবিত রহিবে না। আমি অগ্রে যাইব। তুমি আমার বিরহে উন্মত্তবৎ হইবে। সতীহারা শিবের মত তোমাকে হাহাকার করিতে হইবে।

পিতৃদেব হাস্য করতঃ বলিলেন—অতঃপর কি হইবে। তুমি উমা রূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া আবার আমার গৃহে আসিয়া আমাকে সংসারী করিবে!

মাতৃদেবীর অধরে শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রমার মত ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—না। এতটা হইবে না। তবে তোমাকে—। তিনি নীরব হইয়া গেলেন। তৎপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিলেন—তাহা তোমাকে আমি বলিব না। অন্ততঃ আজ বলিব না। আমি যেদিন যাইব সেইদিন বলিব। আমি শুধু বলিতেছি যে, তোমার উইলের মধ্যে আমার নাম উল্লেখ করিয়া ওই সকল কথা লিখিয়ো না। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। এ সংসারে ভাবনা আমার তোমার জন্য।

অকস্মাৎ তাঁহার আয়ত নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দরদর ধারায় তাহা নির্গলিত হইয়া দরদর ধারে তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিল।

পিতৃদেব অত্যন্ত অভিভূত হইয়া গেলেন, বলিলেন—তুমি ক্রন্দন করিতেছ—সতীবউ?

মাতা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে-মূর্তি অপরূপ। এমন কদাচ নিরীক্ষণ করিয়াছি। মুখমণ্ডল যেন ঈষৎ ঊর্ধ্বে তুলিয়া তিনি কোন অদৃশ্যলোকের দিকে

তাকাইয়া আছেন। এবং সেখানে যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম—মা।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—রত্ন বাবা, তাঁহার ভাগ্যে আমার জন্যই দুঃখ-ভোগ রহিয়াছে। তুমি আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমার অবর্তমানে উনি যাহাই করুন, তুমি কদাচ তাঁহাকে অভক্তি করিবে না। অবহেলা করিবে না।

আমি কহিলাম—সে কি মা? এমন বাক্য তুমি কেন কহিতেছ? আমি কি নরাধম? আমি কি মনুষ্যত্ববর্জিত?

মাতৃদেবী কহিলেন—না বৎস, তুমি অতি কঠোরচেতা ন্যায়বান বলিয়াই এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়াও আরও একটি কথা রহিয়াছে। তোমরা ধনবান, তোমরা ভূসম্পত্তিশালী রাজতুল্য ব্যক্তি। তাহাদের মধ্যে এমতপ্রকারের মতিভ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। পূর্বে রাজাদের বাদশাহদের মধ্যে এরূপ ঘটনা নিরন্তর ঘটিয়াছে। আজও ধনসম্পত্তি লইয়া পিতাপুত্রে মনোমালিন্যের অবধি নাই।

বলিয়া তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পিতা সকরুণ হাস্যসহকারে বলিলেন—উঁহার কথা তুমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিয়ো না রত্নেশ্বর। দেবতা-দেবতা, ধর্ম-ধর্ম করিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সকল সময় সুস্থ থাকে না। বিশেষ করিয়া পূজা করিয়া উঠিবার অব্যবহিত পরই। অনেক সময় তিনি এইরূপ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন।

অতঃপর—।

তারপর রত্নেশ্বর তার ডায়রীতে এদেশের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের অজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। বলেছেন—এইসব 'ভর' দেবাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্ট হওয়ার মতই মানসিক বিকার। মা যে বারো বৎসর ব্রত করেছিলেন, তাতে কি তার বাপের পাপের খণ্ডন হয়েছে? —হয়নি। এইসব অলীক বিশ্বাস আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমি এসব থেকে দূরে থাকব।

যাক, এইবার যা ঘটল, তাই বলি। রত্নেশ্বর রায় ফিরে এলেন কীর্তিহাট। কলকাতা থেকে হুইস্কী-ব্র্যাণ্ডির কেস এল, টার্কী ফাউল, তার সঙ্গে ডজন দরুণে দেশী মুর্গী, ভাল দেখে ভেড়া, দেশী কলকাতার মিষ্টান্ন। বিভিন্ন সাহেব-অফিসারদের এবং তাঁদের স্ত্রীর জন্যে সোনার ঘড়ি, সিল্কের থান, গরম কাপড়ের থান, মূল্যবান লেডীজ শাল এল। বিশেষ ব্যবস্থা করে কলকাতা থেকে সাহেবদের প্রিয় ফুল, তা-ও আনানো হয়েছিল। তবে সেগুলো মেদিনীপুর শহর পর্যন্ত পৌঁছুতে তাজা থাকেনি।

রত্নেশ্বর রায় চোগা-চাপকাম পেণ্টালুন পরে মাথায় শামলা লাগিয়ে বুকের উপর কাটাকাটি চিহ্নের মত খাঁজে কাশ্মিরী শাল ফেলে সাহেবদের বাংলোয় বাংলোয় বড়দিনের ভেট দিয়ে সাহেবদের অজস্র ধন্যবাদ নিয়ে কীর্তিহাটে ফিরে এসেছিলেন।

ওদিকে শ্যামনগর কেনা হয়ে গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় যা বলেছিলেন, তাই সত্য হয়েছিল।

ট্যারা দে-সরকার নিজে এসেছিলেন হুগলী শহর। শ্যামনগর হুগলী জেলা। সেখানে কীর্তিহাটের রায়েদের এস্টেটের সেরেস্তা ছিল, নিজের বাড়ী কিনেছিলেন। একটা সে-আমলের পুরনো ওলন্দাজদের কুঠী। সেই বাড়ীতে ট্যারা দে-সরকার ভাঙা হাত নিয়ে পুত্রের হাত ধরে এসে রত্নেশ্বর রায়ের সামনে প্রথম হেঁট হয়ে নমস্কার করে বলেছিলেন—বৈষ্ণব হয়ে তুলসীপত্র একটিকে ছোট দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি বাবা। মনে হয়েছিল, তুলসীপাতা নয়, পুদিনার পাতা। পায়ে মাড়িয়ে গেলাম, একটু ঠাওর করেও দেখলাম না। তা ডান হাতখানাই ভেঙে গেল!

আচার্য ছিলেন, তিনি বলেছিলেন—হবে। আবার ডান হাত হবে দে-সরকার। পায়ে-মাড়ানো তুলসীপাতা মাথায় তুলে ধরলে যখন তখন আবার হবে। তবে ওই কিঞ্চিৎ বেঁকে থাকবে।

—হবে? আচার্যমশায়—বলছেন—আবার হবে?

—হবে বৈকি? সত্যনারায়ণের পাঁচালী তো শুনেছ? সেই যে বণিকের মেয়ে সত্য-নারাণের প্রসাদ নিয়ে খেতে যাবে এমন সময় খবর এল—নদীর ঘাটে বাপ-স্বামী সাতখানা বোঝাই নৌকো নিয়ে ফিরেছে, অমনি—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে থাকা কি মুখস্থ আছে। 'পাক দিয়া ফেলে রামা হস্তের প্রসাদ।'

—হ্যাঁ, অমনি নৌকোসমেত স্বামী ঘাটের মুখে বারকয়েক বোঁ বোঁ করে ঘুরে ভুস করে জলের তলায় চলে গেল। ঘাটের জলের উপর শুধু বুক বুক করে বুক-বুকি উঠল। তার দৈববাণী—'আমার প্রসাদ ফেলে কোন্ অহঙ্কারে?' যা—এখন মাটি শুধু চেঁচে তুলে খা। তাহলে স্বামী নৌকো উঠবে। তা সে মেয়েটা খেয়েছিল, আর স্বামীসমেত নৌকো যেমন ভুস করে ডুবেছিল, তেমনি আবার হুস করে উঠেছিল। হবে আবার তেমনি হবে।

রত্নেশ্বর এঁদের এই বিচিত্র কথোপকথন কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন। কথা-গুলো তিনি ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।

আচার্য দে-সরকারদের কাছে হাজারদুয়েক টাকা গোপন দালালী পেয়েছিলেন, সে-খবর রত্নেশ্বর রায়ের কাছে গোপন ছিল না। তিনি মুখে কিছু বলেননি। দে-সরকার যখন তার সম্পত্তি নাখরাজ করে নেবার প্রস্তাব জানিয়েছিলেন, আচার্য তা সমর্থন করেছিলেন প্রকারান্তরে। কিন্তু সে নামে। তিনি রত্নেশ্বরকে চিনেছিলেন। রত্নেশ্বর রায় বীরেশ্বর রায়ের উপদেশ মনে করে সম্পত্তি মোকররী-মৌরসী করে দিয়েছিলেন—বিঘার দু' আনা খাজনা। মোট খাজনা খার্য হয়েছিল বত্রিশ টাকা কয়েক আনা। আচার্য বলেছিলেন—ওঁদের ভিটে দেবতার ঘর—এগুলি সম্বন্ধে আমি বলি—নাখরাজ করে দেওয়া হোক।

দলিল হয়েছিল বিমলাকান্তের নামে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর দুটো দলিল হয়েছিল—পাট্টা আর কবুলতি। জমিদার বিমলাকান্ত শ্যামনগর-রাধানগর পত্তনী বিলি করেছিলেন কীর্তিহাটের মা আনন্দময়ীর সেবায়েত বীরেশ্বর রায় এবং রত্নেশ্বর রায়কে।

শ্যামনগরের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, সদ্গোপ-মাহিষ্য বাসিন্দারা চব্বিশপ্রহর হরিনাম উৎসব করেছিল—বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল! দে-সরকারদের বাড়ীতে বিগ্রহের

সামনে হরিবোল দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ধ্বনি দিয়ে গিয়েছিল—বল হরি—হরি বো—ল!

একমাস পরে আবার কলকাতা থেকে পত্র এসেছিল।

"তুমি অবিলম্বে বধূমাতাকে লইয়া এখানে আসিবে। মাঘ মাস শেষ হইতে চলিল। আশা করি ইতিমধ্যে আদায়পত্রের কার্যাদি সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়াছে। আমরা ফাল্গুনের প্রথমেই পশ্চিম যাত্রা করিতেছি। তোমাকে যে-সকল দলিলের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা এ্যাটর্ণী প্রস্তুত করিয়াছেন। তুমি আসিলেই রেজেস্ট্রি হইবে। মাসীমাতাকে বলিবে—তিনি যদি তীর্থে যাইতে চান, তবে আসিতে পারেন। অঞ্জনার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু মাসীমাতা থাকিবেন না, সুতরাং তাহার যাওয়া হইবে না। মাসীমাতাকে বলিবে—সোফিয়াবাঈ আমাদের সঙ্গে আজমীঢ় যাইবে। তিনি যেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন।"

প্রায় ছ' মাস পর বীরেশ্বর রায় কলকাতা ফিরেছিলেন। তিনি তখন একা। ভবানী দেবী নেই। তিনি যা বলেছিলেন, তাই হয়েছিল। বীরেশ্বর রায় আবার তখন মদ্যপান শুরু করেছেন।

সুরেশ্বর বললে—কীর্তিহাটের কড়চায়, রায়বাড়ীর জবানবন্দীতে, বীরেশ্বর রায় শেষজীবন—বছর তিনেক বলতে পার—হারিয়ে-যাওয়া মানুষ।

তাঁর কথাটা সেরে নি সুলতা। ভবানী দেবীর মৃত্যু আমি এঁকেছি। কিন্তু বীরেশ্বর রায়কে তারপর আর আঁকি নি। তিনি।—

যাক, বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর জীবনের কথাটা গুছিয়েই বলি। রায়বাড়ীর জবানবন্দীর ওই ছবিগুলির দিক থেকে দৃষ্টি একটু সরিয়ে নাও।

বীরেশ্বর রায় ভ্রমণকাহিনীর কথা লেখেন নি, কিছু পাই নি, তবে লোকজন যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের বলা কথা রায়বাড়ীতে কিছু কিছু আজও বেঁচে আছে। এবং একটা জমা-খরচের ছোট খাতা আছে।

যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সবই চাকর-বাকর, দারোয়ান, ঠাকুর এইসব। একটু বিস্ময়কর ঠেকবে সুলতা যে, এদের মধ্যে গোপাল সিংও ছিল। বড়াবাবুহুজুর তীর্থ যাবেন শুনে রত্নেশ্বরের অনুমতি নিয়ে সে কলকাতায় এসে বড়াহুজুরের কাছে হাত জোড় করে বলেছিল—হুজুরের কিরপা হলে সে মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাকে হুজুরবাহাদুর এত লোকজনের সঙ্গে তাঁবেদার হিসেবে গরীবকে ভি সঙ্গে নিয়ে চলেন। সে গয়াতে গিয়ে বেটাকে পিণ্ড দেবে, বাপ দাদাকে দেবে। কাশী আর প্রয়াগমে গিয়ে স্নান অর্চনা করে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে!

বীরেশ্বরের আগেই ভবানী দেবী বলেছিলেন—তুমি যাবে গোপাল সিং, তুমি যাবে।

বীরেশ্বরের মাসীমা রত্নেশ্বরের ঠাকুমাও গিয়েছিলেন। আর বলেছি, সোফিয়া বাঈও সঙ্গে গিয়েছিল। তার ব্যবস্থা সব আলাদা ছিল, কিন্তু খাওয়া-শোওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ের বেশীর ভাগটা থাকত বীরেশ্বর রায়ের কাছে। বাঈজীর ঢঙ বা বেশভূষায় মুসলমানী ভাব তার ছিল না। সেই দীর্ঘকাল পর প্রথম সে যে লালপেড়ে শাড়ী হিন্দুস্থানী ঢঙে পরে এসেছিল, তাই ছিল তার পোশাক। এক সন্ধ্যার পর সে যখন এসে গানের আসর পাতত, তখনই কিছুটা

প্রসাধন এবং সামান্ত বেশভূষা করে আসত।

রেললাইন তখন হাওড়া থেকে উত্তর মুখে উত্তরাপথ চলছে দ্রুতবেগে। কাজ মিউটিনীর কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে লুপ লাইনের কাজ চলছিল, তিনপাহাড়ী, সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে, এদিকে মেন লাইন গিয়ে পৌঁছেছিল রাণীগঞ্জ। ১৮৫৫ সালে রেললাইনের তিনজন সাহেব সাঁওতালদের মেয়ে কেড়ে নিয়ে খুন হয়েছিল ইতিহাসে আছে। সে সময় কীর্তিহাটের জেলা মেদিনীপুরেও সাঁওতালরা ক্ষেপেছিল। মিউটিনীর পর রেললাইন দ্রুততর বেগে তৈরী হয়ে এগিয়ে চলেছিল। স্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রেনের বগিতে চড়ে পনেরো দিনের পথ তিনদিনে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বীরেশ্বর রায় ট্রেনে চড়েন নি, তিনি গিয়েছিলেন বজরায়।

চিকিৎসকের উপদেশের জন্যও বটে, এবং তাঁর মেজাজের জন্যও বটে। রেলগাড়ী—সে ছুটবে আপন গতিতে, আপন নিয়মে এবং আরাম তাতে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ভবানীর এবং তাঁর সঙ্গে মাসীমা প্রভৃতি ক'জন বিধবার রেল গাড়ীতে দারুণ অসুবিধা। সে আমল—রেলগাড়ীর বিভিন্ন কামরায় কত জাতের কত লোক, গাড়ীগুলো পৃথক হলেও একসঙ্গে জোড়া ; এর মধ্যে জাত বাঁচিয়ে কি খাওয়া যায় ?

বীরেশ্বর রায়ের অসুবিধা, রেলগাড়ী তাঁর হুকুম মানবে না। তাঁর জীবনের কার্যসূচীগুলোর সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। তার উপর ট্রেনে ঝাঁকি আছে। আর আছে উল্টে-পড়া কি সামনাসামনি দুটো ট্রেনে ধাক্কা লাগবার ভয়। চিকিৎসকেরাও বলেছেন, এই ধাক্কা-ধকলে বীরেশ্বর রায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। তার থেকে, তাঁরাই বলেছেন—বজরায় যাওয়াই উচিত। ধাক্কা-ধকল থাকবে না, এখন ফাল্গুন মাস, ঝড় বা হাওয়ার সময় নয়। বজরা নৌকো যাবে মসৃণ গতিতে। মানসিক স্বস্তিতে থাকবেন রায়। এ ছাড়াও এই গঙ্গার বাতাসের গুণে রায়ের স্বাস্থ্য আরও ভাল হয়ে উঠবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। তাই হয়েছিল।

তিনখানা বজরা, দুখানা বড়, একখানা ছোট। সব থেকে বড় বজরাখানা বীরেশ্বর রায়ের আমলের নতুন বজরা, যাতে দুখানা কামরা। একখানা বসবার, একখানা শোবার। এই বজরাতেই কীর্তিহাট যাওয়া-আসা করতেন। আর একখানা বজরা ছিল, সোমেশ্বর রায়ের আমলের, ছোট বজরা, সেটায় ছিল সোফিয়া বাঈ। অন্য বড় বজরাখানায় ছিল ভবানী দেবীর পূজার ব্যবস্থা, রান্নার ব্যবস্থা, এইটেরই একটা কামরায় থাকতেন মাসীমা এবং আরও দুটি বিধবা আত্মীয়া।

আর বাদবাকী লোকজন সব ছিল কয়েকখানা নৌকোয়। ভবানী দেবীর নিয়ম ছিল, ভোরবেলা উঠে ঘাটে নেমে স্নান করে পূজোর নৌকোয় উঠতেন। এদিকে লোকজনেরা মুখ-হাত ধুয়ে মুড়ি-মুড়কি-চিড়ে-গুড় কাছে বাজার থেকে দই কিনে ভিজিয়ে এক পেট খেয়ে নিত। মাল্লা-মাঝিদের অনেকে ভোর রাত্রে উঠে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেয়ে তৈরী হত। ওদিকে মাসীমারাও স্নান সারতেন। তখন নৌকো ছাড়ত।

সোফিয়া বাঈয়ের কথা বলতে ভুলছি। সেও উঠত খুব ভোরে। উঠে স্নান করে বজরায় গিয়ে ঢুকত। কাপড়-চোপড় ছেড়ে ছাড়াতে বসত মেওয়া ফল। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস

ভেজানো থাকত রাত্রে। তার সঙ্গে কাটত ফল। বাজার থেকে টাটকা ভাল যা পাওয়া যেত তাই।

রায় উঠতেন একটু বেলায়। নৌকো চলতে থাকত, তখনই তিনি উঠতেন। কোন দিন দেড় ঘণ্টা, কোন দিন দু ঘণ্টা পর উঠতেন তিনি। তখন আবার একবার বজরা থামত। তিনি একবার তীরে নামতেন। কিছুখানি হাঁটতেন। শরীরটাকে একটু চঞ্চল করে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার নৌকোয় উঠতেন। মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে বসতেন বসবার ঘরে। এদিকে সোফিয়ার বজরা থেকে রূপোর রেকাবীতে কাটা ফল, মেওয়া ফল এসে পৌঁছুত, ভবানী দেবীর বজরা থেকে আসত মিষ্টান্ন এবং দুধ। তারপর চাকর বানাতো চা। নটা, কোনদিন দশটাও বাজত। খাওয়া শেষ হলেই বজরাখানা মাঝগঙ্গায় থামত। ওদিকে পাশে এসে লাগত সোফিয়া বাঈয়ের বজরা। মাঝখানে দুপাশে রেলিং দেওয়া তক্তা পেতে দিত মাঝিরা। বাঈ তাঁর বীণাখানি হাতে করে এসে উঠতেন হুজুরের বজরায়।

এসে সেলাম করে বসত ; তার জন্যে পাতা থাকত স্বতন্ত্র গালচে, সঙ্গে কেউ না, সারেঙ্গীদার বা তবলচী কেউ না। বসে বীণ বাজাতো। কখনও উৎসাহবোধ করলে নিজেই বীরেশ্বর রায় তবলচী সারেঙ্গীদারদের ডাকতেন। সে ক্বচিৎ। কাম্বণ এর ঘণ্টাখানেক পরই বজরা আবার একবার দাঁড়াত। এবার সোফিয়া চলে যেত নিজের বজরায়। তারপর তার বজরা সরে গেলে এপাশে এসে লাগত ভবানী দেবীর বজরা। ভবানী দেবীর বজরা এবং সোফিয়ার বজরা এক সঙ্গে ঠেকলে বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা আপত্তি করতেন।

—ঠাকুর-দেবতা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে স্পর্শ-দোষ ঘটবে।

যাক। আবার বিকেল হতে হতে আসত সোফিয়া। এবার সাজসজ্জা কিছু করতে হত তাকে, সারেঙ্গীদার, তবলচী, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসর পড়ত। ভবানী দেবীও বজরায় থাকতেন। কিছু রাত্রি হলে তবে ভবানী দেবী আসতেন। স্বামীর খাবার-দাবার নিয়ে। সন্ধ্যের মুখে বজরা নৌকো কোন একটা বাজার বা গঞ্জের ঘাটের আশে-পাশে বাঁধা হত। রাত্রিকালে চলার নিয়ম ছিল না। আর একবার দুপুরে নৌকো বাঁধা হত, লোকজনেরা রান্না করে খাবে।

প্রথম এসে নৌকো বজরার বহর তাঁরা বেঁধেছিলেন পাটনায়। ওখান থেকে পথে পথে যাবেন গয়া। পালকী, রয়েল গাড়ী নিয়ে গয়া যাবেন। সেখান থেকে ফিরে পাটনার ঘাট থেকে আবার রওনা হবেন কাশী। গোটা বৈশাখটা থাকবেন কাশীতে, তারপর রওনা হবেন প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে যমুনায় ঢুকে মথুরা-বৃন্দাবন ; আগ্রা-ফতেপুরশিক্রি ; আকবর শাহের সমাধি। তারপর এখনও ঠিক হয় নি, দিল্লী যাবেন কি গোয়ালিয়র যাবেন। গোয়ালিয়রে মিঞা তানসেনের সমাধি আছে। দিল্লী থেকে হরিদ্বার যাবার ইচ্ছা, ওদিকে কুরুক্ষেত্র, সাবিত্রীতীর্থ, জয়পুর এবং আজমীঢ়। আজমীঢ়ে সোফিয়া বাঈ বিদায় নেবে বলেছে।

বীরেশ্বর রায় সঙ্গে অর্থ নিয়েছিলেন যথেষ্ট। কত নিয়েছিলেন, তার জমা-খরচ নেই। গয়াতীর্থে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড তিনিও দিয়েছিলেন, ভবানী দেবীও দিয়েছিলেন। এই প্রথম শ্যামাকান্তকে তাঁর গৃহী নামে পিণ্ড দিয়েছিলেন। স্বামীকেও অনুরোধ করেছিলেন—সমাজের

ভয়ে সেখানে তাঁর শেষ কাজ করতে পারিনি। এখানে করলাম। তুমিও তোমার কাজ কর। আমার বাবাকে এখানে তুমি পিণ্ড দাও। সেও দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

* * *

স্মলতা, যেটুকু শুনতে পাই ; তাতে শুনি এই গয়া থেকেই ভবানী দেবী কেমন পাল্টে গিয়েছিলেন। পিণ্ড দিয়ে এসে স্বামীকে বলেছিলেন—আমার কাজ শেষ হল গো! এইবার তুমি খালাস দিলেই আমি খালাস!

বীরেশ্বর বলেছিলেন—সে আমি যাবার সময় দিয়ে যাব, তার আগে নয়! অপেক্ষা করে থাক।

ভবানী বলেছিলেন—ওকথা বলতে নেই, বল' না।

—তুমিও খালাস চেয়ো না!

কথাটা ওইখানেই শেষ হল, কথার মধ্যে। কিন্তু সঙ্গের লোকেরা এখানে ফিরে এসে বলেছিল—কথা শেষ হলে কি হবে ; কাজে, ওই দিন থেকেই শুরু হল।

ভবানী দেবী কেমন যেন বদলে যেতে লাগলেন ; আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন একটা কোন ধ্যানে। ধ্যান কথাটা তাদের স্থূলতা ; একাল হলে অন্য কথা বলতো নিশ্চয়। কোন একটা চিন্তায়, কিম্বা নিজের জীবনের সংস্কারের আচ্ছন্নতায়।

গয়া থেকে পাটনা ফিরবার পথে এটা ঠিক ধরা যায় নি। কারণ পালকীতে এসেছেন। পথে চটীতে আশ্রয় নিয়েছেন রাত্রে। বীরেশ্বর রায়ের কাছে এটা ধরা পড়ল পাটনায় ফিরে, বজরায় কাশীর পথে। প্রথম দিনই ভোরে গঙ্গাস্নান করে তাঁর পূজোর ঘর যে বজরায়, সেই বজরায় উঠে পূজোয় বসলেন। সকালবেলা সেদিন বীরেশ্বর রায় একলা পড়ে গেলেন। সোফিয়া বাঈ পাটনা সিটিতে গিয়েছিল, এক বান্ধবী বাঈজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। বীরেশ্বর রায়ের অনুমতি নিয়েই সে গিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় একখানা ইংরিজী বই পড়ছিলেন। ভেবেছিলেন বই পড়েই সময়টা কেটে যাবে। কিন্তু সময় দীর্ঘ হলে তিনি কি করবেন? বেলা প্রায় এগারটা অতিক্রান্ত হতে চলল, তবু ভবানী এলেন না তাঁর পূজার নির্মাল্য নিয়ে। সোফিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে সরাসরি উঠল তার বজরায়। কারণ এই সময়টায় সে থাকত না। ভবানী দেবী জল খান, এই কর্তব্যটির পর। এ সময় সোফিয়া থাকলে তাঁর মন খুঁত-খুঁত করত।

জানবাজারের বাড়ীতে সোফিয়া বসে থাকত মেঝের উপর পাতা গালিচায়, বীরেশ্বর রায় বসে থাকতেন একটা বড় ডিভানে ঠেস দিয়ে। অথবা দামী সেগুন কাঠের পালিশ-করা খাট জাতীয় তক্তপোশের উপর বড় তাকিয়া ঠেস দিয়ে। সেখানে দোতলার মেঝে হলেও সেটা পড়ত মা ধরিত্রীর অংশের পর্যায়ে। সেখানে ছোঁয়ার গণ্য হত না। কিন্তু বজরার কাঠের মেঝে তা নয়।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, একথাটা ভবানী দেবী বা তাঁরা মাসীশাশুড়ীরা মানতেন না।

সেই কারণে সোফিয়া ফিরে এসে এ বজরায় ওঠে নি। সে নিজের বজরায় গিয়ে উঠেছিল। তার রান্নাবান্না আছে। খাওয়া-দাওয়া আছে। তারও নিজের কিছু ভজন আছে। তার

ভজনও নানান যোগের জটিলতায় জটিল। ইসলামী উপাসনার সঙ্গে তার আর একটা জপ ছিল, সেটা পাগলাবাবার দেয়া মন্ত্র জপ।

বীরেশ্বর রায় অধীর হয়ে মহিন্দরকে বলেছিলেন—কি হল দেখতো মহিন্দর? এখনও পুজো শেষ হল না? এত দেরী তো হয় না!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভবানী দেবী এসে উঠেছিলেন তাঁর বজরায়।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এত দেরী আজ?

একটু বিস্মিত হয়েই ভবানী বলেছিলেন—দেরী? না তো!

না তো? দেখ তো ঘড়িতে কটা বাজল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভবানী বলেছিলেন—তাই তো! এগারটা! আমি তো বুঝতে পারি নি!

সেদিন আর এ নিয়ে উচ্যবাচ্য হয় নি। ভবানী দেবী চরণোদক নির্মাল্য দিয়ে, কাপড় ছেড়ে এসে স্বামীর পাশে বসেছিলেন।

বীরেশ্বর তখন যুবক। জন্ম তাঁর বিশ সালে, তখন চলছে উনিশশো ষাট। চল্লিশ বছর বয়স। তবুও জীবনে যে যুদ্ধ তিনি করেছেন নিজের সঙ্গে, যে যুদ্ধের নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁর বাঁ হাত, বাঁ পা খানিকটা দুর্বল হয়ে গেছে, তারই ফলে তখন তাঁর চুলের মধ্যে দু-চারটে পাকা চুল দেখা যেতো; ভবানী পাশে বসে তাই খুঁজে খুঁজে বের করে তুলে ফেলতেন।

সেদিন তিনি বলেছিলেন—আজ সকাল থেকে গান শোনা হয় নি, না?

—হ্যাঁ, সোফিয়া তার এক সহেলীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—এখনও ফেরে নি?

—সে ঠিক সময় ফিরেছে। সে বলেছিল—দশ, সাড়ে দশ বাজে লৌটেঙ্গী, ঠিক তাই এসেছে। কিন্তু তোমার আসবার সময় হয়েছে বলে বজরায় ওঠে নি।

—ও, তাই আমার রাজাবাহাদুরের মেজাজ খারাপ হয়েছে।

—তোমার তাই ধারণা, না?

—তাতে অন্যায়টা কি হল?

ভবানী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল বীরেশ্বর। বলেছিলেন—তুমি বুঝতে পার না ভবানী, আমি তোমাকে কেমনভাবে পেতে চাই? কিন্তু তুমি নিজেকে এমন আড়াল করে রেখেছ, পূজো পূজো আর পূজো নিয়ে—!

ভবানী দেবী সেদিন অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন—দেখ তো পাগলামী! হ্যাঁ গা, আমি পূজো-অর্চনা করি কি আমার মঙ্গলের জন্যে?

বীরেশ্বর বলেছিলেন—থাক!

ভবানী ডেকেছিলেন মহিন্দরকে—মহেন্দ্র, বাবুকে তামাক দাও নি কেন? তামাক দাও। না। এক কাজ কর তো! বজরা থেকে আমার তানপুরাটা নিয়ে এস তো! পাখোয়াজটাও আনো। ময়দা করো।

স্বামীকে বলেছিলেন—নাও, আজ অধীনী তোমাকে গান শোনাবে। মহিন্দর তানপুরা

এনে দিতেই, বলেছিলেন—বজরা খুলে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যেতে বল! ঘাটের কাছে ভিড় জমে যাবে। আর ও বজরায় মাসীমারা আছেন। সোফি বাঈকেও ডাক।

—না। বীরেশ্বর মানা করেছিলেন। তুই তানপুরো পাখোয়াজ দে। সোফি থাক।

ঘাট থেকে বজরা খুলে মাঝগঙ্গার দিকে চলতে আরম্ভ করেছিল। সকলে বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু মহিন্দর চাকর বজরার ছাদে উঠে বলেছিল, একটু ঘুরে আসতে চলল বজরা।

* * *

এ বিবরণ মহিন্দরের সে তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে এসে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল। রত্নেশ্বর তাঁর ডায়রীতে লিখে রেখেছেন।

সেদিন না কি বড়হুজুরের যে আনন্দ, হুজুরের তেমন আনন্দ মহিন্দর আর কখনও দেখেনি। গান গাইতে গাইতে তানপুরার হাত মায়ের বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুচোখ থেকে ধারা নেমেছিল।

গান সে আশ্চর্য গান, আর হুজুরের সে বাজনাও আশ্চর্য! গান থামল, পাখোয়াজে ঘা মেরে হুজুর চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—আমি ভাল হয়ে গিয়েছি। সতীবউ, আমি ভাল হয়ে গিয়েছি।

ভবানী দেবী প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন সবিস্ময়ে। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—বাঁ হাতে আমার একটু কষ্ট হল না! আমি ভাল হয়ে গিয়েছি!

বিকেলে গঙ্গার কিনারায় উঠে দারোয়ানের সঙ্গে ঘুরেও এসেছিলেন। লাঠির দরকার হয় নি, তবু হাতে ছড়ি না নিলে যেন কেমন হাতখানা স্বস্তি পাচ্ছিল না।

* * *

পরের দিন ভোরে নৌকো বজরা পাটনা ছেড়ে রওনা হয়েছিল কাশীর মুখে। সে দিনও দুপুরে গান গেয়েছিলেন সতীবউরাণী। সেদিন কিন্তু পাখোয়াজ ধরতে দেন নি স্বামীকে। বলেছিলেন—বাঁয়া তবলা নাও। কাল যা পাখোয়াজে ঝড় তুলেছ, ও চলবে না। ভাল হয়েছ, বেশ ভাল কথা। কিন্তু ও হাত নিয়ে যুদ্ধ করা চলবে না।

সেদিন ভবানী দেবী ধ্রুপদী গান নি। হাল্কা গান ধরেছিলেন। সেদিন গানের আসর ভাঙতে আরও বেলা হয়েছিল। খেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। ভবানী দেবী বললেন—না। এ হবে না। কাল থেকে রাত্রে, সোফির আসরের পর আমি গান শোনাব। না হয় এ বেলা সোফি বেশীক্ষণ গান শোনাবে, রাত্রে ওর আসর সকাল সকাল ভেঙে দিয়ো, তারপর আমাদের পালা।

তাই চলেছিল ক'দিন। বড় আনন্দ চাকর-বাকরদের। গান-বাজনা নিয়ে হুজুরের ঝোঁক বাড়ল। নতুন নিয়ম হ'ল, বেলা থাকতে নৌকো বাঁধতে হবে। হুজুর কিনারায় উঠে খানিকটা করে হাঁটবেন।

স্নানের আগে তেল মেখে হুজুর নিজে হাত-পা ভেঁজে নিতেন। ডন-বৈঠক দেবার মতলবও করেছিলেন, কিন্তু তাতে সতী-রাণী-মা বাধা দিয়ে বলেছিলেম—না। যা রয়সয়, তাই কর। ও করতে আমি দেব না।

দিন দশেক পর, কাশী পৌঁছুবার দুদিন আগে, হুজুর সেদিন যেন একটু বেশী মেতে উঠলেন। মদ খেয়ে নয়, নিজের ঝোঁকে। সেদিন বললেন—অনেক দিন নাচ হয় নি, আজ নাচ হবে।

সতীরাণী-মা বারণ করলেন—না।

হুজুর বললেন—না কেন? অনেক দিন নাচের আসর বসে নি, আজ এক বছরের ওপর।

সোফি বাঈ মাফি চাইলে। হাত জোড় করে। তবু শুনলেন না। নাচ হল শেষ পর্যন্ত। সে এক প্রহর রাত পর্যন্ত।

সেও আসর জোর করে ভেঙে দিলেন বউরাণী। সোফি বাঈ চলে গেল। এই পর্যন্ত মহিন্দর জানে।

এর পর রাত্রে কি হল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে, কেউ জানে না। কিন্তু ভোরবেলা উঠে বউরাণী গঙ্গাস্নান করে সেই যে পূজোরঘরে ঢুকলেন, সারা দিনেও আর বের হলেন না। মাসীমা এসে চরণোদক পুষ্প দিয়ে বলে গেলেন, আজ আর বউমা পূজোরঘর থেকে বেরুবে না বাবা। কাল কাশী পৌঁছুবে, সে আজ সংকল্প করছে, হবিষ্যান্ন করবে। কম্বলে শোবে। শোবেও ওই পূজোরঘরে। বললে—ওঁকে কাল বলা হয় নি। ভুলে গেছি বলতে। ওঁকে আপনি বলে দেবেন। আজ আমি ও বজরায় যাব না। সোফিকে একটু বেশীক্ষণ থাকতে বলেছে। এবেলা-ওবেলা দুবেলাই।

বীরেশ্বর রায় একটি কথাও বলেন নি। চুপ করে শুনে শুধু একটি হুঁ বলেছিলেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

সেদিন স্নানের সময় তেল মেখে ডনবৈঠক দিলেন। বিকেলবেলা অন্যদিনের চেয়ে বেশীক্ষণ বেড়িয়ে ফিরলেন।

সন্ধ্যেবেলা সোফি বাঈয়ের গানের আসর বসে ভাঙল প্রথম প্রহরের বদলে রাত দু প্রহরে। গঙ্গার পাড়ে চারিদিকে তখন কোলাহল করে শেয়াল ডাকছে।

পরের দিন বেলা দশটার সময় নৌকো কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর লাগল। ও বজরার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বেণীমাধবের ধ্বজাকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে মা প্রণাম করছিলেন। তাঁর সে চেহারা দেখে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

এ তো পরশুর রাণীমা নন।

এ যেন সেই হুজুরের অসুখের সময় যে রাণীমা এসে শুধু শাঁখাশাড়ী পরে যোগিনীর মত রায়বাড়ীতে ঢুকেছিলেন, সেই রাণীমা!

একদিনের উপবাসও নয়, হবিষ্যান্ন করেছিলেন ভবানী দেবী, অর্ধ-উপবাসও বলা যায় না, সন্ধ্যার পূর্বে দুধ খেয়েছিলেন, তবু মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কয়েকটা উপবাস করে আছেন; তার উপর চুল রুক্ষ; সংকল্পের জন্য উপবাসের পূর্বদিন তেল নিষিদ্ধ। কম্বলে শুতে হয়। অশৌচ পালনের মতই ব্যবস্থা। অলঙ্কার সব খুলে রেখে শুধু শাঁখা পরেই তিনি নেমেছিলেন। বিমলাকান্ত এসেছিলেন সস্ত্রীক, পাণ্ডার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে থেকে ব্যবস্থা করা

ছিল। একটা বড় বাগিচাওয়ালা মোকাম ভাড়া করে রাখা হয়েছিল। পালকি-ডুলি এবং এক্কা হাজির ছিল। শহর থেকে একটু বাইরে। ভবানী দেবীর পরামর্শ মতই করা হয়েছিল সব। আর একটা বাড়ীও ভাড়া করে রাখা হয়েছিল শহরের মধ্যে বিমলাকান্তের বাড়ীর কাছে। কাশীতে এক মাসেরও উপর থাকবেন, বিশ্রাম নেবেন বীরেশ্বর রায়। গঙ্গার একেবারে ধারে। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটের দিকে। বীরেশ্বর রায় ওই বাগানে থাকবেন, সঙ্গের দারোয়ান লোকজন সবই থাকবে সেখানে; শহরের বাড়ীতে থাকবেন মাসীমারা। ভবানী দেবী ভোরবেলা শহরের বাইরের বাড়ী থেকে পালকিতে চলে আসবেন শহরের বাড়ীতে। এখানে এসে সারাদিন থাকবেন, স্নান, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি করবেন। বিকেলবেলা বীরেশ্বর রায় আসবেন, সন্ধ্যায় দেবদর্শন সেরে বিমলাকান্তের সঙ্গে গল্পগুজব করে সস্ত্রীক ফিরবেন বাগিচাবাড়ীতে। সোফিয়ার থাকবার ব্যবস্থা ওই বাগিচাবাড়ীতেই একটা আলাদা ছোট বাড়ীতে করা ছিল। সেটা ছিল বাগিচাবাড়ীর দপ্তরখানা বা বাইরের বাড়ী। মূল বড় বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও স্বতন্ত্র বাড়ী।

সুরেশ্বর বললে—এ-বাড়ী পরে কেনা হয়েছিল। এবং বাড়ীখানা পেয়েছিলেন মেজতরফ। মেজঠাকুরদা শিবেশ্বর রায়। শিবেশ্বর রায়ের ধর্মবিশ্বাস ছিল বলে রত্নেশ্বর রায় বাড়ীখানা তাঁকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এ-বাড়ী কিনেছিলেন আমার জ্যেঠামশাই—যজ্ঞেশ্বর রায়। এ-বাড়ী একবার আমি দেখেছি। আমার যখন পাঁচ-ছ বছর বয়স, তখন বাবা আমাকে এবং মাকে নিয়ে গোটা পশ্চিম ঘুরে এসেছিলেন। বড় মনোরম জায়গা ছিল। বাড়ীখানাও তেমনি মুঘল আমলের আমীরী ছাপমারা। কিন্তু সে-কথা থাক। যা বলছিলাম তাই বলি। এই বাইরের বাড়ী বা দপ্তর সেরেস্তাখানায় একখানা প্রশস্ত হল ছিল—সেইখানে বসত রাত্রের আসর।

মহিন্দর চাকর রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—এই কাশী এসেই সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। সতীরাণীমা ব্রত করলেন; ভোরবেলা যখন পালকিতে উঠতেন তখন আবছা অন্ধকারের মত দেখতাম, মায়ের যেন কেমন ঘোর লেগেছে। আবার ফিরতেন রাত্রে, তখন তাঁর দিকে তাকানো যেত না। সে যেন কেমন মানুষ। "পিথিমীর নন।" খাওয়াদাওয়া তো ফল-জল; তা ওই বাড়ীতে খেয়ে আসতেন। পালকি থেকে নামতেন যেন কাঁপছেন; দু'জন ঝি তাঁকে দু'পাশে ধরে উপরে নিয়ে যেত। এক মাস ব্রত, পয়লা বোশেখ থেকে বোশেখের সংক্রান্তি পর্যন্ত—তার মধ্যে প্রথম পনের দিন উপরে উঠেছিলেন,—বাকি ক'দিন উপরে ওঠেননি, তিনি আলাদা ঘরে শুতেন, তাঁর বিছানা একখানা কম্বল, তার উপর খুব ভালো রেশমী চাদর পাট করে চাদরের মত পাতা হত; আর একখানা কম্বল গুটিয়ে রেশমী চাদর জড়িয়ে বালিশের কাজ করত। আর চারখানা লালপাড় গরদের শাড়ী। শ্বেতপাথরের দু'-তিনটে গেলাস, খান-দুই রেকাবি; আর জপের মালাটালা এই সব। বাক্সপেঁটরা যা সব আসল সামগ্রী, সে-সব থাকত রায় হুজুরের কামরায়। একেবারে জানালা খুললেই গঙ্গা।

মহাবীর সিং কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘরের দরজায় পাহারা থাকত।

মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—মা ব্রত করতে লাগলেন, হুজুর যেন নতুন করে সেরে

উঠলেন, মুখের উপর দাগ পড়েছিল, সেগুলো উঠে গেল, মনে হল দশ বছর বয়স কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আগের সেই মেজাজ। সেই চোখের তাকানি। সেই কড়া গলার ডাক। সব ফিরে এল।

রাত্রে সোফি বাঈয়ের আসর বসত অল্পক্ষণের জন্যে। ওই মায়ের সঙ্গে ফিরে এসে; মাকে উপরে তুলে শুইয়ে দিয়ে সটান এসে উঠতেন বাইরের বাড়ীতে পাতা আসরে, একখানা গান শুনেই ফিরে এসে শুতেন। সোফি বাঈয়ের সঙ্গে আসর যা হবার তা হ'ত দিনের বেলা। সকালে হুজুর উঠতেন আটটার সময়, তখন মা চলে গেছেন কাশীর ভিতরে শহরের বাড়ীতে। হুজুর মুখ ধুয়েই উঠতে উঠতে বাঈ মেওয়াফল আর অন্য ফল কেটে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকত; আমি গরম দুধ, মাখন, মিছরী, প্যাঁড়া এনে নামিয়ে দিতাম। হুজুর খেতেন; সোফিয়া বাঈ বসে খাওয়াতো। সতীরাণী মা বাঈকে ভারটা ডেকে দিয়ে গিয়েছিলেন। খেতে খেতে গল্প করতেন। হাসতেন, মসকরা করতেন। আমি তামাক সেজে নলটি রেখে বাইরে গিয়ে বসে থাকতাম। খাওয়ার পর ডাক পড়ত তবলচীর আর সারেঙ্গীদারের। গানের আসর বসত। একটা বাজলে সে-আসর ভাঙত। হুজুর স্নান করে খেয়ে উঠে শোবার আগেই বাঈ আবার এসে হাজির হত পানের রেকাবি হাতে। পান-তামাক খেয়ে হুজুর শুতেন। বাঈ প্রথম প্রথম চলে যেত, দিনকয়েক পর থেকেই হুজুর বলেছিলেন—মাথায় হাত বুলিয়ে দাও; ভবানী দিত, পাকাচুল তুলত। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। না দিলে ঘুম আসবে না।

বাঈ মাথার শিয়রে কুর্সি টেনে নিয়ে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। পাকাচুল তুলতে বললে বলত—হুজুর, এখন তুমি ফের নওজোয়ান হয়ে গেছ, এখন কি আর পাকাচুল থাকে?—

হুজুর খুব হাসতেন। এই সময় হুজুর আর একরকম মানুষ হয়ে যেতেন।

* * *

কাশী থেকে রওনা হয়েছিলেন, বিন্ধ্যাচল হয়ে প্রয়াগ। জষ্টি মাসের পনের-ষোল তারিখে। পনের তারিখের শেষ রাত্রে ষোল তারিখের ভোরে। সতীবউরাণী একমাস ব্রত করে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন; তিনি একটু বল পাবেন—এই বলে অপেক্ষা করা হয়েছিল।

কিন্তু কাশী থেকেই আগের হালচাল সব বদলে গেল। সতীবউরাণী বাসা নিলেন নিজের ঠাকুর ছিল যে বজরায় সেই বজরায়। সেইখানেই তাঁর খাওয়া সেইখানেই শোওয়া। মাত্র তিনবার আসতেন এ বজরায়। একবার চরণোদক দিতে, একবার হুজুরের দিনে খাবার সময়, একবার রাত্রে খাবার সময়। ব'সে থেকে খাইয়ে হুজুরকে শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হুজুর ঘুমিয়ে পড়লে তবে চলে যেতেন।

বলেছিলেন—তীর্থ শেষ করে ফিরে আবার আগের মতন হবে সব। তীর্থ যাচ্ছেন, ভগবান দর্শন করতে চলেছেন, এ সময় একমন হয়ে যেতে হবে। ওই চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করলে কি ভগবানের দর্শন মেলে?

বলতেন—যে যে চিন্তা নিয়ে যায়, তীর্থের মন্দিরে দেবতার মূর্তির বদলে সে তাই দেখে। দেবতা দেখতে পায় না।

হুজুর মুখে কিছু বলেন নি, কিন্তু মেজাজ তাঁর আরও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন

—বেশ, তাই হবে। তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তখন তাই হবে।

মহেন্দ্র বলেছিল—হুজুরের বজরার কামরায় আমি শোব এই ব্যবস্থা করেছিলেন রাণীমা। আমি শুতাম।

প্রয়াগ থেকে বজরা ঢুকল যমুনায়। বরাবর এসে উঠল মথুরায়, তারপর বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে দশদিন থেকে ফিরে এসে উঠলেন আগ্রায়। তবে মাসীমারা থেকে গেলেন বৃন্দাবনে। আগ্রায় দেবদেবতা নেই, সেখানে থেকে কি করবেন? আগ্রায় বাড়ী ভাড়া করে দশদিন পর হুজুর রাণীমা, সোফিবাঈ আর লোকজনকে নিয়ে গিয়ে আগ্রায় উঠলেন।

রাণীমায়ের শরীর তখন আরও খারাপ হয়েছে। রোগা হয়ে গেছেন। আর মনে মনে কি ভাবেন, যেন মাটির মানুষই নন। খেতে কিছু পারেন না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অরুচি।

মহেন্দ্র মাথা চুলকে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—মাসীমারা ফিসফাস্ গুজগুজ করছিলেন। মানে—।

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—হুঁ।

মহেন্দ্র এসব কথা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর। সে প্রায় এক বছর পর। তীর্থপর্যটনে লেগেছিল ছ' সাত মাস, ছ' সাত মাস পর তাঁরা ফিরে এসেছিলেন কাশীতে। কাশীতেই একটি কন্যাসন্তান প্রসব ক'রে ভবানী দেবী মারা যান।

রত্নেশ্বর মোটামুটি ঘটনাগুলি জানতেন, তাই বলেছিলেন—হুঁ। বীরেশ্বর রায়ের মাসীমা এবং অন্যান্য প্রবীণারা কি কানাঘুঁষো করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বলেছিলেন—হুঁ।

কথাটা কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে বলতে ভরসা পায় নি। তার কারণ ভবানী দেবী। ভবানী দেবী বারো বছর পর স্বামীর ঘরে ফিরে এসেও ঠিক সংসারী হন নি। এবং কালটা সে-কাল! কুড়ি-বাইশ বছর পর এমন ধর্মপরায়ণা পূজারিণীর মত মেয়ে সন্তানবতী হয়েছে, এটা যেন প্রবীণাদের কাছে একটু কেমন ভোগলিপ্সা অপবাদের মত মনে হয়েছিল। ভবানী দেবীর নিজের কাছেও সেটা অপরাধ বলে মনে হয়েছিল।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, প্রমাণ সঠিক মানে লিখিত প্রমাণ আমি পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস—তাই। কীর্তিহাটে সেদিন রাত্রে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়তে পড়তে আমি যেন চোখে দেখতে পেয়েছিলাম বিশীর্ণা ভবানী দেবীকে। মুখে চোখে তাঁর অপরাধ-বোধের ছাপ। তিনি যেন মনে মনে বলছিলেন—'একি করলি মা! এ কি লজ্জায় ফেললি! সংসারে ফিরে আসার জন্যে কি এই শাস্তি দিলি!'

আর রাজকুমারী রাণীবউ কাত্যায়নী দেবীর মাসতুতো বোন বৃদ্ধা নিস্তারিণী দেবীর ফিস্‌ফাস্ কথাগুলিও যেন কানে শুনেছিলাম—ছি—ছি মা, এ কি লজ্জা—! এতকাল পর! পুষ্যি-বেটা একুশ পার হয়ে পড়েছে বাইশে; বউ এসেছে ঘরে, কোনদিন ডাকে চিঠি আসবে গ্যানেজার লিখবে—রত্নেশ্বরের সাহেব শ্বশুর লিখবে নাতবউয়ের সন্তান হবে! তা—না—। এখান থেকে খবর যাবে চিঠিতে—। লিকবে কি ক'রে গো!

আর একজন বলেছিলেন—তা বীরেশ্বর আমাদের পারবে। দিব্যি পারবে। আগেকার

কথা তো ঢাকা নেই। এখন এই দেখ না, তীর্থে এসেছে, সঙ্গে বাঈ নিয়ে এসেছে।

নিস্তারিণী বলেছিলেন—এইবারে আগুন লাগবে দিদি। বাপবেটায় মানে পুষ্যিবেটায় আর বাপে বিষয় নিয়ে লাঠালাঠি হবে। ছেলে আর হবে না এই বলে সব পুষ্যিবেটাকে দানপত্র ক'রে দিয়ে এল। এখন? এখন তো মায়ের নিজের ছেলে আসবে কোলে! সে কোথা দাঁড়াবে? কি মতিচ্ছন্ন মা! দানপত্তর ক'রে দিলি কেন?

সুরেশ্বর বললে—এ কথাগুলির আভাস আছে রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে। তাঁর ডায়রীতে শ্রাবণ মাসের আট তারিখে তিনি লিখেছেন—"আজ আগ্রা হইতে পিতৃদেবের পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। মাতৃদেবী এত দীর্ঘকাল—একুশ বৎসর পর আবার সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন! বুঝিতে পারিলাম, মনুষ্য যতই এবং যেমনি সংকল্প করুক, যত নিষ্ঠার সঙ্গেই ধর্মাচারণ করুক, তাহার প্রবৃত্তির কদাপি পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। পিতা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও মৃদু হইলেও পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ছিলেন। তিনি সুস্থ হইবামাত্র আবার ভোগলালসার কাছে পরাজিত হইয়াছেন! কিন্তু আমার নানা চিন্তা হইতেছে। পিতা তাঁহার সম্পত্তি আমাকে দানপত্র করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। লোকচক্ষে আমি স্বর্গীয় সোমেশ্বর রায়ের দৌহিত্র হিসাবে তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক অংশের মালিক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল আনা সম্পত্তিরই মালিক তিনি। আমি অবশ্য ইচ্ছা করিলে এই অর্ধেক অংশ নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস পিতৃদেবও এ বিষয়ে কোন দাবী করিবেন না। করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার পক্ষে ন্যায় কি হইবে? চিঠিখানা ম্যানেজারকে দেখাইলাম। তিনিও এই কথাগুলিই বলিলেন। অবশ্য দৌহিত্র হিসাবে আমার অংশের কোন কথাই তুলিলেন না। এবং বাড়ীতে এই পত্র সরস্বতীবউও দেখিল। পত্র পাঠ করিয়া সে আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ বলিল—"এখন কি হইবে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিসের কি হইবে?"

সে বলিল—সম্পত্তির?

পুত্রসন্তান অর্থাৎ ভ্রাতা হইলে তাহার সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া লইব। ভগ্নী হইলে প্রচুর খরচপত্র করিয়া উচ্চবংশে তাহার বিবাহ দিব।

সরস্বতীবউ চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না। আমি বলিলাম—ইহাই কর্তব্য এবং ধর্ম নহে কি?

সে বলিল—না, আমি তাহা মনে করি না। শ্বশুরমহাশয় তোমাকে যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা ইচ্ছা করিলে তুমি অবশ্যই দিতে পার। কিন্তু জমিদারী সম্পত্তি, বসতবাটী ভাগ হইলেই মাটি হইয়া যায়। তাহার আবার দাম কি? তা ছাড়া শ্বশুরমহাশয়ের কলিকাতার সম্পত্তি তো কম নয়। শুনিয়াছি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে খাটিতেছে এবং গোকুলের কৃষ্ণের মত দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছে। কলিকাতার বাড়ীতে তোমার ভাগ নাই। ও বাড়ী দাদা-শ্বশুর সোমেশ্বর রায় দৌহিত্র হিসাবে তোমাকে দেন নাই। কলিকাতার তেজারতি ইত্যাদিও নয়। সে-সব তো সোনা। এই জমিদারী তাহার কাছে মাটি।

কথায় বাধা পড়িল। অঞ্জনা আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি কহিলাম—থাক এখন এসব কথা। সে-সব অনেক দূরের ব্যাপার। এক্ষণে চুপ কর। অঞ্জনা আসিতেছে।"

সুরেশ্বর বললে—কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম সুলতা, বলছিলাম বীরেশ্বর রায় আর ভবানী দেবীর রায়বাড়ীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থানের কথা। এসে পড়লাম রত্নেশ্বর রায়ের কথায় কীর্তিহাটের বাড়ীতে। ফিরে আবার সেই কথাই বলি।

আগ্রাতেই প্রথম কবিরাজ এবং ডাক্তার দেখিয়ে বীরেশ্বর রায় জানতে পারলেন যে ভবানী-দেবী আবার সন্তানসম্ভবা।

মহেন্দ্র খানসামা রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—সেদিন রাত্রে রাণীমায়ের সঙ্গে হুজুরের কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি কথা কাটাকাটি?

মহেন্দ্র চুপ করে থেকেছিল—জবাব দেয় নি।

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—মহেন্দ্রকে দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া ধমক দিয়া প্রশ্ন করিলাম—কি কথা হইয়াছিল বল্। বলিতেই হইবে।

মহেন্দ্র মুখ নিচু করিয়া বলিল—সতীবউরাণী সংবাদ শুনিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে-ছিলেন। হুজুর গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কাঁদিতেছ কেন?

ভবানী দেবী বলিয়াছিলেন—এ তুমি কি করিলে?

হুজুর বলিয়াছিলেন—কেন কি হইয়াছে?

—কি হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার ব্রত, ধর্মাচরণ সব পণ্ড হইল, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। রত্নেশ্বরের সম্মুখে আমি মুখ তুলিয়া কথা বলিব কি প্রকারে? ইহকালের জন্য আমার পরকাল নষ্ট হইল। জীবনে মাকে ডাকিবার সময় পাইব না। মমতার পাঁকে আবদ্ধ হইয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, মায়ের মুখ ভুলিয়া যাইব, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি হইয়াছে। তুমি জান, আমার জীবন ভোগের জীবন নয়। একবার বালিকা বয়সে যখন সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলাম না তখন তোমাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। তাহার ফল কি হইয়াছিল তুমি তো জান! নিজে তুমি কত দুঃখভোগ করিয়াছ ভাবিয়া দেখ! বারো বৎসর পর তোমার জীবনসংশয় অসুখের সময় আবার আমি ফিরিয়াছিলাম। সম্ভবত ভুল করিয়াছিলাম। তোমাকে তো বারবার বলিয়াছিলাম ঐসকল কথা!

হুজুর বলিয়াছেন—ভুল আমারও হইয়াছিল সতীবউ। তোমাকে বিবাহ করা আমার ভুল হইয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনসংশয়ের সময় তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সকল দুঃখ সকল যন্ত্রণার উপশম হইল বলিয়া তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরা আমার ভুল হইয়াছিল। আমার বাঁচিতে চাওয়া—বাঁচা ভুল হইয়াছে। তোমাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিব' কল্পনা করা ভুল হইয়াছে। চিকিৎসায় এবং এই পশ্চিম ভ্রমণে জলবাতাসের গুণে নূতন করিয়া জীবন যৌবন ফিরিয়া পাওয়া ভুল হইয়াছে। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—তুমি একান্ত করিয়া আমার। আমার ভাবা ভুল হইয়াছে—আমিই তোমার একমাত্র কাম্য! সবই ভুল হইয়াছে ভবানী, সবই ভুল হইয়াছে!

সতীরাণী মা কেমন হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি শুধু বিহ্বলের মত হুজুরের দিকে তাকাইয়াই

ছিলেন, একটি বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই।

হুজুর বলিয়া গিয়াছিলেন—বলিতে পার সতীবউ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ছার স্বয়ং মহেশ্বরের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাহারা কি অধার্মিক? ব্রহ্মার-ঔরসজাত পুত্র নাই, তাঁহার মানসপুত্র আছে। পূর্ণব্রহ্মের অবতার রামচন্দ্রের পুত্র হইয়াছে, ভগবান কৃষ্ণের সন্তান হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কি ধর্মভ্রষ্ট? বল—বল। তুমি বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে, তুমি বল—তোমার উত্তর আমি শুনিতে চাই! বল—বশিষ্ঠের শতপুত্র ছিল বলিয়া কি তাঁহার পত্নীর পরকাল নষ্ট হইয়াছে? সীতার পুত্র লবকুশ, সাবিত্রী শতপুত্রের বর লইয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহারা নরকস্থ হইয়াছেন। বল—শুনি!

মহেন্দ্র বলেছিল রত্নেশ্বর রায়কে—হুজুর, আমি হুজুরের পিছন পিছন আসছিলাম, হুজুর রাণীমার ঘরে ঢুকলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছিলাম, কিন্তু রাণীমাকে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরই কথা আরম্ভ হল। রাণীমায়ের কথা শুনতে শুনতে মনে হ'ল আমি স'রে যাই। কিন্তু হুজুরের গলা তো জানেন, আর তিনি ঠাণ্ডা গলাতেও কথা বলছিলেন না। ঘরখানা গম্‌গম্ করছিল্। তার আওয়াজ পেয়ে অন্য চাকরবাকরেরা ঝিয়েরা এসে বারান্দায় উঁকি মারছিল। আমি কি করব? রাণীমায়ের ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে আমি দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতের ইসারায় সকলকে চলে যেতে বললাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে হল। শুনলাম।

তারপরই হুজুর ডাকলেন—মহিন্দর, মহিন্দর!

আমি ঘরে ঢুকে দাঁড়ালাম। দেখলাম—হুজুর রাণীমায়ের বিছানার পাশে ব'সে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমাকে দেখে বললেন—জল জল আন মহিন্দর জল। আর পাখা!

মা মূর্চ্ছা গিয়েছেন।

মাথায় মুখে জলের ছিটে দিয়ে হুজুর ডাকছিলেন—রাণীমার নাম ধ'রে। তাঁর হাত কাঁপছে। হুজুর, আমি চেঁচিয়ে দামিনী ঝিকে ডাকলাম—সে ছুটে এল।

জ্ঞান অল্পক্ষণ পরেই হল। জ্ঞান হয়ে আমাদের সকলকে দেখে একটু হেসে মা বললেন—থাক্—থাক্। কেমন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। থাক্ আর বাতাস করতে হবে না।

হুজুরকে বললেন—যাও, যাও, তুমি এখানে থেকো না। আমার কিছু হয়নি। মাথার শিয়রে বসে থাকতে হবে না। যাও।

তারপর স্বলতা, সুরেশ্বর বললে—আর কোনদিন কোনও এমন কথা হয় নি। এর-পর থেকে নাকি ভবানী দেবী ধীরে ধীরে সেরে উঠেছিলেন। নানান রকম খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সকালবেলা থেকে বেদানার রস, আঙুরের রস, বাদামের সরবৎ, পেস্তা, কিসমিস, তার সঙ্গে ঘি দুধ প্রচুর পরিমাণে খেতেন তিনি।

আগ্রায় আষাঢ় মাস থেকে প্রচণ্ড গরম আরম্ভ হয়েছিল। তাই আগ্রা থেকে বজরায় দিল্লী পৌঁছে, সেখান থেকে পালকি ঘোড়া, বয়েল গাড়ীতে হরিদ্বারে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর

রায়।

দিল্লীতে এসেই সোফিয়া বাঈজীর বিদায় নেওয়ার কথা। চলে যাবেন আজমীঢ়। চিরজীবনের জন্যই যাবার কথা। কিন্তু আজমীঢ় যাওয়া তার হয় নি। যেতে দেন নি ভবানী দেবী।

হুজুরের যত্ন ভাল হবে না। তা ছাড়া তিনি বলেছিলেন—এবার এসময় আমার দরকার আছে সোফি বাঈ!

সোফি বাঈ আগ্রা থেকেই নীরব হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপই থাকত। সে সেলাম ক'রে বলেছিল—আমাকে আপনার দরকার আছে হুজুরাইন?

—হাঁ, দরকার আছে সোফি। এতদিন তুমি তোমার হুজুরকে গান শুনিয়েছ, এবার আমাকে শোনাবে। ভজন শ্রিক ভজন!

সোফি হেসে বলেছিল—বেশ। তাই হবে! আমি তো একলা হুজুরের বাঁদী নই। আমি আপনারও বাঁদী।

ভবানী দেবী বলেছিলেন—আরও আছে সোফি বাঈ। তুমি আমার পিতাজীর ধরম বেটী। তাঁর শেষ কাজ আমি করতে পারি নি। সে করেছ তুমি। তুমি আমার বহেন। তাঁর কাছে তুমি শেষ শিক্ষা নিয়েছ, দীক্ষা নিয়েছ। ভজন শিখেছ। সেই ভজন আমাকে শোনাবে। তা ছাড়া হুজুরের তোমার দিল খুস রাখবে কে? আমি তো আর পারব না! তুমি ছুটি নিলে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে আমাকে। কিন্তু আমাকেই যে ছুটি নিতে হবে।

মহেন্দ্র সেদিনও কাছে ছিল ওঁদের। কাজ করছিল। রত্নেশ্বরকে সে যা বলেছিল তা তাঁর ডায়রীতে আছে।

"মহেন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। মহেন্দ্র বলিল—আমার মাতৃদেবীর কথা শুনিয়া সোফি বাঈ নাকি চকিত হইয়া বলিয়াছিল—

—ছুট্টি? এ কি বাত্ বলছেন দিদিজী?

—হাঁ। ছুট্টি তো নিতে হবে ভাই। এই অবস্থায় কি আমি তাঁর সেবা করতে পারি। আমার কি সে বল আছে? না হুজুর তোমার আমাকে কাজ করতে দেবেন?

সোফি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি আমাকে ভুলাচ্ছ দিদিজী?

হেসে উঠেছিলেন ভবানী দেবী!

সোফি জিজ্ঞাসা করেছিল—বেশ, কত দিনে ছুটি মিলবে আমার?

—খুদা মালুম সোফি!

রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লিখেছেন—"আমার ভগবতীর কৃপাধন্যা জননী তাহা হইলে সব অবগত হইয়াছিলেন!"

কার্তিকের প্রথমে হরিদ্বার থেকে দিল্লী ফিরে সেখানে দিন দশেক থেকে ওঁরা ফিরেছিলেন কাশী!

সেও ভবানী দেবীর ইচ্ছায় এবং আগ্রহে। সন্তান কাশীতে হবে।

ছেলে হ'লে নাম রাখবেন—বিশ্বেশ্বর। কন্যা হ'লে নাম রাখবেন—অন্নপূর্ণা!

পুত্র নয়—একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন ভবানী দেবী।

বিমলাকান্ত কাশীতে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর সাহেব মেমসাহেবদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন বলে তার পদোন্নতিও হয়েছিল। তখন তিনি কালেক্টরেটের এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হয়েছেন। ডাক্তার দাই এগুলি অর্থাৎ আঁতুড়ে থাকবার লোক ইত্যাদির সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। কেউই বিশেষ আশঙ্কা করেন নি। তবে মাসীমারা আশঙ্কা করেছিলেন। এতকাল পরে সন্তান হবে। তার উপর ভবানী দেবীর শরীর আবার যেন কিছু খারাপ হয়ে পড়েছিল—শেষের দু' মাস।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা কাশীতে ফিরে আসার পর থেকেই গুছিয়ে বলি সুলতা। ভবানী দেবীর বৃত্তান্ত রায়বাড়ীর সর্বাঙ্গে সর্বকর্মে বোধহয় জড়িয়ে আছে।

ভবানী দেবীও কাশীতে এসে আবার যেন বদলে গেলেন। প্রথম তিন মাস আগ্রা পর্যন্ত তিনি মনে মুহ্যমানা এবং দেহে শীর্ণা হয়েছিলেন। কিন্তু আগ্রা থেকে স্বামীর সঙ্গে ওই কথাবার্তার পর হয়েছিলেন অন্য মানুষ। হাসি আনন্দ যেন তাঁর জীবনের পাত্র থেকে উপ্‌চে পড়ত। সোফির কাছে গান শুনতেন। স্বামীর খাওয়া-দাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু ত্রুটি হতে দিতেন না। কিন্তু কাশী ফিরে আট মাসের শেষ থেকে তিনি আবার বদলালেন।

স্বামীকে বললেন—এবার আমাকে ছুটি দাও। এই শরীর নিয়ে আমি যেমন দেখাশুনো করতাম তা আর করতে পারব না। হাঁটতে ফিরতেও আমার কষ্ট হয়।

মহেন্দ্র রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল—হুজুর বলেছিলেন—না—না। বেশী হাঁটাহাঁটি তুমি করো না। বিশ্রাম নাও। আমার জন্যে ভেবো না। মহেন্দ্র আছে। তা ছাড়া সোফি রয়েছে। আর মন্দির-টন্দিরে যাওয়াও বন্ধ কর। হাঁটাহাঁটি তোমার ওখানেই বেশী হয়। আর ওই উপোসগুলি। ওগুলিও এখন বাদ দেওয়া দরকার। নেহাত কোন পর্ব হলে—কি একান্ত ইচ্ছে হলে এক একদিন—।

বাধা দিয়ে ভবানী দেবী নাকি মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে হেসে বলেছিলেন—না, তাও আর যাব না। স্নানজল নির্মাল্য আসবে তাতেই হবে।

সুরেশ্বর বললে—ভবানী দেবী এই বয়সে তাঁর এই অবস্থান্তরে লজ্জিত হয়েছিলেন। এবং মনে মনে ক্ষুণ্নও হয়েছিলেন এর জন্যে। সম্ভবতঃ স্বামীর কাছে ফিরে এসেও তিনি দেহসম্পর্ক-রহিত একটি দাম্পত্যজীবনের কল্পনা করেছিলেন। প্রথম প্রায় এক বছর বীরেশ্বর রায় আংশিক পক্ষাঘাতে রোগীর মতই জীবনযাপন করেছিলেন। সুতরাং এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব স্বামীস্ত্রীর মধ্যে হয় নি। কিন্তু একবৎসর নিয়ম পালন ক'রে সুচিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেও যেটুকু রোগ অবশিষ্ট ছিল তা থেকেও এই চেঞ্জে যাওয়ার ফলে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেই সহজ এবং স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন ফিরে পেতে চাইবেন এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভোগী মানুষ। দুর্বল ভোগী নয়—সবল ভোগী তিনি। কিন্তু ভবানী দেবী তাঁর বিপরীত। তিনি বারো বৎসর ব্রতপালনের পর স্বামীর রোগশয্যায় ফিরে এসেছিলেন; এবং স্বামী তাঁর পুণ্যেই বেঁচেছেন এই বিশ্বাসবশে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর তপস্যাকে। তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল—বীরেশ্বর রায়েরও স্বপ্নভঙ্গ হল।

ভবানী দেবী সন্তান প্রসবের দিন গণনা করে ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন। মন্দিরে তিনি যেতেন না তাঁর দৈহিক অবস্থান্তরের জন্য, কিন্তু ঘরের মধ্যে পূজা পাঠ নিয়েই থাকতেন। স্বামীর কাছে আসতেন দুবার। সকাল এবং সন্ধ্যায়। দুবেলা দুটি প্রণাম ক'রে দু'চারটি কথাবার্তা বলে আপনার ঘরে চলে যেতেন।

একঘরে শোওয়া বন্ধ হয়েছিল। প্রথম কাশীতে আসবার পথে, কাশী পৌছুবার ঠিক আগের দিন থেকে। কাশীতে এসে থেকেই সেই যে একমাস সারাদিন উপোস ক'রে থাকতেন, ভোরে উঠে কাশীর ভিতরে বিমলাকান্তের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে এসে সারাদিন পূজা অর্চনা করতেন, তারপর সন্ধ্যায় আরতি দেখে বাড়ী ফিরতেন—তখন থেকে।

ব্রত উদ্‌যাপনের পরও পনেরদিন কাশীতে ছিলেন—তখনও সেই নিয়ম ভাঙেন নি। তারপর সারা তীর্থ ঘোরার চার পাঁচ মাস সেই নিয়মই বজায় রেখেছিলেন।

আগ্রাতে সন্তানসম্ভবা হয়েছেন এই কথাটা যখন ডাক্তার কবিরাজে বলে গেল, তখন স্বামীস্ত্রীতে যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল—যার কথা একটু আগেই তোমাকে বলেছি সুলতা—যার পর ভবানী দেবী স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেও এই নিয়মটুকু ভাঙেন নি।

তবে একটা নিয়ম নতুন করেছিলেন। হরিদ্বার থেকে ফিরে কাশী ফেরা পর্যন্ত সোফি বাঈ থাকত স্বতন্ত্রভাবে, জলপথে স্বতন্ত্র বজরায়, কাশীতে আগ্রায় হরিদ্বারে স্বতন্ত্র কুঠীতে; সেখান থেকে সে আসতো-যেতো নিয়মমাফিক, সকালে জলখাবার সময় ফল কেটে আনত, পান আনত, গান শোনাতো, দুপুরে খাওয়ার সময় এসে দূরে ব'সে থাকত; পান আনত; বড় রায়হুজুর শুলে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলে মনোরঞ্জন ক'রে ঘুম পাড়াতো; আবার সন্ধ্যের সময় গানের মজলিসে আসত। হরিদ্বার থেকে সন্ধ্যের মজলিসও বসত বড় রায়হুজুরের শোবার ঘরে, সেখানে ভবানী দেবী থাকতেন। তারপর সোফি বাঈ চলে যেত। এবার কাশীতে ফিরে ভবানী দেবী বললেন—সোফি থাকবে এই বাড়ীতেই, দোতলায়। ভবানী দেবীর কামরা এবং বড় হুজুরের কামরা একেবারে পুব দিকে, সোফির জন্যে নির্দিষ্ট হল একেবারে পশ্চিম দিকের কামরা। আর বদল হল হুজুরের সঙ্গে ভবানী দেবীর কামরার। একেবারে পূর্বদিকের কামরাখানা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট—কামরার পূর্বের জানালার নিচেই গঙ্গা এবং দক্ষিণদিকের জানালা খুললে অবারিত দক্ষিণই শুধু পাওয়া যায় না, গঙ্গাও খানিকটা পাওয়া যায়। রায়হুজুরকে দিলেন তার পাশের ঘরখানা, যেখানায় প্রথমবার তিনি থাকতেন।

সুরেশ্বর বললে—তোমার কি মনে হবে বা হচ্ছে তা আমি জানি না সুলতা, তবে আমার মনে হয়েছে বা এখনও আমার তাই বিশ্বাস যে ভবানী দেবীর ওই নতুন ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁর নিজের ভবিষ্যত তিনি নিজে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে আমাদের রায়বাড়ীতে একটা প্রবাদ আজও রয়ে গেছে। মেজঠাকুমা বলতেন—পুণ্যবতীর কাজ ফুরলো, কিন্তু যাই যাই করেও স্বামীর মমতায় যেতে পারছিলেন না; তাঁর ইষ্ট তাঁকে সন্তানধারণের লজ্জা দিয়ে চৈতন্য দিলেন—বললেন—বাঁচবি আর? বাঁচতে হলে, এই সংসারপঙ্কে ডুবতে হবে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস ভাগ্য তোর সধবার ভাগ্য, ভাগ্যের

ফলফুল ধরতে হবে। তা আমার দিদিশাশুড়ী প্রথম নাকি স্বপ্নে বলেছিলেন—মা, আমি স্বামীকে কাছে পেয়েও সে ব্রত পালনের ধর্মকে ধ'রে থাকব। কিছুদিন সংসার আমাকে ভোগ করতে দাও। ইষ্টদেবী বলেছিলেন—'বেশ তাই কর।' বলে হেসে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তা না-হলে মা কি স্বামী বেঁচে উঠলেই তাঁর যাবার কথা ছিল। তা একবছর পার হয়ে দু বছরের বছরেই থাকার মাশুল দিতে হল। সধবা মেয়ে, ফল ধরতে হল। তখন সতীবউয়ের চোখ খুলল। মনে মনে মাকে ডেকে বললেন—আর নয় মা। ভোগের সাধ আমার মিটেছে। আমাকে এবার পায়ে টেনে নে। মা বললেন—তথাস্তু। সংসারে থাকার যে ফলটি জীবনে ফলেছে, ওই ফল বোঁটা খসে মাটিতে পড়ুক—তখন আসব। নিয়ে যাব।

এই স্বপ্নের কথা কে তৈরী করে চালু করে গিয়েছিল তা জানিনে। সুরেশ্বর বললে—তবে আমার মেজদি আমাকে কথাটা বলেছিলেন এবং আজও পর্যন্ত একথা রায়বাড়ীর মেয়েরা প্রায় সবাই জানে এবং বিশ্বাস করে। সে অর্চনাও করে!

সুলতা বললে—তোমার কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয়, সে নিজেই ভবানী দেবী, জন্মান্তরে রায়বাড়ীর ঋণ শোধ করতে এসেছে—একথাও বিশ্বাস করে অর্চনা।

—হ্যাঁ—তা বোধহয় করে। আগে ছেলেবেলায় তো করতই। তবে এখন এম-এ পাশ করেছে, এখন সেটা ততটা শক্ত আছে কিন জানিনে।

সুলতা বললে—ছেলেবেলার বিশ্বাস সহজে মরে না। আমি ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে, আমার ঠাকুরদা'র ঠাকুরদা ঠাকুরদাস পালকে কিছুতেই তোমার আঁকা ছবির মত চেহারায় কল্পনা করতে পারি নে, বিশ্বাস করতে পারিনে। মনে হচ্ছে তুমি জমিদারীর অহঙ্কারে চাষী ঠাকুরদাসকে এমনি ক'রে এঁকেছ।

—ঠাকুরদাস পালের যে ছবি আমার আঁকা ছবির মধ্যে রয়েছে, তা কল্পনার ছবি নয় সুলতা। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আমলে ফটোগ্রাফের রেওয়াজ হয়েছে। রত্নেশ্বর রায় অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়েছেন—তার মধ্যে চার পাঁচখানা গ্রুপ ফটো আজও আছে। বিবর্ণ নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু তবুও ঠাকুরদাসকে সবগুলোতেই চেনা যায়। আমি তাকে যেমনটি পেয়েছি তেমনটি এঁকেছি। দেখাতে পারি।

—আমাকে দেবে সেখানা?

সুরেশ্বর হেসে বললে—দেব। কিন্তু কি করবে নিয়ে?

সুলতা বললে—দেওয়ালে ছবি দিয়ে জিনিওলজি তৈরী করব। আমাদের বাড়ীর জীবনের অহঙ্কারকে একটু সংযত করব। যা ছিলাম—যা হইয়াছি। 'যা হইব'—তার ছবি পার তো একখানা এঁকে দিয়ো।

—কিন্তু কতদিন পরের ভবিষ্যৎ সেটা বল? চরম ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে পারি। সেটা আমি ভবানী দেবীর মত জানি। তার এদিকের যে ভবিষ্যৎটুকু সেটা আমার অজানা। ভবানী দেবী একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। তিন মাস পর মাঘ মাসে তিনি একটি কন্যা প্রসব করে মারা যান। কাশীর সিবিল সার্জেন থেকে ভাল ডাক্তারদের ডেকে বীরেশ্বর রায় ডাক্তারের হাট বসিয়ে দিয়েছিলেন। সিবিল লাইনের একজন মেমসাহেব মিড্-

ওয়াইফকে এনেছিলেন ডেলিভারির জন্যে। তিনদিন লেবার পেনের পর ডেলিভারী হল। হ'ল কন্যাসন্তান। তারপর হ'ল ভবানী দেবীর জ্বর। সেই জ্বরে আর তিনদিন পর তিনি মারা গেলেন।

সেদিন তিথি ছিল পূর্ণিমা। মাঘীপূর্ণিমা হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যতিথিগুলির মধ্যে একটি। মাঘী পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা।

মৃত্যুর পর ভবানী দেবীর হাতবাক্স থেকে চিঠিখানা পেয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, রায়বাড়ীর পুরনো কাগজ ঘেঁটে অনেক মূল্যবান দলিল পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী পেয়েছি; রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের তিরিশ বছরের ডায়রী পেয়েছি; দেবোত্তরের সিন্ধুকের মধ্যে তাড়াবাঁধা চিঠির মধ্যে সোমেশ্বর রায়—রাণী কাত্যায়নীর প্রেমপত্র পেয়েছি; বীরেশ্বর রায়কে শ্যামাকান্তের গোপন সাধনার কথা লিখে যে পত্র ভবানী দেবী লিখেছিলেন তাও পেয়েছি। চন্দন কাঠের বাক্সে কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কীর্তিহাটের পাঁচালী পেয়েছি, কিন্তু ভবানী দেবীর এই চিঠির মত মূল্যবান আমি আর কিছু পাই নি। চিঠিখানা আমি অহরহ সঙ্গে রাখি। রাত্রে মাথার বালিশের তলায় রেখে শুই। ছবি আঁকবার আগে বা কোন কাজ করবার আগে কপালে ঠেকাই।

জামার ভিতরের পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য মরক্কো লেদারের নোটকেস বের করে তার ভিতর থেকে একখানি বিবর্ণ কাগজ বের করে সযত্নে ভাঁজ খুলে সামনের টেবিলের উপর সে মেলে ধরলে।

—এই দেখ।

সুলতা দূর থেকেই চিঠিখানার হস্তাক্ষর দেখে বিস্মিত হল। গোটা গোটা সেকালের ছাঁদের হস্তাক্ষর, কিন্তু ভারী সুন্দর। আরও একটা কথা—লেখাগুলি এতটুকু অস্পষ্ট হয় নি, কালী যেন ডগ্‌ডগ্‌ করছে। কালী সম্পর্কে বিস্ময় তার ছিল না, কারণ সোসিওলজি সম্পর্কে রিসার্চ করতে গিয়ে অনেক পুরনো পুঁথি সে ঘেঁটেছে। তার মধ্যেও এই কালীর দীপ্তি সে লক্ষ্য করেছে। সেকালে এদেশে লোহার কড়াইয়ে নানারকম জিনিস ভিজিয়ে তার কষ থেকে কষের কালী তৈরীর কথা সে জানে। একটা উপাদান—হীরাকষের নামও তার মনে আছে।

চিঠিখানার উপর সাগ্রহে সে ঝুঁকে পড়ল। প্রথমেই সম্বোধনটা বড় ভাল লাগল।

*　　　*　　　*

জন্মজন্মান্তরের পরমারাধ্য প্রিয়তম

স্বামীন—

দাসীর শেষ প্রণাম নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ করুন। শেষমুহূর্তে আমার জ্ঞান থাকিবে না—সেই কারণে আমি প্রণাম এই পত্র নিবেদন করিয়া রাখিলাম।

সন্তান প্রসব করিয়াই আমার জীবনের পালা সম্বরণ করিতে হইবে, ইহাই দৈবাদেশ। সজ্ঞানে আপনাকে দেখিয়া দেহত্যাগে দুঃখ অনুভব করিব বলিয়াই মা'র নিকট ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম। জানি তুমি ইহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু বিশ্বাস করিও—দৈবাদেশ স্বপ্নযোগেই হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বাস করিও। তোমাকে কতদিন তো বলিয়াছি, স্বপ্নযোগে

মায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তার কথা। বারো বৎসরের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিয়া—তোমার অসুখের কথা শুনিয়া—ব্রত অসম্পূর্ণ রাখিয়া তোমার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মা তোমাকে বাঁচাইলেন। আমাকে বলিলেন—তুই ফিরিয়া আয়। কিন্তু তোমাকে ফিরিয়া পাইয়া যাইতে দুঃখবোধ করিলাম। নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিনির্গত হইল। জননী হাসিলেন। বলিলেন—থাকিলে এয়োতী নারীর ফল ভোগ করিতে হইবে! ফল ধারণ করিয়া সৃষ্টির নিয়ম মানিতে হইবে। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াও শিবের প্রতি এমত আকর্ষণে ফিরিয়া উমা হইয়া গিরিরাজতনয়া হইয়াছিলেন। এবং শিবকে লাভ করিয়া, যিনি নিজেই মহাপ্রকৃতি, তাঁহাকেও ফল ধরিতে হইয়াছে। স্বকীয় অঙ্গের হরিদ্রা হইতে গঠন করা পুতুল জীবিত হইয়া গণেশ হইল অতঃপর কার্তিকের। কার্তিকেয়ের জন্য শিব উমার সহিত রতিরঙ্গে মাতিয়াছিলেন।

এ স্বপ্নের কথা তোমার নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম। এই দিবস তুমি আমাকে বলিলে—দেখ ভবানী, ইতিপূর্বে তুমি আমাকে অনেক স্বপ্নের কথা বলিয়াছ, আমি এ সম্পর্কে কোনপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করি নাই বা উত্তর প্রদান করি নাই। শুনিয়া তোমার তৃপ্তির জন্য কখনও হাস্যসহকারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি, কখনও কৃত্রিম বিস্ময়-প্রকাশ করিয়াছি—কখনও শঙ্কা প্রকাশ করিয়া তুমি যে প্রকার দেবপূজা বা গ্রহস্বস্ত্যয়ন করিতে চাহিয়াছ, তাহাতেই মত দিয়াছি। কিন্তু আজ যে স্বপ্নের কথা বলিতেছ, ইহার উত্তর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত না দিয়া উপায় নাই। কথাটা হইল কি জান, স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না, বা সত্য নহে; দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থায় মনুষ্যসকল যে প্রকার চিন্তাভাবনা করিয়া থাকে বা যে সমস্ত ঘটনা সমুদয় সংঘটিত হইয়া থাকে, নিদ্রিত অবস্থার মধ্যেও সেই সকলই কিছুটা এলোমেলো হইয়া বা যেমত তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় বা বিশ্বাস তদনুসারে পরিবর্তিত হইয়া স্বপ্ন হইয়া দেখা দেয়।

যেমন ধর—তুমি ক্রমাগতই দেবতার কথা ভাবিয়া থাক। তাহাতে তোমার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস; সুতরাং তিনিই তোমাকে দেখা দিয়া কথা বলিয়া থাকেন। তোমার মনে হইয়াছে যে—তুমি ব্রত উদ্‌যাপন স্থগিত রাখিয়া আমার অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলে এবং আমি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া বাঁচিলাম। তাহাতে তোমার ধারণা হইল যে, এমত কঠিন অসুখ হইতে যখন আমি বাঁচিলাম তখন তাহার মাশুলস্বরূপ তোমার জীবন দিতে হইবে। যা আমার জীবনলাভেই তোমার তপস্যা পূর্ণ হইল—এবার তোমাকে যাইতে হইবে। এবং এতদিন ব্রহ্মচর্য করিয়াছ, তপস্যা করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার মনে ধারণা হইয়াছে যে, ইহার পর সন্তান ধারণ করা তোমার পক্ষে পাপ বা শাস্তিস্বরূপ হইবে। সুতরাং এমতপ্রকার স্বপ্ন তুমি দর্শন করিয়াছ।

আমি খুবই আঘাত পাইয়াছিলাম। তাহার কিছুটা তুমি অনুভব করিয়াছিলে। এবং কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলে—ভবানী, আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমার কথা ভুল; আমি এতকাল নাস্তিক ছিলাম, সেইমত আচরণ করিয়াছি; সেইহেতু এতবড় দৃষ্টান্তের এবং শিক্ষার পরও মূঢ়ের মত তোমার কথায় প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তুমি চলিয়া গেলে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আমি সত্যই মূঢ় ভ্রান্ত। দেখ,

যতবার এমত চিন্তা মনে উদিত হইল ততবারই ঐ কোণে একটা টিক্‌টিকি টকটক করিয়া উঠিল। এবং আরও আশ্চর্যের কথা ততবারই বাহিরে হাঁচির শব্দ শুনিয়াছি। এবং আরও আশ্চর্যের কথা আমার মনের মধ্যেও বারবার মায়ের মূর্তি ভাসিয়া উঠিল।

আমাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য তুমি মায়ের একটি বিশেষ পূজা দিতে বলিয়াছিলে। পূজার পর নির্মাল্য ও চরণোদক গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলে—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলাম।

সেই রাত্রে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—দেখ ভবানী, একটি শ্যামাসঙ্গীত আছে। আয় মা সাধনসমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে। আমাকে গাহিতে বলিয়াছিলে, আমি গীতখানি গাহিলাম, শেষ হইবামাত্র বলিলে—ভবানী, অতঃপর আমরা যতদিন বাঁচিব, ততদিন এবম্প্রকার সাধনসমরই করিব মায়ের সঙ্গে। আমার দেহের তো এমতপ্রকার অবস্থা। এই অবস্থাই আমাকে এই সাধনজীবনে সাহায্য করিবে। আমরা সংসারে যতদিন বাঁচিব ততদিন ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীর মতই জীবনযাপন করিব। দেখাই যাউক না-কেন—'মা হারে কি পুত্র হারে?'

আমি আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কিছুদিন বেশই ছিলাম—সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস এক হইয়াছে।

কিন্তু মায়ের বিচিত্র পাকচক্র দেখ, মদীয় পিতৃদেবের সন্ধানের নিমিত্ত সোফিকে আহ্বান করা হইল এবং মা সেটা করাইলেন আমাকে দিয়াই। আমার ডাকে নির্ভয়ে সে আসিল এবং কথাবার্তার পর যখন তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল তখন রত্নেশ্বর কথাবার্তাগুলি শুনিয়া এবং সমস্ত বিবরণ জানিয়া সোফিকে সেই তোমাকে গান শুনাইবার জন্য নিযুক্ত করিল। ভয় করিল—সোফি স্বাধীন থাকিলে হয়তো বা কথাটা প্রকাশ করিয়া দিতে পারে। এবং আশ্চর্যের কথা—আমার মনে হইল—আমি বাঁচিলাম, তুমি পুরুষ এবং ভোগী, তোমাকে তুষ্ট করিবার একজন লোক পাইলাম—তাহাকে আড়াল দিয়া আমি বাঁচিব।

তুমি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে। আমি সোফিকে আরও বেশী করিয়া সামনে আনিলাম। কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা করিয়া আমাকেই আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে। রত্নেশ্বরকে যজ্ঞ করিয়া গ্রহণ উপলক্ষ্যে তুমি তাহাকে কীর্তিহাট লইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলে না। কিন্তু আমিই জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

তোমার মনে পড়িবে—আমি বলিয়াছিলাম—একনিষ্ঠভাবে সে তোমার মনোরঞ্জন করিয়া তোমার একধরনের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছে। মহাভারতে মহাত্মা বিদুরের গর্ভধারিণী দাসী ছিলেন। ইহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। তুমি কোন উত্তর প্রদান কর নাই। তবু লইয়া যাইতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলে। এই কারণেই তাহাকে আমি সকালে তোমার ফল কাটিয়া আনিবার ভার দিয়াছিলাম। তুমি যত সুস্থ হইতেছিলে তত বেশী করিয়া আমাকে টানিতেছিলে। আমি তোমাকে ছাড়িয়া মরিতে চাহিতেছিলাম না অথচ ভয় হইতেছিল—সাধনসমরে হয় তো হারিয়া যাইব। মনে কর আমরা সন্তানাদির কামনা করি নাই বলিয়া রত্নেশ্বরের অনুকূলে দানপত্র সমাধা করিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিলাম।

তাহার তীর্থযাত্রার পথে গয়া হইতে ফিরিয়া পাটনায় সেদিন সকালে সোফি ছিল না,

আমার পূজা শেষ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল—তুমি রাগ করিয়াছিলে—তোমার সন্তোষ সাধন করিতে গান গাহিলাম, তুমি পাখোয়াজ সঙ্গত করিয়া উল্লাসে বলিয়া উঠিলে—আমি ভাল হইয়া গিয়াছি। ছড়ি ছাড়িয়া হাঁটিতে লাগিলে, খানিকটা ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, আমি সুখী হইলাম, কিন্তু তুমি যখন আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে, তখন ভয় পাইতাম। আরও ভয় পাইতাম দর্পনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া। আমারও যেন যৌবন ফিরিয়াছে। মাসীমারা বলিলেন—গঙ্গার বাতাসে, পশ্চিমের জলে, আমার শরীর সারিতেছে। এবং জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে এই সময় মা আমাকে আর স্বপ্নে দেখা দেন নাই।

কিন্তু যেদিন তুমি সোফিকে নাচিতে হুকুম করিলে, সেদিন আমি চমকিয়া উঠিলাম। শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিলাম—নাচ দেখিতে শখ হইল কেন? সোফির কটাক্ষ, তাহার অঙ্গের হিল্লোল লীলা দেখিয়া তোমার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং আমার নিজের মধ্যেও কামনা জাগিয়াছিল—ইহা অস্বীকার করিব না।

তাহার পর যাহা হইল তাহা হইয়া গেল। কুশীর মুখে গলিত ঘৃতধারা যখন অগ্নিকে আকৃষ্ট করে তখন ঘৃতের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না, সে আত্মসমর্পণই করে। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে গিয়াও পারি নাই।

সেইদিন রাত্রে মনে হইল—এ কি হইল। এ কি করিলাম? সাধনসমরে পরাজিত হইলাম। অনেক কাঁদিলাম। শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন স্বপ্ন দেখিলাম। মা দেখা দিয়া মৃদু মৃদু হাসতেছিলেন। মাকে বলিলাম—মা, আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। এইবার চরণে স্থান দাও। টানিয়া লও।

মা বলিলেন—সংসারে থাকিতে চাহিয়াছিলে, তাহার ঋণ শোধ কর। তৎপর তোমাকে টানিয়া লইব। মৃত্তিকাবক্ষে বৃক্ষ জন্মে, রস শোষণ করে, তাহার ঋণ শোধ হয় ফলদানে। তোমাকেও ফল দিতে হইবে।

কিন্তু তাহাতেও আমি দমিত হই নাই। আমি যেন ফলবতী না হই এই জন্য কাশীতে বিশেষ সঙ্কল্প লইয়া কঠোর ব্রত করিলাম। তোমার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিলাম। লোকসমাজে কি করিয়া মুখ দেখাইব ভাবিয়া পাইলাম না। আগ্রায় তোমার সহিত কলহ হইল। তুমি কঠিন কথা বলিলে। তখন সোফির শরণাপন্ন হইলাম। সোফি আমার ভগ্নী-তুল্যা। তোমার দিক দিয়াই নয়, আমার দিক দিয়াও বটে। তাহাকে ডাকিয়া সব খুলিয়া বলিয়া বলিলাম, সোফি তুমি আজমীঢ় যাইও না। তুমি এখানে থাক। আমাকে রক্ষা কর। ভগ্নীর কার্য কর। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম হইলেও তুমি তাঁহাকে ভজনা করিয়াছ, তাঁহাকেই চাহিয়াছ; আমার বাবার কাছে দীক্ষা লইয়া তুমি ধর্মেও আমাদের ধর্ম পালন করিতেছ। এ জন্মে তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হও। তুমি নূতন করিয়া তাঁহার মনোহরণ কর। তাহাকে টানিয়া লও।

এ সব বৃত্তান্ত তুমি সোফিকে জিজ্ঞাসা করিলেই জ্ঞাত হইবে। সে কখনই মিথ্যা বলিবে না। সে আমার অনুরোধে, আদেশে নূতন করিয়া সাজিল, নূতন করিয়া অঙ্গ মার্জনা করিল, বেণীবন্ধন করিল। আমি সেই সুযোগ দিবার জন্য তাহাকে প্রায়ই নৃত্য দেখাইতে আদেশ

করিয়াছিলাম।

তুমি আকৃষ্ট হইলে। তাহার নিকট ধরা দিলে। তখন তোমার শরীর নীরোগ, দেহে পূর্বের বল পাইয়াছ, বলিতে কি তোমাকে দেখিয়া আমারই মনে হইত তুমি সেই যৌবনের বীর নবযুবক!

আমি সোফিকে অধিক করিয়া তোমার দিকে ঠেলিয়া দিলাম। কাশীতে আসিয়া সেই কারণেই সোফিকে দোতলায় স্থান দিলাম, তোমার সঙ্গে ঘর বদল করিয়া এক পাশের ঘর লইলাম এবং তোমার ঘরে সোফির আসা-যাওয়ার পথের সব সঙ্কোচ ঘুচাইয়া দিলাম।

স্বামীন, পরম দেবতা, আমি নিশ্চিত জানি, আমার সংসার ভোগের অনিবার্য ফল প্রসব করিয়াই আমাকে যাইতে হইবে। আগ্রাতে তুমি আক্ষেপ করিয়া প্রকারান্তরে আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলে যে, সংসারে মানুষ যাহারা, তাহারা যেন দেবী অংশোদ্ভূতা যাহারা তাহাদিগকে বিবাহ না করে। তাহারা বিবাহ করিয়া স্বামীকে সেবা করে, ভালবাসে, স্বামীকে পাইবার জন্য নয়, দেবতাকে পাইবার জন্য। সংসার করে, স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য। পরজন্মে বা লোকান্তরে তাহারা স্বামীকে কামনা করে না, তাহারা কামনা করে দেবতাকে। বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ হয়, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য।

স্বামীন্, কথাটি আমি মনে মনে অনেক আলোচনা করিয়াছি। কথাটি এক হিসাবে সত্য বটে। কি করিয়া অস্বীকার করিব? কিন্তু এই হিসাবটি তো মায়া-মোহের মিথ্যা হিসাব। ইহাই তো শাস্ত্রোক্ত পথ। তোমার কথাটি ভাল লাগিবে না। কারণ তোমার অনেক বাসনা আছে। আরও অনেক জন্ম তোমাকে পৃথিবীতে আসিতে হইবে। আমার এই জন্মেই মুক্তি নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং ইহাই অবশ্যম্ভাবী। তুমি যেন আর বিবাহ করিও না। আমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি না। তোমার স্বার্থের জন্য বলিতেছি। কারণ নিজের শক্তি না বুঝিয়া তুমি সকল সম্পত্তি রত্নেশ্বরকে দান করিয়াছ। বিবাহ করিয়া নূতন সংসার করিলে নিদারুণ অশান্তি ও পুত্রের সঙ্গে কলহ আরম্ভ হইবে। সে কলহে অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমায় রায়বংশের এবং আমার পিতার সাধনভ্রষ্টতার সকল রহস্য প্রকাশ পাইবেই।

এ সম্পর্কে আমি দাদার সঙ্গে কৌশলে আলোচনা করিয়াছি।"

সুলতা এবং সুরেশ্বর এক সঙ্গেই চিঠিখানা পড়ে যাচ্ছিল। সুরেশ্বর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে ভবানী দেবীর দাদা বিমলাকান্ত; বুঝতে পারছ সুলতা?

সুলতা ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ, তা সে বুঝেছে।

তারপর পড়ে গেল—

"দাদাকে বলিলাম, দাদা সম্পত্তি তো রত্নেশ্বরকে দানপত্র করা হইয়াছে। এখন যে সন্তান হইবে তাহার কি হইবে?

দাদা বলিলেন—রত্নেশ্বর অবশ্যই তাহাকে তাহার অংশ দিবে। সে তোমার সন্তান। বীরেশ্বরেরই পুত্র। দানপত্র করিয়াছে বলিয়া কি সে অংশ দিব না এমন কথা বলিতে পারে?

আমি বলিলাম—দাদা, বিষয় বিষের তুল্য। ইহা দেবতাকেও স্বার্থপর করে। মানুষকে অমানুষ করে।

দাদা বলিলেন—তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। তবুও রত্নেশ্বর তাহা পারিবে না।

আমি বলিলাম—মা কালী তাহাই করুন। বাবা বিশ্বনাথ তাহাকে সেই সুমতিই যেন দেন। কিন্তু আইনটা কি? আইনের বলে পাইতে পারিবে কি?

দাদা বলিলেন—না। দানপত্রের অর্থই হইল যে, দানপত্র সহি এবং রেজেষ্ট্রী হইবামাত্র সেই মুহূর্ত হইতে গ্রহীতা মালিক হইল। দাতা আর কোনরূপেই তাহা নাকচ করিতে পারিবেন না। তবে অনেক সময় এমন মামলা হইয়া থাকে, দাতা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, তিনি অসুস্থ, বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। তাহা ব্যতীত এ ক্ষেত্রে যদি সকল কথা অর্থাৎ রত্নেশ্বর বিমলার গর্ভজাত আমার পুত্র হিসাবে স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় সোমেশ্বর রায়ের পৌত্র নহে, সে বীরেশ্বরের ঔরস-জাত পুত্র, কেবলমাত্র বিমলার পুত্র চুরির অপরাধ গোপনের জন্য এমত প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা হইলে সবই নাকচ হইয়া যাইবে। দৌহিত্র হিসাবে সোমেশ্বর রায়ের উইলসূত্রে সে যে আট আনার মালিক, তাহার মালিকও বীরেশ্বর হইবেন এবং পোষ্যপুত্র হিসাবে যে আট আনা দান করিয়াছেন, তাহাও নাকচ হইবে। সুতরাং চিন্তা করিও না। এ কার্য রত্নেশ্বরও করিবে না। বীরেশ্বরও করিবে না। তাহাতে আমাদের পিতৃদেবের মর্মান্তিক কথা এবং শ্বশুর মহাশয়ের মনোহরা যোগিনী লইয়া কেলেঙ্কারির কথা সমুদয় প্রকাশ হইয়া যাইবে। সমগ্র দেশে রায়বংশের আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।

এই কথা তোমাকেও প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, নিশ্চিন্ত থাক। রত্নেশ্বর এমত করিবে না। যদি করে তাহা হইলেও চিন্তা নাই। কলিকাতার বাটী, সম্পত্তি এবং নগদ কারবারের যে টাকা আছে, তাহা সমুদয় আমি আমাদের এই সন্তানকে দিব। তাহা ব্যতীত আমার পিতামহের আমল হইতে কিছু হীরা জহরতের সঞ্চয় আছে। আমার পিতৃদেব সে সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে হাত দিই নাই। মধ্যে মধ্যে দু-চারিখানা কিনিয়াছি। পিতৃদেব এ সঞ্চয় দৌহিত্রকে দেন নাই। আমাকেই দিয়াছিলেন। তাহার মূল্যও অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা। ওই সকল জহরতের মূল্য এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতের লর্ডদের এই সকল রত্নরাজিতে ঝোঁক বাড়িয়াছে। এ সমুদয় হইতে আমি আর একটা কীর্তিহাট এস্টেট গড়িয়া তুলিব।

একটি সন্তানের তাহাতে ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু আমার পর বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে চার-পাঁচ বা ততোধিক সন্তান জন্মিলে কি করিবে? এবং তাহাদের যিনি জননী হইবেন, তিনিই বা মানিবেন কেন? সন্তানেরাই বা শুনিবে কেন?

তুমি ভাবিও না আমি আমার সন্তানদের স্বার্থহানির কথা চিন্তা করিয়া এ সকল কথা লিখিতেছি। আমি ইহা লিখিতেছি এই বংশ-কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া যাইবে আশঙ্কায়।

তুমি সোফিয়াকে লইয়া থাকিও। সোফিয়া বাঈজী হইলেও এতকাল ধরিয়া তোমাকে ভজনা করিয়াছে, তোমার প্রতি তাহার প্রেম অতি গভীর। সে আমার মত নয়। সে তোমাকেই চায়, মুক্তি সে চাহে না। সে আজমীঢ় না গিয়া তোমাকে পাইবার আশা পাইয়া ফিরিয়াছে। সে আমারই মত তোমার সেবা করিবে। সম্ভবতঃ অধিক মাত্রায় করিবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। কি আর লিখিব? তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এ জীবনে

আমার সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে। তুমি ছাড়া আর কাহারও সহিত বিবাহ হইলে—সে আমার বারো বৎসর ব্রতকাল পর্যন্ত বিবাহ না করিয়া থাকিত না। এবং তাহার সংসারে আমার আর স্থান হইত না। এবং ভাগ্যের চক্রান্তে যে সন্দেহ তুমি করিয়াছিলে তাহাই লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া আমার ললাটে কলঙ্ক কালিমা লেপিয়া দিত। রত্নেশ্বরের ভাগ্যেও লাঞ্ছনার অন্ত থাকিত না।

আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম গ্রহণ করিও। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিও। আমার অপরাধ মার্জনা করিও।

আমার সন্তান বাঁচিলে—বাঁচিবে বলিয়াই মা বলিয়াছেন, এবং সন্তান কন্যাসন্তান হইবে, তাহাকে তুমি প্রতিপালনের জন্য দাদা এবং বউদিদির হস্তে অর্পণ করিও। রত্নেশ্বংকে দিয়া আবার তাহাকে কাড়িয়া লইয়াছি। দাদার বিবাহ আমিই দিয়াছিলাম। অদ্যাপি তিনি নিঃসন্তান! দাদার মনে ক্ষোভ আছে। তুমি এই সন্তান তাঁহাকেই মানুষ করিতে দিও। তুমি সোফিকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিও। রত্নেশ্বর বংশের অভিশাপ ব্যর্থ করিবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। রায়বংশ ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

পরমারাধ্য প্রিয়তম স্বামীন, দাসী শ্রীচরণে বিদায় লইতেছে।

ইতি
প্রণতা
ভবানী।

এ-চিঠিখানা রায়বাড়ীতে ছিল না। এ-চিঠি পরে পেয়েছি আমি অন্নপূর্ণা দেবী—রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরার কাছে। তার জন্ম ১৮৬২ সালে, ১৯৩৭ সালেও তিনি বেঁচেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তাঁকে দেখিনি আমি। এবং রায়বংশের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর থেকে কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি রাখেননি।

সুলতা—তার মূল কারণ জমিদারী এবং সম্পত্তি।

বিয়ের পর তাঁর সন্তান হতেই, তাঁর শ্বশুরেরা বীরেশ্বর রায়ের যে অর্ধেক অংশ পোষ্যপুত্র রত্নেশ্বরকে দান করেছেন, তার উপর দাবী তুলেছিলেন। বলেছিলেন—কন্যা জন্মাবার পূর্বে বীরেশ্বর পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন তাঁর সন্তান নেই বলে। কিন্তু পরে সন্তান যখন হয়েছে, কন্যাও সন্তান, তার সন্তানেরাই বীরেশ্বরের বিত্তাধিকারী, সুতরাং এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ সিদ্ধ নয়, এবং সে-সময় বীরেশ্বর রায় পক্ষাঘাতে অসুস্থ ছিলেন। সে-রোগ তাঁর কখনওই সারেনি। তার প্রমাণ, ভবানী দেবীর মৃত্যুর দেড় বছর পর আবার তিনি পক্ষাঘাতে একেবারেই পঙ্গু এবং স্মৃতি ও বাকশক্তি হারিয়েছিলেন; তার কিছুদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় সই-করা দানপত্র এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ অসিদ্ধ। তা নাকচ হতে বাধ্য।

তোমার বাবা ব্যারিস্টার, তুমি নিজেও আইন মোটামুটি জান। এসব তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না।

পরে বিমলাকান্তের মধ্যস্থতায় এ-মামলা মেটে। তিনি অন্নপূর্ণাকে ডেকে রত্নেশ্বরের সামনে ভবানী দেবী যে-চিঠি বীরেশ্বর রায়কে কাশী থেকে লিখেছিলেন, তাঁর পালক-পিতা যে-চিঠি

লিখেছিলেন, যে-চিঠি দুখানা নিয়ে এসেছিল ছেদী সিং, সেই চিঠি এবং তার সঙ্গে এই চিঠি দেখিয়ে অন্নপূর্ণাকে নিরস্ত করেছিলেন মামলা থেকে। এবং এই চিঠিখানা তিনি চেয়ে নিয়ে বলেছিলেন—ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে। আমি রাখব।

তার সঙ্গে রত্নেশ্বর বোনকে দিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা। আর বিমলাকান্ত দিয়েছিলেন তার নিজের সবকিছু।

অন্নপূর্ণাকে তিনিই মানুষ করেছিলেন। তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন।

এই কথাবার্তার সময়েই ঠাকুরদাস পাল সমস্ত কথা শুনেছিল। এবং এই কথার জোরেই সে রত্নেশ্বর রায়কে বলেছিল, তোমার বংশের সব কুলুজী আমি ফাঁস করে দেব। এবং তার জন্যেই—।

সুলতার বুঝতে বাকি রইল না যে, সুরেশ্বর বলতে চাইছে—তার জন্যই রত্নেশ্বর রায় পিক্র গোয়ানকে ইসারা করেছিলেন এবং সেই ইসারার হুকুম শিরোধার্য করে পিক্র তাকে ঝগড়া করতে টেনে নিয়ে এসেছিল কাঁসাইয়ের গোয়ানপাড়ার ঘাটে। এবং মুহূর্তে তার লুকানো ছোরাখানা বের করে ঠাকুরদাস পালের পেটখানা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরদাস পালের পেটের মধ্যে রায়বাড়ীর গুপ্তকথা যা লুকনো ছিল, যা হজম হবার নয়, তা তার চিরে-দেওয়া পেট থেকে রক্তের স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে মাটির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—এর পর বীরেশ্বর রায়ও একরকম মরা মানুষ। রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন—"একবার মাকে হারাইয়া ভ্রান্তির মধ্যে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর আবার তিনি সেই প্রেতই হইলেন! আবার সেই মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণী নাকি সোফিয়াকেই তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে এবং অহরহ তাঁহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে। মাতুলও তাহাই বলিলেন। বলিলেন—মাতৃদেবী এইরূপই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার নিকট। সোফিয়া বাঈ মুসলমানের কন্যা। পেশায় সে বাঈজী। বহুজন ভজনাই তাহার জীবিকা। সেই সোফিয়া বাঈও পিতৃদেবের আচরণে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। সে পাগলাবাবার কাছে দীক্ষা লইয়া এখন হিন্দুর আচরণেই থাকে। তাহার কর্ম্মগুলি সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কিন্তু পিতৃদেব (দেবতা বলিতে সঙ্কোচ হয়) হয় উন্মাদ, নয় জীবনকালেই প্রেতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে যাইতে ইচ্ছা হয় না, আমার ক্রোধ হয়, ঘৃণা হয়, লজ্জাও হয়। আমার দেবীতুল্য মাতৃদেবীর নিন্দা এবং তাঁহাকে প্রকারান্তরে গালিগালাজই করিয়া থাকেন।

বলেন, আমার জীবন সে বিষময় করিয়া দিয়া গিয়াছে। সারাটা জীবন একটা সুন্দরী প্রস্তর নারী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করিয়া আমার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তপস্বিনী-সতী-শাপভ্রষ্টা দেবীকে বিবাহ করিয়া আজ আমার এই অবস্থা। আমি ভালবাসিলাম তাহাকে, সে আত্মসমর্পণ করিল দেবতাকে। আমাকে সারাজীবন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, জীবনের একটা কণা না দিয়া, আমার হৃদয়ের ক্ষোভের তুষের স্তূপে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া দেবলোকে চলিয়া গেল। আমি তুষানলে দগ্ধ হইতেছি, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইহাই সতীত্বের এবং নারীধর্ম্মের উৎকৃষ্টতম আদর্শ।

সোফিয়া হউক বাঈজী, হউক সে সকলের চক্ষে ঘৃণিতা, পতিতা, হউক সে বিধর্মী, তথাপি সেই আমার সান্ত্বনার উৎস, সেই আমার শান্তি, সেই আমার সব।

সমাজ ইহাতে আপত্তি করিলে আমি সমাজ ছাড়িব। আত্মীয়স্বজন, এমনকি তুমি পুত্র, তুমি আপত্তি করিলে তোমাকেও পরিত্যাগ করিব। আমাকে বলিলেন—তোমার ঘৃণা হয় তুমি আসিয়ো না। ইচ্ছা না হইলে বা লজ্জাবোধ করিলে আমার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ করিয়ো না। স্বর্গে মুক্তিতে আমার লোভ নাই, কামনা নাই এবং তোমার মত দেবোত্তরভোগীও আমি নহি যে, আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

আমার কলিকাতার সম্পত্তি আছে। ইহা দেবোত্তরের অন্তর্গত নহে, ইহার পত্তন করিয়াছিলেন কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য। তিনি প্রথম যৌবনে মুসলমানীকে বৈষ্ণবী করিয়া ঘর বাঁধিয়াছিলেন, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন নাই; আমার পিতা একটা অজাতের মেয়েকে লইয়া তাহাকে যোগিনী বলিয়া জাহির করিয়া প্রকাশ্যে—কীর্তিহাটে রাখিয়াছিলেন। আমি সোফিয়াকে লইয়াই জীবনযাপন করিব, আমি যদৃচ্ছা জীবনযাপন করিব। ইহাতে কাহার কোন কথা শুনিব না। মদ্য আমি পান করিব। চিকিৎসকের কথাও আমি মানিব না। তাহাতে আমার যাহা হয় হইবে। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন—আবার আমি পঙ্গু হইতে পারি। হইলে যতক্ষণ অর্থ আছে, ততক্ষণ আমার সেবার কোনরূপ অভাব হইবে না। তুমি পুত্র হইয়া আমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়ো না।

তুমি তোমার শ্বশুরের পরামর্শে—তিনি ডেপুটি সাহেব, হাকিম লোক, তাঁহার পরামর্শ আইনানুসারে ভাল, তুমি জমিদারী আইন অনুসারে চালনা করিতেছ; বলিতেছ এ-যুগ নূতন যুগ। উত্তম কথা। তাহাই চল। বলিতেছ—এ-যুগে যাহারা ভদ্র, যাহারা শিক্ষিত, যাহারা অভিজাত, তাহারা আর আগের নিয়মে চলে না। তুমি তাহাই চল।

আমার কাছে আমাকে এরূপভাবে উত্যক্ত করিতে আসিয়ো না। তাহার শ্রাদ্ধে আমি যাইব না। তাহাতে তোমার মাথা হেঁট হইবে তুমি ফিরিয়া যাও।

রত্নেশ্বর রায়ের দারুণ ক্রোধ হয়েছিল। তিনি বীরেশ্বর রায়ের চেয়ে কম ক্রোধী ছিলেন না। তবু তিনি ছিলেন সংযমী এবং ছেলেবেলা থেকে জীবনের শিক্ষাও ছিল অন্যরকম। তাছাড়া জমিদারীতে আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন অভিভাবকের অধীন হয়েছিলেন—যিনি ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক, তারপর পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এবং রত্নেশ্বর রায় তাঁর ডায়রীতে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে মিলনের পর যতই আবেগ এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকুন, তাঁর বাল্যকালে বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন, সেটা সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল মাত্র। মায়ের জীবিতকালে সে মুখ বন্ধ গর্তের সাপের মত চাপা ছিল; মায়ের মৃত্যুর পর সুযোগ পাবামাত্র তার বিষ নিশ্বাসে আর মুখে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

তিনি বাপকে মায়ের শ্রাদ্ধে বলতে এসেছিলেন। ভবানী দেবীর মুখাগ্নি করেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রত্নেশ্বর তখন কীর্তিহাটে। এবং তখন সরস্বতী-বউ স্বর্ণলতা চার-পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। এবং সন্তান প্রসব করে তিনি মারা যাবেন এ-কথা কেউ ভাবেওনি। চিকিৎসকেরাও

না। প্রসবের তিন-চার দিন পর মারা গেলেন ভবানী দেবী, সুতরাং মৃত্যু আকস্মিক। রত্নেশ্বরের অনুপস্থিতিতে বীরেশ্বর শেষকৃত্য করেছিলেন। দশদিনে অশৌচান্তের সময় রত্নেশ্বর এসে পৌঁচেছেন, একলাই পৌঁচেছেন; সরস্বতী-বউয়ের বাপ এস-ডি-ও সাহেব ডাক্তারদের পরামর্শমত কন্যাকে তখনকার দিনে ট্রেনে যেতে দেননি। রত্নেশ্বর একলা গিয়েছিলেন। পরে এক বছর পরে প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় রত্নেশ্বর কীর্তিহাটে চন্দনধেনুসহ দানসাগর ক্রিয়া করে সমারোহ করেছিলেন, সেই শ্রাদ্ধের সময় বাপকে বলতে এসেছিলেন যাবার জন্য। বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—না। তখন তিনি আবার মদ ধরেছেন। এবং এ সম্পর্কে পিতা-পুত্রে কিছু পত্রালাপ হয়েছে। সেদিন বিস্ফোরণ হয়ে গেল। এবং সেইদিনই বীরেশ্বর রায়ের আবার নূতন করে পুরনো ব্যাধি দেখা দিল। শরীর অসুস্থ হল।

এর ছ'মাস পর তিনি মারা গেলেন। তাঁর শয্যার পাশে সোফিয়া আর মহেন্দ্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। অবশ্য নিচে এবং বাড়ীতে লোকজন কলকাতার ম্যানেজার থেকে দারোয়ান-টারোয়ান সবই ছিল।

রত্নেশ্বর এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এসে উঠেছিলেন তাঁর শ্বশুরের বাড়ীতে জোড়াসাঁকোয়—তার কারণ তিনি এসেছিলেন সস্ত্রীক। স্বর্ণলতার কোলে তখন প্রথম সন্তান। সোফিয়াকে নিয়ে যে-বাড়ীতে বীরেশ্বর রায় বাস করেন, সে-বাড়ীতে তিনি এসে ওঠেননি। সেই সময় থেকেই এ-বাড়ীতে ওঠা বন্ধ করেছিলেন। রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত থেকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শ্বশুরের বাড়ীতে। তখন অবশ্য অবস্থা এমন খারাপ ছিল না। ডাক্তার একজন বাড়ীতে মোতায়েন ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং কয়েক ঘণ্টা পরই মারা যান।

অবস্থা খারাপ হতেই রাত্রে গাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৩ সালের কলকাতা। পথঘাট একালের মত পিচঢালা পথ নয়। এবং জানবাজার থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত বড় রাস্তা মাত্র একটি। চিৎপুর রোড। আর একটা কলেজ স্ট্রীট-কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কিন্তু সেদিক থেকে জোড়াসাঁকো যেতে অনেক আঁকা-বাঁকা অপরিসর রাস্তা এবং সঙ্কীর্ণ গলি। দু পাশে টিমটিমে কেরোসিনের আলো। তাও দূরে-দূরে। সুতরাং পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল এবং ডাকাডাকি করে রত্নেশ্বর রায়কে তুলতেও সময় লেগেছিল। তারপরও দেরী হয়েছিল তাঁর বের হতে।

সুলতা, রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতে এসব কথা আছে। কিন্তু ঠিক এভাবে নেই। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, মিথ্যা কথা ডায়রীতে লেখেন নি। কিন্তু অন্যত্র যেভাবে তিনি তাঁর মনকে প্রকাশ করেছেন, তা এই ঘটনার ক্ষেত্রে নেই।

শুধু লিখেছেন—"উঠিয়াও একটা কারণে বাহির হইতে বিলম্ব হইল। স্বর্ণলতাকে এই রাত্রে লইয়া যাওয়া ঠিক হইবে কিনা স্থির করিতে বিলম্ব হইল। অবশেষে এই শীতের রাত্রে ছোট ছেলে লইয়া যাওয়া ঠিক উচিতবোধ হইল না, অতএব আমি একাই বাহির হইলাম, বাহির হইবার সময় অঞ্জনা বলিল—আমি যাই। কারণ এ সময় অনেক সাংসারিক মঙ্গলের কাজ থাকে। ও-বাড়ীতে তো এক সেই বাঈ ছাড়া মেয়েছেলে কেউ নাই! সে সব আমিই করিব। ইহা খুবই সমীচীন মনে হইল অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সেই শীতের শেষ রাত্রে রওনা হইয়া

যখন জানবাজার আসিয়া পৌছিলাম, তখন আমার পিতা দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ বীরেশ্বর রায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখবোধ করিলাম। অনুশোচনাও হইল। গত রাত্রে এখানে থাকিলেই হইত। না-হয় ফলটল খাইয়াই থাকিতাম। হায় এমন দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ পুরুষ, বিশালকায় বীরপুরুষ আজ চিরনিস্তব্ধ। আমার নয়ন-যুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বক্ষের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। সেই সমারোহময় পুরুষ আজ নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অথবা ইহাই তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি সংসারে একা থাকিতে চাহিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি বিরাগের অন্ত ছিল না, আমি পুত্র আমার সহিত আজ এক বৎসর পত্র ভিন্ন সাক্ষাৎ করেন নাই। আজীবন এক বাঈজীকে লইয়াই জীবনাতিপাত করিলেন। ঈশ্বর মানিতেন না। কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং এবম্প্রকার মৃত্যুই তাঁহার উপযুক্ত এবং বিধাতা কর্তৃক অবধারিত ছিল।"

সুরেশ্বর একটু চুপ করলে। সুলতা বললে—রত্নেশ্বর রায় একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন সুরেশ্বর। একটা সত্যকারের ক্যারেক্টার। অত্যন্ত শক্ত মানুষ!

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, তা ছিলেন! সে-কথা আমি আমার জবানবন্দীর মধ্যে বারবার বলেছি। সেই কারণেই যে দুটো হত্যা তিনি করিয়েছিলেন, তার অপরাধ বিবেচনা করতে গিয়ে সম্ভ্রমভরে পিছিয়ে এসেছি। মনে-মনে বলেছি, তোমার বিচার অন্য যারা শুনবে, জানবে, তারা যা বলে বলুক, যা করে করুক, আমি শুধু তোমার কাজের জবানবন্দী দিয়েই খালাস।

তবে এক্ষেত্রে, তাঁর ডায়রী থেকে যা পেয়েছি, তার বাইরেও আরও কিছু আছে। সেটা জেনেছিলাম আমি রত্নেশ্বর রায়ের সহোদরা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। এক্ষুনি আমি তোমাকে বললাম—ভবানী দেবীর এই পত্রখানা পেয়েছি আমি তাঁরই কাছে। ১৯৩৭ সালেও পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি বেঁচেছিলেন।

১৮৬৩ সাল থেকে কিছুক্ষণের জন্যে ১৯৩৭ সালে এল সুলতা।

১৯৩৭ সালে যে সময় গোপাল সিংয়ের প্রপৌত্র শিবু সিং নামক ভাল ছেলেটি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েও তার বাপের কাছে রায়বাড়ীর অত্যাচারে তার দুর্ধর্ষ এবং প্রবলপ্রতাপ প্রপিতামহ গোপাল সিংয়ের সর্বনাশের এবং চরম অপমানের গল্প শুনে বিপ্লবীর ধর্ম বিসর্জন দিয়ে, দেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে, সরকারী সাক্ষী হয়ে বীরেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র, রত্নেশ্বর রায়ের পৌত্র, শক্তিহীন দেউলে জমিদার শিবেশ্বর রায়ের পুত্র—তাদের অঞ্চলের বিপ্লবী গোষ্ঠীর নায়ক অতুলেশ্বর কাকার বিরুদ্ধে এজাহার দিলে এবং নির্দোষ আমার মেজদিদিকে সুদ্ধ ধরিয়ে দিলে, সেই সময়ে এল।

নিশ্চয় মনে আছে তোমার সুলতা যে, মেজদি আমাদের অর্চনাকে বাঁচাতে তাঁর কাছে গচ্ছিত রিভলবারটা নিজে নিয়ে বের করে দিয়ে এই শাস্তিটা নিজে নিয়েছেন। অর্চনা তাতেও নিজেকে সংযত করতে পারে নি; শান্ত নিরীহ বৈষ্ণব প্রকৃতির বিষয়ে অনাসক্ত মানুষ বিমলেশ্বর কাকাকে সুকৌশলে উত্তেজিত করে রায়বংশের রক্তের প্রসুপ্ত প্রচণ্ড ক্রোধকে জাগিয়ে তুলেছিল।

অর্চনা যে কথাটা বিমলেশ্বর কাকাকে বলেছিল, সেকথা তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল যে,

অমোঘ শক্তিতে তা আমি শুনি নি, আমি শুনেছিলাম, বিমেলশ্বর কাকার স্ত্রীর মুখ থেকে, তাতেই আমার বুকেও আগুন জলেছিল। বিমলেশ্বর কাকা বুকের জ্বালায় শিবুকে মারতে গিয়ে ধরা পড়লেন। আমি সেদিন রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়ে যাচ্ছিলাম। সকালের পর ওবাড়ী থেকে যখন বিমলেশ্বর কাকাকে ধরে নিয়ে গেল কোমরে দড়ি বেঁধে, তখন থেকেই পড়তে বসেছিলাম, খাই নি, স্নান করি নি, হুইস্কী স্পর্শ করিনি, খেয়েছিলাম কয়েক কাপ চা। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল দশটা। শীতের দিন, কীর্তিহাট গ্রামে রাত্রি দশটা কম নয়। শেয়াল ডেকে গেছে, বিবিমহলের পাশে কাঁসাইয়ের ধারে জঙ্গলে প্যাঁচা ডাকছে। প্যাঁচার ডাক বড় কর্কশ সুলতা। কলকাতায় মানুষ তুমি, নিস্তব্ধ রাত্রে পেঁচার ডাক সম্ভবত তুমি শোন নি। বিবি-মহল খুব বড় নয়, কিন্তু ছোটও নয়, বাড়ীটার মধ্যে আমি আর রঘু চাকর। রঘুও কিছুকাল কীর্তিহাটে বাস করে আর রায়বাড়ীর মহলগুলোয় ঘুরে রায়বাড়ীর মেজাজ খানিকটা পেয়েছিল। বিমলেশ্বর কাকার অপমানে সেও সেদিন দুঃখ পেয়েছিল। সেও আমাকে সেদিন খাবার কথা বিশেষ বলে নি। নিজেও খায় নি।

আমি ডায়রী পড়ছিলাম, হঠাৎ চৌদ্দ বাতির টেবিলল্যাম্পটা দপ করে নিভে গেল। সম্ভবত সন্ধ্যেবেলা থেকে জলতে জলতে গরম হয়ে গ্যাস হয়েছিল। রঘুকে আলো জ্বালবার জন্যে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলাম। ভাবছিলাম রায়বংশের কথা। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীতেই পড়েছি, ভবানী দেবীর মৃত্যুর কথা। রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে বীরেশ্বর রায়ের ওই তিক্ত কঠিন কথাগুলির কথা। তখনও আমি ভবানী দেবীর ওই চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও জানি না।

কি জানি কেন রত্নেশ্বর রায়ের কঠোরতা আমার এক্ষেত্রে ভাল লাগে নি। তাঁর ডায়রীর শেষ যে লাইনটা পড়েছিলাম, সেটা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন—"সংসারে ন্যায় এবং নীতিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ন্যায়কে মাথায় করিলে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজন সকলেই তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনে পিতাপুত্রকে পরিত্যাগ করেন, এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ রহিয়াছে। স্ত্রীর অন্যায়ে স্ত্রীকে ত্যাগ এদেশে সাধারণ ঘটনা। পিতাকে লোকে পরিত্যাগ সচরাচর করে না, তাহার কারণ বিষয় শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে পৈত্রিকই হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে রামমোহন রায়ের মত দৃঢ়চেতা পুরুষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তিনি পিতাকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শের জন্য পিতৃশ্রাদ্ধে বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে অসম্মত হইয়া মাতার সহিত বিরোধ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আমার পিতা চিরদিনই স্বেচ্ছাচারী, কোন ন্যায়, কোন ধর্মকে মান্য করেন না। তিনি বাঈজীকে আমার দেবীতুল্য মাতৃদেবী অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেন। আমার মাতাকে অভিশাপ দেন। তাঁহার প্রতি চিরদিনই আমার বিরাগ। মধ্যে বৎসর তিনেকের জন্য মাতার জন্যই তাঁহার অনাচার সহ্য করিয়াছি। কিন্তু মাতৃদেবীর অন্তে তাঁহার প্রতি পূর্ব বিরাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রায়বংশে তিনি অনাচার, ব্যভিচার এবং স্বেচ্ছাচারে, অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত পুরুষ। সর্বাপেক্ষা দুর্দান্ত। তিনি আজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দুঃখ আমার হইতেছে। কিন্তু দুঃখ হওয়া বোধহয় উচিত ছিল না। আমাকেই তাঁহার মুখাগ্নি

করিতে হইল। মনে মনে বলিলাম, আমি কামনা করি 'তুমি মুক্তিলাভ কর,' কিন্তু আমি জানি, তোমার কর্মফলে তোমাকে বহু জন্মান্তর এই সকল কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।"

অন্ধকারে বেদনাহত মন নিয়েই বসেছিলাম।

রঘু বাইরের ঘরে বসে ছিল, সে ঘরের অন্ধকার দেখে ঘরে এসে ঢুকল, আমি বুঝতে পেরে বললাম—থাক আলো জ্বালতে হবে না!

ঠিক এই সময় নিচে থেকে ডাক শুনলাম, সুরেশ্বর! শুয়েছ নাকি?

কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম না। হেঁকে বললাম—কে?

—আমি জগদীশ্বর কাকা।

জগদীশ্বর কাকা? অর্চনার বাবা! খবর পেয়েছি সন্ধ্যার পর ফিরেছেন। এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন জগদীশ্বর কাকা কিসের জন্য। এসে সমস্ত খবর শুনে আর একটা সর্বনাশ বা ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলেছেন না কি?

আমি তাড়াতাড়ি রঘুকে আলোটা জ্বালতে এবং ডায়রীগুলো সামলে রাখতে বলে বাইরে রঘুর ঘরে যে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল, সেটা নিয়ে নেমে গেলাম। দেখলাম, জগদীশ্বর কাকা অর্চনার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুঝলাম একটা কিছু ঘটেছে। বললাম—এত রাত্রে জগদীশ্বর কাকা?

জগদীশ্বর কাকা বললেন—ওপরে চল বলছি। এসেছি এই সর্বনাশী হারামজাদীর জন্যে।

কোন প্রশ্ন করলাম না সেখানে। কারণ আমার সন্দেহ ছিল, কোন-না-কোন পুলিশের চর কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। বিমলেশ্বর কাকাকে হাতকড়া দিয়ে, কোমরে দড়া বেঁধে গ্রাম ঘুরিয়েই তাদের কাজ তারা শেষ করেছে, এ কথা অন্ততঃ আমার বিশ্বাস হয় নি।

উপরের ঘরে এসেই জগদীশ্বর কাকা অর্চনাকে ছেড়ে দিলেন এবং কঠোর কণ্ঠে বললেন—চুপ করে দাঁড়া হারামজাদী। চু-প করে!

তারপর আমাকে বললেন—তুমি তো শুনেছ সব!

জগদীশ্বর কাকার শরীর থেকে গাঁজার গন্ধ বের হচ্ছিল।

আমি বুঝলাম কি বলছেন তিনি, বললাম—সবই তো আমার চোখের সামনে ঘটেছে। আমি তো ছিলাম!

—ন্যাকা সেজো না হে! বিমলের স্ত্রী, বর্ধমানের বউমা তোমাকে সব বলে নি? হারামজাদী পোড়ারমুখী যা সব বলত বিমলকে, সেসব কথা পুলিশের কাছে বলতে তুমি তাকে বারণ কর নি?

স্বীকার করলাম। বললাম—হ্যাঁ, বলেছিলাম। না-হলে যে আজ ওকেও ধরে নিয়ে যেত জগদীশ্বর কাকা!

—যেতো, আপদ যেতো! আমি বাঁচতাম।

—এসব আপনি কি বলছেন জগদীশ কাকা!

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।—বলছি সাধে! তুমি জান, আমার শালার শালা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর, তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করে এসেছি, তারা আসবে, কথা পাকা হবে।

দিনও ঠিক করে এসেছি; এই মাঘ মাসে। এখন হবে কি ? করব কি ? বলতে পার ?

হঠাৎ কান্না থামিয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন, বললেন—আর হারামজাদী আমাকে মুখের ওপর বলে কি জান ? ওর এতবড় আস্পর্ধা। এতবড় বুকের পাটা, ঘাড়ের ওপর তিনটে মাথা—বলে ওখানে আমি বিয়ে করব না। জোর করলে আমি বলব—আমি এসবের ভেতরে আছি। নয়তো আমি বিষ খাব। নয় গলায় দড়ি দোব।

এসব কথা আমি জানতাম। অর্চনা সেদিন আমায় বলেছিল। আমি বললাম—একটা কথা বলব কাকা ?

মুখভঙ্গী করে আমাকে বললেন—তুমি বিয়ের ভার নেবে তো। যা খরচ করতে হয় তুমি করবে ! সে কথা ও আমাকে বলেছে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, সে কথা আমি বলেছি ওকে। আমি কালই যেতাম আপনার কাছে কথাটা বলবার জন্যে।

জগদীশ কাকা আবার বদলালেন। এবার সংযত অথচ শাসনের সুরে বললেন—হ্যাঁ। তাই আমি জানতে এসেছি। ও আমাকে বললে। বললে, আমার বিয়ের কথা নিয়ে তোমরা ভেবো না। সুরেশ্বরদা বলেছে আমাকে সে পাত্র ঠিক করে বিয়ে দেবে। যা খরচ হয় সে করবে।

—হ্যাঁ। তা করব আমি। আমি সে কথা আপনার সামনেই বলছি।

—না। সামনে বললে হবে না। আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আমি গাঁজা খাই, মদ খাই, যাই হই, আমি তোমার কাকা, গুরুজন, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল। আর তিন সত্যি কর।

তাই বললাম। এবং পায়ে হাত দিয়েও শপথ করলাম। তখন আবার বললেন—শুধু ও বললে হবে না। স্বজাতে, স্বঘরে মানে পালটি ঘরে বিয়ে দিতে হবে। তুমি আধা বেহ্ম, আমি জানি। তুমি যে লেখাপড়া-জানা যার-তার ঘরের ছেলে এনে বলবে এর চেয়ে ভাল পাত্র আর হয় না, সে হবে না।

সুরেশ্বর বললে—তোমাকে কি বলব সুলতা, আমি এই অধঃপতিত রায়বংশের সন্তানটির কথায় রাগ করতেও পারি নি, ঘৃণা করতেও সঙ্কোচ হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল কাঁদি। এক কোণে অর্চনা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটো হয়ে উঠেছে যেন জলন্ত অঙ্গার। ধুক ধুক করে জলছে। সে যেন এখনি ক্রোধে, ক্ষোভে ফেটে পড়বে বলে মনে হল।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিশ্রুতি দিলাম। বললাম—তাই হবে !

জগদীশ্বর কাকা বললেন—শোন, এই রায়বংশ সিদ্ধপুরুষের বংশ। অর্চনাকে সবাই বলে, ও হল সতীবউরাণী। এই বংশে ফিরে এসে জন্মেছেন। সতীবউরাণীর বাবা কালীসিদ্ধ মহাসাধক ছিলেন। ওকে সৎ বংশে, সৎ পাত্রে না দিলে সর্বনাশ হবে তোমার।

অর্চনা এবার সত্যই ফেটে পড়ল। চিৎকার করে উঠল, বাবা !

জগদীশ্বর রায় দুরন্ত ক্রোধী ; গাঁজা, মদ খেয়ে প্রায় বিকৃতমস্তিষ্ক। তাঁর বাপ, আমার

ঠাকুরদা শিবেশ্বরের সমৃদ্ধি এবং জবরদস্তির আমলে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, ছেলেবেলা থেকে দুরন্ত, দুর্দান্ত। এক পুলিশ আর গভর্ণমেণ্ট ছাড়া কাউকে গ্রাহ্য করেন না। সেই তিনি পর্যন্ত চমকে উঠলেন তার সে চিৎকারে।

তার দিকে তাকিয়ে তাকে তিনি ধমক দিতে পারলেন না, সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অর্চনা বললে—তুমি এবার থামবে কিনা বল?

অপ্রতিভের মত জগদীশ্বর কাকা বললেন—থামব?

—হ্যাঁ থামবে। এবার তুমি যা বলবে আমি জানি। বিয়েতে যে টাকা সুরেশ্বরদা খরচ করবে, সেই টাকাটা তুমি নিজে চাইবে। বলবে—তার থেকে সুরেশ্বর, টাকাটা তুমি দাও, আমি দেখে-শুনে ভাল পাত্রেই ওর বিয়ে দিই। আমি জানি! তা হবে না। তুমি বাড়ী চল!

আমি বললাম—অর্চনা চুপ কর। এসব কথা বলতে নেই। উনিই বা তা বলবেন কেন?

অর্চনা বলে উঠল—বলবেন। বলবেন। বলবেন! আমি জানি!

জগদীশশ্বর কাকা মাথা হেঁট করে রইলেন।

অকস্মাৎ কোন চোরের লুকানো চোরাইমাল বেরিয়ে পড়লে, যেমন তার মুখের চেহারা হয়, ঠিক তাই হয়ে গেল।

অর্চনা বললে—রঘু, তুই আমাকে আলো নিয়ে বড় জেঠাইমার কাছে দিয়ে আয়।

বড় জেঠাইমা—শিবেশ্বরের বড় ছেলে—ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী।

খুড়ীমা বিচিত্র মানুষ। আজও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখা হয়েছে। তাঁর বড় ছেলে বিচিত্র চরিত্র মধুরভাষী আমার ব্রজদা, ব্রজেশ্বর। এবং তার সেজ ছেলে সেই দানবটি, যে সুখেশ্বর কাকাকে হত্যা করেছিল।

লোকে বলে এই দুই প্রকৃতিই তাঁর মধ্যে আছে। খুব বড় ঘরের কন্যা। পড়েছিলেনও ভালঘরে। ব্রজদার মত মিষ্ট কথা। আবার রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু একটা বড় গুণ আছে, কেউ আশ্রয় চাইলে সেখানে তিনি আশ্চর্য মানুষ। তাঁর নিজের সন্তানের চেয়েও বড় মমতায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকেন। জগদীশ্বর কাকা বড় ভাই ধনেশ্বরকেও ভয় করেন না। কিন্তু বড় বউঠাকরুণ—"কি হচ্ছে ঠাকুরপো"! বলে বের হলে, আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাড়া পেলেই সরে পড়েন!

কথাটা বলেই হনহন করে চলে গেল অর্চনা

* * *

পরের দিন থেকে সুলতা, আমি অর্চনার বিয়ের জন্যেই সবকিছু ফেলে দিলাম। ওই বিয়ের জন্যেই উঠে-পড়ে লাগলাম।

সেদিন আমি বসে চিঠি লিখছিলাম। লিখছিলাম কলকাতায় জানবাজারের ম্যানেজারকে, লিখছিলাম—একজন বিচক্ষণ ঘটক অবিলম্বে যেন পাঠিয়ে দেন এখানে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এমন সময় খুড়ীমা এলেন, অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে খুড়ীমা আমার সামনে এই প্রথম এলেন বিবিমহলে। ভিতর মহলে আমি অনেকবার গেছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কদাচ কখনও। এবং আমাকে দেখবামাত্র সরে যেতেন। কখনও আমি আগে-ভাগে কথা কইলে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে চলে যেতেন ভিতর মহলে।

আমি এগিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করে নিয়ে এলাম। প্রণাম করলাম। অন্য সময় তিনি পায়ে হাত দিতে দিতেন না। বলতেন—ছুঁয়ো না বাবা, তোমাদের কাপড়-চোপড় শুদ্ধ নয়, আমি পুজোর কাপড় পরে আছি! মাটিতে প্রণাম কর।

তাঁর পুজোর কাপড় আগে দেখেছিলাম, একখানা অতিজীর্ণ লালপেড়ে গরদের শাড়ী। ব্রজদা বউ নিয়ে মাস ছয়েক আগে যখন এসেছিল, তখন একখানা নতুন দামী গরদের শাড়ী দিয়েছিল, আজ সেইখানা পরে এসেছিলেন।

তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করলাম মাটিতে হাত দিয়ে। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি বাবা। এবার ব্রজ এসে তোমার অনেক সুখ্যাত করে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজকে তো আমি জানি চিনি। ও যত মন্দ, তত ভাল। ভালও বাসতে পারে, কিন্তু ওর স্বার্থ যেখানে, সেখানে সে চোর-জোচ্চোর সব। আমি ভেবেছিলাম, তুমি কলকাতায় বড়লোকী করতে, ও তোমার মোসাহেবী করত। তাই প্রশংসা করছে। তুমিও হয় তো রায়বংশের ছেলেদের মত। তোমার বাপ আমার ভাসুর। তার কীর্তিও শুনেছি। তাই 'এলে-গেলে-খেলে-নিলে ভাল আছ, মঙ্গল হোক, এই বলেই কথা সেরেছি। কাল অর্চনা গিয়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল। বললে আমাকে সব। ন-বউ, বিমলেশ্বর ঠাকুরপোর বউও এসেছিল, ওর কাছেও সব শুনলাম। তার আগে ঘরে পুরে যে মারটা অর্চনাকে মেরেছে সেজঠাকুরপো, তাও শুনেছিলাম। সব শুনে তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা। যে সঙ্কল্প করেছ, তা তুমি যত শিগগির হয় করে ফেল! পূর্বপুরুষেরা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

সুলতা, আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম ধনেশ্বর কাকার মত নাটুকে চরিত্র, ভণ্ড তান্ত্রিকের স্ত্রীর এমন কথা শুনে। ইনিই মিথ্যেবাদী, মিষ্টমুখ ব্রজদার মা, ইনিই দৈত্যের মত পশুচরিত্র ছেলেটার মা। এঁকেই সারা রায়বাড়ীতে প্রতিটি জন বলে, মা চামুণ্ডা।

বললাম—আমি এক্ষুনি চিঠি লিখছিলাম খুড়ীমা।

—কোথায় লিখছিলে বাবা? জানাশুনো কেউ?

—না কলকাতায় লিখছি, ওখানকার ম্যানেজারকে, একজন ঘটক পাঠাবার জন্যে।

খুড়ীমা বললেন—তা ভালই করছ বাবা। তাও লেখ। তবে আমি একটি পাত্রের কথা বলতে এসেছি, তুমি চেষ্টা করে দেখ না। জানা ঘর; বলতে গেলে আমাদের আপনার ঘর; তবে বিষয় তো বিষ বাবা। বিষয়ের ঝগড়ায় অতি আপনার হয়েও পর। এক রকম তিনপুরুষ মুখ দেখাদেখি নেই।

শঙ্কিত হয়েই বললাম—বলুন।

শঙ্কা হল সুলতা, যে, রায়বংশের যারা তারাও আজ মহাকাল প্রভুর গদার ঘায়ে ভগ্ন উরু

দুর্যোধনের মত সংসার দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। অশ্বত্থমাও নেই এ-যুগে, যে সে পঞ্চ-পাণ্ডবের বংশধরদের মুণ্ড এনে দেবে। হর্ষ বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু এ দুর্যোধনদের সবারই মৃত্যু হবে বিষাদে।

খুড়ীমা বললেন—আমার দাদাশ্বশুর রায়বাহাদুরের বোন ছিল জান তো। অন্নপূর্ণা দিদিশাশুড়ী। রায়বাহাদুর তো এ বংশে পুষ্যিপুত্তুর। কিন্তু সতীবউরাণীর কাশীতে গিয়ে কন্যা হল। কন্যা হয়েই মারা গেলেন। সেই কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। বিয়ের পর শ্বশুররা ছাড়বে কেন? মামলা করলে তারা। দানপত্তর নাকচ হবে। শেষ মিটমাট করে দিলেন বিমলাকান্ত চাটুজ্যেমশায়, ফিরেশ্বর রায়ের ভগ্নীপতি। পঞ্চাশ হাজার টাকা, কলকাতায় জমি আর তাঁর নিজের সম্পত্তি দিয়ে। মামলা মিটল, কিন্তু মানের মামলা মিটল না। ভাই-বোনে সম্পর্কই মুছে গেল। তাই শুধু নয়, অন্নপূর্ণা ঠাকুরুনের স্বামী রাগের বশে আর একটা বিয়ে করলেন। ভাই মানে রায়বাহাদুর তত্ত্ব পাঠালে অন্নপূর্ণা ঠাকুমার শ্বশুররা ফিরিয়ে দিতেন। কখনও আসতে দেন নি। শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলে নিয়ে ঠাকরুণ স্বামী-ভিন্ন হয়ে গেলেন। টাকার তাঁর অভাব ছিল না। বাপের বাড়ীর পঞ্চাশ হাজার টাকা। কলকাতায় জমি। সেই অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ আজও বেঁচে আছেন। পঁচাত্তর-আশী বছর বয়স। ছেলে নেই। নাতিদের দুজন মারা গিয়েছে। একজন আছে। বড় নাতির একটি ছেলে আছে। বাবা আমার মেয়ে বড় হয়েছে—প্রতিমা। তা আমি চেষ্টা করেছিলাম। ছেলেটি ডাক্তারী পড়ছিল তখন। তা এ বাড়ীর নাম শুনে রাজী তিনি হয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা হয় নি। ওরা মস্ত বড়লোক। জমিদার তো নয়। ওরা সব কেউ উকীল, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ ডেপুটী এই রকম বংশ। তা একবার তার কাছে তুমি নিজে গিয়ে পড় না। টাকা তো তুমি দেবে। আর এ মেয়েটাকে সবাই বলে সতীবউ ঠাকরুন ফিরে এসেছে। যদি ঐ কথাটা তুমি বল তবে হয় তো রাজীও হতে পারেন। অন্নপূর্ণা ঠাকুমাও কথাটা জানেন। হয় তো আগ্রহ করেই নেবেন।

সুরেশ্বর বললে—অন্নপূর্ণা দেবীর নাম আমি বাবার কাছে শুনেছি। আমার বাবা সাহেব মানুষ—মা ছিলেন সে কালের আধুনিকা। তবুও তাঁরা বিজয়ার পর একবার প্রণাম করতে যেতেন। তার কারণ ছিল। অন্নপূর্ণা দেবী আর রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বর এক বয়সী। মাস কয়েকের ছোট বড়।

অন্নপূর্ণা দেবী মানুষ হয়েছিলেন বিমলাকান্তের কাছে, কাশীতে, আর দেবেশ্বর বড় হয়েছিলেন কলকাতায়। জানবাজারের এই বাড়ীতে রত্নেশ্বর পাকাপোক্ত এস্টাব্লিশমেণ্ট করেছিলেন। প্রথম প্রথম জানবাজারের বাড়ীতেই থাকতেন, বছর দুয়েক ছিলেন, ছেলে পড়ত কলকাতার ইস্কুলে, আর তাদের সুখ-দুঃখ দেখবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন ঠাকুরদাস পালকে। লেখাপড়া শেখবার জন্যে সেকালের গ্রাজুয়েট মাস্টার নিযুক্ত করেছিলেন। তার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া শেখাবার ব্যবস্থা, ডন-বৈঠক শেখাবার জন্য ছিল একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। পূজোর ছুটিতে, গরমের ছুটিতে যেতেন কীর্তিহাট। ওদিকে কাশী থেকে আসতেন অন্নপূর্ণাকে নিয়ে সস্ত্রীক বিমলাকান্ত। গোটা একটা মাস কীর্তিহাটের রাজত্বে রাজপুত্র এবং রাজকন্যা—

সহোদর-সহোদরার প্রীতিতে পিসী আর ভাইপো ছুটোছুটি করতেন, হাতী চড়ে বেড়াতেন, পুজোর সময় আশ্বিন-কার্তিক মাসে ভরা কাঁসাইয়ে বজরায় ঘুরতেন। গোয়ানপাড়ায় যেতেন।

দুর্গাপুজোর পর কালীপুজো—রায়বাড়ীর প্রধান উৎসব। সে-উৎসবে—সেকালে তিন-চারদিন উৎসবে—পাঁচ হাজার টাকা খরচ একবারে বাজেটে নির্দিষ্ট করা ছিল। কম কখনও হত না। বরং বেশীই হত। তাছাড়া সরস্বতী-বউরাণী বা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের অথবা বিমলাকান্তের মানসিক পুজোর খরচ তাঁরা আলাদা দিতেন।

কালীপুজোয় দেবেশ্বর অন্নপূর্ণা পাশাপাশি যাত্রার আসরে বসত। নিয়ম ছিল রায়বংশের যাঁরা, তাঁরা বসতেন চেয়ারে, আর বসতেন অতিথি-অভ্যাগত। রত্নেশ্বর রায়ের শ্বশুরবাড়ীর লোক। জেলার দু-চারজন হাকিম। তার সঙ্গে দারোগা-ইন্সপেক্টর, সব-রেজিস্ট্রার আর দু'-চারজন বন্ধু-বান্ধব। তার মধ্যে অন্নপূর্ণা আর দেবেশ্বর ঠিক মাঝখানে বসতেন দুখানা চেয়ারে।

বিসর্জন ছিল না। পাষাণময়ী কালী। তবু বিসর্জনের রাত্রে বাজি পুড়ত। তারও অঙ্ক কখনও দু'শোর নিচে নামেনি। ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। সেখানেও এইসব অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য একটা চাঁদোয়া হত। তার নিচে বসতেন এইসব লোকেরাই। সেখানেও অন্নপূর্ণা দেবেশ্বরের আসন ছিল সামনের সারিতে পাশাপাশি। আর একটা ঘটনা কয়েক বছরই ঘটেছিল; সেটা ভাই-দ্বিতীয়ার দিন। দেবেশ্বরের বোন ছিল না। রত্নেশ্বরকে বোন হিসেবে ফোঁটা দিতেন অন্নপূর্ণা দেবী। তাই দেখে দেবেশ্বর কাঁদতেন—আমি ফোঁটা নেব।

গ্রাম-সম্পর্কের বোন বের করতে দেরী হয়নি। কিন্তু তা না, দেবেশ্বরের আব্দার—ওই অন্নপিসীর কাছে ফোঁটা নেব।

অন্নপূর্ণাও ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতেন—আমি দেবু ভাইপোকে ফোঁটা দেব।

এদের সঙ্গে আর একজন অহরহ ঘুরত সুলতা। তাঁর নাম হল—গোপাল পাল, দেবেশ্বরের ঠাকুরদাস জ্যাঠামশায়ের ছেলে।

তাই খুড়ীমা মানে ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী আমাকে বললেন—তুমি নিজে যাও বাবা, তিনি নিজে আজও বেঁচে, তোমার কথা রাখবেন বোধহয়। অর্চনার একখানা ফটো নিয়ে যেয়ো, তাতে কাজ দেবে। তাঁর মায়ের অয়েল পেন্টিং তাঁর কাছে আছে। অর্চনার সঙ্গে মিল দেখলে মন তাঁর নরম হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজছিল। সুলতা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে দশটা। ওদিকের খাবারঘরে টেবিলের উপর বাসনপত্রের ঠুংঠাং শব্দে হচ্ছে। অর্চনার গলা পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত বাসন সাজানো হচ্ছে। খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

সুরেশ্বর বললে—এখন এখানেই ছেদ টানতে হবে হয়তো। ১৯৩৭ সালে সেদিন মেজতরফের বড় খুড়ীমার একটা কথা বলেই ছেদটা টানি সুলতা। তাঁকে আমার বড় ভাল লাগল। বললাম—এ বাড়ীতে এলেন খুড়ীমা, কিছু খাবেন না?

হাসলেন তিনি। বললেন—খাব না কেন বাবা। তবে তোমার রঘুর হাতে তো খাব না।

অর্চনা এতক্ষণ আমাদের পানে পিছন ফিরে কাঁসাইয়ের ধারের বারান্দার ঠিক দরজাটার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সে এবার বললে—আমি চা করে আনব জ্যেঠাইমা।

—তা আন। কিন্তু এত বেলায় চা কেন? সরবৎ করে আন।

—শীতের দিনে সরবৎ খাবে?

—তা হলে চা করেই আন্। তোরাও খাবি।

অর্চনা চলে গেল। খুড়ীমা এবার কথা বন্ধ করে উঠে চারিদিক ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন—জান বাবা সুরেশ্বর, এই বিবিমহলে আমি আজ প্রায় ত্রিশ বছর আসি নি। এসে-ছিলাম সেই বিয়ের পর—কনে-বউ আমি তখন, তের পার হয়ে চৌদ্দতে পড়েছি। তখন আর একরকম ছিল। এমন সুন্দর ছিল না। তোমার বাবা আমার ভাসুর। কিন্তু তোমার কাকার বিয়ে আগে হয়েছিল। তোমার বাবা বিয়ে করলেন, ক'রে এখানকার ভেতর মহলে তোমাদের অংশ আর বিবিমহল একরকম নতুন করে গড়লেন। তখন থেকে আর ঢুকি নি।

বলে হাসলেন। সে হাসি ঠিক সহজ হাসি নয়। তার অর্থ ঠিক হাসি নয়। তার মধ্যে অনেক কিছু ছিল।

সুরেশ্বর বললে—আমি ঠিক বুঝিনি। তাই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম—কেন খুড়ীমা? সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়ল যে, বাবার মৃত্যুর পর যখন প্রথম মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম বাবার শ্রাদ্ধ করতে, তখন খুড়ীমা এ বাড়ীতে আসেন নি। তাঁর সঙ্গে মা দেখা করে এসেছিলেন ও-বাড়ীতে গিয়ে, আমিও মার সঙ্গে ছিলাম। শুনেছিলাম মেজঠাকুমা বলেছিলেন—"বড়বউমার কথা ছেড়ে দাও মা, বড় জমিদারবাড়ীর মেয়ে, অবস্থাহীন হয়েছে কিন্তু দম্ভ যায় নি। চব্বিশঘণ্টা দম্ভে ফেটে পড়ছে। মা, ধনেশ্বরকে ভয় করে এবাড়ীর সবাই। জগদীশ্বর তো সারা গাঁয়ের লোকের কাছে বাঘ ভালুকের মত। কিন্তু বড়বউমার কাছে সব জুজু। মন হ'ল তো মা—দেবতা। আর মেজাজ বেগড়াল তো মহিষমর্দ্দিনী!

আমার প্রশ্ন শুনে খুড়ীমা চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আমার বাবা এবং মায়ের অয়েল পেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এ ছবি তোমার বাবার একটু বেশী বয়সের ছবি। বিয়েই তো করেছিলেন সাতাস বছর পার ক'রে।

বললাম—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, বিশ একুশ বছর বয়সের সে রূপ এতে নেই। এতে ফ্রেঞ্চছাঁট দাড়ি রয়েছে। গোঁফ সুচলো ক'রে পাকানো, যেন ভারিক্কি মানুষ। মায়ের তোমার পূর্ণ যুবতী বয়স। বোধহয় এর থেকে ভালো চেহারা কখনও হয় নি। বিশ একুশ বছরে তোমার বাবার সে রূপ ভোলবার নয় বাবা। আমার ঠাকুমা দেখে বলেছিলেন—এ যে কন্দর্প লো!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি দেখেছিলেন?

সলজ্জ হেসে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে খুড়ীমা বললেন—দেখেছি বই কি বাবা। না হলে আর বলছি কি ক'রে? আমার বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন বেড়াতে। উনিই তো আমার বিয়ের ঘটক বাবা।

আমি কৌতুকবোধ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম সুলতা—তাই নাকি! কই শুনিনি তো?

—শুনবে কি ক'রে বল। একথা তো বেশী কেউ জানত না!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আমার তখন বয়স তেরো চলছে। গোবরডাঙ্গার মুখুজ্জেবাড়ীর দৌহিত্র শরীক হলেন বাপ আর গ'ড়ের বাঁড়ুজ্জেবাড়ীর মেয়ে হলেন আমার মা। দুদিক থেকে সম্পত্তি পেয়ে বাবা আমার কেষ্টবিষ্টু লোক। চাল-চলন একেবারে রাজারাজড়ার মত। আর আমার রূপ ছিল বাবা। তের বছর বয়সে আমার রূপের খ্যাতি রটেছিল। সম্বন্ধ আপনি আসছিল। বাপের বড় আদুরে মেয়ে ছিলাম আমি। রাগলে জ্ঞান থাকত না। আমাদের বাগান ছিল খুব ভাল। সাবু গাছ, হরেক রকমের পাম গাছ, অর্কিড পাতাবাহার থেকে গোলাপ যুঁই বেল, জবা, চামেলী, গন্ধরাজ, চাঁপা—কি গাছ ছিল না! তার মধ্যে গোটা কয়েক মতিয়াবেলা ছিল, তার ফুল হত এই বড় বড় আর কুঁড়িগুলো হত বড় বড় মুক্তোর মত। ঠাকুমা শিবপুজো করাতেন। আমি মতিয়াবেলার কুঁড়ি তুলে মালা গেঁথে পরাতাম। কিন্তু পাড়ার সব গেরস্তঘরে মেয়েরা খুব ভোরে উঠে এসে ফুল চুরি করে নিয়ে পালাত। আমার বাতিক ছিল এদের পাকড়ে খুব বকা-ঝকা করে তারপর মালীকে ডেকে ফুল দিতে বলতাম। তারা নিয়ে যেত। ওটা আমার স্বভাব ছিল। এখনও আছে। কেউ গরীব এসে কাপড় চাইলে প্রথম খানিকটা খুব বকতাম, তারপর তারা যখন চলে যেতে চাইত তখন ডেকে কাপড় দিতাম।

একদিন বাবা, ভোরে উঠে এমনি কতকগুলো মেয়েকে ধরে বকাঝকা করছি, হঠাৎ নজরে পড়ল বাগানের পাঁচীলের ওপার থেকে একখানা হাত কেউ তুলে মার্শাল নীল গোলাপের লতার একটা ডাল আস্তে আস্তে নোয়াচ্ছে। মস্তবড় মার্শাল নীলের লতা। আর ফুলগুলো খুব ভাল।

আমি মালীকে বললাম—দেখেছিস?

সে বললে—হ্যাঁ।

বললাম—আস্তে আস্তে যা। গিয়ে দু হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরবি হাতখানা। তারপর দেখছি আমি। যা।

মালী গিয়ে খপ করে চেপে ধরলে হাতখানা।

তারপর কি কথা হ'ল মালীর সঙ্গে, মালী হাত ছেড়ে দিলে।

আমার রাগ হ'ল, বললাম—হাত যে ছেড়ে দিলি হারামজাদা!

মালী বললে—খুব একজন বড়বাবু দিদিমণি—

—যেই হোক। ফুলচুরি করছে সে চোর। তুই কেন ছাড়লি তাকে?

মালী বললে—বাবু আসছে দিদিমণি। বললে—আরে হাত ছাড়। আমি হাতটা এখুনি টেনে ছাড়িয়ে নিতে পারি। তোমার থেকে আমার জোর বেশী। ছেড়ে দাও, আমি ফুল তুলেছি, তা যখন মালিকের আপত্তি, তখন আমি নিজেই যাচ্ছি তাঁর সামনে। ওই উনি আসছে। ওই ফটকে দাঁড়িয়েছে। বাবা, তোমার বাবাকে দূর থেকে দেখেই আমি হতভম্ব

হয়ে গেলাম। একেবারে সাক্ষাৎ রাজপুত্র। তোমাদের বংশের লম্বা তো সবাই। আর তেমনি রূপ। তখন ফুনফুনে দাড়ি বলে দাড়ি কামান। গোঁফ সন্থ গজিয়েছে, আর যেমন পোশাক তেমনি কেত্তাদুরস্ত। দারোয়ানকে বলে তিনি ফটকের ভেতরে ঢুকলেন, তাঁর হাতে তিন চারটে মার্শাল নীল গোলাপ।

বাবা, আমার লজ্জার সীমা রইল না, আমি একেবারে দে ছুট ; বাড়ীর ভিতরে গিয়ে হাজির। বাড়ীর ঝি-চাকরেরা উঠেছে আর উঠেছেন ঠাকুমা। আমাকে দেখে বললেন—কি লা, এমন হাঁপাচ্ছিস কেন ?

—ছুটে পালিয়ে এসেছি ঠাক্‌মা।

—কেন কি হ'ল ?

আমি বললাম বাবা। ঠাক্‌মার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, খুব ভালবাসতেন। এমন সময় মালী এসে বললে—উ বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি বললাম—যেতে বলে দে।

ঠাক্‌মা বললেন—না। আমি যাচ্ছি দাঁড়া। দেখি নবাবনন্দিনী আমার আবার কাকে কি বলে এলেন। কি ফ্যাসাদ বাধালেন।

ঠাক্‌মা খিড়কীর দরজা দিয়ে বাগানে গেলেন। আমি দরজার আড়ে লুকিয়ে রইলাম।

একটু থামলেন খুড়ীমা। তারপর হেসে ওই বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন—কি হাসি বাবা। হো-হো-হো ক'রে হেসে একেবারে সারা। তখন ঠাক্‌মার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। ঠাক্‌মা পরিচয় পেয়েছেন—একেবারে অপ্রস্তুতের শেষ। কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর বড় রায়মশায়ের ছোট ছেলে, বি-এ পাশ করেছে অনার্স নিয়ে। এম-এ পড়ছে। এসেছে গোবর-ডাঙার মূল মুখুজ্জেবাড়ীতে, এসেছেন শীকারের নেমন্তন্নে। গোবরডাঙার মুখুজ্জেবাড়ীতে শীকারের ধুম ছিল। গোটা বাংলাদেশের লোকে জানে। জ্ঞানদা মুখুজ্জে তখন নতুন উঠেছেন, ভারী নাম। ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে গোবরডাঙা এসে ভোরবেলা উঠে একলা বেরিয়ে আমাদের বাগানের ধারে মার্শাল নীলের ঝুঁকেপড়া ডাল নুইয়ে ফুল তুলছিলেন। তাঁকেই আমি মালী দিয়ে পাকড়েছি। কি লজ্জা বল তো! ঠাকুমা এসে আমাকে টেনে ধরে নিয়ে গেলেন, বললেন—এই এনেছি ভাই, এ-বাড়ীর পুলিশসাহেবকে। এ মেয়ে ভাই, পুলিশসাহেব। তা ধরবি তো ধর রাজার ছেলেকে! আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তোমার বাবা খুব হাসলেন। বাবা এলেন। আমাকেই চা জলখাবার আনতে হল। খেয়ে বিদায় নিয়ে এলেন।

তারপর—।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—এরপর বাবা তোমার ঠাকুরদার কাছে এলেন বিয়ের কথা নিয়ে। তোমার ঠাকুরদা তো সাহেবী মেজাজের লোক ছিলেন, বললেন—যোগেশ্বরের বিয়ে এখন তো দেবই না। এম-এ পাশ করার পর ভাবব। আর বিয়ে ও করবে নিজে দেখে। বড়ছেলের বিয়ে দিয়েছি জনাইয়ে। তাতে ছেলে সুখী হয়েছে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর চাপে অন্যরকম হয়ে গেল। যা ঠিক আমার পছন্দ নয়। যোগেশ্বরকে আমি অন্যরকম তৈরী করব।

হয়তো বিলেত পাঠাব। এখন থেকে বিয়ে দিয়ে ওর হাতপা বেঁধে পঙ্গু করে দেব না। আর আমার ইচ্ছে, ওর বউ হয় লেখাপড়া জানা মেয়ে। আপনারা মেয়ে তেরো বছরের হতেই ব্যস্ত হয়েছেন বিয়ে দেবার জন্যে। সুতরাং মতে মিলবে না। আপনারা বড়লোক, মানী লোক, মেয়ে সুন্দরী, আপনারা চেষ্টা করুন, যোগেশ্বরের থেকে ভাল পাত্র মিলবে।

বাবা ফিরে এলেন মুখ ভার ক'রে। ঠাকুমাকে বললেন—তুমি পাঠালে জোর ক'রে, এখন হ'ল তো!

তারপরই বাবা, তোমার বাবা চিঠি দিলেন, তোমার খুড়োমশায়ের সন্ধান দিয়ে। আমার শ্বশুর তখন কীর্তিহাটে দেবোত্তরের ভার নিয়ে রাজত্বি করছেন জমিদারদের বনেদী চালে। তোমার খুড়ো তখন এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে কলকাতায় পড়ছেন। পুজো-আহ্নিকে খুব ঝোঁক। চেহারাতে তিনি তোমার বাপ থেকে উজ্জ্বলই ছিলেন। লিখলেন—আমার খুড়তুতো ভাই আছে, বড়কাকার বড়ছেলে, লেখাপড়া করছে, হিন্দুয়ানীতে ঝোঁক আছে। সুন্দরী কন্যা খুঁজছেন। আপনি যদি পছন্দ মনে করেন তবে চেষ্টা করুন, আমার বিশ্বাস হয়ে যাবে। আমি আমার ভাইকে বলেছি আপনার মেয়ের রূপের কথা। আর ভবিষ্যতে রায়বাড়ীতে সে উপযুক্ত গৃহিণী হতে পারবে।

ঠাকুমা বললেন—তাই কর রমানাথ। আমার বাবার নাম রমানাথ বাঁড়ুজ্জে। অন্তত রায়বাড়ীর শরীক হয়ে থাক আমাদের মেয়ে। বড়ভাই ফিরিয়ে দিয়েছে, মেজভাইয়ের পুত্রবধূ হয়ে থাক, জেদটা তাতে আমার বজায় থাকবে।

তাই হ'ল—মেজতরফের বড়বউ হয়ে এলাম। আমার টানে তোমার কাকা লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ী এসে বসলেন। জুড়ি হাঁকালেন, প্রজাশাসন করলেন, থিয়েটার করলেন, মদ ধরলেন। আমার কোলে দু বছর অন্তর ওই সব ছেলের পাল এল। বড় ব্রজ, তাকে জান; সেজটা যা ক'রেছে তা জান। ওদিকে তোমার বাপের নামে দেশ ছাইল। তবু উনি বলতেন—খবরের কাগজওয়ালা। বাঁধা মাইনের চাকর। মাতাল। ফিরিঙ্গী মেয়ে নিয়ে ঘোরে। তারপর যখন বিয়ে ক'রে এখানে তোমার মাকে নিয়ে এলেন, তখন মেজতরফের দেনা হয়েছে, সম্পত্তি বিক্রী হচ্ছে, কিনছে তোমার বাপ আর জ্যেঠা। বাবা, তখন থেকে আমার রাগ হল। মনে হ'ল আমার সব্বনাশের হেতু ওই তোমার বাপ। সেদিন থেকে বিবিমহল আমি মাড়াই নি। তোমার কথা শুনেছিলাম, মেলা নিন্দা তোমার। ছবি আঁক। আর টাকা ওড়াও। এখানকার চালচলন তাও ভাল লাগেনি। আমার ছেলেরা, ব্রজ বাদে, সবাই তোমার নামে অনেক কথা বলে। কিন্তু কাল অর্চনা গিয়ে যখন পড়ল আমার পায়ে আর তোমার কথা বললে, তখন চোখ খুলল। ভাবলাম ভালই হয়েছে। ছেলে তো মা বাপ দুয়ের গুণেই হয়। আমার গর্ভে তুমি হলে তুমি এমন হতে না। অন্যরকম হ'তে। তোমার মা লেখাপড়া জানা মেয়ে, বড় উকীলের ভাগ্নী। তার গুণ পেয়েই না তুমি এমনি। আজ অর্চনার বিয়ের সব ভার নিতে চেয়েছ। দেবোত্তরকে বাঁচিয়ে রেখেছ। ছোটমা—আমার শাশুড়ীর জন্যে এত করেছ। ভালই হয়েছে। সারারাত ভেবে সকালে অর্চনাকে বললাম—চলতো সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। কথা বলে আসি। তা মনটা জুড়লো বাবা।

আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে শুনছিলাম—দাঁড়িয়েই রইলাম।

অর্চনা চা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন—পান দেখ দেখি? সুরেশ্বরের এখানে পানের কারবার আছে না—নেই? কলকাতায় মানুষ আজকালকার ছেলে সিগারেট খায়, মদও হয় তো খায় কিন্তু পান তো ওরা খায় না। বলে খুড়ীমা হাসলেন।

অর্চনা বললে—দোক্তা আনতে রঘুকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। পান এখানে আছে। জর্দাও আছে, তা জর্দায় তো তোমার হবে না! সুরোদার সেদিকে ত্রুটি নেই। সায়েবী কেতা থেকে দেশী কেতার বন্দোবস্তের ত্রুটি নেই।

খুড়ীমা বললেন—তা তো এ-বাড়ীর চিরকালের রেওয়াজ মা। আমি যখন প্রথম বউ হয়ে এলাম, তখন গাড়ী ঘোড়া লোকলস্কর, সাহেবী বাসন কাঁটা চামচে, মুসলমানদের বাসন বাবুর্চি সব ছিল। শ্বশুরের আমলের হাতীটাও তখন বেঁচে। তা যা, পান সেজে নিয়ে আয়। যা, দাঁড়াস নে, চা খেয়েই আমার পান চাই। খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ থাকলে আমার ন্যাকার আসে।

অর্চনা চলে গেল। খুড়ীমা চা নিয়ে কর গুনে নিবেদন করে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—চমৎকার চা হয়েছে। এমন চা অনেকদিন খাইনি। হঠাৎ হেসে বললেন—আমাদের বাড়ীতে দু পয়সা প্যাকেটের চা, আর একটা পুরনো এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে জল গরম হয়—ফুটতে শুরু করলে প্যাকেট শুদ্ধ চা ফেলে দিয়ে ফুটল। তাই নামিয়ে দুধ দিয়ে চিনি দিয়ে পেতলের হাতায় ঘেঁটে চা তৈরী হল। তারপর কাঁসার গেলাসে একগেলাস করে নিয়ে বসল মেয়ে-পুরুষ ছেলেতে বিশ-পঁচিশজন। যেমন গন্ধ তেমনি স্বাদ।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না সুলতা, এসব কথার কি উত্তর দেব। শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু খুড়ীমার সেদিকে গ্রাহ্য ছিল না। তিনি যেন শুধু কথা বলতেই এসেছিলেন এবং আমাকেই বলতে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ এবার বলে ফেললেন—আমার হিংসে ছিল বাবা, রাগ ছিল দারুণ রাগ ছিল। দেখ এসব তো আমার হ'তে পারত। তুই তো আমার পেটে হতে পারতিস! তা হ'ল না—বেশ, হ'ল না। আমি লেখাপড়া জানা ছিলাম না, বিবি ছিলাম না। বেশ। কিন্তু ঘটকালী করে আমার কপালে এই এমন একটা মানুষ—

অর্চনা এসে ঢুকল পান হাতে করে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন খুড়ীমা। খুড়ীমা হেসে বললেন—পান, প্রাণটা বাঁচল। এ তো বেশ বড় ঢলকো পান রে! খুব মোটা খিলি করেছিস।

অর্চনার সেই এক উত্তর—তোমার ভাসুরপো একেবারে আমীর গো। পানের সরঞ্জাম, সেই কলকাতার কাটা সুপুরী সুগন্ধি খয়ের কমলানেবুর শুকনো খোসা, খুব সুগন্ধি জরদা, ছোট এলাচ বড় এলাচ সব আছে!

—ছোট এলাচ দিয়েছিস নাকি?

—না। তুমি খাও না আমি জানি। জর্দাও দিই নি।

—আন ৬ জর্দা খাইনে পাইনে বলে রে। নইলে সেকালে কাশী থেকে জর্দা আসত মেজতরফের কর্তার নামে। তাই ভাগ ক'রে দিতেন। এখন কড়া তামাকপাতা আর দুটো

জোয়ান মৌরী দিয়ে ভেজে নামিয়ে নি। আন জর্দা আন।

এতক্ষণে সুলতা, আমি কথা খুঁজে পেয়ে বাঁচলাম। বললাম—কৌটাটা আপনি নিয়ে যান খুড়ীমা।

—নিয়ে যাব? আমার মুখের দিকে তাকালেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—দে। তোকে আজ বড় ভাল লাগল রে।

তারপরই চলে গেলেন। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—যা বললাম তার চেষ্টা তুই অবিলম্বে কর বাবা! তোর ঠাকুরদার ওপর অন্নপূর্ণা ঠাকুমার একটা মায়া ছিল। হয় তো তোর কথা রাখলেও রাখতে পারেন। সে ছেলের বিয়ে এখনও হয় নি। এ বাড়ীতে বিয়ে দেবেন না বলে চিঠি লিখেছিলেন অগ্রহায়ণ মাসে। আজ তো মাঘ মাসের ৪ঠা।

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, আমি ৬ই মাঘ, দুদিন পর, কলকাতায় এলাম। খুড়ীমার কথাটা আমার মনে ভাল লেগেছিল। অন্নপূর্ণা দেবীকে বছর দুয়েক বিজয়ার পর একবার ক'রে দেখেছি। বাবা-মার সঙ্গে যেতাম। বিজয়ার পর প্রণাম করতে যেতেন। বাবা যখন খুব সাহেব, যখন বিয়ে করেন নি তখন বাবা যেতেন না তাঁর ভয়ে। বিয়ের পর তিনি নিজে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, মাকে গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমি যেবার প্রথম যাই তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। আমাকে দেখে ব'লে উঠেছিলেন—ওরে, এ সে অবিকল আমার দেবুরে। কি সমাদর—আমাকে একশো টাকার নোট দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন—দেখ, সাচ্চা জরী বসানো ভেলভেটের পোশাক কিনে দিস। আর মাথায় একটা পালক দেওয়া পাগড়ি। জানিস, কালীপূজার সময় এই বয়সে দেবু আমার এই পোশাক পরত।

পরের বছর ঠিক তেমনি পোশাক পরে গিছলাম বিজয়ার সময়। তিনি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমাকে দেখে কেঁদেছিলেন। অবিকল দেবেশ্বর। অবিকল! তারপর আমাকে বলেছিলেন—দেখিস বাবা, সেই রূপ পেয়েছিস, কিন্তু দেবুর মত হ'সনে। খবরদার।

তারপর যাওয়া বন্ধ হয়েছিল। বাবা, ইংরিজী কাগজে খুব কড়া প্রবন্ধ লিখলেন, সেটা ষোল সতেরো সাল, পলিটিকাল মার্ডার আর টেররিজিম নিয়ে প্রবন্ধ। প্রবন্ধ একটা নয়, সে একটা সিরিজ—বোধহয় তিনটেতে সম্পূর্ণ হয়েছিল। তার মধ্যে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন মার্ডারারদের মন এবং প্রকৃতি। তিনি বলেছিলেন—আসলে এরা মার্ডারার প্রকৃতি নিয়েই জন্মায়; যদি এরা শিক্ষা না পেত, তা হ'লেও তাদের এই দুর্নিবার প্রকৃতি এই পথেই এদের চালাত। সাধারণ মার্ডারের সংখ্যা তো কম নয়। এ শুধু এদেশেই নয়, সব দেশে। শিক্ষা এদের খুঁজিয়েছে একটা 'কজ'—'এ নোবল কজ'। কিন্তু কজ—যা তোমার কাছে নোবল—তা অন্যের কাছে নোবল্ তো নয়ই, সেটা সেই চিরন্তন ক্রাইম। এই ধরনের প্রবন্ধ। তার সঙ্গে তিনি জড়িয়েছিলেন ল'ইয়ার এ্যাডভোকেটদের। বলেছিলেন—যারা এই সব ক্রিমিন্যালদের ব্রিফ নিয়ে কেস ডিফেণ্ড করে তাদের নেচার এ্যানালিসিস করলেও ঠিক এই ক্রিমিন্যাল ইনস্টিংক্ট্ পাওয়া যাবে। এবং তাদের মধ্যে আবার আরও এক গভীর জলের মৎস্য আছে যারা একই সঙ্গে এই ইনস্টিংক্ট এবং তাদের কেরিয়ারের পথ ক্লীয়ার এবং ব্রডার করে নেয়—যাতে ক'রে

তারা পায়ে হাঁটার বদলে জুড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে চলতে পারে। সেই হিসেবে কনসিডার দেম গ্রেটার অফেণ্ডারস্ টু দি সোসাইটি এ্যাণ্ড স্টেট। যদিও ম্যাজিকে-মুগ্ধ জনসাধারণের স্তিমিত লজিক অনুযায়ী তারা সেলফলেস গ্রেট মেন এ্যাণ্ড ওয়ার ফ্রন্টের সাপ্লাই এ্যাণ্ড সাপোর্ট লাইনের বিগ হিরোজ ব'লে পরিগণিত হয়।"

তুমি তো জান সুলতা, বাবা আমার গান্ধীজীকে কি ব্যঙ্গোক্তি এবং বক্রোক্তি করেছিলেন! তাঁর এ প্রবন্ধ আমি পড়ি নি, কারণ বয়স তখন আমার ছ' সাত বছর। আমি শুনেছি। অবিশ্বাসও করি না। বাবা হয়তো ঠিক এই ধরনের মানুষ ছিলেন না, তবে ইংরিজী কাগজে গিয়ে নাম করবার জন্যে এই ধরনের স্টাণ্ট লিখেছিলেন। এ বোধকুয় ছিল তাঁর রক্তে।

সুলতা বললে—তার কিছুটা তোমার মধ্যেও আছে।

—নিশ্চয় আছে। স্বীকার করব না কেন? নিশ্চয় করি। নইলে বাবার বিরুদ্ধে আমিও তো এগার পেরিয়ে বারো বছর বয়সে ননকো-অপারেশনে পিকেটিং করতে গিয়েছিলাম। যার ধাক্কায় বাবা চাকরি ছাড়লেন। বাবা মিস চন্দ্রিকাকে নিয়ে পালালেন। আমি গোঁড়া হিন্দু হলাম। তারপর বাবা মারা গেলেন, শ্রাদ্ধ করতে এসে কীর্তিহাটের রায়বংশের পরিণতি দেখে তিরিশ সালে জেলে গেলাম। জেল থেকে বণ্ড দিয়ে একমাস আগে বেরিয়ে এসে ইংরিজী কাগজে বিদায় সত্যাগ্রহ লিখলাম। তারপর আর্টিস্ট হলাম। দাড়ি গোঁফ রাখলাম। মা মারা গেলেন। তোমার সঙ্গে আলাপ হল। হঠাৎ কীর্তিহাটে সেটেলমেণ্টের টানে এসে আর একরকম হয়ে গেছি। বলতে গেলে জমিদারী মেজাজ নিয়ে রায়বাড়ীকে কলঙ্কমুক্ত করবার মত দম্ভ নিয়ে এইসব ছবি এঁকেছি। আছে বই কি।

সুলতা রাগ করলে না। হাসলে। বললে—বড় রেগে গেছ তুমি হঠাৎ। কথা শেষ হতে হ'তে হাসিটা জোর হয়ে উঠল। হঠাৎ থেমে বললে—পাত্রাধার তৈল এবং তৈলাধার পাত্র এক সঙ্গে দুইই সত্য—বললে—রাগ করো না।

লজ্জিত হ'ল সুরেশ্বর। বললে—ঠিক বলেছ। মনটা ফুঁসছে। পাত্রে তৈল থাকে, পাত্রের আকার নেয় কিন্তু তৈলও গুণ হারায় না পাত্রও আকার হারায় না। কীর্তিহাটে এসে ইণ্টেলেকচুয়াল আমি এবং জমিদারী আসনে বসে জমিদার বংশধর আমি মিশে গিয়েছি। হয়তো প্রদীপ হয়ে আলো ছড়াতে চেয়েছি কিন্তু কড়াইয়ের তেলে বেগুনের ফালির মত ফুটতে শুরু করেছি।

সুলতা হেসে উঠল আবার। বললে—চমৎকার বলেছ। কিন্তু আমি বলছি—বে-গুণ তুমি নয়। গুণ তোমার কাছে। হঠাৎ রেগে গেছ। কারণটা ঠিক বলতে পারব না।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর আবার বললে—কারণ আমার বাবার ওই প্রবন্ধের স্মৃতি। ওই 'বিদায় সত্যাগ্রহ' চিঠিটার একটা সম্পর্ক আছে। হেরিডিটি ছাড়া কি বলব? তা ছাড়া যা বলতে যাচ্ছি—অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ীতে অর্চনার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়ার কথা—তার সঙ্গে যোগটা আরও নিবিড়। ওর সঙ্গে আমার বাবার ওই প্রবন্ধটা বের হবার পরই অন্নপূর্ণা দেবী বাবাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—"তুমি ইংরাজী কাগজে যেসব কথা লিখিয়াছ তাহা শুনিয়া আমি নগেন্দ্রকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলাম। সে সমস্তই আমাকে বাংলা করিয়া শুনাইল। ইহাতে তুমি আমাদিগকেও গালি দিয়াছ। আমার ছেলে ভবেন্দ্র উকীল

ছিলেন। আমার স্বামী উকীল ছিলেন। আমার স্বামী আলিপুর বোমার মকদ্দমায় আসামীপক্ষে ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। আমার ছেলে ভবেন্দ্র এমন অনেক মকদ্দমায় বিনা ফীতে কাজ করিয়া গিয়াছে। সেও আজ নাই। তাহার পুত্র নগেন্দ্রও এমন ওকালতি করিয়া থাকে। আমি তাহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিই। ইহার জন্য আশীর্বাদ করি। সুতরাং তুমি আমার বংশকে এমন কি আমাকেও অপমান করিয়াছ। বহু পূর্বেই পিতৃবংশের সহিত সম্পর্ক ত্যাগই করিয়াছি। সে দাদার আমল হইতে। শুধু দেবেশ্বর আমার সমবয়সী—খেলার সঙ্গী ছিল, তাহাকে বাল্যকালে ভাইফোঁটা দিবার জন্য কাঁদিতাম, সেই কারণে সে অনেক কুকার্য করিলেও তাহাকে ত্যাগ করি নাই। অদ্য হইতে তোমাকেও ত্যাগ করিলাম জানিবে। অতঃপর, তুমি বৎসরে একদিন আইস, তাহাও আর আসিবে না।”

বাবা হেসে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এবং আর যাননি কোনদিন। আমিও যাইনি। এবং একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। বাবার মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়নি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র গিয়েছিল। অন্নপূর্ণা দেবী লোক দিয়ে ঘাটে কামিয়ে উঠবার পর পরবার জন্য নতুন কাপড় পাঠিয়েছিলেন। আর দশ টাকা লৌকিকতা। কিন্তু পত্র দেননি।

মায়ের মৃত্যুর পর ও-বাড়ীতে যাইনি নিমন্ত্রণ করতে। মনটা যেন ভুরু কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—নাঃ। কি লাভ হবে কতকগুলো কটু কথা শুনে!

এবার অর্চনার জন্যে সংকোচ করলাম না। ঠিক করলাম যাব। অন্তত অর্চনার ফটোখানা দেখিয়ে আসব।

খুড়িমা বললেন—উকিল নগেনবাবুর ছেলেটি ভাল। ডাক্তারী পাশ করেছে, বিয়ে করেনি। কারণ, অন্নপূর্ণা দেবীর প্রপৌত্রের জন্য পাত্রী তাঁর পছন্দমত হওয়া চাই।

অর্চনা অবিকল ভবানী দেবীর মত দেখতে, তার উপর সে গৌরী। দেখেছ তো অর্চনাকে। আজও তার কি রূপ! কিন্তু সে সময়ের রূপের আর কিছুই নেই। সে অর্চনার আর কিছুই নেই বিধবা অর্চনার মধ্যে।

ঠিক এই মুহূর্তেই পুরানো কথার ধারায় বাধা দিয়ে আজকের বিধবা অর্চনা এসে ঢুকল। কাঁধে একখানা বড় তোয়ালে। তার বেশী অংশটাই সামনের দিকে ঝুলছে, সে তাতে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল। এবং বললে—রায়বংশের ইতিহাসে বড় বড় রায়দের ছেড়ে সর্বনাশী অর্চনার নাম কেন?—না, তাই বলছ।

সুলতা বললে—না ভাই, হচ্ছিল তোমার সে-কালের রূপের কথা।

—রূপের কথা! একটু হাসলে অর্চনা। তারপর বললে—হ্যাঁ, তা ছিল। কিন্তু তাই আমার কাল। রূপের জন্যেই বিয়ে হল। বল তো সুরোদা, বিয়েটা না হলে রায় বংশের মহাভারত কি অশুদ্ধ হত? আমি আমার পথ তো ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমি হয় মরতাম, নয়তো এত মেয়ে জেলে গেল—যেতাম। সুলতাদির মত দেশের কাজ করে বেড়াতাম।

সুরেশ্বর বললে—তোর বিয়ের কথাই বলছি রে। রায়বংশের মহাভারত তুই যে শুদ্ধ করতে এসেছিস। তোর বিয়ে না হলে সেটা হয় কি করে? অতুলেশ্বরকাকা আজ কংগ্রেসী মাতব্বর। স্বাধীন দেশের মধ্যে কাটা বাংলাদেশে মেদিনীপুর সব থেকে বড় জেলা।

সেখানকার কংগ্রেসীরাই আজ প্রধান। বল না অতুলেশ্বর রায়বংশের মহাভারতে পাণ্ডব কৌরবদের কে? কেউ না! সে যদুবংশের মহানায়ক পার্থসারথির ডানহাত বা বাঁহাত সাত্যকী-টাত্যকীর মত কেউ হয়ে বসে আছে। রায়বংশের মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তার চুকে গেছে। তুই তেমনি ধারা, রায়বংশের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে সুলতার মত প্রমীলা-ট্রমীলা কেউ হত্তিস।

—খুব হয়েছে। কিন্তু এখনকার মত ওঠো। খাবার তৈরি, শীতের দিন, গরম-গরম খেয়ে নাও এখন। পুরনো কাল ছেড়ে নতুন কালে—যে-কালে মহাভারতের হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি-ঢাকা পড়েছে, সেইকালে এস। নয়াদিল্লীর কনট সার্কাসের হোটেল-রেস্টুরেন্টের মত খাবার করেছি। তবে মাংস মুর্গীর নয়। ওটা মাপ করতে হবে।

—ব্রজদা কি করছে? তার ভজনটজন শেষ হয়েছে।

—অনেকক্ষণ। বসে বসে মাংস রান্না বাত্‌লাচ্ছিল। ওইটেই ছাড়তে পারলে না ব্রজদা। কি বলছিল জান?

—কি?

—হঠাৎ চুপ করে গেল একসময়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বল, এবার কি করব? ঝোল অনেকটা রয়েছে, অথচ মাংসটা নরম হয়ে গেছে খুব। গলে যাবে হয়তো। উত্তর দিলে না। আবার ডাকলাম, ব্রজদা। ব্রজদা হেসে উঠল। বললাম, হাসছ যে? ব্রজদা বললে—ওরে অর্চি, সন্ধ্যেবেলা থেকে ঠাকুরকে বলছিলাম—ঠাকুর, এবার পথে বের করে দাও। বড় ইচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে শুধু তোমায় নিয়ে থাকি। কিন্তু মজা দেখ—এই এতক্ষণ ধরে ঘ্রাণেন অর্ধভোজন করছি, আর ভাবছি, আঃ, এমনি আহারটি যদি নিত্যি জোটে! হঠাৎ সন্ধ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভাবছিলাম, ঠাকুর সব পারে। চোখ-কান-মাথা-হাত-পা সব জব্দ করতে পারে। সবাইকে দমন করতে পারে। কালীয়-নাগকেও পারে, কংসের হাতীকেও পারে। পারে না শুধু মানুষের উদরের সঙ্গে। আরে অন্যে পরে কা কথা, নিজেই ঠাকুর ছেলেবেলায় চুরি করে খেয়েছে, মদ্দ জোয়ান হয়ে ভাত পায়নি, রুটি পায়নি, বিদুরের খুদ খেয়ে—নামই হয়ে গেছে দামোদর।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে অর্চনা।

তোয়ালের খুঁটে চোখ মুছলে। সুলতা বললে—ওটাই মহাভারতের আদি কথা অর্চনাদি। কৌরব-পাণ্ডব, রায়বাড়ী—সব বাড়ীর সব কথার মূলেই ওই কথা। তবে উদর বলব না, বলব অন্ন।

—না। সুলতাদি, কথাটা তোমার নেহাতই পলিটিক্যাল থিয়োরী। ওছাড়া আরও অনেক কিছু আছে।

সুরেশ্বর বললে—চল খেয়েদেয়ে এটার মীমাংসা করব। ওঠো সুলতা।

খাওয়া দাওয়া সেরে এ ঘরে এসে সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—দেখ, আমার জবানবন্দী নেবার বিচারক, তুমি কি এ্যাডজোর্নমেণ্ট দিয়ে বাড়ী যাবে—না? রাত্রিও অনেকটা হয়েছে।

সুলতা চুপ করে রইল। ভাবছিল।

—তা হলে আজ না-হয় থাক! গাড়ী বলে দি!

—না। অন্ততঃ অর্চনার ভাগ্যের কথাটা শুনে যাব। উনি—ওকথা বললেন কেন?

—কোন কথা, নিজেকে স্বামীঘাতিনীর কথা?

—হ্যাঁ।

কথাটা অর্চনা বলেছে খাবার সময়। দুপাশে মুখোমুখি হয়ে বসেছিল চারজনে।

টেবিলে নয়, অর্চনা খাবার ব্যবস্থা করেছিল মেঝের উপর আসন পেতে। বলেছিল—টেবিলে বসলে আমার বসা হবে না—তাই মেঝের উপর আসন পেতে সনাতন নিয়মে করলাম। অসুবিধে হবে?

কথাটা সুলতাকেই বলেছিল। এর অর্থ সুলতার বুঝতে দেরী হয় নি। ব্যাপারটা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার। এবং সেটা তাকে নিয়েই। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বলেছিল—না—না—অসুবিধে কিসের? ঠিক আছে। এ বেশ সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু শেষকালটায় না-বলে পারে নি—আর ছোঁয়াছুঁয়িটা আপনি মানেন—

—না সুলতাদি, তা মানিনে। এই দেখুন—ওপাশে দুখানা আসন—ও দুখানা বড়দা আর সুরোদার জন্যে। আর এদিকে পাশাপাশি আমরা দুজন। আমি মাছ মাংস পেঁয়াজ এগুলো খাইনে, রাত্রে ভাতটাও খাইনে কিন্তু নিরামিষ তরকারী আলু ছেঁচকি-আলুভাজা-পটলভাজা এসব খাই, লুচি রুটির সঙ্গেও খাই মুড়ির সঙ্গেও খাই। হয়তো জানেন না নির্জলা একাদশীও একালে উঠে গেছে। তা নয়, আমার আপত্তি ওই টেবিল। আর ওই চাদর। বুঝলেন না ওটা ভাই বরদাস্ত করতে আমি পারিনে। বিধবা বিয়েও আমি সহ্য করতে পারি, সমর্থন করি। অসবর্ণ বিয়ে—এমন কি International কি Inter Communal বিয়েতেও আপত্তি নেই। কি একটা মেয়ে ডাইভোর্স করছে তাও সয়—কিন্তু দুবার তিনবার ডাইভোর্স করে বিয়ে এটা সহ্য করতে পারিনে। ওটাকে আমি ঘেন্না করি। আর ঘেন্না করি cheating কে! ভালবাসার ছলনার চেয়ে পাপ আর হয় না! জানেন আমার লাইফের ট্র্যাজেডিই ওইখানে। আমার স্বামী আমাকে—।

হঠাৎ চুপ করে গেল অর্চনা। কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বসুন—আপনাদের পরিবেশন ক'রে দিয়ে আমি বসে পড়ব আপনার পাশে।

প্রায় অন্ধ ব্রজেশ্বর কালো চশমাটা খুলে রেখে খেতে বসল। তার পাশে সুরেশ্বর।

ব্রজেশ্বর দিনের থেকে রাত্রে দেখতে পায় অপেক্ষাকৃত ভাল। সকালে সূর্যোদয় থেকেই চোখ তার রাঙা হতে শুরু করে। রোদ যত বাড়ে তত যন্ত্রণা বাড়ে। কালো চশমায় আরাম বোধ করে এবং একটু আধটু দেখতেও পায়, রাত্রে যন্ত্রণা কমে—জল পড়া বন্ধ হয়। তখন আলোতে দেখতে পায়।

চশমাটা খুলে রেখে ব্রজেশ্বর বলেছিল—ওরে ভাই, এসব এড়াবি কি ক'রে? সংসারে এ-জন্মের ঋণ ও-জন্মে শোধ করতে হয়। তুই সেই সতীবউরাণী—

অর্চনা বলেছিল—থাম তো ! ওই ব'লে ব'লে তোমরা আমাকে পাগল করে দেবে। যত সব বাজে কথা ! তোমাদের যত ঝঞ্ঝাটে আমাকে জড়াবার ফন্দী ! আমি সতীবউরাণী তাহলে তুমি-টা কে শুনি ? আর ওই সুরোদা, ওই বা কে ?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—রাজাভাই আমার ; প্রজাদের কাছে রায়দের ঋণ তো অনেক। শোধ দিতে এসেছে। সে জন্মে মদ খায় নি—বিলাস করে নি—তা ক'রে নিতে এসেছে। অঞ্জনা ঠাকরুনের ঋণ শুধতে এসেছে।

সুরেশ্বর বলেছিল—ব্রজদা, তুমি ভাই একখানা বই লেখ—।

ব্রজেশ্বর হা—হা করে হেসে বললে—দ্বিতীয় ভাগের বানানগুলো আজীবনে দোরস্ত করতে পারিনি—বাংলা পণ্ডিতের কিল খেয়ে রায়বংশে জন্মেও মোটাতে পারি নি। তার উপর ঠাকুর চোখে মেরেছেন। তুমি জানো রাজাভাই—সুপুরুষ ব্রজেশ্বরের চোখের চাউনিতে কি ভেল্কী খেলতো। এখুনি করুণ সজল ; রাজা মহারাজাদের সামনে সেই দৃষ্টিতে তাকালে পখল পানি হো যাতা থা। সুন্দরী যুবতীদের দিকে একটু ঢলঢলে উদাস দৃষ্টিতে তাকাতাম, তারা মরমে মরে যেতো। এখন সেই চোখ গেছে, দু চোখে পানি ঝরে। দেখতে পাইনে। তবে আমি বলে যেতে পারি তুমি লিখে নিতে পার। মডার্ন রিয়ালিস্টিক না হোক, লোকে অবাক বনে যাবে।

অর্চনা বলেছিল—আমাকে ব'লো আমি লিখব। সংস্কৃতে এম-এ পাশ করেছি—বানান সব আমি শুদ্ধ ক'রে লিখতে পারব।

—তা হলে ধর—তুই সতীবউরাণী, রাজা ভাইয়ের তিন জন্ম রায়বংশে—প্রথমে কুড়ারাম রায়, তারপর রত্নেশ্বর রায় তারপর রাজাভাই সুরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বলে উঠল—নিজের কথাটা বল—।

—দাঁড়াও ভেবে দেখি, আমি কে ?

অর্চনা বললে—তুমি কে আমি বলব ?

—বল ?

—তুমি সেই শ্যামাকান্ত—এ জন্মে কাঁদতে এসেছ। মুক্তি তোমার এই জন্মে।

—উঁ-হু, উঁ-হু, উঁহু ! শ্যামাকান্ত আমি ? বাপস্। আমি হলাম ;—আমি হলাম কে ?

সুরেশ্বর হেসে বললে—তা হ'লে আমি যতটা দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি তাতে দেখছি তাতে তুমিই হলে কুড়ারাম রায়।

অর্চনা বললে—ঠিক, ঠিক, ঠিক ! বংশটা প্রতিষ্ঠা করেছিলে—কোন প্রেজুডিস্ ছিল না—সেই মুসলমান মেয়েটার চুল বঁটিতে কেটে গোবর খাইয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে ঘর করেছিল, তোমার সঙ্গে মিলবে ব্রজদা—সেই হলে তুমি।

খেতে বসে আলোচনার ধারাটা হাস্য-পরিহাসে এসে পৌচেছিল। ব্রজেশ্বর বললে—আচ্ছা সুলতা দেবীকে আপ্যায়ন কর। উনি বলুন। আমরা গেঁয়ো লোক—বকে মরছি গেঁয়ো চোরের মত, উনি শহুরে—ঠিক সেই শহুরে চোরের মত নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন—ওঁকে একটু

বাধা দেওয়াও হবে। উনিই বলুন—সেই স্থূল বপু গজরাজের মত দুঃসাহসী, ধীর গতি যিনি নাকি রাঁয়-রাঁইয়ার রাজহস্তীস্বরূপে যথেচ্ছ ভ্রমণ করে বিশাল কীর্তিহাট নামক অরণ্য এলাকা দখল করে বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেই মহাশয় ব্যক্তি বা ঐরাবৎ কি এমনি দুর্বল দেহ, শেয়ালের মত ধূর্ত ভীরু যে অহং ব্রজেশ্বর রায়—সে হতে পারি ?

সুলতা হেসে বললেন—শেষকালটায় মিল আছে। তিনিও শেষ বয়সে কালী কালী করেছিলেন, আপনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছেন।

—হা হতোস্মি—এই হল আপনার বিচার ? শহুরে চোরের মত এককথায় ফুললো আর গলো ? সংসারে শেষ জীবনে কালা কালী বা কেষ্ট কেষ্ট কি শুধু কুড়ারাম রায় করেছিলেন না আমি করছি ! সব পাখীতে মাছ খায় রাজাভাই, ধরা পড়েছে মাছরাঙার মত এই তোমার ব্রজদা।

—কি বললেন—কি বললেন কথাটা ? কি সব পাখীতেই—

—ও—সব পাখীতেই মাছ খায় ধরা পড়েছে মাছরাঙা।

অর্চনা বললে—ওসব আমাদের পাড়াগাঁয়ের প্রবাদ।

ব্রজেশ্বর একখানা ফ্রাই তুলে নিয়ে বললে—হয়েছে অর্চনা। আমি হলাম অঞ্জনার বাউণ্ডুলে স্বামী ! সুদর্শন ! আর বিমলেশ্বর কাকা কে জান। ও হ'ল সেই বেটা গোপাল সিং ! বেটা শেষকালে জব্দ হয়ে বীরেশ্বর রায়ের অনুচর হয়েছিল, তীর্থ ক'রে এসেছিল—সে এসেছে এ বংশে তার বাজেয়াপ্তি সম্পত্তি ভোগ করতে। দেখ, সে-জন্মে মেরেছিল নিজের বেটাকে। এ-জন্মে শিবুর হাত কুপিয়ে সে-জন্মের জেল-খাটাটা খাটতে গেল।

অর্চনা বললে—তুমি বড়দা ভুল বললে—তুমি এসেছ খোদ বেদব্যাস, পথ ভুল করে এই রায়বাড়ীর ভাঙাহাটে। সে-জন্মে যা ভোগ করনি, যে-সব পাপ করনি এ-জন্মে করার পর তোমার ভগবান তোমায় চোখে রোগ দিয়ে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছে !

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তাও হতে পারে। না হলে, তুই সতীবউরাণী এ কথা আমার মত কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে ? হ্যাঁ, দিব্যচক্ষেই দেখছি রে আমি। অর্চি দিব্যচক্ষেই দেখছি। সতীবউরাণীকে সে-জন্মে বীরেশ্বর রায় প্রাণ দিয়েও পান নি। বারো বছর পর সতীবউরাণী ফিরে এসেও ধরা দেন নি। তোকে সেই সতীবউরাণী জেনেই অন্নপূর্ণাঠাকরুণ নিজের একমাত্র নাতির নাতবউ করেছিলেন। তুই এবার প্রাণঢেলে তাকে চাইলি—কিন্তু সে শোধ নিলে গত জন্মের, বছর না ঘুরতে রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা ক'রে শোধ নিয়ে চলে গেল।

সুরেশ্বর বলে উঠল—থাম ব্রজদা। কি সব বলছ ?

ব্রজেশ্বর হেসে বললে—ওই দেখ। রাজাভাই, কাল জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাশ হয়েছে। কাল থেকেই তোমাকে আমার রাজাভাই বলা উচিত নয়, তোমারও আমাকে প্রজাদাদা হিসেবে ধমক মারা উচিত নয়। কিন্তু হলে কি হবে ? ও কি ওঠে রে রাজাভাই—না ও ওঠবার। তা বেশ—চুপ করতে বলছ—তা চুপ। চাঁদবিবি নাটক হয়েছিল—তাতে মিয়ানমুঞ্জু আর হাবসী এখলাস্ খাঁ তরোয়াল খুলে লড়ে আর কি, এমন সময় চাঁদ সুলতানা ঢুকল, বললে—মিয়ানমুঞ্জু চুপ। অমনি মিয়ানমুঞ্জু চুপ—ওদিকে এখলাস খাঁ রুখে উঠেছে, কাটে আর কি,

চাঁদ সুলতানা তাকেও বললে, চুপ! তো সেও চুপ হয়ে গেল। তা তুমি রাজাভাই যখন বলছ তখন মিয়ানমুঞ্জু চুপই হয়ে গেল।

কথাটা বলায় কোথায় যে অন্যায় হয়ে গেছে তাতে তার সন্দেহ ছিল না, সে-কথা বুঝতে পেরেই সে এই ধরনের খানিকটা আবোলতাবোল বকে ব্যাপারটা লঘু করে নিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তার আগেই যা হবার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অর্চনাকে নিয়ে। অর্চনা সুলতার পাশে বসে খাচ্ছিল, হঠাৎ সে বাঁ হাতে কপালটা ধরে ঝুঁকে পড়ল, ঝুঁকে পড়ার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সকলেই বুঝতে পারলে যে সে নিজের মুখখানিকে ওই ভঙ্গির মধ্যে আড়াল দিতে চাচ্ছে। এবং ডান হাতে সে শুধু খাবার নাড়াচাড়াই করছে, কিন্তু গ্রাস মুখে তুলছে না!

সুলতা বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে কষ্ট হল না যে, এই কথাটায় নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে অর্চনা মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। স্বামীকে মনে পড়েছে।

সেও মাথা হেঁট ক'রে খেতে চেষ্টাই করছিল। সুরেশ্বরও তাই। শুধু অতি স্বল্পদৃষ্টি ব্রজেশ্বর কথাগুলো শেষ করে অকারণে নিজের কথার ব্যর্থ কৌতুকে খানিকটা হেসে হাতে ধরা ফ্রাইখানা খেতে খেতে বললে—কি চমৎকার ফ্রাই করেছিস অর্চনা! জানিস চিরকুমার সভার সেই ধরে আনা বর ছুটোর "কটলেট কই মশাই কট্‌লেট?" মনে পড়ছে। আমি একবার ওই মৃত্যুঞ্জয়ের পার্ট করেছিলাম! ঠাকুরদা বলেছিলেন—সাবাস্ রে ব্রজ সাবাস্! তুই আমার নাতি না হ'লে তোকে মেডেল দিতাম।

বলে আর একদফা হাসলে এবং গবগব ক'রে খেতে লাগল।

তাতেও কেউ কোন কথা বললে না; প্রায় অন্ধ ব্রজেশ্বর এবার বললে—গানটা মনে আছে? বলেই হাত নেড়ে ভঙ্গি ক'রে গেয়ে উঠল—যাও ঠাকুর, চৈতন চুটকি নিয়া—এস দাড়ী নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা!

সুরেশ্বর এবার বললে—ব্রজদা, কি করছ তুমি?

তার কণ্ঠস্বরে ছিল বিষণ্ণ তিরস্কার, প্রায়ান্ধ ব্রজেশ্বর এবার তার স্পর্শে চমকে উঠে বললে—কেন রাজাভাই? কি—? অর্চি—অর্চি—ওরে অর্চি!

এবার বুঝতে পেরেছে সে। সে আর্তভাবে ডেকে উঠল—অর্চি। অর্চি! ওরে অর্চি! সাড়া দিচ্ছিস না কেন ভাই?

এবার প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করে অর্চনা কোনমতে বললে—কি বড়দা?

—তুই কাঁদছিস?

—না—না!

ব্রজ বলে উঠল—ছি—ছি-ছি। ছি—ছি—ছি! এ আমি কি করলাম। আমি দেখতে পাইনে—। ছি—ছি—ছি! এর থেকে—।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্চনা বললে—তুমি ছি ছি ক'র না বড়দা। তোমার কোন অন্যায় হয় নি। কিছু অন্যায় বলনি! আজকের তোমাকে তো আমি চিনি। জানি। তুমি কোনকালে কোন পাপ করেছ তুমি জান। কিন্তু অন্ধ হয়ে চোখ চাওনি—শুধু ভগবানকে

ডাক—তোমার মুখ থেকে সত্যি ছাড়া মিথ্যে বের হবে কেন ? ঠিক বলেছ তুমি। তোমাদের সতীবউরাণীর অপরাধ কি ছিল তা আমি জানি নে। আমি তিনি কিনা তাও বলতে পারব না। তবে তাঁর এক বছরের মধ্যে অকালমৃত্যুর কারণ আমি। বলতে গেলে আমিই স্বামী-ঘাতিনী। এবং আমাকে দুঃখ দেবার জন্যেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন !

এরপর আর খাওয়া যায় না। কেউ খেতে পারে না। প্রথমেই উঠে পড়ল ব্রজেশ্বর !

—ব্রজদা—বড়দা।

—ওরে অর্চি, পেট ভরে গেছে রে। ওরে আর পারব না।

সে যেন আর্তনাদ করে উঠল।

* * *

আধখাওয়া ক'রে উঠে সুলতা এবং সুরেশ্বর সেই কীর্তিহাটের কড়চার ছবির ঘরে এসে বসল। বিষণ্ণতাটুকু যেন কেটেও কাটছে না। সুরেশ্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললে—দেখ, আমার জবানবন্দীর তুমি বিচারক, তুমি কি এ্যাডজোর্নমেণ্ট দিয়ে বাড়ী যাবে—না ? রাত্রিও অনেকটা হয়েছে। দেখ।

সহজ করে কথাগুলি গুছিয়ে বললেও সুরেশ্বরের কণ্ঠের বিষণ্ণতাটুকু চাপা পড়ল না বা মোছা গেল না—রেশটা রয়ে গেল।

সুলতাও চুপ ক'রেই ছিল ; ভাবছিল।

সুরেশ্বর বললে—দেখ, গাড়ী আনতে বলে দিই।

সুলতা এতক্ষণে বললে—না। অন্ততঃ অর্চনার ভাগ্যের কথাটা শুনে যাব। উনি ও কথাটা বললেন কেন ?

—কোন কথাটা ? স্বামীঘাতিনীর কথা ?

—হ্যাঁ।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সুরেশ্বর। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার টান দিয়ে বললে—তা হ'লে গোড়া থেকে—মানে যেখানে ছেড়েছি সেখান থেকেই শুরু করি শোন। তা হ'লে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। অন্ততঃ কোন প্রশ্নের ফ্যাকড়া বের হবে না।

সুরেশ্বর বললে—বলছিলাম সেই রাত্রির কথা। ১৯৩৭ সালে বিমল কাকাকে এ্যারেস্টের পরের দিন, বড়খুড়ীমা ধনেশ্বর কাকার স্ত্রী মোহনভাঙার মেয়ে সকালে অর্চনাকে সঙ্গে করে এসে আমাকে অন্নপূর্ণা মায়ের কাছে যেতে বললেন। তাঁর বড় নাতির একমাত্র ছেলে ডাক্তারী পাশ করে কিসব রিসার্চ করছে। উজ্জ্বল ছেলে। অর্চনার উপযুক্ত পাত্র হবে। খুড়ীমা তাঁর মেয়ের জন্যে চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু সে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন—তবে অর্চনার চেহারাই এ ক্ষেত্রে বড় আশা। সে সতীবউরাণী ভবানীর মত দেখতে। সতীবউরাণী কালো ছিলেন। অর্চনা গৌরাঙ্গী, সুতরাং কঠোর অন্নপূর্ণাঠাকরুন গলতে পারেন।

আমিও তখন বাইরে থেকে বেকার। না পারি কলকাতায় ফিরতে ; তোমার চিন্তাও আনতে পারি না। কাঁসাই নদীর ঘাটের একটা রক্তমাখা স্থান থেকে কে যেন নিষেধ করে।

এদিকে বিপদের উপর বিপদ। অতুলেশ্বর কাকা—আমার একাধারে মা এবং দিদির মত স্নেহময়ী সঙ্গিনী মেজদি—জেলে। তার উপর অর্চনা।

অন্যদিকে শীত চলে যাচ্ছে, মাঘ মাস, চাষের ক্ষেতের ধান কাটা হয়ে যাচ্ছে। সেটেলমেণ্টের আবার এক নতুন পর্ব আসছে। কিছু বুঝারত তখনও বাকী। তারপর ডিসপিউট দেওয়া কেসগুলির বিচারের জন্যে কোর্ট বসবে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। বিষয়ের জন্য কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে পেয়েছি কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কীর্তিহাটের পাঁচালী ; ঠাকুরের সিন্দুকের মধ্য থেকে সোমেশ্বর রায়ের প্রেম পত্র। এবং ওই যোগিনী আর শ্যামাকান্ত সম্পর্কে পত্র, বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর থাক। বিষয়ের জট ছাড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি রায়বংশের বৃহৎ বটবৃক্ষ।

সে বটবৃক্ষের মূল কাণ্ড মরে গেছে অথচ গাছটা বেঁচে আছে ডাল থেকে নেমে আসা শিকড়গুলোকে কাণ্ড ক'রে নিয়ে।

কখনও দক্ষিণেশ্বর গেছ? তুমি ব্রাহ্ম বলেই জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য বটানিক্যাল গার্ডেনে বিখ্যাত বটগাছটা দেখেছ, কিন্তু সে গাছটা অতি যত্নে তৈরী। রায়বাড়ীর বংশ বৃক্ষটা ওই দক্ষিণেশ্বরের গাছটার মত। তারই মধ্যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দুনিয়া ভুলে গিয়ে। দেখছি এই বংশ বৃক্ষটির শিকড় মাটির তলায় তলায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার মুখ বিস্তার করে। সব রস শুষে চুষে খেয়ে নিয়েছে। কত নতুন গাছকে মেরেছে—

সুলতা বাধা দিয়ে বললে—কথা তুমি বাড়িয়ে ফেলছ সুরেশ্বর। ও সব জানা কথা। প্রজাপীড়নের কথা—কত প্রজাবংশ ধ্বংস করার কথা—কত ঘরবাড়ী সংসার ক্ষেত খামার বন্ধ্যা করে দেওয়ার কথা—জমিদার বংশ, ধনী বংশরূপী বটবৃক্ষেরা যা করেছে কোন ইতিহাসই তার নিখুঁত হিসেব দিতে পারবে না। আজকাল স্টাটিস্টিকসবিদেরা মহেঞ্জদেড়ো হরাপ্পার লোকসংখ্যা যাঁরা বের করছেন ওটা তাঁদের হাতে ছেড়ে দাও। তুমি অর্চনার কথায় এস—তোমার কথায় এস।

সুরেশ্বর বললে—আমি আমার মনটার কথা বোঝাতে চাচ্ছিলাম। আমি তখন আপনার অজ্ঞাতসারে আমার বংশের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি। বংশ পরিচয় সন্ধানী দীর্ঘকালের প্রবাসী একটি খেয়ালী তরুণ এসে যেমন পড়ো ভিঁটের খোঁজ পেয়ে ভূতগ্রস্তের মত ঘুরে বেড়ায়—রাত্রে সাবল হাতে খুঁড়ে বেড়ায় গুপ্তধনের সন্ধানে—তেমনি অবস্থা আমার। কোথাও দু চারটে পুরনো মোহর মেলে কোথাও মেলে পাথর—যাকে মনে করি দুর্লভ মূল্যবান জহরৎ, কিন্তু ধুয়ে মুছে দেখি মোহরগুলো তামার পয়সা, জহরৎগুলো কাচ। আবার অকস্মাৎ মোহরও মেলে, মণিমুক্তাও মেলে। সারা দিনটা বসে বসে ভাবি আর ভাবি—তেমনি আর কি। এর মধ্যে ওই ডাল থেকে নামা ঝুরির মত লম্বা হয়ে নেমে মাটি ছুঁয়েছি, তারও খেয়াল নেই।

তা থাক ও কথা। ইতিহাসই বলি। গল্প বলব না। কারণ মিথ্যে এর মধ্যে নেই।

অর্চনা আমার পরম প্রিয়পাত্রী, তার সম্পর্কে রায়বংশের প্রচলিত প্রবাদেও অন্তত বারো আনা বিশ্বাস করেছি। তখন আর আমি ইন্টেলেক্চুয়াল নই বলতে পার। শুধু খোলসটাই

আছে ভিতরটা পাল্টে গেছে। কীর্তিহাট ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে হয় না।

তবু নড়লাম। অর্চনার তাগিদে নড়লাম। রঘুকে বললাম—জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। কলকাতায় যাব—কাল হবে না—পরশু। ফিরব দিন চারেক কি এক সপ্তাহের মধ্যে। তার বেশী দেরী হবে না।

খবরটা শুনে মোহনডাঙ্গার খুড়ীমা বলে পাঠালেন—পরশু তেরস্পর্শ, পরশু যেতে বারণ করো সুরেশ্বরকে। শুভ কাজে যাচ্ছে।

খবরটা নিজে এসে দিয়ে গেলেন মনোহরপুরের খুড়ীমা মানে অর্চনার মা!

এখানে একটা ফালতু কথা বলি সুলতা। সেটা ওই রায়বাড়ীর এবং বাংলাদেশের বউদের নামের কথা। আগের কালে বড় বড় এবং মধ্যবত্তি বাড়ীতে বড়দের নামকরণের কথা বলেছি। কাত্যায়নী দেবী ছিলেন রাজকুমারী রাণীবউ, তাঁর পুত্রবধূ ভবানী দেবী ছিলেন সতীবউরাণী। তাঁর পুত্রবধূ স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন সরস্বতী বউ। রায়বাহাদুরের তিন ছেলের ছয় বউ। দেবেশ্বরের এক বিবাহ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন মানিক বউ; মেজঠাকুরদার তিন বিয়ে—প্রথমার অর্থাৎ ধনেশ্বর জগদীশ্বর সুখেশ্বরের মায়ের নাম ছিল পদ্মবউ, দ্বিতীয়ার নাম ছিল 'গোলাপ বউ' —তারপর তৃতীয়া আমার মেজদিদি যিনি আমার মায়ের থেকে কমবয়সী, গ্রামের গরীব পুরুত ঠাকুরের মেয়ে—তাঁরও একটা ফুলের নাম জুটেছিল কিন্তু সে নাম ধরে ডাকবার কেউ ছিল না বলেই সেটা কায়েম হয় নি—লোকে তাঁকে বলত মেজমা। ওঁদের ছোট ভাইয়ের দুই বিয়ে —প্রথম স্বজাতে স্বঘরে হয়েছিল তাঁর নাম হয়েছিল রত্নবউ। দ্বিতীয়া যিনি তিনি কখনও কীর্তিহাটে আসেন নি। এলাহাবাদের মেয়ে—ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টারের শিক্ষিতা মেয়ে—তাঁর নাম আমার খাতায় লেখা আছে মনে নেই। কিন্তু রত্ন, মণি, পদ্ম এসব তাতে ছিল না।

এরপর আমার বাবা জ্যেঠা কাকাদের আমল। আমার নিজের জ্যেঠাইমা যজ্ঞেশ্বর রায়ের স্ত্রী বড় কয়লা ব্যবসাদারের মেয়ে, তাঁর নামকরণ হয়েছিল "সৌরভ বউ"। বাবা বিয়ে করেছিলেন সাতাস বছর বয়সে—আমার মায়ের নাম আগে হলে হয়তো 'গৌরব বউ' বা এমনি একটা কিছু হ'ত। ধনেশ্বরকাকার বিয়ের কথা বলেছি, মোহনডাঙ্গার দৌহিত্র শরীক বাড়ীর মেয়ে যখন এসেছিলেন তখন তিনিও একটা নাম পেয়েছিলেন 'সৌভাগ্য বউ'। জগদীশ্বর কাকার বউ মনোহরপুর জমিদারবাড়ীর মেয়ে, পড়ন্ত জমিদারবাড়ী,—রূপও তাঁর ছিল, তার জন্যই তিনি নাম পেয়েছিলেন—'জ্যোৎস্না বউ'। সুখেশ্বর কাকার বউয়ের আমল থেকে এসব নাম রাখা উঠে গেল। তখন ওঁদের মা 'পদ্মবউ' মারা গেছেন। দ্বিতীয়পক্ষের মেজঠাকুমা গোলাপ বউয়ের কোলে তখন দুই ছেলে এক মেয়ে এসেছে। তিনি বলেছিলেন—নাম আর কত খুঁজবে? দেশেও ওসব নাম রাখা উঠে গেছে, বউদের নাম এখন বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম দিয়ে চলছে। বড়-বউমা মোহনডাঙ্গার মেয়ে ও হবে মোহনডাঙ্গার বউ, মেজবউমা মনোহরপুরের মেয়ে ও মনোহরপুরের বউ, সুখেশ্বরের বিয়ে হল 'ওতোরপাড়ায়' ও হবে ওতোরপাড়ার বউ।

তাই মোহনডাঙ্গার মেয়ে সৌভাগ্য বউ নাম পেয়েও হারিয়েছেন—তিনি ঘরে বাইরে মোহনডাঙ্গার বউ;—আমরা সামনে বলি বড় খুড়ীমা—আড়ালে বলি মোহনডাঙ্গার খুড়ীমা।

অর্চনার মা তাই মনোহরপুরের খুড়ীমা—এসে বললেন, বাবা, বড়দি বললেন, পরশু তেরস্পর্শ। তেরস্পর্শে যাত্রা নেই। তুমি হয় তো এসব মানো না তাই বললেন—মেজ তুই যা বলে আয়, এ কাজে তেরস্পর্শ মাথায় করে না যায়।

আমি সুলতা, এসব মানতাম না তুমি জান—আজও ঠিক যে মানি তা নয়। তবে সেদিন মেনেছিলাম। না-মানলে কি হ'ত তা জানি না। তবে মেনে খুব শুভফল হয়নি। তবে যদি অনিবার্যভাবে এইটেই আমার অর্চনার ভাগ্য ফল হয় তো প্রতিবাদের কিছু নেই।

সেদিন ৬ই মাঘ—ভোরবেলা রওনা হলাম। কলকাতায় বাড়ীতে খবর দিয়ে রেখেছি। কীর্তিহাট থেকে পাঁশকুড়ো স্টেশন কাছে। কাছে মানে পঁচিশ তিরিশ মাইল। পালকির বন্দোবস্ত করেছিলাম। পথে তমলুকে এসে ট্যাক্সি নিলাম। বাস সার্ভিসও আছে এখান থেকে। স্ট্যাণ্ডে পালকি ছেড়ে নেমে ট্যাক্সি ধরব, নামলাম ; নেমেই দেখি—গোয়ানপাড়ার হলদীবুড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে কুইনী, আর ওদেরই একজন মধ্য বয়সী লোক। কখনও দেখেছি বলে মনে হল না।

কুইনী কাপড় পরেছে,—সাজগোজের বাহুল্য নেই। কিন্তু সেই ভোরবেলা—সবে তখন আলো ফুটছে—সেই আলোতে বড় মনোরমা মনে হল তাকে। আমাকে দেখেই সে চোখ নামিয়ে নিয়ে হাত জোড় করে বললে, নমস্কার স্যার।

সুলতা—এর আগে তোমার মনে আছে—একদিন সন্ধ্যাবেলায় অর্চনার সঙ্গে এসে আমার হাতে তাদের বাড়ীর দলিল আর কয়েকখানা চিঠি আমাকে দেখতে দিয়ে নীরবে চলে গিয়েছিল। কাঁসাই সে যখন পার হয় তখন তার পিছন দিক থেকে তাকে শিলুটের ছবির মত মনে হয়েছিল। সেদিন তার রূপ যেন ঠিক উল্টো। উজ্জ্বল, সকালের রাঙা আলোয় বললাম তো মনোরমার মত মনে হ'ল। এবং—।

সুলতা সহাস্যমুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে হাসির রেখা বড় বিচিত্র।

সুরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকায় নি। সে তাকিয়েছিল তার ছবির সারির দিকে। সে বললে—ওই দেখ, সে ছবিখানা।

সুলতা আগ্রহভরে উঠে গেল, ছবিখানা একটু দূরে ছিল, ক্রমপর্যায়ে ওটা এসে পড়েছে রায় বংশের কড়চার ছবির সারির শেষের দিকে।

ছবিটার পানে সে তাকালে।

সুরেশ্বর ওঠেননি—সে বসে বসেই বললে—দৃষ্টিটা দেখো আমার। এ-দৃষ্টি যৌবনের দৃষ্টি। আমি লুকোইনি।—কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও ভাবি নি যে,—।

সুলতা ফিরে এসে বললে—এইটেই জীবনের শুভদৃষ্টি। বলে হাসলে সে। সুরেশ্বর বললে—রাইট। খুব ভাল শব্দ তুমি প্রয়োগ করেছ।—কিন্তু থাক। সে পরের কথা পরে। জীবনে যৌবন দৃষ্টি তো বহুবার বহুরূপসীর রূপে আকৃষ্ট হয়। মনও উতলা হয়। তার উপর ১৯৩৭ সালে তখনও আমি জমিদার। বুড়ো বৃটিশ সিংহের তখনও নখ দাঁত থাবা অটুট আছে। মার খেয়ে সহ্য করে—সে প্রতিশোধে শত্রুকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। চার্চিল প্রাইমমিনিষ্টার তা তো ইতিহাসে মোটা-মোটা অক্ষরে খুদে রেখে গেছেন। ভারতবর্ষের গণ আন্দোলন, টেররিষ্ট

আন্দোলনে বিচলিত সে হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তখনও হাল ছাড়েনি। তার আশেপাশে যেসব প্রসাদ-ভিক্ষু নেকড়ে হায়েনার দল বসে আছে তারা ইচ্ছে করলে একটা হরিণী বধ করলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ ছিল না। সুতরাং ওই দৃষ্টিতে হয়তো আরও কিছু দরকার ছিল। সেটা আমি ফোটাতে পারিনি। বলতে পারব না কেন? নিজের উপর মমতায় যদি বল, তবে আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু মন আমার তাতে সায় দেবে না।

সুলতা বললে—তাই মেনে নিলাম। বল। সংসারে দিনেও মানুষের ছায়া পড়ে মাটির উপর, পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সঙ্গে চলে। রাত্রে কায়াটাই দেহকে ঢেকে নেয়। তুমি বলে যাও না কি হল। তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে।

—ঠিক বলেছ। হিলডা আমাকে সেলাম করে বললে, সালাম হুজুর। আপনি ভি কলকাতা যাচ্ছেন? আমি ভি যাচ্ছি—কুইনীকে নিয়ে।

—কেন? হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছ কেন?

—পুছেন হুজুর ইয়ে ছোকরাকে পুছেন।—ই আমাদের আপনা আদমী। কলকাতায় কাম করে, ইখানে কভি কভি আসে—। ওহি কলকাতায় মোকামের ভাড়া আদায় করে।

কুইনী তার আগেই মৃদুস্বরে বললে, কলকাতার সেই বাড়ীর ভাড়াটেরা গোলমাল করছে স্যার। ওদের কাছে মাসে মাসে লোক পাঠিয়ে ভাড়া আদায় করত দিদি, এবার তারা বলেছে—ভাড়া দেব কি? আদালত থেকে কি নোটিশ এসেছে যে, বাড়ী আমার নয়। ভাড়া আমি পাব না।

—সে কি?

—হ্যাঁ সার!

—কাগজপত্র কিছু পাওনি?

—না। মুখেই ওরা বলেছে। আর আমার নামেও একটা কি নোটিস হয়েছে, সেটাও ভাড়াটেদের কাছে আছে। দেয়নি।

এতক্ষণে সেই লোকটি কথা বললে—হাঁ হুজুর! দিলো না আমাকে।—

জিজ্ঞাসা করলাম—কি নাম তোমার?

—আমার নাম হুজুর, জন চৌধুরী। আমি বাঙালী খৃশ্চান। তবে কুইনীদের সঙ্গে একটা কি রিলেশন আছে। আমি জানি না। তবে ওদের ভালবাসি!

হিলডা রূঢ়স্বরে বলে উঠল—ই কাম সেই হারামী-হ্যারিসের কাম আছে হুজুর! ওহি হারামজাদ এইসব লটপট লাগা দিহিস! ওহি সোওয়াইন। কুত্তিকে বাচ্চা।

—চুপ কর দিদি। আগে সেখানে চল, দেখ কি ব্যাপার। তারপর বলো।

হিলডা বললে, পানি আর তেল। এ দুনো কভি মিলে নারে কুইনী। তুই তো পুরা গোয়ান নেহিনা। তু বাঙ্গালী!

সুরেশ্বর বললে, আমি বললাম, সুলতা—তুমিও তো বাঙালী হিলডা। এদেশে এতদিন বাস করছ—গোয়া কখনও দেখনি, পর্টুগালের নামও হয়তো জান না। এখানে বাস করছ, ভাত খাচ্ছ, পানি খাচ্ছ, বাংলা বুলি বলছ, বাঙালী নও কেন?

হিলডা তবু বললে—নেহি হুজুর, হামি লোক হারমাদদের বেটাবেটী। মুলুক হামাদের গোয়া। উসকো আগে পোর্টুগালসে হামি লোক আসিয়ছলম। হামি জানি বাবু।

আমি আর কথা বাড়াইনি। ট্যাক্সিটা এসে গেল। আমি রঘুকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।

*   *   *

কলকাতায় বেলা বারোটার মধ্যেই পৌঁছেছিলাম এবং মোহনডাঙ্গার খুড়ীমার নির্দেশমত অর্চনার ফটো নিয়ে বিকেল বেলাতেই গেলাম ভবানীপুরে। অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ী।

বাড়ীটা নিশ্চয় চেনা বাড়ী। এককালে এ্যাডভোকেট বি এন মুখার্জি ছিলেন কলকাতার একটা মস্ত নাম। যত বড় উকীল—তত ছিল দয়া। দয়াটার উৎস ছিলেন তাঁর মা অন্নপূর্ণা দেবী। ভবেনবাবু কত বঞ্চিত দরিদ্রের পক্ষ নিয়ে যে বিনা ফীতে লড়েছেন এবং জিতেছেন, তার সংখ্যা নেই। টাকা নিতেন জমিদার ব্যবসাদারের কাছে। জমিদার প্রজার যেসব মকর্দমা হাইকোর্টে আসে সে সবই প্রায় স্বত্বের মকর্দমা। তাতে জমিদার পক্ষের ব্রীফ তিনি নিতেন না। মায়ের বারণ ছিল। তবে জমিদারে জমিদারে, কি জমিদার বাড়ীর পার্টিশন স্যুট-এ তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তাঁর ছেলে এন, এন, মুখার্জি—তাঁর ছিল ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস। অধিকাংশ স্বদেশী মকদ্দমায় তিনি থাকতেন। ফিস নিতেন না। ভবেনবাবু ক্রিমিন্যাল প্রাকটিস করতেন না এবং কোন কেসে তিনি কারুর নিচে কাজ করতেন না, কিন্তু মানিকতলা বোমার কেসে একজন সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সে তাঁর মায়ের আদেশ। বলেছিলেন—ওরে আমি মেদনিপুর জেলার মেয়ে। ক্ষুদিরাম মেদনীপুরের ছেলে। সেই বাংলা দেশে প্রথম ফাঁসী গেল। এ কেসে ছোট হয়েই তুই থাক। তাতে তোর মান যাবে না। মূল ডিফেন্সের কাজ করলেন সি আর দাশ। সে তো এই বাড়ীর লোক। তাকে তো জানিস। কি লজ্জা?—

ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম—অর্চনার এসব কথা তাঁকে বলব কি না। মধ্যে মধ্যে সব চিন্তা ভাবনা ওলোট পালোট করে দিয়ে হঠাৎ ভয় হচ্ছিল, যদি নাম শুনেই অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ বলেন, বলে দে আমার দেখা করবার সময় নেই। কি বলবার আছে তা যেন নিচের কাউকে বলে দেয়। কিম্বা নগেনের সঙ্গে দেখা করতে বল।

গাড়ীখানা ময়দানের দিক থেকে হরিশ মুখুজ্জে রোডে ঢুকে খানচারেক বাড়ীর পরেই দাঁড়াল।

পি-জি হস্‌পিটাল থেকে একটু দক্ষিণে,—যে দিকটায় মুরশিদাবাদের এক রাজা বাহাদুরের বাড়ী আছে সেই দিকটায়।

বাড়ীটা সকলেই চেনে। তুমি ব্যারিস্টারের মেয়ে। এ্যাডভোকেট এন, এন, মুখার্জির নাম বোধ হয় জান।

প্রথমেই দেখা হোল নগেনবাবুর সঙ্গে। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। রায়বাড়ীর সৌন্দর্যের স্পর্শও আছে, আবার একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। এঁদের রঙ রায়বংশের মত উজ্জ্বল নয়। এক ধরনের খুব মাজা রঙ আছে শ্যামবর্ণের মধ্যে—এ-রঙ সেই রঙ। রায়বংশের চোখ বড়

এবং একটা প্রখরতা আছে দৃষ্টিতে ; নগেনবাবুর চোখ ছোট নয়, টানা চোখ এবং দৃষ্টির মধ্যে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও একটি মাধুর্য আছে।

গাড়ীটা বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াতেই নগেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু এগিয়ে এলেন। তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন বারান্দার উপর।

আমি মনে মনে সম্বন্ধ নিয়ে অনেক হিসেব করে গিয়েছিলাম। আসবার সময় গোবরডাঙ্গার খুড়ীমা আর মনোহরপুরের খুড়ীমা আমাকে কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে মাথায় পুষ্প ঠেকিয়ে বলেছিলেন—দেখ্ বাবা, কোনমতে যেন সম্পর্ক ভুল করবিনে। অন্তত অন্নপূর্ণা ঠাকুমার কাছে। বুঝলি ? উনি তোর বাবার ঠাকুমা, রায়বাহাদুরের বোন। ওঁর বোধহয় তিন নাতি—নগেনবাবু উকীল, সুরেনবাবু—

ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন—কর্পোরেশনের কাউন্সিলার উনি। কণ্ট্রাক্টারি করেন। ছোটর নাম বীরেন ; তিনিও কণ্ট্রাক্টারি বিজিনেসে আছেন। তাঁকে বোধহয় পাবে না। এঁরা হলেন অন্নপূর্ণা ঠাকুমার নাতি—সম্পর্কে তোমার কাকা। বুঝেছ। ঠাকুমা—তোমার তাহলে প্রপিতামহী—কি বলবে গো তাহলে ? অ—সৌরভবউ!

জগদীশকাকা বসেছিলেন চুপচাপ। তিনি সেদিন থেকে একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। শুনেছিলাম গাঁজা বেশী খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—ওই ঠাকুমাই বলবে। ঠাকুমা থেকে উপরের সবাই ঠাকুমা।

ধনেশ্বরকাকা বলেছিলেন—যেমন তোমার বুদ্ধি। তার উপর ওই ছাইগুলো চব্বিশঘণ্টা খাচ্ছ।

হয়তো এই নিয়েই ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া একটা বেধে যেত। কিন্তু গোবরডাঙ্গার খুড়ীমা বলেছিলেন—বড়-মা বলিস বুঝলি! বড়-মা!

জগদীশ্বরকাকা বলে উঠেছিলেন—ঠাকুমার মা—বড়-মা—

ধমক দিয়েছিলেন—অবশ্য মৃদুস্বরে মনোহরপুরের খুড়ীমা অর্চনার মা—হ্যাঁ। তাই বলবে। দিদি বলছেন শুনছ না।

—তবে তাই বলুকগে।

তর্কটা ওখানেই শেষ হয়েছিল—আমার বড়-মা কথাটা ভাল লেগেছিল। ভারী মিষ্টি হৃদ্য মনে হয়েছিল।

নগেনবাবু আমার কাছে এসে বললেন—আসুন।

আমি টপ করে তাঁকে প্রণাম করে বললাম—আমি আপনার ভাইপো, আমার নাম সুরেশ্বর রায়, ঈশ্বর যোগেশ্বর রায়ের ছেলে।

সবিস্ময়ে তিনি বললেন—তুমি যোগেশ্বরদার ছেলে! তুমি তো আর্টিস্ট শুনেছি। এস, এস, এস। ভেতরে এস।

বাড়ীর ড্রইংরুমে এসে বসলাম। প্রশস্ত হল। দামী ফার্নিচার। সোফা-কৌচের ঢাকাগুলো ধবধবে খদ্দরের। নগেনকাকা-ও খদ্দরের কোঁচানো ধুতি আর আধবাহাঁয়া পরে রয়েছেন।

একটু মিইয়ে গেলাম স্থলতা। কারণ, দেখলাম এঁদের বাড়ীতে গান্ধীয়ানাই হোক আর কংগ্রেসীই হোক, বেশ একটু চড়া স্থরেই বাঁধা আছে।

বসেই বললেন—অনেককাল তোমাকে দেখিনি হে! ১৯১৬।১৭ সালে সেই যে যোগেশ্বরদা আসা বন্ধ করলে, তারপর আর এল না। তখন তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি আসতে। ফুটফুটে ছেলেটি। ঠাকুমা বলতেন—অবিকল আমার দেবু। মানে তোমার পিতামহ দেবেশ্বর রায়। মায়ের ভাইপো তো উনি!

—আমার মনে আছে।

—মনে আছে? তোমার মেমরী তো খুব শার্প! কিন্তু। এমন চেহারা হল কি করে? রঙটা পুড়ে গেছে। একটা কালচে ছাপ পড়েছে। তারপর একালে, সেই সেকালের মত দাড়ি-গোঁফ।—

—আজ এক বছরের ওপর কীর্তিহাটে রয়েছি—ওখানকার রোদে—

—আজকাল কীর্তিহাটে গেছ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটেলমেণ্ট হচ্ছে, তার টানে যেতে হয়েছে।

—আই সী। হ্যাঁ, আমরাও ক'খানা নোটিশ পেয়েছিলাম—ওখানে কি কি যেন ঠাকুমার বাবা দিয়ে গিয়েছিলেন—। তা আমরা ও ক্লেম করিনি। ওখানে খানিকটা জমি-পুকুর নিয়ে কি করব আমরা।

—আমি সেসব আপনাদের নামে রেকর্ড করিয়েছি।

—করিয়েছ? তোমাদের মেজতরফ রেকর্ড করাতে দিলে?

—তা দেবে বইকি?

—নো-নো-নো। আই নো দেম। দে আর—আই মীন দি হোল ফ্যামিলী অব শিবেশ্বরকাকা; একটু থেমে বললেন—দেখ দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশী। অবশ্য ধনেও তাই তাই হয়। ধন থেকেই স্থত্রপাত, দোষগুলো তখনই ধরে, তারপর ধন ফুরিয়ে গেলে দারিদ্র্যের ছোঁয়াচ লাগলে তখন পচতে শুরু করে। স্থখেশ্বর মধ্যে মধ্যে সাহায্যের জন্য চিঠি লিখত আমাকে। কিছু কিছু দিয়েছি তখন। তারপর বুঝলাম এটা ওর স্টাণ্ট। তারপর ধনেশ্বরের ছেলে ব্রজেশ্বর এসেছিল বার-দুই। হি ইজ এ স্নীক।

আমি চুপ করে রইলাম। এবং অনুভব করলাম রায়বংশের প্রতি বিদ্বেষ এঁদের মজ্জাগত বা বংশগত ধারায় পরিণত হয়ে গেছে।

নগেনকাকা এবার বোধহয় অনুভব করলেন—কথাগুলো বলা অন্যায় হয়ে গেছে। তিনি এবার বললেন—থাক ওসব কথা। সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ—অপ্রিয় সত্য সত্য হলেও না বলাই ভাল। এখন কি খবর বল। সব ভালো তো?

বললাম—ভালো নয়। অনেক ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেল।—

—কি? মামলা-মকদ্দমা?

—হ্যাঁ। তবে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে নয়। মেদিনীপুরের কাণ্ড তো জানেন সব। পরপর তিন-তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট মার্ডার হল—

—খুব জানি। মেদিনীপুর ওয়েস্ট বেঙ্গলে, রাজস্থানের চিতোর। বাংলাদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম বলি ষোল বছরের ক্ষুদিরাম। ১৯২১ সাল থেকে সারা বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ড হল, মেদিনীপুর হতে দেয়নি। কীর্তিহাটে সুখেশ্বর ইউনিয়ন বোর্ড করেছিল। পেডি মার্ডার কেসে বিমল দাশগুপ্তকে প্রসিকিউটর করে হাইকোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল। সে-কেসে ডিফেন্সে আমি ছিলাম। কলেজিয়েট ইস্কুলের হেডমাস্টার, এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হীরালাল দাশগুপ্ত আর নারায়ণ মুখুজ্জেমশায়কে সাক্ষী দিতে কিছুতেই রাজী—রাজী কেন বাধ্য করাতে পারেনি পুলিশ। নমস্য ব্যক্তি তাঁরা। এমন শিক্ষক না হলে এমন ছাত্র হয়!

আমি বললাম—যেন একটা সুযোগ পেলাম, বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ঝড় এসে বেজেছে কীর্তিহাটের রায়বাড়ীতে।

—বল কি? চমকে উঠলেন নগেনজ্যাঠা। সেই ঝড়? তুমি বাধিয়েছ নাকি? বিদায় সত্যাগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত! হাসলেন। তারপর বললেন—কি করেছ? টাকাকড়ি দিয়েছ, সেটা জেনেছে পুলিশ? না, আরও কিছু? কংগ্রেস-ফ্ল্যাগ-ট্ল্যাগ তুলেছ? মিটিং-টিটিংয়ে প্রিজাইড করেছ?

বললাম—না। তার থেকে অনেক বেশী।

—অনেক বেশী?

অতুলেশ্বরের বিবরণ থেকে মেজদির জেল, বিমলেশ্বরকাকার এ্যারেস্ট পর্যন্ত সব বললাম তাঁকে। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে শুনলেন। ঘন ঘন মুখের ভাব তাঁর বদলাচ্ছিল। অবশ্য অর্চনার নাম একটুখানি উল্লেখ করে ছেড়ে দিলাম। বললাম—জগদীশ্বরকাকার অর্চনা বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে শুদ্ধ পুলিশ জড়াতে চেষ্টা করেছিল।

—মানে?

—মানে, মেয়েটি মেজদিকে খুব ভালবাসত। আর বিমলেশ্বরকাকা যখন ঘরে বসে কাঁদতেন আর বলতেন—মা কালী, তুমি তো সাক্ষাৎ বিরাজ করছ, প্রভু রাজরাজেশ্বর; তুমি তো সব দেখছ, তবু তার প্রতিকার করছ না তোমরা? অর্চনা শুনে বলেছিল—ন-কাকা, একটা কথা বলব? তোমাদের মা কালী কি বাদশাহী আমলের তাতারিণী-প্রহরিণী, না রাজরাজেশ্বর তোমাদের দারোয়ান-পাইক যে তোমাদের হয়ে খাঁড়াচক্র নিয়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে ছুটবেন? দাও তো দুবেলা ফুল-জল। আর একথালা করে আতপের ভাত। দাও না, দেখাও। দেখিয়ে নিয়ে নিজেরা খাও। এগুলো যারা বলে, তারা ভক্ত না মাথা, কাপুরুষের দল। প্রতিকার দেবতা করে দেয় না—মানুষকেই করতে হয়। তিনি অভয় দেন, সাহস দেন। এমন করে ঘরে বসে কালী কালী আর কেষ্ট কেষ্ট করে কেঁদো না।

কথাটা চাপা আছে। আছে তাই পুলিশের হাত থেকে বেঁচেছে।

স্তম্ভিতের মত তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—এমন মেয়ে? রায়বাড়ীতে এতবড় পরিবর্তন ঘটে গেছে? বল কি হে? কিন্তু হাইকোর্ট থেকে ব্যারিস্টার নিয়ে গেলে,

আর আমাকে জানালে না? বল—এখন কি করতে হবে? বিমলেশ্বরের কেসে যেতে হবে?

বললাম—বিমলেশ্বরকাকার কেসে কনভিকশন হবেই। কারণ তিনি অত্যন্ত ধর্মবাতিকগ্রস্ত লোক; কনফেশন তিনি করেছেন, কুকরীখানা বের করে দিয়েছেন। শুধু অর্চনার কোন কথা তিনি বলেন নি। বলবেনও না। এবং যা বলেছেন তা উইদড্রও করবেন না।

—স্ট্রেঞ্জ! একটু চুপ করে থেকে বললেন—তবু আমি যাব। কাগজপত্র এনেছ?

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম—আমি ও কথা নিয়ে আসি নি। আমি একবার বড়মার কাছে এসেছি। অর্চনার সম্বন্ধে কথা বলব।

—মানে?

—মেয়েটির অবিলম্বে বিয়ে দিতে হবে। জগদীশ্বরকাকার শালা রেলে চাকরি করেন, তার এক শালা, সে পুলিশের দারোগা। প্রথমপক্ষের বউ মারা গেছে। ক'টা ছেলে আছে। তার সঙ্গে বিয়ে দেবার সম্বন্ধ করেছেন। কিন্তু অর্চনা জেদ ধরছে এ বিয়ে সে কিছুতে করবে না। বিষ খাবে। অথচ—

—কি অথচ?

—অথচ আমাদের বাড়ীতে সবাই বলে—অর্চনাই নাকি সতীবউরাণী, মানে বড়মার মা। চেহারাতে অবিকল তাঁর মত! তাই তার কাছে এসেছি একটু পরামর্শ নেব।

ফটোখানা বের করে তাঁর হাতে দিলাম। আমারই তোলা ফটো! ফটো দেখে চমকে উঠলেন নগেন কাকা।

* * *

সুরেশ্বর বললে—এইখানে তোমাকে এই বাড়ীটির একটি পটভূমি দিয়ে রাখি সুলতা। অন্নপূর্ণা দেবীর যে টুকরো টাক্‌রা ছবি পেয়েছ, তাতে তাঁর সম্পর্কে অনায়াসে তাঁর একটা ছবি গড়ে নিতে পার। সে ছবিটা হবে পটভূমিহীন মানুষের ছবি। একান্তভাবে ফটোগ্রাফের মত।

এই বাড়ী তাঁর নিজের তৈরী বাড়ী। তাঁর যে বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল, সে বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

মা মারা গিয়েছিলেন তাঁকে তিন বা চার দিনের শিশু রেখে। চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন —এর নাম হবে অন্নপূর্ণা আর একে মানুষ করবার জন্ম যেন বিমলাকান্তের স্ত্রীকে দেওয়া হয়। তাঁর সন্তান নেই। রত্নেশ্বরকে দিয়ে আবার তাকে আমরা কেড়ে নিয়েছি।

বীরেশ্বর রায় সম্পর্কে বলেছি—চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে পাবার জন্তে অথবা তাঁকে হারিয়ে প্রায় পাগল হয়েছিলেন। ক্রোধে আক্রোশে বাঈজী—মানে সোফি বাঈকে নিয়ে উন্মত্ত জীবনযাপন করেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে পেলেন ভবানী দেবীকে; তখন তিনি একরকম অর্ধপঙ্গু। কিন্তু সেবায় যত্নে চিকিৎসায় নিয়ম পালনে ভাল হয়ে উঠলেন আবার।

তার ফল এই অন্নপূর্ণা দেবী। অন্নপূর্ণা দেবী রায়বংশের দ্বিতীয়া কন্যা। প্রথমা ছিলেন

উন্মাদরোগগ্রস্তা বিমলা দেবী। যাঁর জন্যেই বলতে গেলে রায়বংশে বীরেশ্বর রায় পর্যন্ত একটা সর্বনেশে ঝড় বয়ে গেছে। রক্ষা পেয়েছেন ভবানী দেবীর তপস্যায়।

এ ঝড়ের সব বিবরণ মূল কথা রত্নেশ্বর রায়ের পর বোধহয় কেউ জানতে পারে নি। জেনেছিল ঠাকুরদাস পাল। তাকে খুন করিয়ে রত্নেশ্বর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তবু কি খেয়াল ডায়রীতে লিখে গিয়েছিলেন। শেষের দিকে কথাটা মনে হয়েছিল বলে দপ্তর বেঁধে তার উপর লিখেছিলেন—"আমার চিতায় যেন এগুলি দগ্ধ করা হয়। যে এসব খুলিবে বা পড়িবে তাহার সর্বনাশ হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

সুখেশ্বর রায় এগুলো পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতি চতুর অতি কুটিল মানুষ। স্বার্থের জন্য সব পারতেন। তিনি এগুলো পড়েছিলেন কিনা জানি না। হয়তো পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি রায়বংশের একটা কামার্ত দৈত্যের হাতে জীবন দিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রজদা পড়তে গিয়েও পড়েন নি। পড়লাম আমি।

তাই বলছি—বিমলা দেবী যে রায়বংশে কতবড় অশুভের উৎস তা রায়বংশে কেউ জানত না। আর ভবানী দেবীর তপস্যা যে কত বড় কল্যাণ করেছে, তাও কেউ জানে না।

আমি নাস্তিক হয়েও এরই জন্যে আস্তিক হ'তে চেয়েছি। কিন্তু তা পারিনি। আমি না-আস্তিক না-নাস্তিক।

এক একবার মনে হয় ভবানী দেবী বোধহয় রত্নেশ্বরকে দিয়ে ফিরে নেওয়ার অপরাধ সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। আবার মনে হয় ভবানী দেবী বীরেশ্বর রায়ের উপর কন্যার ভার দিয়ে যান নি—স্বামীর উপর বিশ্বাস ছিল না বলে। ভবিষ্যত তিনি অনুমান করেছিলেন।

জীবনের শেষ ক' মাস তিনি কাশীর বাড়ীতে একপ্রান্তের ঘরে এইটে জেনেই একান্তে বাস করতে চেয়েছিলেন। তিনি থাকতেন একেবারে পূবের ঘরে। তারপর ছিল তাঁদের সন্ধ্যার আসরের ঘর। যে-ঘরে সোফিয়া এসে গান শোনাতো। তার ওপাশে ছিল বীরেশ্বর রায়ের ঘর। তারপর তিন চারখানা ঘর একরকম খালি পড়ে থাকত, তারপর ওপ্রান্তে থাকত সোফিয়া বাঈ। বুঝতে পারছ, স্বামীর স্বেচ্ছাচারের পথে কোথাও একটা পর্দার আড়ালও দেন নি।

সত্য যাই হোক, তিনি কন্যাটিকে দিয়ে গিয়েছিলেন বা স্বামীকে শেষ অনুরোধ করেছিলেন, কন্যাটিকে তাঁর নিঃসন্তান ভাই বিমলাকান্তের স্ত্রীকে দেবার জন্য। তাতে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। হয়তো এমন ভয়ও ছিল যে বীরেশ্বর রায় সোফিয়াকেই দেবেন মেয়েকে মানুষ করতে।

অন্নপূর্ণা দেবী পূজোর সময় একবার আসতেন দেশে। বিমলাকান্ত পূজোর ছুটিতে আসতেন। আসতেন শ্যামনগর। ওখানে যে বিষয় তাঁর ছিল এবং লাট শ্যামনগর রাধানগর দিগরের যে জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা তিনি পেতেন তা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ছিল না। রায়-বংশের কীর্তিহাটের তুলনায় সেটা হয়তো পঁচিশ তিরিশ ভাগের এক ভাগ। অবশ্য বীরেশ্বর রায়ের সময়ের কথা বলছি। রত্নেশ্বর রায়ের আমলে কীর্তিহাটের আয় তিন গুণ বেড়েছিল।

শ্যামনগর কেনা হয়েছিল বিমলাকান্তের মাতামহের বিগ্রহের নামে। তখন জমিদারী মুনাফা ছিল চার হাজার টাকা। বিমলাকান্তকে জমিদারী স্বত্ত দিয়ে রত্নেশ্বর রায় সম্পত্তিটা পত্তনী নিতে ভোলেন নি।

একটু থেমে—হেসে সুরেশ্বর বললে—রত্নেশ্বর রায় এই চার হাজার মুনাফা বিমলাকান্তকে দিয়ে শ্যামনগরের জমির উপর দু-দুবার বৃদ্ধি করে নিজের মুনাফা করেছিলেন ন' হাজার টাকা। অথচ জবরদস্তি বে-আইনী কিছু করেন নি। এবং সেই নিয়েই ঠাকুরদাস পাল, যিনি তাঁকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন, যিনি তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে গোটা পিঠটা পুড়িয়েছিলেন, যাঁকে তিনি দাদা বলতেন—তাঁর সঙ্গে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত রত্নেশ্বর রায়ের।

অবশ্য তিনি শ্যামনগরে ইস্কুল এবং ঠাকুরদাস পালের স্মৃতিতে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিও করে দিয়েছিলেন। যা সেকালে এই ন' হাজার টাকা মুনাফা থেকেই চলবে বলে চিহ্নিত করা ছিল।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর বিচিত্র চরিত্র। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে তিনি অন্যায় কিছু করেছেন। স্নেহ করুণা দয়া ক্রোধ বিদ্বেষ সবের মধ্যে তাঁর চুলচেরা বিচার ছিল, তাঁর কথা থাক পরে বলব। অন্নপূর্ণা দেবীর কথা বলি।

তের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ভবানীপুরের মুখুজ্জে পরিবারে। তাঁরা ব্যবসায়ী লোক, ধনী। কলকাতায় অনেক সম্পত্তি। কর্তার নাম ছিল দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর তিন ছেলে—বড় ছেলে নরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হ'ল। নগদ টাকায় অলঙ্কারে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। বিবাহের সময় রায়বাড়ীর সম্পত্তি নিয়ে একটি কথা তাঁরা তোলেন নি। বছর তিনেক পর অন্নপূর্ণা দেবী ষোল বছর বয়স তখন, প্রথম সন্তানের জননী হলেন। ছেলের জন্মের মাসখানেকের মধ্যেই, শ্বশুর তাঁর দাবী তুললেন—রায়বাড়ীর অর্ধেক অংশের মালিক এই নব-জাতক পুত্র। ওই উইল—যে উইল বীরেশ্বর রায় ভাগিনেয় পোষ্যপুত্র রত্নেশ্বরের নামে করে গেছেন তা ক্যান্সেল হতে বাধ্য ; প্রথম কারণ তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় কোন ক্রিয়া বা দলিল করলে তা সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় কারণ পরে তাঁর নিজের কন্যাসন্তান হয়েছে, এবং সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তানই তাঁর প্রকৃত পিণ্ডাধিকারী, উত্তরাধিকারী।

মধ্যস্থতার জন্য ছুটে এলেন বিমলাকান্ত। তিনি অন্নপূর্ণাকে ডেকে সমস্ত বিবরণ বললেন এবং রত্নেশ্বর রায় বের ক'রে দিলেন মায়ের শেষ চিঠি।

অন্নপূর্ণা দেবী শুধু প্রশ্ন করলেন—কিন্তু শ্বশুরকে আমি কি বলব বলতে পার ? বেশ, কলকাতার সম্পত্তি ছেড়ে দাও আমাকে। বুঝিয়ে বলব!

রত্নেশ্বর বলেছিলেন—না। তা পারব না। আমি সম্পত্তির মালিক নই। আমি রক্ষক। রায়বংশের যা, তা রায়বংশের।

এর উত্তর অন্নপূর্ণা রত্নেশ্বরকে দেন নি, দিয়েছিলেন বিমলাকান্তকে, তাঁকে তিনি ছেলেবেলা থেকে বাবাই বলতেন ; বলেছিলেন—বাবা, তাহলে তুমি আমাকে কাশী নিয়ে চল। ও-বাড়ী আমি ঢুকতে পারব না।

বিমলাকান্ত তাকে বুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দেবেন মুখুজ্জের কাছে। এবং নগদ এক লক্ষ

টাকা দিয়ে মিটমাট করতে চেয়েছিলেন।

দেবেনবাবু হেসে বলেছিলেন—ফিরে নিয়ে যান। রত্নেশ্বর রায়কে ফিরে দেবেন। বলবেন —সোজা আঙুলে তোলা দু ফোঁটা ঘি দিয়ে ভাত খাওয়া দেবেন মুখুজ্জের অভ্যেস নেই।

বিমলাকান্ত বলেছিলেন—আমার যা কিছু কাশী কলকাতা এবং শ্যামনগরে, সব আমি লিখে দিচ্ছি।

—আমাকে কি বীরেশ্বর রায়ের শ্রাদ্ধের কাঙালী ভোজনের কাঙালী পেয়েছেন বেইমশাই? না সভায় নিমন্ত্রিত চালকলা-বাঁধা পুরুত পণ্ডিত? আমি বীরেশ্বর রায়ের দৌহিত্রের পিতামহ।

অন্নপূর্ণা দেবী দরজার আড়ালে ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে শ্বশুরের সামনেই ঘোমটা খুলে বলেছিলেন—বাবা, তুমি বাড়ী যাও।

বিমলাকান্ত মাথা হেঁট করেই উঠে এসেছিলেন এই জানবাজারের বাড়ীতেই। অনেক বোঝাতে চেয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়কে কিন্তু তিনি বলেছিলেন—না। সত্যসত্যই যদি পোষ্যপুত্র হতেন, তা হ'লে এই অর্ধেকই নিশ্চয় ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যখন রায়বংশের বংশধর, বীরেশ্বর রায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান তখন তা তিনি দেবেন না। তাতে তাঁর জন্মমর্যাদার হানি হবে।

দিন চারেক পর একদিন একখানা পালকীগাড়ী এসে লাগল এই বাড়ীতে। নামলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

দেবেন মুখুজ্জে তাঁকে এ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে চিরদিনের মত! গয়নাগাঁটী এমন কি ছেলে পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছেন এবং ছেলের আবার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কারণ, কি-কি মামলার কাগজে তিনি অন্নপূর্ণাকে সই করতে বলেছিলেন, তা তিনি করেন নি।

পরের দিন নরেন্দ্র-জামাই-ছেলেটিকে বুকে ক'রে নিয়ে পায়ে হেঁটে এসে হাজির হয়েছিলেন এ-বাড়ী। ছেলেটিকে অন্নপূর্ণা দেবীর কোলে তুলে দিয়ে আবার ফিরে চলে গিয়েছিলেন।

তার পরদিন থেকে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। দেবেন মুখুজ্জেমশায় ছেলেকেও ক্ষমা করতে জানতেন না। তাঁর বাক্যবাণ তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

অন্নপূর্ণা দেবী বিমলাকান্তের সঙ্গে কাশী গিয়ে ওই সন্তান—ভবেনকে নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। যাবার আগে তিনি গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। তখন তাঁর প্রকাশ হয়েছে। দেশের মধ্যে যেন একটা নতুন হাওয়া বয়েছে। জানবাজারে পাশেই রাণী রাসমণির বাড়ী। বিমলাকান্ত নিজে একদিন তাঁকে দর্শন করে এসে মুগ্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধচিত্ত অন্নপূর্ণাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অন্নপূর্ণা তাঁর মধ্যে যাই দেখে থাকুন, তার ক্ষোভ যেন মিটে গিয়েছিল। তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছিল।

পরমহংসদেব হেসে বলেছিলেন—গঙ্গা গঙ্গা—গঙ্গা গড়াচ্ছে রে বেটী, দে—দে ওই জল একফোঁটা দে আমাকে।

অন্নপূর্ণা দেবী দু হাতে চোখের জল মুছে তাঁর পায়ে মাখিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন—ভগীরথ—ভগীরথ হবে তোর ছেলে।—ভগীরথ হবে। অন্নপূর্ণাকে হাত তুলে আশীর্বাদ

করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ঠাকুরের নামই জপ করেছেন। সেই তাঁর দীক্ষা।

বিমলাকান্তের সম্পত্তি, তাঁর টাকা যা ছিল তাঁর সব তিনি অন্নপূর্ণাকে দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। আর নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, যেটা একটা চিঠিতে বীরেশ্বর রায় কন্যার বিবাহে খরচ করতে বলেছিলেন, সেই টাকাটা নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

ওটার বেলাতেও তিনি হিসেব-নিকেশ করে নিয়েছিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদসমেত কষে অঙ্ক স্থির হয়েছিল আশী হাজার। টাকাটা বীরেশ্বর রায়ের চিঠির কাল থেকে সুদে খেটেছে। তার থেকে বাদ দিয়েছিলেন বিবাহের যৌতুক তিরিশ হাজার টাকা।

ছেলেকে উকীল করে হরিশ মুখুজ্জে রোডের এই মোড়ে বাড়ী তৈরী করিয়ে, কলকাতা এসেছিলেন।

অতি কঠিন মেয়ে অন্নপূর্ণা দেবী। অত্যন্ত কঠিন। কলকাতায় এসেও স্বামী বা শ্বশুরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। দেবেন মুখোপাধ্যায়ের তখন বৃদ্ধাবস্থা, কিন্তু শক্ত মানুষ, তখন বাড়বাড়ন্তও খুব। স্বামী তখন আবার সংসারী, ছেলেমেয়ে হয়েছে। এদিকে বিমলাকান্তের মিতব্যয়ীতা এবং হিসাব করে টাকা খাটানোর গুণে নগদ টাকা সুদে আসলে বেড়ে দেড় লক্ষ্যে গিয়ে পৌচেছে।

দেবেন মুখুজ্জের কানে কথাটা গিয়ে পৌচেছিল। তিনি একটা খবর পাঠিয়েছিলেন নাতির কাছে। 'একবার আসবে। দেখা ক'রে যাবে।'

ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বলে দিয়েছিলেন—একটি উত্তর করে আসবি নে। সব কথায় বলবি—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে বলব।

ছেলেও তাই করেছিল। কুশল প্রশ্নের পালা শেষ ক'রে ঠাকুরদা দেবেন মুখুজ্জে বলেছিলেন—কত বড় বাড়ী করেছ ?· আমার বাড়ী থেকে বড় ?

ভবেন্দ্র বলেছিল—তাই কি হয়, না—পারি ?

—তবে ?

চুপ ক'রে ছিলেন ভবেন্দ্র। ঠাকুরদা বলেছিলেন—এ বাড়ীতে তোমার ঠাঁই হ'ত না ? প্রাকটিস চলত না ?

এতেও চুপ করে ছিলেন ভবেন্দ্র। দেবেন মুখুজ্জে বলেছিলেন—যা হয়ে গেছে গেছে। এমন অনেক হয়। আমার যা আছে, তা তোমার কীর্তিহাটের পুষ্যিমামার থেকে কম না। এর দাম অনেক। যাও, এ-বাড়ীতে এস সব নিয়ে। মস্ত 'বড় কারবার আমাদের ল' ডিপার্টমেণ্ট আছে। তা দেখাশোনা কর। প্রাকটিস কর। বুঝলে ? ও-বাড়ী একটেরে ময়দানের ধারে। ভাড়া দিয়ে দাও। সাহেব-টায়েবরা এখুনি নেবে।

এবার ভবেন্দ্র বলেছিল—মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বলব।

—মাকে ? আচ্ছা! তা হলে উত্তর পাঠাতে হবে না। উত্তর জানি আমি। ষোল বছরের বউ, ঘোমটা কপালে তুলে আমার সামনে এসে বলেছিল—বিমলাকান্তবাবুকে বলেছিল —তুমি উঠে যাও বাবা। আর্জিতে সই করাতে পারি নি।—আচ্ছা এস।

বাপ কথা অল্পই বলেছিলেন। বলেছিলেন—মন দিয়ে কাজকর্ম কর। আমি আশীর্বাদ

করছি।

এর পাঁচ বছর পরেই, দেবেন মুখুজ্জের বয়স তখন পঁয়ষট্টি, রাণীগঞ্জের কয়লাকুঠি কিনে তার সীমানা নিয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সঙ্গে ফৌজদারী করে আসামী হয়ে গেলেন। কুঠীতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ফায়ারিং-এর হুকুম দিয়েছিলেন, বেঙ্গল কোলের দুজন লোক, ছররায় আহত হয়েছিল। একজন মারা গিয়েছিল।

বর্ধমানে সেসনস কোর্টে মামলা। কাঠগড়ায় দেবেন মুখুজ্জে, তার মেজছেলে এবং ভবেন্দ্রের সৎভাই দাঁড়িয়েছিলেন আসামী হয়ে। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর মালিক ইংরেজ। অঢেল টাকা। রাজার জাতের খাতির তাঁদের। দেবেন মুখুজ্জের টাকা কম ছিল না। তিনিও হাটকোর্ট থেকে ব্যারিস্টার এনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভবেন্দ্র মুখুজ্জে জুনিয়রের কাজ করেছিলেন কিছুদিন। তিনি নিজে থেকে গিয়ে বলেছিলেন—এ কেসে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য নিলে আমি সুখী হব।

ব্যারিস্টার বলেছিলেন—তুমি তো এখন নিজে কাজ করছ, নাম হয়েছে, আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে যাবে ?

—আমি যেতে চাই।

—ওঁরা যদি না চান ?

—আমি ফীজ দাবী করব না সার।

—কেন ?

যতটা বলা চলে, ততটা বলেছিলেন ভবেন্দ্র। ব্যারিস্টার তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—তুমি যাবে। এবং আমি তোমাকে স্কোপ দেব।

মামলাটায় দেবেন মুখুজ্জেরা সেসনসে হেরেছিলেন। বাঙালী জজ সাহেব বাঙালী মেশানো জুরী। ওঁদের কারুর চার-বছর কারুর তিন বছর জেল হয়ে গিয়েছিল।

হাইকোর্টে সেই মামলায় রায় উল্টালো। এবং তাতে পুরো আর্গুমেণ্ট করেছিলেন ভবেন্দ্র।

খালাস হয়েছিলেন মুখুজ্জেরা কিন্তু কলিয়ারী হারাতে হয়েছিল। গোটা ব্যবসাটাই প্রায় শেষ হতে বসেছে তখন।

* * *

এই অন্নপূর্ণা দেবী সুলতা। ১৯৩৭ সালেও তিনি বেঁচে, বয়স তখন তার পঁচাত্তর। এখনও এ-বাড়ীর সর্বময়ী তিনি। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন পরমহংসদেবের কাছে। গোটা বাড়ীটাই বেলুড় মঠের শিষ্য। ভবেনবাবু নিজে স্বামীজী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভ করেছেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর উপর কথা নেই।

আজও এস্টেট তাঁর নামে। গোটা সংসারের খরচ, খাওয়াপরা, ছেলেদের লেখাপড়া, কাপড়চোপড়, চিকিৎসা এসব তাঁর হাতে। ছেলে ভবেন্দ্র মারা গেছেন পঞ্চাশ বছর বয়সে। নাতিরাও সেই নিয়মে চলে। নাতিদের উপার্জন থেকে একটা ক'রে টাকা তাঁকে দিতে হয়। সেটা জমা হয় এস্টেটে। এখনও নিত্য তরকারি কোটার বঁটি নিয়ে বসেন। পাশে বসেন তিন

নাতবউয়ের একজন এবং বিধবা বউ। তিনি বলে দেন—এই রান্না হবে, এই কোটো। আলু এত বড় ক'রে কুটো না। দু ভাগ নয় চার ভাগ কর।

সুলতা বললে—দুর্দান্ত মহিলা।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ তা বটে। তিনি খবর পেয়েই আমাকে ডেকে পাঠালেন। নগেন কাকা নিজে উপরে উঠে গিয়ে ঠাকুমায়ের সঙ্গে দেখা করে বললেন—চল, ওপরে চল। ঠাকুমা ডাকছেন।

আমি তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম।

তিনি সেই ফটোটা হাতে দাঁড়িয়ে, দেওয়ালে টাঙানো ভবানী দেবীর অয়েল পেন্টিংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন। একবারে যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন।

নগেন কাকা গলার সাড়া দিয়ে ডাকলেন—ঠাকুমা।—

শুনতে পেলেন না তিনি। আবার ডাকলেন নগেন কাকা—ঠাকুমা।

মুখ ফেরালেন তিনি। দেখলুম পুরু চমশার অন্তরাল থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এসেছে। তিনি কাঁদছেন।

সুরেশ্বর বললে—অর্চনার ফটোর সঙ্গে নিজের মায়ের অয়েল-পেন্টিংয়ের এমন সাদৃশ্য দেখে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ঘুরে আমাকে দেখে বললেন—এস। তারপর আবার একবার ছবির সঙ্গে ফটোটা মিলিয়ে দেখে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর একটু হাসলেন। সে-হাসির অর্থ ঠিক বুঝলাম না। শুধু হাসি নয়, ঘাড় নাড়লেন, যেন বললেন—হায় হায়। নাতির দিকে একবার চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এই ফটোর সঙ্গে মেয়েকে একবার মিলিয়ে দেখব, বুঝলে বাবা। যদি ঠিক এমনি হয়, তবে এ-মেয়ে আমি নিলাম।—কার মেয়ে বলছ?

এমনটা আমি ভাবতে পারিনি। অর্থাৎ এত সহজে এক কথায়? তারপর বললেন—নগেন? আমি তো বললাম—তুই—

—ঠাকুমা, আজ এ-কথা কেন বলছ?

—বলছি। তুই হাজার হলেও ছেলের বাপ। বলে আবার একটু হাসলেন। বললেন—দেখ, ভবেনকে বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে দিইনি। আমিও রাখিনি। কিন্তু ভবেনের বিয়ের সময় তোর মাতাম'-কে বলেছিলাম—তাঁর কাছে যাও। তুই ছেলের বাপ, মনে মনে হবে যে, ঠাকুমা-বুড়ী মরেও মরে না—বাহাত্তুরে ধরেছে, একবার আমার মতটাও চাইলে না! তারপর—। কার মেয়ে বললে?

আমি বললাম—জগদীশ্বরকাকার মেয়ে।

—জগদীশ্বর? শিবেশ্বরের মেজ ছেলে? যেটা গাঁজা খায়, মদ খায়, একটা বাঘ মেরেছিল, সেইটের?

তাঁর মুখ দেখে কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—আজ্ঞে শুনেছি, খান। আপনার কাছে মিথ্যে কি করে বলব?

—তাহলে তো টাকা-পয়সা খরচের ক্ষমতাও তার নেই।

—বড়মা, আমি একটা কথা বলব ?

—কি বললি ? বড়মা ? হুঁ। যোগেশ্বর সাহেবের ছেলে হয়ে শিখলি কি করে রে ? এঁ্যা!—কে শিখিয়েছিল—মা ? তা তোর মায়ের শ্রাদ্ধের সময় একবার খবর দিলিনে তুই হারামজাদা ?

চুপ করে রইলাম। কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগছিল। বললেন—বল, কি বলবি ?

বললাম—অর্চনার বিয়ের ভার আমি নিয়েছি বড়মা। যা চাইবেন আমি দেব।

—এ-মেয়ের বিয়ের ভার তুই নিয়েছিস ?

—হ্যাঁ বড়মা, টাকার জন্যে মেয়েটিকে একজন দোজবরে পুলিশ দারোগার হাতে দেবার ঠিক করেছিলেন ওর বাবা। আমাকে মেজ-ঠাকুমা জেলে যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন—তুই ওর বিয়ের ভারটা নিস। ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিস।

—মেজ-বউমা মানে শিবেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী জেলে গেছে ?

নগেনকাকা বললেন—হ্যাঁ ঠাকুমা, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের কীর্তিহাটের জমিদারী কেল্লার কাটল দিয়ে দেশের হাওয়া ঢুকেছে। মেদিনীপুর তো। অতুলেশ্বর—শিবেশ্বরকাকার দ্বিতীয় পক্ষের ছোট ছেলে, একটা স্বদেশী কেসে ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে খুড়ীমা গেছেন। ছেলেটিকে তিনি মানুষ করেছিলেন, সে রিভলবার রাখতে দিয়েছিল মাকে।

—ওরে আর দুখানা আসন দে তো! দাঁড়িয়ে থেকে কোমর ধরেছে। আমি আসনে বসছি—ওরা তো ওপরে বসবে না!—

আসনে বসে আমার কাছে সব শুনে বললেন—আশ্চর্য। বংশের প্রায়শ্চিত্ত করলে শিবেশ্বরের এক ছেলে। যার বড় ছেলে মাতাল, মেজটা গাঁজাল-মাতাল, সেজটা ছিল জোচ্চোর। তার ছোট ছেলে। একটা খবর দিলিনি রে নগেনকে ?—

—না ঠাকুমা। ও খুব বড় ব্যারিস্টার দিয়েছিল।

—তা দিক। তুই যেতিস। আমি খুশি হতাম।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—বস্, আমি আসছি। নগেনকাকা বললেন—কাল সকালেই একবার এস। রথীনের সঙ্গে দেখা করে যাবে। তাকে একবার দেখাও হবে, আলাপ করেও যাবে। তার ঘরে তোমার আঁকা একখানা ছবি আছে। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের পর ছবির একজিবিশন করেছিলে, সে দেখতে গিয়েছিল—ইনকগনিটো অবশ্য, আলাপ করেনি। একখানা ছবি সে কিনে এনেছিল।

আমি লজ্জিতও হলাম আবার খুশিও হলাম।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর দিক থেকে অন্নপূর্ণা দেবীর রূঢ় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—বউমা, তোমারও কি আক্কেল-বুদ্ধি সব গেছে। সব হারিয়েছ ? যোগেশ্বরের ছেলে এসেছে। তুমি একবার বের হলে না। এখনও জলখাবার পাঠাও নি! ছি-ছি-ছি!

—এই তো যাচ্ছি মা! আমি একা যে বাড়ীতে।

—কেন, নাত-বউরা গেল কোথায় ? আমার নগেন্দ্রাণী কোথায় ? বাড়ীর বড়বউ—

—তারা আজ থিয়েটার দেখতে গেছে মা।

—থিয়েটার দেখতে ? তারপরই বললেন—ও, হ্যাঁ। আমাকে বলেছিল বটে ! হ্যাঁ বলেছিল। সুরেন নিয়ে গেছে তো !—

—হ্যাঁ।

—ওই, আমার আর সব মনে থাকে না। তা' তোমার হল ?

—এই যে।

তারপরই পায়ের শব্দ পেলাম। এবং ঘরে এসে ঢুকলেন অন্নপূর্ণা দেবী আর তাঁর বিধবা পুত্রবধূ, সম্পর্কে আমার ঠাকুমা—ভবেন্দ্রনাথের স্ত্রী। থান কাপড় পরা, মাথার চুল ছোট করে কাটা, ছোটোখাটো মানুষটি। এককালে সুন্দরী ছিলেন। পিছনে ঝি, তার হাতে জলের গ্লাস। আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন—ভাল আছ ভাই ?

—আমি সসম্ভ্রমে উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন—চিনতে পারছ আমাকে ? বললাম—হ্যাঁ। আপনি আমাকে একটা ভারী সুন্দর পুতুল দিয়েছিলেন। মার্বেলের ভেনাস, সেটা ঠাকুমা আমার এখনও আছে।

—আছে ? কি বলেছিলাম বলতো ?

—বলেছিলেন—এই তোমার মেম-বউ। বড়মা বকেছিলেন।

কথাটায় বাধা দিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বললেন—থাক।

সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম বাবার কথা। ওঁরা কি ভেবেছিলেন তা বলতে পারব না। পরে বুঝেছিলাম—তা পরেই বলব। একটুখানি স্তব্ধতার পর অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—রথীনের জন্যে এই মেয়ে আমি নিলাম বউমা।

—এতে আর আমি কি বলব ?

—নগেনও তাই বলেছে।

—বলবে বইকি। তাছাড়া এতো দেখছি উনিই একেবারে।

—হ্যাঁ। তবে বাপ গরীব হয়ে গেছে। তা এ-ছোঁড়াটা তো বড়লোকের বেটা বড়লোক, বলছে টাকাকড়ি ওই দেবে। আগের কাল হলে কান মলে দিতুম। শোন—বিয়ের খরচ তুই করবি, বরযাত্রী খাওয়ানো আর পাত্রাভরণ। ওটা তুই দিবি। মেয়ে আমি সাজিয়ে নেব।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মুখ তুলতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে হঠাৎ জ্বলে গেলেন। বললেন—হ্যাঁরে, তখন থেকে বলব বলব করে বলতে ভুলছি—কথার পিঠে কথা এসে পড়ছে। বলি একি রে ? এই জঙ্গুলে দাড়ি রেখেছিস কেন রে ? বাপ রেখেছিল ফ্রেঞ্চকাট, তুই রেখেছিস লম্বা-দাড়ি। একমুখ জঙ্গল। কেন ?

তাঁর পুত্রবধূ আমার ঠাকুমা—নগেনবাবুর মা হেসে বললেন—নাতি খুব খেয়ালী মা। ওর যখন যেটা খেয়াল হয়।

—আমি তো জানি গো সব। ওরা খবর রাখে না—আমি খবর রাখি। মহাবীর দারোয়ান এই তো বছর-কয়েক মারা গেছে। মহাবীর তো মধ্যে মধ্যে আসত। দিদি বলত আমাকে। তারপরও খবর নি-। জানবাজারে লোক পাঠাই। কীর্তিহাটে দয়াল আমার

থেকে ছোট। শিবেশ্বরেরও ছোট। কীর্তিহাটে যখন যেতুম কালীপুজোর সময়, তখন তাকে পাঁচ-ছ' বছরের দেখেছি। কলকাতার এ-বাড়ীতে প্রথম প্রথম দয়াল আসত। প্রথম এসেছিল তাঁর মেয়ের বিয়ের সময়; সেকাল তো বিয়ের পণ হয়েছিল বারশো টাকা, তা কীর্তিহাটের বাড়ী থেকে ওকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। দেবেশ্বর আড়াইশো, শিবেশ্বর আড়াইশো, রামেশ্বর তো তখন বিলেতে। দয়ালের নিজের ছিল শ-চারেক টাকা; বাকিটার জন্যে আমার কাছে এসেছিল, তখন তো ভবেনের খুব নাম! আমি দয়ালকে আড়াইশো দিয়ে বলেছিলাম—পণ ছাড়াও তো খরচ আছে দয়াল। তা দেখ, দয়াল সে-আমলের লোক তো, মিথ্যে বলতে বাধত, বলেছিল—দিদি মিথ্যে বলব না, সে আমার আছে; মাছ-কাঠ এ পাব তোমাদের বাড়ী থেকেই। আমার অভাব একশো টাকার। আর মেয়ে ইচ্ছে একখানা বালুচরের রেশমী শাড়ীর। তার দাম আর কত। ওই বিশ টাকাতেই খুব ভাল হবে। আমার কাছ থেকে একশো পঁচিশের বেশী নেয়নি।

নগেনবাবুর মা বললেন—আমি তাঁকে দেখেছি মা। কি ভাল গান গাইতেন! আর কি আমুদে লোক ছিলেন—সেই গানটা আমার আজও মনে আছে মা! সেই যে যেবার হাতে জুতো নিয়ে ছাতা মাথায় বোশেখ মাসের দুপুর বেলা এসেছিলেন, দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছিল না—।

হেসে উঠলেন অন্নপূর্ণা দেবী, বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাগ্যে আমি বারান্দায় বেরিয়েছিলুম। হ্যাঁ, আমি বললাম—ওকি, দয়াল জুতো হাতে কেন? বললে—পায়ে ফোস্কা পড়েছে। গান গেয়ে বলেছিল।

—আমার সে-গান আজও মনে আছে। আপনি বললেন—ওকি রে, জুতো হাতে কেন? তো সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে কেত্তনের সুরে গেয়ে বললেন—

"ভাস্করের করো, অতীব প্রখরো,
ফোসোকা পড়িল পায়।
দারোয়ানে দ্বার, রুখিয়া হুঙ্কার
ভয়েতে পরাণ যায়!!"

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার তো খুব মনে আছে বউমা। আমরা খুব হেসেছিলাম। নতুন জুতো কিনে দিতে চেয়েছিলাম, তা চটি ছাড়া নেয়নি; বলেছিল—দিদি, কীর্তিহাটের মাটিতে হাঁটি খালি পায়ে, ফাটা চরণ, এতে কি জুতো চলে—দেবে তো চটি দাও।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা! দয়াল-বৃদ্ধকে দেখেছি, তাঁর কাছে গল্প শুনেছি, তিনি আমার জ্বরের সময় হাত দেখতে এসে সোমেশ্বর রায়ের বজরার আসরের গল্প বলতেন। তাঁর শোনা গল্প। চিরকাল রায়বাড়ীর কাছে কৃতজ্ঞ। যজ্ঞরাম রায়ের স্বাক্ষর করা ছাড়পত্র তাঁর কাছে দেখেছি। এই বিমলেশ্বরকাকার গ্রেপ্তারের দিনও এসে কেঁদে গেছেন, কিন্তু এমন পরিচয় পাইনি। সম্ভবত বয়সের সঙ্গে হারিয়ে গেছে।

তাই সবিস্ময়ে শুনছিলাম, তাঁর আর এক কালের আর এক রূপের কথা!

সেদিন অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—"দয়াল এখনও চিঠি দিলে উত্তর দেয়, তার কাছে খবর

পাই। শিবেশ্বরের আমলে একবার ওর তৃতীয় পক্ষের বিয়ের খবর পেয়ে আমি শিবেশ্বরকে খুব কড়া করে চিঠি লিখেছিলাম। গালাগাল দিয়েছিলাম। লিখেছিলাম—দয়ালের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে, তুমি আবার এই বয়সে তুই পক্ষের ছয়-ছয়টি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা থাকিতেও আবার বিবাহ করিয়াছ একটা পুরুতের মেয়েকে। পৌত্র হইয়াছে, পৌত্রী হইয়াছে, কয়েকগণ্ডা দৌহিত্র-দৌহিত্রও হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই মতিচ্ছন্ন তোমার কেন হইল তাহা জানি না। রায়বংশকে ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িলে তুমি।"

শিবেশ্বর উত্তর দেয়নি। দয়াল দিয়েছিল পত্র। লিখেছিল, 'দিদি আপনি আমার নাম করিয়া মেজ-রায়কে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমার আর লাঞ্ছনার বাকি নাই। অতঃপর আপনাকে আমি নিয়মিত সংবাদ দিয়া খবরাদি দিব। আমাকে আপনি পত্র দিবেন না বা মেজ-রায়কে পত্র দিবেন না। তাহা হইলে আমাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে।' দয়াল আমাকে পত্র দেয়। তোর খবরও আমি জানি! তুই সেটেলমেণ্টে গোচর বাস্তু নাখরাজ দিয়েছিস, তুই গোয়ানদের গোয়ানপাড়া নিষ্কর দিয়েছিস, তাও লিখেছ। লিখেছে—'দিদি যোগেশ্বরের পুত্র এই সময় আসিয়া রায়বংশের সরোবরের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছে। চারিদিকে রায়বংশের নাম উজ্জ্বল হইয়াছে নহিলে শিবেশ্বরের সেই দৈত্যের মত পাগল পুত্রের কীর্তির পর রায়বংশ সরোবর নরককুণ্ড আখ্যা পাইয়াছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন অন্নপূর্ণা দেবী। বোধহয় সেই ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। তারপর বললেন—সবই কর্মফল আর অদৃষ্ট তাছাড়া আর কি? আমার মাতামহের ওই যন্ত্রণা, ওই তপস্যা সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছিল তাঁর জীবনে। আমি ভাবি কি জানিস? আমি ভাবি—ওই আমার মাতামহের ওই পাপ···ওই শিবেশ্বরের ছেলেটা হয়ে এসেছিল।

এরপর সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও চুপ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নগেনবাবু মনে করিয়ে দিলেন সময়ের কথা। বললেন আমাকে। বললেন—রাত্রি তো অনেকটা হয়ে গেল, শীতকাল ৮॥টা বাজল। তা সুরেশ্বর তুমি আজ এখানেই খেয়েদেয়ে যাও। ঠাকুমা—।

যেন দুঃস্বপ্ন ভঙ্গ হল তাঁর। তিনি বললেন—তাই তো যাবে। এর আর নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি? ঘরের ছেলে!

নগেনবাবু আবহাওয়াটা গরম করতেই বোধহয় বললেন—তা আজ ওকে ঘরের ছেলে বললে হবে না ঠাকুমা।

—কেন? কুটুম?

—তাই বা কেন? ও আজ তোমার নাতির বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে, দেশজুড়ে কনে দেখে পছন্দ হচ্ছে না যখন, তখন এমন কনে ও এনেছে যে, তুমি যে-মেয়েটি চাচ্ছিলে, ঠিক তাকেই এনেছে। ওকে নেমন্তন্ন কর। খাতির কর।

হঠাৎ দুহাতে আমার গালদুটি চেপে ধরে বললেন অন্নপূর্ণা দেবী—শুধু তাই নয় নগু, এর চেহারা আর আমার দেবুর চেহারা এক, একরকম। ঠিক যেমন এই মেয়েটি—কি নাম—

—অর্চনা। তা বেশ নাম। ভাল নাম। অর্চনা মানে পূজা। বললেন নগেনবাবুর মা।

—হ্যাঁ। অর্চনা আর আমার মায়ের চেহারা যেমন একরকম, ঠিক সেইরকম। ছেলেবেলায় তাই মনে হত। ওকে আমি ভেলভেটের জরিওলা পোষাক-পাগড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দেখেছি আর কেঁদেছি।

চোখের জল মুছে বললেন—শোন রে, পিসীর কথা শোন। তুই আমাকে বড়মা বলবিনে। বলবি অন্নপিসী। তা না পারিস তো বলবি বড়পিসী। দেবু কীর্তিহাটে প্রথম মানুষ হয়েছিল, আমাকে পিসীমা বলত না, বলত অন্নপিসী। শোন আজ খাবি তো এখানে নিশ্চয়। কাল সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে ফেলবি। নগু আমি তো পুজোয় থাকব ভাই। তুই দাঁড়িয়ে ওর দাড়ি কামিয়ে দেওয়াবি, কেমন? তারপর আমি উঠে ওকে দেখব। তারপর বাড়ি যাবে।

নগেনবাবুর মা বললেন—ও ভারটা আমাকে দিন মা। কিন্তু ওর চুলগুলো? ওই যে লম্বা বাবরী মতন? ওতে কিন্তু ওকে খুব ভাল দেখাচ্ছে।

এরই মধ্যে বাড়ীর যাঁরা থিয়েটারে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরলেন। তাঁদের সঙ্গে অর্থাৎ নগেনবাবুর ভাই সুরেনবাবু এবং বীরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। পরিচয়ে জানলাম—সুরেনবাবুর স্ত্রী আমার মায়ের পিসতুতো বোন।

পরিবারটিকে বড় ভাল লাগল।

সবশেষে এলেন পাত্র রথীনবাবু। মেডিকেল কলেজের নাম-করা ছাত্র। এই সুন্দর সুপুরুষদের বংশের মধ্যে এই ছেলেটিই যেন সবথেকে উজ্জ্বল এবং পৃথক। চেহারায় পার্থক্য আছে। কথায়-বার্তায় আছে, আচারে-আচরণেও আছে।—

আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনি এ-বাড়ীতে!

অন্নপূর্ণা দেবী তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে আনিয়েছিলেন। নইলে ডাক্তার রাত্রে চেম্বার এবং নার্সিংহোম থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢোকে। নিচের তলায় তার ঘর। সেখানে বিশেষ রকম বন্দোবস্ত। দরজার সামনে সিঁড়িতে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো থাকে। তাই মাড়িয়ে ঘরে ঢোকেন। পোষাক সব খুলে স্নান করে কাপড়-চোপড় পরে তবে উপরে আসেন।

বেশ একটু অসুখ ও অসুখের সংক্রামকতা সম্পর্কে বাতিক আছে। স্নান করে এলেও ডেটল-জাতীয় ডিস্ইনফেক্টেণ্টের গন্ধ ওঠে।

আমার উত্তর অন্নপূর্ণা ঠাকুমাই দিলেন। বললেন—তোর জন্যেই এসেছে রে। বসে আছে।

—আমার জন্যে?

এবার আমি বললাম—হ্যাঁ, আপনার জন্যেই।

অন্নপূর্ণা ঠাকুমা বললেন—দেখতো এই ফটোখানা!

—ফটো? কার?

—দেখে বলতো কার?

হেসে সে বললে—একটি মেয়ের।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, বাঘিনীর নয়, গণ্ডারনীর নয়, এতো সবাই জানে।

—তাই তো বলছি।

আমার ভাল লাগল। অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে এমনভাবে কাউকে কথাবার্তা বলতে শুনিনি।

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—তুই মস্ত তঁ্যাদড়।

—বাঁদরও বলতে পার। তোমার কথার উপর কথা কয় কে বল?

—তুই হারামজাদা সে তুই বলিস। দেখতো আমার মায়ের অয়েলপেন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে!

রথীন এবার ভবানী দেবীর অয়লেপেন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে সত্যই বিস্মিত হল। বেশ ভাল করে দেখে যেন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে বললে—তাই তো! আশ্চর্য মিল তো। অবিকল মিলে যাচ্ছে। বলতুম এটা ওই অয়েলপেন্টিংয়ের ফটো কিন্তু সাজেগোজে মিল নেই, এত গয়না নেই। কার ফটো এ, মামণি?

—তাই তো বলতে বলছি। বল?

রথীন হেসে বললে—মঙ্গলবারের কথায় বলতে—সেটা আমার মনে আছে। মঙ্গলচণ্ডীর আসন টলল, মুকুট নড়ল; মা বললেন—দেখ তো জয়া, দেখ তো বিজয়া খড়ি পেতে, আসন কেন টলে, মুকুট কেন দোলে? অমনি জয়া-বিজয়া গুণেগেঁথে বলতো—মা তোমার ভক্ত বিপদে পড়েছে। আমি তো ঠাকুর নই, দেবতা নই, কি করে বলি বল? তুমিই নয় খড়ি পেতে গুণেগেঁথে বলে দাও—এ-ফটো কার?

—ওই জন্যেই তোকে ভালবাসিরে ছোঁড়া। তোর এসব মুখস্থ। চমৎকার করে বলিস। শোন, এ ফটো হচ্ছে সুরেশ্বরের খুড়তুতো বোনের। শিবেশ্বরের মেজ ছেলে জগদীশ্বর রায়ের বড় মেয়ে। বাপটা গাঁজা খায়, মদ খায়, লোককে মারপিট করে বেড়ায়। তার মেয়ে। একটা দোজবরে দারোগা ধরে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছে। সুরেশ্বর এসেছে আমার কাছে। তোর জন্যে।

—আমার জন্যে? মানে আমাকে বিয়ে করতে হবে?

—হ্যাঁ। আমাদের সবারই মত হয়েছে। ইচ্ছে তাই।

—আমাদের বলে লাভ কি? বল তোমার মত হয়েছে। তোমার মায়ের মত দেখতে অমনি তোমার মন গলে গেছে। কেমন?

—তবু তোকে হ্যাঁ বলতে হবে তো।

একটু চুপ করে থেকে রথীন বললে—ভেবে দেখতে সময় দাও মামণি। আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। রথীন এক মুহূর্তে আর এক রথীন হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর আলাদা, মুখ-চোখ আলাদা, সব আলাদা!

এবং সঙ্গে গম্ভীরকণ্ঠে নগেনবাবু বলে উঠলেন—রথীন!

পিতৃত্বের শাসন, ক্ষোভ, অধিকার একসঙ্গে যেন মিলিত গর্জনে ধ্বনিত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। কিন্তু রথীন বিচলিত হল না। সে বললে—বলুন!

নগেনবাবু বললেন—এমন কথা তুমি ঠাকুমাকে বলতে সাহস কর আমাদের সামনে?

রথীন বললে—কথাটা কি অন্যায় বলেছি? আমি বিবাহ করব। আমি ভেবে

দেখব না ?

—ঠাকুমা কথা দিয়েছেন জেনেও তুমি বলছ ভেবে দেখতে হবে ?

নগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—দাঁড়াও। এ বাড়ীতে বাবার থেকে শুরু করে তোমার ছোটকাকা পর্যন্ত সকলের বিবাহ কখন হবে, কোথায় হবে, সে-সবই স্থির করেছেন উনি, আজ—

অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে রথীন বললে—আজ সে-কাল পাল্টে গেছে বাবা-এই কথাটা আপনি বুঝে দেখবেন না ?

অন্য সকলে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন—নগেনবাবুর মা, রথীনের মা, সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু, তাঁদের স্ত্রীরা দুজন। অন্নপূর্ণা দেবী পাথরের মত বসেছিলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম রথীনকে।

দেখলাম, অন্নপূর্ণা দেবীর অজ্ঞাতসারে তাঁর বংশধারা গঙ্গা থেকে পদ্মা ভাগীরথীর মত দুভাগে কখন ভাগ হয়ে গেছে, তা তিনি জানতে পারেননি। অথচ দুভাগ হয়ে গেছে নিঃসংশয়ে।

অন্নপূর্ণা দেবী বললেন—সুরেশ্বর, বাড়ী যা বাবা। এখানে বিয়ে হবে না। তই খরচ করবি বলছিস, মেয়ে সুন্দরী—পাত্রের অভাব হবে না। তুই বাড়ী যা। তারপর রথীনকে বললেন —আমার ভুল হয়েছে রথীন, তুই স্বাধীন হবার আগে তোর বিয়ে না দেওয়া। আজ তুই স্বাধীন ;

রথীন আর দাঁড়াল না। সে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল।

আমি বললাম—খেয়ে যাব বড়মা। আমার খাবার কথা আছে যে !

*　　*　　*

বাড়ী ফিরে এলাম এক বিচিত্র মন নিয়ে। অর্চনার বিয়ের ভাবনা আমার মন থেকে তখন যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। আমার মনে শুধু ঘুরছে রথীন ডাক্তারের কথা। আশ্চর্য একটা ছেলে।

তার সে আশ্চর্যরূপ এতকাল ওই অন্নপূর্ণা দেবীর পরমাদরের মধ্যেই লালিত হয়ে স্বচ্ছন্দ-বুদ্ধিতে বেড়ে উঠেছে। তিনিই তাকে যেন ঢেকে রেখেছিলেন। আজ আমাকে উপলক্ষ্য করেই অকস্মাৎ একমুহূর্তে সে অন্নপূর্ণা দেবীর পরমাদরের সমস্ত আবরণ ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে এসে আপনার চেহারা নিয়ে দাঁড়াল।

জানবাজারে ফিরলাম আমি ওঁদের গাড়ীতে। আমার গাড়ী আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। রাত্রে থাকব কথা হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল কথাটা পাকা করে নিয়ে ফিরব। বাধা উঠবে মনেই করিনি। বাধার মধ্যে বাধা বা অপেক্ষার মধ্যে অপেক্ষা থাকবে—অর্চনাকে হয়তো একবার এনে দেখানোর। কিন্তু সে কোন বাধাই নয়। অর্চনাকে পছন্দ ফটো দেখেই যখন হয়েছে, তখন চোখে দেখলে সে-পছন্দ পরম আগ্রহে পরিণত হবে তাতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু রথীনকে দেখে তার কথা শুনে তার উপর কোন ক্ষোভ আমার হল না। এ-বাড়ীর ছেলে না-হলে ভাবতাম হয়তো কারুর প্রেমে পড়েছে। হয়তো অসবর্ণ। কিম্বা হয়তো

অতি মডার্ন মেয়ে। বরং উল্টো মনে হল। সেটা হল হঠাৎ—ফিরে আসছি ও-বাড়ী থেকে; গাড়ীটা সারকুলার রোড হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে ময়দান ভেঙে এসে উঠবে এসপ্ল্যানেডের সুরেন্দ্রনাথ রোড আর চৌরঙ্গীর জংশনে, পথে দেখলাম খণ্ড খণ্ড জটলা এখানে-ওখানে। তার মধ্যে দশ-বারোটি ছেলেকে দেখলাম আহত অবস্থায় গাছতলার আড়াল দিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, একটা মিটিং ছিল মনুমেণ্টের তলায়। নতুন রিফর্ম আইন প্রবর্তিত হয়েছে, সেই আইনকে বর্জন করবার জন্যই এ-মিটিং করছিল কংগ্রেসের লেফ্‌টিস্টরা।

কংগ্রেসের সে সময়ের অবস্থার কথা আমার থেকে তুমি ভাল জানো সুলতা। হয়তো বা সে মিটিংয়ে তুমিও ছিলে এমন হতে পারে।

কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা করবার জন্য তরুণ দল, কংগ্রেসের মধ্যেই ছোট ছোট দল হয়েছে। পণ্ডিত নেহরু লেফ্‌টিস্ট, লেফ্‌টিস্টরা তাঁর মুখ চেয়ে থাকে, তবু তিনি দল গড়েননি। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী তখন মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে এসে তিনিই তখন কংগ্রেসের সভাপতি। বোধহয় এই কারণেই তিনি দল গড়ার দিকে মনোযোগী হননি।

সুভাষচন্দ্র নেহরুর সমান জনপ্রিয়। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের বীজ পুঁতেছেন। কিন্তু তা তখনও বীজ হয়েই আছে। দেখা দেয়নি। তখন—মানে সে-সময়টায় দেশে তিনি ছিলেন না। মাসখানেক পর ফিরলেন। সেদিনও আমি কলকাতায় ছিলাম।

এম এন রায় দল গড়তে উঠেপড়ে লেগেছেন। সব থেকে বেশী দানা বেঁধেছে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি।

কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে। ছাত্র ফেডারেশন গড়ে উঠেছে।

কম্যুনিস্ট পার্টি তখন জন্মেছে কিন্তু অন্য একটা নামের আড়ালে বাল্যলীলা শুরু করেছে। সবল নয়, সুস্থ নয়।

সুলতা হেসে বললে—হ্যাঁ, তখন ওরা ন্যাশনাল ফ্রণ্টের নামে কাজ চালতো। তাদের ইণ্টারন্যাশানাল এবং এ্যাণ্টিন্যাশনাল চেহারাখানা ওই নামের নামাবলী গায়ে দিয়ে বন্দেমাতরম বলে আওয়াজ দিত। যে মিটিংটার কথা বলছ, তার কথাও মনে পড়ছে। ঠিকই বলেছ আমিও সে মিটিংয়ে ছিলাম। পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—তাহলে আমি ভুল করিনি অনুমানে।

সুলতা বললে—না, তা করনি। গোটা ভারতবর্ষেই তখন সাড়া পড়েছে।

—হ্যাঁ। সেই কারণেই সেদিন আহত অবস্থায় ওদের দেখে আমার মনে হয়েছিল হয়তো বা রথীন কোন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। বিয়েই হয়তো করবে না। এবং তার দক্ষিণপন্থী বাপ-খুড়োদের, এমনকি অন্নপূর্ণা দেবীকেও সেটা জানতে দেয়নি।

একটু চুপ করে থেকে সুরেশ্বর বললে—অকস্মাৎ যেন আমি বদলে গেলাম সুলতা। রায়বাড়ীর এলাকার বাইরে এই ময়দানে যেন সারা ভারতবর্ষের আবেগ আমার বুকে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠল যে, দেব, আমিও ঝাঁপ দেব। প্রায়শ্চিত্ত করব জীবনের। শুধু আমার নয়, আমার বাবার, আমার পূর্বপুরুষদের, ইংরেজ-

আনুগত্যের প্রায়শ্চিত্ত করব। কেন নিজেকে আবদ্ধ করে রাখব এই পচে-যাওয়া জমিদারবংশের জটপাকানো বন্ধনের মধ্যে!

চৌরঙ্গীর মোড়টায় এসে দেখলাম, সেখানটা ফাঁকা। পুলিশ ছাড়া কেউ নেই। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার গাড়ীটা থামিয়েও একবার দেখে নিলে আমার চেহারাটা। তারপর গাড়ীটা ছেড়ে দিলে।

গাড়ীটা এসে জানবাজারের এই বাড়ীতে থামল। আমি গাড়ী থেকে নেমে উপরে ঘরের দরজার কড়া নাড়লাম। ভিতর থেকে একজন চাকর দরজা খুলে দিলে। আমি ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় লম্বা বারান্দাটার ওধার থেকে কে আর্ত চীৎকার করে উঠল—বাবুজী—হুজুর হামার রায়হুজুর!

কে? কণ্ঠস্বরটা পরিচিত। এবং পরমুহূর্তেই মনে হল এ তো হিলডার গলা। মনে পড়ে গেল, কাল সে আমি যে-ট্রেনে এসেছি, সেই ট্রেনেই কলকাতা এসেছে। কিন্তু সে এখানে কেন?

থমকে দাঁড়ালাম।

পরমুহূর্তেই এগিয়ে এসে দাঁড়াল কুইনী। খুব আশ্চর্য হইনি। কারণ হিলডার গলার স্বর আগে পেয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার কুইনী?

—বড় বিপদে পড়ে এখানে এসেছি স্যার। রঘু ছিল, সেই এ-বাড়ীতে আমাদের ঢুকতে দিয়েছে। নইলে হয়তো—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—জানি না কি হত? ও-বাড়ীতে দাদিয়া ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া করে যা-তা গালাগাল করেছিল—হ্যারিস ওখানে তালা ভেঙে ঢুকেছে। তারা তাকে ঠেলে ঘর থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। পড়ে গিয়ে দাদিয়ার হাঁটুটা অত্যন্ত জখম হয়েছে। যার সঙ্গে এসেছিলাম, জন চৌধুরী মারপিট শুরু হতেই পালিয়েছে। তাই এখানে এল দাদিয়া। বললে—আর কোথা যাব? একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—আর—। বলতে গিয়ে থেমে গেল কুইনী।

—কি আর?

—ভাড়াটেরা বললে—রায়বাবুরা নোটিশ দিয়েছে—এ-বাড়ী আমাদের। যেন অন্য কাউকে ভাড়া না দেওয়া হয়। শুনলাম, তিন মাসের ভাড়া তারা প্রত্যেককে ছেড়ে দেবে।

—আমরা নোটিশ দিয়েছি? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না আমার।

—না স্যার। আপনাদের বড়-তরফের বাবুরা দিয়েছেন নোটিশ।

—আমাদের বড়-তরফ? মানে জ্যাঠামশাই?—যজ্ঞেশ্বর রায়?

—হ্যাঁ। তাঁর নাম আছে। আর হ্যারিসের যে-ঘরটা আমরা বন্ধ করে রেখেছিলাম সেই ঘরটা হ্যারিসকে দিয়ে খুলিয়ে তাকে থাকতে দিয়েছেন বড় রায়বাবুর ছেলেরা। হ্যারিস এখন বলছে—এ-বাড়ী বড় রায়বাবুর। এখানে তারা চিরকাল ভাড়া দিয়ে থাকে। আমার মা-বাবাও ভাড়া দিত। আমার মায়ের বাবাও ভাড়া দিতো—সে তার সাক্ষী। হ্যারিসই কলকাতায় এসে বড় রায়বাবুর কাছে গিয়েছিল। তাঁর অসুখ। তাঁর ছেলে যিনি সেটেলমেণ্টের সময় কীর্তিহাট গিয়েছিলেন, তিনিই হ্যারিসকে নিয়ে এসব করিয়েছেন।

কুইনীর কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। আমি বললাম—বেশ করেছ কুইনী। ভালই করেছ। আমি খুশি হয়েছি। আপনার ভাবতে পেরেছ—এসেছ এখানে—কিন্তু কিছু খেয়েছ?

টপ টপ করে কুইনীর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। দোকান থেকে কিনে এনে খেয়েছি। কিন্তু দাদিয়া বড় জখম হয়েছে। অনেক রক্ত পড়েছে।

আমি বললাম—আজ বড় ক্লান্ত আমি 'কুইনী। মনও ভাল নেই। কাল শুনব তুমি ছিলডাকে বল গিয়ে। কাল শুনব; বুঝে দেখব। তবে বাড়ী তোমার এ আমি জানি। দরকার হলে এ-কথা আমি বলব। আদালতেও বলব।

বলে উপরে উঠে চলে গেলাম আমি।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা সে রাত্রে আদৌ ঘুম হয় নি। আমার মনের মধ্যে পাশাপাশি তিনটে চিন্তার স্রোত বইছিল। ঘুমুতে আমি পারিনি।

একটা স্রোত—অন্নপূর্ণা দেবী বড়মার বাড়ীর ঘটনা এবং ওই রথীন ছেলেটিকে নিয়ে বিচিত্র অনুমান ও কল্পনা। অন্যটি কাল যে-হাওয়াতে ময়দানে নিশ্বাস নিয়ে এসেছিলাম তার চিন্তা। ঘর সংসার বংশ—সমস্ত কিছুর বাইরে যে জগতে ও জীবনের স্রোত বইছে, তার গর্জন। সে রাত্রে এই শেষেরটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমাকে কোন মতে স্থির হ'তে দিচ্ছিল না। একটা প্রবল আকর্ষণে যেন টানছিল আমাকে।

আজও পর্যন্ত আমার জানাশোনা জমিদারবংশের মধ্যে দুচার ঘর ছাড়া কেউ এই ভারতের জীবনধারাকে সমর্থন করেন নি। আমি নিজে গিয়ে বণ্ড দিয়ে ফিরে এসেছি। বাবা গান্ধীজীকে অনেক মন্দ কথা বলে গেছেন।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। প্রথম বম্বেতে তারপর ১৮৮৬ সালে কলকাতায়। সে সময়ে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় জীবিত। বড় ছেলে দেবেশ্বর রায় তখন তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণ। কীর্তিহাটের লোকে বলত বড়কুমার। রত্নেশ্বর রায়ের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—ল্যাণ্ডলর্ড এ্যাসোসিয়েশন থেকেই জন্মেছে। রাজা মহারাজ উপাধিধারী বড় বড় জমিদাররা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে বেশী ছিলেন না। কিন্তু সে কালের যাঁরা এক সঙ্গে জমিদার ধনী এবং শিক্ষা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রত্ন—তাঁরা এই এ্যাসোসিয়েশনেই ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্তির, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্তির, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উত্তরপাড়ার দোর্দাণ্ডপ্রতাপ জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে এরা এঁর সঙ্গে ছিলেন।

প্রথম কংগ্রেস হবার কথা ছিল পুণায়। ছত্রপতি মহারাজাধিরাজ শিবাজীর লীলাক্ষেত্রে। জানি না এটা তাঁরা সচেতন জাগ্রত বুদ্ধি নিয়ে করেছিলেন কিনা। মিস্টার হিউম—আমরা জানতাম মহামতি হিউম, ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের অনুমতি নিয়েই এর পত্তন করেছিলেন। দেশে তখন একটা জাগরণ এসেছে। বীরেশ্বর রায়ের কাল চলে গেছে। রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুরের কাল তখনও যায় নি কিন্তু পোশাক বদলাচ্ছে। পুণাতে কি একটা এপিডেমিক হয়েছিল বলেই স্থান পরিবর্তন করে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বম্বেতে। বাংলার উমেশ বাড়ুজ্জে—ডব্ল্যু সি ব্যানার্জি হয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট। দ্বিতীয় অধিবেশন হল কলকাতায় তাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন জ্যেষ্ঠের মত সমাদর করে সাহায্য করেছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্তির—শুধু ধনী নন, জমিদারীতে জমিদার নন, নিজে তিনি বিরাট পণ্ডিত, তিনিই ছিলেন কলকাতায় সে কংগ্রেস অধিবেশনে রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান। বম্বের দাদাভাই নওরোজী মূল সভাপতি।

সভাপতি হিসেবে দাদাভাই নওরোজীর নাম প্রস্তাব করেছিল উত্তরপাড়ার জমিদার, যাঁর প্রতাপের ভয়ে প্রজারা কাঁপত, তিনি। তখন তাঁর উনআশী বছর বয়স।

সভাপতি দাদাভাই নওরোজী থেকে বিভিন্ন প্রভিন্সের ডেলিগেটরা মুক্তকণ্ঠে কলকাতার সম্বর্দনার প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুরের আমলের জমাখরচের খাতায় তিন অঙ্কের একটা চাঁদা খরচ আছে। কিন্তু নিজে তিনি আসতে পারেন নি, তীর্থে যাবার আয়োজন করেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন দেবেশ্বর রায়; তিনি ছিলেন ভলেণ্টিয়ার দলের একজন কর্তা। এবং বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১৮৮৮ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেকে কংগ্রেস পৃথক হয়ে গেল। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হল, স্থায়ী অস্তিত্ব; তার লক্ষ্য হল স্বতন্ত্র; দৃষ্টি জমিদার ধনীদের ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত হল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন পৃথক হয়ে গেল।

রত্নেশ্বর রায়ের কাগজপত্রের মধ্যে একখানা চিঠির নকল আছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন লিখেছিল ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে। দীর্ঘ পত্র। তার কটা লাইন আমি নোট করে রেখেছি সুলতা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সেসনে ডেলিগেট পাঠাবার জন্য অনুরোধের উত্তরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী 'রাজকুমার সর্বাধিকারী' লিখেছিলেন—

'No Political Association of the country, can feel the least hesitation in sending delegates to a conference but they will naturaly shrink from associating themselves with a rival Association, whose mode of action—whose methods and measures—may often be diametrically opposite to those of their own".

এরপর থেকে জমিদার শ্রেণীই একরকম কংগ্রেস থেকে দূরে সরেছে। ছোঁয়াছ বাঁচিয়ে চলেছে। যেটুকু ছিল, তা ছিল একগোছা না-পাকানো সুতোর বাঁধনের মত। তার অর্ধেক-গুলো ছিঁড়ে গেল ১৯০৫ সালে, বাকীটা ছিঁড়লো ১৯২১ সালে। সম্পদ যাদের থাকে সুলতা তারা রাষ্ট্রবিপ্লব চায় না; আর সম্পদ যাদের আছে, তাদের বাঁচবার সাধ বড় বেশী। ওই কথাগুলোই তার সাক্ষী।

এর মধ্যেও হয় তো দু' চারজন জমিদারের দুঃসাহসী বা আবেগপ্রবণ ছেলে—কংগ্রেস কেন বোমা-পিস্তলের দলেও ঢুকেছে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে জমিদার বাপকে ধরে পুলিশ আপিসে এসে নরেন গোঁসাইয়ের মত এ্যাপ্রুভার হয়েছে।

কিন্তু সেদিন যেন অনুভব করেছিলাম, না—এ আর এক যুগ! অন্ততঃ রায়বংশের পক্ষে। আর এক যুগ বলেই অতুলেশ্বর এই কাজ পেয়েছে, অর্চনা তার সহকারিণী হতে চেষ্টা ক'রেছে।

মেজদি যে মেজদি, তিনিও পেরেছেন।

আমি কেন পারব না ?

উত্তেজনায় মধ্যে মধ্যে উঠে বসেছি সেদিন রাত্রে। সে কতবার তা মনে নেই, তবে অনেক ক'বার তা মনে আছে।

এরই মধ্যে আর এক চিন্তাও এসেছে।

মাঝে মাঝে চীৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। যন্ত্রণাকাতর নারীকণ্ঠের চীৎকার। চেঁচাচ্ছিল—গোয়ান বুড়ী হিলডা।

সত্য বলব তোমার কাছে সুলতা—মধ্যে মধ্যে এমন বিরক্তি বোধ করছিলাম যে ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে ধমক দিই। থামতে বলি। একবার অন্ততঃ মনে হয়েছিল যে দারোয়ানকে বলি—এমন চীৎকার করলে বের করে দে ওকে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল কুইনীকে। কুইনীর সঙ্গে সেই চিঠিগুলো। রত্নেশ্বর রায়ের দানপত্র। রায় এ্যাণ্ড কোম্পানীর চিঠি ভায়লা পিদ্রুসকে। তার ছেলেকে পড়বার খরচ দেবার কথা। ভায়লাকে মাসোহারা দেবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য আবছা প্রশ্ন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছিল কুইনীকে। কুইনীর মধ্যে একটা কি ছিল। যা আমাকে তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট করত।

হয়তো মানুষের দেহের মধ্যে যে অনিবার্য আকর্ষণ থাকে নারীদেহের প্রতি যার জন্য পরস্পরের দেখা হওয়া মাত্র নারী চঞ্চল হয়ে উঠে মুখ ফেরায়, ঘোমটা টানে, গায়ের কাপড়টা টেনে দেয় ; পুরুষ বিস্ফারিত নির্লজ্জ দৃষ্টিতে দেখে প্রতি মুহূর্তে এগুতে চায় জন্তুর মত, কেবল মানুষ বলেই পারে না, সমাজ আছে বলে পারে না, গভর্নমেণ্ট আছে বলে পারে না—এটা তাই।

ভেবে দেখ সুলতা কোন জগৎ থেকে কোন জগতে গিয়ে পড়ছিলাম আমি। কোথায় দেশ-মানুষ, আত্মদান—আবার কোথায় পুরুষ আর নারী—দৃষ্টিতে মোহ, অন্তরে প্রবল আকর্ষণ তার সঙ্গে বংশের একটা অন্যায় সংযোগের রহস্যময় কিছু। তাকে কি বলব বুঝতে পারছি না। বারবার নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম সেদিন। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর মধ্যে কিছু কিছু বিচিত্র আত্মবিশ্লেষণ আছে। ডায়রী তিনি বিলুপ্ত করে দেবেন, এই ইচ্ছে তাঁর ছিল। ডায়রীর দপ্তরের উপর লেখা ছিল—এগুলিকে আমার চিতায় পুড়িয়ে দিয়ো। যদিই তা কোন কারণে না হয়, অর্থাৎ যদি শেষসময়ে আমি একথা বলে যেতে না পারি এবং এই লুকানো দপ্তর কারুর চোখে না পড়ে, থেকেই যায়, তবে এ ডায়রী কেউ পড়ো না। যে পড়বে সে ব্রহ্মহত্যার পিতৃহত্যার পাতকগ্রস্ত হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে। তার কারণ, শ্যামাকান্তের কাহিনী, সোমেশ্বর রায়ের কাহিনী, বিমলা দেবীর সন্তান চুরির কাহিনী তিনি পৃথিবী থেকে মুছে দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে তা হয় না। রায়বাড়ীর ক্ষেত্রে আমিই তাঁর সকল নিষেধ অমান্য করলাম।

আমি পড়েছিলাম সুলতা তোমার জন্যে। ঠাকুরদাস পালের খুনের মধ্যে তিনি কি ভাবে কতখানি জড়িয়েছিলেন তাই জানবার জন্য। এবং বিচার করবার জন্যও বটে। সেই সূত্রে

পেলাম রায়বংশের গোপন করা ইতিহাসের কথা। কি সে গুপ্ত কথা? তাঁর নির্দেশ মানি নি। চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে এ কথা বিশ্বাসই করতাম না। আর পিতৃহত্যা ব্রহ্মহত্যার পাপ—এ আমাকে অর্শাবে বলে ভয়ও করি নি, পড়তে পড়তে এই মানুষটিকে ভয় হয়েছে তাঁর কঠোরতার কথা পড়ে, সত্যবাদিতা দেখে, মনের কথা একবিন্দু গোপন করেন নি ডায়রীতে। এবং বিচিত্র রঙে রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সুলতা, কিছুক্ষণ আগে অঞ্জনার সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল একখানি ঘরের মধ্যে—যখন সরস্বতীবউ দ্বিতীয়া কন্যা প্রসবের পর অসুস্থ এবং শোকার্ত, কারণ মেয়েটি মারা গেছে, সেই নিরিবিলিতেও যে সাংঘাতিক কথাগুলি অঞ্জনা বলেছিল এবং তার উত্তরে তাঁর যে স্বরূপটি প্রকাশ করেছিলেন, তা তোমাকে শুনিয়েছি। তোমাকে বলতেই হবে যে, তিনি গোপন কিছু করেন নি, এমন কি নিজের মনের অন্ধকার কোণে নিরন্তর অন্ধকারের মত যে গোপন কামনাটি লুব্ধ পশুর মত দাঁড়িয়েছিল, তাকেও তিনি গোপন করেন নি।

এই রত্নেশ্বর রায়ের আর একদিনের বা দু তিন দিনের ডায়রীর মধ্যে বোধহয়, সারা জীবনটা আকাশের আলোর নিচে পৃথিবীর মত মেলে ধরা আছে। তার মধ্যে দেখেছি এক একটা জায়গা আছে বড় ভয়ঙ্কর। মানুষের সত্য জীবনে যা আছে—গোটা পৃথিবীর কোথাও বোধহয় তা নেই।

টেবিলের উপর থাক-বন্দী ডায়রীগুলি থেকে উপরের সেই খাতাখানা টেনে নিলে—যেখানার মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ আগে অঞ্জনা এবং রত্নেশ্বরের কথা কাটাকাটির বিবরণ পড়ে শুনিয়েছিল।

এক চিহ্নিত স্থান খুলে বের করে সুরেশ্বর বললে—ওই ঘটনার তিন মাস পর। অঞ্জনা একদিন সকালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ ডায়রী সেই দিনের ডায়রী।

লিখেছেন—"প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়াই শুনিলাম অঞ্জনা গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। এত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম—প্রতি দরজায় তালাচাবীর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, দারোয়ান ছিল, কিন্তু তথাপি সে পলাইয়াছে।

সংবাদটা শুনিয়া মনে হইল মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আমার মাথার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে, আমার অন্তর শাল্মলীবৃক্ষ বা বটবৃক্ষের মত এই ঝঞ্ঝার মূল লইয়া অর্ধোৎপাটিত হইয়া ভূতলশায়ী হইতেছে। আমি অবশিষ্ট মূলগুলি দিয়া এবং প্রধান মূলটি দিয়া এখনও কোনরকমে টলায়মন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

চক্ষে দেখিলাম জীবনের যত অশুভ এবং মন্দবুদ্ধি ও মতি কুটিল সন্দেহ ও আশঙ্কা, জটিল জটপাকানো কামনা এবং ভাবনা—সব আজ এই ঝড়ের আঘাতে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে পঙ্কশায়ী মূলের মত উপরে উঠিয়া শত মুখ বিস্তার করিয়াছে। যত ক্রোধ তত আক্রোশ, নিগূঢ়তম মন্দ মতলব মনের মধ্যে খেলিয়া যাইতে লাগিল। খুন করিতে ইচ্ছা হইল। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল।

ক্রমে তাহা হইতে এত ক্রোধ হইল যে-মুখ হাত ধুইতে ধুইতে চৌকীতে বসিয়া প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া গেলাম! অঞ্জনা পলাইয়াছে? কাহার সহিত পলাইয়াছে? মনে মনে সব

বুঝিতেছি—এই সেই শয়তান, রবিনসন-হত্যাকারী আলফান্‌সো পিক্রুস ; সে রবিনসনকে হত্যা করিয়া এখান হইতে গোয়া এবং গোয়া হইতে পর্তুগাল গিয়াছিল কিন্তু কিছুদিন হইল আবার আসিয়া হাজির হইয়াছে।

আজ পিতৃদেব থাকিলে এবং দেওয়ানজী থাকিলে হয় তো অসমসাহসিক কিছু করা যাইত। আমি ভুল করিয়া তাহাকে একটা চাকরী দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। দেশে আজ কয় বৎসর নীল লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। দেশের সাধারণ লোকজন উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে ভারত শাসনের ভার লইলেন কিন্তু অদ্যাপি ইংরাজ ব্যবসাদারদের প্রতাপ গেল না। গোটা দেশের শাসনপ্রণালী ও পদ্ধতি তাহারাই স্থির করিতেছে। হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ব্যক্তির যুক্তি-প্রতিবাদ ইহারা গ্রাহ্য করে না ; ফাদার লঙের মত ব্যক্তিকেও জেলে প্রেরণ করে। সুতরাং অনেক প্রকার চিন্তা-বিবেচনা করিয়া, ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই আলফান্‌সোকে হাতে রাখিবার জন্যই মাসিক একশত টাকা বেতন বন্দুক ইত্যাদির তদ্বির করিতে এবং প্রয়োজন হইলে সাহেব সুবাদের শীকারের ব্যবস্থা করিতে তাহাকে রাখা হইয়াছিল। আলফান্‌সোকে এখানেই রাখিয়াছিলাম। কারণ ও অঞ্চলের দু চারজন চিনিতেও পারে। লোকটা নাম পাল্টাইয়াছিল। পূর্বে দাড়ি-গোঁফ দুইই ছিল, এখন দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছে।

সোফিয়া বাঈকে শ্রদ্ধা করি এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে, তাহাকে, বেতন দিয়া পিতার মনোরঞ্জনের জন্য বাকী জীবনটার ভার তাহার লইয়াছিলাম বলিয়াই রায়বংশের সকল গোপন কথা কখনও আর প্রকাশ পাইবে না। পিতা গত হইয়াছেন, মাতা স্বর্গে গিয়াছেন—সোফি বাঈকে পাঠাইয়াছি গোয়ালিয়রে। তানসেনের সমাধিস্থল পরিষ্কার করিয়া ধূপ দীপ জ্বালিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবে।

আলফান্‌সোকেও ঠিক সেই কারণেই রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ক্রমশ পোষ মানাইয়া আমাদের গোয়ানপাড়ায় একটা বিবাহ দিয়া বাস করাইব। বাড়ী করিয়া দিব। ঘরসংসার ছেলেপুলে হইলেই লোকটা পোষা সার্কাসের চিতায় পরিণত হইয়া যাইবে। না হয়, তখন কীর্তিহাটের জঙ্গল অঞ্চলে সুন্দরবনের দিকে লোকটাকে পাঠাইয়া দিব, আপনা আপনিই হারাইয়া যাইবে। কিন্তু লোকটা আমার পিঠের উপর ছুরিকাঘাত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদটা শুনিয়া যেন আমি ক্রোধে ক্ষোভে যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল—দামিনী ঝি খবরটা আনিয়াছে, তাহার বুকে একটা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলি—মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! অঞ্জনা যায় নাই যাইতে পারে না! না—না—পারে না। আমাকে ছাড়িয়া সে—। কিন্তু তাহা পারিলাম না।

ক্রমশঃ উত্তেজনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, উত্তপ্ত রক্ত শীতল হইল, মনে হইল জমিয়া প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছি।

মৃদুস্বরে বলিলাম—পলাইয়াছে? কোথায়? গঙ্গায়—

দামিনী বলিল—সে একখানা চিঠিখানা রাখিয়া গিয়াছে। চিঠিখানা বউরাণীর নিকট রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—আপনাকে ডাকিতে।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, দেবুকে লইয়া বসিয়া আছেন মদীয় শাশুড়ী ঠাকুরাণী এবং বিছানায় শুইয়া আছে স্বর্ণলতা।

শাশুড়ীকে দেখিবামাত্র অগ্নিবৎ প্রজ্জলিত হইলাম। ইনিই—ইনিই সর্বনাশের একটি হেতু। ইনি, মাস চারেক পূর্বে স্বর্ণলতাকে যখন কীর্তিহাট হইতে কলিকাতা আনা হইয়াছিল, তখন কীর্তিহাটে গিয়া দেবেশ্বরকে অঞ্জনার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

এস ডি ও সাহেবের পত্নী মেমসাহেব, সভ্যা রমণী, তিনি শুনিয়েছিলেন, অঞ্জনা দেবেশ্বরকে অসভ্য কথা শিখাইতে ছিল। শুধু তাঁহাকে দোষ দিয়াই বা লাভ কি? তাহার কথায় আমিও তো সায় দিয়াছিলাম। অঞ্জনাই দেবেশ্বরকে মানুষ করিত। তাহারই অনুগত ছিল সে। তাহার কোল ছাড়া তাহার ঘুম আসিত না। তাহার জন্যই সে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় দেবেশ্বরকে কাঁধে ফেলিয়া পায়চারী করিয়া ঘুমপাড়ানী গান গাহিয়া ফিরিত। মনে পড়িল এই ছড়াটাই সে বেশী গাহিত—"সে যদি তোমার মা হ'ত', ধুলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিতো!"

মাস পাঁচেক আগে শাশুড়ী ঠাকুরণ স্বর্ণলতার অন্তর্বত্নী অবস্থায় শরীর খারাপ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন অঞ্জনা দেবশ্বরকে কি কয়েকটা অশ্লীল কথা বলিয়াছিল—অশ্লীল এই অর্থে যে, হনুমান দম্পতির সঙ্গম দেখিয়া দেবেশ্বর অঞ্জনাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—পিসী দেখ—দেখ কি হইতেছে। অঞ্জনা হাসিয়া ফেলিয়াছিল। এবং ব্যাপারটা তাহাকে অশ্লীলভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছিল—এমন সবাই করে বাবা। স-বা-ই করে। তাহার পরও অনেক কথা। কথাটা শাশুড়ী ঠাকরুণ শুনিয়া স্বর্ণলতাকে বলিয়াছিলেন, স্বর্ণলতা আমাকে বলিয়াছিলেন। এবং শাশুড়ীই জেদ ধরিয়াছিলেন—কলিকাতায় যাইতেছে, সেখানে সাহেববাড়ীর সুদক্ষ আয়া নিযুক্ত করা হউক দেবেশ্বরের জন্য।

কলিকাতায় আসিয়া তাহাই হইয়াছে, সাহেববাড়ীর আয়া আসিয়াছে। দেবেশ্বরেরও তাহাকে বেশ পছন্দ হইয়াছে। তাহার সাজগোছ বিধিব্যবস্থা সত্যই ভাল। অঞ্জনা তাহাতে কাঁদিয়াছিল। তাহার পরই এই সর্বনাশের, রায়বাড়ীতে এই কলঙ্ক লেপনের সূত্রপাত। কখন কি করিয়া সে ওই দুর্দান্ত আলফানুসোকে দেখিয়াছিল কি করিয়া যোগাযোগ করিয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। পাঁচ মাস প্রায় কলিকাতা আসা হইয়াছে—অঞ্জনাকে সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছি। অঞ্জনার স্বামী একটা ব্রাত্য রমণী লইয়া ব্যভিচারপ্রমত্ত হইয়াছে সুতরাং তাহাকে জোর করিয়াই লইয়া আসিয়াছিলাম।

মাস দুয়েক পরে, অর্থাৎ আজ হইতে তিন মাস পূর্বে প্রথম আমার নজরে আসিল অঞ্জনা আলফানুসোর সহিত দূর হইতে হাস্য বিনিময় করে। চোখে পড়িল আমারই। কয়েকদিন হইতে দেখিতেছিলাম—আলফানুসো হঠাৎ যেন অতিরিক্ত হাঁকডাক শুরু করিয়াছে এবং দারোয়ান-দের কুস্তীর আখাড়াতেও কুস্তী লড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদেরও বাহার বাড়িয়াছে এবং সে এই বাড়ীতে বেশীক্ষণ কাটাইতেছে। তাহার ডিউটি নামমাত্র—একবার সকালে আসিয়া প্রথমে ঘোড়াগুলাকে দেখে, এবং সেগুলাকে টহল দেওয়ায়। তারপর বন্দুক ও কার্তুজগুলা গুনিয়া দেখিয়া কলিকাতা দপ্তরের ম্যানেজারকে 'সব ঠিক হ্যায়' বলিয়া সেলাম বাজাইয়া চলিয়া যায়। আবার অপরাহ্ণে আসে। তখন কাজ যৎসামান্যই। আর কাজ পড়ে,

কোন গাড়ী কারখানায় গেলে। সেখানে মেরামতের কাজ দেখিয়া আসে। বাড়ীতে মেরামত-যোগ্য হইলে সে নিজেই খুলিয়া তাহা করিয়া ফেলে। তবে আমি তাহা ঠিক পছন্দ করি না। কারণ যত অস্পৃশ্য চর্বির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে কোথা যে কোন স্পর্শদোষ কিভাবে ঘটে তাহা কে বলিতে পারে ?

এবার তাহার এই উল্লাসময় পরিবর্তন দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, আলফান্সো বোধহয় আবার কোর্টশিপ করিতেছে। রবিনসনের কুঠিতে গোয়ানপাড়ায় পিক্রুজের যে একটা সৎ-বোনকে লইয়া গিয়াছিল—সে মেয়েটা, আলফান্সো পর্তুগালে চলিয়া গেলে অন্য একনজকে বিবাহ করিয়াছে। আলফান্সো পর্তুগালে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু কি কারণে তাহাকে ডাই-ভোর্স করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সেই কারণেই এরূপ ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দৃষ্টি যে রায়বাড়ীর অন্দর ভেদ করিয়া অঞ্জনার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেমন করিয়া বুঝিব ? একজন হিন্দু নারী, ব্রাহ্মণকন্যা তাহার এমন মতি হইতে পারে কি করিয়া বুঝিব ? অবশ্য সমাজে গুপ্ত ব্যাধির মত ব্যাধি আছে। ব্যাধি, বড়বাড়ী ছোটবাড়ী বাছে না। বড়বাড়ীর বড় শিক্ষাকেও ব্যর্থ করিয়া নানা অনাচার ঘটায়। কাশীধামে থাকিতে ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া আসিয়াছি। ঘৃণা করিয়াছি। কিন্তু কখনও ভাবি নাই যে এমন কিছু আমার বাড়ীতে ঘটিতে পারে। অন্য জমিদারের বাড়ীতে ঘটে। জমিদার, ব্যবসাদার, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল এ পাপ যেখানে সূচীছিদ্র পথ পায় সেইখানেই প্রবেশ করে।

অন্যে পরে কা-কথা, দেবতাদের গৃহেও ঘটে।

ইন্দ্র গুরুপত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন, অহল্যা পাষাণী হইয়াছিল। চন্দ্র বৃহস্পতি-পত্নী তারাকে হরণ করিয়া লইয়া পলাইয়াছিল। এবং বৃহস্পতি তারাকে চন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র বুধ-সহ আবার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তবুও আমার বাড়ীর—আমি রত্নেশ্বর—আমার বাড়ীতে এমন ঘটিবে কল্পনাও করিতে পারি নাই। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল ব্যাপারটা। প্রথম পিতৃদেবের আমলের চাকর মনিন্দর এবং দারোয়ানদের ঘর হইতে ছেদী সিং ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং আমাকে তাহা জ্ঞাত করিলে, আমি ব্যাপারটা আড়াল হইতে স্বচক্ষে লক্ষ করিলাম। দেখিলাম ছাদের আলসের উপর ভর দিয়া সে অন্তরালের একটা গলিতে দাঁড়াইয়া পরস্পরে হাসিতেছে, ইঙ্গিত বিনিময় হইতেছে। ছেদীর নির্দেশমত আমি মেথর নির্গত হইবার গলিপথ ধরিয়া আসিয়া আলফান্সোর পিছনে দাঁড়াইয়াছিলাম। আলফান্সো আমাকে প্রথমটা দেখে নাই কিন্তু আলসে হইতে অঞ্জনা আমাকে দেখিয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অদৃশ্য হইয়াছিল। আলফান্সোকে প্রশ্ন করিতে গিয়াও পারিলাম না।

অঞ্জনার আকস্মিক অন্তর্ধানে হতচকিত আলফান্সো ফিরিয়া আমাকে দেখিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমি ধর্ ধর্ বলিয়া চীৎকার করিতে পারিলাম না। কারণ, মুহূর্তে কারণটা এমনই বৃহদাকার ও কুৎসিত হইয়া উঠিবে যে—যাহা শুধু অঞ্জনাকে লইয়াই হইবে না, কলিকাতার অভিজাত মহলের কাছে রায়বাড়ীর মাথাই হেঁট হইবে। ওই মেথর চলাচলের পথ ধরিয়াই যেমন চোরের মত গিয়াছিলাম তেমনি চোরের মত ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। সারাদিন

ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই কি করিব? আলফান্সোর উপর নিষ্ঠুর ক্রোধ সত্ত্বেও চুপ করিয়াছিলাম, লোকটা এখনি যদি নীলকর সমাজে গিয়া সব ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দেয়, তবে সর্বনাশ হইবে।

ইংরেজ জাত অতি ভয়ানক জাত। এমনিতে সে ভদ্র, ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু ইংরাজের এক বিন্দু রক্তের জন্য সে কি না পারে?

ওঃ! সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিয়া শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্রদের, হুমায়ুন বাদশাহের কবর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, খুনী দরওয়াজায় ফাঁসী দিয়া দেহগুলিরও সৎকার করিতে দেয় নাই। ইহারা সব পারে। কাশীতে বালকদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে দেখিয়াছি। পা কাটা ছেদী আজও আমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে।

ডাকিয়া তিরস্কার করিলাম অঞ্জনাকে। আশ্চর্য! অঞ্জনা সেদিন যে উত্তর দিয়াছিল তাহাতে শুধু স্তম্ভিতই হই নাই। তাহার ঠিক উত্তরও খুঁজিয়া পাই নাই।

শুধু কয়েকদিন ধরিয়াই ভাবিয়াছিলাম—অপরাধ কি আমার?

অপরাধ ধর্ম অনুসারে আমার নিশ্চয় নয়, তবুও নিজেকে অপরাধী না-ভাবিয়া পারি-নাই। হ্যাঁ, অঞ্জনাকে আশ্রয় দিয়া আমার নিজের কাছে আমি রাখিয়াছি। নিজের জন্য রাখিয়াছি। স্বর্ণলতার জন্য ঠিক নহে। তাহাকে প্রশ্রয়ও আমি দিয়াছি। ইহা স্বীকার করি। কিন্তু পাপ অভিপ্রায় আমার ছিল না। তাহার কল্যাণের জন্য রাখিয়াছিলাম এবং আমার তাহাতে আনন্দ বলিয়াও রাখিয়াছিলাম। আমার এই আনন্দ তাহার মনে আশা উদ্রিক্ত করিয়া থাকিবে। হাঁ, ইহা স্বাভাবিক।

অঞ্জনাকে এইজন্যই শাস্তি দিতে পারি নাই।

আলফান্সো সেই দিন হইতে আর আসে নাই। আমি সন্ধানের জন্য গোয়ানপাড়ার পিদ্রুজকে লাগাইয়া জানিলাম, সে ভীত হইয়াছে। এবং বলিতেছে—সুযোগ পাইলেই সে কলিকাতা হইতে গোয়া পলাইয়া যাইবে। যাইবার পূর্বে তাহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে—সে নীলকরদের পত্র লিখিয়া রবিনসন বৃত্তান্ত জানাইয়া দিবে। ইহাই অনুমান করিয়াছিলাম।

অবশ্য কলিকাতায় বা বৃটিশ এলাকায় থাকিতে সে ইহা পারিবে না। তাহা হইলে মামলায় তাহাকেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আমারও হাঙ্গামা কম হইবে না। কিন্তু আমার অর্থ, আমার সম্মান, গভর্ণমেণ্ট ঘরে আমাদের রেকর্ড—এ সমস্তই আমার সহায়। আমার অনুকূলে। আমি তাহাতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইব।

তথাপি গোয়ানপাড়ার পিদ্রুজকে বলিলাম—তাহাকে বলিও, এরূপ করিবার চেষ্টা করিলে একজন ইংরাজকে দিয়াই আমি তাহাকে শেষ করাইব। এবং আমিই তাকে ধরাইয়া দিব। তদপেক্ষা তাহাকে বল—আমি আবার তাহাকে কিছু টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। সে চিরদিনের মত বৃটিশ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাউক। প্রস্তাবে সে রাজী হইয়াছিল এবং এ্যাটর্নী বাড়ীতে নগদ টাকা লইয়া এ্যাটর্নীদের তৈরী একখানি কনফেশন পত্রে সই করিয়া দিয়াছে এই পরশু তারিখ।

আর আজ—আজ দেখিতেছি অঞ্জনা নিরুদ্দেশ।

কাহার সহিত নিরুদ্দেশ ইহা কি আমার নিকটেও প্রশ্ন ? না, ইহা আমার নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট। বক্ষের অভ্যন্তর যেন আগ্নেয়গিরির মত প্রধূমিত।

শাশুড়ীকে দেখিয়াই আমার সর্বাঙ্গ যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইনি—ইনি—ইনিই অঞ্জনার অন্তর্ধানের প্রথম কারণ। ইনিই। এই কলিকাতার আধাব্রাহ্ম, এস-ডি-ও সাহেবের মেমসাহেব, ইনিই প্রথম কারণ। দেবেশ্বরকে অঞ্জনার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন ইনি। সায়েববাড়ীর আয়া আনাইয়া রাখিয়াছেন ইনিই। ইঁহারা স্বামী এবং স্ত্রী—উভয়ে যত বয়স হইতেছে, ততই বেশী করিয়া সাহেব-মেম হইয়া উঠিতেছেন। আমার শ্বশুরই পরামর্শ দিয়াছিলেন আলফান্সোকে মাহিনা দিয়া রাখিবার জন্য। হাজার হউক একজন গোয়ানীজ ফিরিঙ্গী, শাদা চামড়া চাকর থাকিবে। শিকার করিবার সময় সাহেবদের মনোরঞ্জন করিবে, তাহা ছাড়া লোকটার মুখ যখন বন্ধ করার প্রয়োজন, তখন তাহাকে নিশ্চয় রাখিবে।

আজ তাহার ফল ফলিল। যাহা হইবার হইয়া গেল। যে পত্রখানি অঞ্জনার শয্যার উপর পাওয়া গিয়াছে, সেই পত্রখানি লইয়া এস-ডি-ও সাহেব-দুহিতা, কীর্তিহাটের বিদ্যাবতী বধূঠাকুরাণী বলিলেন—দেখ, অঞ্জনার কীর্তি দেখ।

এস-ডি-ও মেম বলিলেন—আমি জানিতাম, আমি জানিতাম। সেদিন দেবেশ্বরকে যাহা বলিতেছিল, তাহা হইতেই আমি এমনি একটা কিছু অনুমান করিয়াছিলাম। দারুণ ক্রোধে আমি পত্রখানা হাতে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এবং স্থির করিলাম শ্বশুরকে লিখিব যে, এই ধরনের ঘন ঘন কন্যার বাড়ী আসাটা তাঁহার মেমসাহেবের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হইতেছে।

আমি পত্রখানা পড়িলাম—"আমি আলফান্সোর সঙ্গেই যাইতেছি। তোমাদের অনেক খাইয়াছি পরিয়াছি, অনেক দিয়াছ ; গহনা কাপড় ; আর কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি, কায়দাকানুন শিখিয়াছি। এবার ক্রশ্চান হইব। ইংরাজী শিখিব। খাঁটি মেমসাহেব হইব। স্বেচ্ছায় যাইতেছি। এবং লাটসাহেবের কাছে জানাইতেছি যে, আমি ক্রশ্চান হইতে চাই কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনেরা বাধা দিতে পারেন বলিয়া হুজুর লর্ডবাহাদুরের শরণাপন্ন হইতেছি।"

সুরেশ্বর বললে—এরপর ডায়রী লিখবার সময় রত্নেশ্বর রায় যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। তখন লিখছেন—"ইচ্ছে হচ্ছে আজই লক্ষ টাকা লাগিলেও খরচ করিয়া আলফান্সোকে হত্যা করাইব। ওই গোয়ানপাড়ার পিক্রুজকে দিয়াই হত্যা করাইব। লোকটাকে কোনমতে মুখ বাঁধিয়া তুলিয়া আনিয়া প্রথমে আঙুল কাটিব, তারপর চোখ দুইটা গালিয়া দিব, তাহার পর জিভটা কাটিয়া দিব। এবং কানেও বধির করিয়া দিব। হত্যা করিব না।"

আবার লিখেছেন—"অঞ্জনাকে পাইলে তাহাকে অন্য শাস্তি দিব না। তাহাকে টাকাপয়সা সাজ-পোষাক দিয়া সাজাইয়া গরাণহাটা সোনাগাজি অঞ্চলের বারবনিতা সাজাইয়া বলিব —এই পথ ছাড়া তোমার পরিতৃপ্তি হইবে না। ইহাই তোমার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আমার অভিষেকের দিন একরূপ সংকল্প করিয়া তোমার ভার লইয়াছিলাম। সুতরাং ইহা হউক পাপের পথ, এই পথেই তোমাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া কর্তব্য পালন করিতেছি। তাহার কামার্ত-

তার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে বহুভোগ্যা করিয়া ছাড়িয়া দিব। বলিব প্রেতিনী তুমি—এই পিণ্ডেই তোমার তৃপ্তি। তাহাই গ্রহণ কর।"

তারপর আবার লিখেছেন—"ইচ্ছা হইতেছে আলফানসোকে টাকা দিয়া ওই আলফনসোভুক্তা স্বৈরিণীকে আনিয়া কীর্তিহাটে সিদ্ধপীঠতলায় বলিদান দিই। এবং মাংস টুকরা টুকরা করিয়া ছড়াইয়া দিই। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, কুক্কুর-শৃগাল, শকুনি-গৃধিণীরা খাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিক।"

ডায়রীতেই আছে—পরপর তিন দিনের ডায়রীতে যা রয়েছে, সে যেন কোন হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যাওয়া মানুষের ডায়রী। মধ্যে মধ্যে অজস্র কাটাকুটোর চিহ্ন। তার মধ্যে পেলাম একজন সহিসের পিঠে দশ কোড়া লাগাবার হুকুম দিয়েছিলেন। তিনজন দারোয়ানের জবাব হয়েছিল। কারণ, রায়বাড়ীর দুটো গেটে দু'জন পাহারা ছিল আর একজন হাতার মধ্যে টহল দিয়ে ফিরেছিল। এর মধ্যে থেকেও যখন অঞ্জনা পালিয়েছে, তখন প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব তাদের। কিন্তু তারা কিছু বলতে পারেনি। বলবে কি, জানতেও কিছু পারেনি, কারণ সদর কোন পথে অঞ্জনা অদৃশ্য হয়নি, সে অদৃশ্য হয়েছিল মেথর যাওয়ার গলি-পথটার দরজা খুলে, সেই গলি পথে পথে। এবং এসে আলফানসোর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল একেবারে রিপন স্ট্রীটের ধারে। এ-পথ তাকে বাত্‌লে দিয়েছিল গোয়ানপাড়ার পিড্রুজের এক চ্যালা গোয়ান। রায়বাহাদুর খুন করিয়েছিলেন একেই।

কিন্তু তারপর এর জন্য যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেছিলেন সে এক পরমাশ্চর্য সুলতা। পরমাশ্চর্য।

তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন—মানুষের মন যখন নিষ্ঠুর আঘাতে আহত হয়, তখন সে স্বর্গমর্ত-রসাতল পরিভ্রমণ করিয়া ফেরে উন্মত্ত কক্ষভ্রষ্ট উল্কার মত। কোথাও সে আশ্রয় পায় না। কোথাও আশ্রয় পাইলেও, সে তাহা লয় না।

একমাত্র আশ্রয় এবং একমাত্র আনন্দ আত্মনির্যাতনে। এইখানেই পরিত্রাণ আছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বহুজনকে বা বিশ্ববাসীকে যাহারা দগ্ধ করে, হত্যা করে, তাহারা দানব বা দেবতা। আমি মনুষ্য। আমি স্থির করিলাম—আমার সর্বাপেক্ষা বিলাসের সামগ্রী তাম্রকূট সেবন আমি ত্যাগ করিব।

সুলতা বললে—কিন্তু দেবতা বা দৈত্যের চেয়েও এ-মানুষ ডেঞ্জারাস।

হেসে সুরেশ্বর বললে—ওখানে আমার কোন বাদ-প্রতিবাদ নেই। কিন্তু যে-কথা থেকে এত কথা বললাম সুলতা; সেইটে বলে নি। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সেই রাত্রে আমার মনও এমনি করে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বা স্বর্গ-মর্ত-রসাতল ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রসাতলে টানছিল হিলডার চীৎকার।

সে কি অমানুষিক গোঙানী।—

ওই গোঙানী শুনে বিরক্তই হচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, হেঁকে দারোয়ানকে বলে দি যে, হিলডাকে বল চুপ করতে, না হলে বেরিয়ে যাক এখান থেকে। এমন করে চ্যাঁচানো চলবে না।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চক্ষে মনে হচ্ছিল একটি তরুণীর মুখ। আজই ভবানীপুর থেকে ফিরে এসে ওকে দেখেছি। ড্রয়িংরুমে আড়াইশো ওয়াটের বাল্ব জ্বলছিল—তারই পরিপূর্ণ আলোকের মধ্যে দেখেছিলাম কুইনীকে। সেই দিন সকালে, সকালবেলাতেই পাঁশকুড়ায় তাকে দেখেছিলাম, আবার দেখলাম এই রাত্রে ইলেকট্রিক আলোর সামনে।

আশ্চর্য মমতা হয়েছিল তার উপর। গভীর মমতা।

Poor Girl!

ঈশ্বর জানেন, তিনি সাক্ষী, সুলতা, চিত্ত আমার চকিত হয়নি তা নয় হয়েছিল; কিন্তু সে অত্যন্ত নর্মাল ব্যাপার। কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য নারী-পুরুষ চলে পাশাপাশি; ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে; এর মধ্যে যেমন অহরহ একটা মুহূর্তের ভাল লাগায় চকিত তরঙ্গ বর্ষা-রাত্রির জোনাকির মত জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে, ঠিক তারই মত। তার বেশী কিছু নয়। —না, ভুলই বললাম। কুইনী তো জোনাকীর মত হারিয়ে যাবার কেউ নয়। সে থাকে গোয়ানপাড়ায়। তার মায়ের বাপকে রত্নেশ্বর রায় বাড়ী দান করেছেন। নিশ্চয় কোন দেনা ছিল।

সেসব কথা ভেবেই দারোয়ানকে হেঁকে বলতে পারিনি—হিলডাকে বলে দাও, চীৎকার করতে হলে যেন বাইরে গিয়ে করে। বের করে দাও।

কুইনীর শান্ত শ্রীমতী মুখখানিও মনে পড়েছিল। সেটা যেন পুরনো বন্ধনের সঙ্গে একটা নতুন বন্ধনের মত গর্জাচ্ছিল—

দেবেশ্বর রায়ের চিঠি মনে পড়েছিল।

রত্নেশ্বর রায়ের এলিয়ট রোডের বাড়ী দানপত্রের কথা মনে পড়েছিল। বলেছি তোমাকে, সেদিন রাত্রে ভাবনা-চিন্তা আমার যেন স্বর্গ-মর্ত-রসাতল ঘুরে বেড়াচ্ছিল ধূমকেতুর মত অথবা নতুনকালের প্লেনের মত। কখনও ভাবছিলাম—দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কখনও ভাবছিলাম—সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়ে রায়বংশের সকল ঋণ শোধ করার কথা। অর্থাৎ চিন্তার প্লেনটা এখুনি ল্যাণ্ড করে আবার রানওয়ে ধরে ওমাথায় গিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল। আবার ঘুরে এসে নামছিল। কিন্তু রসাতলের দিকে যখন ওই হিলডাকে উপলক্ষ্য করে কুইনীকে লক্ষ্য করে নেমে যাচ্ছিলাম, তখন যেন ইঞ্জিনটি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বিকল হয়ে গেছে, একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে।

হ্যাঁ সুলতা, তুমি যা ভাবছ তাই।

কুইনীকে দেখে সেদিন আমি সত্য সত্যই যেন মুগ্ধ এবং মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে আলাপ যখন হয়, তখন তার মধ্যে তোমার শ্রী, তোমার রূপও ছিল। কিন্তু এর চেয়েও বড় ছিল তোমার মনের আকর্ষণ।

কিন্তু কুইনীর আকর্ষণের মধ্যে তার শ্রী-রূপ ছাড়াও একটা কিছুর আকর্ষণ আমাকে আগুনের শিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি করেই আকর্ষণ করছিল।

সুরেশ্বর যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎ উঠে গিয়ে সে ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীটের দিকে কাচের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেছে সেদিনের কথা।

আজ ১৯৫৩ সাল। সেদিন ছিল ১৯৩৭ সাল। সেদিনের চঞ্চলতা যেন আজও তার স্মৃতিকে এবং স্মৃতির সঙ্গে মনকে খানিকটা অস্থির করে তুলেছে। বাইরে নভেম্বরের রাত্রে কলকাতার রাস্তা দোকান আইন সত্ত্বেও জমজমাট রয়েছে। পথে জনতা চলছে। এ-জনতা সারাদিন যারা খাটেখোটে, পেটের ধান্ধায় ফেরে তারা ঠিক নয়। অবশ্য পেটের দায় সব সময়ই আছে। গভীর রাত্রে যে-হতভাগিনী দেহ বিক্রীর আশায় রাস্তার কোন কোণে দাঁড়িয়ে থাকে, সে পেটের দায়েই থাকে। কিন্তু তার থেকেও বেশীসংখ্যক থাকে অন্য একদল মানুষ। যারা রাত্রিকালে জীবনের উন্মত্ত নেশায় পাগলের মত বের হয়। নারীদেহের পর নারীদেহ ভোগ করে যাদের তৃপ্তি হয় না। কেন হয় না তা তারা তো জানেই না। অন্যেও জানে কিনা বলতে পারে না সুরেশ্বর। তবে ব্যাধি বললে মিটে যায় এক কথায়।

আজ তার মনে পড়ল কুইনীকে। সেদিনের কুইনীকে। যার জন্য সেদিন ১৯৩৭ সালের শীতের রাত্রে সে পায়চারি করেছিল এবং পেডি ডগলাস বার্জ মার্ডার কেস, অতুলেশ্বরের কেস, ১৮৮৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে দেবেশ্বর রায়ের অংশগ্রহণ থেকে হিলডার চীৎকারে সে যে কুইনীর চিন্তায় এসে পড়েছিল, সেই কুইনীকে আজ আবার মনে পড়ল। কুইনীর সেই আকর্ষণ আজ তার মনে পড়ছে।

সুলতা প্রশ্ন করলে—কি হল? বস! না, ক্লান্তিবোধ করছ? কিম্বা—?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুলতা উঠে গিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে ডেকে বলেছিল—সুরেশ্বর—

—সুলতা।

—তাহলে কি—তুমি সেইদিন—সেই—সেই—।

বাধা দিয়ে সুরেশ্বর বললে—না-না-না। ছিঃ। এতখানি ছোট তুমি আমাকে মনে কর না সুলতা!

সেদিন আমি সমস্ত রাত্রি ঘুমুইনি। কিন্তু সে শুধু কুইনীর তাড়না নয়। আরও ছিল। বলেছি তোমাকে। ১৯৩৭ সাল। ১৯৩০ সাল থেকে পেডি ডগলাস বার্জ মার্ডার যেখানে হয়েছে, সেই মেদিনীপুরে তখন থাকতাম আমি। অতুলকাকা ধরা পড়েছে। মেজদিদি অর্চনাকে বাঁচাতে ধরা দিয়েছেন, জেল খাটছেন। বিমলেশ্বরকাকা ওই কাণ্ড করেছেন। আগের দিন রাত্রে অন্নপূর্ণা-মাকে দেখেছি, ফিরবার সময় ময়দানে তখনও জায়গায় জায়গায় লোক জমায়েত দেখেছি। সেদিন কেউ তাই পারে? না, তা নয়। তবে হাঁ, তার আশ্চর্য আকর্ষণ আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম। আশ্চর্য! অর্চনা, মেজদি, অতুলেশ্বর, বিমলেশ্বর এরা চারজনে চারদিকে ঘিরে আমাকে বোধহয় বাঁচিয়েছিল সেদিন।

নীচে হিলডা চীৎকার করেছে, আমি ঠিক এইখানে এই কাচঘেরা বারান্দায় পায়চারি করেছি, কখনও দাঁড়িয়ে থেকেছি। ইচ্ছে হয়েছে নীচে যেতে কিন্তু পারিনি। তার কারণ ওই চারজন। এবং আরও একজন—সে হল রঘু চাকর। সে তো আমি না ঘুমুলে ঘুমোয় না। পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল এরা।

যেন বলেছিল—না-না-না। নীচে নেমো না। নামতে গেলে বাকি থাকবে না। নতুন

কাল এসেছে। পাল্টেছি, পাল্টাচ্ছি, রায়বাড়ীর আমরাও পাল্টাচ্ছি। এসময় আর নীচে নেমো না।

কথাগুলো শুনতে বোধহয় তোমার সেন্টিমেন্টাল বা ইমোশনাল মনে হচ্ছে, তা হতে পারে। এবং সত্যও তাই। কিন্তু এই সেন্টিমেন্ট আর ইমোশন এই দুটোই সংসারে অঘটন ঘটায়, চিরকাল ঘটিয়ে আসছে, আজও ঘটাচ্ছে, সেদিনও ঘটিয়েছিল।

কুইনী একলা জেগে বসে আছে, তা যে-কেউ অনুমান করতে পারে। হিলডার ওই চীৎকার এবং যন্ত্রণা দেখে সে নিশ্চয় ঘুমোয়নি।

ভোরবেলার দিকে হিলডার চীৎকার একটু কমে এসেছিল—আমারও একটু তন্দ্রা এসেছিল। রঘু আমাকে ডাকলে।

—লালবাবু!

তন্দ্রা ভেঙে গেল। বললাম—কি? এখন চা খাব না, যা।—

রঘু বললে—না লালবাবু, ওই গোয়ানপাড়ার ওই লেড়কীটি—ওই কুইনী আপনের সাথ দেখা করনেকে মাংছে। হলদী বুড়ীর বহুৎ বেমার।

চমকে উঠলাম। কুইনী?

—হাঁ লালবাবু, ছোকরী কাঁদছে।

—কাঁদছে? কোথায়?

—সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বললে—রাত্রে আরও দু'-দুবার সে বাবুজীর কাছে আসবার জন্যে এসেছিল কিন্তু ডাকতে সাহস করেনি।

আমি চমকে উঠলাম। কুইনী রাত্রে আরও দুবার আসতে গিয়ে ফিরে গেছে? বুকটাও কেমন করে উঠল।

রায়বংশের ছেলে আমি এবং ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদের রাত্রে বলছি তোমাকে; কথাটা তুমি দুই অর্থে ধরে নিতে পার। বুকটা চলকে ওঠার হেতু কিছু ছিল না। কারণ, কুইনী কাঁদছিল, তবু রক্ত। রায়বংশের রক্ত স্খলতা। অথবা বলতে পার মানুষের রক্তের কীর্তিনাশা ধারা। জান্তব-জীবন থেকে উদ্ধার করতে বহু তপস্যা করে মর্তে গঙ্গা এনেছিলেন ভগীরথ। সাগরের কাছাকাছি এসে গঙ্গা ভুল করে পথ হারাল। মানুষই তাকে ভুল পথে নিয়ে গেল। অথবা বলতে পার, ওইটেই তো স্বাভাবিক ক্রমনিম্নতা। জলের স্বভাববশে ওই পথেই তো যাবার কথা। তাই গিয়েছে। তবে বিষ্ণুপদের মহিমা আছে, সেখান থেকে ঝরা জল; তেমনি মানুষের সাধনারও মহিমা আছে, সেই সাধনার বলে কীর্তিনাশাকে বাঁয়ে সরিয়ে পতিতোদ্ধারিণী সাগরসঙ্গমে গেছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব—গত দশ-বারো বছরের যুদ্ধ, কালোবাজার, তারপর স্বাধীনতার পর আমাদের বিজয়াদশমীর দিনের মদ খেয়ে উন্মত্ত উলঙ্গ নৃত্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব কিছুটা থাকে, মরে না, একবারে মরে না। সেদিনও আমার মনুষ্যত্ব ছিল। রায়বংশের রক্ত হলেও তার মধ্যে বেঁচে ছিল।

ঘরের দরজা খুলে দেখলাম কুইনী দাঁড়িয়ে আছে, চোখদুটি রাঙা, বুঝলাম অনেক কেঁদেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে কুইনী?

—বুড়ী দিদিমা—আর বলতে পারলে না।

—কি হল? সারারাত্রি তো চীৎকার করছিল। এই তো কিছুক্ষণ আগেও শুনেছি।

—হ্যাঁ স্যার। কিন্তু হঠাৎ মুখ খুলতে পারছে না—গোঙাচ্ছে। কি রকম হয়ে গেছে।

—চল দেখি। ভয় কি, একটু বেলা হলেই ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি। আসবে দেখবে ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাবে। হাঁটুটা বোধহয় পেকে উঠে থাকবে।

—হ্যাঁ খুব ফুলেছে।

ঠিক এই সময়েই একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঢুকল বাড়ীর ফটকের মধ্যে। এই মুহূর্তেই এলেন অন্নপূর্ণা-মা। অবশ্য আমি সঠিক অনুমান করতে পারিনি যে, এ একেবারে খোদ অন্নপূর্ণা-মা এবং রথীন। তবে ভেবেছিলাম, কম্পাস গাড়ী যখন, তখন এ ভবানীপুরের মুখুজ্যেবাড়ীর গাড়ী। হাইকোর্টে ১৯৩৭।৩৮ সালেও এক ঘোড়া দিয়ে টানা পালকিগাড়ীর অনেক ভিড় ছিল। ওদের বাড়ীতে যখন ঢুকি বিকেলবেলা, তখন গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল। কাল ঘোড়াটার কপালে সাদা দাগটা ভাল লেগেছিল বলে চেনা হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ীটা দাঁড়াল, আমি চমকে উঠলাম। একি, ভিতরে খোদ অন্নপূর্ণা দেবী, বড়-মা? আর ও কে? রথীন?—

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়ীটার পাদানের সামনের অংশটা খুলে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—বড়-মা!

চিবুকে হাত দিয়ে হাত মুখে ঠেকিয়ে বড়-মা বললেন—প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কাশী যাব ভোরে উঠে। ও-বাড়ীতে আর থাকব না। মা যে-বাড়ীতে দেহ রেখেছেন, সেই বাড়ীতে দেহ রাখব। ওরে মাঝরাতে দেবু এসে যেন আমাকে ডাকলে। সেই বাঁকা বাঁকা হেসে বললে—হেরে গেলে তো! আমার মত পিসী হারতে হয়। জেতা যায় না গো। আমি উঠে বসে ঝি চাকরদের ডেকে জিনিস গুছাতে বললাম—আমি হার মানব না। চলে যাব কাশী।—কিন্তু ভোরবেলা রথীন গোলমাল লাগালে। পায়ে জড়িয়ে ধরে বললে—হ্যাঁ, আমি বিয়ে করব, করব, করব। তুমি বাড়ী ছেড়ে যেয়ো না।

গোলমাল হয়ে গেল সব। তা বললাম—আগে চল তাহলে গঙ্গাস্নান করে আসি রাণী রাসমণির ঘাটে, আর বলে আসি সুরেশ্বরকে।

বলতে বলতে নামলেন তিনি। আমার ঘাড়ের উপর হাতের ভর দিয়ে। আশী বছরের কাছে বয়স কিন্তু বড়-মা বেশ শক্ত ছিলেন। চোখে তাঁর চশমা লাগত না। তাঁর পিছনে পিছনে রথীন। রথীনকে পেয়ে বেঁচে গেলাম। অর্চনার সমস্যার সমাধান তো হলই, হিলডাকেও দেখাতে পারব। সে ডাক্তার।

বড়-মা নেমেই বললেন—তোর মায়ের ঘরে চল। যে-ঘরে তোর মা শেষকালটা থাকতো। আমি শুনেছি, আমি তোদের সব খবর নিই রে, বিশেষ করে দেবুর গুষ্টীর। তোর মা বড় পবিত্রভাবে থাকত। সেই ঘরে চল। বলতে বলতেই তিনি বললেন—এ-মেয়েটি কে রে?

অর্থাৎ কুইনী। সকালের সদ্য-ওঠা রোদটা কুইনীর মুখের উপর পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল। তার রুক্ষ চুলের মধ্যে ঈষৎ পিঙ্গলাভা, রঙের মধ্যে চাপা পর্তুগালের রঙের আভাস, কালো চোখ

এবং সে-চোখদুটি তার বিচিত্র ডাগর, আয়ত, পটলচেরা, হরিণচোখ এ-সবের কোনটা না নয় কিন্তু চোখদুটি আশ্চর্য কালো এবং আশ্চর্য গড়ন, বিশেষ করে চোখের পাতার চুলগুলি। এবং সমস্ত জড়িয়ে একটি বিষণ্ণ মহিমা ফুটে উঠেছিল। নির্বাক হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। আমি দেখতে যাচ্ছিলাম হিলডাকে, তাতে বাধা পড়ল, তাতে তার চোখে-মুখে একটি বিরক্তির রেখা ফুটল না। তার দিকে চোখ পড়া স্বাভাবিকই ছিল। রথীনও তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি বড়-মার কথার উত্তরে বললাম—ওদের বাড়ী এখন একরকম কীর্তিহাট বড়-মা। এখানে এসে বিপদে পড়ে গেছে, দিদিমাকে নিয়ে কাল রাত্রে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—

কথায় বাধা দিয়ে বড়-মা বললেন—কাদের মেয়ে গো তুমি—হ্যাঁ মেয়ে?

বিনম্রভাবে নমস্কার করে কুইনী বললে—নমস্কার মা। আমি গোয়ানপাড়ায় ছিলাম। আমি ওদের।—

—গোয়ান? ও মা! গোয়ানরা এখন এইরকম হয়েছে নাকি রে? এঁ্যা? এ যে কলেজে-পড়া মেয়ে-টেয়ের মত! এঁ্যা আগে সেই লম্বা গাউনের মত ঢিলে পা পর্যন্ত জামা পরে ঘুরত—।

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। বললেন—উঁ? কাউকে যেন কিছু প্রশ্ন করলেন। সম্ভবত নিজেকেই।

কুইনী বললে—আমি ওখানকার মেয়ে নই মা। আমি কলকাতার মেয়ে। তবে গোয়ান-পাড়ার ওরা আমাদের আত্মীয়। খুব আপনজন।—

—তাই বল। কলকাতার মেয়ে তুমি।—ওরে রথীন, চশমাটা দে তো। দেখ তো ওই ভিজে কাপড়ের ঝোলাটার মধ্যে থাকবে। দে তো!

চশমাটা চোখে দিয়ে খুব ভাল করে কুইনীকে দেখতে লাগলেন। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম সুলতা। আমার পাপবোধই বল আর যাই বল মনে হচ্ছিল অন্নপূর্ণা দেবী মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজছেন—হয়তো বা আমারই স্পর্শের ছাপ বা চিহ্ন কিছু খুঁজছেন।

সেইজন্যে আমিই কৈফিয়ৎ দিলাম নিজে থেকে—মেয়েটির মায়ের দরুণ একটা বাড়ী ছিল কলকাতায়, সে-বাড়ী নাকি আমাদেরই দান-করা ওদের পূর্বপুরুষকে। সেই বাড়ীতে থাকত ওরা। ওর বাবা ছিলেন আমাদের দেশী খৃষ্টান—মুখার্জি; ওর মা ছিলেন গোয়ান মেয়ে। হঠাৎ দুজনেই মারা গেলেন একসঙ্গে বছর-দেড়েক আগে, মেয়েটিকে গোয়ানপাড়ার হিলডা পিড্রুজ বলে একটি বৃদ্ধা মহিলা আছেন—

—হলদী? হলদী?—সে তো আমার থেকে ছোট। তা অবিশ্যি এখন বুড়ী হবে বই কি! হলদী বলতাম আমরা। ছোট্ট মেয়েটা। সে বেঁচে আছে? আরে কালীপুজোর সময় যখন যেতাম, তখন আসত আমাদের কাছে। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন —হ্যাঁ, দাদা একখানা বাড়ী দিয়েছিলেন ভায়লেট বলে একটা মেয়েকে। সে অনেক কাণ্ড। অনেক।—

আমি চুপ করে শুনছিলাম, উনি থামতেই বললাম—ওদের সেই বাড়ী জ্যাঠামশায়ের তরফ

থেকে ও'র ছেলেরা ওদের বেদখল করে দিয়েছে। ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া তারা আদায় করছে। খবর পেয়ে হিলডা এসেছিল কুইনীকে নিয়ে। তা কাল ঝগড়া করে হাঁকিয়ে দিয়েছে, হিলডাও গালাগাল করেছিল, তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গোটা হাঁটুটা জখম হয়ে গেছে। ছাল-চামড়া তো উঠেছেই, আর কি হয়েছে জানি না। কাল ও-বাড়ী থেকে এসে দেখি ওরা কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এখানে এসেছে। ওই নীচের পূবদিককার একখানা ঘরে আছে। বেচারী সারারাত্রি যা চীৎকার করেছে যন্ত্রণায় যে, সে আর বলবার নয়। তাই সকালেই মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল খবরটা বলতে। তা রথীনবাবু এসেছেন ভালই হয়েছে। একবার দেখুন তো ভাই কি হয়েছে।

—টিটেনাস-ফিটেনাস নয় তো? ক'ঘণ্টা হল? মানে চোটটা লেগেছে কখন?

কুইনী এবার বললে—কাল বেলা তিনটের সময়। দিদিয়া বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করছিল—রায়বাবু ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন উঠোনের উপর।

বড়-মা ফোঁস করে উঠলেন—রায়বাবু?—কে?—কোন্ রায়বাবু?

কুইনী উত্তর দিলে না, আমি বললাম—প্রণবেশ্বরদা। জ্যাঠামশায়ের ছেলে।

—যজ্ঞেশ্বরের ছোট ছেলেটা—রাস্তার উপর যেটার গাড়ী আটকে কান মলে কাচ্ছি কয়লা-ওলারা গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে দেনার জন্যে গাড়ী কেড়ে নিয়েছে, সেইটে?

আমি চুপ করে রইলাম।

বড়-মা বললেন—তুই যা রথীন, হলদীকে দেখে আয় কি হয়েছে। না, দাঁড়া আমিও যাব। একবার দেখব হলদীকে।

* * *

এই ধরনের সারারাত্রি চীৎকারের জন্য হলদীকে দোষ দেওয়া যায় না। বেচারার হাঁটুটা একেবারে ফুলে এবং পেকে যেন ঢোল হয়ে উঠেছিল। সারারাত্রি চীৎকার করে ভোরবেলা বুড়ী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে জেগে উঠে আবার চীৎকার শুরু করে দিলে। রথীন দেখতে গেল তার ক্ষতটা, তাতে আতঙ্কিত হয়ে ছোট মেয়ের মত হাউ-মাউ করতে লাগল।

কুইনী তাকে বোঝালে—এমন করে না দিদিয়া। ডাক্তারবাবুকে দেখতে হবে তো। কিন্তু সে-কথা শোনে কে? এবার ঘরের ভিতর ঢুকলেন অন্নপূর্ণা-মা। ধমক দিয়ে বললেন—এই হলদী। কচি খুকি নাকি তুই? এঁ্যা! ছেলেবেলার সে-অভ্যেস তোর দেখছি এখনও যায়নি। চুপ কর।

হলদী অন্নপূর্ণা-মাকে দেখে কেমন হয়ে গেল। সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। এবং চুপ করেই চেয়ে রইল। রথীন হাঁটুর ক্ষতটা বেশ ভাল করেই দেখলে একবার দুবার নাড়লেও, তবু হিলডা যেন তা খেয়ালই করলে না, সে চেয়ে রইল অন্নপূর্ণা-মায়ের মুখের দিকে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—পছহানতে পারিস?—আঁ? পারছিস না?

হিলডা বললে—মালুম হচ্ছে কি চিনি আপনাকে, লেকিন—

—ঠিক ঠাওর করতে পারছিসনে? না? রায়বাহাদুর হুজুরের আমল মনে পড়ে? এঁ্যা? উঠে বসতে চেষ্টা করলে হিলডা। তার ফলে চাড় পেয়ে হাঁটুর ফুলোর যে-অংশটা আংশিক-

ভাবে পেকেছিল, তা ফেটে গেল। চীৎকার করে উঠল হিলডা।

রথীন বললে—গরম জল করে আন। এখন ধুয়ে দাও। টিংচার-আইডিন থাকলে খানিকটা দিয়ে দাও তাতে। তারপর আমি বরং কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দেব, সে পরিষ্কার করে দিয়ে ড্রেস করে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

আমি কুইনীকে বললাম—তুমি যাও কুইনী, রঘুকে বল—সে জল গরম করে দেবে। টিংচার আইডিনও থাকতে পারে।

অন্নপূর্ণা-মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হিলডা বললে—পিসী রাণীমাঈ!

—হ্যাঁ। পিসী রাণীমাঈ!

হিলডা বললে—এ হি দেখেন পিসী রাণীমাঈ, আপনের সাদীর সময় হামি আপনেকে নাকের টাপ চেয়েছিলাম, এহি দেখেন—এহি সেই টাপ, হামি আজও খুলে নাই। কুইনীকে বললাম—হামি মরব যখুন, তখুন তু খুলিয়ে লিস। ইটা খুব দামী পাথল বটে।

—হ্যাঁ, ওটা হীরে। হাত দিয়ে নাড়ছিলাম, ওটা পড়ে গেল বাগানে। খুঁজে পাওয়া গেল না। একবেলা পর তুই ওটা খুঁজে পেয়ে আমাকে ফেরৎ দিতে এসেছিলি। আমি বলেছিলাম—তুই ওটা নে। ভায়লা বলে সেই মেয়েটা তোকে সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল।

—আপনের সব মনে আছে, আপনের সব মনে আছে। ঠোঁটদুটো তার কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বললে—তব তো আচ্ছা হল পিসী রাণীমায়ী—আপনে বিচার করে দেন। আপনে জানেন। ভায়লাকে নিয়ে গোপাল কলকাতা গেল—।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—হ্যাঁ আমি জানি। আমি শুনলাম, দাদা ভায়লার ছেলেকে বাড়ী দিয়ে গিয়েছিলেন। এলিয়ট রোডের বাড়ী। সেই বাড়ী প্রণবেশ্বর কেড়ে নিচ্ছে। আমি শুনেছি।

—হামাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।

—সেও শুনেছি। চোখে দেখছি। রত্নেশ্বর রায়, ধার্মিক রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুরের স্বর্গসিংহাসন ওল্টাতে ওল্টাতে পড়ছে মাটিতে তাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তুই ভাবিসনে, আমার ছেলে হাইকোর্টের উকিল, তাকে বলে দেব, সে তোদের হয়ে মামলা করে দেবে হাইকোর্টে। বাড়ী তোদের যাবে কোথায়?

একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন—এই মেয়েটি কে হয় ভায়লার?

—ভায়লার? ভায়লার বেটা পিড্রুজ, ওই পিড্রুজ সাদী করলে এক আংরেজ ফিরিঙ্গী লেড়কীকে। একটা বেটী পয়দা হল। ওহি বেটী সাদী করলে এক দেশী কৃশ্চান মুখুর্জিকে। তারই বেটী এই কুইনী।

—ভায়লার বেটার বেটীর বেটী?

—হাঁ!

—হ্যাঁ। তাই দেখলাম। চোখে-মুখে ভায়লার আদল আছে। ভায়লার রঙ ছিল শাদা। এর রঙে কোন মুখুজ্জেবাড়ীর রঙের ছোপ ধরেছে। কিন্তু চোখদুটো একরকম—নাক-মুখ তাও

মেলে। অঞ্জনা-দিদিকে মনে পড়িয়ে দেয়, চুলগুলোও কোঁকড়া। সেই এক ছাঁচ।

কুইনী দুই হাতে তোয়ালে দিয়ে ধরে ফুটন্ত গরম জলের একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচি এনে নামালে।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—ওরে বেটী, একবার মুখ তোল তো, দেখি আর একবার ভাল করে।

একটু অবাক হয়ে গেল কুইনী।

ঠিক অ—। বলে থেমে গেলেন অন্নপূর্ণা-মা। তারপর বললেন—ঠিক তেমনি চোখ, তেমনি চুল। আমার বয়স তখন তো কম নয়। আমার ছয়। দেবুরও ছয়। বউদিদির কোলে একটা মেয়ে হয়ে মারা গেছে। আমার তাকে বেশ মনে পড়ে। কাশী থেকে কীর্তিহাটে আসতাম-থাকতাম, দিনরাত দেবু-আমি ছুটোছুটি করতাম—বউদিদি সামলাতে পারত না। সামলাতো ওই—।

চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন—এ-বাড়ী যদি কেড়ে নেয় যজ্ঞেশ্বরের ছেলেরা তবে—। কি বলব তবে? কি বলব?

রথীন বললে—বড়-মা বড়-মা! তুমি উপরে চল। এখানকার ব্যবস্থা সব হচ্ছে, হবে। চল ওপরে চল।

* * *

উপরে অন্নপূর্ণা-মাকে চেয়ারে বসিয়ে তোলা হল। রথীন আর আমি দুপাশে দুজন উঠছিলাম। হঠাৎ রথীন বললে—রাগলে আর তোমার জ্ঞানগম্যি থাকে না বড়-মা।

অন্নপূর্ণা মা বললেন—ওরে হারামজাদা, যেখানে আমি রেগে জ্ঞানগম্যি হারাই, সে হল আমার খাস এলাকা। বুঝলি! সেখানে আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন ও-কথা যে বলবে, তার মুখে পোকা পড়বে। তোদের সংসার আমার পাতা, আমার মায়ের আশীর্বাদে আর পিসেমশায় বিমলাকান্ত চাটুজ্জের মূলধনে। বুঝলি। নইলে তোদের মূল মুখুজ্জেবংশের পরিণাম তো দেখছিস চোখে। আর এই এ-পাশে এই দেখ সুরেশ্বর; ওদের এতবড় রায়বাড়ী, এত সম্পত্তি, এত চাল, এত চলন, তার পরিণামও দেখছিস। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর আমার ভাই, লোকে বলে তার মত লোক আর হয় না। ধার্মিক, রায়বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, একেবারে কষ্টি-পাথরে নিখাদ সোনা! হায়, হায়, হায়। কি বলব? দেখ, তার বংশের পরিণাম দেখ!

* * *

উপরে মায়ের ঘরে এসে ঘরখানা খানিকটা চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন—সুরেশ্বর, রথীন কাল রাজী হয়েছে বিয়ে করতে। বল রে—বল রথীন।—বল, সুরেশ্বরকে কথা দে।

রথীনবাবু বললেন—আমি কথা দিলাম সুরেশ্বরবাবু, অর্চনাকে আমি বিয়ে করব, করব, করব।

আমি বললাম—বড়-মা, তাহলে কখন বিয়েটা হবে? দিন একটা স্থির করে আপনিই দিন। কলকাতা থেকেই বিয়ে দেব—আপনি যেমন বলেছেন। বিয়ের পর কখনও অর্চনাকে কীর্তিহাটে পাঠাতে বলব না। আর জগদীশকাকার সে সামর্থ্যও নেই। তাঁরা মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হলে এ-বাড়ীতে আসবেন, এসে ইচ্ছে হলে মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করে

খাওয়াবেন বা আপনার বাড়ীতে যাবেন। আপনি যা বলেছেন, তাই হবে বড়-মা। আমরা তাই মানব।

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দেখ, কাল তুই গিয়েছিলি, তোকে একরকম ফিরিয়েই দিয়েছিলাম। আমি নই—ওই রথীন ফিরিয়ে দিয়েছিল। ভোরবেলা উঠে এসে বললে—বড়-মা, আমাকে মাপ কর তুমি, ওই মেয়েকেই বিয়ে করব আমি। চল তুমি, সুরেশ্বরবাবুর ওখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল—একলা যেতে ঠিক আমার পা উঠছে না। তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওসব শর্তের কথা যা বলেছিলাম, তা মানবি—ভালই। তবে ওগুলো আমি একরকম রাগ করেই বলেছিলাম রে! শর্ত কাল যেগুলো বলেছিলাম, তার কড়াকড়ি এক রাত্রেই হাল্কা হয়ে গেছে। কিন্তু শর্ত আজকে দিচ্ছি তোকে। বিয়ে হবে, মেয়ে আমি সাজিয়ে দেব। তুই বরাভরণটা দিস। আর এই বাড়ীতে বিয়ে হবে—ফুলশয্যের তত্ত্ব কলকাতায় একটা বড় ব্যাপার, সেটা ভাল করে করিস। কিন্তু এসব ছাড়া কিংবা এসবের উপরে একটা শর্ত আমি তোকে দিচ্ছি সুরেশ্বর। সেটা তোকে মানতে হবে।

—বলুন বড়-মা, কি মানতে হবে।

—ওই যে নীচে যে-মেয়েটিকে দেখে এলাম, কি নাম ?

—কুইনী।—

—হ্যাঁ। কুইনী মুখুজ্জে। ওর বাড়ী কেড়ে নিয়েছে কোন প্যাঁচপোঁচে ফেলে যজ্ঞেশ্বরের ছেলেরা। ওকে ওর বাড়ী ফিরিয়ে দিতে হবে। মামলা করলে উদ্ধার হয়তো হবে। নিশ্চয় হবে। সাক্ষী তো আমি আজও বেঁচে রয়েছি। দয়াল চোখে অঞ্জনাকে দেখেনি। কিন্তু অঞ্জনার নাম তার কাণ্ডকারখানা, তার জন্মে রায়বাহাদুর একটা গোয়ান ছোঁড়াকে কেটে ভাসিয়ে দিলে এসব দয়াল শুনেছে। জানে।

রথীন অবাক হয়ে শুনছিল—মানে ঠিক বুঝতে পারছিল না। আমি আন্দাজ করছিলাম অন্নপূর্ণা-মা কি বলছেন বা বলতে চাচ্ছেন। আমি তার ডায়রীর এখান-সেখান থেকে পড়েছি, একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত পড়েছি। বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। তবু এইটুকু বিস্ময় বোধ করছিলাম যে, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় অত্যাচারী প্রজাপীড়ক, জটিলবুদ্ধি, মামলাবাজ আইনানুগত্যের মুখোশে মুখ ঢেকে ন্যায়পরায়ণ সেজে ইস্কুল, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক কিছু করেছেন কিন্তু ডায়রীতে মিথ্যে কথা লেখেননি। মধ্যে মধ্যে কথা বাদ দিয়ে গেছেন মাত্র।

অন্নপূর্ণা-মা বলে যাচ্ছিলেন—লোকের কাছে সত্য গোপন থাকে না। অঞ্জনা ছিল সম্পর্কে আমাদের দিদি, দাদার সমবয়সী, তার বিয়ে হয়েছিল এক বাউণ্ডুলের সঙ্গে—

—জানি বড়-মা।

—তুই জানিস ?

—জানি।

—কি করে জানলি ?

—কাগজ ঘেঁটে, রায়বাহাদুরের ডায়রী পড়ে। আপনার বাবার একখানা খাতা আছে—

সেখানা পড়ে।

একটু চুপ করে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তাহলে তো জানিস যে, আলফানসো পিড্রুজ বলে সেই খুনে ফিরিঙ্গীটা অঞ্জনাকে নিয়ে পালিয়েছিল। পালিয়েছিল গোয়ায়। সেখানে অঞ্জনা মারা গেল। অঞ্জনার অসুখের সময় আলফানসো চিঠি লিখেছিল দাদাকে—আমার দাদাকে। দাদা টাকা পাঠিয়েছিলেন হিলডার বাবার হাত দিয়ে। হিলডার তখন জন্ম হয়নি। আমারই বয়স তখন দশ—মনে পড়েছে পিড্রুজ অঞ্জনার মেয়ে ভায়লেটকে নিয়ে ফিরে এল কীর্তিহাট।. শুনলাম, আলফানসো পাগল হয়ে গেছে। পিড্রুজ মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে এখানে। দাদার নাকি তাই হুকুম ছিল।

ভায়লেট তখন তিন বছরের। বাংলা একটু-আধটু বুঝতো। হয়তো অঞ্জনা শিখিয়েছিল। ভায়লেটের চোখ ছিল ঠিক অঞ্জনাদিদির মত।

তারপর—

অনেকক্ষণই চুপ করে থেকে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তখন দাদার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বিয়ের পর টাকা নিয়ে সম্পত্তির দাবী ছেড়ে দিয়েছি। আমার শ্বশুর আমাকে এক-রকম ত্যাগ করেছেন। স্বামী প্রতিবাদ করতে পারেননি। আমি কাশী এসে পিসেমশায়ের মেয়ের মত সংসার পেতে ছেলেকে মানুষ করছি। একদিন খবর শুনলাম, দেবু, দেবেশ্বর তোর ঠাকুরদাদা, বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছে।

সে এই ভায়লার জন্যে। ভায়লেট পিড্রুজের জন্যে।

আমি সে-সময় একবার শ্যামনগর এসেছিলাম। দেবুকে দেখবার জন্যে। দাদাকে বলেও এসেছিলাম—এ দেবুর পাপ নয়। এ তোমার পাপের ফল।

* * *

অন্নপূর্ণা-মা বললেন—দাদা রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। অন্য কেউ হলে তার ঘাড়ে মাথা থাকত না। ধার্মিক দাদা আমার খুন করাতেন অন্য লোককে দিয়ে, তারপর যে খুন হল, তার ছেলেদের জমি-জেরাত-টাকা দিতেন। আবার খুন করে যে ফাঁসি যেতো, তার মামলায় টাকা খরচ করতেন। তার ছেলে-মেয়েদেরও টাকাকড়ি দিতেন। ঠাকুরদাস পাল এমনি একটা কথা বেফাঁস বলেছিল বলে হিলডার বাবা পিড্রুস তাকে খুন করেছিল। সেসব এই ভায়লা মেয়ে-টাকে নিয়ে।

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ হেসে অন্নপূর্ণা-মা বললেন—তবু এমন মানুষ, এমন শক্ত ধার্মিক মানুষ আর হয় না। আমি বললাম—এ তোমার পাপের ফল। দাদা চমকে উঠে বললে—কি বললি অন্নপূর্ণা? এতবড় কথা তুই বললি?

তখন ঠাকুরদাসের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে সদ্য সদ্য।

আমি বলেছিলাম—তুমি বীরেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি মেয়ে। আমি ঠাকুরদাস পাল নই। তোমার বাড়িতে আমি জল পর্যন্ত খাব না।

গুম হয়ে গেলেন প্রবলপ্রতাপ মহিমান্বিত রায়বাহাদুর। একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—হ্যাঁ, আমি তুই ভাই আর বোন। এ-বাড়ীতে তোর যে অধিকার,

আমার সেই অধিকার। এ-বাড়ীর মান-মর্যাদা তুই আদালতে দাঁড়ালে—

বলেছিলাম—থাক। সে-কথা তুলো না। সেখানে পাপ তুমিও করনি, আমিও এমন কিছু ধর্মের ধ্বজা তুলিনি।

—বেশ, তাহলে বলে যা, এতে তুই আমার পাপটা কোথায় দেখলি? ঠাকুরদাস কি বলে আমাকে শাসিয়েছিল তুই জানিস?

অন্নপূর্ণা বলেছিলেন—ঠাকুরদাস মরেছে ছোট মুখে বড় কথা বলে। সে তুমি যা করেছ তাই করেছ। ও যদি পাপ হয়, তবে ও-পাপ না করে তোমার উপায় ছিল না। আমি কাছে থাকলে তোমার কানে কানে বলতাম—দাও, মুখটা একেবারে বন্ধ করে দাও। আমি বলছি, ভায়লাকে দেবেশ্বর ভালবেসেছে, একটা কাণ্ড করেছে বলে তুমি লাফাচ্ছ, বলছ—ছেলের মুখদর্শন করব না। তুমি ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা করে দিয়ে কীর্তিহাট এসে বসে আছ। ঠিক কথা। খুব পুণ্যিবানের কথা। কিন্তু কই বলতো অঞ্জনাদিদিকে তো মা-বাবা এখানে ঘড়বাড়ী দিয়ে ওর স্বামীকে শুদ্ধ চাকরি দিয়ে সংসারী করে দিতে চেয়েছিলেন। তুমি সেসব করলে, বাড়ী দিলে, জমি দিলে, ওর বাউণ্ডুলে স্বামীটাকে চাকরি দিলে, কিন্তু অঞ্জনাদিদিকে সে-বাড়ীতে স্বামী নিয়ে সংসার পাততে দিলে না কেন? তার কোলে দেবুকে দিয়ে তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে—। থাক, তুমি বড়-দাদা, বয়সে অনেক বড়। বাপেরই বয়সী—বাইশ বছরের বড়। সেসব কথা আমার বলা উচিত নয়। বলব না। অঞ্জনা যে চলে গেল, সে তোমার পাপে গেল। আবার সেই পাপের ফল তুমি টাকা-পয়সা খরচ করে গোয়ায় লোক পাঠিয়ে এখানে নিয়ে এলে। চোখের সামনে পুষে রাখলে। এ-পাপ তোমার কর্মফল কিনা?—বল না, তুমিই বল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

। যয়া মুগ্ধং জগৎসর্বং সর্বদেহাভিমানিনঃ ॥

রাধা

॥ স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরমমিত্রবরেষু

দোলপূর্ণিমা,

আঠারো শতকের তৃতীয় দশক তখন শেষ হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে মুঘল আমল। সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুরশিদাবাদ ; একাধারে দেওয়ান ও সুবেদার 'মতোমন্ উল্ মুল্ক আলাউদ্দৌল্লা জাফর খাঁ নসিরী নাসির জঙ্গ মুরশিদকুলী খাঁ' তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এক অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সদ্য বিগত হয়েছেন। বাংলার মসনদে তখন সদ্য বসেছেন জাফর খাঁর একমাত্র জামাতা সুজাউদ্দীন্—'মতোমন্ উল্ মুল্ক সুজাউদ্দীন বাহাদুর আসদ্ জঙ্গ'। রাজা সীতারাম রায় থেকে শুরু করে বাংলার সমস্ত জমিদারের সামন্ততান্ত্রিক উদ্ধতপনা বা স্বাধীনতার প্রয়াস দমিত। তাঁদের ঘোড়ার মত মুখে লাগাম পরিয়ে সুবে বাংলার রথে জুড়ে বাংলার নবাবী তখন জৌলুসের রাত্রির শোভাযাত্রার মত চলেছে। দেশে তখন নিরঙ্কুশ শান্তি—চোর-ডাকাতেরা দিনের বেলায় সাপের মত লুকিয়েছে, ডাকাত ধরা পড়লে তাকে দু ভাগে ভাগ করে চিরে পথের ধারের গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রাত্রিকালেও পথের ধারে গাছের তলায় ক্লান্ত পথিক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়। মুরশিদাবাদ শহরে তখন টাকায় পাঁচ মণ চাল। খাদ্যসামগ্রীর বাজার-দর বাঁধা। কোন ব্যবসায়ী বাঁধা-দরের উপর দর চড়িয়ে লাভ করতে চেষ্টা করলে ধরা পড়তে দেরি হয় না, তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে আনা হয়। সে-আমলের ইতিহাসের কেতাবে পাওয়া যায় যে, মাসে এক টাকা আয় হলে একজন লোক দু বেলা পেট পুরে পোলাও-কালিয়া খেতে পারত। ১৭২৬।২৭ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র তিরিশ বছর পর আসছে পলাশীর যুদ্ধ, বাংলার নবাবশাহীর পতন। কিন্তু তখনই সুবে বাংলায় মুসলমান নবাবশাহীর উজ্জ্বলতম জৌলুসের আসর। বোধ করি বেলোয়ারী কাচের ঝাড়লণ্ঠনে সামাদানে বাতিগুলি নেববার আগে শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে

জিলা বীরভূমে অজয় নদীর ধারে ইলামবাজার গঞ্জ। বড় জমজমাট গঞ্জ তখন ইলামবাজার। ইলামবাজার থেকে পশ্চিমে জয়বাজার, উত্তরে সুখবাজার পর্যন্ত নিয়ে একনাগাড় এক মস্ত জমজমাট গঞ্জ।

দেশ তখন সমৃদ্ধ। বর্গীর হাঙ্গামা তখনও বছর বিশেক দূরে। বুলবুল কি টিয়াপাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ধান খেয়ে গেলেও লোকে খাজনা দেবার জন্য ভাবে না। দেশে তখন অনাবৃষ্টিও ছিল না। যুদ্ধও না। বাংলা দেশের ক্ষেতে তখন শস্যের সমারোহ ; খামারে খামারে ধানের বাখার, ছোলা-মুসুরের বাখার, ভাঁড়ারে জালায় জালায় গুড় মজুদ। ঢাকায় মসলিন, মুরশিদাবাদ-বিষ্ণুপুরে রেশম, গ্রামে গ্রামে আটপৌরে কাপড়ের তাঁত চলে ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। ফিরিঙ্গীরা এ দেশে এসেছে, বসেছে, কিন্তু তার ভিত পোক্ত হতে পারে নি।

আজকাল ইলামবাজারে যে ইংরেজ-কুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তার কথা কেউ তখন স্বপ্নও দেখত না ; শুধু কখনও-সখনও দু-একখানা নৌকো এসে লাগত ; তার উপর থেকে দু-চারজন আশ্চর্য সাদা রঙের মানুষ এসে নেমে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলত। এখানকার মাল নিয়ে চলে যেত। ওদের বলত ফিরিঙ্গী। তাঁদের কারবার ছিল তুলোর আর কাপড়ের।

তাঁতের কারবারে ইলামবাজারের তুলোর বাজার তখন মস্ত বড় মোকাম। লেন-দেন

চলে হাজার হাজার টাকার। তার সঙ্গে আশপাশের চাষীদের ঘরের পলুর চাষের রেশমের কারবারও কিছু ছিল। কিন্তু ইলামবাজারে সব চেয়ে বড় কারবার লাক্ষার। অজয়ের কূলের কুলগাছ আর পলাশগাছে লায়ের চাষ চলত। লা থেকে রঙ আলতা গালা তৈরী হয়ে চালান যেত দিল্লি পর্যন্ত। এখানকার গালার কদর ছিল খুব। মুরশিদাবাদের দরবারে যে গালার উপর মোহর ছাপ দিয়ে গোপনীয় পত্র পাঠানো হত সে গালা ছিল ইলামবাজারের। নবাব সুজাউদ্দিনের রঙমহল চেহেলসতুনে যে সব গালার আসবাব খেলনা ছিল, বিলাসভবন ফরাসবাগে গালার যে বিরাট বড় অপরূপ গাছটি ছিল, যার সবুজ পত্রপল্লবের বৃন্তে বৃন্তে ছিল লাল ফুল আর টোপা টোপা হলুদ ফল এবং যার উপর এক ঝাঁক কালো কুচকুচে মৌটুসকি পাখি সরষের আকারের রাঙা চোখ আর প্রবাল রঙের ঠোঁট নিয়ে বসে ছিল, যার তারিফ নাকি দিল্লি-দরবারের আমীরেরা এসেও করে যেতেন, সে গাছটি ইলামবাজারের গালা দিয়ে এখানকার কারিগরেরাই তৈরি করেছিল। মুকশুদাবাদের নবাবের রঙমহল থেকে আমীর-ওমরাহ-রাজা-জমিদার-বাড়ির মেয়েরা সে সময় পুরনো ভেঙে নিত্যই যে নতুন গালার চুড়ি পরতেন, জড়োয়া চুড়ির পাশেও যে চুড়ি জেল্লায় হার মানত না, সে চুড়িও ছিল ইলামবাজারের। মুরশিদাবাদের তওয়াএফ বাঈজী-কসবীদের হাতে যে একহাত করে গালার চুড়ি বাহার দিত সেও তাই। তার সঙ্গে তার গড়ন-রঙ-ঢঙের নিত্যই ছিল পরিবর্তন। ওদিকে ইলামবাজারের কারিগরদের যেমন ছিল কারিগরির এলেম তেমনই ছিল নিত্যনূতন ঢঙ আবিষ্কারের উপযুক্ত সাফা মগজ। নবাব বাদশাহের দরবারে খেলাতের ফর্দে বড় বড় বাড়ির কুটুম্বিতার তত্ত্বতল্লাশের দফার মধ্যে ইলামবাজারী গালার জিনিস কিছু-না-কিছু না থাকলে চলতই না। শুধু নবাব আমীর শেঠই নয়, গালার তৈরী থালার উপর ফল ফুল আর খুচরো ফল—আম জাম কাঁঠাল এসব সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে না থাকলে তাদের মনও খুঁতখুঁত করত। ইলামবাজারের বাজারে এর জন্যই ছিল বড় খরিদ্দারের আমদানি। অনেকে বলত, ইলামবাজার নয়, এলেমবাজার। সেই জমজমাট ইলামবাজারে সেদিন অমাবস্যার ভোরবেলা।

ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম সোমবার। সোমবার অমাবস্যা। শিবচতুর্দশীর পরদিন মৌনী অমাবস্যা। পঞ্জিকায় নির্দেশ আছে মন্বন্তরা ও অক্ষয়স্নান। এই রাত্রিতে গঙ্গাস্নান অক্ষয়পুণ্য। রাত্রি-প্রভাতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ হবে মাধবপক্ষ, পক্ষের পূর্ণতিথি পূর্ণিমায় মাধবের রঙে খেলা, হোলি-উৎসব, আবীরে রঙে কুমকুমে পৃথিবী রাঙা হয়ে যাবে, মাধবের পূজার জন্য মাধবীলতার কোমল সবুজ শাখাগ্রগুলির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে হরিদ্রাভ কোমল শুভ্র-মর্ম মাধবীপুষ্প স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠবে। তার আগেই গৌরীপতির অর্চনার জন্য বসন্ত আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ফুটতে শুরু করেছিল যে রাঙা পলাশস্তবক সে পলাশের ফোটা শেষ হয়েছে শিব-চতুর্দশীতে, তার ঝরার পালা শুরু আজ থেকে। রাঙা পলাশ শুকিয়ে রঙে পরিণত হবে, তারই কণা উড়িয়ে বাতাস খেলবে হোলি। সংকল্প করে যারা মাধবার্চনা করবে তারা এই অমাবস্যার রাত্রিতে স্নান করে ঝরা পলাশ কুড়িয়ে আনবে, রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে তাই দিয়ে তৈরি করবে মাধবরঞ্জনের জন্য রাঙা রঙ। আবীর কুমকুম আসবে

বাজার থেকে। ইলামবাজারে অজয়ের ঘাটে বড় বড় নৌকো এসে লাগবে। আবীর কুমকুম বেচে তার বদলে আলতা, গালার খেলনা, চুড়ি আর তুলো বোঝাই নিয়ে ফিরবে। কাশ্মীরী জাফরান নিয়ে আসবে পাঞ্জাবের শেখ সওদাগরেরা—ইয়া ঢিলেঢালা পায়জামা, হাঁটুঝুল পাঞ্জাবির আস্তিন, তার উপরে হাতকাটা জরির কামদার ফতুয়া পরে শাহী জোয়ান সব। জাফরানের সঙ্গে আনবে আতর। বড় বড় গদির মালিকেরা, জমিদারেরা আতর কিনবে; তাদের হোলিতে আবীরের সঙ্গে আতর না হলে চলে না। পাঞ্জাবীরা আরও পণ্য আনে, ঘোড়া আনে। জমিদার-ব্যবসাদারেররা কেনে সে সব।

আকাশের পূর্বকোণে শুকতারা দপদপ করছে তখনও; অমাবস্যার অন্ধকার সবে ফিকে হতে শুরু করেছে, রাত্রের নিঝুম থমথমানি এখনও কাটে নি। পাখিরা সবে একবার ডাক দিয়ে আবার ডাকা-ডাকি করছে, বাজারের গালার কারখানার চুল্লির ছাই কাড়া—অর্থাৎ পরিষ্কার করা তখনও পর্যন্ত শুরু হয় নি; এরই মধ্যে সেদিন মৌনী অমাবস্যার মন্বন্তরা-স্নান উপলক্ষ্যে বাজারের ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে। কাল থেকে মাধবার্চনা পক্ষ। আজ স্নান না করলে চলে? দোল-পূর্ণিমা হোলি-উৎসব। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা দোলযাত্রা। দ্বাপরের কানহাইয়ালালের ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠ লীলা দোললীলা, ভারতের বসন্তোৎসব হোলি; বাংলার প্রাণচৈতন্য শচীনন্দন মহাপ্রভুর জন্মতিথি। হোলি-উৎসবের প্রস্তুতির জন্য প্রথম স্নান

পনের দিন ধরে এখন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত কলায় কলায় উল্লাস আনন্দ উৎসব বাড়তে থাকবে। বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, বালিকা থেকে বৃদ্ধা অবধি। রঙ পিচকারি থেকে কাদা আলকাতরা পর্যন্ত। সরঞ্জাম সংগৃহীত হচ্ছে। শরবত থেকে সুরা পর্যন্ত। ভগবানের জন্য নৈবেদ্য থেকে নেশার মুখের স্বাদের জন্য নানাবিধ স্থূল ও তীব্রস্বাদী আহার্য পর্যন্ত। নামগান কীর্তনগান থেকে বাঈজী-কসবী-খেমটা-ঝুমুর পর্যন্ত।

দেশের জীবনের শুধু এইখানটিতে সর্বনাশের সংকেত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনে পচ ধরেছে, একটু অবহিত হলেই তার গন্ধে অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে। কিন্তু সেদিকে অবহিত হবার মত দৃষ্টির স্বচ্ছতাও নেই কারও।

বাংলা দেশে মহাপ্রভুর যে বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্লাবন এনেছিল, জীবনকে সাগর-সঙ্গমের মহাতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিল, সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজে এসেছে, ফলে দেশ-জীবনের অবস্থা হয়েছে বিলের মত। মাছেরা যেমন এ ক্ষেত্রে সাগরসঙ্গমে পৌঁছতে পারে না, সাগরের স্বাদ পায় না —বিলের জলতলেই চক্রাকারে পাক খেয়ে উছল মেরে অসীমের সীমা ও অতলের তল পাওয়ার ভ্রান্ত আস্বাদে বিভোর থাকে—মানুষেরাও তেমনিই আচার-আচরণ পালনের মধ্যেই পরম-প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। বিলের জলে নিক্ষিপ্ত গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জনের লবণের স্বাদেই যেমন বিলের মাছের সমুদ্র-জলের আস্বাদ বলে ভ্রম হয়—মানুষেরও ঠিক সেই অবস্থা।

স্নান। স্নান। অক্ষয় স্নান। ইলামবাজারের প্রান্তদেশে অজয়; ক্রোশ তিনেক দূরে শ্রীমন্ জয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট কেন্দুলী। কেন্দুলী পর্যন্ত অজয় নদ গঙ্গা-মহিমায় মহিমান্বিত;

পৌষ-সংক্রান্তিতে মকরবাহিনী নাকি উজান বেয়ে কাটোয়া থেকে কেন্দুলী ঘাট পর্যন্ত আসেন ; এই ঘাট পর্যন্ত অজয়-স্নানে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয় ; সেই বিশ্বাসে দলে দলে স্নানার্থীরা স্নানপুণ্য সঞ্চয়ের জন্ম জেগে উঠেছে সেদিন।

* * *

—ওদিকে নয়। এই দিকে। আরও খানিকটা নীচে যাই চল্। লোক থৈ-থৈ করছে ওদিকে। এদিকটা নিরিবিলি হবে। কী? দাঁড়ালি যে?

—হুঁ। অভিযোগের সুরে 'হুঁ' বলে সুর টানলে মোহিনী। অভিযোগের সঙ্গে আবদার : হুঁ, ঘাটের বাজারে গালার চুড়ি পরব যে!

মা আর মেয়ে। কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমোহিনী। সংক্ষেপে দাসী আর মোহিনী। জয়বাজার ও ইলামবাজারের ছাড়ানেড়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটি বড় আখড়ার অধিকারিণী। কিন্তু লোক চুপি চুপি বলে বৈষ্ণবী নটী। কথাটা পরিষ্কার হল না। ছিল ওরা বৈষ্ণবী। মা কৃষ্ণদাসী তরুণ বয়সে নামের দলের সঙ্গে নামগান গেয়ে বেড়াত ; ক্রমে ইলামবাজারের ঐশ্বর্যের মোহে আজ নটী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পুরো নটী নয়, নটীপাড়ায় বাস করে না, নটীর সাজে সাজে না, বৈষ্ণবীর মত তিলক কাটে, চূড়া বেঁধে চুলও বাঁধে, দুই বাজারের বাজার-এলাকার বাইরে একটি শান্ত বৈষ্ণব-পল্লীতে আখড়াতেই বাস করে ; সেখানে প্রভুর সেবাও আছে। তবে এ সমস্তের আড়ালে এদের আর একটি রূপ আছে। সেটি নটির রূপ। অনেককাল পর্যন্ত সেটি সাধারণ্যে অপ্রকাশ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাসীর আখড়ার চারিদিক পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকা সত্ত্বেও সে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পাঁচিল পার হয়ে বাতাসে ভেসে এসেছে মুরশিদাবাদী জর্দার গন্ধের সঙ্গে দামী আতরের গন্ধ। আরও ভেসে এসেছে অনেককিছু, যা নাকি কানাকানি করে প্রায় ঘরে ঘরেই ছড়িয়ে দিয়েছে, কৃষ্ণদাসীর স্বরূপের ব্যাখ্যা। তাতে কৃষ্ণদাসীর কোন অনুশোচনা নেই ; কিন্তু লজ্জা বা শঙ্কা দুয়ের একটা হয়তো বা দুটোই এখনও আছে। তার কারণ সে হল এ অঞ্চলের আখড়াধারী বৈরাগী-বাউলদের শীর্ষস্থানীয় সিদ্ধসাধক প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ার উত্তরাধিকারিণী। তার খেতাব হল—মা-জী। আখড়ায় প্রেমদাসের সিদ্ধাসন আছে ; তাঁর প্রতিষ্ঠা-করা মহাপ্রভুর দারু-বিগ্রহ আছে। সেই কারণে সে অত্যন্ত সাবধানে থাকে। কোন গদিওয়ালা ধনীর বাড়িতে যখন সে যায় তখন যায় অত্যন্ত গোপনে। যায় ডুলিতে, সঙ্গে লোক থাকে। বিরল পথে যাতায়াত করে। পথে লোক ব্যঙ্গ করলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। বাজারের লোক দেশান্তরের আগন্তুক দুঃসাহসী সওদাগরদের পিছন ধরিয়ে দিলে বিপদ হবে। ওদের তো কোন বাধাবন্ধন নেই, পথের মাঝখানেই এসে হাঁকবে—এ লম্বরদারণী!

তাদের সম্প্রদায়ের অনেককে এই অসাবধানতার জন্তে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে বাজারে। একেবারে সম্প্রদায় থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারা। সব চেয়ে ভয় তার এই মেয়ে মোহিনীকে। মোহিনীকে কৃষ্ণদাসী অতি সন্তর্পণে গোপন সম্পদের মত রাখতে চায়। মেয়েকে নিয়ে তার অনেক আশা অনেক কল্পনা ; সে শুধু জানে তার মন আর জানেন যিনি সব জেনেও কিছু-না-জানার ভান করে বসে আছেন—লুকিয়ে থাকেন পাথরের বিগ্রহের মধ্যে। মোহিনীর

দিকে কৃষ্ণদাসী তাকায় আর বুকের ভিতর সেই কথার আলোড়ন ওঠে। মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ আগুনের শিখা। ঘরের দেওয়ালের আড়ালে কাচ-ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের প্রদীপের মত ঢেকে রেখেছে তাই। ঘেরা না থাকলে এত পাখাওয়ালা পিঁপড়ে-ফড়িং ছুটে এসে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যে, তাতে শিখাই নিবে যাবে, নয় অগ্নিকাণ্ড হবে। সেই কারণেই বাজার পার হয়ে ইলামবাজারের সদরঘাটে যাবে না কৃষ্ণদাসী। বাজারকে পিছনে রেখে মাঠ পার হয়ে শালবন-কুলবনের ভিতর দিয়ে গাঁয়ের ঘাটে স্নান করবে। আর মেয়ে আবদার ধরেছে ঘাটের বাজারে যাবে চুড়ি পরতে।

কৃষ্ণদাসী বললে, না। একটু রূঢ়ভাবেই বললে।

ভাল করে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মেয়ের চাদরটাও ঠিক করে দিলে। মেয়েটার বয়স সবে পনের। তার কুড়ি বছর বয়সের সন্তান।

—চুড়ি আমি আনিয়ে দেব।

মৃদুস্বরে মেয়ে তেমনিই অনুযোগের সুরেই বললে, আনিয়ে দেবে! পরের আনা জিনিস বুঝি পছন্দমত হয়? দোকানে কত রকম চুড়ি—

বাধা দিয়ে মা বললে, কত রকম চুড়ি! মরণ তোমার। দোকানে সবার সামনে লোক দেখিয়ে চুড়ি পরবি কী? আমাদের বুঝি তাই পরতে আছে?

—নেই তো এত চুড়ি পরে তুমি ডুলি চেপে যাও কেন?

—যাই কেন? কচি খুকী নাকি তুই? সে যাই লুকিয়ে। আমরা বৈরাগী-বোষ্টম, ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায়। আমাদের অলঙ্কার না, আভরণ না। শুধু তেলক আর মালা। বড়জোর দরবেশী ফকিরকাঁটা ফটিকের মালা। দশকে দেখিয়ে গালার চুড়ি পরে 'ভাবন' করতে গেলে পতিত করবে। চল্, আর কচি খুকীর মত দাঁড়িয়ে ঘ্যান-ঘ্যান করিস নে। ঝুঁঝকি কেটে ফরসা হয়ে আসছে।

আকাশ সত্যিই ফরসা হয়ে আসছে; গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। দিক্‌চক্রবালের ওপার থেকে সূর্যদেবতার রথ ছুটে আসছে মুহূর্তে মুহূর্তে বহু যোজন পথ অতিক্রম করে। পাখিরা বাসায় বসে মুখ বাড়িয়ে কলরব করা শেষ করে দুটি চারটি করে বাইরে উড়তে শুরু করেছে। কাকেরা বেরিয়েছে সর্বচেয়ে আগে। প্যাঁচা এবং বাদুড়েরা বাসায় ফিরেছে। খুবই কাছাকাছি মাথার উপর দিয়ে দ্রুত কুহু কুহু কুহু কুহু ডাক ডেকে উড়ে গেল একটা কোকিল। কাকে তাড়া করেছে।

মোহিনী কাকটাকে গাল দিলে, মর্ মুখপোড়া হিংসুটে।

কৃষ্ণদাসী বললে, ওই অমনি করে তেড়ে ঠোকরাতে আসবে বাজারের যত নচ্ছারের দল। শিস কাটবে। তখন মানটা থাকবে কোথায়?

বাজারের পাশে সাধারণ নটীরা যখন সেজেগুজে বের হয় তখন বাজারের অবস্থাটা যে কী হয়। মা গো। শিস, হাসি, অশ্লীল কথা, যেন হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে গড়িয়ে বেড়ায় অবরুদ্ধ পচনরসের মত। ওই বিদেশীদের দু-একজন দুঃসাহসী দাঁত মেলে পথ আগলে দাঁড়ায়,

হাত ধরে টানে। সাধারণ নটী-কসবীরা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে গুপ্ত প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাই কি কৃষ্ণদাসীর সহ্য হয়?

মেয়ের পিঠে ঠেলা দিয়ে কৃষ্ণদাসী হাঁটতে শুরু করলে। রাত্রির ম্লান। আলো ফুটলে হবে না। এতেই অন্যায় হল। রাত আর নেই। পাখি ডেকেছে। পাখি ডাকলে আর রাত্রি থাকে না। 'ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা, খনা বলেন সে হল উষা।' উষাকাল রাতও নয়, দিনও নয়। পাখি বাসা ছেড়ে বাতাসে পাখা মেললেই উষা শেষ, দিন শুরু হয়ে যায়। —চল্, চল্, পা চালিয়ে চল্ বাছা। তা বলে দেখে চলিস্। দেখছিস না, কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া 'কুয়ো' (কুয়াশা) জাগছে।

কৃষ্ণদাসী মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ ধরলে। চারিপাশে পাতলা শালবনের ভিতর মাঝে মাঝে খানিকটা খানিকটা চাষের ক্ষেত। তারই আলোর উপর দিয়ে শালবনের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ। গঞ্জ বাজারকে বেড় দিয়ে চলে গেছে। ওই পথ ধরে কৃষ্ণদাসী মেয়েকে নিয়ে এক নির্জন ঘাটে গিয়ে নামবে। বাঁয়ে বোলপুর সুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত শালবনের এলাকাটা পার হয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে এই গাড়ির রাস্তাটা। ওই রাস্তায় সারিবন্দি গরুর গাড়ি চলছেই—চলছেই। ধান আর চাল, চাল আর ধান। উত্তর দিক থেকে আসে এই ইলামবাজার জম্বুবাজার গঞ্জে। ওই পথে ঠিক এই সময়ে একটা ভয়ের সম্ভাবনা আছে। ওই পথে এই সময়ে দেখা যায় এক ঘোড়সওয়ারকে। রাধারমণ দাস-সরকারের পাষণ্ড বংশধর অক্রূর সরকারকে। অক্রূর অহঙ্কার করে বুক বাজিয়ে বলে—অক্রূর নেহি, হাম ক্রূর সরকার হ্যায়। রাধারমণ সরকার ধনী ব্যবসাদার, ইলামবাজারে তার মস্ত গদি। রাধারমণের সাধনকুঞ্জে কৃষ্ণদাসীর যাতায়াত আছে ছেলে অক্রূর কুলধর্ম মানে না, সে বৈষ্ণব-বংশের ছেলে হয়েও দুর্দান্ত মাতাল, নারীদেহের প্রতি তার প্রচণ্ড প্রলোভন এবং রুচিও বিচিত্র; তার রুচিতে সে নিকষ কালো বন্য বর্বর জাতীয়া মেয়েদের পিছনে উন্মত্ত লালসায় ছোটে। এই বনের পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকে বনের ভিতর তার এক বিলাসকুঞ্জ আছে, সেইখানে তার অনুচরেরা সংগ্রহ করে আনে নিত্য-নূতন শবরী জাতীয় যুবতী। সেই ভোগ করে এই ভোরবেলা সে ইলামবাজারে ফেরে। রাধারমণ পুত্রের মতি ফেরাবার জন্য মোহিনীকে চায় কৃষ্ণদাসীর কাছে। এই শবরীলালসা-লোলুপ অক্রূরের কিকিরি মধ্যেও বিচিত্র ব্যতিক্রমের মত ভাল লেগেছে মোহিনীকে। বাপকে সে কথা দিয়েছে যে, মোহিনীকে সে যদি পরকীয়া-সাধনের সঙ্গিনী হিসাবে পায় তবে দীক্ষা নিয়ে সব ব্যভিচার ছেড়ে দেবে। কৃষ্ণদাসী মুখে সরকারকে 'না' বলতে পারে না, কিন্তু ওই অক্রূরের হাতে মোহিনীর মত সোনার পুতুলীকে তুলে দিতে পারবে না।

মোহিনীকে নিয়ে তার অনেক বাসনা, অনেক কামনা।

পথের ধারে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণদাসী। মেয়েকে বললে, দাঁড়া। ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে রাঙা মাটির গরুড়-গাড়ি-চলা কাঁচা সড়ক। ক্যাঁ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে গরুর গাড়ি চলেছে—ধুলো উড়ছে; লাল ধুলোয় সব ঢেকে গেছে। গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণদাসী যথাসম্ভব স্থিরনিশ্চয় হয়ে নিলে। না, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, ঘূর্ণির মত ধুলোর

ঝড়ও আসছে না, কোন প্রমত্ত কণ্ঠের শাসনবাক্যও শোনা যাচ্ছে না। না। আসছে না অক্রুর। এবার সে মেয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললে, আয়।

* * *

সড়ক রাস্তাটা পার হয়ে ওধারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত হল কৃষ্ণদাসী। জঙ্গলের একেবারে প্রান্তদেশ এখানটা। ডাইনে পড়ে রইল ইলামবাজারের বাজার। সড়কের মুখে গঞ্জের ঘাট, সামনেই একটু ডান দিকে দক্ষিণ মুখে এসেই পড়ল অজয়ের তটভূমি। তটভূমিতে শালজঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে; বোধ করি বালুপ্রধান জমিতে শালগাছ ভাল জন্মায় নি। নইলে অজয়ের দক্ষিণ দিকে যে শালজঙ্গল তাকে জঙ্গল বলা চলে না—বন বলতে হয়। বিশাল শালবন। ক্রোশের পর ক্রোশ চলে গেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে সাঁওতাল পরগণার অরণ্যভূমের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার দক্ষিণে বাদশাহী সড়ক পার হয়ে গেছে দামোদরের ধার পর্যন্ত। দামোদরের ওপারে আবার শুরু হয়েছে বন। বাঁকুড়া জেলা জুড়ে এঁকে-বেঁকে এক দিকে চলে গেছে মানভূম-হাজারিবাগের অভিমুখে, অন্য দিকে চলে গেছে মেদিনীপুর হয়ে উড়িষ্যা সীমান্ত ধরে নাগপুরের দিকে। মূল শালবন প্রকৃতপক্ষে অজয়ের দক্ষিণ দিকে। বর্ধমান জেলার মধ্যে একটা ফ্যাকড়ার মত শালবনের খানিকটা অংশ ক্রোশ দুই-আড়াই চলে গেছে বোলপুরের ধার পর্যন্ত।

খোলা জায়গায় এসে কৃষ্ণদাসী দম নেবার জন্য একটু দাঁড়াল। এতক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত। নবাবী শাসনে চোর-ডাকাতেরা শায়েস্তা হয়েছে, দরিদ্র-লম্পটেরাও শায়েস্তা হয়েছে, কিন্তু ধনী-লম্পট যারা তাদের শায়েস্তা করবে কে? তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে কে? সে নালিশ নেবেই বা কে?

অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে কৃষ্ণদাসী।

কী থেকে কী হয়ে গেল! হয়তো তার জন্যে নিজের দায়িত্ব কম নয়। কিন্তু তবু মনে হয় এর উপর তার নিজের হাত ছিল না; নিজের হাত নেই স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। লোকে বলছে, সাঁতার কেটে তীরে উঠল না কেন? সাঁতার তো জানে। জানে বই-কি সাঁতার। এত বড় পাট—প্রেমদাস বাবাজীর পাট—সেই পাটের মা-জী সাঁতার জানে বই-কি! কিন্তু আশ্চর্য, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলার টান থেকে কিছুতেই সে পাশ কাটিয়ে তীরে উঠতে পারছে না!

নিন্দা তো উঠেছে। চাপা যেন আর থাকছে না। শুধু তার শ্বশুরের সাধনসিদ্ধ পাটের উপর শ্রদ্ধার জন্য লোকে এখনও তাকে পতিত করতে পারে নি। উঁচু জাতের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-সমাজের লোকেরাও প্রকাশ্যে কোন কথা বলতে পারে না।

তারা অবশ্য সমাজে নগণ্য, বৈষ্ণব-গোস্বামীদের চরণরেণু, জাতহারা ন্যাড়া-নেড়ী দলের বৈরাগী বৈষ্ণব। কিন্তু তবুও তার শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজীর সাধক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাঁর ভাবাবেশ হত, তাঁর ভাবাবেশের সময় গোরাচাঁদের কাঁধের উত্তরীয় খসে পড়ত। বড় বড় গোস্বামীরা দেখতে আসতেন। তাঁরা বলতেন, প্রভুর অঙ্গেও কম্পন জাগে তাই এমন হয়। কেউ বলতেন, এই উত্তরীয় দিয়ে প্রেমদাসের অঙ্গের ধুলো ঝেড়ে দিতে বলেন।

কৃষ্ণদাসীর মহান্ত প্রেমদাস বাবাজীর নিজের ছেলে নয় ; সুন্দর রূপ দেখে পোষ্য নিয়েছিলেন শেখ সেবদাসীর গৃহস্থাশ্রমের ছেলেটিকে। নাম দিয়েছিলেন গোপালদাস। পাটটিই বরাবরকার শিষ্য আর পোষ্যের পাট। এ পাটের সেবায়েত বাবাজীদের সেবাদাসী আছে, সন্তান নেই। অর্থাৎ সাধনেরই পাট, সংসারের হাট নয়। এখানে দেওয়া-নেওয়া আছে, কিন্তু বিকিকিনি নেই। ঘর আছে দোর আছে, কিন্তু বাঁধন নেই। বাঁধনের ডোর পাকিয়ে উঠল কৃষ্ণদাসীর কন্যা মোহিনী হতে। গোপালদাস কৃষ্ণদাসীকে নিয়ে এল সাধন-সঙ্গিনী করে, সাধনের ফুল ফল হল ; বছর কয়েক যেতেই কৃষ্ণদাসীর সন্তান হল—মোহিনী। তাতে সমাজে লজ্জা অবশ্য হয়েছিল তখন, কিন্তু এ লজ্জা আর সে লজ্জায় অনেক প্রভেদ। তারপর কৃষ্ণদাসীর জীবনে ঘটল বিপর্যয়। বৈষ্ণব গোপালদাস দেহ রাখলে। শ্বশুর প্রেমদাস আর শাশুড়ী রাইদাসী বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসীকে বুক দিয়ে আগলে রাখলে—তাদের সাধনভজনের পুঁজিপাটা যা ছিল সব কৃষ্ণদাসীকে দিয়ে আখড়ার বিগ্রহকে দেখিয়ে বলে দিলে, ওইখানে মনটি রেখে ঘর কর, সংসার কর, মেয়েকে মানুষ কর, মুক্তি ওইখানে, অভয় ওইখানে, উদ্ধার ওইখানে। ঘাটে বাঁধা আছে নামের তরী, উনি তার কাণ্ডারী, পারের কড়ি তোমার ওই চরণে মতি।

আরও কিছু দিয়ে গিয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ী ; দিয়ে গিয়েছে অনেক রোগের অনেক ওষুধ, অনেক মন্তরতন্তর ঝাড়ফুঁকের বিদ্যে। লোকে বলে ডাকিনী-বিদ্যা। ইলামবাজার অঞ্চলে ওই মূলধনে কৃষ্ণদাসী মহাজন সেজে বসে আছে। তাই লোকে কেউ কিছু বলতে পারে না। এদিকে এল আর-একটা স্রোত। ইলামবাজারে জনুবাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত। গঞ্জ উঠল জেঁকে। ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী এল মুরশিদাবাদে ; সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চল আবার জাঁকল। নৌকা এল, বজরা এল, উটের সারি এল, খচ্চরের পালের পিঠে হরেক রকমের সওদা এল, দেশ-দেশান্তর থেকে হরেক রকমের লোকজন এল, তাদের গেঁজেলে সোনার মোহর, রূপোর সিক্কা। তারা এসে যে বিকিকিনি শুরু করলে সে শুধু জিনিসপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, আরও অগ্রসর হল অনেক দূর। ইলামবাজারের গঞ্জে কসবীপাড়াটা সারারাত্রি আলো জ্বালিয়ে রেখে আর হৈ-হুল্লোড় করে তার সাক্ষী দিচ্ছে। স্রোতটা বাইরে থেকে যেমন এল, ভিতর থেকেও তেমনিই বন্যার জলের সঙ্গে মেশবার জন্য পুকুরের জলেও স্রোত ধরল। এখানকার দোকানদারো এক পুরুষের মধ্যেই মহাজন হয়ে উঠে আমিরী বিলাসে মাতল ; যারা সামান্য সাধনভজন করত তারা হয়ে উঠল সাধক।

পরকীয়া সাধন কিশোরী-ভজন দেশে চলছিল, কিন্তু সে চলছিল গোপনে ; চলছিল গুরুদের ইশারায়। সংসারে সাধনা করলেই সিদ্ধি মেলে না। শতকরা নিরেনব্বই জনই ভ্রষ্ট হয় ; এবং তাই হত। কিন্তু তাতে ভ্রষ্ট যারা হত তারা দুঃখও পেত লজ্জাও পেত, বুক ফাটিয়ে কেঁদে গোবিন্দের কাছে কামনা জানাত যেন আগামী জন্মে সিদ্ধি মেলে। টান পড়ল তাদের সম্প্রদায়ে ; বিশেষ করে যারা শহর বাজার গঞ্জ এলাকায় থাকে তাদের উপর টানটা পড়ল প্রবল ভাবে। তারা গরিব, তারা ভিখারীর জাত, তারা এ টানে স্রোতের কুটোর মতই ভেসেছে। এর জন্য অপবাদ তাদের হয়েছে। বিশেষ করে ইলামবাজারের এলাকার

বাইরে। এই তো ক্রোশ চারেক পথ জয়দেব-কেন্দুলী, পৌষ-সংক্রান্তিতে সেখানে গোটা দেশের বাউল দরবেশ স্থাড়ানেড়ীর সমাগম হয়; সেখানে ইলামবাজারের তাদের যাওয়া ভার হয়েছে। ইলামবাজারের বৈষ্ণবী শুনলে—তাদের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে, কেউ মুচকে হাসে, কেউবা একটু সরেও বসে।

কখনও কখনও রাগ হয় কৃষ্ণদাসীর; নিজের উপরও হয়, যারা লোভ দেখিয়ে তাকে তার সাধনপথ থেকে টেনে কাদায় নামিয়েছে তাদের উপরও হয়, ওই বাউল-বৈষ্ণবদের উপরেও হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরই হয়। কখনও ঘেন্না হয় ওদের উপর, ওই বাউলদেরও উপর, যারা, সরে বসে, যারা মুখ বেঁকিয়ে হাসে তাদের উপর। মরণ! সে তো সব জানে, সাধন জানে, ভজন জানে, সিদ্ধি জানে—সব জানে। সব মিছে—সব মিছে। জাত হারালে ভিখিরী, ঘর বেঁধে সে ঘর যে রাখতে না পারে সে-ই ঘর ছেড়ে হয় বৈরাগী।

—মা! ডাকলে মোহিনী।

চমক ভাঙল কৃষ্ণদাসীর: অ্যাঁ?

—পূব দিকে লালি দিয়েছে। ঘাটে নাম। সূয্যি উঠে যাবে যে!

—চল্।

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়ের হাতখানা ধরলে কৃষ্ণদাসী; তারপর কোন্ কৌতুকোচ্ছলতায় কে জানে, তার হাত ধরে ঠিক সমবয়সী সখীর মত অজয়ের বালুময় ঢালু পাড় ভেঙে ছুটে নামতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল শব্দে হাসি। মা এবং মেয়ে দুজনে ঝপ করে দুটি বালিহাঁসের মত জলে এসে পড়ল।

* * *

আকাশ লাল হয়ে উঠল।

পাখির কলরবে ভরে উঠেছে ওপার এপারের বনস্থলী। শীতের শেষ, বুনো হাঁসের ঝাঁক সারারাত্রি ক্ষেতে ফসল খেয়ে কলকল শব্দ তুলে দহের দিকে বিলের দিকে খালের দিকে ফিরছে। মোহিনী স্নান সেরে উঠে শুকনো কাপড় পরে পলাশতলায়-তলায় ঝরা ফুল কুড়োচ্ছিল। শুকিয়ে দোলের রঙ খেলার রঙ হবে। কৃষ্ণদাসী কাপড় ছাড়ছিল। আর তাকিয়ে ছিল ওপারের শালবনের দিকে। ওই বনের ভিতর দিয়ে পথ ধরে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে পুরীর পথ। কৃষ্ণদাসী মোহিনীকে কোলে নিয়েই ওই অরণ্যের ভিতর দিয়ে সড়ক ধরে মদনমোহনের বিষ্ণুপুর হয়ে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করে এসেছে একবার। তখন মোহিনীর বাপ গোপালদাস বেঁচে ছিল, দল বেঁধে গিয়েছিল তারা। এদিকে এ-বন কেন্দুলীর ওপারের শ্যামরূপার গড় পার হয়ে চলে গিয়েছে পাহাড়-মুলুকের দিকে। আর-একবার জগন্নাথদর্শনে যেতে মাঝে-মধ্যে তার ইচ্ছা হয়। কিন্তু হয় না। মাঝে-মধ্যে ইচ্ছা হয় জগন্নাথের পাট-অঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে মাথার বুকের সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে বাকী জীবনটা পথের ধারে বসে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে কাটিয়ে দেয়। আর সব চেয়ে বড় বোঝা তার রূপের ডালি ওই মোহিনী, তাকেও জগৎ-নাথের চরণে নিবেদন করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু হয় না, হয়ে ওঠে না; কেমন করে কোথা দিয়ে যে কোন্

পাকচক্র লেগে যায় তা বুঝতে পারে না।

—খাবে মা?

মোহিনী এসে কাছে দাঁড়াল।

—কী? প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পূর্বেই গন্ধ এসে তার নাকে ঢুকল। মহুয়ার গন্ধ; পূর্ণপ্রস্ফুটিত রসপরিপুষ্ট মহুয়াফুল। কৃষ্ণদাসীর বুকের ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার, গন্ধে।

—মহুয়া?

—হ্যাঁ। কী বড় বড় আর কী সুন্দর দেখ। আর কী যে মিষ্টি!

পলাশফুল কুড়োতে কুড়োতে মোহিনী পলাশফুলের সঙ্গে মহুয়াফুল কুড়িয়েছে; আঁচল-ভর্তি। মোহিনীর রসনা মুহূর্তে রসাপ্লুত হয়ে উঠল, রসনার সে রসক্ষরণের সঙ্গে জগবন্ধুদর্শনের কামনাও বোধ হয় গলে ওই রসের সঙ্গেই মিশিয়ে গেল। কয়েকটা মহুয়াফুল তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললে, তুই কতগুলো খেলি? বেশী খেয়েছিস নাকি? আর খাস নে। বলে আবার এক মুঠো মহুয়াফুল তুলে মুখে ফেলে দিলে কৃষ্ণদাসী।

মোহিনী বললে, তবে তুমি খাচ্ছ কেন?

—আমাতে আর তোতে? মরণ! হেসে ফেললে মা।

—শুধু তো গা ঘুরবে! তা ঘুরুক।

—মরণ। যা বলি তাই শোন্। বলে, শুধু তো গা ঘুরবে! মাদকেতে মেতে উঠবি। শুধু মেতে? তেতে উঠবে সারা গা। হেসে ফেললে কৃষ্ণদাসী। আবার গম্ভীর হয়ে বললে, সবেরই একটা বয়েস আছে। এখন হোক থাক্। সে সব আচার-আচরণ আছে, কত ক্রিয়াকরণ আছে, সে সব হবে।

আবার হেসে ফেললে কৃষ্ণদাসী। মহুয়ার রস তার পাকস্থলীতে গিয়ে তার দেহকে মাতায় নি, তাতায় নি, কিন্তু মন তার এরই মধ্যে মেতে উঠেছে। আপন মনেই মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সে।

এসব মোহিনী আবছা বোঝে। লজ্জা হয় সঙ্গে সঙ্গে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার, বলেছে, কী বলিস যা-তা!

মুখ টিপে হেসে দাসী বলেছে, যা-তা? দেখবি, তখন দেখবি। তোকে পুজো করবে লো। চন্দন মাখাবে সারা অঙ্গে। যা-তা নয়। কিশোরী-পুজো।

গুনগুন করে গান গেয়ে শুনিয়ে দিল মেয়েকে: উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী—

একে সেকালের ন্যাড়ানেড়ীর দলের বোষ্টমী, তায় গঞ্জবাজারের জলে-বাতাসে আধা-নটী, তার উপর এই নির্জন নদীতট, তারও উপর মুখে তার মৌফুলের রসাল স্বাদ; সর্বোপরি জীবন তাদের দোটানার স্রোতে হাল্কাপল্কা কাগজের নৌকার মত, জগন্নাথের সমুদ্রতট থেকে ইলামবাজারের ধনীর বাড়ির কিশোরী-ভজনের কুঞ্জ পর্যন্ত যাওয়া-আসা—এক ফুঁ বা একটা দমকা হাওয়ার জোরে প্রায় চোখের নিমেষে চলে; কাজেই কিশোরী-ভজনের রসবিলাস-উপার্জন-প্রত্যাশা তাকে উদ্দাম করে তুললে। ভেসে গেল জগন্নাথকে কন্যা-নিবেদনের সংকল্প,

ভেসে গেল নিজের ভিক্ষায়ে জীবন-ধারণের স্বপ্ন, সে মেয়েকে বলতে লাগল কিশোরী-ভজনের কথা। জানিয়ে দিলে যে, বাইরে যেমন নানান্ আচার ও ধর্মাচরণের পদ্ধতির সঙ্গে কোন একটি নিরীহ বৈষ্ণব মহান্তের সঙ্গে তার মালা বদল হবে, তেমনি ভিতরে কোঠাঘরের উপরে আতর গোলাপ বসনভূষণের সমারোহের মধ্যে বাজারের কোন বিলাসী ধনী এসে তার সঙ্গে বাসরসজ্জা পাতবে।

—দেখবি, ইলেমবাজারের যে আলতা এ চাকলায় কেউ চোখে দেখে না, যা যায় রাজারাজড়ার বাড়ি, সেই আলতা পরাবে তোর পায়ে।

তারপর আবার বললে, সেই ঠিক তার আগে, পরব দেখে তোকে অজয়ের সদর ঘাটে চান করাতে নিয়ে যাবে। সকালবেলা—ভর্তি বাজারের সময়। তোকে দেখবে সব হাঁ করে। তারপর লাগবে—নিলেমের ডাক। হুঁ-হুঁ! ওই সরকারের বেটা অক্রূরের হুমকিতে ভুলব নাকি আমি? না, টেকো রমনের মিষ্টি কথায় ভুলব? যে টাকা দিতে পারবে—। কথা বন্ধ করে মুখ তুলে সে তাকালে।

কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বাজছে; বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে।

বিস্ময়ের সীমা রইল না কৃষ্ণদাসীর। খুব কাছেই কোথাও।

মোহিনী চুপ করে শুনছিল। মায়ের কথাগুলির মধ্যে একটি মারাত্মক মোহ ছিল। তার কিশোরী-মন তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, শুনতে শুনতে অঙ্গ যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ফুল কুড়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার। এই ঘণ্টার শব্দে এবং মায়ের চমকে সে চমকে উঠল না, শুধু সজাগ হয়ে পলাশফুল কুড়িয়ে যেতে লাগল। কোঁচড় প্রায় ভর্তি হয়ে উঠেছে পলাশফুলে। একেবারে তলারগুলি থেকে চাপে এবং পেষণে রাঙা নির্যাস বের হয়ে আঁচল-খানিতে ছোপ ধরিয়েছে।

কৃষ্ণদাসী মৌ-কুড়ানো বন্ধ করে সবিস্ময়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

সামনেই বনান্তরালে অজয় নদী বাঁক ঘুরেছে। সেই বাঁকের মাথায় একখানা বড় নৌকো। নৌকোর গলুইয়ে একটা ধ্বজা উড়ছে। ওই নৌকো থেকে উঠছে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা-শাঁখের শব্দ। মস্তবড় নৌকো।

কার নৌকো? মাঝিমাল্লার মাঝখানে জনকয়েক গেরুয়া পরা লোক: কোথাকার মহান্ত? জয়দেবের মহান্তের ঝাণ্ডা তো নয়! সে তো চেনে কৃষ্ণদাসী।

ঠিক এই সময়েই নৌকার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন সন্ন্যাসী। নৌকোখানা পালে চলেছে এখন। জোর বাতাসে পালের টানে নৌকোখানা তরতর করে উজানে চলেছে। অজয়ের স্রোতও এখন মন্থর। দেখতে দেখতে নৌকোখানা তাদের সামনাসামনি এসে গেল। অজয়ের বালি এখন ওপারে, দক্ষিণ তটে। এপাশের কোল ঘেঁষেই স্রোত। মা-মেয়ে দুজনেই সবিস্ময়ে পা-পা করে এগিয়ে এল তটের ধারে।

অপরূপ সন্ন্যাসী। বৈষ্ণব। চূড়ার মত চুলের ঝুঁটির উপর সাদা ফুলের মালা জড়ানো। কপালে তিলক। বাহুতে তিলক। সবল দীর্ঘকার মানুষ, প্রশস্ত বক্ষটি। তার উপর তুলসীর মালা আর ফুলের মালা জড়াজড়ি করে দুলছে। দেহবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু তাতে অপরূপ একটি

কান্তি আছে, আয়ত দুটি চোখ মুখশ্রীকে অপরূপ করে তুলেছে, শান্ত প্রসন্ন মুখশ্রীতে একটি গম্ভীর উদাসীনতা থমথম করছে।

সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে সদ্য-উদিত সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন।

কৃষ্ণদাসী অবাক হয়ে গেল। কে এল এ নবীন গোসাঁই? এ অঞ্চলের গোসাঁই মহান্ত সকলকেই তো সে চেনে! হোক না সে ন্যাড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের বৈরাগী বৈষ্ণবী; কিন্তু সে ইলামবাজারের ন্যাড়া-নেড়ীদের বড় আখড়ার মা-জী। দুর্নাম থাকলেও এখনও মহোৎসবে চব্বিশপ্রহরে নবরাত্রিতে তার ডাক আসে—তাকে যেতে হয়, তার একটা আসন হয়। আর আখড়ার মহাপ্রভু-বিগ্রহ প্রেমদাস বাবাজীর সেবাসাধনায় জীবন্ত দেবতা; সে বিগ্রহকে দেশের লোক সাধ্যসাধনা করে নিয়ে যায় চব্বিশপ্রহর নবরাত্রিতে। সে সব আসরে সে যোগিনীর মত সাজ করে প্রভুর চরণতলেই বসে থাকে। যিনিই হোন, যত বড় গোসাঁই হোন, এসে তার হাত থেকেই চরণোদক নিয়ে ধন্য হন। সে সকলকেই তো জানে চেনে। এ কে? এ গোসাঁই সেখানকার কেউ নয়। এ তা হলে কোন দূরান্তরের গোস্বামী মহান্ত, নিজের মঠের ধ্বজা উড়িয়ে আসছেন জয়দেব প্রভুর পাট পরিক্রমা করতে। তীর্থযাত্রী গোস্বামী মহান্ত; বড় সুন্দর নবীন মহান্ত। গৌর যেন নবকলেবর ধরে আবার অবতীর্ণ হয়েছেন পাতকী-তারণের জন্য। প্রভাতটি আজ ভাল। দর্শন-পুণ্য হয়ে গেল। নৌকোখানা পার হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণদাসী যাই হোক, বৈষ্ণবের ঘরে তার জন্ম, বৈষ্ণবের আখড়ায় সে বাস করে, সে এ গোসাঁইকে দেখে প্রণাম করতে ভুলল না। সেই তটভূমিতে নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করে উঠে হাত জোড় করে রইল। পর-মুহূর্তে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে যতখানি সে অবাক হল ততখানি সে বিরক্ত হল। মেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ে না। কৃষ্ণদাসী তার হাত ধরে টানলে: মর্—মর্—মর্। প্রণাম কর্। প্রণাম কর্।

মোহিনী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে বসে মাথাটি লুটিয়ে দিলে।

কী যে হাবা মেয়ে! প্রণাম করতে গিয়ে আঁচল ছেড়ে দিয়েছে। পলাশফুলগুলি ঝরঝর করে পড়ে গেছে মাটিতে ছড়িয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় সেদিন সকাল থেকেই অনেক ভিড়। মাধবার্চনা শুরু আজ থেকে। এই শুক্লপক্ষ ষোলকলায় পরিপূর্ণ হওয়ার ক্ষণে মাটিতে চাঁদের উদয় হয়েছিল, আজ প্রেমদাস বাবাজীর মত সিদ্ধ সাধকের পাটে ভিড় হবে বইকি। প্রবীণ যাঁরা তাঁরা বলেন, প্রেমদাস বাবাজী যখন নামগান করতেন তখন বিগ্রহের আবেশ হত। প্রভুর কাঁধের উপর থেকে উত্তরীয় খসে খসে পড়ত; চোখের কোণ দুটি চিকচিক করে উঠত।

ইলামবাজার আর জয়বাজারের মাঝখানে খানিকটা উত্তরে অজয় থেকে কিছুটা দূরে এই বাবাজী-পল্লীটি। অধিকাংশই মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি, মাটির মেঝে; চারিপাশ বাঁশঝাড় নিম সজনে রাঙচিতের বেড়ার সঙ্গে জমিয়ে তুলে তারই বেড় দিয়ে ঘেরা; শান্ত

নিস্তব্ধ পল্লীটি ; ক্বচৎ কোলাহল কলরব শোনা যায় ; মধ্যে-মাঝে দু-চারটে উচ্চ কণ্ঠে ডাক শোনা যায় : আয়, আয়, আঃ—অ মঙলী—। অর্থাৎ মঙলী গরুটিকে ডাকে। নয়তো শোনা যায় : অ—রে, অ, বে—জো—! বে জো রে—! অর্থাৎ অ ব্রজবল্লভ কি ব্রজদাস। কখনও কখনও রূঢ় কটু কণ্ঠস্বরে শোনা যায় : আরে ও হতচ্ছাড়া মুখপোড়া। উচ্চকণ্ঠের এই হাঁকডাকগুলি পাড়াটির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চারিপাশের আখড়াগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, গাছগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে ; পত্রপল্লবে সাড়া জাগিয়ে অকস্মাৎ কুহু-কুহু শব্দ তুলে ত্রস্ত কোকিল উড়ে চলে যায়, কিংবা কা-কা শব্দ তুলে উড়ে যায় কাক। কখনও শোনা যায় গরুর হাম্বা রব—বাঁধা গাইটি তার দূরে-চলে-যাওয়া বাছুরটিকে ডাকছে। আখড়াগুলি সকাল থেকে নির্জনই থাকে, ভোরবেলা থেকেই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা খঞ্জনি একতারা গোপীযন্ত্র নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে ভিক্ষায় বের হয় ; আখড়ায় থাকে শুধু বৃদ্ধেরা আর নিতান্ত যারা কিশোরী বা সদ্য-যুবতী তারা। বৃদ্ধেরা দাড়ির বিন্যাস করে আর গুন গুন করে গানের সুরে বিলাপ করে, "ও হায় প্রেম করা আমার হল না।" যুবতীরা ঘরের পাট-কাম করে, কাঁথা সেলাই করে, চূড়া করে চুল বাঁধে, নাকে রসকলি আঁকে। মধ্যে-মাঝে কোকিল বা পাপিয়াকে সুর করে তাদের ডাক ডেকে ভেঙায়—কু-উ! কু-উ! কু-উ! চোখ গেল! চোখ গেল! কখনও-সখনও আপন আখড়ার আগড় বন্ধ করে পাশের আখড়ার সখীর কাছে গিয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ তুলে বলে, শুনেছিস ?

—কী ?

—মা-জীর কথা ?

—ডুলি এসেছিল তো ?

—হ্যাঁ। সঙ্গে পাহারা।

—মরণ, তার আর শুনব কী ?

—আমার কাছে শোন্। কান কাছে আন্।

কানে কানে সে কী বলে। শুনে এ সখী খিলখিল শব্দে হাসতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে যে বলে সেও শুরু করে হাসতে। খিলখিল হাসির ঐকতানে চঞ্চল হয়ে ওঠে কুঞ্জগুলি। এই পর্বপার্বণের দিনে শুধু সকলেই তারা আখড়ায় থাকে ; নিজেদের করণীয় নিয়মগুলি পালন করে। আজ প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় সকলেই প্রণাম করে অর্চনা করে মাধবার্চনা-গৌরাঙ্গার্চনায় প্রথম দিনটি পালন করবে।

কৃষ্ণদাসী কপালে তিলক কেটে রেশমের ঝাড়া সুতোর তৈরী কেটের কাপড় পরে প্রভুর সেবায় নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছে। আপন মনে স্তবগান করে চলেছে।

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় শচীনন্দন !

আর-সব কথা সে ভুলে গিয়েছে। রাধারমণ সরকারের কথা, তার ছেলে অক্রূরের কথা —সব কথা। এখন শুধু সম্মুখে আছেন প্রভু। তিনি যেন জগৎ জুড়ে বসেছেন। সে মধ্যে মধ্যে কাঁদে। অনুতাপে নয়, অপূর্ণ কামনার জন্য নয়—এমনি কাঁদে। আপনি যেন কান্নার সাগর উথলে ওঠে। কতজন কত কথা বলে। বলে, এ কী করে হয়? যে কৃষ্ণদাসী সেজে-

গুজে গায়ে গন্ধ মেখে ডুলি-চড়ে দাস-সরকারের কুঞ্জে যায় নটীর মত গান গাইতে; শুধু দাস-সরকার হলেও কথা ছিল না, আরও দু-চারজন জমিদার-জোতদারের বাড়ি যায়, সে এমন কাঁদে কেমন করে?

কেমন করে কাঁদে সে কৃষ্ণদাসীও জানে না, কিন্তু সে কাঁদে। দুটো জীবন তার যেন দুটো আলাদা ঘরের মত। দুই ঘরের মধ্যে কোন যোগ নেই। অথবা দুটো আলাদা পাত্রে সে তরল পদার্থের মত আলাদা আকার ধারণ করে।

আজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে তার সুর কেটে যাচ্ছে।

প্রভুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওই সকালে-দেখা নবীন গোসাঁইয়ের মুখ মনে পড়ছে। যেন গৌরের মুখের সঙ্গে ও-মুখের কোথাও মিল আছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগছে—কে? ও কে? এই নবীন গোসাঁই কোথা থেকে এল?

কথাটা শুধু নিজের মনের থেকেই নয়—বাইরে থেকেও বার বার এসে হাজির হল, যারা আখড়ায় প্রণাম করতে এল তারাও কথাটা তুলে দিয়ে গেল।

যারাই দেখেছে নৌকার উপর সূর্যপ্রণামরত এই নবীন সন্ন্যাসীকে, তাদের সকলের মুখেই ওই এক কথা—আহা, কী দেখলাম! মরি মরি মরি! কী রূপ, কী ছটা! কে? এ সন্ন্যাসী কে?

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলে, বললে, কোন্ মায়ের ঘর আঁধার করে বুক খালি করে পথে বেরিয়ে এল সোনার চাঁদ!

ওরই মধ্যে নিতাই দাস ভাবুক লোক—সাধন-ভজনে নিষ্ঠাবান মানুষ। সে বললে, মাকে না-কাঁদালে লীলা বুঝি হয় না, বুঝেছ না! রাম পিতৃসত্য পালনে বনে গেলেন—মা কৌশল্যা কাঁদলেন; গোবিন্দ মথুরা এলেন—মা যশোদার চোখের জলে মাটির পৃথিবী গলে গেল। গৌর আমার পথে বেরুলেন পাতকীতারণে—শচীমা কেঁদে সারা। জয় গৌর! জয় গোবিন্দ!

বৈষ্ণবের আখড়ায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর আলোচনা; ওদের জীবনে একটি তার—একতারাতে একটি সুরই বাজে, কথাবার্তা সেই সুরেই চলে।

তরুণী বৈষ্ণবীরা কানাকানি করে—নিতাই দাসকে অভিশাপ দিয়ে বললে, মরণ, বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। শ্রীমতীর কান্না মনে পড়ল না! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জলের কথা জিভ দিয়ে বেরুল না? মর্ বুড়ো, মর্।

কৃষ্ণদাসী কথা বললে না। শুধু কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, আর প্রতিবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার পর মুখ তুলে উদাস দৃষ্টিতে সূর্যালোকিত আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ে রইল। মেয়ে মোহিনী অবাক হয়ে শুনছিল কথাগুলি।

এমন সময় এল গোপীদাস বাবাজী। বিচিত্র মানুষ। বাউল বৈষ্ণবদের কাছে বিচিত্র নয়; কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে বিচিত্র। গোপীদাস মুখে মুখে পদ রচনা করে পথে পথে একতারা বাজিয়ে গেয়ে বেড়ায়। গাইতে গাইতেই সে এল—ওই সন্ন্যাসীর কথা নিয়েই গান।

—কে এল সই নবীন সন্ন্যাসী ?
দেখে তারে, মন কী করে, ও হায় পরান-উদাসী !
তার হাতে নাই বাঁশী,
পীতধড়া নাই পরনে, গেরুয়াতে নবীন দেয়াশী—
তমালতলার ধূলা ঝেড়ে, আয় গো রাধে—যাই দেখে আসি।

গানে গোপীদাস মাতন তুলে দিলে—

ভাল ক'রে দেখ সে মিলায়ে—
সাজ বদলের আড়াল দিয়ে দিস নে তারে যেতে পালায়ে—
(দেখ না কেন) যায় নি ঢাকা বাঁকা নয়ন—মধুমাখা অধরের হাসি।

গানের শেষে গোপীদাস বললে, অজয়ের ঘাট, বাজার হাট—সব জুড়ে এই এক কথা মা-জী। কে ? কে এল ? আমি বললাম—সে-ই এল রে, সে-ই এল। সঙ্গে সঙ্গে গায়েন এসে গেল। জয় নিতাই গৌরাঙ্গ হে ! জয় রাধে !

খবরটা নিয়ে এল শেষ পর্যন্ত কয়ো বোরেগী। সে প্রায় সন্ধ্যাবেলায়। সারাটা দিনে তখন কৃষ্ণদাসী সন্ন্যাসীর কথা প্রায় বিস্মৃত হয়ে বসে আছে। শুধু কৃষ্ণদাসী কেন, বৈষ্ণব-পল্লীতেও তখন সন্ন্যাসীর আলোচনা, তাকে নিয়ে প্রশ্ন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কর্মময় সংসার, সেখানে প্রশ্ন মনে করে রাখবার অবকাশ কোথায় ?

বৈষ্ণব-পল্লীতে গাই দুইবার সময় এল। উনুনে আঁচ পড়ল, রান্না চাপল ; ফাল্গুন মাসের শেষ, চৈত্র-কিস্তির খাজনার তাগিদ নিয়ে জমিদারের পাইক এল ; দু-চারজন পাওনাদারও এল। এল জন-দুয়েক পেশোয়ারী পাঠান—গরম কাপড় মলিদা আলোয়ানের ব্যবসাদার ; ধারে গত বছর গায়ের কাপড় দিয়ে গেছে, তার টাকার তাগিদে।

—এ বাবাজী, এ কোকনদাস (খোকনদাস) বৈরাগী ! টাকা—টাকা—টাকা লাও। এ—

আরও এল দু-একজন ফেরিওয়ালা : কেঁ-টের কাপড় !

আরও এল দু-চারজন বিচিত্র চরিত্রের লোক। তিলক-ফোঁটা-কাটা লোক আখড়ায় বসে প্রবীণা বৈষ্ণবীদের সঙ্গে গুজ-গুজ ফুস-ফুস কথা বললে। সে কথাগুলিও বিচিত্র।

মাধবার্চনার পক্ষারম্ভে পরকীয়া-সাধন করবেন এখানকার অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত ধার্মিক জনেরা। তারই সাধনসঙ্গিনী চাই। যোগাযোগ অবশ্য আগে থেকেই আছে, তবুও নিমন্ত্রণ এসেছে নূতন করে।

কৃষ্ণদাসীর বাড়িতেও লোক এসেছে—এখানকার মস্ত গদির মালিক রমণ সরকারের ওখান থেকে। পুজো নিয়ে লোক এসেছিল ; তারই সঙ্গে ইশারায় ডাকও এসেছে। সন্ধ্যার পরই ডুলি আসবে। এর পরই তার সারা মন ওই মুখে ফিরেছে ; যে-মন নিয়ে মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে ফিরে সেবায় নিযুক্ত ছিল, সেবা শেষ করতে সে-মন তৎপর হয়ে উঠল। বিগ্রহের ঘরের দরজা বন্ধ করে মন এসে বসল তার বিলাসের সাজঘরে। যে চোখ থেকে এতক্ষণ বিগ্রহের

দিকে চেয়ে জল ঝরছিল, সেখানে চঞ্চল দৃষ্টি ফুটে উঠল। কৃষ্ণদাসীর মনে রাখবার অবকাশ কোথায় ?

মনে রেখেছিল শুধু মোহিনী। সারাটা দিনই ওই সন্ন্যাসীর ছবি তার মনে মনে ভেসে বেড়িয়েছে। অপরূপ সন্ন্যাসী! আর কানের পাশে বেজেছে গোপীদাস বাবাজীর গান—

কে এল সই নবীন সন্ন্যাসী ?

তাই কয়ো বোরেগী আসতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলে মোহিনী। কয়ো অর্থে কাক; কাককে এখানে 'কয়ো' বলে; বোধ করি বা 'কউয়া' শব্দের বঙ্গজ রূপ। 'কয়ো বোরেগী' নাম নয়, আসল নাম একটা আছে, কিন্তু সে লোকে ভুলে গেছে। বাউণ্ডুলে গাঁজাখোর ভিক্ষুক। কিন্তু ভিক্ষে সে গৃহস্থের দোরে-দোরে ঘুরে করে না, সে বেছে বেছে গিয়ে দাঁড়ায় এ অঞ্চলে যে বাড়িতে যেদিন কোন একটা সমারোহ থাকে সেদিন সেই বাড়িতে। সে শ্রাদ্ধই হোক আর গৃহশান্তিই হোক, অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা ব্রত কি যা-কিছু হোক। ভিক্ষার ঝুলি তার আছে, কিন্তু সেটা পূর্ণ করার চেয়ে পেট পূর্ণ করে খেয়ে-দেয়েই সে অধিক তৃপ্ত। এ অঞ্চলে কোথায় কবে কোন্ সমারোহ সে সমাচার তার নখ-দর্পণে। সেই কারণে সে ভোর থাকতে উঠে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হয় হয়তো কোনদিন চার ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ; পথে যেখানে যত সমৃদ্ধ বাড়ি বা ঠাকুরবাড়ি আছে—সেখানে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে, জলপান খেয়ে, গাঁজায় দম দিয়ে আবার রওনা হয়। ঠাকুরবাড়িই সে বেশী পছন্দ করে; কারণ সেখানে যা পায় তা মুড়ি-মুড়কি-পাটালিগুড় জলপান নয়, সে পায় বাল্যভোগের বা প্রভাতীভোগের প্রসাদ—ছোলাভিজে, বাতাসা, একটু ছানা, এক টুকরো আর-কিছু, কোন কোন মন্দিরে দুখানা পুরিও মিলে যায়। এ গুণগুলির সঙ্গে এ অঞ্চলের লোকে কাকের গুণের যথেষ্ট মিল দেখতে পায়। আরও একটি গুণ আছে—কাকের প্রকৃতি ও গুণের সঙ্গে যার মিল নাকি প্রায় আধ্যাত্মিক। কাকেরাই নাকি বার্তা নিয়ে আসে সকলের আগে। ওরা অযাচিতভাবে বার্তা বহন করে এনে দিয়ে যায়। এটা নাকি কাকচরিত্র-পণ্ডিত যাঁরা তাঁদের মত। বাড়িতে কাক এসে বসে কলকল করে রব করলে বুঝতে হবে, বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। আরও মিল আছে। কয়ো বোরেগীর গায়ের রঙ কালো, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং পা দুখানি কাকের পাখার মতই অশ্রান্ত ও দ্রুত। লোকে দেড় প্রহরে যে পথটা হাঁটে, কয়ো বোরেগী এক প্রহর না-যেতেই সে পথ চলে যায়। মধ্যে মধ্যে কয়ো কৃষ্ণদাসীর আখড়ায় এসে হাজির হয় এবং চেরা গলায় ডাকে—গৌর বলে কয়ো এসেছে মা-জী! এঁটো-কাঁটা যা আছে ছিটিয়ে দাও। জয় গৌর! নিতাই হে!

ওইটিই ওর সকলের দরজায় ভিক্ষার বুলি।

সেদিন সন্ধ্যার মুখ। কৃষ্ণদাসী তখন ব্যস্ত। ঘরের সকল কাজ সেরে নিয়েছে। প্রভুর আরতি হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুত হচ্ছে সে সাধনরাত্রির জন্য। দেহ-মার্জনা আছে, প্রসাধন আছে। দুধের সর এবং ময়দা মুখে মেখে ধুয়ে-মুছে হলুদের-সূক্ষ্ম চূর্ণ-বাঁধা মিহি কাপড়ের খুপনিটি মুখের উপর হালকাভাবে বুলিয়ে নিয়ে রসকলি তিলক আঁকতে হবে। চুল বাঁধা আছে। রামারমণ দাস-সরকার প্রৌঢ় বৈষ্ণব মানুষ, নটীর প্রসাধন বা সজ্জা তাঁর কাছে

পলাণ্ডুর মতই অস্পৃশ্য অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-বেশ না-হলে তিনি দোড়গোড়া থেকেই ফিরিয়ে দেবেন। বৈষ্ণবীর বেশই তাকে এমন করতে হবে, যাতে সুর্মা-টিপ-ওড়না-চুড়ি-সমৃদ্ধ নটী বা তওয়াইফী-বেশকে হার মানাতে পারে। ব্যস্ততা সেই জন্য। কিন্তু কয়োর আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না। কারণ কয়ো কাকের মত, তাড়ালেও যায় না। তাড়া দিলে কাকেরা উড়ে উড়ে গিয়ে সরে বসে, মুহূর্ত পরে আবার আসে; কয়োও তাই, এখন তাড়ালে একটু পরেই আবার ফিরে আসবে সে, এবং হাঁকবে: গৌর বলে কয়ো আবার এসেছে মা-জী। জয় গৌর! নিতাই হে!

একখানি মালপোয়া এবং মালসাভোগের কিছু একটি পাতায় সাজিয়ে আলগোছে তার হাতে দিয়ে দাসী বললে, আজ আমার তাড়া আছে কয়ো, তুই অন্য কোথাও বসে খেগে যা।

কয়ো পাতাখানা সামনে পেতে নিয়ে বললে, কোথায় যাব? যেতে যেতে চিলে ছোঁ মারবে। ও-বেটাদের হাতে কয়োরও রেহাই নাই। কোথাও যাবে বুঝি?

কয়ো নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করলে। ওর প্রশ্নে শ্লেষ নেই, ঘৃণাও নেই। কয়োর কুৎসা রটনার প্রবৃত্তিও নেই। ও শুধু শোনে, শুধু বলে। জেনে সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করে না বলে ও তা কাউকে করাতে চায় না।

—কোথায় যাব? দাসী বললে, কত কাজ, সে আর তুই বুঝবি কী? সেই ভোর থেকে—

কথা কটা বলতে বলতেই চলে আসছিল কৃষ্ণদাসী, হঠাৎ পাশ থেকে মোহিনী প্রশ্ন করে বসল। সন্ন্যাসীর কথা কয়ো তো নিশ্চয় জানবে। সে বললে, হ্যাঁ কয়ো, জয়দেবের ঘাটে আজ কোন্ গোসাঁই মহান্ত এল? মস্ত বড় নৌকো। শিষ্যসেবক। এই উঁচু ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডাতে গড়ুর আঁকা। খুব ধুমধাম! কে সে কয়ো?

মেয়ের প্রশ্ন শুনে কৃষ্ণদাসীও ঘুরে দাঁড়াল। তারও মনে পড়ে গেছে।

কয়ো আগেই মালপোতে কামড় মেরেছিল। বিচিত্র কয়ো, বিচিত্র তার খাওয়া। সে খেতে আরম্ভ করে উলটো দিক থেকে। শাক থেকে নয়—মিষ্টি থেকে। এঁটোকাঁটার খাওয়া তো, আগাগোড়াটা একসঙ্গেই পায়। তাই ওইভাবে খেতে অসুবিধাও নেই। জিজ্ঞেস করলে বলে, হাবজ-গাবজ ঘাস-পাতা খেয়ে পেট ভরে গিয়ে শেষে যদি ভাল জিনিস খাবার জায়গা না থাকে! এবং চিবোয় সে চোখ বুজে। মালপোয় কামড় মেরে চিবোতে চিবোতে সে ঘাড় নাড়তে লাগল, উঁ-হু। উঁ-হু।

—উঁহু কী? আমি নিজে চোখে দেখেছি।—কৃষ্ণদাসীর দেরি হয়ে যাচ্ছে; ভ্রূ কুঞ্চিত হল তার। একটু উচ্চস্বরেই সে বলে উঠল, আমি নিজে চোখে দেখেছি।

কয়ো কোঁত করে গ্রাসটা গিলে এবার বললে, হুঁ। সে জয়দেবে নয়।

—তবে কোথায়?

—কদমখণ্ডীর ঘাটের ওপারের ঘাটে।

—ওপারের ঘাটে? শ্যামরূপার ঘাটে?

—হুঁ। রাজার ছেলে কালাপাহাড়। বলে, রাধা মানি না। জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা

নয়, চামুণ্ডো। ঠাকুর এনেছে শুধু শ্যাম। ওই শ্যামরূপার ভাঙা গড়ের এক পাশে মঠ বানাবে। বোষ্টুমী গেলে ঝাঁটা মারবে।

কৃষ্ণদাসী অবাক হয়ে গেল। শ্যামরূপার ভাঙা গড়ের এক পাশে মঠ বানাবে! ভাঙা মঠ জঙ্গলে ভর্তি, বুনো শুয়োর সাপ-খোপের আড়ত। মধ্যে মধ্যে বাঘ আসে। ভালুকের তো কথাই নেই। এই তো ভালুকের সময়। মৌ পেকেছে, মৌ খেতে আসবে। মৌ খেয়ে মাতাল হয়ে ধেই-ধেই করে নাচবে। সেইখানে মঠ করবে!

জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা নয়, চামুণ্ডো! রাজার ছেলে কালাপাহাড়! শুধু শ্যাম! রাধা নেই! কী আবোল-তাবোল বকছে কয়ো?

অধীর হয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, অ মুখপোড়া, তা চোখ খুলে কথা বল্ না কেন? এসব আজগুবী কথা বললে কে তোকে?

কয়ো কিন্তু চোখ বুজেই খেতে খেতে বলে গেল, পাঁচজনে এক কথা দু কথা করে দশ কথা বললে—কয়ো শুনে এল। তুমি শুধাচ্ছ—বলছি। মস্ত বড় ঘরের ছেলে। হয় বামুন, নয় কায়স্থ। রাজা বাপের বেটা। খুব নাকি পণ্ডিতও বটে, কাশীতে পড়ত। তা'পরেতে সন্ন্যেসী হয়ে যায়। বাপ মরে গেল, অনেক ধন। ভাইকে সর্বস্ব দিয়েছিল। এখন এই স্বকীয়াওলারা কাশীতে এলে পর জুটল তাদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই এ দেশে এয়েছিল চেলা হয়ে।—একটুকুন জল দেবা? গলাতে আঁটির মতন আটকায়—

চোখ খুলল কয়ো।

কৃষ্ণদাসী তখন চলে যাচ্ছে। পাঁচজনের মুখের উড়ো কথা! ও শুনতে কৃষ্ণদাসীর প্রবৃত্তি নেই। হ্যাঁ, কোন একটা লোকের মত লোকের কথা হত তো শুনত কৃষ্ণদাসী। উড়ো কথা আর ঝরা পাতা—ও দুইয়ে আগুন দিয়ে ছাই করে দিয়ো। উড়ো কথা সব মিথ্যে আর ঝরা পাতা আবর্জনা—দূর, দূর। কয়ো ডাকলে—মা-জী!

—মরণ!—কী?

—জল।

—জল! বললাম, ঘাটে খেগে যা। আমার এখন হাতজোড়া।

—আমি দিচ্ছি মা।—মোহিনী বলে উঠল। ছুটে ভিতরে গিয়ে জলের ঘটি হাতে আবার বেরিয়ে এল সে।

কৃষ্ণদাসী ভুরু কুঁচকে বললে, তা বলে ছুঁস না যেন কয়োকে। যে আঁচলের ফেঁচা তোর, উড়ছে—উড়ছে—উড়ছে। পতাকার মত ফত-ফত করে উড়ছে। সামলাস আঁচল।

কৃষ্ণদাসী বাড়িয়ে বলে নি। পনের বছরের কিশোরী মোহিনী মনেও যেমন এখন অপরিপক্ব, দেহেও তেমনি অপরিপূর্ণ এবং অপটু। পনের বছরের কিশোরী মোহিনী এখনও হিলহিলে পাতলা; হাতের মুঠিতে কোমর ধরতে পারার কথা প্রচলিত আছে, কিশোরীকে দেখে তাই মনে হয়। কৃষ্ণদাসীর পাটের শাড়ি পরে পুজোর কাজ করে মোহিনী, কিন্তু সে কাপড় মোহিনী ভাল সামলাতে পারে না। আঁচল ঝলমলে হয়ে ঝুলে পড়ে, মাটিতে লুটোয়, বাতাসে ওড়ে; কখনও কখনও পায়ের সঙ্গে কাপড়ের প্রান্ত জড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে আছাড়

খেয়ে পড়ে। মায়ের সাবধান কিন্তু কয়োকে ছোঁয়াপড়ার ভয়ে। কয়ো সত্যি সত্যিই কয়ো অর্থাৎ কাক। খাদ্যের বাছবিচার নেই, ঘরেরও বিচার সে করে না ; যার ঘরে ভাত আছে—সে ব্রাহ্মণই হোক আর চণ্ডালই হোক, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভিক্ষে সে তার ঘরেই করে। ওকে কি ছোঁয়া যায় ?

কাপড় সামলে নিয়েই মোহিনী ঘটি হাতে কয়োর সামনে দাঁড়াল। কয়োকে মোহিনী ভালবাসে। মা না থাকলে কয়োকে পেলে মোহিনীর সময়টা কাটে ভাল। সারা চাকলাটার খবর বলে কয়ো। শুধু খবর নয়, এ অঞ্চলের যত গল্প সব তার জানা। ওই ওপারের ইছাই ঘোষের দেউলের গল্প ; শ্যামরূপার গড়ের গল্প ; এপারে কালু ডোমের ডাঙার গল্প—সব সে জানে। জয়দেবের গল্প অবশ্য সবারই জানা, কিন্তু এসব গল্প কজন জানে ? তা ছাড়া দিল্লিতে বাদশা মারা গেলে কয়ো আগে খবর আনে। মুরশিদাবাদে কোন ফরমান জারি হলে, সে খবর সর্বাগ্রে জানতে পারে কয়ো।

মোহিনী এসে দাঁড়াল, কিন্তু কয়ো তখনও চোখ বুজে রয়েছে, চিবোচ্ছে। মোহিনী বললে, জল নে কয়ো।

—মোহিনী !—অঞ্জলি পাতলে কয়ো। খানিকটা খেয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ইশারা দিলে 'আর না'। তারপর আবার আরম্ভ করলে আহার। এবার নীরবে। কেষ্টদাসী নাই, কাকে বলবে! মালপোর শেষটুকু মুখে পুরে চোখ দুটি মুদ্রিত করলে। কিন্তু মোহিনী প্রশ্ন করলে, তারপর কয়ো ?

—কী ?—অস্পষ্ট কথার সঙ্গে ভুরু দুটি চকিতে ওপরে উঠে নীচে নামল, ঘাড়টি ঈষৎ দুলল। অস্পষ্ট কথা ইশারায় স্পষ্ট করে তোলে কয়ো। কথা তো তাকে খেতে খেতেই কইতে হয়।

—ওই যে সকালের গোস াঁয়ের কথা। কোথাকার রাজার ছেলে ?

—কে জানে ? শুনলাম রাজার ছেলে।

—ঘরে পরিবার ছেলেপুলে আছে ?

—তা আছে বইকি। উহুঁ, নাই।—ঘাড় নাড়লে কয়ো: থাকলে ভাইকে রাজ্যি দেবে কেন ?—একটু চুপ করে থেকে বললে, ছিল বোধ হয়, বোধ হয় মরে গিয়েছে সব।—আবার একটু চুপ করে থেকে বললে, ভাইটা ভাল। মঠ করবার জন্যে টাকাকড়ি অনেক দিয়েছে। সম্পত্তিও দেবে। শ্যামরূপার গড়ের অংশ কিনেছে।

বলেই যায় কয়ো, জয়পুরী পণ্ডিতেরা নবদ্বীপে হার মেনে দস্তখত করে রাধারাণীর জয় দিয়ে জয়পুর ফিরে গেল। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এ ছেলে নাম কাটিয়ে নিজেই মত বানিয়েছে, বুয়েচ !

বলে গেল অনেক কথা। শুনে এসেছে কেঁদুলীর মহান্তের মঠে।

কদমখণ্ডীর ঘাটে নেমে পুজো ভেট অবশ্য পাঠিয়েছে, কিন্তু নিজে দর্শন করতে যায়নি এই নবীন গোস্বামী। চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রণাম জানিয়ে শ্যামরূপার গড়ের ঘন অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কেন্দুলীর মহান্ত বলেছেন—অধার্মিক!

মহান্তের লোকজনেরা বলাবলি করেছে—লাগবে।

পাইকেরা লাঠি-সোঁটায় ভাল করে তেল মাখিয়েছে।

হঠাৎ থেমে গেল কয়ো। তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। বললে, দাও, আর খানিক জল দাও। বেশী দিয়ো না। মালসাভোগ প্যাটে গিয়ে জল পেয়ে গেঁজে উঠে ফাঁপবে। হুঁ, আর না। এই ঠাঁইটাতে দাও, হাত বুলিয়ে নিই। নইলে কাল এলে মা-জী ঝাঁ-ঝাঁ করে লাগবে—এক্কেরে বাঘিনীর মতন।

মোহিনী বললে, তারপর কয়ো?

—আর জানি না। কয়ো পাতাটা মুড়ে হাতে নিয়ে চলে গেল। কয়োর খাওয়া শেষ হয়েছে, আর কথা সে বলবে না। এবার হাত মুখ ধুয়ে কোথাও বসে আবার গাঁজা খাবে। তারপর শুয়ে পড়বে। তবুও আজ সে বেরিয়ে যাবার সময় বললে, দরজা-টরজা দাও বাপু। একলা থাকবে। কয়ো এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছে যে, কৃষ্ণদাসী আজ বাইরে যাবে। তার কথাবার্তার সুর থেকে, তার গা ধোয়ার জন্য ব্যস্ততা থেকে সে বুঝে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়েছে যে আজ ফাল্গুনের শুক্লা-প্রতিপদ। এবং একসময় বাড়ির বাইরে কয়েকটা শব্দও পেয়েছে। বুঝতে তার বাকী থাকে নি যে, ওপাশে খিড়কির ডোবাটার চারিপাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও ডুলি নিয়ে বেহারারা এসে বসল। ওই ডুলিতেই কৃষ্ণদাসী যাবে দাস-সরকারের কুঞ্জে। মা চলে যাবে, মোহিনী একরকম একলা থাকবে।

অবশ্য ভয় এ-কালে তেমন কিছু নেই। নবাব জাফর কুলী খাঁর শাসনের গুণে এ দেশে এখন বাঘে-বকরিতে এক ঘাটে জল খায়, বাজে-কবুতরে এক গাছের ডালে বসে জিরোয়। কাটোয়ার নায়েব ফৌজদার কুড়ালিয়া মহম্মদ জানের দাপটে চোর ডাকাত শীতের সাপের মত মুদ নিয়েছে।

তা ছাড়া, এই যে আখড়া প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধপাট—এ হল লোহার বাসর ঘরের চেয়েও নিরাপদ। এ জায়গা মহাপ্রভুর আদেশে দৈববলে সুরক্ষিত। এখানে মন্দ অভিপ্রায়ে কেউ রাত্রে ঢুকলে আর বের হতে পারে না। ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই হয় রাত্রের মত অন্ধ হয়ে বসে থাকে অথবা পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে; সকাল হলে ধরা পড়ে যায়। অনেকে বলে, রাত্রে এই আখড়ার মধ্যে অবিরাম খড়মের আওয়াজ ওঠে। যিনি এই আখড়া রক্ষা করেন তিনি ঘুরে বেড়ান। এর উপর কৃষ্ণদাসী নিজে অনেক সিদ্ধবিদ্যা জানে। প্রেমদাসের বৈষ্ণবী আসামের মেয়ে ছিল। ডাকিনী-বিদ্যা জানত। কৃষ্ণদাসীকে সে বিদ্যা সে দিয়ে গেছে। সাধনা করে ভগবান পেয়ে যে সিদ্ধি তা কেউ কাউকে দিতে পারে না, কিন্তু এ সব বিদ্যা দেওয়া যায়। কৃষ্ণদাসী ঘরবন্ধন জানে, অঙ্গবন্ধন জানে। যাবার আগে এক মুঠো সরষে হাতে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে আখড়ার চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে যাবে। ওই সরষে-গণ্ডি লঙ্ঘনের সাধ্য কারুর নেই। প্রতিটি সরষে হয়ে উঠবে এক এক সাপ। গণ্ডির ভিতর পা বাড়ালেই ফণা তুলে দংশন করবে। মন্ত্র পড়ে মোহিনীর অঙ্গবন্ধন করে দিয়ে যাবে। সেই অঙ্গ কেউ স্পর্শ করলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে মরে যাবে।

মোহিনী চুপিচুপি বললে, তুই থাক্ না ভাই কয়ো।

—থাকব?—কয়ো অবশ্য কখনও কখনও থাকে, মোহিনীকে আগলায়। যতক্ষণ কৃষ্ণদাসী না আসে ততক্ষণ দাওয়ায় শুয়ে গল্প বলে, মোহিনী ঘরের ভিতর জানালার ধারে শুয়ে শোনে। কৃষ্ণদাসী চলে গেলে মোহিনী কয়োকে দরজা খুলে দেয়। কয়ো বাড়ি এসে ঢোকে। কয়োর বাড়ি ঢোকার কোন ব্যাঘাত হয় না। তার কারণ মোহিনীই যে ডাকে, আর কয়োর মনেও যে কোনও মন্দ অভিপ্রায় থাকে না। সুতরাং আখড়ার দেবতাও কোনদিন রুদ্রমূর্তি ধরেন না, মন্ত্রপড়া সরষেও সাপ হয় না। কেন হবে? তবে কয়ো আভাস যেন পায়। মনে মনে প্রণাম করে বলে—আমার ধর্ম আমার ঠাঁই, গোসাঁই, তোমার ধর্ম তোমার ঠেঞে। মেয়েটা ভয় পেয়েছে একলা আছে, আমি ধর্মের মুখ চেয়ে এসেছি আগলাতে। ভয়টয় দেখিয়ো না, অধর্ম হবে।

কৃষ্ণদাসী দাস-সরকারের কুঞ্জে গিয়েই এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলে—ওই সন্ন্যাসীর কথা। সকালে সন্ন্যাসী দেখার পর এসে দেবকার্যে নিযুক্ত করেছিল নিজেকে। ভুলে না গেলেও সন্ন্যাসীর কথা ভাববার অবকাশ হয় নি; সুযোগ হয় নি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কথাটা। কিন্তু এই অভিসারে বের হবার পর-মুহূর্তে কয়োর কথায় তার কৌতূহল বিচিত্রভাবে প্রবলতর হয়ে উঠল।

মঠ করবে সন্ন্যাসী ওই শ্যামরূপার গড়ে?

রাজার ছেলে সন্ন্যাসী হয়েছে?

এই দুটো খবরই তার কৌতূহলকে দুর্দমনীয় করে তুলতে যথেষ্ট।

রাজার ছেলে সন্ন্যাসী! তাই এত রূপ! তাই এত গম্ভীর! অভিসার-যাত্রাপথের চঞ্চল মন একটু অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠল। দাস-সরকারের কুঞ্জে ঢুকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে, আজ নতুন সন্ন্যাসী কে এল সরকার মশাই? সারা চাকলা চন-মন করে উঠেছে। ঘাটে মাঠে হাটে নাকি ওই ছাড়া কথা নেই? কয়ো বলে—রাজার ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে এসেছে, শ্যামরূপার গড়ের মধ্যে মঠ করবে। মঠে নাকি শুধু শ্যামের পূজো! রাধার নাকি বনবাস! আমরা তো দূরের কথা, বোষ্টুমী বৈরাগিনীদের ঝাড়ু মেরে তাড়াবে, আপনাদেরও নাকি মুখ দেখবে না!

সুন্দর সাজানো ঘরে বসে দাস-সরকার তামাক খাচ্ছিলেন। সুগন্ধি কাঠগড়ার তামাক। ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ ভুরভুর করছিল। রাঢ় অঞ্চলের মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল ঘর খড়িমাটি দিয়ে নিকানো; লম্বায় চওড়ায় বেশ বড় ঘর। দরজার পাশে মাথায় পটুয়ার তুলিতে আঁকা সুন্দর পদ্ম; কুলুঙ্গির মাথায় মাথায় ছোট ছোট আল্পনা। এ ছাড়াও দেওয়ালগুলির ঠিক মাঝখানে ব্রজলীলার এক-একটি অধ্যায় বেশ বড় বড় করে আঁকা—মানভঞ্জন রাসলীলা বস্ত্রহরণ দোললীলা। এ সবের মাঝখানে ঢুকেছে মুসলমানী আমলের লতাপাতা ফুল পাখি। মেঝেটি জমানো খোয়ার—উপরে পঙ্কচুনের পালিশ। মেঝের উপর পুরু গালিচার ফরাস। গালিচার উপর কয়েকটি মখমলের তাকিয়া। দেওয়ালে শৌখিন দেওয়ালগিরিতে সামাদানের

মধ্যে বাতি জ্বলছে। চার দেওয়ালে আটটি দেওয়ালগিরিতে জোড়া সামাদানে ষোল বাতির আলোর ঘরখানি উজ্জ্বল। তার উপর খড়িমাটির কোমল শুভ্র লেপনের প্রতিফলন সে উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে বড় একখানি গালিচার আসন। তার সামনে জ্বলছে বড় পিলসুজের উপর বড় একটি প্রদীপ। গন্ধে বোঝা যায় প্রদীপ তেলের নয়, ঘিয়ের। আর নামানো রয়েছে রূপোর রেকাবিতে নানান উপকরণ। ফুলের মালা, ফুল, চন্দন, চুয়া, পান, একটি আতরদানও নামানো রয়েছে। দাস-সরকারের কাছে নামানো একখানি চমৎকার খোল। দাস-সরকার কৃষ্ণদাসীর কথায় মুখ তুলে চোখ মেলে তাকালেন। বেশ জোর করেই তাকাতে হল যেন। চোখ দুটি রাঙা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। ওঠারই কথা। সন্ধ্যার মুখেই দুগ্ধ এবং সর-সহযোগে অহিফেন সেবন হয়েছে, তার উপর এই তামাক-ছিলিমটির অব্যবাহত পূর্বেই সেবন করেছেন সকাল-থেকে-গোলাপজলে-ভিজানো ত্বরিতানন্দ একদফা। ত্বরিতানন্দ অর্থাৎ গাঁজা! কেউ কেউ তুরীয়ানন্দও বলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যের যবনিকা যেন ফাঁক হয়ে গেছে সরকারের চোখের সামনে। মৃদঙ্গ বাজিয়ে বিশ্বজগৎ নৃত্য করতে করতে চলেছে—অপ্সরীর মত রাসমঞ্চের চারিপাশের অষ্টসখীর মত, আর রাধারমণ সরকার যেন কেন্দ্রস্থ গোবিন্দের চরণপদ্মে স্থির ভ্রমরটির মত বসে আছেন।

ফরসির কাঠের নলটি ছেড়ে দিয়ে হেসে রমণ সরকার বললেন, সকালের সেই নবীন মহান্ত? দেখেছ নাকি?

—দেখেছি। ভোরবেলা স্নানে গিয়েছিলাম যে!

—দেখেছ?

—হ্যাঁ। মরি মরি, রূপই বটে। লোকের পাগল হওয়ার দোষ নাই। রাজার ছেলে—

অকস্মাৎ রেগে উঠলেন দাস-সরকার। দাঁতে দাঁত টিপে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, রাজার ছেলে কৃষ্ণদাসী! ও রাজার ছেলে হলে আমিও জগৎশেঠ। ওটা কামদেব হলে আমিও মহাদেব! বেটা পাষণ্ড! বেটা কালাপাহাড়! কম্নো ঠিক বলেছে—কালাপাহাড়ই বটে। রাধারাণীকে মানে না। বলে পরকীয়া-সাধন যদি ধর্ম হয় তবে অধর্ম কিসে! শ্যামের পাশ থেকে রাধারাণীকে সরাবে! বাঁশীর বদলে চক্র ধরাবে! আমাদের ঘেন্না করে! হুঁঃ, ওর ঘেন্নায় কী হয় কৃষ্ণদাসী? আমরা ওকে ঘেন্না করি। রাধে! রাধে! রাধে!

—তা হলে রাজার ছেলে নয়?

—পক্ষ থাকলেই পক্ষী হয় না কৃষ্ণদাসী। পক্ষীর আরও লক্ষণ আছে। না-হলে ফড়িংকে পক্ষী বলতে হয়। এ গোসাঁইয়ের পক্ষী-লক্ষণ সবই আছে, তবে সবই আকারে ছোট। অর্থাৎ চড়ুইয়ের জাত। বাজপক্ষী নয়। জয়পুরের রাজপুত্তুর ভাবছ! তা নয়। রাজা-টাজা নয়। জমিদার, বড় জমিদার। চটক—বুঝলে, যাকে বলে চড়ুই। বড় জোর শালিক বলতে পার। গাঙ-শালিক। গাঙের ধারে বাড়ি। বোয়েচ কিনা?—সরকার কথা বলতে বলতে শান্ত হয়ে এলেন এতক্ষণে। রসিয়ে রসিয়ে শ্লেষ দিয়ে বলতে লাগলেন রসিকের মত।

রসিকের মত কথা বলতে গেলেই সরকার এইভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন আর মধ্যে মধ্যে বলেন 'বোয়েচ কিনা!'

—বোয়েচ কিনা, বড় জমিদার, উপাধি রায়চৌধুরী। জাতিতে ব্রাহ্মণ; বহুপূর্বে পূর্ব-পুরুষেরা ছিল শুধু বামুন পণ্ডিত। পাঠান আমলে গৌড়ের সুলতানদের কোন সুলতানের সুনজরে পড়ে যায়। অনুস্বার-বিসর্গের ছটা আর টিকি-নাড়ার ঘটা দেখে সুলতান খুশী হয়ে খেলাতের সঙ্গে মোটা ব্রহ্মত্রের সনদ দেন। কিন্তু খাগের যে কলমে তালপাতার ওপর ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব উদঘাটন করা যায়—বোয়েচ কিনা দাসী, জীবন-জমিতে ব্রহ্মতত্ত্বের চাষ করা যায়, তা দিয়ে আসল জমির একটি ঢেলাও ওলটানো যায় না। কাজেই ব্রহ্মত্রের জমি খাজনা-বিলি করে হন জোতদার। তারপর বোয়েচ কিনা, জোতদার থেকে জমিদার। শিষ্যসেবকদের পরলোকের কর্ণধার থেকে প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দেবশর্মা থেকে রায়চৌধুরী। শাস্ত্র-পুরাণের পুঁথিগুলি খেরোর কাপড়ে বাঁধা হয়ে, কালস্রোতের ঠেলায় ভাঙা কূলের মাটি ঢলে পড়ল। তার জায়গায় কাপড়ের মোটা মোটা দপ্তরে থোকা জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ বিন্ধ্যপর্বতের মত বাড়তে লাগল। পুঁথিগুলি যদি একেবারে ফেলে দিত তো হত। ধুয়ে-মুছে যেত। বোয়েচ কিনা দাসী—তিত্‌লাউ খাওয়া যায় না—গেরস্ত-বাড়িতে ও লাউ হলে তার ফল থেকে মূল পর্যন্ত ফেলে দেয়। কিন্তু বৈরাগীর আখড়ায় হলে কি সন্ন্যাসীর আশ্রমে হলে তারা বিষ্ণুমায়ায় ফেলতে পারে না; নতুন করে না-লাগালেও তিতলাউ কটি পাকিয়ে শিকেয় টাঙিয়ে রেখে দেয়। সোনারূপোর জলপাত্রও লাউয়ের খোলার কমণ্ডলুর মায়া ঘোচাতে পারে না। এও তাই আর কী! তাই থেকেই এ-বংশে মধ্যে-মাঝে দু-চারজন পণ্ডিত জমিদারও ফড়কে বেরিয়েছে। দেশে এদের অনেক নাম কেষ্টদাসী। তবে ভক্তি-পথে পা বাড়ায় না, মেঠো পথের ধুলো-কাদার উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা, জ্ঞানমার্গের পাকা সড়কে হাঁটার উপরেই বংশটার ঝোঁক। বোয়েচ কিনা—দু-চারটে মহানাস্তিক জন্মেছে, আবার জনদুয়েক দুঁদে জমিদার, পাকাপোক্ত ভোগীও জন্মেছে। এই ছেলের বাপ ছিল তেমনি একজন ভোগী। বিয়ে ছিল দুটি। দুটিই ছিল দুয়োরানী। সুয়োরানী ছিল এক যবনী রক্ষিতা। এ ছাড়াও নিত্য নতুন বাঈজী-বাঈয়ের অভাব ছিল না। আর একটি জিনিসের অভাব ছিল না, সেটি হল বিষয়বুদ্ধির। অনেক দিনের পুরনো বংশ, ডালপালা অনেক, সবার মধ্যেই এই একই ধরন, এই সুযোগে ইনি অধিকাংশ শরিকের সম্পত্তি নানান কৌশলে কিনে, আসল গুঁড়ির মত মোটা হয়ে উঠলেন। শরিকেরা শেষ প্যাঁচ মারলে, যবনী রক্ষিতার অপরাধে পতিত করবার ভয় দেখালে। ইনি হাসলেন, এবং গুরু ডেকে তিলক ফোঁটা কেটে মালা পরে নিজে বৈষ্ণব হলেন—সঙ্গে সঙ্গে ওই যবনীটিকে ভেক দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন।

—বোয়েচ কিনা, কেষ্টদাসী? অল্পদামী জিনিস মেকী হয় কম। কী তার দাম যে মেকী হবে? মেকী হয় দামী জিনিস। আর যে জিনিসের যত মূল্য সে জিনিসের মেকী তত নিখুঁত। ধর্মের চেয়ে মূল্য আর কোন্ জিনিসের আছে বল? তাই এ সংসারে ধর্মের ভণ্ডামি আর আসল ধর্মাচরণ কষ্ট করে ধরা তত্ত্ব কঠিন, বোয়েচ!

চাদরের খুঁটে চোখ মুছলেন সরকার। এই ধর, আমরা যে গোপন ভজন করছি, এর অর্থ নিয়ে যত খুশী কুৎসা করা যায়। কিন্তু তিনি তো জানেন—। কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে কসরত-

দক্ষ তরুণের শূন্যে লাফ মেরে ডিগবাজি খাওয়ার মত উপরের দিকে চোখ দুটি তুলে বিচিত্র কৌশলে উল্টে দিলেন।—বোয়েচ কিনা!

—বোয়েচ, এই ছেলেটি তাঁর বড় ছেলে। ছেলেটির মা গোঁড়া পণ্ডিতবংশের মেয়ে।—বোয়েচ কিনা। একটা কথা বলতে ভুলেছি কেষ্টদাসী; সেটা কী জান, সেটা হল ওদের জাতের কথা। নিজেরা দেবশর্মা থেকে রায়চৌধুরী হয়েছিল, পুঁথিপেঁতে তাকে তুলে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ নিয়ে পড়েছিল, এবং শামুকের খোলার নস্যের বদলে ফুরসির নল, চটি এবং তালপাতার বদলে নাগরা এবং রেশমী ছত্র গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অন্দরমহলে মা-লক্ষ্মীদের জাত বদল হতে দেয় নি; তাঁরা ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণী। মেয়ে দিত বড়লোকের বাড়িতে, কিন্তু মেয়ে আনত গরিব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাড়ি থেকে। ওটা ছিল ওদের সেই প্রথম যিনি জমির সনদ পেয়ে জোতদার হয়েছিলেন—তাঁর আজ্ঞা। সেটা ওদের ভাঙবার জো ছিল না, ভাঙলে অভিসম্পাতের ভয় ছিল। বোয়েচ কিনা—বাজিকরেরা বলে শুনেছ তো—কার আজ্ঞে? না, কামরূপের মা-কামিক্ষের আজ্ঞে। এ তাই। এখন এ ছেলের মা ছিলেন—জাত-বামুন যাকে বলে—সেই ঘরের মেয়ে। বোয়েচ কিনা, যখন বিয়ে হয় তখন তো জামাই ছিল ছেলেমানুষ, মেয়ের বাপ বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝলেন তখন মেয়েকে বললেন—আমার লোভের পাপে তুই লক্ষ্মীর মত জলে পড়েছিস মা। তবে আমার লোভ হলেও, তোর কপাল বড়। তার ওপরেই তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি চললাম। আর কখনও আসব না। তোর কপাল তোর ওই ছেলে। বোয়েচ কিনা, ওই ছেলেকে তিনি ইচ্ছেমত মানুষ করেছিলেন। বাধা দেবার কেউ ছিল না। কর্তা তখন ওই যবনীকে নিয়ে বিলাসের আমিরী ঢঙ পালটে বৈষ্ণবী-ভজনের মুখোশ পরেছিল। বাঁয়া-তবলার বদলে মৃদঙ্গ, ঘুঙুরের বদলে মন্দিরা বাজিয়ে গানবাজনার আসর চলে। ঘরে কদাচিৎ আসেন। সে এসেও বড় গিন্নীর ওদিক বড় মাড়ান না; ও-মেয়েকে বড় ভয় বড় ঘেন্না, যা হোক একটা কিছু করেন। বোয়েচ কিনা, এইভাবে ছেলে বড় হল; ঘোড়ায় চড়া শিখলে না, বন্দুক তলোয়ার ছুঁলে না, বাবরি করে চুল রাখলে না; শিখলে সংস্কৃত, কিছু ফার্সী পুঁথি নিয়ে পড়ে রইল, মাথার চুল ছাঁটলে বামুন-পণ্ডিতের মত। তারপর একদিন বাপকে গিয়ে বললে, কাশী যাব পড়তে।

বাপ বেশ ভাল করে ছেলের আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে বললেন, কাশী!

—হ্যাঁ, কাশী।

বাপ ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমাদের দুই ভাইকে আমি মুরশিদাবাদে পাঠাব ঠিক করেছি। দিন-কতক দরবারে আমাদের মোক্তারের সঙ্গে যাবে আসবে। নবাব বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় হবে। রাজকার্য কাকে বলে শিখবে। চালচলন তরিবত-সহবত কায়দাকানুনে দোরস্ত হবে। গানবাজনা শিখবে। এ সময় কাশী? তোমার মা কি বড়ই ধরেছেন? তা সে তো আমাকে বললেই পারতেন।

ছেলে যেন নিবাতনিষ্কম্প। বোয়েচ না, কেষ্টদাসী, ছেলে হাসলে না, কাশলে না, ভুরুও কোঁচকালে না, যেমন বলছিল তেমনি বলে গেল—মা যাবেন না। আমি যাব। পড়তে যাব। কাশীতে পড়ব ঠিক করেছি।

—পড়তে যাবে ? কাশীতে পড়তে যাবে স্থির করেছ ?

—ছেলে, বোয়েচ না, বলে গেল—বেদান্ত পড়ব স্থির করেছি।

—বেদান্ত পড়ে তো পৈতৃক জমিদারী চালানো যাবে না।

ছেলে বললে, শুনেছি অনেক আগে আমাদের পিতৃপুরুষের বেদান্ত টোল ছিল।

—বোয়েচ না, কেষ্টদাসী, এবারে বাপের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ফুরসির নলের অম্বুরি তামাকের ধোঁয়ায় বিষম খেলেন তিনি। কাশতে কাশতে বুকে হাত বুলিয়ে স্থির হয়ে বললেন, তুমি টোল খুলবে নাকি ?

ছেলে বললে, টোল তো আমাদের আছে ; সেটা তো উঠিয়ে দেন নি কোনদিন ; তবে আমরা অধ্যাপনা করি না, মাইনে-করা বৃত্তিভোগী পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা করেন।

—তুমি তাই করবে নাকি ?

—না, সে এখনও স্থির করি নি। বেদান্ত পড়ে, এ বংশের এতকালের কুলধর্ম-ভ্রষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য যা প্রয়োজন হবে তাই করব।

বাপ অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না। তারপর বললেন, তুমি হয়তো প্রহ্লাদ কিন্তু আমি হিরণ্যকশিপু নই—আমাদের বংশও দৈত্যবংশ নয়। কৃষ্ণনাম করতে নিষেধ করব না। উৎসাহই দেব। যাও। কাশীই যাও। কিন্তু—। কিন্তু সেখানে থাকার ব্যবস্থাটা এ বংশের—। না, যেমন ইচ্ছা তেমনি থেকো। বারণ করব না।

ফুরসির নলে একটা সুখটান দিয়ে দাস-সরকার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নলটি কেষ্টদাসীর হাতে দিয়ে বললেন, মজেছে ভাল। নাও, দেখ।

সলজ্জভাবে নলটি হাতে নিয়ে পাশে রেখে দাসী বললে, তার পর ?

—তার পর ? বোয়েচ না, এখন ধ্রুব তো তপস্যা করতে গেলেন কাশী। বোয়েচ না, এর বাবা বলেছিল—আমি হিরণ্যকশিপু নই। তা নয়। কিন্তু সুরুচি-মোহমুগ্ধ উত্তানপাদের সঙ্গে মিল পনের আনা। তাই ধ্রুব বলেছি এঁকে।

ধ্রুব কাশী গেলেন। কিছুদিন পর মা মারা গেলেন।

—বছর চারেক পর খোদ কর্তা।

—শ্রাদ্ধশান্তির পর সৎভাইকে সব ভার দিয়ে ফের চলে গেল কাশী। কী করবে এখনও স্থির করে নি। তবে জমিদারি নয়, এটা ঠিক। বেদান্ত পড়া হয়েছে, কিন্তু ধাতস্থ হয় নি। তার কিছুদিন পরেই জয়পুরের মহারাজার ফতোয়া নিয়ে পণ্ডিতেরা এল কাশী।—সেই স্বকীয়-পরকীয়ার কাণ্ড গো !

—জান তো ঔরঙ্গজীব বাদশার ভয়ে পাণ্ডারা গোবিন্দজীকে গোপীনাথকে জয়পুর পাঠিয়েছে। মদনমোহনকে পাঠায় করোলী। সেও জয়পুরের মহারাজার বাস্তু। বাস্—

—মহারাণা দ্বিতীয় জয়সিং তিন মূর্তির সেবার অধিকার পেয়ে বৈষ্ণবধর্মের অভিভাবক হয়ে উঠলেন ; বোয়েচ না ! তিনি এখন পরমভাগবত। হুঁ, লোকটার অনেক গুণ আছে, অনেক কীর্তি করেছে, কিন্তু আস্পর্ধা দেখ তো।

নড়েচড়ে বসলেন দাস-সরকার। এতক্ষণ নেশার ঝোঁকে এক নাগাড় ওই আগন্তুক

সন্ন্যাসীর ঠিকুজি-কুলুজীর বিবরণ বলে এসেছেন উত্তেজনার বশে, এবার নড়ে বসলেন। ফুরসিটা টেনে নিয়ে বারকতক টান দিয়ে বললেন, নিবে গেছে। ওরে বাবা কালীচরণ, দে তো একবার তামাক!

কৃষ্ণদাসী তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া করছিল মৃদু মৃদু। সরকার ঘেমে উঠেছেন। শীত শ্রীপঞ্চমীর পর থেকেই বলতে গেলে নেই। শীতলাষষ্ঠীর পান্তাভাত কলাইসেদ্ধ শীতের অভাবে বেশ ভাল জমে নি। লেপ সহ্য হয় না। তার উপর ঘরখানার দরজা-জানলা বন্ধ। ভজন-কুঠুরি এর নাম। এ সব ঘরের দরজা-জানলা ছোট, এবং আঁটসাঁট করে বন্ধই থাকে। বন্ধ ঘরে ধূপশলাকার ধোঁয়া। এক নাগাড় এতক্ষণ বকেছেন স্থূলবপু দাস-সরকার। মুখে জাফরান-দেওয়া পান দাস-সরকারের, সুতরাং দাস-সরকারের ঘেমে ওঠা স্বাভাবিক। কৃষ্ণ-দাসীরও এমন ক্ষেত্রে পাখাখানি নিয়ে বাতাস করাই রীতিসম্মত। সাধনসম্মতও বটে।

দাস-সরকারের এতক্ষণে সেদিকে দৃষ্টি পড়ল। হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, আমাকে দাও। তোমাকে কি বাতাস করতে হয়? দাও।

—না—না—না। আপনি এত কথা বলে ঘেমে উঠেছেন যে।

দাস-সরকার হাতের তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ এক করে মুদ্রাসহযোগে মৃদুস্বরে গান ধরে দিলেন—

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা—
সখিবিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা!

—সখি, ওটা মদনানলে দহন-জ্বালার ঘাম। বাতাসে শীতল হওয়ার নয়।

কৃষ্ণদাসী ফিক্ করে হেসে বললে, হাকিমী দাওয়াই খেয়েছেন বুঝি? মরণ!

উত্তর একটা দিতে যাচ্ছিলেন দাস-সরকার, কিন্তু তার আগেই চাকর সাড়া দিল—কল্কে নিয়ে সে ঘরে ঢুকছে। সরকার সংযত হলেন। এটা দাস-সরকারেরা পারেন—চক্ষের পলকে ভোল পাল্টাতে পারেন। মুহূর্তে ভোল পাল্টে গেল সরকারের। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন জয়পুরের মহারানা সওয়াই জয়সিংহের উপর। বলতে লাগিলেন, মরণ হলে তো বাঁচতাম কৃষ্ণদাসী। তুমিই বল—জয়পুরের মহারানা জয়সিংহের আস্পর্ধার কথা শুনে বাঁচতে ইচ্ছে হয়? ওঃ! বলে কিনা, রাধারাণী পরকীয়া বলে—। রাজা হলেই মাথা কেনে তো! আর তারই বা দোষ কী দিই বল? বোঝেচ কিনা, ঔরঙ্গজীব বাদশা গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভাঙলে, পাণ্ডারা ভয়ে গোবিন্দজীকে জয়পুরের মহারানার বাড়িতে তুলে দিলে। প্রভু নিজেই যখন আশ্রয় নিলে, তখন সে বাতলাবে বইকি, বলবার আস্পর্ধা হবে বইকি যে—ঠাকুর, ওসব গোপিনী-টোপিনী নিয়ে তোমার রাস দোল ঝুলন করা হবে না।

কৃষ্ণদাসী সে বিবরণ জানে। সে তো বেশীদিনের কথা নয়, সেদিনের কথা। কৃষ্ণদাসী তখন কিশোরী। কৃষ্ণদাসীর শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজী, স্বামী গোপালদাস তখন বেঁচে। জয়পুরের মহারানার পাঠানো পণ্ডিত কৃষ্ণদেব আসছেন—এই সংবাদে দেশময় বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গেল, গেল, সব গেল। রাধাই যদি যান তবে আর বৈষ্ণব-ধর্মের রইল কী? গোবিন্দ? হায় রে হায়, রাধা বাদ দিয়ে গোবিন্দ? জল বিনে মীন? বিজুলী বিনে মেঘ? রূপ ছাড়া রস? মহারানা জয়সিংহের এত ঔদ্ধত্য গোবিন্দ সহ্য করবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কীর্তিমান মহারানা 'সওয়াই' জয়সিং। গণিতে জ্যোতিষে পণ্ডিত লোক। জয়পুরে দিল্লিতে মথুরায় উজ্জয়িনীতে কাশীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী এবং পৃষ্ঠপোষক, শাস্ত্রপরায়ণ এবং সত্যসন্ধানী। গোবিন্দজীকে জয়পুরে নিয়ে গিয়ে দেশের বৈষ্ণবাচার ও ধর্মের অবস্থার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। চিত্ত পীড়িত হল। বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের পরকীয়া-তত্ত্বের ব্যাখ্যায়, পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষের উপাসনায় এ কী বিকৃতি! এ যে ব্যভিচার!

পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি বিচার করলেন। সমগ্র ভাগবতের প্রতিটি শ্লোক বিশ্লেষণ করে বিচার করে 'পরকীয়া' মতকে খণ্ডন করে তিনি 'স্বকীয়া' মতের প্রতিষ্ঠা চাইলেন। বহুবল্লভকে শুধু শ্রীবল্লভ হিসেবে দেখতে চাইলেন। গোপীজনমনোহারীকে রাধাপ্রেমপরায়ণতায় কলঙ্কমুক্ত করবার সংকল্প করলেন। পরকীয়া রাধার স্থলে লক্ষ্মীকে দেখতে চাইলেন তাঁর পাশে। বহু সতর্ক বিচারের পর মত খাড়া হল। মহাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব হলেন সে মতের ধারক। বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার হবে। প্রথমেই বিচার হল বঙ্গদেশীয়-মতাবলম্বী জয়পুরবাসী পণ্ডিতদের সঙ্গে। তাঁরা হার মানলেন, বিচারপত্রে স্বকীয়া-মতস্বীকৃতির স্বাক্ষর দিলেন। তারপর মহারানা পণ্ডিত কৃষ্ণদেবকে পাঠালেন দিগ্বিজয়ে। মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সর্বাগ্রে জয় করতে হবে বঙ্গদেশ।

কলিতে বৈষ্ণবধর্মের মুরলী তার দ্বাপরের কেন্দ্র বৃন্দাবন ও যমুনাতট থেকে স্থান পরিবর্তন করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের গঙ্গাতটে এসে নূতন সুরে বেজেছে। আজু কে গো মুরলী বাজায়? এ তো কভু নহে শ্যামরায়! সে গৌরতনু, বৃন্দাবনচন্দ্রের নব ভাব-বিগ্রহ। আবির্ভূত হলেন নবদ্বীপে শচীমাতার কোলে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। সকল শাস্ত্র সকল পাণ্ডিত্য অর্জন করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের পরাভূত করেও অবশেষে একদা নিজেকে যেন বিদীর্ণ করে নবভাবে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। যেন খনির কঠিন প্রস্তরময় দেহ দীর্ণ করে জ্যোতি বেরিয়ে এল; জ্ঞানতত্ত্বের ব্রহ্মকমণ্ডলু থেকে গঙ্গাস্রোতের মত উৎসারিত হল ভক্তি ও ভাব-রসের সুরধুনী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পুরুষ সেই এক প্রেমময় পরমপুরুষ; ভজনা কর তাঁকে। উন্মত্ত ভাবাবেগে বের হলেন নবদ্বীপের নিমাই। নিমাই নয়, লোকে প্রত্যক্ষ দেখলে জীবন-চৈতন্যের বিশাল স্রোত। ভেসে গেল দেশ—ভেসে গেল জীবন। সেই নবভাবেই বৈষ্ণবধর্মে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে; নূতন গোমুখী—নবদ্বীপ; অথবা বলা যায় জহ্নুমুনির আশ্রম। নূতন মহিমায় নির্গত হয়ে ভাবগঙ্গা প্লাবিত করে দিয়েছে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ। নবদ্বীপের শঙ্খ যদি এ স্রোতের আগে আগে না বাজে, বাংলা দেশ যদি এ মত স্বীকার না করে, তবে অপর সকল দেশ স্বীকার করা সত্ত্বেও এর অবস্থা হবে বঙ্গদেশের কীর্তিনাশার মত; নবদ্বীপের স্রোতই মহাপ্রভুর পুণ্যে ভাগীরথীর মহিমা বহন করবে।

মহারানা জয়সিংহ আচার্য কৃষ্ণদেবকে সর্বপ্রথম পাঠালেন বাংলা দেশে। সঙ্গে রক্ষক সিপাহী দিলেন; সুবায় সুবায় সুবাদার নবাবদের কাছে, রাজ্যে রাজ্যে রাজাদের কাছে

অনুরোধপত্র পাঠালেন ; সাহায্য প্রার্থনা জানিয়ে লিখলেন—"সঠিক ধর্মতত্ত্বের বিচার সর্বদেশে সর্বকালে সর্বলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য এবং এ বিষয়ে সাহায্য করা সকল রাজারই কর্তব্য, ও অপর সকল ধর্মেরও সহযোগিতা করা সকল ধর্মেরই অঙ্গীভূত। ধর্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত, সেই গুহার পথ আবিষ্কার, নির্ভুল দিঙ্‌দর্শন, বিচার ভিন্ন অর্থাৎ 'বিনা তজবিজে' হয় না। ধর্মের ভাণ্ডারে তদ্রূপ হইলে, আসলের বদলে মেকী চলিলে বেহেস্তের স্বর্গের ফটক বন্ধ হইয়া যায়। সেখানে মেকী সেলামী অচল ; অথবা বেহেস্তের তোষাখানা মেকী মালে ভরিয়া উঠিলে ডুবিয়া জাহান্নমে যায়। খোদাতয়লা ঈশ্বর রুষ্ট হইয়া উঠেন। সুতরাং হিসাবনিকাশে সাহায্য করিয়া নিজের ও দশের ধর্মের কল্যাণ অবশ্যই করিবেন।

প্রয়াগে এসে বিচার হল। কৃষ্ণদেবের প্রতিভা জয়যুক্ত হল। পণ্ডিতেরা স্বকীয় মতে স্বাক্ষর দিলেন। সেখান থেকে স্থলপথ ছেড়ে নৌকো নিয়ে গঙ্গার স্রোত-পথে নবদ্বীপ যাত্রা করেন। পথে কাশী—ভারতের সর্বমত সর্ববিদ্যার মহাকেন্দ্র। এখানেও বিচারসভা বসল। কাশীর গঙ্গার ঘাট—অতীত ভারতের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যাপীঠ। এত বিচার, এত গবেষণা, এত দীক্ষা, এত উপলব্ধি, জ্ঞানে ধ্যানে এত আবিষ্কার পৃথিবীর আর বোধ করি কোথাও হয় নি। আচার্য কৃষ্ণদেব ঘাটে পূর্বাস্য হয়ে জাহ্নবীকে সম্মুখে রেখে আসন গ্রহণ করলেন, আশেপাশে বসল শিষ্যরা, আর তাঁর দক্ষিণে বামে—উত্তর ও দক্ষিণ মুখে বসলেন কাশীর বৈষ্ণবাচার্যেরা। দৃষ্টির সম্মুখে অনন্ত পুণ্যস্রোতা সুরধনী। বিরাট ঘাট জনসমাগমে পূর্ণ, কিন্তু স্তব্ধ। শুধু গঙ্গাস্রোতের কলকল শব্দ উঠছিল।

বিচারে আপন মতকে জয়যুক্ত করে আচার্য কৃষ্ণদেব বৈষ্ণবাচার্যদের স্বাক্ষর নিয়ে উঠে গঙ্গার ঘাটে নেমে জল মাথায় দিয়ে উপরে উঠছেন—এক শ্যামবর্ণ কান্তিমান নবীন যুবক তাঁর সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মুণ্ডিত মস্তক, মধ্যস্থলে সুপুষ্ট শিখাগুচ্ছ, কপালে তিলক, বুকের উপর দুলছে তুলসীর মালা। বললে, আপনার সঙ্গে বঙ্গদেশ-বিজয়ে সঙ্গী হতে চাই।

আচার্য তার মুখের দিকে চেয়ে তার কান্তিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন, এস। গ্রহণ করছি তোমাকে। দীক্ষা নাও আমার কাছে।

সেই যুবকই এই নবীন সন্ন্যাসী। বুকে তার মায়ের সারা জীবনের বঞ্চনার বেদনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে ভূমিকম্পের কঠিন চাপে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার স্তরের মত ; তার উপর বনিয়াদ করে সে গড়ে তুলেছে তার সংকল্পের মন্দির। তার মা যাতে বেদনা পেয়েছেন, সারাটা জীবন ম্লানমুখী হয়ে কাটিয়েছেন, তার উচ্ছেদ সে করবেই। ধর্মের নামে জীবনের বিকৃতি প্রবৃত্তির এই ব্যভিচারকে সে জীবনপাত করে নির্মূল করবে। শাস্ত্রকে সে জেনেছে, অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি সে করেছে। মানুষের জীবনের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ হয়ে চলেছে অসৎ থেকে সতে, অশুদ্ধতা থেকে পরিশুদ্ধতায়। বিকৃত ব্যাখ্যায় তাকে অধোমুখী বিপরীতমুখী করার পাপ কখনও সহ্য হবে না। সমস্ত দেশ সমস্ত জাতি—সব যাবে অনিবার্য ধ্বংসের পথে। বেণীমাধবের ধ্বজার দিকে, জ্ঞানবাপীর দিকে, বিশ্বনাথের পুরনো মন্দিরের দিকে সে তাকায় আর সারা অন্তর তার ক্ষোভে বেদনায় টনটন করে ওঠে। বৃন্দাবন সে যায় নি, কিন্তু কল্পনায় সে

দেখতে পায় বৃন্দাবনের ভাঙা মন্দির। তার মায়ের বেদনা আর এই বেদনা যেন এক হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে তার পূর্বপুরুষদের। তাঁরা যেন বলেন—আমাদের বংশের পাপেরই এই পরিণাম। ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসে সে। সারারাত্রি আর ঘুম হয় না। দোষ সে ঔরঙ্গজীব বাদশা বা হিন্দুধর্মদ্বেষী বাদশাদের দেয় না। তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসমত কাজ করছে। ধর্মবিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয় তবে তার ফলভোগ তারা করবে। কিন্তু হিন্দুর এ দুর্ভোগ তার নিজের জীবনের কর্মফল। এ পাপ থেকে হিন্দুকে উদ্ধার পেতে হবে। এক-একদিন ইচ্ছা হয় একটা পতাকা হাতে করে সে বেরিয়ে পড়ে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, দ্বারকা থেকে মণিপুর পর্যন্ত চিৎকার করে ডাক দিয়ে বেড়ায়—জাগো, বিলাস-ব্যভিচার থেকে জাগো। ওঠো। কিন্তু সাহস হয় নি। সে শক্তি কি তার আছে!

সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে আচার্য কৃষ্ণদেবের ক্ষুরধার যুক্তিতর্কের দীপ্তি দেখে বঙ্গদেশানুসারী বৈষ্ণব-পণ্ডিতদের অসহায় অবস্থা এবং পরাজয় দেখে তার অন্তরাত্মা বলে উঠল—এই তো, এই তো পেয়েছি নবগঙ্গার স্রোতোধারা, এরই সঙ্গে মিশিয়ে দিই আমার জীবনের স্রোতটুকু। প্রবলতর হোক স্রোত। পরকীয়া-সাধনার খাতের মুখ বন্ধ হয়ে যাক, অথবা সে স্রোত অভিশপ্ত হোক কীর্তিনাশার মত।

আচার্য কৃষ্ণদেবের সাদর সম্ভাষণের উত্তরে সে হাত জোড় করে বললে, শুধু দীক্ষা নয়, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই সাধনাকে প্রচার করব আজীবন। এই আমার সংকল্প।

কৃষ্ণদেব বললেন, আমি সংসারী, আমি তো সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে পারব না। আমার তো অধিকার নেই।

দৃঢ়কণ্ঠে নবীন ব্রহ্মচারী বললে, তা হলে দীক্ষা থাক্, আপনার কাছে আমি শাস্ত্রতত্ত্বে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছি। আমাকে শাস্ত্র-শিষ্য হিসাবেই গ্রহণ করুন। সঙ্গে নিন আমাকে। এই দিগ্বিজয়ের অভিযানে সামান্য কিছু করতে পারলেও জীবন সার্থক হবে আমার।

সস্নেহে তার হাত ধরলেন কৃষ্ণদেব।

* * *

নবাব জাফর কুলি খাঁ কঠোর শাসক, হিসাবনিকাশ, অর্থনীতিতে, ভূমি ও রাজস্ব-বিস্তারে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত; সেই রাজস্ব আদায়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর; বাংলার জমিদারদের ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতা নিষ্ঠুর হাতে দমন করে রাজস্ব আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিচারক হিসাবে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। কৃষ্ণদেব তাঁর দরবারে এসে মহারানা সওয়াই জয়সিংহের অনুরোধপত্র পেশ করতেই তিনি সসম্মানে গ্রহণ করে বললেন, মহারাণার অনুরোধ আমি আমার পালনীয় কর্তব্য বলেই গ্রহণ করছি। এ আমার অবশ্যকর্তব্য।

কৃষ্ণদেবকে বাসস্থান দিলেন। নবাবী ভাণ্ডার থেকে তাঁর সিধার ব্যবস্থা হল। নবাব জাফর কুলী খাঁ সুবে বাংলার ফৌজদারদের মারফৎ বৈষ্ণবধর্মের কুলপতি এবং সমাজপতিদের সিদ্ধান্তের এই বিচারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধপত্রের নামে পরওয়ানা পাঠালেন। শ্রীপাট নবদ্বীপ শান্তিপুর থেকে দিকে দিকে পত্র গেল। উড়িষ্যা পার হয়ে দক্ষিণে ত্রৈলঙ্গ দেশ পর্যন্ত গেল এর সাড়া। কয়েকজন ত্রৈলঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতও এসে উপস্থিত হলেন।

বাংলা দেশেও পরকীয়া মতের বিরোধী—স্বকীয়া মতের সমর্থক পণ্ডিত যাঁরা ছিলেন তাঁরাও এসে উপস্থিত হলেন। দিনাজপুরের শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ এবং প্রাণনাথ রায় তাঁদের অগ্রণী। কৃষ্ণদেবের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। নবদ্বীপের প্রধান আচার্য কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ত্রৈলঙ্গী বৈষ্ণব রামজয় বললেন, ভাল, বিচার হোক। জাফর কুলী খাঁ আদেশ দিলেন—দলিল লেখা হোক সর্বাগ্রে। দলিল লেখা হল। বাংলার বৈষ্ণবেরা লিখলেন।

> "আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থাই হয় তাহাই লইব। এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুক্ত জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্মাধর্ম বিনা তজবিজ হয় না। অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাট নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ও ত্রৈলঙ্গ দেশের রামজয় বিদ্যালঙ্কার সোনার গ্রামের শ্রীরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়ানন্দ ভট্টাচার্য সাং মহুলা।"

জয়পুরের আচার্য কৃষ্ণদেব প্রসন্ন গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বললেন, স্বীকার করছি। সাক্ষী মাথার উপর চন্দ্র সূর্য, সাক্ষী সম্মুখে সমাসীন মতোমন উল্ মুল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসির জঙ্গ মুরশীদ কুলী খাঁ—সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক, ধর্মের রক্ষক, যিনি যুদ্ধে বীর, পরোপকারে মুক্তহস্ত, দানে হাতেম ও বিচারে নসেরুয়ার তুল্য। পরাজয় হলে আমি পরকীয়া-মতকে স্বীকার করে এঁদের গুরু বলে মেনে নিয়ে দীক্ষা নেবার প্রতিজ্ঞা করছি।

কৃষ্ণদেবের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে বাগ্মিতায় চকিত হয়ে উঠল সভায় উপস্থিত আমীর-ওমরাহেরা। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তরুণ ব্রহ্মচারীর মুখ। আমীর-ওমরাহদের মধ্যে উপস্থিত ছিল তার জ্ঞাতিরা। কৃষ্ণদেব নিজের ধ্বজাটি দিলেন শিষ্যের হাতে। সে বহন করে নিয়ে গেল সেই ধ্বজা রাজসভা থেকে বিচারসভা পর্যন্ত।

বিচারসভা বসল মুরশিদাবাদে নয়। বসল মোকাম মালিহাটিতে। কাটোয়ার কাছে মালিহাটি। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস ঠাকুরের নামমণ্ডপে, অগ্রবর্তী হয়ে বসলেন শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর। পাশে বসলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের বংশধর। তাঁদের পাশে বসলেন বাংলার বৈষ্ণব আচার্যেরা।

এপাশে কৃষ্ণদেব। পাশে শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ। বাঁদিকে তরুণ ব্রহ্মচারী। পাশে পুঁথির স্তূপ। যখন যে পুঁথির প্রয়োজন হয় যুগিয়ে দেয়। দ্রুত লেখনীতে লিখে যায় বিচারের যুক্তিতর্ক। বিচার চলল ছ মাস।

ছ মাস বিচারের পর একদিন আচার্য কৃষ্ণদেব স্তব্ধ হলেন। চোখ থেকে তাঁর জলের ধারা নেমে এসেছে। চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র পুরুষের সেই বিশ্ববিমোহন মূর্তি তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তি রাধার মত তাঁর বাঁশী শুনে পাগলিনী। বিরহে ব্যাকুল। সুখ নাই, সান্ত্বনা নাই, তৃপ্তি নাই, ওই মোহন বাঁশরিয়াকে না পেলে সব শূন্য—সব শূন্য—সব শূন্য। সেই একমাত্র আপন। কিন্তু সে আপনার নয়, নিজস্ব নয়, বস্তুময় সংসার শতবন্ধনে বেঁধে রেখেছে প্রাণরূপিণী নায়িকাকে। তাঁকে অভিসার করতে হয় গোপনে, নিশীথ

রাত্রে বর্ষণমুখর দুর্যোগের মধ্যে। ওদিকে বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনির আর বিরাম নাই। তিনিও ব্যাকুল। অধীর। প্রাণময়ী রাধা ছাড়া তাঁর লীলাব্যাকুলতার পরিতৃপ্তি কোথায়?

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্॥

কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের পদাবলীর মধ্য দিয়ে পরকীয়া বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সেই আহ্বান—প্রাণ-রাধাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তিনি তোমাকে ডাকছেন তোমাকে ডাকছেন। বাঁশী বাজে ওই শোন। তিনি তোমার বিরহব্যাকুল। কাল চলে যায়—শত-বন্ধনে-বাঁধা মানুষ, মিথ্যা অভিমানে অধীর মানুষ, রাত্রি যায়—আমার কথা রাখ, ওই পথ যাত্রা কর। তিনি তোমারই অনুরাগী, ওগো, শুধু তোমারই অনুরাগী।

"কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥"

জীবন এবং চৈতন্যস্বরূপের এই লীলা-মাধুরী পরকীয়া ভাবের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে সেই সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে। এই হল পরম সত্য। স্বকীয়া ভাবের মধ্যে এ রসাস্বাদন সম্পূর্ণ হতে পারে নি বলে স্বয়ং লক্ষ্মীই রাধারূপে অবতীর্ণা হলেন।

রাধামোহন ঠাকুর রাধা-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করলেন: আচার্য কৃষ্ণদেব, একদা বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নিজে বললেন—প্রভু, আমি তো তোমার সর্বেশ্বরী, তোমার পরম সান্নিধ্যে অহরহ আমার অবস্থান। আমাকে ধারণের জন্য তোমার ওই বক্ষস্থল উন্মুক্ত প্রসারিত। কিন্তু কই, এই পাওয়ার মধ্যে তো পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছি না!

চৈতন্যস্বরূপ পরমপুরুষ বললেন—দেবী, তুমি আমার পত্নীত্বের অধিকারে মহারাজ্ঞীর মত আমার উপর অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। পাওয়ার জন্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের দুঃখ নাই, অসাধ্য সাধনের আকুল আবেগ নাই, হারানোর ভয় নাই, হারিয়ে তার জন্য অনন্ত বেদনা নাই। দুঃখের আস্বাদন নাই, তাই সুখের মিষ্টত্বের উপলব্ধি নাই; চোখের জল ঝরে না, তাই হাসির মধ্যে প্রাণ প্রকাশ পায় না। তোমাকে সেই রস আমি আস্বাদন করাব। তুমি জন্মাবে রাধা হয়ে, আমি জন্মাব কৃষ্ণরূপে। পরকীয়া ভাবের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ হবে লীলারসের।

এর আগে ঋগ্বেদ অথর্ববেদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ভাগবত থেকে বিভিন্ন পুরাণ এবং কাব্য থেকে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করে বিচার হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কৃষ্ণদেব বিচলিত হন নি। এবার তিনি বিচলিত নয়, যেন বিগলিত হয়ে গেলেন। কাঁদলেন তিনি। নিজে যেন বাঁশী শুনতে পেলেন।

কৃষ্ণদেব অশ্রুবিগলিত চোখ তুলেই তাকালেন সূর্যের দিকে, বললেন—হে দেবতা, তোমাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তুমি সাক্ষী, আমি পরাভূত হয়েছি। এ পরাভব আমার ভ্রান্তি নিরসন। তোমাকে সাক্ষী করেই আমি আচার্য রাধামোহন ঠাকুরকে অজয়পত্র লিখে দিয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছি।

লেখা হল অজয়পত্র।—

"শ্রীযুক্ত সেওয়ার জয়সিংহ মহারাজার সেথান হইতে স্বকীয় ধর্মের পরওয়ানা লইয়া গৌরমণ্ডলে স্বকীয় ধর্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহার

হুকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌরমণ্ডলে সবশুদ্ধা স্বকীয়সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম। নালিহাটী মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺গোস্বামী-দিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে স্বকীয় ধর্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম।"

কাটোয়ায় গঙ্গার যে ঘাটে মহাপ্রভু মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন সেই ঘাটে এসে সশিষ্য কৃষ্ণদেব পরকীয়া বৈষ্ণবতন্ত্রের যুগলমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এবং নিজের দীক্ষান্তে নিজের শিষ্যদের নবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শিষ্যরা একে একে দীক্ষা গ্রহণ করলেন; কিন্তু কই, সে নবীন ব্রহ্মচারী কই? কই? নবীন ব্রহ্মচারী নেই। নিঃশব্দে কাউকে কিছু না বলে নবীন ব্রহ্মচারী স্থানত্যাগ করেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কৃষ্ণদেব।

চারিদিকে তখন জয়ধ্বনি উঠেছে। সংকীর্তন হচ্ছে।

রাধাগোবিন্দ জয় রাধাগোবিন্দ!

জয় চৈতন্য নিত্যানন্দ! জয় বঙ্গদেশ! 'ঢাণ্ডা গাড়া গেল'। ঝাণ্ডা—জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত হল।

* * *

এ সব কৃষ্ণদাসী জানে। তবে এই নবীন সন্ন্যাসী যে সেই গাজনের দলছাড়া গোসাঁই তা জানত না। হেসে সরকার গাঁজার কল্কেটি মুখে তুলতে গিয়ে নামালেন। এর মধ্যে আর-একবার ত্বরিতানন্দের তৃষ্ণা অনুভব করেছেন। রজনী গভীর হয়ে আসছে। পরকীয়া-রসতৃষ্ণাকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করে তুলতে চাইছেন, কিন্তু মন এবং দেহ যেন বীণার তারের সুরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সুরের এক হয়ে মিলে যাওয়ার মত মিলছে না। তাই আর-একবার গঞ্জিকা সেবন করে প্রৌঢ় বয়সের মেদবহুল স্থূল দেহের স্নায়ুকে চড়া সুরে টেনে বেঁধে উদগ্র তৃষ্ণাতুর মনের কড়া তারের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইলেন। চৈতন্যস্বরূপ পরমপুরুষ মানসবৃন্দাবন বিকৃত জীবনে নিতান্তই অলীক হয়ে গেছে।

কল্কেটি নামিয়ে সরকার বললেন, গাজনের দলছাড়া গোসাঁই নয় সখী, এটা নিতান্তই গোয়ালছাড়া সেই গরুটা যেটা নাকি কানে কালা, যেটা নাকি ঘাসের টানেই ছুটে বেড়ায়, বংশীধ্বনি দূরের কথা—বলভদ্রের শিঙের শব্দও কানে পৌঁছয় না। ওটা একান্তভাবে বাঘের হাতে অকালে মরবে অথবা কোনও কসাইয়ের হাতে আড়াই পোঁচে জবেহ হবে।

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেই একদফা খিক-খিক শব্দে হেসে সারা হলেন দাস-সরকার, তারপর হস্তবদ্ধ গঞ্জিকার কল্কেটি তুলে বারকয়েক ফুস্ ফুস্ করে টেনে শেষবারে সজোরে টান মেরে কল্কেটি দাসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে দম ধরে বসে রইলেন। দাসী টানতে লাগল কল্কে। চিত্ত বিকৃত না হলে ব্যভিচার উল্লসিত হয় না। তারও নেশার প্রয়োজন হয়। দমটা ছেড়ে আবার বললেন দাস-সরকার, সেই কাটোয়ার ঘাট থেকে ভেগেছিলেন মহাগরুটি। কত খোঁয়াড় ঘুরে আবার দেখা দিয়েছেন। এবার আরও এককাঠি চড়ে এসেছেন গো। ছিলেন ষাঁড়, হয়েছেন ধর্মের ষাঁড়। সন্ন্যাসী হয়েছেন। কেউ বলে

গুরু মিলেছে, সন্ন্যাসী গুরু। কেউ বলে, গুরু-টুরুর ধারই ধারেন না, নিজেই স্বয়ম্ভু। বুদ্ধের মত নিজেই নিজের গুরু। এবার পরকীয়া তো পরকীয়া, স্বকীয়াও নয়; কড়াকিয়া কাঠাকিয়া সেরকিয়া সব বরবাদ, ধারাপাতই বাদ। একের পর দুই নেই। শুধু শ্যাম। বোয়েচ না! জয়পুর থেকে মূর্তি গড়িয়ে এনেছে শুনছি। ভাইয়ের কাছে গিয়েছিল। ভাইটা ভাল। বিষয়ের বদলে মোটা টাকা দিয়েছে। শ্যামরূপার ইছাই ঘোষের দেউলটা কিনেছে। সেইখানে মঠ করে শুধু শ্যামের তপস্যা হবে। এই মাধবপক্ষে প্রতিষ্ঠা হবে। উনি হলেন তিনি। লগনচাঁদা। রাধা বাদ দিয়ে শ্যাম, রূপ বাদ দিয়ে রস, বোয়েচ দাসী—সে রস বানায় ময়রারা; ওটা বামুন নয়, সাধকও নয়, সন্ন্যেসীও নয়, ওটা ময়রা। কিন্তু—। লাল চোখ মেলে দাসীর মুখের দিকে চাইলেন দাস-সরকার।

—কী?—হাসলে দাসী।

—তোমার এত খোঁজ? লক্ষণ তো ভাল নয় কেষ্টদাসী। কী বলে, তোমার বুকের মধ্যে প্রাণ-ভোমরার যেন গুনগুনানি শুনছি সখী।—খিক-খিক করে হাসতে লাগলেন দাস-সরকার।

—এতও জানেন আপনি। কী গুনগুনানি?—কটাক্ষ হেনে দাসীও মুচকি হাসল।

হাতখানির আঙুলে মুদ্রা করে দাসীর মুখের সামনে ধরে সরকার যথাসাধ্য সুরে গাইলেন—

"সখি রে—মুঞি কেন গে'লু কালিন্দীর জলে।
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছ—লে।
রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গে—ল॥"

দাসী চতুরা নায়িকা। সে কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাসভাবে বললে, তাই তো হয়। পুরুষেরা তাই চিরকাল বলে। অথচ—

—অথচ কী?

—আমাদের এক কথা সরকার মশায়; আমাদের জীবন দিলে আর ফেরে না। ফাঁসি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সেও সুরে গান ধরে—

তোমারই চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।

দাস-সরকারের চোখ দিয়ে জল পড়ে না, কিন্তু পিট-পিট করে। দাসী কয়েক কলি গাইতে গাইতেই সরকার ঘন ঘন চোখ মোছেন, এবং সেই ঘর্ষণে বাধ্য হয়ে জল আসে। এবং বার বার বলেন, রাধে—রাধে—রাধে! জয় রাধে, জয় রাধে!

বাইরে মধ্যরাত্রির ঘোষণা করছে শৃগালেরা। প্যাঁচা ডাকছে বাড়ির পাশের আমকাঠালের বাগানের গাছের কোটরে। বন্দরের ঘাটে মণ্ডপের স্খলিত কণ্ঠের গান টুকরোটুকরো ভেসে আসছে সন্ত-আগত দক্ষিণা বাতাসে। অজয়ের ওপারে শালবনে ফেউ ডাকছে। চিতাবাঘ বেরিয়েছে বোধ হয়।

দাসী বলে, রাত্রি অনেক হল সরকার মশায়। মোহিনী একলা আছে।

হেসে সরকার বলেন, তোমার ঘরবন্ধন মন্ত্রের গণ্ডী পার হবে কে? ভয় কেন এত? আখড়ার মধ্যে তো যমের অধিকার নেই কৃষ্ণদাসী। তার উপর যে পাহারা রয়েছে কেলে সর্দার, কোন ভাবনা নেই।

কৃষ্ণদাসী চমকে উঠল। কেলে সর্দারকে পাহারা রেখেছে? কে রেখেছে? অক্রুর? কেন? ভুরু দুটি তার কুঁচকে উঠল। বলল, কেলে সর্দারকে পাঠিয়েছে অক্রুর, মোহিনীকে আগলাতে, না, আমাদের উপর নজর রাখতে?

—না-না-না। অক্রুর পাঠায় নি। দিব্যি করে বলছি। সে বেটার মোহিনীকে মনে ধরেছে, কিন্তু মনের টান ওই সব বুনো জাতের মেয়েদের উপর বেশী। পাঠিয়েছি আমি কৃষ্ণদাসী। তোমার মন্ত্র-তন্ত্র আখড়ার মহিমা—সবই জানি। তবু বোয়েচ না, এমন একটা লোক পাহারা দিলে অনেক নিশ্চিন্তি। বেটাকে বলছি তিনজন শাকরেদ নিয়ে গাছের উপরে বসে থাকবে। আর বোয়েচ কিনা, তুমি এসেছ আমার কুঞ্জে, এ সময় আখড়ায় কিছু ঘটলে দুঃখ তুমি পাবে, কিন্তু আমার সে অপবাদের সীমা থাকবে না গো! রাধে রাধে—এ যে আমার কর্তব্য সখি!

কৃষ্ণদাসী শান্ত হল। শান্ত স্বরেই বললে, আমাকে বলে রাখলেই হত।

—হত। কিন্তু আমার নিজের কি জোর নেই তোমার উপর কৃষ্ণদাসী? শুধু তুমি নও—মোহিনী—! সেও তো ধর গা মেয়ে—আমার ছেলের সাধনসঙ্গিনী হবে? না কী?

কৃষ্ণদাসী চুপ করে রইল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল অক্রুরের কুৎসিত চেহারাখানা।

সরকার প্রশ্ন করলেন এবার, কত বয়স হল মোহিনীর?

—এই পনের।

—তবে আর কী! গর্ভ ধরে ষোল করে ক্রিয়াটা করে ফেল। ছেলেটা বড় বেবগ্‌গা হয়ে উঠছে। ওকে আর রাখতে পারছি না। বোয়েচ না, কোন্ দিন কোন্ যবনী নটীর খপ্পরে পড়বে!

—না না। এখনও—

—না নয়। আমি অনেক অর্থ দিয়েছি। দিয়েও যাচ্ছি। আমার ছেলের নজরের কথা যদি লোকে না জানত কেষ্টদাসী, তা হলে এতদিন তোমার মন্তর-তন্তর তোমার আখড়ার ঠাকুরের ভয় এ সব অগ্রাহ্যি করে অনেক ধাক্কা তোমার দরজায় পড়ত। বোয়েচ না? এখন আমার ছেলে নটীপাড়ায় ইতর লোকের হাতে ধরা পড়লে, বোয়েচ না, আমার মাথা হেঁট হবে। তা ছাড়া পাপ স্পর্শ করবে।

পুষ্পমাল্য, চন্দন, চুয়া, গুয়াপান ইত্যাদি উপকরণে সাজানো থালাখানি আসরের সামনে নামিয়ে দিল কেষ্টদাসী। কুঞ্জভঙ্গের ইশারা এটি। বললে, নটীরাও তো কিছু প্রত্যাশা করে আপনার ছেলের কাছ থেকে! আমার মেয়ের মনটা এখনও বড় কাঁচা সরকার মশায়। এ সব বললে বড় লজ্জা পায়। এখন কিছুদিন যাক।

বেশ শক্ত ভাবেই ঘাড় নাড়লে সে। অক্রুরের বীভৎস মূর্তিটা যেন তার চোখের সামনে

দাঁড়িয়ে কুকুর-দাঁত দুটো বের করে হাসছে। শুধু কদাকার নয়, তার উপরেও কিছু।

শ্বাপদের মত হিংস্র দেখায় তার ওই প্রকট শ্বাদন্তের জন্য। বন্য জাতের মেয়েদের উপর তার আসক্তিও তাদের বন্য দেহোন্মত্ততার জন্যই শুধু নয়, কৃষ্ণদাসী শুনেছে ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে সমানে সে তাদের রান্না-করা মাংস গেলে গোগ্রাসে। তাদের সঙ্গে তাদের তৈরি দেশী পচাই মদ্য পান করে। আহার করে শূকরের মত। ভালুকের মত রোমশ দেহ। কর্কশ স্থুল। রসিকতায় কৌতুকে মুখখানায় মুহূর্তে যেন বানরের মুখের সাদৃশ্য ফুটে ওঠে। চিৎকার করে গর্দভের মত। কিন্তু ক্রোধে সে বাঘের মত ভয়ঙ্কর।

এই সরকারেরই তো ছেলে! সরকার যখন তাকে প্রথম তার এই ঘরে সাধনের নামে এনে তার জীবনটাকে মহিষের স্নানে পঙ্কিল পল্বলের মত করে তুলেছিল, সে স্মৃতি তার মনে আছে। আজ তার সব সয়ে গেছে। কিন্তু মোহিনীর বোধ করি তা সহ্য হবে না। ছেলেটা বাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তার মেয়ে তার চেয়েও কোমল। সে হয়তো প্রথম দিনেই শুকিয়ে যাবে। মরে যাবে মোহিনী।

দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে কৃষ্ণদাসী বললে, না। তা হয় না সরকার মশায়। আমি স্বপ্ন দেখি। প্রায় স্বপ্ন দেখি। আমার শ্বশুরকে দেখি। তিনি শাসান। বলেন--অনিয়মে ফেটে মরে যাবে মেয়ে। আর যে সে অনিয়ম করবে, তার সর্পাঘাত হবে।

দাসী জানে, সাপকে সরকারের বড় ভয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অজয়তটে কেন্দুবিল্বের কদমখণ্ডীর ঘাট ইতিহাস-বিখ্যাত--বিখ্যাত, শাস্ত্রমতে পুণ্য-মহিমায় মহিমান্বিত। কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়নদস্নানে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য। কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব প্রভু এবং কবিপ্রিয়া পদ্মাবতী এই ঘাটেই নিত্য স্নান করতেন। প্রবাদ, কবিরাজ গোস্বামীর প্রার্থনায় মা-গঙ্গা উজান বেয়ে কদমখণ্ডীর ঘাটে এসে আবির্ভূতা হতেন। গল্প আছে, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিনে জয়দেব গোস্বামী গঙ্গাস্নানে যেতেন। একবার ঘটনাচক্রে যাওয়া ঘটে নি। যাওয়া না ঘটায় কবিরাজ গোস্বামীর ক্ষোভের আর শেষ ছিল না। সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে চোখের জল ফেলে শয্যাগ্রহণ করেছিলেন। শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলেন দেবী-জাহ্নবীকে। মকরবাহিনী হেসে বলেছিলেন—ক্ষোভ দূর কর। তুমি যেতে পারলে না যখন, তখন আমি আসব অজয়ের স্রোত বেয়ে কদমখণ্ডীর ঘাটে। তোমার স্পর্শে আমি ধন্য হব। ঘুম ভেঙে কবিরাজের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। মনের মধ্যে সে এক প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। এ কি স্বপ্ন? না, সত্যই দেবীর প্রত্যাদেশ? কী করে বুঝবেন? সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে গোস্বামী কদমখণ্ডীর ঘাটে গিয়ে উপনীত হতেই ঘাটের সম্মুখে অজয়ের জলধারা থেকে দিব্য-মণিময়-কঙ্কণ-পরা দুখানি অমলধবল বর্ণাভ হাত বেরিয়ে ঊর্ধ্বে উঠেছিল—কবিরাজ গোস্বামীকে সংকেত জানিয়েছিলেন, আমি এসেছি। অন্য প্রবাদে বলে, গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল থেকে সেদিন গঙ্গার জল উজানে অজয়ের খাত বেয়ে

কদমখণ্ডীর ঘাটে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। এবং সেই অবধি কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়-জলে স্নানে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয় বলে লোকের বিশ্বাস। সে বিশ্বাস আজও এই বিংশ শতাব্দীতে যায় নি। আজও উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে দলে দলে স্নানার্থীরা ভিড় করে আসে। সুতরাং আজ হতে প্রায় দু শো পঁচিশ বৎসর পূর্বে মানুষের এ বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা এবং প্রচণ্ডতা অনুমান করতে কষ্ট হবে না। প্রতিটি স্নানপূর্বেই এ অঞ্চলের লোকেরা হাজারে হাজারে ছুটে আসত।

তার উপর কবিরাজ গোস্বামীর কাল থেকে দীর্ঘ কয়েক শত বৎসর সমারোহ-সমৃদ্ধি-হীনতার কেন্দুবিল্ব তখন সদ্য-সদ্য অভাবনীয় সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে রাধারমণ ব্রজবাসী কেন্দুবিল্বে তীর্থদর্শনে এসে এখানে মহান্তের গদি স্থাপন করেছেন। বর্ধমান-রাজবাড়ির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বর্ধমানের রাজ-সরকারের ব্যয়ে ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ন'চূড়ার মন্দির তৈরী হয়েছে। ওপারের শ্যামরূপার গড়ের যে শ্রীরাধাবিনোদজীউ বিগ্রহ অধিকারী ব্রাহ্মণদের বাড়িতে ছিলেন, সেই বিগ্রহ এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ওই নূতন মন্দিরে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর রাধামাধবকে নিয়েই বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন—সে বিগ্রহ বৃন্দাবনে—এতদিন কেন্দুবিল্বের পাটে কোন দেবতা ছিলেন না; রাধাবিনোদ এসে সেই স্থান পূর্ণ করেছেন। এবং রাধাবিনোদও কবিরাজ গোস্বামীর পূজা নিয়েছেন, তাঁর গীতগোবিন্দ-গীতসুধা শুনেছেন। লোকে বলে, শ্যামরূপার গড় তখন জঙ্গল ছিল না—ছিল একটি সমৃদ্ধ দুর্গ এবং মহারাজ বল্লালসেনের সঙ্গে বিরোধ করে কুমার লক্ষ্মণসেন এখানে এসে বাস করেছিলেন। তখনই কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্গে মহারাজকুমারের পরিচয় হয়। রাধাবিনোদ কবিরাজ গোস্বামীর পূজা তখনই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কালক্রমে গড় ধ্বংস হল, অরণ্য এসে গ্রাস করলে ধ্বংসস্তূপকে; রাধাবিনোদ তখন গিয়েছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণদের ঘরে; এইবার এসে অধিষ্ঠিত হলেন জয়দেবের পাটে, নূতন প্রতিষ্ঠিত নবরত্নের মন্দিরে। মন্দিরের পশ্চিমেই ব্রজবাসী মহান্তের গদি ও দেবালয়। চারিপাশে বসেছে বাজার। ওদিকে ইলামবাজার জমুবাজার সুখবাজার বাণিজ্যের সমারোহে পরিণত হয়েছে জমজমাট বন্দরে। কাজেই নিত্যই মেলা বসত কদমখণ্ডীর ঘাটের উপরে চারিপাশে। কারণ পঞ্জিকার ছোটখাটো স্নানপর্বের তো অভাব নেই—দু-দশদিন অন্তর লেগেই আছে এবং মানুষের পুণ্য-কামনারও শেষ নেই। অসহায় মানুষ দৈনন্দিন জীবনের অপচয় করে অপব্যয় করে। আবার অন্য দিকে শুদ্ধ জীবনের আনন্দের জন্য লালায়িত হয়; সত্য-ন্যায়-সংযম-আত্মত্যাগে আলোকিত জীবন তার মনে পুষ্পিত বৃক্ষশীর্ষের মত নিজেকে সুন্দর করে বিকশিত করে তোলবার স্বপ্ন দেখে। কোনটাই তার মিথ্যা নয়। তাই একটি স্নানে বহুপাপক্ষয়ের সুযোগ সে ছাড়ে না। এমন সহজ প্রায়শ্চিত্তের পথ ছাড়লে সে বাঁচবে কী করে? আরও আছে, এই স্নানপর্ব উপলক্ষে সমারোহের মধ্যে সে পায় উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস আস্বাদনের নূতন ক্ষেত্র, পরোক্ষ প্রশ্রয়। তাই সমৃদ্ধ অঞ্চলটির মধ্যে সদ্যসমৃদ্ধ কেন্দুবিল্বে কদমখণ্ডীর ঘাটে মেলা লেগেই আছে।

সেদিন চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। এ আখ্যায়িকার আরম্ভ দোলযাত্রা

শুক্লপক্ষের প্রতিপদে; মধ্যে দোলপূর্ণিমা চলে গেছে; তারপর আজ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী। কেন্দুবিল্বের মন্দির-প্রাঙ্গণে গাছপালার পত্রপল্লবের কাণ্ডের গায়ে, গৃহস্থের বাড়ির দেওয়ালে এখনও আবীরের প্রলেপ ও রঙের দাগ মুছে যায় নি। লোকজনের কাপড়-চোপড়ে এখনও লালচে আভা ফুটে রয়েছে। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ দিনে এত আবীর এত রঙ মুছবার নয়। আবার এল মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। পঞ্জিকাকারেরা লিখেছেন, এই ত্রয়োদশীতে বারুণী-গঙ্গাস্নান পর্ব। বহু শত সূর্যগ্রহণে গঙ্গাস্নানের পুণ্য একত্রিত করলে যে ফল হয়, এক বারুণী-গঙ্গাস্নানে সেই পুণ্যফলের অধিকারী হয় মানুষ। সুতরাং হাজারে হাজারে সেদিন যাত্রী এসে সমবেত হচ্ছে কদমখণ্ডীর ঘাটে। পণ্যসম্ভারের নৌকো নিয়ে ইলামবাজার জয়বাজার থেকে ব্যবসায়ীরা গতকাল থেকেই হাজির হয়েছে। মুরশিদাবাদ অঞ্চল থেকেও নৌকা এসেছে কয়েকখানা। কেউ এনেছে নৌকো-বোঝাই মাদুর শীতলপাটি; কেউ এনেছে কাঁসা-পিতলের বাসন; কেউ পাথরের বাসনের নৌকো—পশ্চিম অঞ্চলের পাথর থেকে তৈরী থালা বাটি ঘটি ইত্যাদি; আর স্থানীয় তন্তুবায়েরা এনেছে মশারি; চাষীরা এনেছে বাবুই-ঘাসের ঝাঁটি। গ্রীষ্মকাল আসছে, এ সব জিনিস গৃহস্থেরা প্রয়োজনমত কিনবে। মন্দিরের সেবাইতরা মাথায় নামাবলী পাগড়ির মত বেঁধে বসেছে; তারা মন্দিরে প্রণামী কুড়চ্ছে, তাদের লোকজনেরা চারিপাশের দোকানে খাজনা আদায় করে ফিরছে; মোহন্তের লোকজনেরাও নিজেদের এলাকায় ঘুরছে। কালটিও মনোরমা; শীত যাই-যাই করছে, বসন্তের বাতাস মধ্যে মধ্যে দমকা মেরে ছুটে আসছে; গাছপালায় নূতন পাতা দেখা দিয়েছে। ঝরাপাতা শিমুলের গাছগুলি রাঙা—রাঙা আর রাঙা; পলাশ দু-চারটে গাছে এখনও ফুটে আছে। জয়দেব-মন্দিরের পিছনেই বড় মাধবীলতার সুদীর্ঘ নমনীয় ডালগুলির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পুষ্পস্তবকের সমাবেশ। আমের মুকুল প্রায় ঝরে এল। গুটি ধরেছে। বহড়ার মুকুল দেখা দিচ্ছে।

অজয়ের ওপারে গড়জঙ্গলের বিশাল শালবন কচিপাতার শ্যামলারণ্যে নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। এপার থেকে মনে হয় বসন্তের ফিকে নীল আকাশের প্রান্তদেশে কোন চিত্রকর যেন তুলির টানে কোমল সবুজ রঙের দীর্ঘ একটি পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছে। ওদিকে চোখ পড়লে আর ফিরতে চায় না; জুড়িয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণা বাতাসের দমকায় শালফুল মহুয়া ও বহড়া-মুকুলের মিশ্রিত গন্ধ ভেসে আসছে। ওপারেও একটি ঘাটে ছোটখাটো ভিড় দেখা যাচ্ছে; নৌকোও জমে রয়েছে কতকগুলি; ওই ঘাটে নেমে যাবে সব—শ্যামরূপার গড়। মা শ্যামরূপার স্থানে প্রণাম করে আসবে, মানস সিদ্ধির জন্য ঢেলা বাঁধবে। এপার থেকেও লোক যাচ্ছে ওপারে। প্রতি বৎসরই যায়; এবার ভিড় বেশী। কারণ আছে। গড়ে শ্যামরূপার স্থান থেকে খানিকটা পূর্বদিকে ইছাই ঘোষের দেউলে নাকি এক নবীন গোস্বামী এসে নূতন মঠ তৈরী করছে।

নবীন গোস্বামী এসেছে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে, ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে। গোস্বামীর নাকি দেবতার মত রূপ, তেমনি তার মহিমা। সাক্ষাৎ দেবতা। মুখের দিকে তাকানো যায় না। ধর্মমতে সে বৈষ্ণব; কিন্তু সে মত অদ্ভুত। সঙ্গে এনেছে এক অনুপম বিগ্রহ। কেউ বলে

গোবিন্দ, কেউ বলে দ্বিভুজ বিষ্ণু, কেউ বলে উদ্ভট বিগ্রহ। কারণ রাধা বিহনে কি গোবিন্দ থাকেন? অবশ্য বৃন্দাবনে বাঁকেবিহারী আছেন, কিন্তু সে তাঁর গোপাল অর্থাৎ বাল্যভাব। আর বিষ্ণু কি দ্বিভুজ হন? না, তাঁর হাতে বাঁশী থাকে? এ মূর্তির এক হাতে বাঁশী, অপর হাতে চক্র। মুখমণ্ডলে আশ্চর্য একটি ভাবব্যঞ্জনা। হাসির মাধুর্যের চেয়ে যেন তেজ বেশী। ঠাম বঙ্কিম নয়। ঋজু মহিমায় পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

কতকালের ইছাই ঘোষের দেউল; চারিদিকে ধ্বংসাবশেষ, শত শত বৎসর ধরে শালবন ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করেছে। গাঁথনির ফাটলে ফাটলে বীজ পড়ে গাছ জন্মেছে, মোটা শিকড়ের চাড়ে ফাটিয়েছে, সূক্ষ্ম শিকড়ের জাল বিস্তার করে—শত সহস্র গ্রন্থি দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, মাথার উপরে কাণ্ড শাখা বিস্তার করে পত্র-পল্লবের আবরণে দৃষ্টির অগোচর করে ছেয়ে ফেলেছে। পারে নি শুধু মূল দেউলটিকে কুক্ষিগত করতে; সে দেউল আজও শাল-বনস্পতির মাথা ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এবং আশ্চর্য গাঁথনি, এতটুকু ফাটে নি, কোথাও একটি বীজ অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায় নি, জন্মেছে শুধু কালো শ্যাওলা—চূড়া থেকে বনিয়াদ পর্যন্ত। শত শত বৎসরের বর্ষার ধারায় ধূলি-ধূসর অবস্থায় ভিজেছে; ফলে এই সিক্ত ধূলি-আস্তরণটিকে অবলম্বন করে জন্মেছে শ্যাওলা। অনেক দূর থেকে মনে হয়, মন্দিরের চূড়ার আকারের এক টুকরো কালো মেঘ। কাছে গেলে মনে হয়, কালো-পাথর-কেটে-গড়া এক বিশাল মন্দির। একেবারে কাছে গেলে বোঝা যায়—না, পাথর নয়, ইটেরই মন্দির, শ্যাওলা পড়েছে।

* * *

ধর্মমঙ্গলের কালের শক্তি-উপাসক গোপভূমের মহাবীর ইছাই ঘোষ। শ্যামরূপার গড় তাঁরই দুর্গ। আজ অরণ্যভূমের কুক্ষিগত। চারিপাশেই অরণ্য। পশ্চিম এবং উত্তর দিকের বন পাতলা, বন ঠিক বলা চলে না—জঙ্গল বলতে হয়। উত্তর দিকে খানিকটা বিক্ষিপ্ত জঙ্গলের পরই চাষের মাঠ, তারপর অজয়ের বন্যারোধী প্রশস্ত বাঁধ; সেকালে এই বাঁধই ছিল যুদ্ধের সময় নগরীর প্রাচীর, আবার সাধারণ সময়ে পথের কাজও করত। বাঁধের পরই অজয়ের চরভূমি। পশ্চিমে খানিকটা দূরে মৌজা গৌরাঙ্গপুর, আরও খানিকটা পশ্চিমে মূল গড় বা ইছাই ঘোষের পুরী এবং বিশাল দুর্গ—গভীর অরণ্যের মধ্যে ধ্বংসাবশেষে পরিণত। দেউলের পূর্বে এবং দক্ষিণে ঘন শালবন। এই আবেষ্টনীর মধ্যে অভগ্ন অটুট দেউলটির চারিপাশের জঙ্গল কেটে ইটের স্তূপ পরিষ্কার করে সেকালের পাকা মেঝে বের করা হয়েছে। প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির উপর অতি দ্রুতগতিতে শালকাঠ বাঁশ খড় দিয়ে সারি সারি ঘর তৈরি হচ্ছে। দেউলের দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর। এককালে হয়তো সরোবর ছিল। এখন সাধারণ জলাশয় ছাড়া কিছু বলা চলে না। পূর্বদিকে পূর্বকাল থেকেই ছিল দেউলচত্বরে প্রবেশের তোরণ বা সিংহদ্বার। দুদিকে দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মত ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্য দিয়েই চলে গেছে গাড়ি চলবার মত প্রশস্ত পথ, অরণ্য ভেদ করে চলে গিয়েছে অজয়ের ঘাটের দিকে। সেইখানেই দুটি পাকা মজবুত থাম তৈরি করে প্রবেশদ্বার করা হয়েছে এবং পুষ্করিণী সমেত এলাকাটিকে ঘন শালখুঁটির বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। শালকাঠের খুঁটি,

বাখারির বেড়ার দেওয়াল, খড়ের চাল, পাকা মেঝে, শালকাঠের তৈরি আগড়, সামনে শালের খুঁটির উপর টানা-কাটা পরচালা। যেন ফৌজী ছাউনি। অবশ্য বাখারির বেড়ার দেওয়ালে ভিতরে বাহিরে মাটির প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই ছাউনির চেহারা পালটে গিয়ে—আশ্রমের চেহারা নেবে। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনা ঘটেছে অনেক—লোকজন এসে এদিক-ওদিক দেখে কিছুক্ষণ থেকেই চলে গিয়েছে। অস্বস্তি বোধ করেছে।

এখানকার সমস্ত-কিছুর মধ্যেই তারা যেন নিজেদের জীবনের ছন্দ মেলাতে পারে না। এখানে উল্লাস আনন্দ মানুষজন, আবেষ্টনী সবই যেন গভীর গম্ভীর স্থির। স্থির শান্ত দহের মত, নামতে ভয় করে; অনুমান করতে পারে না, কী আছে ওর তলদেশে। নামবার মত শক্তিও নেই; ভয় হয় বোধ করি বা তলদেশে নামতে নামতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। আরও আছে। এই গোস্বামী শুধু গোস্বামী নন, ইনি এখানকার ভূস্বামী হয়ে এসেছেন। এখানকার জমিদারী স্বত্বের ইজারা নিয়ে এসেছেন। খাস নবাব-দপ্তর থেকে নজর-সেলামী দিয়ে বন্দোবস্ত নিয়েছেন। ব্যবস্থা পাকা করেই সব করেছেন তিনি, কিন্তু তবু পাকা মঠ করবার কল্পনা এখনও স্থগিত রেখেছেন। তার কারণ রাজসরকারের ভয়। বেণীমাধবের ভাঙা ধ্বজার উপর তৈরী মিনার, বিশ্বনাথের পুরনো মন্দিরের মাথায় মসজিদের গম্বুজ মাধবানন্দ চোখে দেখেছেন; বৃন্দাবনের অর্ধভগ্ন গোবিন্দ-মন্দিরের কথা বহুজনের কাছে শুনেছেন। বাংলা দেশে জাফর কুলী খাঁর মত ন্যায়পরায়ণ নবাবের আমলেও মানুষের এ ভয় দূর হয় নি। জাফর কুলী খাঁ এবং তাঁর আমীর-ওমরাহদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ লোক অনেক আছে; কিন্তু 'শরফ' কাজীর মত লোকেরও অভাব নেই। নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ 'কাজী-শরফ'; ভণ্ড ফকিরের অভিযোগে চুনাখালির জমিদার বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড বিধান করেছিলেন। নবাব জাফর কুলী খাঁ—সম্রাট আলমগীরের পৌত্র সুলতান আজিমুশ্বান পর্যন্ত এ বিচারকে ন্যায়বিচার বলতে পারেন নি। জমিদার বৃন্দাবনের প্রাণরক্ষার জন্য সম্রাটের কাছে আবেদন করবেন বলে কাজীকে অনুরোধ করেছিলেন প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখতে। কাজী তা শোনেন নি। বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বহস্তে তীর যোগে বৃন্দাবনকে বধ করে শান্ত হয়েছিলেন। সংবাদ শুনে সম্রাট আলমগীর স্বহস্তে লিখেছিলেন, "কাজী-শরফ খোদাকা তরফ।" অন্যদিকে সমস্ত বাংলার সামন্ত শক্তি তখন জাফর কুলী খাঁর প্রবল শক্তির চাপে নিস্তেজ; বহু স্থলে আঘাত খেয়ে নির্জীব। আজ মঠ-মন্দির গড়তে হলে নবাব-দরবারে যথারীতি অনুমতি ইত্যাদি নিয়ে করাই যুক্তিসঙ্গত। শুধু বাংলার নবাবের নয়—দিল্লির বাদশাহের ফরমানের জন্যও যথারীতি চেষ্টা হচ্ছে। ফরমান এলেই পাকা মঠ শুরু হবে।

প্রথম দিন যেদিন মাধবানন্দ এখানে এসে উপস্থিত হন, সেদিন দেউলের আশ্রমে আসবার আগে প্রথম এসে নেমেছিলেন কদমখণ্ডীর ঘাটে। কবিরাজ গোস্বামীর সাধনায় পবিত্র কেন্দুবিল্বে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীউকে প্রণাম করে তারপর এসে নেমেছেন এপারে নিজের আশ্রমে। জয়দেব গোস্বামীর মন্দির, রাধাবিনোদজীউ ঠাকুর ব্রাহ্মণ সেবায়েতদের। তার ওপাশে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধুরা এসে এক মঠ তুলেছেন। সেখানেও তিনি গিয়েছিলেন। তাঁরই সঙ্গে পরিচয়ের পর কথাপ্রসঙ্গে কথাগুলি প্রকাশ করেছিলেন। শুধু আশ্রমের স্বত্বের

কথাই নয়—তত্ত্ব নিয়েও কথা হয়েছিল।

কেন্দুবিল্বের মহান্ত ভরত দাস সেদিন প্রথম পরিচয়ের পর মাধবানন্দের নৌকোয় এসে বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। তাঁর কৌতূহল হয়েছিল নৌকোর ধ্বজা দেখে। ধ্বজার প্রতীক তাঁর কাছে নূতন বলে মনে হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ ঝাণ্ডার অর্থ কী গোস্বামীজী? কৌন্ কুলকা ঝাণ্ডা? অর্থাৎ কোন্ গুরুকুলের ধ্বজা?

মাধবানন্দ হেসে বলেছিলেন, আমার গুরুই নিজের কুল প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছেন মহান্ত মহারাজ। দেবতা তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, বহুরূপের মায়াকে সম্বরণ করে শুদ্ধ স্বরূপে দেখা দিয়ে এই ধ্বজা তাঁকে দিয়েছেন।

এ কথায় প্রথমটা বেশ কিছুক্ষণ স্থির অথচ কৌতুক-মেশানো দৃষ্টিতে মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহান্ত; কিন্তু সে ব্যঙ্গ সে কৌতুকের উপহাসে এই তরুণ গোস্বামীটিকে কিছুতে উপহাসাস্পদ বলে মনে করতে পারলেন না। হঠাৎ মাধবানন্দের হাত ধরে বললেন, দেবতাকে দর্শন করাও ভাই; দেখি সমঝাতে চেষ্টা করি।

দেবতা দর্শন করে বলেছিলেন, পরমাপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষোত্তম? রাধা বাদ দিয়ে শ্যাম? এ যে ভ্রান্তি!

কানে আঙুল দিয়ে মাধবানন্দ বলেছিলেন, সে মীমাংসা হতে পারে আমার গুরুর সঙ্গে। আমাকে ও-কথা শুনতে নেই।

—ভাল। তুমি কী বুঝেছ ভাই আমাকে বল?

—নিজে যা বুঝি তা যখন সকল জনকে বোঝাতে পারব, তার আগে আমার সাক্ষাৎদর্শন হবে মহারাজ। তখন আমিই হব গুরু।

—তার অর্থ তুমি ভাই বলতে চাও না।

—যোগ্যতা না থাকলে বলতে নেই মহারাজ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ভরত দাস বলেছিলেন, তোমার কথা শ্রীখণ্ডের বাউল সাধক উদ্ধব আমাকে বলেছিল। কৃষ্ণদেবের সঙ্গে তুমি স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্ববিচারের সময় মেলেটিতে উপস্থিত ছিলে। কৃষ্ণদেব হার মেনে দীক্ষা নিলেন, তুমি পালিয়ে গেলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে।

শান্তস্বরে বাধা দিয়ে মাধবানন্দ বললেন, আমি কোনও প্রতিজ্ঞা করি নি মহারাজ। চুক্তি-নামায় আমি স্বাক্ষর দিই নি।

—তোমার গুরু দিয়েছিলেন।

শান্তস্বরেই আবার মাধবানন্দ বললেন, কৃষ্ণদেব কোন কালেই আমার গুরু ছিলেন না মহান্তজী।

—ছিলেন না?

—না। কৃষ্ণদেব সন্ন্যাসী নন; আমি দীক্ষার পূর্ব থেকেই সন্ন্যাসের পথ অনুসরণ করছি। তিনি আমার আচার্য মাত্র।

—হুঁ। কিন্তু—

—কী বলুন?

—আচার্য রাধামোহন পরকীয়া-তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে শোনবার পরও তোমার সন্দেহের নিরসন হয় নি ? সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ চৈতন্য মহাপ্রভুর উপলব্ধি তাঁর নির্দেশ, একেও তুমি ভ্রান্তি মনে কর ?

মাধবানন্দ একটু হাসলেন শুধু। কোনও উত্তর দিলেন না।

অসহিষ্ণু হয়েই ভরত দাস ব্রজবাসী প্রশ্ন করলেন, জবাব তো দেনা চাহি ভাই। বাতাইয়ে।

মাধবানন্দ বললেন, ভ্রান্তি আমারই মহারাজ। যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা তিনি এবং সত্যরূপিণী অভিন্ন। তাঁর ভ্রান্তিরূপিণী রূপ তিনিই সম্বরণ করে আমাকে তাঁর সত্যরূপ দেখাবেন।

—অর্থাৎ এখন এই তোমার কাছে পরম সত্য।

—মহারাজ, ব্রহ্মকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরাই বিশ্বদহনকারী সূর্যের দাহিকা-শক্তিকে অতিক্রম করে তাঁর মধ্যস্থিত পুরুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। যাঁরা পারেন নি, তাঁরা ওই বিশ্বাসে সূর্যের সমীপস্থ হবার চেষ্টা করলে পুড়ে ছাই হয়ে যান। তর্ক আমি করব না, কিন্তু মহাপ্রভু যে পরকীয়া-তত্ত্বের সাধনার মধ্যে অহরহ আনন্দময় সত্তার সঙ্গে বিরহ-মিলনের অমৃতরস আস্বাদন করেছেন, সাধারণ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাউল বৈরাগী মোহগ্রস্ত গৃহস্থের পক্ষে সে সাধনা কি সম্ভব ? চোখে কি দেখছেন না দেশের অবস্থা ?

মহান্ত ভরত দাস আবার নবীন গোস্বামীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সেই কারণেই শ্যামসুন্দরের মুখের হাসি মুছে দিয়েছ, আনন্দময় প্রেমময়কে তেজোময় করে নির্মাণ করেছ ?

উত্তর দিলেন না মাধবানন্দ।

ভরত দাস বললেন, ওই তেজে যদি তোমাকেই দগ্ধ করে গোস্বামীজী!

মাধবানন্দ হেসে বললেন, তাতে দুঃখ করব না। দগ্ধ হতে হতে বলব—"বায়ুরনিলমমৃতম-থেদং ভস্মান্তং শরীরং ওঁ ক্রতোস্মর কৃতং স্মর ক্রতোস্মর কৃতংস্মর।"

ভরত দাস আপন মনে বলে গেলেন, হুঁ। প্রাণবায়ু মহাবায়ুর অমৃতে লীন হোক, এ দেহ ভস্মে পরিণত হোক। হে অগ্নি, হে তেজ, আমার যা স্মরণীয় তা স্মরণ কর; আমার কৃতকর্মও স্মরণ কর। তুমি জ্ঞানবাদী পণ্ডিত, ভাল কথা। অগ্নি নিয়ে যজ্ঞের ছলে খেলা করতে ভালবাস। ভাল ভাই, তোমার পথ তোমার। কিন্তু এখানে তুমি এলে কেন ? এই কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দের পাটে ? জান, এখানে তিনি নিজ হাতে গীতগোবিন্দের পাদপূরণ করে লিখেছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ! রাধার চরণ মাথায় ধরে পরকীয়া-তত্ত্বকে মানুষের শিরোধার্য করে দিয়েছেন। এ তো তোমার তীর্থ নয়।

মাধবানন্দ বললেন, যেখানে সাধনপীঠ সেখানেই তীর্থ। সব সাধনাই সমান পবিত্র। তাই এখানে যখন এলাম, তখন সর্বাগ্রে কবিরাজ গোস্বামীর পাটেই প্রণাম জানাতে নামলাম। এবার ওপারে যাব।

—ওপারে ? চকিত হলেন মহান্ত ভরত দাস।—ওপারে কোথায় ?

—ইছাই ঘোষের দেউলে। মৌজা গৌরাঙ্গপুরে। ওখানেই মঠস্থাপনের ইচ্ছা আছে।

—গৌরাঙ্গপুর—দেউল এলাকা—তা হলে—আপনারাই বন্দোবস্ত নিয়েছেন?

—আমরাই বন্দোবস্ত নিয়েছি।

—গড় এলাকাও তা হলে—? প্রশ্নের দৃষ্টিতে আরও কিছু অর্থ যেন ফুটে উঠল।

—হ্যাঁ।

—বন্দোবস্ত পাকা করেই এসেছেন তা হলে। কিন্তু—

—কী?

—ওই বনের মধ্যে মঠ করবেন? কেন, বনের মধ্যে কেন, লোকালয় ছেড়ে?

মাধবানন্দ হেসে বললেন, তপস্যার জন্য তো অরণ্যই প্রশস্ত স্থান মহারাজ।

—তা হয়তো বটে। কিন্তু এ এলাকা যে গীতগোবিন্দের এলাকা। বিপরীত সুর হলেই বেসুর বাজে ভাই। বেসুর বাজালেই যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

হেসে মাধবানন্দ বললেন, কিসের বেসুর, কিসের বিরোধ মহারাজ? ব্রজলীলার পর তো মথুরা। কংসবধ। এপারে ব্রজধাম—ওপারে মথুরা—মধ্যে যমুনা। এখানেও সেই লীলার নূতন প্রকাশ যদি হয় তো হোক না মহান্ত মহারাজ, ক্ষতি কী?

মহান্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—সে দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার মাধবানন্দ বললেন, তপস্যা মানুষের একান্তভাবে নিজস্ব মহান্ত মহারাজ; তত্ত্ব নিয়ে বিরোধ আমি করব না।

মহান্ত স্তব্ধ হয়েই রইলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা ভাই, দেখা যাক।

নৌকো থেকে নেমে চলে গেলেন তিনি।

মাধবানন্দের নৌকো কদমখণ্ডীর ঘাট থেকে নোঙর তুলল। সরতে লাগল নৌকো, হাল ঘুরল—নৌকো বিপরীতমুখী হয়ে খানিকটা নীচের দিকে এসে এপারে দেউলের সামনের ঘাটে ভিড়ল।

মাধবানন্দ একখানি আসনের উপর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন। ঠোঁট নড়ছিল তাঁর। একটি শ্লোক বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই মৃদুস্বরে তিনি আবৃত্তি করছিলেন—

“যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মিলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবা রোধোসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।”

চৈতন্যস্বরূপ প্রেমবিভোর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভোর হয়ে জগন্নাথদেবের রথের সামনে দাঁড়িয়ে দরবিগলিত ধারার মধ্যে গদগদ কণ্ঠে এই শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন।

এর মর্ম মাধবানন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। পরকীয়া নায়িকার নায়ক-মিলনাগ্রহ এবং আবেগের কথা কে না জানে, অনুমান করতে পারে? আত্মসমর্পণের গভীরতা যে অতলস্পর্শী! সে যে অকূলে ঝাঁপ দেওয়া। কূল না হারালে অকূলে ঝাঁপ দেয় কী করে?

স্বকীয়া থাকেন কূলের মধ্যে। রুক্মিণীরূপিণী লক্ষ্মীকে পাশে নিয়ে যদুকুলপতি গোবিন্দ নিজেও সম্পর্ক এবং রক্তের সূত্রে বাঁধা ; সর্বাগ্রে তিনি যাদবদের, সেখানে তিনি কারও পতি কারও পিতা কারও পুত্র ; সেখানে তিনি রাজা—সেখানে তিনি পালককর্তা—সেখানে তিনি দণ্ডদাতা। যাদব-বংশের ধর্ম আর রাজধর্মের দুই বাঁধা কূলের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। কূল হারালে অকূলের যাত্রীর তরী বাঁধবার ভাসাবার ওখানে ঘাট কোথায়? পরকীয়াকে পাশে নিয়ে গোবিন্দ কূল ভাসিয়ে অকূল পারাবারের মত অপার প্রেমরঙ্গের তরঙ্গময়। সেখানে তিনি সবার। রাসবিলাসে ষোল শো গোপীর সকলের পাশেই রাসবিহারী। জাত নাই কুল নাই মান নাই মর্যাদা নাই, অকূলের জন্য আকুল হয়ে কুল ছেড়ে তিমির-রাত্রে দুর্গমে বের হতে পারলেই শুনতে পাবে—ধীর সমীরে যমুনাতীরে বংশী বাজছে। তিনি জানেন। এ ভজনার মাধুর্য পঙ্কোদ্ভূত পঙ্কজের মত সর্বমালিন্য-মুক্ত, এ পুষ্পের মর্ম মধুর-আস্বাদ অমৃততুল্য। তবু এ সবার জন্য নয়। সাধারণের নয়। এ অধিকার নিষ্কাম ভক্তের।

রূপ গোস্বামীর শ্লোকও তাঁর মনে আছে। কিন্তু তবু তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি সে-কথাও জানেন। বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী ঈশ্বরের শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী স্বামী-প্রেমের ঐশ্বর্য ও সকল গৌরবের অধিকারিণী হয়েও তৃপ্ত হন নি ; মনে হয়েছিল এর চেয়েও মধুরতম মাধুর্য আছে। সেই মাধুর্যের আস্বাদনের জন্যই তিনি দ্বাপরে গোকুলে পরকীয়া রাধা হয়েছিলেন। তবু না। তবু না। এ সাধনা বিকৃত হলে যে কী পরিণতি হয় সে তিনি জানেন ; চোখে দেখেছেন। মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। অমৃত বিষ হয়, জ্যোতি অন্ধ হয় ; জীবনচন্দন গলিত পঙ্কে পরিণত হয় ; নরকাসুরের উদ্ভব হয়।

যা চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য, তা সাধারণের জন্য নয়। তিনি তো দেখেছেন তাঁর বাপের জীবনের ধর্ম-সাধনার স্বরূপ। সারা দেশে পরকীয়া এবং কিশোরী-ভজনের পরিণতি। এ ছাড়াও তাঁর মন চৈতন্যময় পুরুষের পাশে আর কোন রূপকে কল্পনা করতে পারে না ; নিত্য-চৈতন্যে স্থিতিমান আনন্দ-ধ্যানে মগ্ন—চিরসুন্দর পুরুষোত্তম তিনি যে পূর্ণ, মাধুর্য ঐশ্বর্য সবই তাঁর মধ্যে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত। আজ কয়েক পুরুষের মোহাচ্ছন্নতায় সেই বিন্দুর ধ্যান বস্তুজগতে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। স্থির জ্যোতির্বিন্দুকে হারিয়ে আলো-আঁধারির মোহে দিক্‌ভ্রান্তি ঘটেছে। পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধকার জমেছে বংশকে ঘিরে। পরলোকে ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা আলোক-তৃষ্ণায় আকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন উত্তরপুরুষের দিকে। সেই হারানো বংশ-তপস্যাকে তিনি পুনরুদ্ধার করবেন। তাই তাঁর ধ্যান এক অদ্বিতীয় পূর্ণপুরুষের ধ্যান। সকল লীলার মধ্যে তিনিই লীলাময়। বৃন্দাবন থেকে প্রভাস পর্যন্ত তিনি একক ; সকল-কিছুকে মিথ্যার মত অলীকের মত বর্জন করে পিছনে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে মুহূর্ত বিলম্ব ঘটে নি তাঁর। কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের এক বিন্দু তাঁর মন স্পর্শ করে নি। প্রভাসের তটে বংশলোপের খেলা তিনি নিজেই রচনা করে গেছেন। তিনি পূর্ণ। তাঁর উপাসনা পূর্ণ এককের উপাসনা।

শুধু গোবিন্দ। শুধু শ্যাম। পূর্ণপুরুষোত্তম। চৈতন্যের উৎস জ্যোতির্বিন্দু। গীতাতে তিনি স্বমুখে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—মামেকং শরণং ব্রজ। দর্শন করবে সে তাঁর সেই

বিশ্বরূপ—

"ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ।"

ব্রহ্মচর্য তার প্রথম যোগ, দ্বিতীয় সন্ন্যাস, তৃতীয় ধ্যান। নারীকে দূরে রাখ। সে-ই ভাঙে ধ্যান—সে-ই ভাঙে সন্ন্যাস—সে-ই ভাঙে ব্রহ্মচর্য। বস্তু-জগতের মোহ সে, চৈতন্যকে সে আচ্ছন্ন করে, জ্যোতিকে সে শিখাময় বহ্নি করে তোলে ইন্ধনের মত। অনেক মর্মযন্ত্রণা ভোগ করে ভাগ্যক্রমে এই সত্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। মালিহাটিতে স্বকীয়া-মতের পরাজয়ের পর কাটোয়ার ঘাটে জয়পুরের কৃষ্ণদেব আচার্য থেকে তাঁর অনুচরবর্গ যখন পরকীয়া-মতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন—তাঁর দীক্ষাগ্রহণের পালা এগিয়ে আসছে, তখন তাঁর অন্তরাত্মা মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হয়ে উঠেছিল, আকাশে মাটিতে গঙ্গার জলে ভেসে উঠেছিল তাঁর মায়ের পাথরের মূর্তির মুখের মত মুখখানি। অনেক যন্ত্রণা তাঁর জীবনে, তবু তাঁর মুখে পাথরের কাঠিন্য। বাতাসে অনুভব করেছিলেন তাঁর নিশ্বাসের উষ্ণস্পর্শ। তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। তারপর ঘুরলেন সারা ভারতবর্ষ। তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন। চার ধাম পরিক্রমা করলেন। কোথায় আছে পথের সন্ধান? কোথায় পাওয়া যায় মৃতসঞ্জীবনী? মহারাষ্ট্রে গেলেন—নাসিকে। দেখলেন সেখানে হিন্দুকুল-তিলক ছত্রপতি শিবাজীর মারাঠা জাতিকে। ছত্রপতির সাধনা তখন বিগত; শম্ভাজী সুরা এবং নারীর আসক্তিতে ডুবে বিকৃত হয়ে মুঘল কারাগারে বন্দী হয়ে প্রাণ দিয়েছে। ছত্রপতির বংশধরেরা দু ভাগে ভাগ হয়ে দাবার ঘুঁটির মত পেশবাদের হাতের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে। রাজপুতানা ঘুরলেন, বিস্ময়ের সীমা রইল না। এত বড় তেজ এত বড় বীর্য, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ব্যভিচারের ব্যাধি! কী ব্যসন! কী বিলাস! মীরার রণছোড়জীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন তিনি। কেন রণছোড়জী হলে তুমি? কেন পরিবর্তন করলে তোমার কুরুক্ষেত্রের সেই মহিমময় রূপ? পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভব কি আর তুমি হবে না? বৈষ্ণব পরকীয়া-তত্ত্বের প্রভাবে সমগ্র দেশের সাধারণ সমাজের মধ্যেও দেখে এলেন এই বিকৃতির প্রতিচ্ছায়া। মঠে দেখে এলেন এই বিকৃতি। ফেরার পথে গোকুলে হঠাৎ দেখা পেলেন এক গোস্বামী সাধুর। তাঁর কাছে তিনি পেলেন সান্ত্বনা।

তিনি বললেন, তোর আত্মা-নারায়ণ তো জেগেছে। সে যা বলে তাই কর্। দুনিয়া ঢুঁড়ে ঘুরে মরেছিস তুই, তার সে তোর হৃদয়-মন্দিরমে খাড়া হয়ে ফুকারছে, তু শুনতা নেহি?

তারপর হেসে বললেন, কাল তো আ গয়া। হামারা আঁখো কি সামানা মে দেখতা হুঁ কি ভৈরব তো নাচনেকো লিয়ে খাড়া হো গয়া—হ-হ-হ! তাথৈ-থৈ। তাথৈ-থৈ—! হ-হ-হ!

সেদিন গোস্বামীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরের কথাগুলি তাঁর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে ভেরীনাদের ধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনি তোলে ধাতুপাত্রে ধাতুযন্ত্রে ধাতুখণ্ডে, তেমনি এক প্রতিধ্বনি তুলেছিল।

সেখান থেকেই তিনি নূতন তত্ত্ব নিয়ে ফিরলেন।

গোস্বামীর কাছেও তিনি দীক্ষা নেন নি। তাঁর দীক্ষা তাঁর অন্তরপুরুষের কাছে। তবে

গোস্বামীর সঙ্গে মাসখানেক ছিলেন তিনি। অনেক কথা তাঁর সঙ্গে হয়েছে। সে-সব কথা কাউকে বলবার নয়। কাল পার্শ্বপরিবর্তন করেন মধ্যে মধ্যে। কাল পার্শ্বপরিবর্তন করবেন, সময় এসেছে। সেই সব নিয়ে অনেক কথা। সে গোস্বামী আর কেউ নন—রাজিন্দর গিরি গোসাঁই।

তারপর এই অভিনব গোবিন্দমূর্তি নিয়ে তিনি সাধনা শুরু করেছেন। প্রথমে প্রয়াগের কাছে ছিলেন কিছুদিন। সেখানেই জুটেছিল তাঁর ভক্ত শিষ্য দল। সেখান থেকে বাংলা দেশে ফিরেছেন। বাংলায় ফিরে কিছুদিন নৌকোয় নৌকোয়ই কাটিয়ে অনেক সন্ধান করে এই গড় জঙ্গলের সন্ধান পেয়ে, এই জঙ্গলের একাংশ বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে এসেছেন।

অর্থের অভাব ছিল না। তাঁর পিতা বোধ করি পুত্রের এই সন্ন্যাসপ্রীতির কারণ অনুমান করে মনে মনে লজ্জা বেদনা দুই-ই অনুভব করেছিলেন, তাই মৃত্যুকালে তাঁর বিশ্বস্ত নায়েবকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একটি পেটিকা; তাতে ছিল লক্ষাধিক টাকা মূল্যের কিছু হীরা-জহরত এবং একখানি পত্র। লিখেছিলেন, "এগুলি পিতৃপুরুষ আমাদের গৃহদেবতাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতারা তো ব্যবহার করেন না, দেবতাদের নামে চিহ্নিত হইয়া ঘরের সিন্দুকেই মজুত আছে। ছিল অবশ্য আরও অনেক। যুগলবিগ্রহের গোবিন্দের বুকে কৌস্তুভের মত ঝুলাইবার জন্য একখানা দুর্লভ হীরা ছিল; সেখানা চোরে চুরি করিয়াছে। দুই ছড়া পারস্য মুক্তার মালা ছিল; সে মালা দুই ছড়ার এক ছড়া আমাদের এক বিষয়ী পূর্বপুরুষ নাকি দিল্লীতে বাদশাহী দরবারে খেলাত দিয়েছিলেন, অন্য ছড়াটা—বংশের অপর একজন বেনামী পূর্বপুরুষ তাঁহার প্রণয়িনীকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এ সব অবশ্য কানা-ঘুষা কথা। আমাদের হিসাব-নিকাশের খাতায় কোন খরচ নাই, অথচ মজুতও নাই। কিছু জড়োয়া বংশের ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় নিখোঁজ হইয়াছে। ছোট তক্তির আকারের একখানি দুর্লভ পান্না-বসানো বাজুবন্ধ ছিল দেবী রাধারাণীর। সেখানি নিখোঁজ হয় আমার পিতা ও পিতৃব্যেরা যখন পৃথক হয় তখন। পান্নাখানি অবিকল তোমার বিমাতার সিঁথিতে যে পান্নাখানি আছে তাহারই অনুরূপ। অনেকে সন্দেহ করে এখানি সেখানিই। আমি এখানি আমার ছোট খুড়ার সংকটের সময় কিনিয়াছিলাম। তোমার মা লন নাই, বিমাতা লইয়াছেন। বর্তমানে আমাদের দেবত্রের সকল শরিকের অংশ কিনিয়া দেবত্রের ষোল আনার মালিক হওয়া সূত্রে এই অবশিষ্ট দেবনামাঙ্কিত জহরতগুলির ষোল আনার মালিক হিসাবেই তোমার কাছে পাঠাইতেছি। পিতৃত্বের দাবিতে অনুরোধ করিতেছি যে, আমাদের বংশের যে সাধনার দেবতা হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সাক্ষাৎকার ও অনুভব হইত, যে সাধনা কয়েক পুরুষ ধরিয়া আমরা ভূসম্পত্তি ও স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের তলায় চাপা দিয়াছি, তুমিই যখন সেই সাধনা উদ্ধারে কৃতসংকল্প এবং খানিকটা উদ্ধারও করিয়াছ, তখন তুমি এইগুলি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই গ্রহণ করিবে। আর পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ হিসাবে আমাদের পূর্বপুরুষের অর্জন করা কয়েক শত বিঘা ব্রহ্মত্র জমি যাহা আমার ভাগে পড়িয়াছে আমার অন্তিমকালে তোমাকেই একমাত্র ন্যায্য উত্তরাধিকারী জানিয়া তোমাকেই একক দিয়া গেলাম। অন্যান্য জমিদারী সম্পত্তি তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য হিসাবে পাইবেন। এই ব্রহ্মত্রের সহিত কোন

প্রকার বৈষয়িক চাতুরীর সংস্পর্শ নাই ; সুতরাং ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবে না। করিলে প্রকারান্তরে আমাকেও তোমার অস্বীকার করা হইবে জানিবে। ইতি।"

হীরা-জহরত এবং সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেছেন এই কর্মের জন্যই। তাঁর পিতার মৃত্যু হয় গোকুল-বৃন্দাবন থেকে ফেরার অব্যবহতি পরেই। প্রয়াগে এসে সংবাদের সঙ্গেই দানগুলিও পান। হীরা-জহরতের অধিকাংশগুলি বিক্রয় করে প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁর মায়ের দেওয়া অলঙ্কারের দরুন কিছু টাকা আগে থেকেই তাঁর হাতে ছিল। সেই অর্থ সম্বল করে কয়েকখানি নৌকো নিয়ে তিনি বাংলাদেশে এসে সর্বাগ্রে দেখা করলেন ভাইয়ের সঙ্গে। ভাইকে বললেন, ব্রহ্মত্র জমি থেকে নিত্য দু মণ চালের ব্যবস্থা কি সম্ভব ? কৃষকের ন্যায্য অংশ দিয়ে তা কি পাওয়া যেতে পারে ?

ভাই বললেন, বৎসরে পাঁচ শো মণ চালেরই বন্দোবস্ত আছে। নূতন বন্দোবস্ত করলে হয়তো ওটা ছ শো মণে অনায়াসে দাঁড়াতে পারবে। ওর সঙ্গে আমিও কিছু যোগ করে দিতে চাই।

মাধবানন্দ বললেন, না। প্রয়োজন হলে হাত পাতব। তখন দিও। এখন আর একটি কাজ করে দাও। একটি নিভৃত নিরাপদ স্থান। যেখানে মঠ করে নিরুপদ্রবে থাকতে পারি —রাজকুল, ভক্ত, উভয় কুল থেকে।

ভাই অনেক খুঁজে বিবেচনা করে শ্যামরূপার গড় ইছাই ঘোষের দেউল এবং তৎসংলগ্ন স্থানগুলির স্বামিত্ব আয়ত্ত করে দলিল হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও।

মাধবানন্দ এর পরই পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে—সঙ্গে দিলেন বাপের আমলের ইমারত তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে। বললেন, সামান্য ভাবে আশ্রমের মত করে পত্তন করে দিন। সেখানে বসে ধীরে ধীরে মঠ তৈরি করে নেব আমি। আর নৌকোর উপর থাকতে পারছি না। ভূমির উপর আসন করবার জন্য অন্তরাত্মা উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

এই আশ্রম তাঁর সেই বহু আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়। এখানেই আসন করে বসে তিনি চৈতন্যময় পুরুষকে আহ্বান করবেন। ওপারে জয়দেব গোস্বামীর বৃন্দাবনলীলার নায়ক রাধাবিনোদকে বলবেন—বাঁশী ছেড়ে অসি ধর। কংসারিরূপে জাগ্রত হও।

* * *

আজ মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী।

মাধবানন্দ ভোরবেলায় অজয়ের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ওপারে কেন্দুলীর ঘাটে জনতার সমাবেশ দেখে বিস্মিত হলেন। এত লোক!

জনতা তিনি অনেক দেখেছেন। কৌতূহল তাঁর নেই। সামান্য উপলক্ষ্য পেলেই মানুষ যে কেন এমন করে ছুটে আসে তিনি জানেন।

খুঁজতে আসে। জীবনে যা চায় তাই খুঁজতে আসে।

স্নান সেরে উঠে আবার একবার ঘুরে দাঁড়ালেন।

ওটা ? ও কার ধ্বজা উড়ছে ?

একটা গাছের উপর একটা লাল রঙের ধ্বজা উড়ছে। নদীর ধারে একটা হাতী। কয়েকটা ঘোড়া। ধ্বজার প্রতীক-চিহ্ন কার?

গোস্বামী-সম্প্রদায়ের প্রতীক বলেই তো মনে হচ্ছে! সম্ভবত পুরীধামে দোলযাত্রার পর গোস্বামীদের কোন দল উত্তর-ভারতে ফিরছেন। দ্রুতপদে আশ্রমে ফিরে তিনি ডাকলেন, শ্যামানন্দ!

—গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দেরই সমবয়সী সবল ব্যায়ামপুষ্টদেহ একজন শিষ্য এসে দাঁড়াল।

মাধবানন্দ বললেন, আমি একবার ওপারে যাচ্ছি; কেন্দুলীতে রাধাবিনোদকে প্রণাম করে আসি। প্রভুর মঙ্গলারতি হয়ে গেছে, তুমি বাল্যভোগের ব্যবস্থা কর। একটু চুপ করে থেকে বললেন, মনে হচ্ছে ওপারে গোকুলের গোস্বামীদের একটি দল এসেছে, দেখে আসি।

গৈরিক উত্তরীয়খানি টেনে নিয়ে কাঁধে ফেললেন। গৈরিক নামাবলীর মস্তকাবরণটি মাথায় জড়িয়ে নিয়ে দণ্ড হাতে বেরিয়ে পড়লেন।

গোপালানন্দ বিরাটদেহ সন্ন্যাসী; আশ্রমের দাওয়ায় অষ্টপ্রহরই বসে আছে তার লৌহ-দণ্ড হাতে নিয়ে—সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

মাধবানন্দ বললেন, না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশ্রম থেকে বের হয়ে তিনি বনের পথ ধরলেন। বনে বনে শ্যামরূপার গড় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে রক্তনালার মাঠ পার হয়ে কেন্দুলীর সামনা-সামনি অজয়ের ঘাটে গিয়ে উঠবেন। সেখান থেকে নৌকো নিয়ে ওপারে যাবেন। দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম করতেই যেখানে বেরিয়েছেন, সেখানে শ্যামরূপাকে প্রণাম না করে যাবেন—সে কি হয়? আদ্যাশক্তি, যোগমায়া চৈতন্যময় সত্তার আধারস্বরূপিণী; ফুলের যেমন বৃন্ত, চৈতন্যময় সত্তার তেমনি আদ্যা-শক্তি পরমাপ্রকৃতি; আধারের মত, বৃন্তের মত ধারিণী। নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদাগর্ভ-সম্ভূতা। ইনি সেদিন আবির্ভূত হয়ে কংসাসুরের হিংসানলে নিজেকে আহুতি না দিলে পৃথিবী দেবকীনন্দনকে পেত না। ভাগবতে সেই হিসাবে আদ্যাশক্তি পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষোত্তমের ভগিনী! মাধবানন্দের নিজের সাধনায় এই শক্তিসত্তাকে বাদ দিয়া চৈতন্যসত্তার উপাসনায় সিদ্ধি নেই। সৎ শুদ্ধ সংযত শক্তির লালনেই চৈতন্যসত্তার জ্যোতির্ময় অমৃতময় প্রকাশ। আপন ভাবনাতেই মগ্ন হয়ে পথ চলছিলেন মাধবানন্দ। কিন্তু এ পথেও আজ লোকের ভিড়। ওপার থেকে এপারে এসে শ্যামরূপাকে প্রণাম করে মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশীর স্নানপুণ্যকে বাড়িয়ে ষোল আনাকে আঠারো আনা করে তবে ফিরবে। তিনি এ পথ ছেড়েও গভীর বনের পথ ধরলেন। নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে কাঠুরিয়াদের, ঔষধ-সংগ্রহকারীদের, শিকারীদের পায়ে-চলা পথ। চারিপাশে প্রাচীনকালের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। মজে-আসা পরিখা, সুদৃঢ় সুউচ্চ মাটির প্রাকার, ভাঙা পাঁচিল, খিলানের পর খিলান, ভাঙা মন্দির, নিবিড় অরণ্যের মধ্যে

বিশাল এক বটের ছায়ায় নবতিপর জীর্ণ অসাড়দেহ পঙ্গু এক প্রাচীনের মত নিস্তরঙ্গ স্বপ্নহীন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যেন পড়ে আছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে শালগাছ জন্মেছে। তার উপর অজস্র লতাজাল। নীচে অজস্র গুল্ম। অনন্তমূল-শতমূখী কচু আলকুশী।

বনের এই মর্মস্থলে ঢুকেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অপরূপ শব্দঝঙ্কারে বনস্থলী ভরে গেছে। যেন একটা বিরাট সেতার বাজছে দ্রুনের গতিতে—জোয়ারীর তারগুলি ঝঙ্কার তুলছে। তার সঙ্গে গন্ধ। নিশ্বাস ভরে গেছে তাঁর। চোখ জুড়িয়ে গেছে। কচি সবুজের ঢেউ বইছে অরণ্যে, তার মধ্যে নানা বর্ণচ্ছটা। অরণ্যভূমিতে বসন্ত যেন পরিপূর্ণ প্রকাশে প্রকাশিত। বসন্তেরও আদি মধ্য অন্ত আছে—শৈশব যৌবন বার্ধক্য আছে। অরণ্যের তৃণাঙ্কুর থেকে শালশীর্ষের রক্তাভ কিশলয়-বৃন্তে, নবোদ্গত মঞ্জরীর মধ্যে বসন্ত যেন নবকিশোরের মূর্তি ধরে আসন পেতেছে। পাতায় পাতায়, ফুলে ফলে রূপ রস গন্ধের শব্দের সে যেন মহোৎসব। শব্দ সঙ্গীত হয়ে উঠেছে, কত পাখির কত গানে সে এক সঙ্গীতের ঐকতান ঝঙ্কৃত হচ্ছে; তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এবং ভ্রমরের অশান্ত গুঞ্জন। সেতারের জোয়ারীর তারগুলির ঝঙ্কারের মত। দুটো ভ্রমর তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটানা ভোঁ—ওঁ শব্দ করে পরস্পরকে তাড়া করে উড়ে চলে গেল। ঠিক কানের পাশটিতে শব্দ অকস্মাৎ উচ্চ হয়ে উঠে তাঁকে ঈষৎ চকিত করে তীরের মত সামনের দিকে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। মাথার উপর বিরাট মৌমাছির ঝাঁক। এখানে অজয়-তীরের মাটির রঙ গৈরিক, গৈরিক বনতলের উপর টপ-টপ করে মধু ঝরে পড়ছে; ঝরা পাতাগুলি আঠালো হয়ে উঠেছে, পায়ে আটকাচ্ছে। স্থানটায় অনেকগুলি বহড়ার গাছ। বহড়ার মঞ্জরী থেকে মধু ঝরছে। উগ্র মধুর গন্ধের মধ্যে মাদকতার আভাস। ঝরা পাতার উপর অসংখ্য মৃত পতঙ্গ; কয়েকটা ভ্রমরও পড়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে গলগলে ফুলে পত্রহীন গাছগুলি ফুলে ভরে গিয়েছে; জবা ফুলের মত আকার, গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ রঙ, বনের শ্যাম-অঙ্গে স্বর্ণ-ভূষণের মত। ফুলগুলিকে ঘিরে এখানে মৌচুটকি পাখিরা নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় পত্রপল্লবের অন্তরালে কোকিল ডাকছে; মধ্যে মধ্যে কোথায় কোন্ গুল্মের অন্তরালে তিত্তির ডেকে উঠছে। ক্রমোচ্চ স্বরগ্রামে একটানা ডেকে চলেছে—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল। এবার আসছে শালফুলের গন্ধ। শালবন শুরু হল। সরল দীর্ঘতনু শিশু বনস্পতির দল, তলায় অজস্র অসংখ্য চারা, তারই মধ্য থেকে উঠেছে কত লতা—গুঞ্জলতা, শতমূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, আরও কত লতা। যে বনস্পতিকে ধরেছে তাকে পাকে পাকে পিষে ধরেছে, কাণ্ডের গায়ে সর্পিল বেষ্টনের চিহ্ন এঁকে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—সহস্র বিস্তারের জাল রচনা করে তাকে আচ্ছন্ন করে তার আলোকপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। নারী। লতারাই এখানে নারী।

সামনেই একটা পথ। বনটার ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে অজয়ের ঘাটে। লোক চলেছে। দল বেঁধে চলেছে। এক এক দলে পাঁচজন সাতজন। চলেছে ওপারে কেন্দুবিল্বে, অধিকাংশই তিলক-ফোঁটা-কাটা বৈষ্ণব, কিন্তু গৃহস্থ এরা। মধ্যে মধ্যে দুজন, তিনজন বা চারজনের দলে বাউল বৈরাগী আর বৈষ্ণবী। মন বিমুখ হয়ে ওঠে মাধবানন্দের। অন্ধকূপের পঙ্কস্তরে পড়ে

মানুষ যখন নেশার ঘোরে বা মস্তিষ্কের বিকৃতিতে পুষ্পশয্যার আনন্দ অনুভব করে, এবং ওই গাঢ় অন্ধকারকে জ্যোতির ভাস্বরতায় দৃষ্টি অবরুদ্ধ হল মনে করে পুলকিত হয় তখন চৈতন্যময় পুরুষেরও চেতনা বিলুপ্ত হয়—অন্ধ তামসী আদিম উল্লাসে অট্টহাস্য করে। এদের কেন্দ্র করে সেই তামসী জাগছে। একটা গাছের ছায়ায় বসে একটি এমনি দল গঞ্জিকা সেবনের আয়োজন করছে। মাধবানন্দ দিকটা পাশে ফেলে মোড় ঘুরলেন। তিমিরান্ধ অসহায় হতভাগ্যের দল। কৃমিকীট পঙ্কপল্বলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় আর আকণ্ঠ পঙ্ক পান করে অমৃতাস্বাদনের তৃপ্তি অনুভব করে; এরা তাই। মধ্যে মধ্যে মাধবানন্দের মনে করুণা জেগে উঠতে চায়, কিন্তু করুণা করতে পারেন না তিনি। করতে গেলেই তাঁর মায়ের কঠোর শীতলদৃষ্টি চোখ দুটি তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জেগে ওঠে। মনে হয় পরপার থেকে মা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন —এই ভঙ্গিতেই তিনি তাঁকে তাঁর অবাঞ্ছিত কর্ম থেকে নিরস্ত করতেন। না, করুণা করতে পারেন না তিনি। তবে, ঘৃণা! না, ঘৃণাও তিনি করেন না।

হঠাৎ এসে পড়লেন এক টুকরো খোলা জায়গায়। চারিপাশে ঘন বন-বেষ্টনীর মধ্যে ঘন সবুজ ঘাস কোমল লাবণ্যে ঝলমল করছে। যেন একটি শ্বেতচন্দনের তিলকবিন্দুর মত প্রসন্ন। তারই পাশে পাশাপাশি কটি লাল কাঞ্চনের গাছ; অষ্টাবক্রের মত আঁকাবাঁকা-ডাল খর্বাকৃতি গাছগুলি একেবারে পত্ররিক্ত; শুধু একেবারে মাথায় দুটি ডালে রক্তাভ কাঞ্চনবর্ণ দু-চারটি করে ফুল ফুটে আছে; যেন কোন শবরী ফুলের অর্ঘ্য মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু ফুল পেড়ে নিলেন মাধবানন্দ। মা শ্যামরূপাকে কয়েকটি, রাধাবিনোদকে কয়েকটি ভেট দিয়ে আসবেন।

* * *

মন্দিরে আজ অনেক যাত্রীর সমাগম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং এক শ্রেণীর বিলাসী গৃহস্থ বৈষ্ণবের ভিড় বেশী। তাদের ভিড়ের আর অন্ত নাই। সঙ্গে আশ্রিতা সেবাদাসী। কারও একটি, কারও দুটি, কারও কয়েকটি। এমন আখড়াধারী বৈষ্ণব মহান্ত আছে যাদের কয়েক গণ্ডা। তাদের আখড়ায় লীলা চলে। দোলযাত্রায় দোললীলা, ঝুলনে ঝুলনলীলা, রাসে রাসলীলা, এমন কি বিশেষ গোপনতার মধ্যে বস্ত্রহরণলীলাও নাকি হয়ে থাকে। একটা কথা আছে, দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী কথাটা অস্বীকারের উপায় নাই; কিন্তু ধন-সম্পদ যেখানে, সেখানে বিকৃতি একবার শুরু হলে আর রক্ষা নাই। মাধবানন্দের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, দেখ বাবা, এই কুচো মাছ পচলে পলাণ্ডু রশুন লঙ্কার বাটনা বেশী পরিমাণে দিলে খাওয়া যায়; আমি অবশ্য মাছ খাই নে, তবে গন্ধে রসনা সরস হয়ে ওঠে এ সত্য অস্বীকার করব না এবং পরিতোষ সহকারে অনেককেই খেতে দেখেছি। কিন্তু বাবা, বড় রোহিত মৎস্য যখন পচে তখন পৃথিবীর কোন উপাদান-সংযোগেই তাকে আর খাদ্যে পরিণত করতে পারা যায় না। তখন ওকে লেবুগাছের তলায় চাপা দিতে হয়। রস যে রস, তাও অম্লরসেই ওর পরিণতি হয়। তবে হজমী যদি বল তো বলতে পার। সাধারণ দরিদ্র ভিক্ষুক বৈষ্ণবদের বিকৃতি সমাজকে তত বিকৃত পঙ্গু করে নি, যত করেছে এই সম্পন্ন অবস্থার বৈষ্ণব গৃহস্থেরা—বৈষ্ণব মহান্তেরা। দরিদ্রদের তবু একটা বিশ্বাস কোথাও-না-কোথাও আছে, সম্পন্নদের

কোন বিশ্বাসই নেই। তারা শুধু বিলাসী, শুধু ব্যভিচারী। হায়, বৈষ্ণব ধর্মের পরিণতি! মহাধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম! তার আদি কবি তুমি কবিরাজ গোস্বামী!

কবিরাজ গোস্বামী পদ্মাবতীরমণ জয়দেব সরস্বতী, তুমি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলে তোমার সখী-সচিব-পত্নী পদ্মাবতীর রূপসাগরে, যৌবন-জলধিতে; তোমার কবিচিত্ত বিলাস-কলাকুতূহলে এমনি মগ্ন হয়ে গেল যে, চৈতন্যময় পুরুষোত্তমের আর কোন মহিমা দেখতে পেলে না। প্রভাসে সমুদ্রের কূলে নিমগাছের ছায়ার তলায় দ্বাপরের জীবচিত্ত-তিমির-হরণ জ্যোতির্ময় পুরুষটি যাদবহীন নির্বংশ দ্বারকাপুরীর দিকে তাকিয়ে যে নিরাসক্ত প্রসন্ন মুখে বসেছিলেন সে মুখশ্রীর মহিমাও কি তোমাকে মুগ্ধ করে নাই? হায় কবি হায়! শুধু তুমিই বা কেন? মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পর তোমরা কবিরা সেদিন থেকে তপোবনের তপস্যাকে বহুমহিষীপরিবৃত রাজাদের রাজসভাশ্রিত করিয়েছ সেদিন থেকেই তোমরা কবিচিত্তকে বিলাস-কলাতরঙ্গমুখর আদিরসের ঘাটে ডুব দিইয়ে গলিয়ে দিয়েছ। সমুদ্রতটের ঘাটে বসেই তরঙ্গ-স্নানের সঙ্গে বালি মেখে উল্লসিত হলে। জীবনে সমুদ্রের মহাগভীরে অনন্তের ধ্যান-মহিমার সন্ধান হারালে।

কেন্দুলীর মন্দিরে রাধাবিনোদজীকে দর্শন করে ফিরছিলেন মাধবানন্দ। ওই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে ফিরছিল। গলায় রাধাবিনোদজীর প্রসাদী মালা, সাদা টগরফুলের মালাগাছির মধ্যে মধ্যে ওই কাঞ্চনফুলের পরন; যেন শিলাফলকে সাদা রঙে লেখা ললিত-কাব্যের একটি শ্লোকের এক-একটি চরণের শেষে আলতার লাল কলিতে টানা এক-একটি পদচিহ্ন। চমৎকার নিপুণ হাতের রচনা মালাগাছ; একেবারে মধ্যস্থলে কয়েকটি কাঞ্চনের একটি স্তবক।

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তিনি তাকিয়ে দেখলেন চারিদিক। কোথায় সেই ধ্বজা, যে ধ্বজা তিনি ওপার থেকে লক্ষ্য করেছেন? সামনে অজয়ের ঘাট পর্যন্ত এক পোয়া পরিমাণ প্রশস্ত চরভূমি ও বালুচর। এপারের মন্দির থেকে ওপারে শ্যামরূপার সামনের বাঁধ পর্যন্ত ভূমি প্রায় দেড়-ক্রোশব্যাপী। এই দেড় ক্রোশ স্থানের মধ্যে দুর্দান্ত অজয় পার্শ্বপরিবর্তন করে। যেকালে শ্যামরূপার বাঁধ তৈরি হয়েছিল সেকালে ওরই কোণ ঘেঁষে অজয় বোধ হয় প্রবাহিত হত। প্রবাদে রয়েছে, কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মহাসমস্যার পদ স্মর-গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং অসমাপ্ত রেখে চিন্তিত মনে কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নানে বেরিয়ে পথ থেকে ফিরে গিয়ে দেখেছিলেন বিগ্রহের সেবাভোগ হয়ে গেছে, তাঁর ছদ্মবেশধারী পরমপুরুষের আহার হয়ে গেছে, তিনি শুয়েছেন এবং পদ্মাবতী প্রসাদ ভক্ষণ করছেন। সুতরাং এই সময়ে যে পথটা অতিক্রম করা যায় সেটা কম পথ নয়। এখন হয়তো ততটা নেই, অজয় সরে এসে খেয়ে নিয়েছে, কিন্তু যেটা আছে সেটাও কম নয়। ওদিকে শ্মশান ও বাউল-সমাবেশের বটতলা। এদিকের অংশটা শুধুই বালুচর। এই চরেই বসেছে মেলা। পথে বসে গিয়েছে সারি দিয়ে ভিক্ষুকের দল।

ওই—ওই তো দেখা যাচ্ছে! একটা তরুণ অশ্বত্থগাছের মাথায় ধ্বজাটা উড়ছে। ওই যে কয়েকটা হাতী চলেছে অজয়ের ধারার দিকে! পিছনে চলেছে ছেলের দল!

অগ্রসর হলেন তিনি। দুদিকেই ভিক্ষুকের সারি।

ভিক্ষুকের সারির মধ্যে বসে রয়েছে 'কয়ো'; ইলামবাজারের কয়ো। কয়োকে তিনি চেনেন। কয়ো নিজেই চিনিয়েছে। ভিক্ষুকের সারির মধ্যে বসে সামনে একখানি গামছা পেতে মুড়ি চিবোচ্ছে এবং মুড়ি মুখেই যাত্রীদের উদ্দেশ করে তার নিজস্ব ভিক্ষার বুলিটি উচ্চারণ করে চলেছে—কয়ো, আমি কয়ো বোরেগী মা সকল—বাবা সকল—গোবিন্দের এঁটোকাঁটা ছিটিয়ে দিয়ে যাও। কয়ো এঁটোর ভিখেরী মা।

অর্থাৎ প্রসাদ। চালের মুষ্টিভিক্ষা, দুটো চারটে কড়ি, কখনও বা একটি আধটা কপর্দক আপনিই পড়ছে। কিন্তু তাতে কয়োর বিশেষ আনন্দ নাই। কয়েকখানা বাতাসা বা আধখানা মণ্ডা বা একটা কলা পড়লে মুখ তার খুশিতে ভরে উঠছে। তেলেভাজা পড়লে আরও খুশী। মুড়ি চিবানো বন্ধ করে আগে সেইগুলি মুখে পুরে অভ্যাসমত চোখ বন্ধ করে উপভোগ করে চর্বণ করে।

মাধবানন্দ হাসলেন কয়োকে দেখে। এর মধ্যে কয়েকদিনই সে তাঁর আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে আসছে। প্রথম দিনই যে কথাটি কয়ো বলেছিল, সে কথাটি তাঁর ভারি ভাল লেগেছিল, কৌতুকরসের সঞ্চার করেছিল—তিনি হেসে ফেলেছিলেন। কয়ো গিয়ে হেঁকে বলেছিল—জয় গৌর নিতাই হে! শোনলাম বনের মাঝে প্রভুর পেসাদের পাতা পড়ছে। আমি বাবা কয়ো, কয়ো বোরেগী। দু-মুঠো এঁটোকাঁটা ছড়িয়ে দিতে মন হোক গোসাঁইয়ের।

ওই 'মন হোক' কথাটা এবং 'কয়ো' নাম তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। লোকটি বিয়ে করে নি শুনে খুশী হয়েছিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে ওকে খাইয়েছিলেন। কিন্তু কয়ো তাঁর ওখানকার প্রসাদে সন্তুষ্ট হয় নি। কারণ তাঁর ওখানকার আশ্রমের ভোগ-রাগে বিলাসিতা নেই; দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করার পঞ্চামৃতের মধ্যেই দেব-ভোজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট। তারপর সকল ভোগই ব্রহ্মচারী তপস্বীর উপযোগী উপকরণ ও পদ্ধতিতে প্রস্তুত। হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা। এ সবই মাধবানন্দের নিজের কল্পনা।

তিনি আশ্রম গড়ছেন, শুধু ধ্যানী তপস্বী দিয়ে নয়। কয়েকজন জ্ঞানী পণ্ডিত আছেন, কিন্তু সংখ্যায় বেশী কর্মীর দল। তার মধ্যেও কয়েকটি স্তর অবশ্যই আছে। কেউ কেউ করে আশ্রম পরিচালনা, কেউ দেখে আশ্রম গঠনের কাজ; কেউ করে আশপাশের গ্রামের লোকেদের সঙ্গে পরিচয় আলাপ; তারা ধ্যানী তপস্বী বা জ্ঞানী বলতে যা বোঝায়, তা না হলেও অশিক্ষিত নয়। বরং কর্মের সঙ্গে তাদের শিক্ষার কাজ আজও চলছে। একটা অধ্যয়নের সময় আছে, সে-সময় ওই জ্ঞানী গুণীদের কাছে তারা পাঠ গ্রহণ করে। এ ছাড়া আরও কিছু সেবক আছে—তারা অক্ষরপরিচয়হীন, কিন্তু বিচিত্র মানুষ। শিক্ষিত নয়, জ্ঞানী নয়, কিন্তু তারা শুদ্ধচিত্ত মানুষ। তারা আসন করে যৌগিক নিয়মে ধ্যান করে না, কিন্তু চোখ বুজলেই ইষ্টমূর্তিকে দেখতে পায়। তারা চিন্তা করে না, শুধু আদেশ পালন করে যায়। তারা কর্ম কখনও অসমাপ্ত রাখে না। কোন তত্ত্বকে তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না; কিন্তু অদ্ভুত জন্মগত প্রকৃতি বা শক্তি যে, তত্ত্ব শুনবামাত্র বিশ্বাস করে ধারণ করতে পারে। কাম

ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু দমনের জন্য এদের কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় না ; সে শক্তি যেন চরিত্র-গত ; এরা বাঁচার জন্য খায়, খাওয়ার জন্য বাঁচে না ; এরা রূপ চোখে পড়লে দেখে, কিন্তু রূপ দেখার জন্য চোখ চেয়ে বসে থাকে না ; রূপের পিছনে ছোটে না। এরা সব মোটা কাজ করে। গো-সেবার কাজ, কৃষিক্ষেত্রের কাজ এরাই করে। সবচেয়ে বড় কাজ এদের সেবা। আশ্রমবাসীদের অসুখের সময় সেই পরিচয় সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে ওঠে। এদের মাধবানন্দ নিজে মনে মনে প্রণাম করেন। কয়োকে দেখে, তার বিচিত্র কথা শুনে তিনি ভেবেছিলেন তাকে তাঁর আশ্রমে নিলে হয়। ধাতুটা মনে হয়েছিল খাঁটি। অনেক আবর্জনা মিশে আছে, কিন্তু তপস্যার হোমবহ্নি সংস্পর্শে এলেই আবর্জনা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। তাই তিনি বলেছিলেন—এই আশ্রমে তুমি থাক না। থাকবে ?

অভ্যাসমত কয়ো চোখ বন্ধ করেই খাচ্ছিল। মুখে তখন একমুখ ভাত আর কচুসিদ্ধ ; সে নীরবে ঘাড় নেড়ে দিয়েছিল—না।

—কেন ?

এবার ঘাড় নাড়ার সঙ্গে জিভ নাড়তে হয় না, এমন একটি উত্তর দিয়েছিল—উঁহু। উঁহু।

—কেন ?

কোঁত করে গ্রাসটার খানিকটা গিলে বলেছিল, রামঃ। তোমাদের এখানে ঠাকুরের চরণ আছে, বদন নাই। এখানে কে থাকবে ?

—তার মানে ?

—মানে—এটা গয়াক্ষেত্র, পিণ্ডির ব্যবস্থা। পিণ্ডি ঠাকুর পায়ে ছোঁয়, চটকায়, মুখে তোলে না, চটকানো পিণ্ডি প্রেতে খায়। এখানে কয়ো থাকতে পারবে না। কয়ো কয়ো বটে কিন্তু দাঁড়কয়ো নয় ; অর্থাৎ দাঁড়কাক।

কয়োর কথা শুনে তিনি রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারেন নি ; তার কারণ তার এই বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গি। তিনি হেসে ফেলেছিলেন। শুধু এইটুকুই নয়—খেয়েদেয়ে কয়ো তার গামছার খুঁট খুলে মটরদানার মত একটি পাথর তাঁর সামনে রেখে বলেছিল, দেখেন তো গোসাঁই, এটা কী ? জঙ্গলের মধ্যে পেয়েছি।

—জঙ্গলের মধ্যে ? পাথরটি হাতে তুলে নিয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন মাধবানন্দ। এ তো নীলা! বেশ মূল্যবান নীলা! অভিজাত বংশের সন্তান মাধবানন্দ অনেক জহরত দেখেছেন। আজও মায়ের ও বাপের দেওয়া কিছু মূল্যবান জহরত তাঁর আছে।

কয়ো বলেছিল, হ্যাঁ, জঙ্গলের মধ্যে এই তোমার আখড়ার কাছেই। রোদের ছটায় জল-জল করছিল। কুড়িয়ে নিলাম। তোমারই বটে কি না তা দেখ।

—না, আমার নয়।

—তা হলে ? তা হলে হয়তো সেই বিবির হবে।

—বিবির ? বিবি কে ?

—এই।—চোখ বুজে ভেবে নিয়ে কয়ো বলেছিল, চার-পাঁচ মাস হবে—এক শ্বাখ আর এক বিবি কোথা থেকে এসে এই তোমার দেউলের এইখানে এয়েছিল। শ্বাখের বয়েস এই

তোমার পারাই হবে আর বিবি মোহিনীর চেয়ে বেশী বড় নয়—তবে বড় বটে। আর মোহিনীর চেয়ে অ্যানেক সোন্দর। গোলাপফুলের মত রঙ।

—মোহিনী? কে মোহিনী?

—মোহিনী? ইলেমবাজারের আমাদের মাঝীর বিটী গো। ভারি ভাল মেয়ে। সেদিন তোমাকে দেখেছিল নদীর ঘাটে। তুমি দেখ নাই?

—না। কিন্তু এই বিবি আর শেখ যাদের কথা বলছ, তারা কোথায় গেল?

—তারা হ্যাতমপুর গিয়েছে। ওই যে নগরের রাজা নতুন গড় করেছে। বুড়ো হাতেম খাঁ তার ফৌজদার; তার কাছে গিয়ে নকুরি করছে। সেই বিবির কানে নাকে এমনি পাথর ছিল! তা তুমি পাথরটা রাখ। উ নিয়ে আমি কী করব? লোকে জানলে আমাকে মেরে কেড়ে লেবে। মাজী জানলে ভুলিয়ে লেবে। মহান্ত জানলে ধরে লিয়ে যাবে। রাধবিনোদকে দিলে বামুনরা বেচে খেয়ে দেবে। আর মরলে সুপুরের গোসাঁইরা লেবে। তার চেয়ে তুমি রাখ। তুমি লোক ভাল গোসাঁই। তুমি অনেক নোককে অন্ন দাও।

মাধবানন্দ বলেছিলেন, তা তুমি একদিন হেতমপুর গিয়ে শেখের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করে এস না—এটা তাদের কি না?

—বাবা রে, ছ-সাত কোশ পথ। যেতে আসতে বার-চৌদ্দ কোশ। কয়োর পায়ে তা কিছুই লয়, কিন্তু হ্যাতমপুরে একঘরও হিন্দু নাই। "হেতমপুর হিঁদু নাস্তি মূলুকে অভিরামপুর—" সব মোগল সব মোগল। জল খাব কোথায়? তা ছাড়া হ্যাতমপুর আমি যাব না। যে প্যাঁজ গোস্তের খসবু ছুটিয়ে পাকায় ওরা, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমি খাই চাই-না-খাই, গেলে জাত-জ্ঞাতে আমাকে পতিত করবে।

—কিন্তু এ পাথর আমি নেব কেন? তুমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে ঘর-সংসার কর। পাথরটি তিনি নামিয়ে দিয়েছিলেন।

—উঁহু। ঘর-সংসার আমার হবে না গোসাঁই। আমি একেবারে আনাড়ী। তা—। তা তুমি যদি না লাও তবে যেখানে পেয়েছিলাম সেইখানে ফেলে দেব। সেই ভাল!

মাধবানন্দ বলেছিলেন, আচ্ছা রাখ, আমি একবার খোঁজ করব হেতমপুরে। নতুন বিদেশী শেখ চাকরি করছে। নাম জান?

—হাফেজ মিয়া গো। ওই যে হাতেম খাঁয়ের খুব পেয়ারের লোক হয়েছে, সেই গো।

লোকটিকে এই একটি ঘটনা থেকেই তিনি স্নেহ করেছেন অন্তরে অন্তরে। তাই কয়োকে দেখে সস্নেহ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আজও একটি কপর্দক তার গামছায় ফেলে দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ওই সন্ন্যাসীদের আড্ডার দিকে।

* * *

পতাকায় প্রতীক-চিহ্ন শৈব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের। কিন্তু শঙ্কর মঠের নয়। অশ্বত্থগাছটির তলায় সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল গেড়ে আসন পেতেছেন। গাছটির গোড়াতে হাতীর পিঠের হাওদার গদি পেতে তার উপর মৃগচর্ম বিছিয়ে বসে আছেন সম্প্রদায়ের প্রধান। পরনে মাত্র বহির্বাস,

ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন—মুখে দাড়িগোঁফ, মাথায় বড় বড় চুলগুলি সদ্য-স্নানের পর খোলা রয়েছে। সর্বাঙ্গে ভস্মমাখা শেষ করে সন্ন্যাসী ত্রিপুণ্ড্রক তিলক রচনা করছেন। গলায় ছোট-বড় রুদ্রাক্ষের কয়েকগাছা মালা; রুদ্রাক্ষের মধ্যে ছোট ছোট স্ফটিকগুলি ঝিকমিক করছে। বাহুতে রুদ্রাক্ষের তাগা। শরীরখানি সিংহের মত। প্রশস্ত পেশী, সবল বক্ষস্থল, ক্ষীণ কটি, আশ্চর্য সবল দুটি বাহু। ডান দিকের বুকের পাশে দীর্ঘ একটি ক্ষতচিহ্ন; ভস্মাচ্ছাদনেও তা ঢাকা পড়ে নি। তীক্ষ্ণদৃষ্টে দেখছিলেন মাধবানন্দ। যেন সন্ধান করছিলেন কিছুর। হঠাৎ সন্ন্যাসী মুখ তুললেন, চোখাচোখি হতেই মাধবানন্দ হাত তুলে অভিবাদন জানালেন, নমো নারায়ণায়!

সন্ন্যাসী হাত তুললেন না, শুধু মুখে বললেন, নমো নারায়ণায়! তারপর আবার ত্রিপুণ্ড্রক রচনায় মন দিলেন।

মাধবানন্দ বললেন, অনুমতি হলে বসব মহারাজ?

—বয়ঠিয়ে মহারাজ। সব ভুমি হ্যায় ভগবানকে। বয়ঠিয়ে।—বলেই ডেকে উঠলেন, শিব শম্ভো

মাধবানন্দ বললেন, মহারাজ আসছেন শ্রীক্ষেত্র থেকে? এ পথে? তাই প্রশ্ন করছি। পঞ্চকোটের পথ ছেড়ে এদিকে? কোন্ ক্ষেত্রমুখে চলেছেন?

সন্ন্যাসী বারেকের জন্য মুখ তুলে আবার মুখ নামিয়ে বললেন, বঙ্গদেশে নাকি অনেক শক্তিপীঠ আছে শুনেছি। মহাপীঠই পাঁচ-সাতটি। আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছি এই পীঠগুলি পরিভ্রমণ করবার জন্য। এখানে শুনেছি শ্যামরূপা দেবীর পীঠ ছিল একদা, এদিকে জয়দেব গোস্বামীর সাধনপীঠ, তাই এখানে—দুদিন থাকবার বাসনা।

মাধবানন্দ বললেন, বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি হলেন কালিকা। 'কালিকা বঙ্গদেশে।' কিন্তু শক্তি এখানে এখন নিজেই নিদ্রামগ্ন। এখানকার লোকে বলে—শ্যামা এখন শ্যাম হয়ে অসি ফেলে বাঁশী ধরেছেন। এতটা ঘুরলেন, শক্তির সাক্ষাৎ পেলেন কোথাও?

বলতে বলতেই তিনি চকিত হয়ে উঠলেন—সন্ন্যাসীর কয়েকজন অনুচর এসে দাঁড়াল। চমকে উঠলেন তাদের অভিবাদনের ভঙ্গি দেখে। ঠিক গুরু-শিষ্যের অভিবাদন নয়। এ যেন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি সৈনিকের অভিবাদন।

সন্ন্যাসী বললেন, তামাম হিন্দোস্তানেরই এই হাল। বঙ্গদেশের লোকেরা তার উপর ভীরু শান্তিবিলাসী। কিছু মনে করো না—এই জাতিটাই চরিত্রভ্রষ্ট জাতি। এরা নাচতে গান গাইতে জানে, তাও ধ্রুপদ ধামার নয়—খেমটা। হাসলেন সন্ন্যাসী।

মাধবানন্দ বললেন, বাঙালীর চরিত্রে অনেক ত্রুটি আছে। তার ধর্মে পর্যন্ত ব্যভিচার ঢুকেছে। কিন্তু এক এক সময় ভাবি, প্রকৃতির এ দুর্বলতা কোথায় নেই? এত বড় ছত্রপতি শিবাজী, ভবানীর বরপুত্র, এমন সাধনা এমন চরিত্র—তাঁর জীবন জীবনেই শেষ? তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র যুবরাজ শম্ভাজী—

শিবো শম্ভো শিব শম্ভো! বলে সন্ন্যাসী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে উঠলেন অকস্মাৎ।

মাধবানন্দ বললেন, সাক্ষাৎ শিবতুল্য রামদাস স্বামীর দেওয়া ভগোয়া জেন্দা নিশান; সেই

নিদান আজ—

—রহে দেহ মহারাজ। উ সব বাত থাক্‌। পরের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। তার পর হেসে বললেন, মহারাজের দেখি ধর্মচর্চা থেকে রাজনীতির চর্চাতেই আসক্তি বেশী।

—না না। হেসে মাধবানন্দ বললেন, আমি ভেবেছিলাম মহারাজের এ চর্চা ভাল লাগবে। আচ্ছা মহারাজ, আমি উঠলাম। যদি ওপারে শ্যামরূপার পীঠ দর্শনে যান তবে অবশ্যই আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে। ওপারে ওইখানেই আমার আশ্রম। নমো নারায়ণায়!

—নমো নারায়ণায়!

* * *

এরা সাধুর ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র সৈনিক। গুপ্তচর। মাধবানন্দের মনে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ওদিকে দিল্লীতে মুঘলশক্তি পতনোন্মুখ। সিংহাসন অধিকারের কলহে সব হারিয়ে বসে আছে। সুবায় সুবায় সুবাদারেরা, নবাব রাজারা প্রত্যেকেই স্বাধীন হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীরা এক বিরাট শক্তি। তারা অবশ্য সে শক্তি দিয়ে কোনদিন দেশ অধিকার করতে চেষ্টা করে নি, রক্ষা করতেও অগ্রসর হয় নি। তারা ধর্ম ও দেবস্থান এবং মহাভারতের অন্তররাজ্য নিয়েই বসে আছে। এবার তারাও চঞ্চল হয়েছে। গোকুলে মাধবানন্দ তার কিছু আভাস পেয়েছেন। এই প্রত্যাশাতেই তিনি শৈব সাধুর ঝাণ্ডা দেখে এসেছিলেন, যদি তেমন কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুর সাক্ষাৎ পান! কিন্তু সে দূরে থাক্‌, তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। এরা সন্ন্যাসীই নয়। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র গুপ্তচর। তিনি মহারাষ্ট্র ভ্রমণ করে এসেছেন। এরা বড় নিষ্ঠুর। ছত্রপতি শিবাজীর আদর্শ ভুলে গিয়ে লুণ্ঠনের নেশায় এরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—কৌটিল্যের নীতিকে অবলম্বন করবার সময়, শঠকে শাঠ্যের দ্বারা পরাভূত করবার কথাটাই মনে হয়েছিল, নিজেদের শঠে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তাদের ঘুণাক্ষরেও মনে জাগে নি। আশ্চর্য! সর্বত্রই সেই এক সত্য। জীবন—সেই অদৃশ্য অব্যক্ত প্রাণস্রোতে নিজেকে ব্যক্ত করে মানবজন্মে এসে নিজেকে প্রকাশ করছে, অহং বলে, প্রকৃতিধর্ম থেকে সে উপনীত হয়েছে চরিত্রধর্মে। ধর্মে কর্মে বাক্যে মর্মে সে ওই চরিত্রকেই প্রকাশ করে। অন্ধ প্রকৃতির যত আক্রোশ ওই চরিত্রের উপর। চরিত্রভ্রষ্ট করে প্রবৃত্তি-পল্বলে টেনে ফেলা তামসী প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর আনন্দ। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের মধ্যে সে তামসী অনুপ্রবেশ করেছে; রামদাস স্বামীর শিষ্য ভবানীর বর-পুত্র ছত্রপতির শক্তিধর্মের মধ্যেও তার অনুপ্রবেশ কেউ রোধ করতে পারে নি। একটি কেশ-প্রমাণ ছিদ্র পেলেই সে তার মধ্যে কালনাগিনীর মত প্রবেশ করে ফণা তুলে দাঁড়ায়।

উপায়?—জীবনের সকল দ্বারকে রুদ্ধ করে তপস্যা কর। সিদ্ধিলাভ করে সেই শক্তি নিয়ে তামসীর সঙ্গে যুদ্ধ কর। ভাবতে ভাবতেই তিনি পথ চলছিলেন—অকস্মাৎ তাঁর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল অদূরবর্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। একজন ঘোড়সওয়ার মহোল্লাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে চিৎকার করে সমবেত যাত্রীদের ভীত এবং সন্ত্রস্ত করে চলে আসছে!—হো—হট যাও! হট যাও! হা-রা-রা-রা!—তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অট্টহাসি হেসে উঠেছে

—হা-হা-হা-হা! হাসির কারণ, কোন ভয়ার্ত গ্রামবাসী সরে যেতে গিয়ে পড়ে গেছে। অথবা মেয়েদের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। লোকটা হাতের চাবুক নিয়ে শূন্যমার্গে ঘোরাচ্ছে।

লোকটার অদ্ভুত বর্বর চেহারা। বয়স অল্প, যৌবনমদমত্ত, বেশেবাসে উচ্ছৃঙ্খল ধনীপুত্র বলেই মনে হয়। ওঃ! রক্তাভ গোল চোখ, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, কালো রঙ, লোকটা যেন বর্বরতার প্রতিমূর্তি। পান চিবোচ্ছে। লোকটা ব্রতও করে নি, দেবদর্শন করতেও আসে নি; এসেছে মেলা দেখতে, সম্ভবত—নারী-সন্ধানে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একজন সন্ন্যাসী পড়ল সামনে। ওই আগন্তুক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একজন। বর্বর লোকটা চিৎকার করে উঠল। সন্ন্যাসীটি যেন ইচ্ছে করেই সামনে থেকে সরে গেল না। সওয়ারের আর ঘোড়াটাকে সামলাবার সাধ্য নেই। চাপা পড়ে মরবে। সেই কারণেই বর্বর সওয়ারটা এমন চিৎকার করে উঠেছে। মুখে মেরে ফেলবার ভয় দেখায় সংসারে নিরানব্বই জন, কিন্তু সত্যই মেরে ফেলা বা হত্যা করা এত সহজ নয়—সে হয়তো একজন পারে; সে একজন অন্তত এ লোকটা নয়। কিন্তু সন্ন্যাসীটি হয়তো সেই একজন। এ জনেরা শুধু মারতেই পারে না, মরতেও পারে এবং এদের মারতে এলেও এরা মরে না, আত্মরক্ষা করতে পারে। তাই বটে, আশ্চর্য শক্তি এবং কৌশলের সঙ্গে সন্ন্যাসী ঘোড়াটার লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে এমন ভাবে ঘুরিয়েছে যে নিজের গতিবেগের সঙ্গে এই বিপরীতমুখী প্রচণ্ড টানের সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে পিছনের পা হড়কে ঘোড়াটা গেল পড়ে এবং বর্বর অশ্বারোহীটাও সশব্দে তার সঙ্গে পড়ে গেল—ঘোড়ার তলায় একটা পা পড়ল চাপা।

প্রথমে উঠল একটা হাসি—হো-হো-হো! দৃশ্যটা সত্যই উপভোগ্য রকমের হাস্যকর। তারপরই কোলাহল উঠল চারিদিকে। চারিদিকে ভিড় জমে গেল। রব উঠল—ছোট সরকার। ছোট সরকার! ইলেমবাজারের ছোট সরকার!

পর-মুহূর্তেই ভিড়টা ফাঁক হয়ে গেল। আরোহীবিহীন ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

মাধবানন্দ সেই পথে ভিতরে ঢুকে গেলেন। লোকটা পড়ে পড়েই চিৎকার করছে! যে সন্ন্যাসী তার এ দুর্দশা করেছে সে কিন্তু নেই, কাজ সেরে চলে গেছে। কাতর চিৎকার, না ক্রুদ্ধ চিৎকার ঠিক বোঝা যায় না—হয়তো দুইই। মাধবানন্দ গিয়ে তার হাত ধরে বললেন, আগে ওঠ, আগে ওঠ। পরে গালাগাল করবে। কোথায় লেগেছে দেখি।

উত্তরে কুৎসিত গালিগালাজ দিয়ে উঠল লোকটা। পর-মুহূর্তেই থু-থু করে থুতু ছিটোতে আরম্ভ করল। মাধবানন্দের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে গেল। ইচ্ছা হল—। কিন্তু সে ইচ্ছাকে দমন করে তিনি বাইরে এলেন। মনে পড়ে গেল মহাভারতে বর্ণিত মহারাজ নলের কথা। বনবাসী মহারাজ নল একদিন দেখলেন, চারিদিকে বনের আগুনের মধ্যে এক নাগ মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে। নাগের দৃষ্টি দেখে মনে হল, সে তাঁর কাছে যেন করুণা ভিক্ষা করছে। নল করুণাপরবশ হয়েই একটা বৃক্ষশাখার সাহায্যে তাকে তুলে আগুনের গণ্ডীর বাইরে নিরাপদ স্থানে রেখে দিয়ে বললেন, যা, চলে যা। নাগ চলে গেল না। সে মুহূর্তে মহারাজ নলকেই আক্রমণ করলে। যার যা স্বভাব। এরাই সমাজের বিকৃতির

কুৎসিততম প্রকাশ ; কটুতম বিষফল। সমাজের পচ-ধরা জীবনের কৃমিকীট।

ক্রোধ দমন করেই ঘাটে এসে তিনি নৌকোয় চড়লেন। মাঝি লখাই ডোম লগি ঠেলে নৌকোটা স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বললে, ছোট সরকার ঘোড়াচাপা পড়ে মরেছে গোসাঁইবাবা ?

—না, মরে নি। কিন্তু ছোট সরকার লোকটা কে ?

—বাপ রে, অক্রুর দাস-সরকার। ইলেমবাজারের বড় গদির মালিকের বেটা।

—হুঁ।

—একটা গোটা পাঁঠা সরকারের নস্যি। তিন-চার বোতল মদ খেয়ে একটুকুন টলে না। তারি ঘোঁড়সাঁ'র (ঘোড়সওয়ার)। গায়ে ক্ষ্যামতাও খুব। এখানকার যত লেঠেল দাঙ্গাবাজ —সব বড় সরকারের তনখা খায়। ক'জনার সঙ্গে ছোট সরকারের খুব ভাব, যত খারাপ কাজের চেলা। নাগা সন্ন্যাসীটা ভাল কাজ করে নাই গোসাঁইবাবা। অক্রুর সরকার সহজে ছাড়বে না। হাঙ্গামা একটা লাগাবেই। ওই—ওই বুঝি লাগল—

পিছনে কেন্দুলীর চরে মেলার মধ্যে কোলাহল সত্যই প্রবল হয়ে উঠেছে। ঘুরে মুখ ফিরিয়ে বসলেন মাধবানন্দ। দেখলেন, ভিড় সরে গেছে এক পাশে; বর্বরদর্শন ওই অক্রুর সরকার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, কোন্ হ্যায় রে হামীরা—কোন্ হ্যায় ?

কয়েকজন শক্ত-সমর্থ জোয়ানও এসে জমেছে তার পাশে। অন্যদিকে সমবেত জনতার মধ্যে রোল উঠেছে, পালা—পালা—পালা !

লখাই বললে, হল। নাগা সন্ন্যাসীদের হল।

লখাই ওই সন্ন্যাসীদের নাগা সন্ন্যাসী বলে মনে করেছে।

লখাই তখনও বলছিল, সরকারের ভয়-ডর নাই। আজলগরের (রাজনগরের) ফৌজদার সাহেব হাতেমগড়ের হাতে খাঁয়ের সজেও খুব দহরম মহরম। আঘরপুরের (রাঘবপুরের) আঘব-ঠাকুরের সাঁতে হাঙ্গামার সময় অ্যানেক সাহায্য করেছিল দাস-সরকারেরা। একটা ছুটো ক্যানে, সাতখুন মাপ ওদের। সন্ন্যাসীদের আজ হল।

মাধবানন্দের কপালে সারি সারি চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। হাঙ্গামা বাধলে— ! লখাই জানে না, ওই ছোট সরকারও জানে না, ওই সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকে নিপুণ যোদ্ধা। শুধু তাই নয়, মহারাষ্ট্র ভ্রমণের সময় আরও অনেক জায়গা তিনি ঘুরেছেন; গোয়াতে গিয়েছিলেন বর্গীদের লুণ্ঠন-অভিযানের কিছুদিন পরেই। সেখানে যা শুনে এসেছেন—। শুনে নয়, দেখেও এসেছেন। এক হতভাগিনীকে দেখে এসেছিলেন। তার বুকের সুধাভাণ্ড দুটির চিহ্নমাত্র নাই; সে নগ্ন বক্ষেই পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। শুনেছিলেন বর্গীরা তাকে শাস্তি দিয়ে গেছে, স্তন দুটি কেটে দিয়েছে! ওরা যদি—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, চল, তুমি তাড়াতাড়ি চল।

বেলা বেড়েছে। সূর্যের আলোতে উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। স্রোত পার হয়ে অজয়ের বালি অতিক্রম করে বনভূমে এসে ঢুকলেন। মঞ্জরী-জাতীয় ফুলে মধু বেশী এবং গুণে ও গন্ধে অপেক্ষাকৃত উগ্র। রৌদ্রোত্তাপে এরই মধ্যে মাধবীগন্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভ্রমরগুলি

মাতাল হয়েছে; পরস্পরকে তাড়া দিয়ে তাদের ছুটাছুটির আর অন্ত নাই। বনতল আলোছায়ার টুকরো টুকরো ছাপে ছাপে বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। গাছে চড়ে সাঁওতাল-ছেলেমেয়েরা মহুয়া সংগ্রহ করছে। কেউ কেউ কাঠ ভাঙছে। ছোট কয়েকটা ছেলে তিতির-খরগোশের সন্ধানে তীরধনুক হাতে পা টিপে টিপে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বনে কোথায় কে গাছ কাটিছে। কুড়ুলের শব্দ বিচিত্র গতিতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছুটে গিয়ে দিকে দিকে পর পর প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। আরও একটু অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অদূরে তাঁর আশ্রম। অতি মধুর নারীকণ্ঠের গান শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিত ললিত বনমাল।
জয় জয় দেব হরে।

বারেকের জন্য থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপরই গতি দ্রুততর করলেন। দ্রুতপদে আশ্রমে এসে তাঁর আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। একটি যুবতী, একটি কিশোরী দেবতার গৃহের সামনে বসে গান গাইছে। দেখে বুঝতে তাঁর বাকি রইল না যে এরা সেই ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবী, বেশভূষা দেখে আরও একটু সন্দেহ হয়। সাদা থান-কাপড়ের মধ্যে থাকে যে পরিচ্ছন্ন বৈরাগ্য, পরিধান-পারিপাট্যে তা বিলাস মনে হচ্ছে। মেয়ে দুটি স্নান করেই এসেছে, চুলে কোন বিন্যাস নেই—এলানো চুল পিঠের উপর পড়ে আছে, কিন্তু অবিন্যস্ত চুলের মধ্যেও অভ্যস্ত বিন্যাসের শাসন ফুটে রয়েছে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। মুখে শুধু যৌবন ও স্বাস্থ্যের সহজ রূপের সৌন্দর্যই নেই—প্রসাধন-মার্জনার ছটাও রয়েছে সেখানে। যুবতীটির চোখের কোলে দুটি কালো দাগের আভাস আরও কিছুকে যেন ব্যক্ত করছে।

আশ্রমের সকলে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন পাঠে রত। তাদের সামনে পুঁথি শুধু খোলাই আছে। তাদের চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেছে। দেবতার ঘরে দেবতার সম্মুখে আসনে বসে কেশবানন্দ ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার করগণনায় আঙুল আর চলছে না। বাসুদেবানন্দ সদ্য ফিরে এসেছে, সে হাত পা ধুচ্ছে এবং গুন গুন করে ওই সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে চেষ্টা করছে। শুধু গোপালানন্দ হৃষ্টপুষ্ট শ্যামাঙ্গী গাভী শ্যামলীর পিঠে হাতখানি রেখে চোখ বুজে বিভোর হয়ে গান শুনছে। কারণ গানের তালে তালে তার সর্বাঙ্গে দোলা লাগছে।

ঠাকুরঘরের সামনে একখানি শালপাতার উপর একটি ছোট ডালায় মনোরম করে সাজানো ভেট নামানো রয়েছে। তার মধ্যে লাল কাঞ্চন-ফুলগুলি ঝলমল করছে। এরাই নামিয়ে দিয়েছে তা বুঝতে বাকি থাকে না।

মাধবানন্দ নীরবে দেবগৃহের দাওয়ায় উঠে গেলেন। কোন দিকে ফিরেও তাকালেন না।

* * *

গান গাইছিল কৃষ্ণদাসী এবং মোহিনী। গাইছিল কৃষ্ণদাসী, মোহিনীর তরুণ স্বরখানি বাতাসের গতির সঙ্গে বনের কাচ শালের পল্লবান্দোলনের বেগের মত মিলে মিশে যাচ্ছিল। মাধবানন্দকে দেখে দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা-মেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে

বায়েকের হুজ তাকিয়ে আবার তাকালে নবীন গোস্বামীর দিকে। অপরূপ নবীন গোস্বামী। শুধু রূপই নয়, আরও যেন কী আছে! হাপরের মধ্যে গলা সোনার দীপ্তি আর হাপরের ফুঁয়ে গনগনে হয়ে জলে ওঠা কয়লার ছটার মধ্যে তফাত আছে। এ রূপে ওই গলানো সোনার মত একটি মহিমা আছে। ওকে দর্শন করতেই তারা এসেছে এখানে।

কৃষ্ণদাসী আর মোহিনী কেন্দুলী থেকে নবীন সন্ন্যাসীর মঠ দেখতে এসেছে। তাঁকে দেখতেই এসেছে। কয়ো বোরেগী মেলায় এই কথাটাই মাধবানন্দকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘোড়সওয়ার আসায় বলা হয় নি।

আজকের স্নান-পার্বণে রাধাবিনোদজীকে দর্শন করতে তারা প্রতি বৎসরই আসে। অন্যবারের আসার সঙ্গে কিন্তু এবারের আসার একটা পার্থক্য আছে। এবার সকাল সকাল এসেছে। অন্যবার আসে পায়ে হেঁটে দলের সঙ্গে। এবার এসেছে দল বাদ দিয়ে নৌকোয়, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওই কয়োকে। মেলা পর্যন্ত এসে কয়ো আর আসতে রাজী হয় নি। বলেছে, মা-জী, কয়ো নেহাতই কয়ো—বাঘও নয়, হাতীও নয়, ভালকুত্তাও নয়। বিপদ হলে কয়ো কয়োর মতই উড়ে পালাবে। আর পথ চেনাতেও তোমাকে হবে না। তুমি এদেশ তো ওদেশ—পুরী বৃন্দাবন ঘেঁটে এসেছ। আর তোমার কাছে মন্তর-তন্তর। তোমার ভয় কী? চলে যাও, দেখে এসগা সন্ন্যেসীকে, তার আশ্রমকে। তবে বড় কড়া লোক। একটুকুন সাবধান। বুয়েচ? মানে—বেশী হাসি—কী চোখটোখ—

বাধা দিয়ে কৃষ্ণদাসী বলেছিল, বুঝেছি রে মড়া মুখপোড়া, তোকে আর মানে বুঝাতে হবে না। বেশী হাসি—! হাসি কাঁদি যা করি, তু কয়ো তার মর্ম কী বুঝবি? বেশী হাসি। আমি যেন হাসতেই যাচ্ছি!

মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে কৃষ্ণদাসী।

নারীচরিত্র বিচিত্র। তারও মধ্যে বিচিত্র কৃষ্ণদাসীদের মত মেয়েদের চরিত্র।

এই নবীন অপরূপ সন্ন্যাসীটিকে দেখা অবধি কৃষ্ণদাসীর অন্তর আশ্চর্যভাবে উতলা হয়ে উঠেছে। সে উতলা ভাবটি অনেকটা অন্তরের আগুনের অকস্মাৎ জলে ওঠার মত। কিন্তু কৃষ্ণদাসী জানে, তার জীবনের আগুনে আর সে দীপ্তি সে উত্তাপ নেই যাতে সন্ন্যাসীর মত সোনা গলে। তবু তাকে গলাতে তার বড় বাসনা, বড় কামনা! কত কল্পনাই সে এ কয়দিন করেছে! অজয়ের কোন দহে, কোন বিশেষ লগ্নে স্নান করে উঠে বাড়ি এসে বার বার আয়না নিয়ে নিজেকে দেখেছে। কিন্তু যা চেয়েছে তা পায় নি। নিজের জানা মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি অতি সংগোপনে ব্যবহার করেও দেখেছে। কিন্তু ফল হয় নি। অবশেষে সে নিজের সেই হারানো দীপ্তি ও উত্তাপ খুঁজে পেয়েছে মোহিনীর মধ্যে। এই তো—এই তো। মেয়ের মধ্যে দিয়ে কামনার ধনকে পাওয়ার বাসনা জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে। বার বার দিনের মধ্যে শতবার মেয়ের কাছে গল্প করেছে ওই সন্ন্যাসীর।

মানুষটি যেন তেজোময় মণি। মাটির বুকের মণিতে ছটা আছে, দীপ্তি আছে, এ মণিতে তার সঙ্গে তেজ আছে। মণির সঙ্গে তেজ; সে যে দিনমণির ভগ্নাংশ। ওই মণির তেজে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে উড়ে যাবার ব্যগ্র কামনায় তার মনোপতঙ্গের যেন পক্ষোদ্গম হয়েছে।

মনে মনে মনের সঙ্গে অনেক কথা বলে ক্লান্ত হয়েছে, মনের কথা বলবার মানুষ না পেয়ে অবশেষে মেয়েকেই বলেছে। নিজের মনের বিস্ময় মেয়ের মনে সঞ্চারিত করেছে। একদিনে বলে নি, দিনে দিনে খানিকটা খানিকটা করে বলেছে। তার মনের রঙে সন্ন্যাসীর আসল রঙ আরও অনেক গাঢ় হয়েছে। তাই আরও গাঢ়তর করে মেয়ের মনে ছবি এঁকে দিয়েছে। দাস-সরকার বলেছিল একগুণ, সে তাকে দশগুণ করে তুলেছে! রমণ সরকার ওদের বাড়ি ঘরদোরের কথা বলে নি; দাসী মেয়েকে সাতমহলা বাড়ির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে; হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিংখাবে-মোড়া ষোল বেহারার পালকি, হাঙরমুখো নৌকো, পাইক-বরকন্দাজের হিসেবনিকেশ দিতেও বাকি রাখে নি। সবশেষে উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বলেছে, সেই স—ব ছেড়ে চলে এসেছে নবীন গোসাঁই।

মোহিনী শুনে অবাক হয়েছে। দাসী নিজে বলতে বলতে বিস্ময়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বসে নূতন করে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। হাতী ঘোড়া থাকার বিস্ময় তো সংসারে কম নয়, অনেক। রাজার ছেলে রথে যায়—পথে ভিড় জমে, কিন্তু এসব ছেড়ে আসার বিস্ময় তো তার চেয়ে অনেক বেশী। এর সীমা আছে, তার সীমা নেই। দাসী বলতে বলতে এবং মোহিনী শুনতে শুনতে একসঙ্গে কেঁদে ফেলেছিল, আপনা-আপনি যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

কাল সন্ধ্যায় অকস্মাৎ দাসীর মনের বাসনা আগুন হয়ে জ্বলেছে। মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর পুণ্যস্নানে কেন্দুলী তারা প্রতি বৎসরই যায়। তারই আয়োজন করতে করতে হঠাৎ মনে হয়েছে, কেন্দুলীর ওপারেই তো শ্যামরূপার গড়—ইছাই ঘোষের দেউল; ওখানে গেলেই তো দর্শন মেলে নবীন সন্ন্যাসীর। নূতন আশ্রম গড়ছে; কর্ত্তা তার বিবরণ বলেছে; সে সব তো চোখে দেখা হয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে হাঁ-না করে দ্বন্দ্ব চলেছিল, মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তার পরই 'না' শব্দটা মনের দিগ্বলয়ে কোথায় কোন্ অকূলে নৈঃশব্দের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। 'হাঁ' ধ্বনিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল অন্তরলোক। সঙ্গে সঙ্গেই ডেকেছিল, মোহিনী!

মোহিনী আকাশে তারা দেখছিল গুনছিল—এক তারা নাড়াখাড়া, দুই তারা কাপাসের খাড়া, তিন তারা চাষীভুষী, চার তারা পাটে বসি, পাঁচ তারা ঘোরমোর—

মায়ের ডাক শুনে তারা গনায় ক্ষান্ত দিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাকে ডাকছ?

—শোন্। শিগ্গিরি! শিগ্গিরি! একেবারে সখীর কৌতূহল তার কণ্ঠে।

মোহিনী ও আহ্লাদী মেয়ে, সেও ছুটে গিয়ে বলেছিল, কী মা?

মেয়ের চোখে চোখ রেখে অকারণে চুপি চুপি দাসী বলেছিল, মোহিনী কাল কেন্দুলীতে চান করে প্রভুকে দর্শন করে অজয় পেরিয়ে শ্যামরূপা যাবি? সেই নবীন গোসাঁইকে দেখে আসব, নূতন মঠ গড়েছে দেখে আসব। যাবি? যেন মেয়ের সম্মতির উপরেই যাওয়াটা নির্ভর করছে।

আর বলে দিতে হয় নি। মোহিনীর মনে দাসীর মনের কথা প্রতিধ্বনি তুলেছিল সঙ্গে সঙ্গে।—নবীন গোসাঁইয়ের মঠে? সত্যি, মা, যাবি?

—হাঁ।

তারপরই খুব চুপি চুপি বলেছিল, কিন্তু খবরদার, কাউকে বলিস না। বুঝলি? আমরা দলের সঙ্গে যাব না। দুজনাতে যাব শুধু। কয়োকে নিয়ে ভোর ভোর নৌকো করে চলে যাব; কেউ জানতে পারবে না। চানটি করে রাধাবিনোদজীকে পুজো ভেট দিয়ে আড়ে আড়ে চলে যাব। দলবল নিয়ে গেলে হৈ-চৈ হবে। ভাল করে দর্শন হবে না। দুটো কথা নিবেদন করতে পাব না। ভাল করে চরণ ছুঁয়ে পেনাম করতেই দেবে না সবাই।

আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না মোহিনীর। রাত্রিতে তার ভাল ঘুম হয় নি। বুকের ভিতরটা একটা আশ্চর্য উদ্বেগে অস্থির হয়েছে, কেঁপেছে। চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করবে, গোসাঁই মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন—তখন কেমন হবে তার?

কৃষ্ণদাসীর মনে শেষের দিকে একটা শঙ্কা হয়েছিল। অজয় পার হয়ে বনে ঢুকে সে বার দুয়েক থমকে দাঁড়িয়েছিল। রাধা মানে না গোসাঁই। পরকীয়া-মতের উপর বিরাগ। যদি—। মোহিনী সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, দাঁড়ালি যে, চল্ না কেন! কতবার বলি, এত করে দুধ খাস না, আর ওই কস্তে। দিন দিন মোটা হচ্ছিস।

মেয়ের উৎসাহে তার শঙ্কার অবসন্নতা কেটে গিয়েছে। শঙ্কাতে মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়। অভয়ের চেয়ে বল নাই।

অভিনব জলধর সুন্দর। ধৃতমন্দর। শ্রীমুখ চন্দ্রচকোর॥
জয় জয় দেব হরে॥
তব চরণে প্রণতাবয়। মিতি ভাবয়। কুরু কুশলং প্রণতেষু॥
জয় জয় দেব হরে॥

গান গাইতে গাইতেই তারা এসে আশ্রমে ঢুকেছিল। ওপার থেকেই ভেট নিয়ে এসেছিল। ওই টগরের স্তবকের মধ্যে কাঞ্চনফুলের পরন দেওয়া মালা। কিছু মাধবীফুল; কিছু চিনির মুড়কি; কিছু মিষ্টান্ন; তার সঙ্গে একটি ছোট বাটিতে ঘষা চন্দন; অগুরুচন্দন লেপন।

কিন্তু কই, নবীন সন্ন্যাসী কই?

মাধবানন্দ তখন শ্যামরূপা হয়ে ওপারের মুখে চলেছিলেন।

অন্য একজন সন্ন্যাসী এসে বিগ্রহের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেছিলেন, কী চাই? কারণ তিলক ফোঁটা সত্ত্বেও ভিক্ষুকের বেশ তাদের ছিল না।

দাসী বলেছিল, নবীন গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব হয়েছে, দর্শন করতে এসেছি, গীতিগোবিন্দ শোনাতে এসেছি। শিষ্যটি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়েছিল।

দাসী হেসে বলেছিল, প্রভুকে, নবীন গোসাঁইকে দর্শন করব।

এবার শিষ্যটি বলেছিল, তিনি তো এখন আশ্রমে নেই। ওপারে গেছেন।

—ওপারে? তবে? পর-মুহূর্তেই বসে পড়ে বলেছিল, তা হলে বসি। ঠাকুরকে গান শোনাই। বলেই আরম্ভ করেছিল গান। কৃষ্ণদাসী নিজেকে ভাল করে জানত। সে জানত তার রূপের দীপ্তি উত্তাপ যতই কমে থাক্, তার কণ্ঠস্বরের সুরের তেজ মাধুর্য একবিন্দু কমে নি। এ গান, এ সুর কানে ঢুকলে তাকে বসতে দিতেই হবে। হয়েছিলও তাই। তাদের গান শুনে গোটা আশ্রমের অধিবাসী কয়েকজন একেবারে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এমনি একটি মুহূর্তেই মাধবানন্দ এসে আশ্রমে ঢুকলেন। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। নারীকণ্ঠের গান তাঁর আশ্রমে?

বারেকের জন্য তিনি ওদের দেখলেন। কৃষ্ণদাসীর রূপ তাঁকে পীড়িত করে তুলল। এদের তিনি চেনেন; বাল্যকালে এদের দেখেছেন। তাঁর জ্ঞাতিদের ঘরের যুবকদের সঙ্গে এদের একটা গোপন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই কৃষ্ণদাসীর মত পরিণতযৌবনা বৈষ্ণবীরা—তাদের চোখের নীচে যে কালি পড়েছে, সেই কালি দিয়েই বৈষ্ণব-প্রেমের কাজল এঁকে দিত তাদের চোখে। সদ্য-ফোটা ফুলের মত কিশোরী মেয়েটিকে দেখে করুণা হল, একেও দীক্ষা দিতে শুরু করেছে ওই বর্ষীয়সী! মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের দাওয়ার উপর উঠলেন। কৃষ্ণদাসী এবং মোহিনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন নিবে-আসে-আসে এমন দুটি প্রদীপ—নূতন করে ঘৃত-অভিষিক্ত হয়ে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কৃষ্ণদাসী ডাকলে, প্রভু!

বারেকের জন্য আবার একবার ফিরে তাকালেন মাধবানন্দ।

কৃষ্ণদাসীর বুকে আবেগ জমে উঠেছে, সেই আবেগে কথাও এসে জমেছে মনের মধ্যে। সে বলতে চাচ্ছে—ঠাকুর, আমাদের বাঁচাতে পার? উদ্ধার করতে পার?

এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে যে কাহিনী সে শুনেছে, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তার চোখের সম্মুখে মাধবানন্দ যেন আর লালসার জন নয়; এ যেন উদ্ধারকর্তা। এর কাছে কটাক্ষ হেনে কোনমতেই বলা যায় না—"চাও করুণানয়নে।" ও কথা বলতে হলে সজল চোখেই বলতে হয়, পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে হয়। কৃষ্ণদাসী সত্য সত্যই সেই মুহূর্তে, উদ্ধারের আশায় আকুলভাবে আর্ত। কিন্তু মাধবানন্দ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঢুকে গেলেন। তাঁর অবসর নেই। তিনি ডাকলেন, কেশবানন্দ! কেশবানন্দ কোথায়? তাঁর চিত্তে এদের জন্য বিরক্তির চেয়েও আরও গুরুতর চিন্তা রয়েছে। প্রধান শিষ্য কেশবানন্দকে বলতে হবে—সাবধান, সাধুর ছদ্মবেশে বর্গীদের দেখে এসেছি ওপারে।

কৃষ্ণদাসীর মনে তখন অনেক কথা জেগে উঠেছে—উদ্ধার করতে পার প্রভু, রমণ দাস-সরকারের মত অজগরের পাক থেকে! বাঁচাও গোসাঁই, কিশোরী হরিণীর মত এই আমার মোহিনীকে অক্রূরের মত চিতে বাঘের গ্রাস থেকে।

সে আবার ডাকলে, গোসাঁই! ঠাকুর! প্রভু!

মোহিনী স্তব্ধ; তার মুখে কথা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই, সে নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মত জ্বলছে, তার সকল ছটা গিয়ে পড়েছে দেবতার মত ওই মানুষটির পা থেকে মুখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে।

একটিমাত্র অস্ফুট কামনা—সে শুধু প্রণাম করবে, তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবে গোসাঁই, তার সারা অঙ্গ সেই আশীর্বাদে থরথর করে কেঁপে উঠবে।

দাসী আবার ডাকলে, গোসাঁই! বেরিয়ে এলেন আর-একজন।···মাধবানন্দের একজন শিষ্য—বয়সে প্রৌঢ়। ইনিই দেবতার পূজা করে থাকেন। হাতে তাঁর নির্মাল্য এবং কিছু প্রসাদ।

—নাও।

ওরা কথা বলতে পারল না। নির্বাক হয়ে কলের পুতুলের মত হাত পেতে গ্রহণ করল প্রৌঢ় সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছিলেন, দাসী তাঁকেই ডাকলে, প্রভু!

—বল, কী বলছ? বলেই আবার বললেন, এখানে পূজার কোন মানস সিদ্ধি হয় না। কোন কবচ-টবচ আমাদের নেই। যা নির্মাল্য আর প্রসাদ দিয়েছি, এর বেশী কিছু দেবার নেই বাছা।

হাতখানি বাড়িয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, গোস্বামী প্রভুকে একবার প্রণাম করব। কটি কথা বলব।

—উনি খুব ব্যস্ত এখন।

—খুব ব্যস্ত!

—হ্যাঁ। চলে যাবার জন্য উদ্যত হলেন সন্ন্যাসী।—কেশবানন্দজী! মহারাজ!

—প্রভু! আবার ডাকলে কৃষ্ণদাসী।

—আরে মায়ী, ফের ডাকলে উনি গোস্সা হয়ে যাবেন। জরুরী কাজ।

—না ঠাকুর। সে কথা বলি নি। বলছি, আমরা গোবিন্দের জন্য ভেট এনেছি। ওই রেখেছি। ওই কটি তা হলে নিবেদন করে দিন।

দাওয়ার ওপর নামানো ভেটের ডালাটি সে দেখিয়ে দিল। সবার উপরে টগরফুলের গাঁথনির মধ্যে লাল কাঞ্চনের পরন-দেওয়া সেই মালাখানি অম্লান মাধুর্যে উজ্জ্বল রয়েছে, কয়েকটি মৌমাছি তার উপর উড়ে উড়ে ফিরছে।

শিষ্য কিছু বলবার বা করবার আগেই মাধবানন্দ নিজেই বেরিয়ে এলেন, তিনি সব শুনেছেন। বললেন, ওখান থেকেই নিবেদন করা হয়ে গেছে। নিয়ে যাও প্রসাদ।

দাসী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আমাদের আনা ফুল ফল ঠাকুর ছোঁবেন না? অর্থ সে বুঝেছে।

শান্ত গভীর স্বরে মাধবানন্দ বললেন, দেবতার দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত। সব জায়গায় পড়ে, দেওয়ালের ঘেরে তো আটকায় না; ওঁর ভোগ তো দৃষ্টিতে। দৃষ্টি নিশ্চয় পড়েছে তোমাদের নৈবেদ্যের উপর।

দাসী বললে, রাধাবিনোদের দরবারে, জগন্নাথ প্রভুর দরবারে কোথাও তো এমন নিয়ম নাই গোসাঁই। ওই তো, ওই তো তোমার গলায় রাধাবিনোদজীর প্রসাদী মালা, ও মালা তো আমার মেয়ের হাতের—এই মোহিনীর হাতের গাঁথা। কই, সেখানে তো—

তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল; মাধবানন্দ গলা থেকে মালাগাছি খুলে ফেলেছেন

দেখে তার সমস্ত দেহমন যেন পঙ্গু হয়ে গেল। পর-মুহূর্তেই মেয়ের হাত ধরে সে টানলে, আয়, সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকিস না। মোহিনী!

মোহিনী নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে, আমরা কী করলাম?

মাধবানন্দ মালাগাছি তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন: নাও। ধর। রাধাবিনোদের প্রসাদ।

মোহিনী হাত বাড়ালে, সে সব কথা ঠিক বুঝতে পারছে না। বুক দুরু দুরু করে ভয়ে কাঁপছে।

ওদিক থেকে দাসী সবলে তাকে আকর্ষণ করলে: না।

তারা চলে গেল।

মাধবানন্দ মালাখানি দরজার চৌকাঠের মাথায় খোদাই হাতীর শুঁড়ের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। কাল অজয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দেবেন।

ঠিক এই মুহূর্তেই লখিন্দর মাঝির উৎকণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠে নিঃশব্দ শান্ত আশ্রমখানি যেন চকিত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে ছুটে এল—গুরু মহারাজ! গুরু মহারাজ! সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে কেউ বাজালে বনশিঙা—প্রকৃতির সঙ্গীতময় পরিবেশে তালভঙ্গ হয়ে গেল মুহূর্তে। ফুলে ফুলে মধুপানরত মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে উড়ল, ভ্রমরেরা উচ্চতর শব্দ করে প্রচণ্ড বেগে উড়ে চলে গেল এক দিক থেকে অন্য দিকে; কয়েকটা বিশ্রামরত কোকিল চকিত কুহু কুহু শব্দ করে পাখার শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে গেল। গাই কটি নড়েচড়ে উঠল—যে কটি বসে রোমন্থন করছিল তারা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

লখিন্দর মাঝি শঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে এসে আশ্রমে ঢুকল—মহারাজ—গুরু মহারাজ! গোস্বামী মহারাজ!

তার পিছনে একজন ফটকে দাঁড়িয়ে শিঙায় শব্দ তুলেছে।

—কী? মাধবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন: ও পারে—

—ওপারে দাঙ্গা লেগে গিয়েছে মহারাজ।

—দাঙ্গা? কার সঙ্গে? কোথায়? প্রশ্ন করলেন কেশবানন্দ।

—নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছোট সরকারের দলের। ওপারের চরে লেগেছিল। নাগারা এই পারে চলে আসছে বনের বাগে (দিকে)।

—কেশবানন্দ! মাধবানন্দ এতক্ষণ ভাবছিলেন কী কর্তব্য, কিন্তু সে ভাবনা পরে—কেশবানন্দকে উদ্দেশ করে বললেন, ওপারে বর্গীর দল এসেছে কেশবানন্দ।

লখাই তখনও বলছে—ওরে বাপ রে। নাগারা কোথা থেকে সড়কি-তরোয়াল তীর-ধনুক বার করলে, তার পরেতে সে কী কাণ্ড! হাতীতে চড়ে ঘোড়ায় চড়ে সরকারের লেঠেলের দলকে কচু-কাটা করে মেলা লণ্ডভণ্ড করে চলে আসছে এই দিকে। বন্দুকও রয়েছে গো ওদের সঙ্গে।

—প্রস্তুত হও কেশবানন্দ। এরা সন্ন্যাসী নয়। আমার বিশ্বাস এরা ছদ্মবেশী বর্গী।

মহারাষ্ট্রে এদের হিন্দুস্থান লুঠের উদ্যোগের কানাঘুষো আমি শুনে এসেছি। এদের সঙ্গে কথা বলে, এদের কথার টান শুনে, এদের চেহারা দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে এরা বর্গী। বর্গীদের কাছে লুঠতরাজের সময় পৃথিবীর কোন বাধাই বাধা নয়। আমাদের আশ্রম পথে পড়বে; আশ্রম লুঠ করতে ওরা দ্বিধা করবে না। তোমরা তৈরী হও। ওদের সঙ্গে হাতী আছে।

কেশবানন্দ ডাকলেন, গোপালানন্দ!

ভীমকায় গোপালানন্দ তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—এস। বের কর।

দণ্ডখানেক সময়ের মধ্যে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। কোথা থেকে বের হয়ে এল গোটা বিশেক পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীদের তৈরী বন্দুক, বারুদ, গুলি; আরও বের হল রাজপুতানার ভীলদের তৈরী ধনুক-তীর। তার সঙ্গে তরবারি। বের করে আনলে বড় বড় মই। মইগুলি লাগানো হল কয়েকটা বিরাটশীর্ষ গাছের গায়ে। গাছগুলির ডালের উপর কবে কখন মাচা বাঁধা হয়েছে বাইরের লোক ঘুণাক্ষরে টেরও পায় নি, এমন কি লখিন্দর পর্যন্ত পায় নি। তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও জেগে উঠল মনে। এরা কারা? এরা কী? ওপারে কেন্দুলীর মহান্তদের গদি অবশ্য সে দেখেছে—তাদের পাইকদের বহরও দেখেছে, লাঠি সড়কি প্রভৃতির সরঞ্জামও না-দেখা নয়, কিন্তু এদের এ-সব ব্যবহার ধারাধরন রকমসকম সবই আলাদা।

চারটে মাচায় আট জন লোক উঠে গেল। আটটা বন্দুক বারুদ গুলি উঠিয়ে নিল তারা। তার সঙ্গে তীর ধনুক। আশ্রমের ঘের শক্ত শালখুঁটি দিয়ে তৈরী, তার মধ্যে দুটি ফটক; ফটক দুটির মুখে শক্ত আগড় টেনে এনে ঠিক করে রাখল, যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া যায়।

মাধবানন্দ বললেন, দেখতে পাচ্ছ কিছু?

পশ্চিম দিকের সব চেয়ে উঁচু শালগাছটির মাচা থেকে তরুণ সন্ন্যাসী শ্যামানন্দ বললে, পাচ্ছি, ওরা অজয়ের স্রোত পার হয়ে এপারের চরে উঠছে। দুটো হাতী, দশটা ঘোড়া, লোক প্রায় পঁচিশ জন।

—ওপারের অবস্থা?

—ওপারে কাতারে কাতারে লোক জমছে। দাঁড়িয়ে দেখছে। গুরু মহারাজ!—কথা বলতে বলতেই শ্যামানন্দ অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, গুরু মহারাজ! কণ্ঠস্বরের উত্তেজনার মধ্যেও শঙ্কার আভাস। অকস্মাৎ একটা কিছু যেন ঘটেছে।

মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন, কী?

—বালুচরের ওপর দুটি মেয়ে! ছুটছে—পালাচ্ছে। ওদের চরের উপর উঠতে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে। সেই মেয়ে দুটি। যারা এখুনি এখান থেকে গেল। মহারাজ, ওরাও মেয়ে দুটিকে দেখেছে। বর্বর-আনন্দে চেঁচাচ্ছে। মহারাজ—দুজন নাগা, ছুটেছে।

লখিন্দর বলে উঠল, ইলেমবাজারের মা-জী!

মাধবানন্দ বললেন, গোপালানন্দ! তোমরা চারজন এস আমার সঙ্গে। বন্দুক নাও সঙ্গে। আমি বন্দুক ছুঁড়লে, তোমরা একসঙ্গে চারটে বন্দুকের আওয়াজ করবে। গুলি পৌঁছবে না, কিন্তু শব্দে কাজ হবে।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি যাবেন মহারাজ?

—নারীকে রক্ষা করতে না পারলে ধর্ম চঞ্চল হবে। প্রভু মুখ ফেরাবেন। আর তুমি জান না কেশবানন্দ, আমি নিজে চোখে গোয়াতে দেখে এসেছি, মেয়েদের কী নিষ্ঠুর নির্যাতন করে এরা!

তিনি শিউরে উঠলেন।

পরক্ষণেই 'জয় কংসারি জয় মুরারি!' বলে তিনি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন। হাতে নিলেন একখানি তরবারি। বিপুলকায় গোপালানন্দ চারজন সঙ্গী নিয়ে বাঘের মত লাফ দিয়ে তাঁর সঙ্গ নিল।

যাবার সময় মাধবানন্দ চিৎকার করে বললেন, তোমার নাকাড়ায় ঘা দাও। ঘাটে বজরার ওদের সাবধান করে দাও।

সামনে অজয়ের ঘাটে আশ্রমের কয়েকখানা নৌকো বাঁধা আছে। যে বজরায় তিনি এসেছেন, সেখানা এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকখানা—তার মাল্লা-মাঝিরাও আশ্রমেরই লোক। তবে ঠিক সন্ন্যাসী নয়। তারাও লড়তে জানে। উত্তরবঙ্গের পাকা মাঝি এবং সড়কিবাজ নমশূদ্র তারা। মাধবানন্দ তাঁর পিতৃকুলের অনুগত মাঝি-সম্প্রদায় থেকে এদের সংগ্রহ করে এনেছেন। যারা নৌকোয় পদ্মায় ডাকাতি করে ফেরে, চর নিয়ে দাঙ্গা করে, এরা তাদেরই সন্ততি। মাধবানন্দ এদের নূতন জীবনে শিক্ষা দিচ্ছেন। দীক্ষা এখনও হয় নি। লখিন্দরের মত কয়েকজন এখানকার লোকও সম্প্রতি নিয়েছেন এদের সঙ্গে।

অজয়ের জলস্রোতকে মাঝখানে রেখে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় দক্ষিণ তীরে বালির উপর তাদের দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারে কেন্দুলীর তীরে প্রায় সারা মেলাটার লোক জমেছে। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়, বিশেষ করে যারা হাঁতী ঘোড়া এবং শিষ্যসেবকের দল নিয়ে দেশভ্রমণ করে, তারা প্রয়োজন হলেই ত্রিশূল এবং চিমটেকে অস্ত্র হিসেবে উদ্যত করে লড়াই করে থাকে। তীর্থপথে দলে দলে সংঘর্ষ হয়, যাত্রীদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, আবার স্থানীয় লোকেদের সঙ্গেও হয়, কিন্তু এমনটি হয় না। কারণ তাদের সঙ্গে বড় জোর তলোয়ার বাঘনখ থাকে, বন্দুক থাকে না। সারা মেলাটার লোক চমকে গেছে। যতক্ষণ না সন্ন্যাসীরা নদী পার হয়ে এপারে এসেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পশুর মত ছুটোছুটি করেছে। সারা চরটা প্রায় জনশূন্যই হয়ে পড়েছিল এতক্ষণ। ওরা অক্রূর সরকারের দলের সঙ্গে লড়াই দিয়ে খুনখারাপি করে—নদী পার হয়ে বনের দিকে পথ ধরেছে। জলে নেমে মাঝ নদী পর্যন্ত যাওয়ার পর এতক্ষণে লোকেরা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে। এপারের কাছাকাছি হতেই বেরিয়ে এসে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন এসে নদীর চরভূমে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করছে—গেল! গেল! গেল ওই মেয়ে ছুটো!

এপারে কৃষ্ণাদাসী আর মোহিনী ভয়ে প্রাণপণে ছুটছে। ছুটে পালিয়ে চলেছে বিপরীত মুখে। লক্ষ্যস্থল বোধ করি মনের মধ্যে স্থির করবারও অবকাশ হয় নি ; বাঁয়ে অজয়, ডাইনে অদূরে বন—তার মধ্যে শরবন কাশবন ও নানান তৃণে আচ্ছন্ন সেই চরভূমি ধরে তারা ছুটছে। এই মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এইটি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থান তাদের আর নাই, মনে পড়ছে না।

দেউলের ঘাটে মাধবানন্দের বাঁধা বজরাখানা এবং অপর নৌকোগুলি ঘাট ছেড়ে নিরাপত্তার জন্ম গভীর জলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—মাল্লারা সড়কি-হাতে নৌকোর উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজনের হাতে তীর ধনুক। তারাও স্বরূপ প্রকাশে বাধ্য হয়েছে।

ওদিকে দুজন সন্ন্যাসী পলায়নপর মেয়ে দুটোর দিকে বর্বর উল্লাসে চিৎকার করে ধরবার জন্ম ছুটেছে। হাতীর হাওদার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রধান সন্ন্যাসী। নিষ্ঠুর ক্রোধে তার মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে বলছে, আমার অভিশাপে একদিন এই তামাম মুলুক ছারেখারে যাবে। ঘর জলবে। শিবের অনুচরের তাণ্ডবে তছনছ হয়ে যাবে সব। পঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেলবে দেশ। হাঁ! আর মধ্যে মধ্যে এদিকে মুখ ফিরিয়ে বলছে—পাকড়কে লাও। পাকড়কে লাও।

মাধবানন্দ সঙ্গীদের নিয়ে যেখানে দাঁড়ালেন—সে স্থানটি ঠিক পলায়নপর কৃষ্ণদাসীর ও অনুসরণরত সন্ন্যাসী দুজনের মধ্যে পূর্বপশ্চিমে সরলরেখা টানলে তার প্রায় মাঝখানে, কিন্তু অনেকটা দক্ষিণে। একটা স্থূলকোণ ত্রিভুজের মত অনেকটা। ওই স্থূলকোণের বিন্দুটির উপর মাধবানন্দ এবং সামনে অতিভুজের দুই প্রান্তে অপর দুই কোণের এক কোণে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনী, অন্ম কোণে সন্ন্যাসী দুজন। মাধবানন্দ বললেন, এক বন্দুক দাগো গোপালানন্দ। জলদি।

গোপালানন্দ মুহূর্তে বন্দুক দেগে দিল। অজয়ের গর্ভে গর্ভে একটি শব্দ এপারে-ওপারে প্রতিহত হতে হতে দুপাশে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে, পর পর আটটি বন্দুকের শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল তখন আকাশ-লোকে, প্রায় বনভূমির মাথার উপর।

দুই পারের দুই পক্ষই চকিত হয়ে উঠল। ওপারের জনতা ঘটনাটা ঠিক কী বুঝতে না পেরে ছুটতে লাগল। পালাতে লাগল। এপারে অনুসরণরত সন্ন্যাসী দুজন থমকে দাঁড়াল। ওদিকে হাতীর হাওদার উপর খাড়া সন্ন্যাসী চকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে মাধবানন্দদের দেখে দাঁতে দাঁতে ঘষে কঠোর কিছু উচ্চারণ করল। একবার হাতীটা মাহুতের ইঙ্গিতে কয়েক পা অগ্রসরও হল মাধবানন্দের দিকে, কিন্তু তারপরই পর পর আটটা বন্দুকের শব্দে চমকে উঠে কিছু বলতেই হাতী থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল নাকাড়ার শব্দ—ডুম-ডুম-ডুম-ডুম, ডুম-ডুম-ডুম-ডুম। ওদিকে বজরা এবং নৌকো থেকে মাল্লারা ঝপাঝপ জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে এসে কূলে উঠে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বাংলার বহুবিখ্যাত কুক অর্থাৎ যুদ্ধধ্বনি দিয়ে উঠল—মুখে হাতের তালু সঞ্চালনের ফলে সে ধ্বনি অতিবিচিত্র—আ-বা-বা-বা-বা-বা। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে মেয়ে দুটিও বারেকের জন্ম ফিরে তাকিয়ে সব দেখে থমকে দাঁড়াল; একটি আর্তস্বরের চিৎকার উঠল, পর-মুহূর্তেই কিশোরীটি চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল সেই-

খানে। কৃষ্ণদাসীও বসে পড়ে চিৎকার করে উঠল। হে গৌর, রক্ষা কর। বাঁচাও। ওগো ঠাকুর!

মাধবানন্দ তাঁর দল নিয়ে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন খানিকটা। মাল্লারাও এগিয়ে আসছে। ওদিকে পিছনে বনের মধ্যে নাকাড়ার শব্দ গাছে-গাছে ধ্বনিপ্রতিধ্বনির ধ্বনি-তরঙ্গ তুলেছে। আকাশে ভয়ার্ত পাখিরা উড়ছে। অজয়ের চরভূমের কাশ ও শরবনের আশ্রয় থেকে সজারু খরগোশ কয়েকটা ছুটে পালাল। একটা ঝোপ থেকে একসঙ্গে চার-পাঁচটা বুনো শুয়োর দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল।

মাধবানন্দ দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, এরা সন্ন্যাসী নয়, এরা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বর্গীর দল। তোমরা ওপারে কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে থেকো না, এগিয়ে এস। কোন ভয় নেই। দেউলের আশ্রমের সন্ন্যাসী আমরা—আমরা থাকব সর্বাগ্রে—সামনে।

কথায় ফল হল। কিছু সবল সুস্থ জোয়ান চিৎকার করতে করতে অজয়ের জলে নামল। মার্—মার্ বেটাদের। মার্—

সন্ন্যাসী দলের প্রধান দাঁড়িয়ে ছিলেন হাওদার উপর, তিনি বসে পড়লেন। একটা শিঙা তুলে বাজিয়ে দিতেই দলের পদাতিকেরা বনের দিকে চলতে লাগল; অনুসরণকারী সন্ন্যাসী দুজনও ফিরল। পদাতিকের পিছনে চলল ঘোড়সওয়ারেরা। তার পিছনে হাতী। হাতীর হাওদার উপর আরোহীরা পিছন দিকে অনুসরণকারীদের জন্য বন্দুক প্রস্তুত রেখে চলতে লাগল। হঠাৎ অনুসরণরত সন্ন্যাসী দুজনের একজন একটা চিৎকার করে হাত দুটোকে উপরের দিকে তুলে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। গোপালানন্দ জানু পেতে বসে রাজপুতানার ভীলদের ধনুকে আকর্ণ জ্যা টেনে নিপুণ লক্ষ্যে তীর ছেড়েছিল। সে তীর ছুটন্ত মানুষ দুটির একটিকে বিদ্ধ করেছে। হাতীর উপর থেকে প্রধান সন্ন্যাসী কিছু বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আহত সন্ন্যাসীর সঙ্গী তার হাতের তলোয়ারখানি সঙ্গীর বুকে আমূল বিদ্ধ করে তাকে নিশ্চিন্তরূপে হত্যা করে তলোয়ারখানা আবার টেনে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। গোটা দলটি তখন বনের প্রান্তদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নাকাড়ার শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেদিকটা যথাসম্ভব দূরে রেখে দিকনির্ণয় করে বনের মধ্যে ঢুকছে।

মাধবানন্দ এগিয়ে গিয়ে কিশোরী মেয়েটির শিয়রে দাঁড়ালেন। চমকে উঠলেন তিনি। ভীরু কিশোরী কি আতঙ্কেই মরে গেছে? বসে তিনি তার হাতখানি তুলে ধরলেন। নাড়ী পরীক্ষা করলেন। অতি ক্ষীণ ভাবে নাড়ীর গতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে কেটেও যাচ্ছে। এখনও জীবন আছে। কিন্তু অবিলম্বে কোন সঞ্জীবনী ওষুধ না পড়লে বিপদ ঘটবে। মকরধ্বজ বা মৃগনাভি।

—গোপালানন্দ! শিগগির একজন এখানে এস। শিগ্‌গির। আর তোমরা অনুসরণ কর। আশ্রম থেকে বন্দুকধারীদের কয়েকজনকে নাও। বনের আশ্রয়ে বাঘ বড় ভয়ঙ্কর শত্রু। যতদূর পারা যায় ওদের তাড়িয়ে দিয়ে এস। লোক জড়ো কর। লোক চাই। নাকাড়া বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চল।

কৃষ্ণদাসী চিৎকার করে উঠল, রক্ষা কর গোসাঁই, ওগো গৌর, রক্ষা কর।

* * *

অনেকক্ষণ পর মোহিনী চোখ মেলল।

চৈত্রের সূর্য তখন অপরাহ্নের দিকে চলেছে। মাধবানন্দ তাকে একখানি নৌকোর উপর শুইয়ে দিয়েছিলেন। আশ্রম অনেক দূর ; বালুচরে ছায়া নেই ; তাই একখানি নৌকোকে কাছাকাছি এনে সন্তর্পণে তার ছইয়ের নীচে পাটাতনের উপর শুইয়ে দিয়েছিলেন। একজন সেবককে আশ্রমে পাঠিয়ে চিকিৎসা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ রামানন্দকে সংবাদ দিয়েছিলেন। রামানন্দ শঙ্কিত হয়েছিলেন প্রথমটায়। ভেবেছিলেন হয়তো যে কোন মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে আশঙ্কা দূর হয়ে গেল, মোহিনী চোখ মেলে চাইল।

মাধবানন্দ ভাবছিলেন, চলে যাবেন। তাঁর তো আর করার কিছু নেই! ওদিকে কৃষ্ণদাসী যেন পাথর হয়ে গেছে। স্থাণুর মত বসে আছে। শুধু চোখের দৃষ্টি তার অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল। নৌকোর উপর মোহিনীকে তোলবার আগে পর্যন্ত সে বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলেছে। অচেতন মোহিনীর অদূরে দাঁড়িয়ে বলেছে, চোখ মেল, মোহিনী, চোখ চেয়ে দেখ—, ওরে নবীন গোসাঁই—দেবতা তোর মুখের দিকে চেয়ে। ভয় নাই, আর ভয় নাই। চোখ চা মা, চোখ চা।

মাধবানন্দ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, চিৎকার করো না তুমি।

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ থেকে আবার কৃষ্ণদাসী শুরু করেছিল, তোর অনেক ভাগ্যি—তোর অনেক ভাগ্যি! সাতজন্মের তপস্যা না থাকলে দেবতার সেবা কেউ এমন করে পায় না।

মাধবানন্দ এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে তাকিয়েছিলেন শুধু। চুপ করে গিয়েছিল কৃষ্ণদাসী।

এর পর মোহিনীকে শিশুর মত দুই হাতের উপর তুলে নিয়ে নৌকোর উপর তাকে সযত্নে শুইয়ে দিতেই, কৃষ্ণদাসী তাঁর কাছে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, দয়াল, তুমি ওকে চরণে রাখ—

এবার মাধবানন্দ তাঁর পা টেনে নিয়ে সরে এসে বলেছিলেন, দূর থেকে প্রণাম কর। পায়ে হাত দিয়ে নয়।

তারপরই যে কথাটি বলেছিলেন—সে কথা নয়—সে কথা মর্মচ্ছেদী উত্তপ্ত লৌহশলাকা। বলেছিলেন, পাপিষ্ঠা কোথাকার!

কৃষ্ণদাসীর কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ছিল না। এদের এই বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাল্যকালের। তাঁর বাল্যকালে ঠিক এমনি একটি বৈষ্ণবী ছিল তাঁদের গ্রামের কাছে। তারও ছিল একটি পালিতা কন্যা। গান গাইতে আসত। তাঁদের কাছারিতে বৈষ্ণব-পর্বে বৃত্তি নিতে আসত; দোলে-ঝুলনে-রাসে-জন্মাষ্টমীতে দু আনা হিসেবে বৃত্তি। মেয়েটি তোতাপাখির মত কথা বলত—বৈষ্ণবী বুলি, গানের সময় মন্দিরা বাজাত, সুরে সুর মেলাত। মাধবানন্দের সঙ্গে বয়সের অল্পই পার্থক্য ছিল ভামিনীর ; মেয়েটির নাম ছিল কৃষ্ণভামিনী। সে-ই কিছু বড় ছিল। কৃষ্ণভামিনী গান গাইত, তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। তের-চোদ্দ বছর বয়সে কৃষ্ণভামিনী ঠিক মোহিনীর মত হয়ে উঠল। মাধবানন্দের

দিকে তাকিয়ে সে রাঙা হয়ে উঠত। মাধবানন্দের বয়স তখন বারো-তেরো। কিন্তু বাড়ির কুস্তিগীরের সঙ্গে আখড়ার মাটি মেখে এবং দুধ ঘিয়ের প্রাচুর্যে তখনই তিনি মাথায় বেড়ে উঠেছেন, দেহে শক্তির জোয়ার এসেছে। অস্ফুটভাবে অনেক আভাস দূরে ফোটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধের মত তাঁর নাকে আসতে আরম্ভ করেছে। গভীর রাত্রে আধোঘুমের মধ্যে দূরে ফোটা কামিনীফুলের গন্ধে চঞ্চলতার মত একটা চঞ্চলতা তিনি অনুভব করতেন ভামিনী কাছে এলে।

ভামিনীর পালিতা-মা প্রৌঢ়া বৈষ্ণবী ঠিক এমনি ধরনের কথা বলত। বলত, গোবিন্দের চেয়ে রাধা কিছু বড়ই ছিল গো, কিশোর ঠাকুর। বলে হাসত।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ওই বৈষ্ণবীই তাঁকে প্রথম শুনিয়েছিল। বলেছিল, জান কিশোর ঠাকুর, কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দে আছে—সেদিন আকাশে খুব মেঘ করেছে, সে ঘনঘটায় নীল আকাশ ঘনশ্যাম হয়ে উঠেছে। গুর্ গুর্ শব্দে মেঘ ডাকছে, বৃন্দাবনের বনে একে কালো তমালগাছের ভিড়, তার উপরে রাত্রিকাল। মহারাজ নন্দ যুবতী রাধাকে ডেকে তার হাতে কিশোর কৃষ্ণকে দিয়ে বললেন—রাধে, তুমি আমার দুলাল মাধবকে নিয়ে ঘরে দিয়ে এস। বল তো কিশোর ঠাকুর, ভামিনী তোমাকে দাঁড়িয়ে আসে বাড়ি পর্যন্ত।

সন্ধ্যাবেলা সেদিন মা ও মেয়ের সঙ্গে তাঁর গ্রামপ্রান্তে দেখা হয়েছিল। কয়েকটা কথা তিনিই বলেছিলেন ডেকে ; তারপর অকস্মাৎ সন্ধ্যার কথা মনে হতেই বলেছিলেন, আজ বাড়ি যাই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মা বকবেন।

বৈষ্ণবী ওই কথাই বলেছিল সেদিন ; অবশ্য ভামিনীকে দাঁড়িয়ে দেবার জন্য সঙ্গে নেন নি তিনি—সলজ্জভাবে 'ধেৎ' বলে নিজেই চলে এসেছিলেন। কিন্তু সে কথা মনে আজও আছে। এবং আরও মনে আছে—তাঁর মা সেদিন তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন, চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়েছিল, কথা বলতে বলতে সেইদিনই তাঁর বাপের, তাঁদের বংশের অন্ধকার ঘরের ইতিহাস ছেলের সামনে খুলে ধরেছিলেন। সে অন্ধকার ঘর—বাইরের নাটমন্দির দেবমন্দির কীর্তিকলাপ সব-কিছুর চেয়ে অনেক বিপুল অনেক বিশাল; বিরাট এক গ্রাস বিস্তার করে সে এগিয়ে আসছে, একদিন উদরসাৎ করে নিশ্চিন্ত হবে। ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত চোখের জল তাঁর সর্বাঙ্গে ঝরে পড়েছিল। সেই বৎসরই হল তাঁর উপনয়ন। মা দিলেন দীক্ষা। শিক্ষার ভার নিলেন এক আচার্য। এবং সেই বৎসরই তাঁরই জ্ঞাতি-দাদার কুঞ্জে কৃষ্ণভামিনী দাদার সাধনসঙ্গিনী হয়ে প্রবেশ করল। অমাবস্যার অন্ধকারে—এরা জোনাকিপোকার মত মেকী জ্যোতির ছলনা, তেমনি দুর্গন্ধময়—তেমনি বিষাক্ত। সেই কারণেই জিহ্বা তাঁর অসঙ্কোচে উচ্চারণ করেছিল—পাপিষ্ঠা কোথাকার!

মোহিনী চোখ মেলে চাইল।

সামনেই দাঁড়িয়ে মাধবানন্দ। তিনি ভাবছিলেন, চলে যাবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে মোহিনী। আশ্বাসের দীর্ঘনিশ্বাস। সামনে নবীন গোসাঁই, তা হলে আর ভয় নাই। তারপর তার চোখে পড়ল, সে নৌকোর উপর শুয়ে আছে। তা হলে নবীন গোসাঁই তাকে বাঁচিয়েছেন। সে ছবি যে তার চোখের উপর ভাসছে। বন্দুকের শব্দ

শুনে চোখ ফিরিয়ে সে দেখেছিল, নবীন সন্ন্যাসীকে তলোয়ার হাতে অভয়দাতা দেবতার মত। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তারপর আর তার মনে নেই। চেতনা আসায় তাঁকে এত কাছে সামনে দেখে তার আর কোন ভয় রইল না। সংশয় রইল না। গৌর তাকে বাঁচিয়েছেন! তার চোখ ফেটে জলধারা বেরিয়ে এল, টলমল করে উঠল চোখ ছুটি। পরম নিশ্চিন্তভরে সে চোখ বুজল, ভয় নেই—গৌর তাকে রক্ষা করেছেন, তাঁরই নৌকোয় তাকে ঠাঁই দিয়েছেন, সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন—আবার কী। চোখের নেমে আসা পাতা ছুটির চাপে চোখের কূলে কূলে ভরা জল দরদর ধারায় বেরিয়ে এল—

—জ্ঞান হয়েছে। কে কথাটা বললে, বুঝতে পারলে না মোহিনী। তবে গৌর নয়। তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ী দেখে বললে, দুর্বলতা কমে আসছে। তবে বিশ্রাম প্রয়োজন। আকস্মিক দুরন্ত ভয়ে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

—এই নৌকোতেই এদের—কোথায় বাড়ি সেই গ্রামের ঘাটে পৌঁছে দাও!—এ কণ্ঠস্বর তাঁর, চোখ মেললে মোহিনী। দেখলে, পিছন ফিরে চলে যাচ্ছেন তিনি। নৌকোটি অল্প দুলছে। মাধবানন্দ নৌকো থেকে নেমে পড়লেন।

মোহিনী উঠে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু প্রৌঢ় সন্ন্যাসী বারণ করলেন, উঠো না। উঠো না।

মোহিনী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল—জেদ করবার মত তার মনের ধাতুর দৃঢ়তাই নেই, একবার কাতর অনুনয়ে বলতেও পারল না—গৌরের চরণের একটু ধুলো!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে সে প্রশ্ন করলে, মা? আমার মা?

—আছে। এই যে বসে আছে।

কৃষ্ণদাসী সেই থেকে পাথরের মত বসে আছে; চোখে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টি।

দূরে বনের মধ্যে তখনও নাকাড়া বাজছে। ওপারের ভিড় কমে এসেছে, কিন্তু এখনও অনেক লোক জমে রয়েছে। কিছু লোক এপার পর্যন্ত এসেছে। চারিদিকে উত্তেজনার চিহ্ন এখনও বিকীর্ণ হচ্ছে—পুড়ে-যাওয়া ঘরের ভস্মস্তূপের উত্তাপের মত। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করছে।

মাধবানন্দ তীরে উঠবামাত্র একদল লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। সেদিন যারা তাঁকে নৌকোর উপর সূর্যবন্দনার সময় সকালের আলোর তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, আজ তাঁকে আর এক রূপে দেখেছে। রূপে মানুষ মগ্ধ হয়—বীর্যে মানুষ অভিভূত হয়ে নত হয়। তারা দুইই হয়েছে। মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন, ওপারে কী হয়েছিল—কেউ বলতে পার? আমি সূত্রপাত দেখে এসেছিলাম। একজন ঘোড়সওয়ার—একজন সন্ন্যাসীর প্রায় ওপরে পড়বার উপক্রম হতেই সন্ন্যাসী ঘোড়ার লাগাম ধরে এমনি টান দিয়েছিল যে ঘোড়াটা পড়ে যায়—

—হ্যাঁ। ইলেমবাজারের ছোট দাস-সরকার।

—হ্যাঁ, কয়েকবারই নামটা শুনেছি। ইলামবাজারের খুব বড় গদিওয়ালার ছেলে। খুবই দুর্ধর্ষ। চিৎকারও করছিল, হামারা কোই হ্যায় রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানকার লেঠেল-টেটেল সবাই ওদের টাকা খায়। তা ছাড়া ছোট

দাস-সরকার ওদের নিয়ে ইয়ার বক্সীর মত উঠে বসে। মদ-টদ খায়। আর কাছেই লাউসেন তালাওয়ের চারিপাশে অনেক ডোম লেঠেল আছে। তারা খবর পেয়ে 'হা রে রে' করে ছুটে আসে। ওরা লাঠিবাজি পেলে আর কিছু চায় না, দাঙ্গাতে ভারি নেশা—

—থাক্ সে কথা। ওপারের ঘটনাটা শুধু শুনতে চাচ্ছি।

—ছোট সরকারের হাঁকে তারা এসে জমেছিল। তারপর বচসা গালাগাল। সরকার খুব গালাগাল করে হুকুম দিয়েছিল—দে বেটাদের পিটে ভাগিয়ে। কেড়ে নে হাতী ঘোড়া যা পারিস। ওরে বাবা, সঙ্গে সঙ্গে নাগারা সড়কি তলোয়ার বার করে—

—কেউ কি মরেছে? জখম হয়েছে?

—সরকারের দলের তিনজন মরেছে। জখম হয়েছে পাঁচ-সাতজন। সরকারের পা'খানা আগেই জখম হয়েছে, দাঙ্গার সময় পালাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে নাকে খুব চোট খেয়েছে, তার উপর নাগারা ঘোড়া চালিয়ে একটা পা খতম করে দিয়েছে। আর যাত্রীদের মধ্যে পালাতে গিয়ে চাপে জনকতক জখম হয়েছে। হাতীর পায়ের চাপে এক বুড়ী মারা গিয়েছে।

মাধবানন্দ ভিড় ঠেলে বাইরে এলেন।

নৌকাটা তখন ইলেমবাজারের ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। ওপারের চরের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে একজন লোক ছুটছে আর চিৎকার করছে।

—কয়ো ঠিক যেছে মা-জী—তুমি ভেবো না। কয়ো ঠিক চলছে সঙ্গে সঙ্গে মা-জী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘটনাটার কয়েকদিন পর। মাধবানন্দ ভোরবেলা উঠেই প্রবীণ সন্ন্যাসী কেশবানন্দকে ডেকে বললেন, এ কয়েকদিন দুশ্চিন্তায় আমার নিদ্রা হচ্ছে না কেশবানন্দ। আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

কেশবানন্দ বড় ধীর মানুষ, পশ্চিমদেশীয় লালা-বংশের লোক; জীবনে রাজকর্মে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বংশের সন্তান। ওই রাজকর্মেই তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে। মুঘলবংশের যে শাখাকে সমর্থন করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন—তার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ধ্বংস হয়ে গেছেন। সংসার, সম্পত্তি সব ধ্বংস হয়েছে, নিজে প্রাণে বেঁচে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মাধবানন্দের সঙ্গে পরিচয় হয় কাশীতে। মাধবানন্দের নূতন সাধনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একটা নিজের গতি আছে। যা গুরুর গতিপথ থেকে একটু ভিন্ন। আশ্রম সংগঠনের কল্পনা-বুদ্ধি সবই তাঁর। মাধবানন্দের এই কথা কটি শুনে তিনি চুপ করেই রইলেন। প্রতীক্ষা করে রইলেন চিন্তার কারণ শুনবার জন্য। উত্তর তারপর দেবেন।

মাধবানন্দ বললেন, কালকের ঘটনার কথাই বলছি। ঘটনাটা লোকের মুখে মুখে অনেক বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আমি ভাবছি আমাদের বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রের কথা, আমাদের লোকবলের কথা নবাবী কাছারিতে গিয়ে না পৌঁছয়। ওপারে কেন্দুলীর মহান্তের গদিতে

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করে।

আবার কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, স্থানীয় লোকের কাছেও খানিকটা সন্দেহের স্থল হয়ে পড়বে আমাদের আশ্রম। কী মনে কর তুমি?

—অসম্ভব তো নয়ই এবং তাই সম্ভব। কিন্তু—

—বল।

—তাতে বিচলিত হলে বা ভয় পেলে তো চলবে না।

—না। তা চলবে না।

কেশবানন্দ বললেন, স্থানীয় লোকের সন্দেহ বেন্দুলীর মহান্তের চাঞ্চল্য বা শত্রুতাও যদি হয় তাতে আমাদের বিচলিত হবার কোন হেতু নেই। ভয় শুধু নবাবকে। কিন্তু সুজাউদ্দীন যতদিন গদিতে আছে ততদিন নবাব-দরবারেও খুব আশঙ্কা আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ নবাব সুজাউদ্দিন বিলাসী এবং অলস, নিতান্তই দেহলালসায় আবদ্ধ জীব। এই সব কারণে তিনি শান্তিপ্রিয়। তার উপর লোকটি হিসাবী। উড়িষ্যায় নায়েব তকী খাঁর অত্যাচারে পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথ-বিগ্রহমূর্তি চিল্কা হ্রদের অপর পারে স্থাপন করবার সংকল্প করেছিল। এক বছর নিয়েও গিয়েছিল। তাতে উড়িষ্যায় তীর্থযাত্রীর অভাবে রাজস্ব কমে গিয়েছিল। নবাব সুজা সঙ্গে সঙ্গে তকী খাঁকে সরিয়ে দিয়ে কুলি খাঁকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন—এই ঘটনা উপলক্ষ্য করেই আমি উপঢৌকন নিয়ে মুরশিদাবাদ গিয়ে আশ্রয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কিছু অস্ত্র রাখবার অনুমতি নিয়ে আসি।

—আমি আরও এক ঠাঁই থেকে বিরোধিতার আশঙ্কা করছি। হেতমপুরের ফৌজদারের। হেতমপুরের ফৌজদার রাজনগরের রাজা উপাধিকারী মুসলমান নবাবের অধীন।

—জানি।

—রাঘবপুরের ব্রাহ্মণ জোতদার রাঘব রায়ের কথা শুনেছ? রাঘবপুর থেকে সে ব্রাহ্মণ আজ নির্বাসিত। সেখানে অত্যাচারী কোম্বর খাঁয়ের সন্ততিরা বাস করছে। রাঘবানন্দকে দমন করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। হেতমপুরে গড় তৈরি হয়েছে সেই কারণে। তাদের বিরোধিতা আশঙ্কা করছি। বীরভূমের এলাকা অজয়ের ওপারে—এপারে তাদের অধিকার নেই। কিন্তু এত কাছে হিন্দুর মঠে শক্তির সন্ধান পেলে তারা স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল হবে। হেতমপুর এখান থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা আমার ওখানে। ওরা পরকীয়া-তত্ত্ব, তার বিকৃতি—এ সব বুঝেও বুঝতে চায় না। বরং এই তত্ত্বের উপর একটা অলৌকিক রহস্য আরোপ করে খুশী হয়। অনেকে প্রলুব্ধও হয়। তুমি জান না, এদেশে অনেক মুসলমান আমীর গোপনে কুঞ্জ করে বৈষ্ণবীদের কীর্তন শোনে, কাঁদেও অনেকে; মালাও জপে। তারা রাধাহীন কংসারী কৃষ্ণের উপাসনা বুঝতে চাইবে না। রাজতন্ত্রের সে কাল চলে গেছে কেশবানন্দ, যে কালে প্রজার আধ্যাত্মিক কল্যাণ চরিত্রগঠন রাজা নিজের দায়িত্ব বলে গ্রহণ করত। আজকাল প্রজা ভ্রষ্টচরিত্র আত্মিক শক্তিতে দুর্বল হলেই রাজা নিশ্চিন্ত। বিশেষ করে রাজা এবং প্রজা যেখানে ভিন্নধর্মাবলম্বী। হিন্দুস্থানের মাথাভাঙা

দেউলগুলো শুধু আমাদের চোখেই পড়ে না, তারাও দেখে আমাদের সঙ্গে। কল্কি অবতারের প্রত্যাশার কথা তো তারাও শোনে—জানে ; কংসারি কৃষ্ণ দেখে তাকেই কল্কি বলে ব্যাখ্যা করা বা মনে করা তো স্বাভাবিক।

কেশবানন্দ চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

—কেশবানন্দ !

—আপনি কি স্থানান্তরে যাওয়ার কথা কল্পনা করছেন ?

—করি নি। ভাবছি। ভাবছি, প্রারম্ভেই এই বিঘ্ন !

—ভেবে দেখুন। আমি ইতিমধ্যে আরও কিছু বল সংগ্রহের চেষ্টা করি। আমাদের আশ্রমকে সুদৃঢ় করে তুলি। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। তামাম হিন্দুস্থানে বাদশা ঔরংজীবের পর সব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ সাড়া জেগেছে গুরু মহারাজ। রাজেন্দর গিরি গোসাঁইকে নিজের চোখে আপনি দেখে এসেছেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। এ ছাড়া পথ নেই গুরু মহারাজ।

—পথ নেই ? প্রশ্নের সুরে কথাটিকে আকাশলোকের দিকে উচ্চারণ করে বোধ করি উত্তরের জন্য সেই দিকেই চেয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, না কেশবানন্দ। আমি স্বীকার করি নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, কিন্তু সে বল নিছক অস্ত্রবল নয়, প্রতিশোধের জন্য তার প্রয়োগ নয় ; তার প্রয়োগ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য। তার প্রেরণা হিংসা নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠা নয়, তার প্রেরণা ন্যায়বোধ। তার উৎস চরিত্রবল এবং সংযম। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সাড়া আমি দেখেছি সে সাড়ার মধ্যে হিংসার রক্তচক্ষু দেখেছি, কুটিল আক্রোশের গর্জন শুনেছি। আমি তো সে পথের পথিক নই। আমার সাধনা চরিত্রের, সংযমের, সাহসের, চৈতন্যের। মানুষকে আমি কল্যাণ-চৈতন্যে জাগাতে চাই। প্রতিরোধ চাই, প্রতিশোধ নয় কেশবানন্দ। তাতে অকল্যাণ। মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম আমি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি, সেখানে কোন বিরোধ নেই !

কেশবানন্দ প্রবীণ মানুষ, দীর্ঘকাল রাজকর্মে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মুখভাবের মধ্যে মনোভাব কখনও প্রকাশ পায় না। তিনি প্রশ্ন করলেন ধীর কণ্ঠে, আপনার কী অভিপ্রায় বলুন ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। ভেবে দেখি। আমি ভাবছি—

—কী বলুন, যদি বাধা না থাকে ?

—বাধা থাকলে কথাটা তোমার কাছে উত্থাপন করব কেন ? গুরু হলেও আমি বয়সে তোমার চেয়ে ছোট। তোমার পরামর্শ চাই বলেই কথা উত্থাপন করেছি। আমি যদি, কেশবানন্দ, হেতমপুরের ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলি ?

—নিজে থেকে যাবেন ? রাজচরিত্রের স্বভাব হল সবই বিপরীত দিক থেকে দেখা।

—আমার একটি অজুহাত আছে কেশবানন্দ। অবশ্য অজুহাত কথাটা ঠিক নয়। এ ঘটনাটা না ঘটলেও আমাকে একবার যেতে হত। করো লোকটিকে দেখেছ, সে এই আশ্রমের কাছে কোথাও একটি বহুমূল্য নীলা কুড়িয়ে পেয়েছে। রত্নটি সে আমার ভেবেই আমাকে

দিতে এসেছিল, কিন্তু সে আমার নয় শুনে বললে—তা হলে সেই মোগল-বিবির হবে। হেতমপুরের এখন যে হাফেজ খাঁ—হাতেম খাঁয়ের সর্বাধিক প্রিয় পাত্র, পুত্রাধিক প্রিয়, সর্বেসর্বা—সেই হাফেজ খাঁ ওখানে কর্মলাভের পূর্বে প্রথম এই বনের এই দেউলে এসে উঠেছিল। হয়তো নিতান্তই কর্মসন্ধানীর মত পথের মধ্যে আশ্রয় দেখে বিশ্রাম করেছিল। হয়তো বা, কেশবানন্দ, তা ছাড়াও আরও কিছুর মত—পলাতকের মত। কারণ লোকান্তর ছেড়ে এই বনে তার পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে আশ্রয় নেওয়াটা ঠিক যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কয়ো বলে, এমনি রত্ন সে দেখেছিল সেই মেয়েটির আভরণের মধ্যে। আমি তারই একটা সন্ধান করতে যেতামই; তাই যাব। সেই সূত্র ধরেই কথা তুলব।

—অপেক্ষা করুন মহারাজ। দেখুন, ফল কী হয়!

মাধবানন্দ বললেন, অপেক্ষা করতে বলছ? আচ্ছা। তাই হোক। দেখি।

মাধবানন্দের আশঙ্কা অমূলক নয়। তার দিন পাঁচেক পরেই ওপার থেকে কেন্দুলীর মহান্ত ভরত দাস সংবাদ পাঠালেন। একজন শিষ্য এল একখানি লিপি নিয়ে।

দেবনাগরীতে ব্রজভাষায় লেখা পত্র—

"কংসারি দ্বারকাধীশ শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সেবক মাধবানন্দজী, তোমার ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী-স্নানপর্বে দুর্বৃত্তদমনে তোমরা যে বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ—তাহার জন্য দেবতা অবশ্যই প্রসন্ন হইয়াছেন। কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হইলে অসুরেরা অপ্রসন্ন হয়। সে অপ্রসন্নতার সংবাদ তোমাকে জানাইতেছি। ইলামবাজারের ধনী তুলা ও গালাওয়ালা রাধারমণ দে-সরকারের পুত্র সেদিনের সেই হাঙ্গামার মূল—অক্রুর দে-সরকার তোমার উপর উপদ্রব অত্যাচারের সংকল্প করিয়াছে এবং ষড়যন্ত্র করিতেছে। কারণ ঠিক অনুমান করিতে পারিতেছি না—তবু সংবাদ সত্য। সম্মুখ-সংঘর্ষে সাহসী না হইয়া সে স্থানীয় বীরভূম রাজ্যের ফৌজদার হাতেম খাঁয়ের নিকট তোমার বিরুদ্ধে অনেক শিকাইত করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে রাঘবপুরের রাঘবানন্দ রায় নামক ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনেক হাঙ্গামা হইয়াছিল—প্রজা-বিদ্রোহ হইয়াছিল। সে-কারণ ফৌজদারের সহজেই উৎকণ্ঠিত হওয়ার কথা। তাহার উপর নানান স্থানে তীর্থপথে 'সন্ন্যাসীদের' দ্বারা লুঠতরাজের সংবাদ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সকলেই ছদ্মবেশী বর্গী নয়। সুতরাং হাতেম খাঁ অবশ্যই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবে। কেবল এলাকা তাহার নয়—বর্ধমানের এলাকা বলিয়াই ইতস্তত করিতেছে। তোমার অবগতির জন্য সব জ্ঞাত করিলাম।"

পরিশেষে পুনশ্চ লিখেছেন—"ইলামবাজার দাস-সরকারের এলাকা। সেখানে কোন কারণেই যাওয়া সঙ্গত হইবে না।"

কেশবানন্দ বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না। দাস-সরকারের ওই বন্যশূকরের মত পুত্রটাকে ভয় করবার কোন হেতু নাই। বন্যশূকরের উপদ্রব তৃণভূমিতে, কন্দজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, নদীর পলিমাটিতে; শালকাণ্ডকে তার ওই দাঁত দিয়ে ফেড়ে ফেলা যায় না। আমিও এই কদিন নিশ্চিন্ত বসে নেই। লোক সংগ্রহ করছি। অস্ত্র আমাদের আছে—আরও সংগ্রহ

করছি। সড়কি-দা-তীর-ধনুক। এবং হেতমপুরের ফৌজদারের ডান হাত সেই হাফেজ খাঁ সম্পর্কেও আমি সন্ধান করছি। আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে গুরু মহারাজ, যদি তা সত্য হয়—তা হলে সে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।

মাধবানন্দ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন কেশবানন্দের দিকে।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি সেদিন নীলার কথা বললেন। তাই থেকে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আপনি কি মথুরার ঘাটে দিল্লির বাদশাহ-বংশের সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের কথা ভুলে গেছেন গুরু মহারাজ! হুসেন আলি—! চোখের কোলে সেই আশ্চর্য কালির দাগ!

হুসেন আলি! সুপুরুষ অভিজাত বংশের সন্তান—সুন্দর মুখে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ। বড় বড় চোখ দুটির কোলে আশ্চর্য কালো দাগ! মনে পড়েছে বইকি। হঠাৎ একখানা নৌকো এসে ভিড়েছিল তাঁর বজরার গায়ে ; নৌকো থেকে বজরায় উঠে বলেছিল—হিন্দু ফকির, শুনেছি তোমরা গণনা করে অনেক কিছু বলতে পার, তুমি কিছু পার, না বুজরুক!

মাধবানন্দের চোখে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হয়েছিল। কিন্তু চতুর কেশবানন্দ তাঁকে আড়াল করে সামনে এসে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এককালের বিজ্ঞ রাজকর্মচারী—সুচতুর বুদ্ধিধর লালা-বংশের সন্তান—অতি সংক্ষেই মত্তপ হুসেন আলির সঙ্গে কথা বলে তার কাছ থেকে কথা সংগ্রহ করেই তাকে উত্তর দিয়ে তুষ্ট করেছিলেন। মাধবানন্দ কথাটা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

হুসেন আলি বলেছিল, তার প্রেয়সী বাদশাহ-বংশেরই কন্যা আমিনা ওসমান বলে এক ওমরাহপুত্রের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছে। হুসেন আলি তাদেরই সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। যত দূর সংবাদ পেয়েছে তাতে তারা আগ্রার দিকেই এসেছে।

চতুর কেশবানন্দ বলেছিল, আগ্রা বোধ হয় ত্যাগ করেছে তারা এতক্ষণে। গনণা করে দুজনের আকৃতি এবং রূপও বর্ণনা করেছিল, ঠিক মিলিয়ে দিয়েছিল। এমন কি অলঙ্কারও। সেই প্রসঙ্গে বলেছিল, বহুমূল্য রত্ন রয়েছে যেন! নানা বর্ণের নীলা—

সঙ্গে সঙ্গে হুসেন আলি বলেছিল, নীলা। বহুমূল্য নীলা সেখানা। বাদশাহ শাহজাহান যে সব জহরতকে পেয়ার করতেন, শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কাছে রেখেছিলেন, তারই মধ্যে ছিল ওই নীলাখানা। কোনক্রমে এসেছিল আমাদের হাতে। ওই নীলাখানা আমিই তাকে দিয়েছিলাম।

কেশবানন্দ বললেন, আমার বিশ্বাস, গুরু মহারাজ, এরা তারাই। কয়োর কুড়িয়ে পাওয়া ওই নীলা বহুমূল্য। বাদশাহী জহরত বলেই আমার ধারণা। ওই নীলা থেকে এবং তারা যেভাবে এই বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল যার কৈফিয়ত একমাত্র আত্মগোপন ছাড়া কিছু হতে পারে না, এই দুই তথ্য থেকে আমার ধারণা এরা তারাই। এ কথা ঘুণাক্ষরে তার কানে তুললে সে আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে বাধ্য। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

—চিন্তা! না। চিন্তার আমার অবসর নেই বর্তমানে কেশবানন্দ। চৈত্রের শেষ হবে

কাল। বৈশাখ মাস তপস্যার মাস। সেই চিন্তাই আমার একমাত্র চিন্তা বর্তমানে।

*　　　*　　　*

দ্বাদশ রাশিতে সূর্য দ্বাদশ মাসে অবস্থান করবেন, তাঁর সপ্তাশ্ববাহিত রথে বারো মাসে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ করে পৃথিবী-পরিক্রমা শেষ করেন আর বিষ্ণুপ্রিয়া ধরিত্রী দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রায় দ্বাদশ উপচারে পূজা করেন। বৈশাখে মেষ রাশিস্থ ভাস্করে প্রখরতম তাপের দিনে অগুরুচন্দনের লেপন প্রস্তুত করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ চর্চিত করে দেয়। প্রখর উত্তাপ। বড় ক্লেশ হবে। চৈতন্যময় পরমপুরুষ স্নিগ্ধ শান্ত হলেই সব স্নিগ্ধ শান্ত।

মাধবানন্দ দেব-অঙ্গ চন্দনচর্চিত করে দিলেন। তারপর একে একে আশ্রমের সকলেই চন্দন অর্ঘ্য দিলেন ভগবানের ভাব-বিগ্রহের চরণে। নিজের নিজের মস্তকে ললাটে এবং বুকে চন্দন-প্রসাদের তিলক এঁকে নিলেন। এবং এর পর গোস্বামীরা একে একে বার হয়ে গেলেন।

এ মাসে অনেক কাজ। কাজ নয় ব্রত। বৈশাখ ব্রতেরই মাস। সব চেয়ে বড় কাজ এ মাসে জলদানের কাজ। অনেকগুলি জলসত্রের ব্যবস্থা করেছেন মাধবানন্দ। এই সুদীর্ঘ বহুক্রোশব্যাপী অরণ্যের মধ্য দিয়ে বহুকালের সড়ক চলে গিয়েছে। এদিকে বর্ধমান থেকে, ওদিকে বহু দেশান্তর পার হয়ে চলে গিয়েছে পঞ্চনদ পর্যন্ত। আবার রানীগঞ্জের ওখানে দামোদর পার হয়ে, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পার হয়ে চলে গিয়েচে শ্রীক্ষেত্র। সুদীর্ঘ অরণ্যপথে ছায়া সুলভ, কিন্তু জল সুলভ নয়। মধ্যে মধ্যে অনেক ছোট ছোট নালা-নদী এদিকে অজয়, ওদিকে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু বনের মধ্যে তাদের খুঁজে বের করা শক্ত; দূর থেকে দেখা যায় না, চলার পথে বনের আড়াল থেকে হঠাৎ সামনে পড়ে; তার উপর গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়; দামোদর এবং অজয়ের নিজেদেরই অবস্থা ওই সময় উপবাস-ক্লিষ্টের মত বিশীর্ণ; বালিময় ড়ির মত ধু-ধু করে। বৈশাখ-দ্বিপ্রহরে গরম বাতাসে বালি ওড়ে, মধ্যে মধ্যে দু-চারটি অতি তৃষ্ণার্ত পথিকের নদীর বালির উপর পড়ে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ করে দামোদরের গর্ভে। দামোদরের এক কূলবর্তী স্রোতের জলের আশায় তৃষ্ণার্ত পথিক বিশাল বালুময় বুকের উপর দিয়ে আসতে আসতে মাথার উপর সূর্যের এবং পায়ের তলায় বালির উত্তাপে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু হয়। কিছুক্ষণ মুখ ঘষড়ায় বালিতে, নাক-মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তারপর শেষ হয়ে যায়। এদিকে অজয় অবশ্য এতখানি নয়, এবং অজয়ের ওপার দিয়ে যে পথ, সে পথ এমন অরণ্যসঙ্কুলও নয় আর এ পথটির মত এমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। পশ্চিমে নগরী অর্থাৎ রাজনগর থেকে উত্তরে রাজমহল পর্যন্ত পথের যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু খুব বেশী লোকজন হাঁটে না। তবে ওদিকে এক-একটা খাঁ-খাঁ-করা মাঠ আছে। গ্রাম নেই, গাছ নেই, জলাশয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন প্রান্তরে পড়েও মানুষ তৃষ্ণায় মরে। এই দুই দিকেই আশ্রমের ব্যয়ে ও উদ্যোগে জলসত্র খোলা হবে। বৈশাখ মাসে জলদান শ্রেষ্ঠ দান। প্রতি স্থানের জলসত্রে স্থানীয় কর্মীরাই অবশ্য প্রধান হয়ে থাকবে। সেখানকার লোক বেছে ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। ছোলা, গুড়, জলের জালা—খরচপত্র সবই আশ্রমের, তত্ত্বাবধানও করবে

আশ্রমের গোস্বামীরাই, কিন্তু হাতে-কলমে সব-কিছু করবার দায়িত্ব স্থানীয় লোকের। প্রতি সত্রে জল সরবরাহের জন্ম এক-একখানা গরুর গাড়ি কেনা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কর্ম গ্রহণ করেছে আশ্রম। সন্ধ্যায় গোস্বামীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভাগবত-কথা শুনিয়ে আসবেন। বলে আসবেন, "মানুষ অসত্য থেকে সত্যে চল, অসততা থেকে সততায় চল, অশুদ্ধতা থেকে শুদ্ধতায় চল, আচার আর অন্ধবিশ্বাস থেকে চৈতন্তে জাগো।" এই তো সাধন। সেবা এবং ভগবদ্গীতির পুণ্যে চৈতন্তময়ের পূজা।

মাধবানন্দ নিজে নিয়েছেন পঞ্চতপার মত ব্রত। পঞ্চতপা নয়। আশ্রমের উঠোনের ঠিক মাঝখানে বড় নিমগাছটার তলায় মাটি-বাঁধানো বেদীটির উপর বসে সমস্ত দিন হোমকর্মে মগ্ন থাকবেন; অর্থাৎ সারাটা দিন বাইরে থেকে সূর্যকিরণকে যথাসম্ভব দেহে মনে গ্রহণ করবেন। জলগ্রহণ করবেন সূর্যাস্তের পর।

* * *

"ওঁ বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্কর শুক্লপক্ষে—" দিনশেষে মাধবানন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি প্রদান করছিলেন। একখানি গরুর গাড়ি এসে আশ্রমের মধ্যে ঢুকল। গাড়িখানিতে মাটির জালা, বড় বড় মাটির কলসী, কয়েকটা বস্তা প্রভৃতি জলসত্রের সরঞ্জামে বোঝাই। কোন স্থানের জলসত্রের গাড়ি ফিরে এল; সঙ্গে একজন তরুণ সন্ন্যাসী আর একজন সন্ন্যাসী, সে ওই গোপালানন্দের দলভুক্ত।

কেশবানন্দ প্রশ্ন করলেন, এ কী, তুমি ফিরে এলে যে গাড়ি নিয়ে?

গাড়িগুলির ফেরার কথা নয়, সন্ন্যাসীদেরও নয়, যে গ্রামে জলসত্র দেওয়া হয়েছে সেই গ্রামেই তাদের বৈশাখী সংক্রান্তি পর্যন্ত থাকবার কথা।

মাধবানন্দ বারেকের জন্ম সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে আবার আপন কর্মে মন দিলেন। আপন অজ্ঞাতসারেই বোধ করি ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

—একটা হাঙ্গামার জন্ম ফিরে আসতে হল গোস্বামী মহারাজ।

—হাঙ্গামা? কী হাঙ্গামা?

—আমাদের জলসত্রে কেউ জল খাবে না মহারাজ। কাউকে খেতেও দেবে না। আমরা 'রাধা'কে বর্জন করেছি। গোটা গ্রামটাই আমাদের উপর বিরূপ হয়ে উঠল মহারাজ।

—কই, এ পর্যন্ত তো ঘুণাক্ষরে এ কথার আভাস পাই নি।

—হঠাৎ একটা ঘটনা, তা থেকেই এমন হয়ে গেল মহারাজ।

—হঠাৎ কী ঘটল?

—এক বৈষ্ণবী, মহারাজ, যে বৈষ্ণবী তার মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছিল, নদীর চরের উপর গুরু মহারাজ যাদের বর্গীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন সেই বৈষ্ণবী—সে কোথায় যাচ্ছিল। পথে তৃষ্ণার্ত হয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের জলসত্রে জলপানের জন্ম, অঞ্জলিও পাতলে কিন্তু হঠাৎ জলপান করতে গিয়ে অঞ্জলির জল ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—না। না। না। এ জল নয়—এ আগুন, এ বিষ। এ বিষ। যারা রাধার মধ্যে পাপ দেখে, যারা

গোবিন্দের পাশ থেকে রাধাকে বর্জন করেছে, তাদের জলসত্রের জল বিষ, আগুন। সর্বনাশ হবে, ইহলোক যাবে, পরলোক যাবে, যে এ জলসত্রের জল পান করবে। হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল সে। চোখ দুটি মেয়েটির বড়। সেই বড় বড় চোখ যেন আগুনের মত জলতে লাগল। চিৎকার করতে লাগল রাধার প্রেমে কলুষ! হা-হা-হা-রে! ক্রমে লোক জমে গেল। তারপর লোকজনেরা বিরূপ হয়ে উঠল, তারা কেউ কেউ আমাদের সব কিছু ভেঙে চুরে তছনছ করে দিতে চাইলে। দুটো জালা ভেঙেও দিলে। তারপর আরম্ভ হল নামগান। তারা নামগান করতে করতে চলে গেল। আমরা চলে আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছি। মেয়েটি কিন্তু সাধারণ নয় মহারাজ। অনর্গল তার চোখে ধারা বইছিল। লোকে বললে, সে নাকি সিদ্ধাই-পাওয়া বৈষ্ণবী; ওদের আখড়া পাটই সিদ্ধাইয়ের পাট।

কেশবানন্দ বললেন, চলে এসেছ ভাল করেছ। বিশ্রাম কর।

মাধবানন্দ ধীরে ধীরে উঠে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সিদ্ধাই? কৃষ্ণদাসীর মুখখানা মনে পড়ল; তার বেশভূষা মনে পড়ল। তার সিদ্ধাই? সে-সিদ্ধাই কোন্ সিদ্ধাই?

কেশবানন্দ মন্দিরে প্রবেশ করলেন, বললেন, চিন্তিত হবেন না গুরু মহারাজ। কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় হবে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কালই সুপুরের আনন্দচাঁদ গোস্বামীর কাছে যাব।

সুপুরের আনন্দচাঁদ গোস্বামী এক তরুণ বৈষ্ণব সাধক। মাধবানন্দ তাঁর নাম শুনেছেন। এখানকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাথার মণি। তিনি নাকি অলৌকিক অনেক কিছু করতে পারেন।

কেশবানন্দ বললেন, আনন্দচাঁদ গোস্বামী, আমি যা শুনেছি তাতে যে সাধনাই তাঁর থাক্ তিনি বিষয়াসক্ত। ঘোরতর বিষয়াসক্ত। এ অঞ্চলের উত্তরাধিকারীহীন বৈষ্ণবদের মৃত্যু হলে তার সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হন তিনি। দক্ষিণা নিয়ে পাপীর পাপমোক্ষণ করে দেন। তাঁর বিগ্রহসেবা আছে, তাঁর বিগ্রহের জন্ত কিছু অলঙ্কার নিয়ে যাব আমি।

মাধবানন্দ নীরবে বিগ্রহের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পর ঘাড় নেড়ে বললেন, না। এমনি যেতে পার। অলঙ্কার নিয়ে নয়।

—গুরু মহারাজ!

বাইরে থেকে ডাকলে শ্যামানন্দ, তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠা দুইই রনরন করছে।

—কী? কেশবানন্দ বাইরে গেলেন।

—আরও পাঁচখানা গ্রাম থেকে লোক ফিরে আসছে গুরু মহারাজ। এখানে তারা গাড়ি গরু সব কেড়ে নিয়েছে। আমাদের সেবকদের মারপিট করেছে। সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। সুখবাজারে আমাদের সেবক যাদবানন্দের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তার অবস্থা ভাল নয়।

কেশবানন্দ কঠিন হয়ে উঠলেন, বিস্মিতও হলেন—একটা সামান্ত স্ত্রীলোকের এত প্রভাব! সিদ্ধাই! সিদ্ধাই তিনি জানেন! দীর্ঘকাল রাজকর্মে অতিবাহিত করেছেন, এ সব অনেক ঘেঁটেছেন। জানেন তিনি। উন্মত্তের মত চিৎকার কর, হাস, কাঁদ, ধুলোয় গড়াগড়ি দাও,

যা খুশি তাই বল—শুধু জোর করে বল, চিৎকার করে বল, অপর সকলের কণ্ঠস্বরকে চুপ করিয়ে দেবার মত জোর দিয়ে বল। তৎক্ষণাৎ লোকে তোমার কথা অলৌকিক বলে মেনে নেবে। সিদ্ধপুরুষ বলে খ্যাতি রটবে। কঠিন অথচ শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, কে লোক এসেছে? কোথায় সে? ডাক তাকে এখানে।

বিস্মিত হলেন কেশবানন্দ।

এসব গ্রামে ওই বৈষ্ণবী কিছু করে নি। করেছে অন্য লোক—ইলামবাজারের তুলোর গদির মালিক রমণ দাস-সরকারের বর্বর পুত্র, যে সেদিন কেন্দুলীতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী বর্গীদের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, যার নাকটা তারা ভেঙে দিয়ে গেছে, সেই অক্রূর সরকার। এবং বিস্ময়ের কথাটা হল এই যে, এই বৈষ্ণবীই অক্রূর সরকারের কার্যকলাপে বাধা দিয়েছে। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" যে বৈষ্ণবী চিৎকার করে লোককে এই রাধা-বর্জনকারী আশ্রমের জলসত্রকে বিষ বলে জল খেতে বারণ করলে, লোকজনকে জড়ো করে রাধানাম কীর্তন করে সারা অঞ্চলে মাতন তুললে, সে-ই অক্রূর সরকারের অত্যাচারের স্থানে এসে চিৎকার করে বললে—মহাপাপ। মহাপাপ হবে। বললে—ওই যে বর্বর পিশাচের মত চেহারা ওই যে সরকার, ও সাক্ষাৎ পাপ। সাক্ষাৎ অধর্ম। ওর কথায় তোমরা সন্ন্যাসীর গায়ে হাত তুলো না। জ্বলে যাবে সব, পুড়ে যাবে সব, মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যাবে সব। আমি বলছি। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

এ তো বিচিত্র ব্যাপার!

ভ্রূ-ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠল কেশবানন্দের। কী? ঘটনাটার মর্মস্থলে সত্য তা হলে কী?

মাধবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, চৈত্র-সংক্রান্তিতে সংকল্প করে জলসত্রের ব্রত গ্রহণ করেছি, সে তো ভঙ্গ করতে পারব না। এদিকে আমি ব্রত করেছি। প্রথম দিনের হোম হয়ে গেছে। আমি নিজেও তো ব্রত ছেড়ে যেতে পারব না। তোমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির কর—কী করা হবে। সংঘর্ষ আমি চাই না। কিন্তু সংঘর্ষের ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়ার অর্থ—পরাজয়। ব্রতভঙ্গের পরাজয় আর মৃত্যুতে পার্থক্য কোথায়?

কেশবানন্দ বললেন, কাল ভোরবেলা আবার এদের পাঠাব গুরু মহারাজ। অবশ্য ওই গ্রামগুলিতে নয়—অন্য গ্রামে। এবং ওপারে নয়—এপারে। শহর রানীগঞ্জ পর্যন্ত বাদশাহী সড়কের দুই পাশে এই জঙ্গলের পর মরুভূমির মত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে জলাভাবে পথিকের মৃত্যু ঘটে। ওদের সেই দিকে পাঠাব। আমরা হাত বাড়িয়ে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি না গুরুজী। আমরা এদিকে যে হাতটা বাড়িয়েছিলাম সেটা অন্যদিকে বাড়াচ্ছি।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, বর্বর অক্রূর সরকার এবং তার বাবা দাস-সরকারের সঙ্গে—হেতমপুরের বৃদ্ধ ফৌজদারের সম্পর্কটা সত্যই নিবিড়। হওয়াই স্বাভাবিক। দাস-সরকার নিজের স্বার্থের জন্য স্বজাতি-জ্ঞাতি-আত্মীয়-ধর্ম সমস্ত কিছুকেই বিপন্ন করতে দ্বিধা করে না। ব্রাহ্মণ রাঘব রায়ের বিদ্রোহ দমনের সময় দাস-সরকার অনেক সাহায্য করেছে হাতেম খাঁকে। হাতেম খাঁয়ের কাছে তারা আমাদের সম্পর্কে সংবাদও পাঠিয়েছে। সে সংবাদও আমি পেয়েছি। এক্ষেত্রে সেবকদের ওপারে পাঠানোর অর্থ—

—প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ! রক্তপাত!

—আমাদের তো রক্তপাতের অধিকার আপনি দেন নি। রক্ত আমাদের দিতে হবে। জীবনও যেতে পারে।

—কংসারির সেবকেরা কি ভীত কেশবানন্দ?

—ভীত নয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহাবীর কর্ণ যখন ভীষণ নাগাস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, তখন কংসারি—কপিধ্বজের অশ্বগুলিকে নতজানু করে, রথটিকে অবনত করেছিলেন—কর্ণের লক্ষ্যরেখার নীচে নেমে গিয়েছিল অর্জুনের মস্তক। ফলে অর্জুনের শিরস্ত্রাণই কাটা গিয়েছিল, অর্জুন ছিলেন অক্ষত। তাতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কলঙ্কও স্পর্শ করে নাই। আপনি এতে আপত্তি করবেন না।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে মাধবানন্দ বললেন, তোমার কল্যাণ হোক কেশবানন্দ। আজ তোমার কথায় এক মহাসত্যকে আমি উপলব্ধি করলাম।

—কী গুরু মহারাজ?

—কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি হয়, কার্যোদ্ধার হয়—কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। কৌশলের জন্মদাত্রী বুদ্ধি—তারই মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্যভাবে অবস্থান করছে—মিথ্যা। জীবনে যুদ্ধে হোক, সন্ধিতে হোক, বন্ধুত্বে হোক, যেখানে বুদ্ধিকে সর্বস্ব করবে, সেইখানেই মিথ্যা এসে রন্ধ্রপথে শনির মত প্রবেশ করবে। কৌশলে সত্যরক্ষার অধিকার কারও নেই। অবতারেরও নেই। না, নেই। তার জন্য অবতারকেও মাশুল দিতে হয়। তাতেও জের মেটে না, কাল থেকে কালান্তরে চলে দূষিত জলধারার মত।

ধীরপদক্ষেপে তিনি মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কেশবানন্দ একটু হাসলেন; গুরুকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তিনি বয়সে নবীন। তিনি তো জানেন না, এই হৃদয়, এই মানবহৃদয়—সে কত ছলনা করে!

কেশবানন্দ আবারও একটু হাসলেন। তিনি নিজের কথা ভাবছেন—তা থেকেই বুঝছেন। সর্বনাশের পর তিনি সত্য বৈরাগ্য বলেই পথে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সন্ন্যাসী-সংগঠনের মধ্যে ঢুকে একদা অনুভব করলেন মনের মধ্যে উঁকি মারছে—এক কঠিন প্রতিহিংসা। এই নবীন গুরুটির মধ্যে এক বিরাট নায়কের গুণ দেখে—এঁর কাছেই দীক্ষা নিয়ে সংগঠন শুরু করেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরও কিছুদিন পর। আষাঢ় মাস। রথযাত্রার দিন।

আশ্রমে বিশেষ আয়োজন। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা রথযাত্রা। মাধবানন্দের ইচ্ছা ছিল অনেক—বড় রথ তৈরি করে সেই রথে কংসারি কৃষ্ণকে চড়িয়ে অজয়ের বন্যারোধী প্রশস্ত বাঁধটির উপর রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। শুরু হোক মানুষের জীবনে নবীন যাত্রা; কিন্তু এতখানি করতে পারেন নি। হেতমপুরের ফৌজদার হাতেম খাঁয়ের বিরোধিতার

উদ্যোগের আভাস পেয়েছেন। ফৌজদার সন্দেহ করেছেন। হাতেম খাঁ সন্দিগ্ধপ্রকৃতির লোক। তার উপর ইলামবাজারের দাস-সরকার তাঁর সন্দেহকে উগ্র করে তুলেছে। বিশেষ করে তার সেই বর্বর পুত্রটা। তার সঙ্গে আছে সেই বৈষ্ণবীর বিচিত্র ব্যবহার। সেটাও স্থানীয় লোকের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নি।

হাতেম খাঁ রাঘবানন্দ রায়ের বিদ্রোহ দমন করার পর থেকে অত্যন্ত ধর্মদ্বেষী হয়ে উঠেছে। রাজনগরের রাজা বাদিওজ্জমান খাঁ ভাল লোক, কিন্তু নিজের ফৌজদার এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রজাতে অনেক প্রভেদ। বিচারে ভুল হয়। ভুল না হলেও প্রতিকারে অনেক বাধা। এই তো সুজাউদ্দিনের মত ধর্মে গোঁড়ামিহীন নবাব উড়িষ্যার জগন্নাথক্ষেত্রের উপর তকী খাঁর জুলুমের কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। তকী খাঁ অবশ্য সুজাউদ্দিনের পুত্র, কিন্তু পুত্র না হয়ে অন্য কেউ হলেও সম্ভবপর হত না। তকী খাঁর জুলুমের জন্যে পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথদেবের বিগ্রহ নিয়ে চিল্কা হ্রদের অপর পারে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে তকী খাঁর অকালমৃত্যু ঘটায় প্রতিকার সম্ভবপর হল। সুজাউদ্দিনের দ্বিতীয় জামাতা ঢাকা থেকে উড়িষ্যায় নায়েব-নাজিম হয়ে গিয়ে পুরুষোত্তমের রাজার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জগন্নাথদেবকে পুরীতেই রেখেছেন। সেটুকু নায়েব-নাজিমের ধর্মের উদারতার জন্যই শুধু নয় —জগন্নাথদেব চিল্কার অপর পারে গেলে যাত্রীর অভাবে উড়িষ্যার সমৃদ্ধির হানি ঘটত, নবাবী রাজস্বে ঘাটতি হত; নূতন নায়েব-নাজিমের বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। মূল কারণ সেইটাই। অনেক বিবেচনা করে মাধবানন্দ আশ্রমের পর্বপার্বণের সমারোহ—আশ্রমের প্রসার-চেষ্টাকে সংযত করেছেন। বিশেষ করে সমারোহের দিকটা। সমারোহের ধ্বনি বর্ণচ্ছটা এসব বড় উচ্চ। এগুলি লোককে শুধু মুগ্ধই করে না; ক্ষেত্রবিশেষে শঙ্কিত করে, ঈর্ষান্বিত করে। তবুও যাত্রী কম হয় নি। প্রায় হাজারখানেক লোক সমবেত হয়েছিল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রথের দিন বর্ষণটা এদেশে প্রবাদ-সম্মত। বৃষ্টি নাকি হতেই হয়। প্রবল হোক বা না হোক, দু-এক পশলা হবেই। তবুও এসেছে লোকজন ভিড় করে। রথে ভগবানকে দেখবে। মহাপুণ্য হবে। প্রসাদ পাবে। উৎসব সমারোহ বাদ্যভাণ্ড ধ্বজা পতাকা এসব বেশী না করলেও মাধবানন্দ অন্ন-মহোৎসবের দিকটা এতটুকু খর্ব করেন নি। দেশে অন্ন প্রচুর। কিছুদিন আগেও টাকায় আট মণ চাল ছিল। এখনও টাকায় সাত মণ। কিন্তু তবুও অন্নাভাব আছে। উদায়স্ত পরিশ্রম করে পাঁচ গণ্ডা কড়ি অর্থাৎ একটা পয়সা উপার্জন করাও অত্যন্ত কঠিন। কিছুদিন আগেই মুরশিদাবাদের এক বেগম পথে ভিক্ষুকদের দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, হতভাগ্যেরা কি দু বেলা পেটপুরে পোলাও খেতেও পায় না? নবাব বলেছিলেন, না। মধ্যে মধ্যে উপবাসও করতে হয়।

সম্ভবত বেগম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। উত্তরে বোধ করি নবাব নিজের কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, সবই নসীব বেগমসাহেবা। নসীবে না থাকলে জুটবে কী করে?

বেলা দুপহরের পর রথ চলল। তারপর আরম্ভ হল অন্ন-মহোৎসব। হরিধ্বনি দিয়ে বসে গেল প্রসাদপ্রার্থী অন্ন-ভিক্ষুর দল। বড় সমারোহ। পেটপুরে অন্ন, কাঁচাকলাইয়ের

ডাল, দুটো ব্যঞ্জন, তার উপর গুড়ের পায়েস এবং গুড়ের মণ্ডা। হরি হরি বোল। হরিধ্বনি আকাশ স্পর্শ করছে। ওদিকে সংকীর্তন চলছে। রাত্রি নামল। মশাল জেলে দেওয়া হল। তখনও দরিদ্র-ভগবানের ভোগ চলছে।

* * *

মাধবানন্দ পরিশ্রান্ত শরীরে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে ডাকলে, প্রভু!

—কে?

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল কয়ো বৈরাগী।

—কয়ো! আশ্রমে কে রয়েছে?

এসে দাঁড়াল একজন তরুণ শিষ্য।—গুরু মহারাজ!

—একে দুটি কড়্দক দিয়ো। তোমার ভোজন হয়েছে কয়ো?

—পেটভরে গোসাঁই। একদিন বলেছিলাম, এ আপনারা গয়াক্ষেত্র করেছ, এখানের অন্ন দেখি পিণ্ড। আজ পরমান্ন মণ্ডা খেয়ে পেট বোঝাই করেছি।

—শুনে খুব খুশী হলাম। তোমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দামোদর আছেন কয়ো।

—না প্রভু, কয়ো এঁটোকাঁটায় তুষ্ট। দামোদরের মত গেরাম বসতি জোর করে পেটে পুরতে পারে না। কয়ো অগস্ত্য নয়। কয়ো নেহাত মাঠের নালা। গাঁ-ধোয়া জলেই ভরে যায়।

হাসলেন মাধবানন্দ।

কয়ো বললে, একটা কথা বলব বলে দাঁড়িয়ে আছি গোসাঁই। নইলে এতক্ষণ কয়ো চলে যেত। খাওয়া হলে কয়ো দাঁড়ায় না।

—কথা? ও! সেই পাথরটি কার সন্ধান পেয়েছ বুঝি?

—না গোসাঁই।

—তবে?

—ছলনা করো না গোসাঁই, তুমি তো সিদ্ধপুরুষ। আমার কথা তুমি জান না, এই কী হয়?

—না কয়ো, আমি সিদ্ধপুরুষ নই। লোকের মনের কথা কেউ জানতে পারে কি না জানি না। তবে শুনেছি নাকি পারে। আমি পারি না। সিদ্ধপুরুষেরা যা যা পারেন বলে শুনেছ তার কিছুই আমি পারি না।

—তবে মা-জী পাগল হল কেনে গোসাঁই?

—কে? মা-জী কে?

—কেষ্টদাসী বৈষ্ণবী। ইলেমবাজারে আমাদের সম্প্রদায়ের মা-জী। সেদিন মধুকৃষ্ণা-তেরোদশীর দিন সেই গোসাঁই-সাজা বরগীর দল, যারা মা-বেটীকে ধরতে গিয়েছিল—

এক মুহূর্তেই সব স্মৃতিপথে উদিত হল। একটি দৃশ্যপটের মতই ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিও যোগ হল। স্মরণে এসে গেল। এই মেয়েই তো বৈশাখ মাসে জলসত্রের

সময়ে তৃষ্ণার জল উপেক্ষা করে চিৎকার করেছে, রাধাকে যারা কলঙ্কিনী বলে শ্যামের পাশ থেকে নির্বাসন দিয়েছে, খেয়ো না—তাদের জল কেউ খেয়ো না। আবার ওই বৈষ্ণবীই নাকি অন্যত্র তাঁর আশ্রমের সেবকদের রক্ষা করেছে ইলামবাজারের বর্বর ধনীপুত্র অক্রূরের অনুচরদের আক্রমণের হাত থেকে। চিৎকার করে বলেছে, তা হলে সর্বনাশ হবে। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এ চাকলা। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। খবরদার! খবরদার!

সে পাগল হয়ে গেছে? পরস্পর-বিরোধী আচরণ এবং উক্তি থেকে সেই সত্যই প্রকাশ পাচ্ছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু কয়ো তাঁকে দায়ী করে কেন? মা এবং মেয়েকে তাঁর স্পষ্ট মনে পড়েছে। তাদের তিনি বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করে সযত্নে নৌকোযোগে ইলামবাজারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। অকরুণা বা ক্রোধ এ তো তাঁর মনের মধ্যে উদয় হওয়ার কথা স্মরণ করতে পারছেন না।

ভ্রূকুঞ্চিত করে মাধবানন্দ বললেন, এ সব ভুল কয়ো। মেয়েটি পাগল হয়ে গিয়ে থাকলে ব্যাধিতে হয়েছে। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এমন কোন মহিমাও আমার নেই, যাতে আমার ক্রোধে ক্ষোভে কারও কোন অনিষ্ট হয়!

—কিন্তু হয়েছে যে গোসাঁই। মোহিনী বলছে আর কাঁদছে।

—মোহিনী কে? সেই কিশোরী মেয়েটি?

—হ্যাঁ গোসাঁই। কেষ্টদাসীও বলছে—ওরে, আমি ক্যানে গিয়েছিলাম রে! মণির ছটা দেখে, বিষধরের কথা ভুলে ক্যানে হাত বাড়িয়েছিলাম। জ্বলে গেল। বিষে আমি জ্বলে গেলাম। আমি বারণ করেছিলাম গোসাঁই। তেরোদশীর দিন যখন ওপার থেকে এখানে আসে—মালা নিয়ে ফুল নিয়ে ভেট নিয়ে, তখুনিই আমি বারণ করেছিলাম। আমিই বলেছিলাম। আমিই বলেছিলাম গোসাঁই, মণির লোভে ফণির গর্তে হাত বাড়িয়ো না মা-জী। মা-জী বলেছিল—ওরে কয়ো, সে ফণি হলে আমিও ফণিধরুনী। আমার মোহিনী-মন্তর আছে রে, আমার মোহিনী-মন্তর আছে। গোসাঁই, সে ওই মেয়ে মোহিনীকে তোমার পায়ে পূজো দিতে এসেছিল, ভোলাতে এসেছিল।

স্থির দৃষ্টিতে কয়োর দিকে তাকিয়ে রইলেন মাধবানন্দ। এ মেয়েটির মনের কথা তিনি না জানলেও এদের এ চরিত্রের কথা তো তাঁর অজানা নয়, এবং কৃষ্ণদাসীকে দেখে সেইদিনই তাঁর নিজের বাল্যস্মৃতির একটি ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়েছিল।

দৃষ্টি দেখে ভয় পেল কয়ো। সভয়ে মিনতি করে বললেন, আমার উপর রাগ করছ গোসাঁই?

—না। কিন্তু এসব কথা আমি শুনে কি করব? কেন বলছ?

—তোমার করুণার জন্যে গোসাঁই। তোমার মনের অজান্তে তোমার রাগ—

—রাগ আমি করি নি।

—মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে গোসাঁই। ওই পাষণ্ড অক্রূর—

কানে আঙুল দিয়ে মাধবানন্দ চলে গেলেন।

কয়ো কিছুক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন মনেই

বললে, বরাত। সবই বরাত।

—নাও। ধর। একজন সন্ন্যাসী এসে সামনে দাঁড়ালেন—কপর্দক!

কয়ো কপর্দক দুটি নিয়ে গামছার খুঁটে বাঁধছিল। বাঁধছিল আর ভাবছিল, সংসারে কপর্দক এক ফ্যাসাদ। লোকের কাছে কড়ি দুর্লভ সামগ্রী। কপর্দক তো সত্যকারের ধনসম্পদ। এ সে রাখবে কোথায়? মা-জী ভাল থাকলে—

—দাঁড়াও কয়ো।

—গোসাঁই!

—হ্যাঁ। তুমি এটি নিয়ে যাও। সেই নীলাটি।

—লোকে জানলে যে আমার গলা কেটে দেবে গোসাঁই। আমি রাখব কোথা?

—এক কাজ কর। এটি নিয়ে তুমি হেতমপুরে হাফেজ খাঁয়ের সঙ্গে দেখা কর। এ রত্নটি যদি তাঁদের হয় তবে পেলে খুশী হবেন। তখন যদি তুমি ওই মেয়েটিকে বর্বর অক্রূরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সাহায্য চাও তবে নিশ্চয় পাবে। যদি তাঁদের নাও হয় কয়ো, তা হলেও এটি নজরানা দিয়ে সাহায্য চাইলেও পাবে।

নীলাটি কয়োর হাতে দিয়ে মাধবানন্দ নিঃশব্দে গিয়ে আশ্রম-কক্ষে প্রবেশ করলেন। কয়ো অগত্যা ফিরল। হতভাগিনী মা-জী! হতভাগিনী মা-জীর পরিত্রাণের আর কোনও উপায় নেই। হায় মা-জী! সারা জীবনটাই তুমি অপচয় করলে! সারাজীবন! ভগবানের কম দয়া তো তোমার উপর ছিল না! তোমার শ্বশুর প্রেমদাসের এত বড় সিদ্ধপাটের মহিমা—তুমি পেয়েছ। সিদ্ধি তোমার হাতের মুঠোয় ছিল। সে ফেলে দিয়ে তুমি—! আঃ, সহ্যশক্তি তোমার একেবারে নাই! দেবতা গোসাঁই মান না তুমি!

* * *

সেদিন অর্থাৎ ওই সন্ন্যাসীদের হাঙ্গামার দিন মাধবানন্দ ওদের মা-মেয়েকে নৌকো করে ইলামবাজার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে ছিলেন। নৌকোয় সারাক্ষণ কেষ্টদাসী যেন পাথরের মত বসে ছিল। মোহিনী মায়ের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি দেখে বার কয়েকই মৃদুস্বরে মাকে ডেকেছিল, মা—মা! মা গো! কিন্তু কেষ্টদাসী উত্তর দেয় নি, পলকও পড়ে নি তার চোখে।

ইলামবাজারের ঘাটে নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে যেন প্রথম তার সচেতনতা ফিরেছিল। চোখে একটা আগুনের ঝলক যেন দপ করে জ্বলে উঠল। ঘাটে নেমে অজয়ের ওপারের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে নিম্নস্বরে বললে, আমরা এত পাপী? এমন অচ্ছুৎ? তোমার পা ছুঁলে তোমার শরীরে জ্বালা ধরত? তোমার পায়ের রঙ কালো হয়ে যেত? তোমার পুণ্যের এত অহঙ্কার? তুমি রাজার ছেলে, তুমি পুণ্যাত্মা আর আমরা ভিখারী বৈরেগী বাউল বষ্টুম বলে—

মোহিনী ভয় পাচ্ছিল গোড়া থেকেই। আর সে সহ্য করতে পারে নি, সভয়ে সে মায়ের হাত ধরে তাকে ডেকেছিল, মা, মা গো! হাত ধরে তাকে নাড়া দিয়েছিল।

এবার চকিত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনেছিল এবং খপ করে মেয়ের হাত ধরে বলেছিল, আর তুই?

তারপরই তাকে প্রায় টানতে টানতে পথ চলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ বলেছিল, কচি খুকী! তুইও কচি খুকী।

মোহিনী সভয়ে বলেছিল, আমি কী করলাম?

—ক্যানে তু মালা নিতে হাত বাড়িয়েছিলি?

—আমি মনে করলাম আমাকে দেবে গোসাঁই।

—চোখ দুটো জলজল করছিল ক্যানে তোর? নৌকোয় ক্যানে এমন করে তাকিয়ে কাঁদছিলি? আমি ভাবতাম, মেয়ে আমার সত্যিই কচি খুকী। ভাবতাম, হাবাগোবা। তুমি খুব সেয়ানা!

কুৎসিত কথা বলতে শুরু করেছিল কেষ্টদাসী। মোহিনী বিবর্ণ মুখে বলেছিল, মা গো, ওসব বলিস না মা গো। তোর পায়ে পড়ি গো।

তবুও ক্রোধের শান্তি হয় নি কেষ্টদাসীর।—জানি, ওই রাজার ছেলে ভণ্ড গোসাঁইদেরও আমি জানি। আমি তো কিশোরী নই। আমি তো কুঁড়ি নই। তাই আমি অদ্ভুত। আর চাঁপার কলির দিকে চাউনি, সে চাউনিতে—

কুৎসিত উপমা দিয়ে কথা শেষ করলে সে। তারপর আবার বললে, এই পুন্নিমেতেই তোমাকে অক্রুর চণ্ডালের আটচালায় উচ্ছুগ্‌গু করব আমি।

এবার কেঁদে উঠল মোহিনী।—মা গো! না গো, না—না—; আমি মরে যাব গো! আমি মরে যাব।

সন্ধ্যার পর কেষ্টদাসী কয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গিয়েছিল রমণ সরকারের বাড়ি। অক্রুরকে দেখবার অছিলা করে তার কাছে প্রতিশ্রুতি নিতে গিয়েছিল। ভিতরটা তার অপমানে ক্ষোভে জ্বলে যাচ্ছিল যে। এত বড় আঘাত সে জীবনে পায় নি। এমন কি, তাদের সমাজের উপর প্রতিপত্তি নিয়ে, যার সঙ্গে তার শ্বশুরের মৃত্যুর পর থেকে ছোটখাটো কত ঝগড়া হয়ে গেল, সেই সুপুরের আনন্দচাঁদ ঠাকুরের কাছেও পায় নি। আনন্দচাঁদ ঠাকুরও ব্রহ্মচারী। বৈষ্ণবী-শক্তি নিয়ে ভজনপূজন তিনিও করেন না। অথচ বৈষ্ণবী বলে ঘেন্নাও করেন না। ঠাকুরের সাধন সে এক বিচিত্র ভাবের সাধনা। তিনি বৃন্দার মত স্নেহ করেন শ্রদ্ধা করেন বৈষ্ণবদের। ঠাকুরও মহৎ বংশের ছেলে। নিজে আজ রাজাবিশেষ লোক। তাঁর বাড়িতেও যুগল-বিগ্রহ আছে। শিষ্যসেবকদের সংখ্যা নেই। তা ছাড়া নিঃসন্তান বৈষ্ণবদের সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী। সিদ্ধাই-পাওয়া সিদ্ধপুরুষ।

খুসটিকুরির পীরতুল্য সিদ্ধপুরুষ হজরৎ হোসেন সাহেব একবার আনন্দ ঠাকুরের শক্তি পরীক্ষার জন্য বাঘের পিঠে চড়ে দেখা করতে এসেছিলেন। সঙ্গে উপঢৌকন এনেছিলেন সোনার থালায় সুন্দর থাঞ্চিপোশে ঢেকে হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস। আনন্দ ঠাকুর তখন একটা ভাঙা পাঁচিলের উপর বসে কাজকর্ম দেখছিলেন। হজরৎ বাঘের পিঠে সুপুরের প্রান্তে উপস্থিত হতেই ঠাকুর পাঁচিলকে বললেন, চল। পাঁচিল চলতে লাগল, এসে হাজির হল গ্রামে ঢোকবার প্রবেশপথে। হজরৎ অবাক হলেন। তাঁর আর সাহস হচ্ছিল না হিন্দুর নিষিদ্ধ

মাংস উপঢৌকন দিতে। কিন্তু ঠাকুর বললেন, ও কী হজরৎ, আমার জন্তে এমন সমাদর করে উপঢৌকন এনে আমাকে না দিয়ে আপনি লুকোচ্ছেন কেন? না না না, দিন দিন। বলে থালাখানি প্রায় কেড়ে নিয়ে থাঞ্চিপোশ খুলে ফেললেন। সে অবাক কথা, সাধারণ মানুষ ছার, হজরৎ সাহেবই অবাক হয়ে দেখলেন—থালায় মাংস কোথায়! মাংস নেই; তার পরিবর্তে রয়েছে সন্ত-ফোটা একরাশি লাল পদ্ম-পুষ্প; তার গন্ধে চারিপাশে মৌমাছি এসে জমতে লাগল।

এমন আনন্দ ঠাকুরের কাছে নবীন গোসাঁই তুমি? তোমার এত অহঙ্কার? কেষ্টদাসীও সিদ্ধপাটের অধিকারিণী, তার হুকুমে পাঁচিল না চলুক, বাঘ তার বশ না মানুক, ইচ্ছে করলে সে বাঘিনী হতে পারে, কালনাগিনী হতে পারে। নবীন গোসাঁই, তুমি কালনাগিনীর মাথায় পা দিয়েছ। লখাইয়ের রূপ দেখে বিমোহিত হয়েও কালনাগিনী লাথি খেয়ে আক্ষেপ করে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে দংশন করেছিল, কেষ্টদাসীও ঠিক তাই বলে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে তোমাকে দংশাবে।

সাক্ষী থেকো, চন্দ্র-সূর্য।

পা ভেঙে অক্রুর বিছানায় শুয়ে ষাঁড়ের মত চিৎকার করছিল। সত্যই ষাঁড়ের মত; কণ্ঠস্বরে তার মানুষের মাধুর্যের চেয়ে জন্তুর, বিশেষ করে ষাঁড়-মহিষের, কর্কশতার আভাসই বেশী। যন্ত্রণার অভিব্যক্তির সঙ্গে তখনও পশুর মত ক্রোধের প্রকাশ সমানে চলেছে। অকারণে এই কারণে যে, ক্রোধের যারা লক্ষ্য তারা তখন বহুদূরে, ছদ্মবেশী বর্গী সন্ন্যাসীরা তখন অন্তত বনে বনে দশ-বারো ক্রোশ পথ নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে চলে গেছে। বিছানায় পড়ে অক্রুর তাদেরই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে চলেছে। এবং মধ্যে মধ্যে পশুর মতই নিজের ভাঙা পা-টাকেই খামচে ধরতে চেষ্টা করছে।—শালার পা! ওঃ!

কেষ্টদাসীকে দেখে সে খানিকটা শান্ত হল। মোহিনীর মা তাকে দেখতে এসেছে! তার উপর কেষ্টদাসীর বিরূপতা সে জানে। সেই কেষ্টদাসী আজ সদয় হয়ে দেখতে এসেছে এ কি কম কথা! কুৎসিত দুপাটি দন্ত বিস্তার করে অক্রুর বললে, মা-জী, এস।

তারপরেই সে আর-এক দফা চিৎকার করে উঠল। যাত্রাদলের ভীমের মত ক্রুদ্ধ চীৎকারে বলে উঠল, এবার পেলে শালাদিগে আমি—

দাঁতে দাঁত ঘষে কড়মড় শব্দ করে বললে, শালাদিগে চিবিয়ে খাব আমি। তার মনে পড়ে গেল বর্গীদের হাতে মা-জী এবং মোহিনীও চরম লাঞ্ছিত হতে হতে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছে।

—ওই শালা বর্গী গোসাঁইদের।

এর পর বর্ষণ করলে সে এক দফা অশ্লীল গালিগালাজ।

কেষ্টদাসী বললে, আছ কেমন?

—শালার পা-খানা ভেঙে গিয়েছে। হাড় ভেঙেছে। কবরেজ হাড় জোড়া দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। পাজী বেটারা বদ্যিনাথের ঘোড়া বানিয়ে দিয়ে গেল—ডান পাটা লটোর-পটোর বাঁ পাটা খোঁড়া, বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া। বলেই হি-হি করে হাসতে লাগল।

তার পরই হাত বাড়িয়ে অনুচরকে বললে, দে রে বেটা, বোতল দে। সেই মুরশিদাবাদের আমদানি কড়া জিনিসটা। শালা মদ খেয়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নাই।

মদ খানিকটা গিলে বললে, শোন মা-জী। একটা কথা বলি তোমাকে।

কেষ্টদাসী বললে, তোমার সঙ্গে আমারও কথা আছে অক্রুর। তোমার চাকরবাকরকে বাইরে যেতে বল।

—এই শালা শূয়োরের বাচ্চারা, যা—যা—বাইরে যা। দোর দিয়ে দে রে আবাগীর ব্যাটারা! তারপর—শোন মা-জী। আমার কথাটা আগে শোন। তোমার কথা পরে শুনব। মোহিনীকে তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দাও। সে গায়ে হাত বুলোবে। তাতেও আমার আরাম হবে। নরম কচি হাতের হাতবুলুনি ভারি ওষুধ।

তারপরেই শাসনের ভঙ্গিতে বললে, না দিলে—হুঁ—হুঁ। বুঝতে পারছ? হম অক্রুর হ্যায়। তার নিজের সম্পর্কে রচনা করা মহিম্নস্তোত্রটি সে আউড়ে দিল—

হম অক্রুর হ্যায়। লেকিন দুনিয়া বোলতা হম ক্রুর হ্যায়—জবরদস্ত শূর হ্যায়। শুনো মা-জী, কাজীকে দরবার দূর হ্যায়; বহুত কাজী হম দেখা হ্যায়। জেব মে রূপেয়া হ্যায়। কাজী হাজী গাজি পাজী সবই ইস্‌মে রাজী হ্যায়। এইবার সহজ বাংলায় বলি—শোন মা-জী, সহজে তুমি রাজী না হলে—আমি আজই লোক পাঠিয়ে মোহিনীকে তুলে আনাব, হাঁ। বলেই সে নিজের এ হেন কাব্যপ্রতিভায় উদ্দীপ্ত হয়ে হা-হা করে হেসে উঠল।

দাসী সহজে ভয় পায় না। জীবনে সে অনেক দেখেছে। সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, আমি তোমাকে ডাকিনী বিদ্যেতে বাণ মেরে পেড়ে ফেলব ছোট সরকার। বর্গীরা পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে, সে সারবে—খুঁড়িয়ে হলেও চলতে পারবে। আমার বাণে তোমাকে চিরজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে; বোবা সুদ্ধ করে দেব আমি। আমার শ্বশুরের সিদ্ধাই হারায় নি, সে আমার কাছে আছে।

এবার ভয় পেলে অক্রুর। হৈ-হৈ করে দেঁতো হাসি হেসে সে কেষ্টদাসীর একটু তোষামোদ করেই বললে, না—না—না। ও আমি তামাশা করে বলছিলাম মা-জী। তুমি যে বাবার সেবাদাসী, নইলে তোমাকেই বলতাম, তুমিই থাক দাসী, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

কেষ্টদাসী মেঝেতে থুতু ফেলে বললে, মাছের মধ্যে হাঙর, পাখির মধ্যে শকুনি, জন্তুর মধ্যে বুনো শুয়োর, পোকার মধ্যে মাছি, আর মানুষের মধ্যে তুমি ছোট সরকার—তোমাদের তুলনা নাই। কিন্তু তবু তোমার হাতে মোহিনীকে আমি দেব। আজ বলি তোমাকে, এতদিন—দেব দেব মুখে বলেছি কিন্তু মনে ঠিক করেছিলাম, দেব না। কিছুতেই না। দরকার হলে পালাব। কিন্তু আজ সত্যি করে বলছি, দেব—দেব—দেব। তবে এক শর্তে।

—কত টাকা?

—টাকা নয়।

—বেশ, সম্পত্তি?

—না, তাও নয়।

—তবে ?

—কেন্দুলীর ওপারে গড়জঙ্গলে এক নূতন গোসাঁই এসেছে—

—হ্যাঁ। কোথাকার রাজার ছেলে। সেই তো—

বাধা দিয়ে কেষ্টদাসী বললে, মহারাজার ছেলে হোক, দেবতা হোক ওকে যদি অপমান করতে পার, বাজারের নটী দিয়ে যদি অপমান করাতে পার, তা হলে—শুধু তা হলে তোমার হাতে মোহিনীকে দেব।

অক্রুর জীবনে কোন কাজেই হিসেব করে না, খতিয়েও বোঝে না, শুধু নির্বোধের মত প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্মে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে; মন্দ কাজ হলে তার সঙ্গে জোটে তার বর্বর উল্লাস। বর্বর উল্লাসের সঙ্গেই সে বললে, আঃ! হায়! হায়! হায়! হম পা ভাঙকে—বিস্তারামে পড়া হুয়া হ্যায়, নেহি তো—। আচ্ছা, আভি! আভি! আভি! আভি নটীর দল হম ভেজুঙ্গা উসকো মঠমে। উলোক—লেংটা নাচ নাচকে মু-মে থুক্ দেকে চলা আয়েঙ্গী।

—না। ইলেমবাজারে ওকে আসতেই হবে—কোন-না-কোন কাজ পড়বেই। তখনই —এই বাজারে।

—বহুত আচ্ছা। তাই হোগা। বলেই সে নিজের বুকে তবলার বোল বাজিয়ে দিয়েছিল: তেটে খেটে—। ওটা তার একটা স্বভাব। বেশী খুশী হলেই সে বুকে তবলা বাজায়—তেটে খেটে তেটে খেটে—কত্তে গদি ঘিনি ধা।

হঠাৎ কিন্তু তবলা বাজানো বন্ধ করে কেষ্টদাসীর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে বলেছিল, কিন্তু মা-জী!

—কী ?

—ওই গোসাঁই-ই তো তোমাদের আজ—

—বর্গীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ? হ্যাঁ, বাঁচিয়েছে।

—তবে ?

—তোমার কি মনে 'কিন্তু' হচ্ছে অক্রুর ?

হা-হা করে হেসে অক্রুর বলেছিল, আমার মনে কিন্তু। আমি পড়ে গেলে ওই গোসাঁই আমার হাত ধরে তুলতে এসেছিল, আমি গাল দিয়ে তার মুখে থুতু দিয়েছি। আমার কথা নয়। তোমার কথা। তোমার হল কী ?

—সে আমাদের অপমান করেছে অক্রুর! আমি তার শোধ চাই। এই শোধ যে নেবে তাকেই দেব আমি মোহিনীকে।

—কী অপমান করেছে ? অপমানটো কেমা গো ?—হি-হি করে হেসে উঠল অক্রুর: বলি, মতলব নিয়ে গিয়েছিল বুঝি ? পাকড়াবার মতলব ?

কঠিন দৃষ্টিতে অক্রুরের দিকে তাকিয়ে কেষ্টদাসী বলেছিল, সে তুমি বুঝবে না অক্রুর। তবে এইটি জেনে রেখো, সে থাকতে মোহিনীকে তুমি পাবে না। আমি তাকে পাকড়াতে পারি বা না পারি, সে পাকড়েছে আমার বেটীকে। হারামজাদী মজেছে, অক্রুর।

বলেই চলে এসেছিল কেষ্টদাসী। কয়ো বাইরে বসে প্রায় সকল কথাই শুনেছিল। সে

বলেছিল মোহিনীকে। বলেছিল, মোহিনী, তু সাবধান হ। তু বরং ওই মাধবদাসের সঙ্গে পালিয়ে যা। তোর মা তোকে জবাই করবে রে।

মোহিনী ভয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

কয়ো জীবনে কাউকে কখনও সান্ত্বনা দেয় নি—দিতে পারে না; তার নিজের কোন ভাবনা নেই বলে তার ভয়ও নেই। ভয় যে-পথে আছে সে-পথে সে হাঁটেই না। ভূত প্রেত পিশাচের ভয় তার নেই, কারণ তাদের সে ভক্তি করে প্রণাম করে। সাপের ভয় সে করে না, কারণ সে সাপ ধরতে পারে—সাপের ওঝা; জলকে সে ভয় করে না, কারণ সে সাঁতার দিতে পারে কুমীরের মত। ভয় করে আগুনকে, ভয় করে ঝড়কে, আর ভয় করে মানুষকে, মানুষের মধ্যে বিশেষ করে সাধু-সন্ন্যাসী সিদ্ধ-পুরুষদের আর রাজপুরুষদের আর ডাকাতদের। সিদ্ধপুরুষদের প্রণাম করে তাদের এড়িয়ে চলে, রাজপুরুষদের ত্রিসীমানায় হাঁটে না ডাকাতদের—সীমানা এড়াবার জন্য দুটি কপর্দকও সে নিজের কাছে রাখতে চায় না। কাজেই; তার দুঃখ নেই—কারুর কাছ থেকে তার সান্ত্বনার প্রয়োজন হয় না, সে কারুর কাছ থেকে সান্ত্বনা-বাক্য শোনে নি। অপরের দুঃখে শোকে সে কখনও কাছে যায় না: কেউ কাঁদলে দূরে দাঁড়িয়ে শোনে, বেশী দুঃখ অনুভব করলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে নদীর ধারে বা বনের কোন গাছতলায় চুপ করে বসে থাকে। বাক্য সে খুঁজে পায় না। সেদিন কিন্তু কয়ো মোহিনীর কান্না দেখে দুঃখ অনুভব করেও পালিয়ে যায় নি। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ভয় কি মোহিনী! কাঁদিস না। আমি তোকে বলছি, আমি বেঁচে থাকতে ওই অক্রূর অসুরকে তোর গা ছুঁতে আমি দোব না।

মোহিনী তার হাত দুটি ধরে বলেছিল, তা হলে কয়ো, তুই ওপারের গোসাঁইকে বলে আয়—গোসাঁই যেন ইলেমবাজারে না আসে। পায়ে ধরে বলিস কয়ো—গোসাঁই এসো না, এসো না, ইলেমবাজারে তুমি এসো না। ওই অক্রূরকে তুমি জান না—সে ভয়ঙ্কর—সে রাক্ষস—সে সব পারে। কিন্তু কী? কী? কী দেখছিস কয়ো? কথা হচ্ছিল খিড়কির দিকের ফুলবাগিচার মালতীলতার কুঞ্জটার মধ্যে; স্থানটা বেশ আড়াল। কয়ো হঠাৎ উঠোনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছে কিছু দেখে। মোহিনী তাই প্রশ্ন করেছিল, কী? কী? কী কয়ো?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কয়ো উঠোনের ও-মাথাটা।

উন্মাদিনীর মত ঘুরছে কেষ্টদাসী। চুল এলিয়ে পড়েছে, গায়ের কাপড় মাটিতে লুটোচ্ছে, আকাশের দিক মুখ করে সে ঘুরছে।

ফিসফিস করে কয়ো বললে, 'বাট' বইছে বোধ হয়!

'বাট বওয়া' ডাকিনী বিদ্যার অঙ্গ। প্রেমদাস বাবাজীর বোষ্টুমী, মোহিনীর পিতামহী ছিল কামরূপের মেয়ে। বাবাজী গিয়েছিল মণিপুর, সেখান থেকে ফেরার সময় নিয়ে এসেছিল বোষ্টুমীকে। লোকে বলে, কেষ্টদাসীও বলে, শাশুড়ী ডাকিনী বিদ্যা একটি কৌটোয় পুরে রেখে গিয়েছিল—সেই কৌটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যা কেষ্টদাসীর আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধাই, সেও নাকি ডাকিনী-সিদ্ধির সিদ্ধাই। সে সিদ্ধাই আছে আখড়ার

গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের আইনকে আশ্রয় করে। আশীর্বাদ আছে—তিন বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন হলেই, ওই গৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে ফুল-জল দিলেই, দু বেলা আরতি করলেই সে সিদ্ধাই নিশ্চয় পাবে। সে সিদ্ধাই কেউ কেউ বলে কেষ্টদাসী পেয়েছে। কিন্তু কয়ো জানে, না, সে সিদ্ধাই পায় নি এখনও মা-জী। মা-জী নিজে শাসায় লোককে শাশুড়ীর ডাকিনী বিদ্যার জোরে। ডাকিনী বিদ্যাকে জাগাতে হলে বাট বইতে হয়। তার শুরুটা ঠিক এই রকম। এর পর গভীর রাত্রে চারিদিক নিযুতি হলে মা-জী মাথা নিচু দিকে করে পা উপরের দিকে তুলে হাতের উপর হেঁটে বেড়াবে। সারা অঙ্গে একগাছি সুতো বলতে কিছু থাকবে না। সে সময় কেউ যদি সামনে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে এবং তাতেই হবে তার সুনিশ্চিত মৃত্যু।

মোহিনী সভয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল; কয়ো তার হাতখানা মুখে চাপা দিয়ে বলেছিল, চুপ। আয়, ঘরে আয়। ও দেখতে নাই। পালিয়ে আয়।

সারাটা রাত্রি মোহিনী আতঙ্কে অভিভূত হয়ে মাটির মূর্তির মত বসে ছিল।

তখন বোধ হয় শেষ রাত্রি, কারণ তখন চাঁদ উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী-রাত্রির চাঁদ। ছাব্বিশ দণ্ড পার হয়ে গেছে। একটা কাতর আর্তনাদ শুনে মোহিনী চমকে শিউরে উঠেছিল।

—এ আমি কী করলাম! এ আমি কী করলাম রে!

তারপর শব্দ উঠেছিল যেন প্রহারের শব্দ। কেউ যেন কাউকে প্রহার করছে।

চিৎকার করে মোহিনী ডাকতে গিয়েছিল, মা! মা গো! কিন্তু বাড়ির বাইরের দিক থেকে শুনতে পেয়েছিল কয়োর কণ্ঠস্বর। কয়ো বাড়ির বাইরে দাওয়ায় শুয়ে ছিল। সে সন্তর্পিত কণ্ঠে মোহিনীকে ডাকছিল, মো-হি-নী! মো-হি-নী!

নিস্তব্ধ নিষুতি রাত্রি। তার মধ্যে এ ডাকে ব্যঞ্জনা দ্বিগুণিত হয়ে উঠেছিল—সাবধান মোহিনী! উঠিস না! দোর খুলিস না। ডাকিস না। খবরদার!

কয়োও শুনতে পেয়েছিল এ আর্তনাদ।

আর্তনাদ তখনও শেষ হয় নি। সেই মুহূর্তেই আবার আর্তনাদ উঠেছিল, রক্ষা কর—তুমি রক্ষা কর ঠাকুর—মহাপ্রভু—হে গৌরাঙ্গ—দয়াল—তুমি রক্ষা কর।

সকালে উঠে মোহিনী সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এসে উঠোনের চারিদিক চেয়ে দেখেও মাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু নীচে নেমে আসতেও তার ভরসা হয় নি। কয়ো একটা গাছের উপর চড়ে তারই একটা ডাল বেয়ে অন্য একটা গাছের ডাল বেয়ে পর পর কয়েকটা গাছ অতিক্রম করে এসে নেমেছিল বাড়ির মধ্যে। এ বিদ্যাতে কয়ো বানরের চেয়েও পটু, কাঠবিড়ালীর মত। তারই সাহসে নেমে এসে মোহিনী মাকে আবিষ্কার করেছিল। কেষ্টদাসী পড়ে ছিল ঠাকুরঘরে—বিগ্রহের সম্মুখে। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সে-ঘুম ভেঙেছিল কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে। ও-পাড়ায় মন্দিরে মঙ্গলারতি হচ্ছে। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে কেষ্টদাসী উঠে বসেছিল। কেষ্টদাসীর চোখ দুটি তখন যেন লাল হয়ে উঠেছে। ঘুম ভেঙে উঠেও সে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি।

—মা! মা গো! অনেক সাহস সঞ্চয় করে ডেকেছিল মোহিনী।

কন্যার দিকে সেই নিষ্পলক দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়েছিল কেষ্টদাসী।

—মা! মা! এবার গায়ে হাত দিয়েছিল মোহিনী।

কেষ্টদাসী দুই হাত বাড়িয়ে মেয়েকে বুকে জাপটে ধরে যেন আপন-মনেই বলে উঠেছিল, না—না—না। দেব না। আমি দেব না।

কয়ো বাইরে নীরবে দাঁড়িয়েছিল। সে তখন বলেছিল, মা-জী, তোমার এ চেহারা মোহিনী সহ্য করতে পারবে না মা-জী। তুমি তোমার সিদ্ধাইরূপ সামলাও মা-জী।

—কয়ো!

—হ্যাঁ মা-জী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কেষ্টদাসী।

—ওঠ। চান কর। প্রভুর আরতি কর। বাল্যভোগ দাও। প্রসাদ লাও। দেরি করো না মা-জী। এখনি পাড়া-ঘরের সকলে আসবে। বাউলরা আসবে গান গাইতে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে উঠেছিল কেষ্টদাসী। দিনের আলোয় যেন অনেকটা আত্মস্থ হয়েছে তখন। আলনা থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল খিড়কির পথে। কিছুক্ষণ পরে খিড়কির ডোবাটাতেই স্নান সেরে এসে কাপড় ছেড়ে গিয়ে আবার ঢুকেছিল মন্দিরে।

তারপর সে পূজা—তার অদ্ভুত পূজা। এ পূজারিণী কেষ্টদাসী যেন নূতন কেষ্টদাসী; সে পুরনো মানুষই নয়। খাওয়া ভুলে, ঘর-সংসার সব ভুলে প্রায় সারাদিন সে পূজাই করেছিল; পান-দোক্তা পর্যন্ত খায় নি। খেয়েছিল শুধু বারকয়েক ছোট কল্কেতে বড় তামাক। অবসর সময়ে ভাম হয়েই বসেছিল।

সন্ধ্যার সময় মোহিনী ভয় পেয়ে কয়োকে বলেছিল, আবার যে রাত নামল কয়ো! আজ যে অমাবস্যে!

কয়ো বলেছিল, চুপ করে থাক মোহিনী। চুপ করে ঘরে বসে থাক। এর উপায় নাই।

—কেন এমন হল কয়ো?

—বুঝতে পারছি না মোহিনী। বুঝতে পারছি না। ওর সব যেন ওলটপালট হয়ে গিয়েছে মনে লাগছে। এ তো বাট বওয়ার মত লাগছে না। ডাকিনী বিদ্যে জাগা তো নয় এ।

ঠিক এই সময়েই কেষ্টদাসীর তীব্র ক্রুদ্ধ চিৎকারে শান্ত আখড়াটির সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণ-মৌন পরিবেশটি চিরে যেন ফালিফালি হয়ে গিয়েছিল।

কেষ্টদাসী চিৎকার করে উঠেছিল, না—না—না। বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা হারামজাদারা।

খিড়কির দরজায় চিৎকার! কয়ো উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছিল ঘটনাটা। দেখে বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বেড়ে গিয়েছিল তার। মা-জীর জন্যে দাস-সরকারের কুঞ্জ থেকে ডুলি এনেছে দাস-সরকারের খাস পাইক কালু। কালুকে গালাগাল দিচ্ছে মা-জী। ডুলি ফিরিয়ে দিচ্ছে

মা-জী। বলছে, বেরিয়ে যা হারামজাদারা—বেরিয়ে যা।

কেষ্টদাসী তখনও চিৎকার করছিল, বেরিয়ে যা, নইলে আমি শাপান্ত করব।

কালু যেন তবুও কিছু বলছিল। কেষ্টদাসী ছুটে গিয়ে বিগ্রহের ঘরে ঢুকে চিৎকার করছিল, আয়! আয়! কই, আয় দেখি! আমি—আমি পেড়ে ফেলব—আমি শাপান্ত করব।

কালু এবার সভয়ে ডুলি নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর। দাস-সরকার এসেছিল নিজে।—কেষ্টদাসী!

কেষ্টদাসী আবার চিৎকার উঠেছিল, না।

—তোমার হল কী? কখনও তো এমন কর না। তা ছাড়া ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে—

দাসী বলেছিল, ধর্ম আমি জানি দাসজী, আর ধর্মে কাজ নাই দাসজী। তুমি আমাকে রেহাই দাও। রেহাই দাও।

—দাসী! কেষ্টদাসী!

—তোমাকে হাতজোড় করছি। জোড়হাত করছি। তুমি যাও।

—তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে তো আমি যাব না। তা হলে তো তুমি ডুলি ফিরিয়ে দিয়েছ তাতেই মিটে যেত। বিবেচনা কর, আমি নিজে এসেছি কেষ্টদাসী।

—আমি যাব না দাস-সরকার।

—না গেলে তোমার প্রত্যবায় হবে দাসী। সাধনের ব্যাপার। তুমি তো না-জানা নও। ধর্ম তোমাকে ক্ষমা করবে না। অনিষ্ট হয়ে যাবে।

—হোক। তাই হোক। আমার সর্পাঘাত হোক, আমার ব্যাধি হোক। আমি যাব না।

—যেতে তোমাকে হবে। আমার লোক তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

—তুলে নিয়ে যাবে? তুলুক দেখি, কে পারে?

বলেই সে ছুটে গিয়ে গৌরাঙ্গমূর্তির পা দুটি জড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। বলেছিল, এই পা ছাড়িয়ে নিয়ে যাও আমাকে। দেখব!

এর পর দাস-সরকার নীরবে উঠে গিয়েছিল। কৃষ্ণদাসী সেই চতুর্দশীর সন্ধ্যা থেকে অমাবস্যার রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেবতার চরণ ছেড়ে ওঠে নি।

যখন উঠল, তখন চোখ দুটো তার জবাফুলের মত লাল।

মোহিনী শিউরে উঠেছিল মাকে দেখে। মা ভ্রূক্ষেপ করে নি। অজয়ে স্নান করে এসে প্যাটরা খুঁজে শাশুড়ীর অর্থাৎ সিদ্ধবাউল প্রেমদাসের সেবাদাসীর অতি জীর্ণ গেরুয়া কাপড়খানা পরে পুজোর ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মোহিনী! মোহিনী! আন্ তো জাঁতিখানা—

মোহিনীর হাত থেকে জাঁতিখানা নিয়ে নিজের চুলের প্রান্তভাগ তার হাতে দিয়ে বলেছিল, ধর্। তারপর নিজের হাতে চুলের রাশি কেটে, নিজের হাতে সেগুলি খিড়কির ডোবায় ফেলে দিয়ে এসেছিল।

শিষ্যেরা এখানেও একটি জলসত্র খুলেছিল, হৈ-হৈ সেখানেই।

অক্রুরের অনুচরেরা এখানে তাণ্ডব শুরু করেছে তখন।

অক্রুরের মস্তিষ্ক মাধবানন্দকে অপমানের উপায়-উদ্ভাবনেই চিন্তান্বিত ছিল। কৃষ্ণদাসীই তার মস্তিষ্ককে এ বিষয়ে সক্রিয় করে দিয়েছে সেদিন। ওই শর্তে সে মোহিনীকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু নিজে সে শয্যাশায়ী তাই এতদিন একটা কিছু করে উঠতে পারে নি। সাধারণ লোক হলে এতদিন যাহোক একটা কিছু হয়ে যেত। কিন্তু মাধবানন্দের আশ্রমবাসীরা সেদিন, ওই নাগা সন্ন্যাসীই হোক আর ছদ্মবেশী বর্গীই হোক, তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। সাধারণ লোক হলে অক্রুরের অনুচরেরা এতদিন কোন্‌দিন হা-রে-রে শব্দ করে তার বাড়িতে হানা দিয়ে ঘরের চালখানা উল্টে দিয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসত। এবং সারা ইলামবাজারের বাজারটায় হয় কান ধরে, নয় গলায় গামছা দিয়ে টেনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। নবাবী শাসন খুবই কড়া। নবাব সুজাউদ্দৌল্লা, শ্বশুর মুরশিদকুলি খাঁর শাসনকে ঠিক বজায় রেখেছেন। কিন্তু অক্রুর বলে, বাবা নাম দিয়া, উ তো অক্রুর হ্যায়, লেকিন দুনিয়া বোলতা হম ক্রুর হ্যায়। হ্যাঁ, ক্রুর হ্যায়, জবরদস্ত শূর ভি হ্যায়, নেশামে মগজ হরদম চুর হ্যায়। কাজীকে দরবার দুর হ্যায়। বহুত কাজী হম দেখা ভি হ্যায়। জেব মে রূপেয়া হ্যায়, কাজী-গাজী-পাজী সবকোই ইসমে রাজী হ্যায়। ফৌজদার-সে সুবাদার সব দরবার মে রূপেয়া-সে কেয়া নেহি হোতা হ্যায়?

বলেই নিজের রসিকতায় এবং এমন কাব্যপ্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে অট্টহাস্য করে ওঠে। কোন একটা কিছু যেদিন ঘটে যায়, সেই দিনই বা পরের দিন খাসি ঘি থেকে শুরু করে জাফরান পর্যন্ত সাজিয়ে মধ্যস্থলে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিরাট সিধের খেলাত চলে যায় হাতেমপুরের খাঁ সাহেবের দরবারে। কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীকে দমন-সমস্যাটা এত সোজা নয়। শুধু শক্তিমান বলেই নয়, নবীন সন্ন্যাসীর আশ্রম হাতেম খাঁর এলাকার বাইরে। অজয়ের ওপার বর্ধমানের রাজার এলাকা। কিছুদিন আগে শোভাসিং আর পাঠানদের বিদ্রোহের সময় বর্ধমান-রাজকন্যাকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল, তারপর বর্ধমান নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। তেজস্বিনী বর্ধমান-কন্যা যে দীপ্তিচ্ছটা ছড়িয়ে বংশগৌরবকে উজ্জ্বল করে গিয়েছেন, তার উপযুক্ত উত্তাপ সংগ্রহ করেছে বর্ধমান এবং নিজে থেকেই সঞ্চারিতও হয়েছে।

হঠাৎ সেদিন কিছুক্ষণ আগে, জলসত্র নিয়ে কৃষ্ণদাসীর বিচিত্র যুদ্ধকথা শুনে বিছানা চাপড়ে বর্বর চিৎকারে বাহা-বাহা করে উঠেছিল অক্রুর।—বাহা রে মা-জী! বাহা বাহা বাহা! সঙ্গে সঙ্গে হাঁক পেড়েছিল, ওরে শূয়ারের বাচ্চা হারামজাদা কেলো!

কেলোর দল অক্রুরের অষ্টপ্রহরের সঙ্গী। এই অসুখের মধ্যে তারা হাজির থাকত, গাঁজা টিপে তৈরি করে হুজুরকে খাওয়াত। অশ্লীল গল্প বলত। গান করত। পদ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কোমল হাতে হাত বুলোবার জন্য নারী সংগ্রহ করে আনত। অক্রুরের হাঁকে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল কেলে এবং বলেছিল, কী বলছ?

—যা, আভি যা, ওই গো-হাটায় সন্ন্যাসী-বেটারা যে জলসত্র বসিয়েছে দিয়ে আয় ভেঙে।

আর সন্ন্যাসী-বেটাদের—

—কেটেকুটে পুঁতে দোব অজয়ের গাবায় ?

—দিবি ?

—তুমি বললেই দোব।

—বেটাদের বন্দুক আছে রে! তার চেয়ে কান মলে, মাথায় চাটি, পাছায় লাথি মেরে ভাগিয়ে দিয়ে আয়। নাকগুলো বেটাদের ঘষে দিবি।

কৃষ্ণদাসীর কীর্তনের দল যখন ওই হাটের কাছে এসে পৌছেছিল—তখন কেলোর দল ওই তাণ্ডবে মেতে নৃত্য করছিল! কৃষ্ণদাসী থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বর্বর অক্রুরের এই পাষণ্ড অনুচরের দল এই অত্যাচার করছে নবীন সন্ন্যাসীর অনুচরদের উপর? সে ভুলে গিয়েছিল যে, এ অনুরোধ সে-ই করেছিল। তার প্রতিবাদ রাধার অপমানের জন্য, তার মর্মে আঘাতের জন্য। অক্রুরের কী অধিকার? এই পাষণ্ডেরা কিসের জন্য এ তাণ্ডব করছে? কেন করবে? সেই নবীন সন্ন্যাসীর অপমান হবে অক্রুরের হাতে?

সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণদাসীর। অন্তরাত্মার তাড়নায় সে চিৎকার করে উঠেছিল, ধ্বংস হয়ে যাবে। সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে যমদূতেরা। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ওই সন্ন্যাসীদের রক্তপাত হলে সর্বনাশ হবে। রক্তগঙ্গা—আগুন—মহামার—মহামারী। সাবধান! সাবধান! সাবধান!

অবাক হয়ে গিয়েছিল দলের লোকেরা।

কেলে সর্দার অক্রুরের অনুচর। সে সহজে দমে না। সে হি-হি করে হেসে বলেছিল, তুমিই তো বলেছ গো।

তার পুরো বক্তব্যটা ছিল এই যে, তুমিই তো বলেছ গো অক্রুর সরকারকে। এ আবার এখন কী বলছ? কিন্তু অধীর, অস্থিরমস্তিষ্ক কৃষ্ণদাসী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠেছিল, ওরে পাপের অনুচর প্রেত, ওরে নরকের আগুনের কালি, ধর্মের ভুলভ্রান্তির প্রতিকার করবি তোরা? মন্তর ভুল হয়েছে বলে হোমের ঘিয়ের আহুতি জ্বালবি তোরা? সরে যা, দূরে যা—পাপ—পাপ—মহাপাপ! জ্বলে যাবে, জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে দেশ—ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার ওই বন দাউ দাউ করে জ্বলবে। দলে দলে যমদূত আসবে রে, ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ে সব ঝাপসা হয়ে যাবে। তারপর রক্তগঙ্গা! রক্তগঙ্গা!

বলতে বলতে তার চোখ হয়ে উঠেছিল বিস্ফারিত, নাকের পেটি দুটো থর থর করে কাঁপছিল। হাতের আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন আপনা-আপনি। মনে হচ্ছিল জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে এখনই। জ্ঞান হারাবে নয়—জ্ঞান যেন ওর হারিয়েই গেছে; এ-লোকে দাঁড়িয়েও, এই লোকে আর সে নেই এখন। কোন অলৌকিক লোকে দাঁড়িয়ে ওই বিস্ফারিত চোখে দিব্যদৃষ্টির মত দৃষ্টিতে এক বিচিত্র জগৎ থেকে কথা বলছে; সে জগতে সকল কর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ পটুয়াদের পটের মত খুলে যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষদের কথা থাক্, এবার ভয় পেয়েছিল ওই কেলে সর্দার পর্যন্ত! এ কী মূর্তি!

মা-জীর এমন মূর্তি সে তো কখনও দেখে নি। কতদিন মা-জী সময়ে অসময়ে তাকে শাসিয়েছে, বলেছে, আমি ডাকিনী-বিদ্যে জানি কেলে। সাবধান! কেলে ভয় করেছে, আবার করে নি। এবং ভয় করা বা না-করা দুটো দিকের কোন একটা দিক নিয়ে খুঁট পেতে দাঁড়াবার প্রয়োজনও হয় নি। অর্থাৎ সব সময়েই একটা মিটমাট হয়ে গেছে। আজ তার নিশ্চিত বিশ্বাস হল—মা-জী ডাকিনীমূর্তি ধরেছে। সে সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি। আয় রে—আয় রে, সব চলে আয়, চলে আয়।

আশ্রমের কর্মীরাও উন্মাদিনীর মধ্যে এক দিব্যমূর্তিকে যেন প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা প্রণাম করেছিল কৃষ্ণদাসীকে। বলেছিল, তুমি মা। তুমি মা।

কৃষ্ণদাসী এবার অকস্মাৎ হা-হা করে কেঁদে উঠেছিল। এবং মুহূর্ত কয়েক হা-হা শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করে কেঁদেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল।

* * *

সে জ্ঞান তার ফিরেছিল প্রায় প্রহরখানেক পর। তখন নাম-সংকীর্তনে সমাগত লোকেরা তাকে ধরাধরি করে তার আখড়ায় এনে শুইয়ে দিয়েছে। মোহিনী একান্তভাবে অবোধ মেয়ে, তার বয়সের অনুপাতেও বোধশক্তি পরিপুষ্ট হয় নি। সে ভয়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে নির্বাক হয়েই বসে ছিল। শুধু কাঁদছিল।

প্রাচীন বৈষ্ণবেরা এসে বসে ছিল। তারা সকলেই তাদের ধারণা অনুযায়ী বলেছিল, দশা। দশা হয়েছে কৃষ্ণদাসীর। এত বড় সিদ্ধপাটের মহিমা। যাবে কোথায়? উঠোনে সংকীর্তনের বিরাম ছিল না।

জয় রাধে জয় রাধে—জয় জয় রাধে!
বাঁশরী বাজায়ে শ্যাম রাধানাম সাধে।
রাধে! রাধে! জয় জয় রাধে!
মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে তিন ভুবন কাঁদে।

রাধে! রাধে! রাধে! জয় রাধে! জয় রাধে! জয় রাধে!

এরই মধ্যে কৃষ্ণদাসী একসময়ে চেতনা পেয়ে উঠে বসেছিল। কিন্তু তখন সে প্রায় বদ্ধ উন্মাদ। অসম্বৃত কেশবাস রূপসী কৃষ্ণদাসী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি রাধা, আমি কলঙ্কিনী, আমি সামান্যা, আমি গোপনারী, তোমার গরবে আমি গরবিনী—তুমি আমাকে ধুলায় লুটিয়ে দিলে! আমি যে তোমার জন্যই চন্দন মাখি অঙ্গে; সেই অঙ্গে ঢেলে দিলে কলঙ্কের কালি!

বলতে বলতে আবার হা-হা করে কান্না। সে কী কান্না!

আজীবন না হোক, আযৌবনই কৃষ্ণদাসী পাপিষ্ঠা। কিন্তু ওই পাপিষ্ঠার মরুভূমির মত অন্তরে কোথায় ছিল ফল্গুর মত অপরূপের তৃষ্ণার স্নিগ্ধ একটা প্রবাহ। দেহ-সম্ভোগের লালসাবিক্ষুব্ধ লবণ-সমুদ্রের মত জীবনের মধ্যে কোথায় ছিল প্রেমকামনার অনির্বাণ বহ্নিশিখা, আজ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মরুভূমি বিদীর্ণ হল, সমুদ্র শুকাল, বয়ে গেল একটি নির্ঝরিণী প্রবাহ, তারই তীরে জ্বলে উঠল একটি হোমকুণ্ড। কৃষ্ণদাসী পাগল হয়ে গেল।

*　　*　　*

কয়ো বরাবরই তাদের কাছে কাছে আছে। মা-জীকে মোহিনীকে—দুজনকেই সে ভালবাসে। সে ভালবাসা জন্তুর মত ভালবাসা। যদি কেউ বলে কুকুর-বেড়ালের মত, তো বলার কিছু নেই। বলেও লোকে। পুরুষেরা বলে—আখড়ার কুকুর। মেয়েরা বলে—কুকুর নয়, কেষ্টদাসীর হুলো বেড়াল। ঘেউ ঘেউ নয়—ম্যাও-ম্যাও ওর ডাক। মরণ! মেনী মোহিনীর গা চেটেই পোড়ারমুখোর সুখ!

কয়ো শুনতে অবশ্যই পায়। কিন্তু বলে না কিছুই। খুব খোঁচালে বলে—কয়ো কয়ো, কুকুরও না, বেড়ালও না। কেষ্টদাসী বেলগাছ, মোহিনী বেল; বাসা বেঁধে বেলগাছে আছি। বোধ হয় আর-জন্মের কর্ম্মফের।

তারপর ভেবেচিন্তে আবার বলে -আর-জন্মে বেহ্মদত্যি ছিলাম, মরে কয়ো হয়েছি; বেলগাছ ছাড়া তাই মন ওঠে না। তোদের চামড়ার মুখে যা আসে বলে যা। তবে মোহিনীর কথা বলিস নে, পাপ হবে। বেলের নাম শ্রীফল। মা-লক্ষ্মী নিজের স্তন কেটে শিবপূজা করেছিল। ওতে কয়ো কখনও ঠোকর মারে না। পাকলেও ও-গন্ধ কয়োর ভাল লাগে না। আমি, যে হ্যাড়া বেটারা বেলের লোভে আঁকশি নিয়ে আসে, তাদের মাথায় ঠোকর মারি, বাস।

কয়ো সে-দিনও মা-জীর পাশেই ছিল। পয়লা বৈশাখ, বহু স্থানে বহু দান বহু সেবা বহু ভোগ। কয়ো সকাল থেকে ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছিল। আগের দিন চৈত্র-সংক্রান্তিতে ছাতু খেয়েছিল পেট পুরে। সকালে একটু অগ্নিমন্দা ছিল। তাই এখানে ওখানে ওই ইলাম-বাজারেই—শশা বাতাসে গুড় ছোলাভিজে খেয়েই তৃপ্ত ছিল। ঠিক করেছিল আরও একটু বেলা চড়লে অর্থাৎ দুপহরের কাছাকাছি হলেই যাবে সুপুরে, সিদ্ধপুরুষ আনন্দ ঠাকুরের ওখানে গিয়ে এঁটোকাঁটায় তৃপ্ত হয়ে আসবে। তবে ঠাকুর বোষ্টমদের শিরোমণি, মা-জীরও বাবার বাবার মত বাবাজী, ওঁর ঘরে এঁটো আছে কাঁটা নেই। একেবারে নিরামিষ। তা হোক, বছরের প্রথম দিন। সিদ্ধপুরুষের গোবিন্দের প্রসাদ। আর কয়ো হলেও কয়ো তো বোষ্টম বটে। আজ নিরামিষই ভাল। শুক্তো, বড়িভাজা আর গুড়-অম্বল যা মধুর, তাতে ওর কাছে আমিষের কাঁটা কোথায় লাগে!

হঠাৎ মা-জী গামছা মাথায় বের হল, মোহিনীকে বললে, আমি চললাম সুপুর, ঠাকুরের কাছে। কয়ো সঙ্গ নিয়েছিল; পথে এই কাণ্ড। কাণ্ড যখন হল তখন কয়ো নিরামিষ শুক্তো বড়িভাজা গুড়-অম্বলের লোভ ত্যাগ করেই মা-জীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরেছে। অবাক হয়ে দেখেছে। ভেবে কূলকিনারা পায় নি। এ হল কী? মা-জীর জীবনের আলো-অন্ধকারের খেলার কথা তো খুব ভাল করেই জানে। এ যে সব একাকার হয়ে গেল। মা-জী যদি অক্রুর সরকারের বাহন ওই কেনো সর্দারের তাণ্ডব দেখে নৃত্য করত তবে সে বিস্মিত হত না। সূর্যে গ্রহণ লাগে—অন্ধকার আলোকে গিলে ফেলতে চায়; সর্বগ্রাসী গ্রহণও দেখেছে সে। অজয়ের ঘাটে লোকে যখন হরিনাম করেছে, স্নান করেছে, কয়ো তখন একটা ভুষো-কালি-

মাখানো কাচ চোখের সামনে ধরে গ্রহণ দেখেছে—সেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। আর অন্ধকারকে মনে মনে প্রণাম করে বলেছে—হাঁ, তুমি জিন্দে বট। বাপ রে, বাপ রে! অমন সাক্ষাৎ আগুন—সুয্যিকে গব করে গিলে ফেললে! তবে ভাগ্যে উগ্‌রে দাও। সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের কথা মনে পড়ে, বীর হনুমান নাকি সুয্যিকে বগলে ভরে রেখেছিল; অবিশ্যি সুয্যির তাতে সায় ছিল। তা থাকুক, কিন্তু সুয্যি তো বটে। বোশেখ মাসে অজয়ের বালির আঁচে ধান পড়লে খই হয়, মানুষ পড়ে তিন-চারটে কাত ফিরলে ঝলসে কালো হয়ে যায়—বাবা, সেই সুয্যি! মনে মনে সে হনুমানকেও প্রণাম করে। আর বুঝতে পারে, পশ্চিমা পালোয়ানগুলোর জোর কেন এত বেশী! ওই মহাবীরের চ্যালা বলে। কিন্তু আজ মা-জীর এ কী হল? অন্ধকারের মত আলোকে গিলতে এল, এসে আলোর তেজে পুড়ে ছাই হয়ে গেল নাকি! মা-জীর চোখে এত জল ছিল কোথায়! কিন্তু এ যে পাগল হয়ে গেল!

চকিতে একদিন মনে হয়ে গেল একটা কথা।

এ ওই নবীন সন্ন্যাসীর মহিমা।

সন্ন্যাসীর কাছে যে অপরাধ করেছে, কেষ্টদাসী তারই শাস্তিতে পাগল হয়ে গেল। আর তারই মহিমাতে তার সব অন্ধকার কালো কাপড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার কেষ্টদাসী বলেও উঠেছে, মণির ছটা দেখে বিষধরের কথা ভুলে আমি ক্যানে হাত বাড়িয়েছিলাম রে! জ্বলে গেল। বিষে আমি জ্বলে গেলাম। তার অর্থ অন্যে কে কী করে তা কয়ো জানে না, কিন্তু তার সঠিক অর্থ কয়ো জানে। সেই কারণেই সে প্রশ্ন করতে এসেছে মাধবানন্দকে। প্রতিকার ভিক্ষা করতে এসেছে।

মাধবানন্দ সমস্ত শুনে যে কথা বললেন, সে তার মনঃপূত হল না। বিশ্বাস হল না। সন্ন্যাসী তাকে ছলনা করলেন। বললেন, না কায়ো, আমি সিদ্ধপুরুষ নই।

মোহিনীর কথা বলে তার জন্যে সে করুণা ভিক্ষে করলে। হায় সিদ্ধপুরুষ, তুমি তো সব জান। তবু তোমার করুণা হল না! মোহিনী সত্যিই কেষ্টদাসীর মেয়ে কিনা এ নিয়ে কয়োরও সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় হয়তো কোনদিন অজয়ের ঘাটে সেই ভোরের বেলা স্নান করতে এসেছিল কেষ্টদাসী, সেই লগ্নে এক পদ্মপাতার-উপর-ভাসিয়ে-দেওয়া মেয়ে এসে কেষ্টদাসীর গায়ে ঠেকেছিল। রাধার মত। রাধাও নাকি এক ফুটন্ত পদ্মফুলের মধ্যে জন্মে ফুলের মতই ফুটেছিলেন। মোহিনী তেমনি মেয়ে। মাটির সংসারে ধুলো-মাটিতে এরা মলিন হয় না—দুঃখ পায়। ঠাকুর, নবীন সন্ন্যাসী তুমি, পাথর। এতটুকু করুণা হল না তোমার? মায়া হল না?

কয়ো জীবনে বোধ করি দীর্ঘনিশ্বাস কখনও ফেলে নি। আজ সে সম্ভবত প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর ফিরল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার আর দেরি করবার উপায় নাই। আগে সে উড়ো কাক ছিল। বাসা ছিল না। এখনও তার বাসা নাই, কিন্তু কেষ্টদাসীর আখড়ার ডালে না বসলে তার প্রাণ ছটফট করে। গাছের তলায় মোহিনী পড়ে আছে—পুরাণের গল্পে শোনা, সেই এক অপ্সরার ফেলে-দেওয়া মেয়ের মত। সে মেয়েকে শকুনে পাখা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। কয়ো মোহিনীকে আগলায়। কেষ্টদাসী সারারাত্রি

উঠোনে বেড়ায় ডাকিনীর মত বাট বয়ে।

বর্বর অক্রুর অনেকটা নাকি সেরে উঠেছে এই দু মাসে। লাঠি ধরে ঘরের উঠোনে বেড়াচ্ছে এবং গালাগাল দিচ্ছে কেলেদের। কেলে বলেছে, মা-জীর ছামনে আমি যাব না ছোট সরকার। তুলি চল, তুমি ছামনে দাঁড়াবে। আমি মোহিনীকে পটাস করে কচি লাউ-ছেঁড়া করে কাঁধে ফেলে চলে আসব। ছামনে আমি যাব না। ও বাবা, কাপড়খানা টেনে খুলে ফেলে দেবে আর আমার খালখানা (চামড়া) চড় চড় করে ছড়া পাঁঠার মত টেনে ছাড়িয়ে নেবে। বাপ রে!

কথাটা মিথ্যে নয়। তার সাক্ষী জয়দেব-কেন্দুলী যাবার পথের পাশে হেলেপড়া অশ্বথ-গাছটা। কেলে ডোমের ঠাকুরদাদা জানত ডাকিনী-বিদ্যা। সে তার এক সাঙাতের সঙ্গে এক পূর্ণিমার রাত্রে ঠ্যাঙা হাতে বসেছিল। তখনও কুলী খাঁ নবাব হয়ে বসে নি। ঠ্যাঙাড়ের কাল—ডাকাতি ব্যবসার খুব ফলাও অবস্থা। পথে রাহাজানি দিনের বেলাতেও চলত। কেলের টাকুরদাদার ঘরে তখন দুটো পরিবার, একটা রক্ষিতা। শাহী জোয়ান আর গুণীর বিদ্যেতে তেমনি ডাকসাইটে গুণিন। পথে লোক ছিল না। তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। আশ্বিন মাসের ধোয়া-মোছা আকাশ ষোলকলায় ঝলমলে চাঁদের আলোয় সে যেন দুধ-সাগরে বান ডেকেছে। হঠাৎ একটা সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল আর মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড পাখি পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কেলের ঠাকুরদাদা হেসে বলেছিল, কী বল্ তো?

সাঙাত বলেছিল, তাই তো রে! কী পাখি বল্ দিকি?

—পাখি নয়। ডাকিনী। গাছে চড়ে উড়ে চলেছে।

সাঙাত বলেছিল, মিছে কথা। সব তোর ধাপ্পা। ওই ডাকিনী-বিদ্যে সুদ্ধ তোর ধাপ্পা-বাজি। কই, কখনও তো পেমান দিস নাই। পাখিকে বলে ডাকিনী!

মদের মুখে গালাগাল দিয়ে গিয়েছিল। কেলের ঠাকুরদাদা বলেছিল, তবে দেখ্ শালা। চোখে দেখ্। বলেই হেঁকেছিল মন্তর। বিচিত্র কাণ্ড! বিরাট পাখিটা চলেছিল সোজা তীরের মত পুব থেকে পশ্চিমে। সেটা আকাশে পাক খেতে শুরু করেছিল। যেন ঘুরতে শুরু করল। এবং নামতে লাগল ধীরে ধীরে। সাঙাত অবাক। পাখিটা যত নামছে তত যেন সত্যিই গাছ হয়ে উঠেছে। ডাল পালা কাণ্ড স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তারপর গাছটা ওই ভাবে হেলে মাটির উপর নামল। একটা দু-ডালের অশ্বত্থগাছ। তার ডালের উপর বসে এক উলঙ্গিনী এলোচুল রূপসী মেয়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে বললে, নামালে যদি তো লজ্জা রাখ গুণিন। দাও কাপড়, না হয় গামছাও দাও একখানা। দাও—দাও।

কেলের ঠাকুরদা তখন মেতেছে। সে হা-হা করে হেসে উঠেছিল। আকাশে চন্দ্র-সুয্যি সাত তারা। তাদের ছামনে লজ্জা নাই, যত লজ্জা মাটির ওপর মানুষের ছামনে? নাম্, নাম্, গাছ থেকে নাম্। মুখ থেকে হাত খোল্—চাঁদবদনটা দেখি।

নামল মেয়েটা, হাতও খুললে, চোখে যেন জল। মুখে বলল, ওগো, আমি মেয়েমানুষ।

সঙ্গের সাঙাত আর থাকতে পারে নি। নিজের গামছাখানা মাথা থেকে খুলে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, এই নাও।

কেলের ঠাকুরদাদা চিৎকার করে উঠেছিল, করলি কী? করলি কী? হাত বাড়িয়ে ছুঁড়ে-দেওয়া গামছাখানা ধরতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন মেয়েটার হাতে গামছা পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নায় ঝলমলে আকাশখানায় যেন বিনামেঘে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠল—বিদ্যুৎ নয়, ওই উলঙ্গিনী মেয়েটার খিলখিল হাসিতে —হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি!

ওপারের গড়জঙ্গলের শালবনের পাতায় পাতায় সে হাসি বাতাস তুললে। মেয়েটা সেই গামছাখানায় দেহটা ঢেকে নিয়েই আবার টেনে খুলে মাথা পার করে পিছনে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা পাঁঠার ছাল-ছাড়ানোর মত কেলের ঠাকুরদাদার চামড়া কে যেন টেনে ছাড়িয়ে ফেলে দিলে। একটা ছাল-ছাড়িয়ে-নেওয়া কাঁচা মাংসের পিণ্ডের মত পড়ে গেল সে।

সাঙাত অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ডাকিনী যে গাছটা চালিয়ে এসেছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে আর একটা গাছে উঠে সেটাকে উড়িয়ে আবার আকাশপথে উড়ল। গাছটা রইল এখানে ডাকিনী-বিদ্যের জয়ধ্বজা হয়ে।—ডাকিনীকে ঘাঁটিয়ো না।

কেলে সেই ভয়ে যায় নাই।

অক্রুর আস্ফালন করছে: আচ্ছা, আমার শরীর ভাল হোক। অক্রুর শূর হ্যায়। মরণকে ডরতা নেহি। আওরতকো ছোড়তা নেহি।

কয়ো অক্রুরকে আটকাতে হয়তো পারবে না। কিন্তু কা-কা শব্দ করে সাবধান করে দিতে পারবে।

কয়ো মাধবানন্দের আশ্রম থেকে ফিরল।

অজয়ের ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল। কিসের যেন শব্দ উঠছে। নাকাড়ার! হ্যাঁ, নাকাড়াই তো। দুম্ দুম্ দুম্ দুম্।

কী একটা আসছে! একটা গাছ!

ওঃ, সাত-আট হাত উঁচু একটা মানুষ। রণ-পার উপর চড়ে আসছে। বাপ রে বাপ! ডাকাত নয়, মাধবানন্দ গোস্বামীর চর-অনুচর। এপারে আশপাশের গ্রামে ইতিমধ্যেই কেশবানন্দের ব্যবস্থায় অনেক লোক আশ্রমের কাজে লেগেছে। কেন্দুলীর মহান্ত মহারাজের পাইক বরকন্দাজের মত ব্যবস্থা।

পিছনে বনটার মুখে কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রশ্ন করলে, কে আসে?

রণপার উপর থেকে লোকটা উত্তর দিলে, জয় কংসারি!

বন থেকে আবার শব্দ হল, জয় মাধব!

রণপা সওয়ার বললে, জয় কেশব!

তারপরেই বললে, আমি পরাণ পাইক। জরুরী খবর আছে। হ্যাতমপুরের হ্যাতেম খাঁ ফৌজদার ফৌত হইছে। হাফেজ খাঁ ফৌজদার হলছে। ঢেঁড়া পড়ছে ইলেমবাজারে।

কয়ো চমকে উঠল। মনে পড়ে গেল নবীন গোসাঁইয়ের কথা। গোসাঁই, তুমি সিদ্ধপুরুষ। মুখে 'না' বললে কী হবে! তুমি এইমাত্র সেই মণিটি ফেরত দিয়ে বললে—এটি বোধ হয় হেতমপুরের হাফেজ খাঁয়ের বিবির। কয়ো, এইটি নিয়ে সেখানে যাও।

এই তো বললে! এই তো!

আবার বল তুমি সিদ্ধপুরুষ নও ?

নবম পরিচ্ছেদ

মাধবানন্দ দেবতার সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন।

কৃষ্ণদাসী উন্মাদ হয়ে গেছে। সেই সরলা কিশোরী মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাবে বর্বর অক্রুর। কৃষ্ণদাসীর উপর সেদিন তাঁর অপরিসীম ঘৃণা হয়েছিল। তার বেশভূষা তার চোখের কোণে কালির ছায়ার মধ্যে লালসাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। মনে পড়ে গিয়েছিল বাল্যকালের স্মৃতি। সেদিন জলসত্র নিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তাতে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। আজ সমস্ত শুনে তাঁর অন্তরে তিনি বেদনা অনুভব করছেন। সেই বেদনাকে বিস্মৃত হবার জন্যই ধ্যানে বসবেন। ওই বেদনা অনুভব করাও তাঁর উপলব্ধিমতে দুর্বলতা। ওকে প্রশ্রয় দিলে সহস্র বা লক্ষ বাহু আলোকলতার মত জীবনসাধনার বনস্পতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

নারীর মধ্যে আদিম মহাপ্রকৃতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন। যিনি পুরুষকে আয়ত্ত করে পরিশেষে গ্রাস করে নিশ্চিন্ত হন, তাঁর কামনা শুধু সৃষ্টির। মহাকালীর ধ্যানে আছে "বিপরীত রতাতুরাং সুখ প্রসন্ন বদনাং স্মেরানন স্বরারুহাং।" হ্যাঁ, আদিম নারীপ্রকৃতির স্বরূপ এর থেকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আর হয় না। কিন্তু তার বুক থেকেই প্রকাশিত হয় চৈতন্যস্বরূপ, মহা-অগ্নির মধ্য থেকে মহা-জ্যোতির মত। সেই জ্যোতির্ময়কে প্রকাশ করেও তার সান্ত্বনা নেই। সে-ই আবার ওই জ্যোতির্ময়কে আচ্ছন্ন করবার জন্য মরীচিকার পিছনে হরিণীর মত ছোটে। তিনি চৈতন্যকে প্রকাশিত করে চৈতন্যের হৃদয়ে হ্লাদিনী শক্তি হয়ে অধিষ্ঠিত হন, তিনিই বাইরে এসে রাধা হয়ে চৈতন্যময় পুরুষোত্তমকে আচ্ছন্ন করেন। কিন্তু চৈতন্যময় পুরুষোত্তম সে আচ্ছন্নতা কাটিয়ে চলে যান। রাধা শতবর্ষ বিরহে কাঁদে।

কৃষ্ণদাসীরা রাধা নয়, পুতনা। আর ওই মেয়ে মোহিনী ? না, কৃষ্ণদাসীদের গর্ভে রাধা জন্মায় না। আজও সে স্বরূপ প্রকাশিত হয় নি, যখন হবে তখন হবে ছলনাময়ী, লাস্যময়ী। চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেই ওর জীবনলীলার সার্থকতা। করুণা করেও ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ো না সন্ন্যাসী। ওই তামসী মায়ায় মহাভারতের মহাযজ্ঞের চরু বিষাক্ত হয়ে গেছে।

এ মোহ থেকে মুক্ত কর, হে প্রভু, আমাকে এ মোহ থেকে মুক্ত কর।

—গুরু মহারাজ! বাইরের দরজা থেকে ডাকলেন কেশবানন্দ।

উত্তর দিলেন না মাধবানন্দ। কেশবানন্দ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার গলার সাড়া দিয়ে নিজের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিলেন।

মাধবানন্দ এবার বুঝলেন, সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জপ রেখে প্রণাম করে বাইরে এলেন: কিছু বক্তব্য আছে বলে মনে হচ্ছে কেশবানন্দ!

—হ্যাঁ, গুরু মহারাজ, হাতেমপুরের হাতেম খাঁ ফৌত হল। হাফেজ খাঁ ফৌজদার হল।

—ওপারে কি তারই ঢেঁড়া পড়ছে ?

—হ্যাঁ।

—এক রাজা বিগত হয়, অন্য জন রাজা হয়ে বসে। ওতে আমাদের কী আছে বল ?

—আর সংবাদ আছে গুরু মহারাজ। মুরশিদাবাদে নবাব সুজাউদ্দিন বীরভূমের রাজকর আদায়ের জন্য ফৌজ পাঠাচ্ছেন। রাজনগরের বাদিওজ্জমান খাঁ কয়েক বৎসর রাজকর বাকী ফেলেছেন। আমাদের আরও একটু সংগঠন প্রয়োজন, গুরু মহারাজ।

—কী সংগঠন কেশবানন্দ ? সংগঠন বলতে আমি তো বুঝি আত্মসংগঠন।

—না মহারাজ, আত্মসংগঠনের জন্য যখন আমরা সংঘের আশ্রয় নিয়েছি তখন সংঘ-সংগঠন না হলে আত্মসংগঠন কখনও সম্পূর্ণ হবে না। আপনি আমা অপেক্ষা বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞানে আপনি প্রবীণ। কিন্তু আত্মজ্ঞান এবং সংসারজ্ঞানে কিছু প্রভেদ আছে। একটা আসে জন্মান্তরের পুণ্যে ভগবদকৃপায়, অন্যটা আসে শুধু অভিজ্ঞতায়। সেই হিসেবে সংসার-জ্ঞান আমার আছে বলেই বলছি সংঘ-সংগঠন প্রয়োজন। আমি জানি, আপনি বাহুবলের শক্তিকে সুচক্ষে দেখেন না।

—তাই তো কেশবানন্দ !

চিন্তিত মুখে কেশবানন্দ কথা কয়েকটি বলে সম্মুখে বিরাট বনস্পতিশীর্ষের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারই মধ্যে মসীকৃষ্ণ বর্ণে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে শালগাছটা। জীবনের প্রথম বিরাট স্বরূপ ওই বনস্পতি। যত আলোর দিকে সহস্র শাখা বিস্তার করে নিজেকে প্রসারিত করে উর্ধ্বলোকে উঠছে, তত তার তলায় অন্ধকার ঘন হচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে। জীবনের তামসীর বিনাশ নাই। কেশবানন্দ তাঁর ধ্যান-ধারণা সাধন-তপস্যা সত্ত্বেও কঠোর বাস্তববাদী। কেশবানন্দ বললেন, গুরু মহারাজ, এক মহর্ষি তাঁর পরমায়ু মাত্র কয়েক কোটি বর্ষ জেনে এবং অনন্ত কালের সঙ্গে তুলনায় কয়েক কোটি বর্ষকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর উপলব্ধি করে কোন কুটির নির্মাণ না করে মাত্র একটি গাছের পাতা মাথায় দিয়ে তপস্যায় বসেছিলেন। কিন্তু পাতাটির আয়ু নিশ্চয় কয়েক কোটি বর্ষ ছিল না। সুতরাং পাতাটিকে নিশ্চয় বারংবার বদল করেছিলেন। আমাদের সংঘ সেই পাতাই না হয় হল ; কিন্তু সেটি যাতে ঝড়ে না ওড়ে, বর্ষায় না গলিত হয়, তার চেষ্টা তো করতেই হবে। ঝড় উঠছে গুরু মহারাজ। হিন্দুস্থানের আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ উঠছে। শুনছি, পারস্যে মহা অসুরতুল্য এক নাদিরশাহের অভ্যুদয় হয়েছে। সে নাকি হিন্দুস্থানের দিকে অভিযানে অগ্রসর হবে। মুঘলের কাল গত হতে চলেছে গুরু মহারাজ। নাদিরশাহের আঘাতে দিল্লির দরবার একান্তভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। দক্ষিণে মারাঠারা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভবানীর বরপুত্র রামদাস-শিষ্য শিবাজী মহারাজার গড়া শক্তি আজ ভ্রষ্ট। এ সময়ে শুধু নিজের জন্য তপস্যা করতে চান—হিমালয়ে যান। যদি ধর্মকে রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করেন, তা হলে সক্রিয় হতে হবে। দিকে দিকে সন্ন্যাসীরা সক্রিয় হয়ে উঠছে। আপনি রাজেন্দর গিরি-মহারাজের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেখানেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা। আপনার মধ্যে জ্ঞান এবং তেজের সমাবেশ, সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আপনাকে অনুসরণ করেছি। নইলে আমি আসতাম না। আজও বলুন, যদি সংকল্পে আপনি দুর্বল হয়ে থাকেন

বা তত্ত্বজ্ঞানে এ সংসারকে একটি বুদ্বুদই মনে করে থাকেন, তবে আমি স্থান ত্যাগ করি।—একটু স্তব্ধ থেকে আবার কেশবানন্দ বলেন, আজকের মত উদাসীন বলুন উদাসীন, দুর্বল বলুন দুর্বল—এ তো আমি কোনদিন দেখি নি। মার্জনা করবেন, মনে হচ্ছে আপনি বিচলিত।

মাধবানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, কেশবানন্দ, সত্য গোপন আমি করি না। তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি বিচলিত হয়েছি আজ। ওই কয়ো আমাকে বলে গেল—আমার অভিশাপেই নাকি ইলামবাজারের সেই বৈষ্ণবী, যাকে আমরা বর্গীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম, যে আমাদের জলসত্র নিয়ে গোলমাল করেছিল, সে পাগল হয়ে গেছে। অন্তত লোক তাই বলছে।

কেশবানন্দ বললেন, আমি জানি কৃষ্ণদাসী পাগল হয়ে গেছে। আপনার দয়াই তারা ভিক্ষা করতে এসেছিল। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ নিয়ে দেখেছি আপনাকে দেখে তার পাপপঙ্ক থেকে মুক্তিকামনাই জেগেছিল। সেই কারণেই ছুটে এসেছিল। হতভাগিনীর জীবনে যা ঘটে গেছে তার উপায় তো আর নেই, উপায় খুঁজতে এসেছিল ওই মেয়েটার জন্য। মেয়েটি সত্যিই বড় ভাল। ওর উপর লুব্ধ দৃষ্টি ওই বর্বর অক্রূরের! যদি বলেন—

চুপ করলেন কেশবানন্দ।

মাধবানন্দ বললেন, চুপ করলে কেন কেশবানন্দ?

—যদি বলেন তো ওই মা এবং মেয়েকে এপারে আমাদের সীমানার মধ্যে এনে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দিই।

—না। দৃঢ়স্বরে মাধবানন্দ বলে উঠলেন, না। বিশ্বসংসারে পাপ এবং পুণ্য প্রবৃত্তি দুইই একই শক্তির দুই বিরোধী রূপ। এ বিরোধের মধ্যে সন্ধির মধ্যপথ নেই কেশবানন্দ। পাপকে মরতেই হবে। তার পূর্ণ বিলুপ্তির মধ্যেই চৈতন্যস্বরূপের মহাপ্রকাশ সম্পূর্ণ হবে। আমাকে ভুল বুঝেছ কেশবানন্দ। তাদের প্রতি আমার কোন করুণা নেই। কিন্তু আমার ক্রোধ আমার অভিশাপ হয়ে থাকলে আমার পক্ষে বেদনা অনুভব না করে উপায় কী বল? শেষে পিপীলিকা বধ করলাম!

বলতে বলতেই দুটি বিন্দু জল তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল মুছে বিষণ্ণ হেসে মাধবানন্দ আবার বললেন, সংসারে শুধু ন্যায়ে-অন্যায়ে পাপে-পুণ্যেই বিরোধ নয় কেশবানন্দ, ন্যায়ে-ন্যায়েও সংঘর্ষ বাধে। ন্যায়বিচার আর করুণার সংঘর্ষে চোখে আমার জল এসেছে অনেকক্ষণ। সেই কারণেই এতক্ষণ প্রভুর সামনে বসে বলছিলাম—পথ বলে দাও।

কেশবানন্দ বললেন, ওদের কথা তা হলে থাক্ গুরু মহারাজ। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে যে পতঙ্গ পুড়ছে সে পুড়ুক। অখিল সংসারে মুহূর্তে কোটি কোটি প্রাণের লয়। তার মধ্যেই থাক্ ওরা। এখন যা বলছিলাম। আমার বলা শেষ হয় নি। সংবাদ আরও আছে। বাংলা দেশেও শান্তি আর থাকবে না। নবাব সুজাউদ্দিন বিলাস এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। উজীর হাজি মহম্মদ এই সুযোগে শক্তি সঞ্চয় করছে। পাটনায় হাজির ভাই আলিবর্দী ক্রমশ স্বাধীন চালে চলতে শুরু করেছে। সুজাউদ্দিনের দুই ছেলে—তকীউদ্দিন রাজকার্যে রাজনীতিতে পারঙ্গম; সরফরাজ—বিচিত্রচরিত্র।

মাধবানন্দ বললেন, জানি। হাজার-নারী-বেষ্টনীর মধ্যে দিন যাপন করে। তারা নাকি সখী! কোন সখীর মাথা ধরলে কোরাণ-মাথায় দুপহর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকে, তবুও অনেকে বলে সে সাধক!

ব্যঙ্গহাস্য করে মাধবানন্দ কথা শেষ করলেন।

—তকীর সঙ্গে সরফরাজের বিরোধ বাধিয়ে হাজি মহম্মদ অবিচার করে তকীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। মারণ-যাগ করেছিল, তকীর মৃত্যুতে হাজি প্রায় নিষ্কণ্টক। বাংলার আকাশেও ঘনঘটা উঠছে, দিগন্তে বিদ্যুচ্চমক বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহারাজ। আমাদের শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। এবং—

—থামলে কেন, বল।

—আমি কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসব।

—ঘুরে আসবে? কোথায়?

—গোকুল পর্যন্ত।

—গিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—তাঁর নির্দেশ?

হেসে কেশবানন্দ বললেন, নির্দেশ একমাত্র আপনার হতে পারে। পরামর্শ-উপদেশের জন্য যাচ্ছি। কোনও চিন্তা আপনি করবেন না। আমি অন্য সকলকে, বিশেষ করে—

—তোমরা কি সকলে একই অভিপ্রায়ে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে কেশবানন্দ?

কেশবানন্দ চুপ করে রইলেন।

—আমি বুঝতে পারি নি, তুমি আমার অনুমানের চেয়ে অনেক বেশী চতুর কেশবানন্দ।

একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, কিন্তু ও-খেলায় দেশ জাগবে না কেশবানন্দ, দেশের ধুলো উড়বে। হয়তো প্রচণ্ড ধুলোর বিরাট আবর্ত। মনে হবে মাটি বুঝি জেগে উঠে মাথা তুলে আকাশ ছুঁতে চলেছে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই নেমে আসতে হবে আবার সেইখানে।

কেশবানন্দ তবু কোনও উত্তর দিলেন না।

—যাক ওসব কথা। কিন্তু গুরু যেখানে শিষ্যদের সাধনার মার্গ সম্পর্কে বিশ্বাস করাতে পারে না, সেখানে সে গুরু হিসাবে ব্যর্থ। আমি ব্যর্থ হয়েছি কেশবানন্দ। তোমরাই আমাকে মুক্তি দাও।

কেশবানন্দ এবার বললেন, আপনার শাস্ত্রবিচার-উপলব্ধিতে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী গুরু মহারাজ। আমি মুগ্ধ হয়েই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। হয়তো আপনিই নূতন উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারছি না। আপনি যেদিন শিষ্য গ্রহণ করে মঠ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেই দিনই তো নিজের মুক্তি ছাড়া আরও মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন। বাংলা দেশে, এই বৈষ্ণব ধর্মের বিকৃত পরকীয়া-সাধনের গতি-রোধ করতেই তো এখানে এসে আশ্রম তৈরি করতে আরম্ভ করেছেন। এখন রাজনৈতিক দুর্যোগ যদি ঘনিয়ে আসে, আসে কেন—আসছে গুরু মহারাজ, তা হলে যে জীবনের সর্বত্র

তার আঘাত এসে লাগবে। আত্মরক্ষা প্রথম ধর্ম। অরাজকতা বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজা যে হবে—সে যত দিনের জন্যই হোক, লোক শোষণ করতে শুরু করবে। দস্যুতার প্রাদুর্ভাব হবে। দুঃসাহসীরা দস্যুতার সাহায্য নিয়ে রাজা হতে চাইবে। ব্যভিচারীর উৎপাত হবে। এখানে অভ্যুদয় হবে ওই বর্বর অক্রূর দাস-সরকারের।

অরাজকতার মধ্যে অত্যাচারীর অভ্যুদয় হয়—অত্যাচারের মধ্যে তাঁর অভ্যুদয় ঘটে মানুষের বুকে কেশবানন্দ। আমি তো তাই চেয়েছিলাম মানুষকে জাগাতে। মানুষকে চালাতে নয়। তুমি বহুকাল রাজকর্ম করেছ। তুমি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অতি সংযতবাক্, কিন্তু তার মধ্যে থেকেও তোমার গোপন উদ্দেশ্য অন্ধকারে শ্বাপদ-দৃষ্টির অগ্নিচ্ছটার মত চকিতপ্রকাশে দেখা দিচ্ছে। রাজেন্দর গিরি মহারাজের কাছে যাবে বলছ। আমিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি। বল তো তিনি সন্ন্যাসধর্মে কি আজও স্থির আছেন? অথবা ভ্রষ্ট হয়েছেন? অর্থ দিয়ে অযোধ্যার নবাব ডাকছে। তিনি তার হয়ে যুদ্ধ করতে ছুটছেন। তার চেয়ে বেশী অর্থ দিয়ে ডাকছে দিল্লির উজির—সঙ্গে সঙ্গে তিনি নবাবকে ছেড়ে ছুটছেন তার হয়ে লড়াই করতে। সাবধান কেশবানন্দ, সাবধান। সন্ন্যাসীর হাতে রাজদণ্ড এলে সন্ন্যাসের অপমৃত্যু এবং গৃহীর অকল্যাণ। ভেবে দেখো কেশবানন্দ, তারপর ঝাঁপ দিয়ো। ওতে ঝাঁপ দিলে আর ফেরা যায় না। কয়েকদিন চিন্তা করে আমাকে উত্তর দিয়ো, গোকুলে যাবার দিন স্থির কোরো।

বলে আর দাঁড়ালেন না। কথা বাড়াতে চাইলেন না বোধ করি। আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।—হে যাদবোত্তম, হে পুরুষোত্তম, হে কংসারি, পথ দেখাও। স্থির রাখো আমাকে।

*　　　*　　　*

কেশবানন্দ কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন। শ্যামরূপার গড়জঙ্গলে রাত্রি নেমেছে। আষাঢ়ের শুক্লা-তৃতীয়ার চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। তার উপর আকাশে মেঘ। অন্ধকার যেন সূচীভেদ্য। অরণ্যময় শুধু লক্ষ কোটি পতঙ্গের একটানা আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে চলেছে, এ ধ্বনিবৈচিত্র্য না শুনলে বোঝা যায় না। জলপ্রপাতের শব্দ যেমন অবিরাম—একসুরে বাঁধা, এ ধ্বনিও তেমনি। তবে এতে একটি সঙ্গীতের রেশ আছে। এ ধ্বনি যে জড়প্রকৃতির ধ্বনি নয়, জীবনপ্রকৃতির ধ্বনি। এ ধ্বনি তো শুধু বস্তুর সংঘাতে উৎপন্ন নয়, এ ধ্বনির মধ্যে জীবনের অভিপ্রায়ের প্রকাশ আছে। কিন্তু কেশবানন্দের চিত্ত এই দিকে আকৃষ্ট হবার নয়। তাঁর চিত্ত আপন লক্ষ্যে, আপন সংকল্পে অধিষ্ঠিত। তিনি ডাকলেন, শ্যামানন্দ!

অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন শ্যামানন্দ।—আমি আপনার অপেক্ষাতেই এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি।

কেশবানন্দ বললেন, শুনলে সব?

—শুনেছি বইকি। আপনি কি—

—না। আমার সংকল্পে আমি স্থির আছি। এই বিধর্মীর রাজত্ব ধ্বংসের এত বড় সুযোগ

গেলে আর আসবে না। যারা আমার সর্বনাশ করেছে তাদের সর্বনাশ আমি করব। ঘর গেছে, সংসার গেছে—আমার সব গেছে এদের হাতে। সন্ন্যাস নিতে গিয়েছিলাম সাময়িক বৈরাগ্যের বশে, সন্ন্যাসে শান্তি পাই নি। প্রতিহিংসার কামনা আমার বুকে জ্বলছে। তারই তাড়নায় এই সংকল্প নিয়ে ফিরে মঠে মঠে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু মনের মত স্থান পাই নি। হঠাৎ এঁকে দেখে—। থাক্ সে সব কথা শ্যামানন্দ, ভুল আমার হয়েছে। কিন্তু পরিশ্রম পণ্ড হয় নি। প্রয়োজন হলে সব আয়োজন নিয়ে একদিনে চলে যাব এখান থেকে। কিন্তু মুরশিদাবাদের লোক এখনও এল না কেন? আসা তো উচিত ছিল। সুজাউদ্দীনের বীরভূম-অভিযানের সংকল্পের কথা সে তো আজ সাত দিন পূর্বের সংবাদ। এর পরের লোক এখনও এল না কেন?

কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে বললেন, কাল তুমি কাউকে ইলামবাজারে পাঠিয়ে ওই কয়ো বৈরেগী বলে উন্মু লোকটাকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করতে পার?

—তাকে নিয়ে কী হবে?

—প্রয়োজন আছে। আমরা মুরশিদাবাদে মোক্তার রেখেছি। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য চর রেখেছি। কিন্তু ঘরের দোরে—নদীর ওপারে কোন সংগঠন করতে পারি নি। এ লোকটাকে একটু চতুর করে তুলতে পারলে এর চেয়ে ভাল গুপ্তচর আর হবে না। আমাদের প্রাচীনকালে ভিক্ষুক শ্রমণ নটী বাজিকরের ছদ্মবেশে গুপ্তচরেরা সংবাদ সংগ্রহ করত। এ লোকটা স্বভাবে ভিক্ষুক, এবং লক্ষ্য করেছি সংবাদ-সংগ্রহেও এর একটা আশ্চর্য রকম নিপুণতা আছে এবং আশ্চর্য রকমে লোকটা চুপ করে থাকতে পারে। কোন কিছু শুনেই ওর মুখ-ভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। লোকটাকে কাল একবার হাতেমপুর পাঠাব আমি। ভোরবেলা কাউকে পাঠিয়ে দেবে। অবশ্যই বুঝতে পারছ আমাদের আশ্রমের কোন সেবক-কে নয়, কারণ ওই বর্বর অক্রুরের অনুচরের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে। গ্রামের কাউকে পাঠিয়ে দেবে।

একটা নিশাচর পাখি প্রহর ঘোষণা করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক পাখি সাড়া দিলে। অজয়ের তটপ্রান্ত থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। নিঃশব্দ বনভূমির মধ্যেও যেন একটা চাঞ্চল্য বয়ে গেল।

কেশবানন্দ বললেন, রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে। আজকের মত বিশ্রাম কর।

উঠোনে নামলেন তিনি। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে আবেগময় শ্লোক আবৃত্তি করছেন মাধবানন্দ। কেশবানন্দ হাসলেন। পরক্ষণেই চোখ জ্বলে উঠল তাঁর। মন প্রকৃতিধর্মে আকাশবিহারী। কিন্তু মন যখন ভুলে যায় যে, তার মনকে বহন করছে যে বস্তুময় দেহ, সে দেহ দাঁড়িয়ে আছে মাটির উপর, তখনই মন মাটির কথা ভুলে গিয়ে আকাশবিহারে ওড়ে—সে ওড়ায় নিঃশেষিত করে নিজেকে। তারপর ক্লান্ত নিঃশেষিতশক্তি পাখা দুটি আপনি একসময় ভগ্নপক্ষের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, আছাড় খেয়ে এসে পড়ে সে সেই মাটির উপর; মহাপ্রকৃতি ব্যঙ্গহাসি হাসেন—ভগ্নপক্ষ পাখির দেহের মধ্যে তার আকাশবিহারী মন অসহায়ভাবে কাঁদে।

তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

ওটা কী?

মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রের বনভূমির মাথায় একটা উদ্যত শূলের মত ওটা কী?

পরক্ষণেই একটা রাত্রিচর পাখি কর্কশ কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করে পাখা ঝাপটে এসে শূলটার উপর বসে ডাকতে লাগল—ক্যা—চ। ক্যাচ—ক্যা—চ। ওঃ! ওটা ইছাই ঘোষের দেউলের চূড়াটা! গম্ভীর চিন্তামগ্নতার মধ্যে এই মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি মন্দিরটিকেই ভুলে গিয়েছিলেন।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যার সময় কয়োকে নিয়ে লোক ফিরল। ভোরবেলা গিয়েও লোকটি কয়োকে পায় নি। তার আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল তার অভ্যাসমত। অন্ধকার থাকতেই কাকে বাসা ছাড়ে, কয়োও তাদের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বের হয়। ঘর তার নেই। কয়ো বলে—আমি কয়ো, বাসা বাঁধি না। ডালে রাত কাটাই গো। অর্থাৎ পরের ঘরের দাওয়ায় কিংবা ছাঁচতলায় শুয়ে পড়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়। ইলামবাজারে মা-জীর আখড়ার আনাচে-কানাচেই কাটে। মা-জীর এই রোগ বা সিদ্ধাই যাই হোক তারপর থেকে সে আখড়ার ভিতরেই থাকে। থাকে মোহিনীর জন্যে। সন্ধ্যা হয়ে আসে আর মোহিনীর মুখ শুকিয়ে যায়। সামনে চারপ্রহর রাত্রি। মোহিনী বলে, কেমন করে কাটাব কয়ো?

কয়ো বলে, কাটবে, ঘুমিয়ে গেলে। তুই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়্। সকালবেলা কা-কা করে তোকে ডেকে তবে আমি বেরুব। আমি রইলাম। আর না যদি ঘুমোস তবে চার-পহর রাত মনে হবে জীবনে আর পোয়াবে না। তোর কোনও ভয় নাই।

—রাতে যদি ছোট সরকারের দানোরা আসে?

—আসবে না। তাদের পরাণের ডর আছে। লোকে জানে মা-জী ডাকিনী সিদ্ধাই পেয়েছে। রাত্রে মা-জীর বাট বয়। বাট বওয়া দেখলে তৎক্ষণাৎ মিত্যু।

এবার তার হাত দুটো চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মোহিনী বলে, আমি যদি দেখে ফেলি কয়ো?

—ঘুমুবি যখন, তখন দেখবি কী করে? আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ঘুম পাড়িয়ে দোব।

—যদি ঘুম ভেঙে যায়?

—উঠবি না, চোখ খুলবি না, মিটি-মিটি করে চোখ বুজে পড়ে থাকবি।

—ওরে, তা যে পারি না রে, মা কী করছে না দেখে যে থির থাকতে পারি না রে। আমি যে সব ভুলে যাই।

—তা হলে তু দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—তবে আবার কী! দেখেও তো তু মরিস নাই? তবে তোর ভয় কী? একটু চুপ করে থেকে এবার কয়ো তাকে বুঝিয়ে বলে, এ মা-জীর সিদ্ধাই লয় মোহিনী; এ তোর মায়ের ব্যাধি। মায়ের তোর মাথা খারাপ হয়েছে। মা-জী ক্ষেপেছে। মোহিনী, এ তোর

মায়ের—ওই সিদ্ধপুরুষ নবীন সন্ন্যাসীর কাছে অপরাধের ফল!

মোহিনীর চোখের সামনে পুরনো ঘটনাগুলি ভেসে ওঠে। সে হতাশায় বেদনায় আকুল হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘটনার পর ঘটনা তার চোখের সামনে ছবির পর ছবির মত ভেসে যায়। সে সঠিক বুঝতে পারে না অপরাধটা কোথায়? কিন্তু অপরাধ যে হয়েছে তাতে তার সন্দেহ থাকে না।

হঠাৎ সে বলে, কয়ো, আমাকে তুই নিয়ে চল্।

—কোথা?

—ওই নবীন সন্ন্যাসীর দরবারে। আমি তাঁর পা দুটো চেপে ধরে মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলব—ঠাকুর, দয়া কর, ক্ষমা কর।

শিউরে উঠে কয়ো বলে, খবরদার মোহিনী। মা তোর ক্ষেপেছে, তুই হয়তো মরেই যাবি।

—কেনে কয়ো?

—ওরে, আগুন—নবীন সন্ন্যাসী জ্বলন্ত আগুন, ওর দিকে হাত বাড়ালে হাত পুড়ে যায়। তোদের ছুঁতে নাই, সামনে যেতে নাই, কখনও যাস নে। তোর মায়ের অপরাধ তো সেইখানে।

অবাক হয়ে যায় মোহিনী। অপরাধ সেইখানে! সে বুঝতে পারে না।

—কেনে কয়ো? তাতে কী অপরাধ? কই, কোন দেবতা তো তাতে রাগ করেন না রে। দেবতা দূরের কথা, সব দেবতার সার যিনি, যিনি ভগবান গোবিন্দ, মদনমোহন শ্যাম তিনি যে ভক্তাধীন রে! বৃন্দাবনে—রাধার—

—চুপ কর্ মোহিনী। ওসব ভুলে যা। নবীন সন্ন্যাসীর যত রাগ রাধার উপর। ওর সাধন-ভজন সব হল, যেখানে যত রাধা আছে সব বেসজ্জন দেবে। খবরদার, ওর পা ছুঁতে যাস না॥ ছামনে যাস না। তোর মা পাগল হয়ে গেল, তু হয়তো পাথর হয়ে যাবি।

শিউরে উঠেছিল মোহিনী। ভয়ে আতঙ্কে বোবার মত শুধু দৃষ্টি বিস্ফারিত করে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু সে দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবীর কোন কিছুই ছিল না। ছিল অন্ধকার, একটা কালো পর্দা যেন চোখের সামনে সমস্ত কিছুকে ঢেকে টেনে দিয়েছে কেউ।

সেদিন অর্থাৎ রথের দিনই রাত্রিবেলায় এই কথাগুলি হয়েছিল। রাত্রে মোহিনীও ঘুমোয় নি—কয়োও না। মোহিনী ভেবেছিল নবীন সন্ন্যাসীর কথা।—এমন মানুষ এমন পাষাণ কেন? পাষাণ নয়, এমন আগুনের মত জ্বলে কেন? মানুষ যদি আগুনের মত জ্বলে, তবে অপর মানুষ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কেমন করে? শ্যাম তো শুনেছে—নবজলধর। সে জল দেয়, ছায়া দেয়। পাপী-তাপী সবারই তৃষ্ণা নিবারণ হয়—তাপিত অঙ্গ শীতল হয়। শ্যাম নবজলধর বলেই তো তার নামে শুষ্ক-তরু মুঞ্জার—মরাগাছ বেঁচে ওঠে, পাতা গজায়, ফুল ফোটে। শ্যাম যদি আগুন হত তবে সব যে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। হায় নবীন গোসাঁই, তুমি এমন আগুনের মত জ্বলন্ত কেন?

কয়ো সারারাত ঘুমোয় নি—মোহিনী এবং মা-জীর জন্য দুর্ভাবনায়।

মা-জীর জন্যে দুর্ভাবনা শেষ হবে কবে এবং কী ভাবে? কৃষ্ণদাসী তখন অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় আখড়ার উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার হা-হা করে কেঁদে আছড়ে পড়ছিল। আবার কিছুক্ষণ পর উঠে ঠাকুরঘরের মধ্যে ঢুকে বিগ্রহের পা দুটি ধরে পড়ছিল। আবার বেরিয়ে এসে পরিক্রমা শুরু করছিল। অবিশ্রান্ত পরিক্রমা। এ কৃষ্ণদাসীর নিত্যকর্ম। এর জন্য অবশ্য ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাসী যদি কোনদিন বিগ্রহ টেনে এনে আছড়ে ফেলে? তারও একটি শঙ্কা কয়োর আছে। সেই আশঙ্কাই তার সব চেয়ে বড় আশঙ্কা। মধ্যে মধ্যে মা-জীর চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা যেন কী দেখতে পায়। তার ভয় হয়। তার ধারণা এই দৃষ্টিতে মা-জী যখন তাকায়, তখন তার মনের মধ্যে খুন খেলা করে। মনে হয়, হয় মা-জী মারণ-যাগ করে নবীন সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলবার কথা ভাবছে, নয় ভাবছে বর্বর অক্রুরকে 'বাণ' মেরে শেষ করবার কথা, নয় ভাবছে মোহিনীকে মেরে ফেলবার কথা। মোহিনীকে মারতে যাগ করতে হবে না, 'বাণ' মারতে হবে না; গলা টিপে ধরলেই হবে। মধ্যে মধ্যে আখড়ার মধ্যে ছাগলের বাচ্চা ঢুকে পড়ে চিৎকার করে, মা-জী তাড়া করে ছুটে যায়, ধরতে পারলে গলা টিপে ধরে আখড়ার দরজা দিয়ে বের করে পথে আছড়ে ফেলে দেয়। কখনও কখনও আছাড় মেরে ফেলে দেওয়ার পর নিজের গলাটা টিপে ধরে। কোনদিন মোহিনীকে গলা টিপে মেরে ফেলে যদি নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরে!

মা-জী অবশ্য মরলেই ভাল: সেও খালাস পাবে, সংসারও পাবে। কিন্তু মোহিনীকে তো মারতে দিতে পারবে না।

গতরাত্রে ঘরের ছাঁচতলায় বসে ঢুলছিল কয়ো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার একটা শব্দে। হঠাৎ সশব্দে যেন আখড়ার বাইরের দরজাটা খুলে গিয়েছিল। চমকে উঠেছিল কয়ো। কে? কে? আখড়ার খোলা দরজাটার ওপারে কে যেন বেরিয়ে গেল। কে? কয়ো ধড়মড় করে উঠে চারিদিক দেখেছিল। আঁধারের শুক্লা-দ্বিতীয়ার অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘ। তবুও অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখের সামনে আখড়ার উঠোনটা প্রায় স্পষ্ট হয়েই ভেসে উঠেছিল। কই, মা-জী কই? ছুটে গিয়েছিল দেবতার ঘরের দিকে। সেখানেও মা-জীকে পায় নি। এবার সে ছুটে খোলা দুয়ার অতিক্রম করে পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল।

চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল—মা-জী! ঠিক সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণদাসীর খিল-খিল হাসির শব্দ শুনে ডাকা আর হয় নি, ছুটে এগিয়ে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভয়ঙ্করই বটে! কৃষ্ণদাসী কাপড় ছেড়ে ফেলে দিয়ে উলঙ্গিনী হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে—হি-হি-হি! হি-হি-হি—হি-হি-হি! হি-হি! আর মধ্যে মধ্যে বলছে—মর্ মর্, মুখ দিয়ে রক্ত তুলে মর্। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে মর্। গল্ গল্ করে বেরুক রক্ত। হি-হি-হি-হি-হি।

আর তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক থর থর করে কাঁপছে। তাকে চিনতে কয়োর দেরি হল না। সে অক্রুরের অনুচর। কেলের শাগরেদ। একেবারে কাঁচা জোয়ান। কেলের চেয়ে দুঃসাহসী। কেলে মা-জীর ডাকিনী-মন্ত্রের ভয়ে আখড়ায় উঁকি মারতে আসে না। এই দুঃসাহসী কাঁচা জোয়ানটা কেলের উপরে নিজের আসন করে নেবার দুরাকাঙ্ক্ষায় বোধ করি

রাত্রে এসে উঁকি মেরেছিল। মা-জী বুঝতে পেরে বেরিয়ে এসেছে। অথবা হয়তো আকস্মিকভাবেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। মুহূর্তে কয়ো মা-জীর পরিত্যক্ত কাপড়খানা কুড়িয়ে মা-জীর দেহের উপর কোনমতে জড়িয়ে দিয়ে মা-জীর সামনে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল—মা-জী। মা-জী! মা-জী!

সেই মুহূর্তে পিছন থেকে অন্ধকার চিরে আর একটি আর্ত কণ্ঠস্বরের ডাক ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—মা-গো! মা—

মা-জী চেতনা হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

পিছনের লোকটা এই অবসরে ছুটে পালিয়েছিল।

মোহিনীর সাহায্যে কয়ো কোনরকমে টেনে-হিঁচড়ে মা-জীকে আখড়ায় এনেছিল, জ্ঞানও হয়েছে। মা-জী কিন্তু যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কয়ো মা-জীর এ অবস্থার জন্য চিন্তিত হয় নি। কইমাছের পরানের মত শক্ত মা-জীর পরান, ও সহজে যাবার নয়, যাবে না। গেলে ও খালাস পাবে। কিন্তু চিন্তিত হয়েছে মোহিনীর জন্যে। বর্বর অক্রুরের ওই কাঁচা জোয়ান প্রেত অনুচরটা তো পালিয়েছে, সে যখন ওই মূর্তি দেখেও মরে নি—যখন সামলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে পেরেছে তখন তো মরবে না। তার মানে, সর্বনাশ। প্রেতের যখন ভয় ভেঙেছে তখন তো আর মোহিনীর পরিত্রাণ নেই। এই বর্বরগুলো যখন ভয় করে তখন সে ভয় মারাত্মক, কিন্তু ভয় ভাঙলে এরা হয়ে ওঠে আরও মারাত্মক। তাই ভোরবেলা, কাক-কোকিল বাসা ছাড়বার আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। ফিরেছে অপরাহ্ণে। ফেরার পর আশ্রমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কেশবানন্দ তার জন্য চর্বচোষ্য লেহ্যপেয় আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়ো অবাক হয়ে গেল। যেন খানিকটা সন্দেহ হল তার। চতুর কেশবানন্দের তা বুঝতে ভুল হল না। এ সন্দেহ যে কয়োর হতে পারে—এ অনুমান আগে থেকেই তাঁর ছিল। তবুও এই ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি এই ভেবে যে, সন্দেহ ঘুচিয়ে দিতে পারলে এর ফলাফল অব্যর্থ। কেশবানন্দ কয়োর সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি স্থির রেখে হেসে বললেন, গুরু মহারাজের এই আদেশ।

তারপর বললেন, তাঁর ধারণা দামোদরের ক্ষুধার কিছুটা তোমার উদরে বাসা গেড়েছে। মানুষের ক্ষুধা কিছুটা পেলেই মেটে। দামোদরের ক্ষুধা পেটপুরে খেলেও মেটে না। তাই বললেন, ওকে কাল ক্ষুধা মিটিয়ে খাওয়াও তো। বস তুমি।

কথাগুলি কয়োর ভালই লাগল। বেশ ভাল ভাল কথা। আর অকাট্য। তার ক্ষিদে এবং পেটের ফাঁদে আর দামোদর নদের ক্ষিদে আর পেটের ফাঁদের সঙ্গে সত্যিই মিল আছে। সিদ্ধপুরুষ বলেই এ কথা গোসাঁই বুঝেছে। কিন্তু তবু সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। মাথা চুলকোতে লাগল। হে ভগবান, এ কী বিপদে ফেললে!

কেশবানন্দ বললেন, বস, বস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হাত জোড় করে কয়ো বললে, আমাকে পরীক্ষা করছ গোসাঁই?

—না না, পরীক্ষা কিসের? বস তুমি। এর মধ্যে কোন পরীক্ষা নেই।

—তবে গোসাঁই, খেয়ে যে কয়োর কখনও পেট ফাঁপে না—তার পেট নাগরার মত ঢং ঢং করে বাজনা দেয় কেনে? গলায় গলায় অম্বল কেনে? ঘি গরম-মশলার গরমে বুক গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে! পরানটা শুধু জল জল করে সারা হল।

—গরম-মশলা? গরম-মশলা দেওয়া খাবার কোথায় খেলি?

—হাতেমপুরে। ফৌজদার-বাড়িতে। সেখানে গিয়েছিলাম আজ।

—হাতেমপুরে? ফৌজদার বাড়িতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সের দুই তিন হাল্লু আর ম্যাও; সেও সের ট্যাক হবে। পেট ফেঁপে উঠেছে। আইঢাই করছে।

—তুই মুসলমান-ঘরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে এলি?

—উচ্ছিষ্ট লয় গো। আদর করে ব্যাগম সাহেবা পাতা পেড়ে খাওয়ালে। তার হারানো নীল হীরেটা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম তো। ফোজদার তো দেখে 'বিস্‌মিল্লা ইয়ে আল্লা' বলে পেরায় নাপিয়ে উঠল। বলে—তোর মাফিক সাচ্চা আদমী নেহি দেখতে পাতা হ্যায়। বলে—কী বসকীস্ লিবি? টাকা লে—মোহর লে—জমি লে। আমি বলি—না। বসকিস্-টসকিস্ আমি চাই না। আপনি একটা উপকার করেন। আপনি ফোজদার, এ মুলুকের দণ্ডমুণ্ডুর মালিক। এক বদমাশের অত্যেচার থেকে একটি অনাথা বালিকাকে রক্ষা করেন। সেই মোহিনী বলে মেয়েটা গো। এবার আর তার অক্রুরের হাত থেকে নিস্কিতি নাই। মা-জীর ডাকিনী-মন্তর সিদ্ধাই এসব কথার কথা, তা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। নবীন গোসাঁই সিদ্ধপুরুষ, উনিই আমাকে কাল বলেছিল—তু যা কয়ো, ফোজদার হাফেজ খাঁর কাছে যা, কার্যসিদ্ধি হবে। এই নীল হীরেটা তুই কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে রাখতে দিয়েছিস, এটা তাদেরই, এটা নিয়ে যা; দেখাবি; দেখালেই কার্যসিদ্ধি হবে। তা হয়ে যাবে। ঠিক হবে। ...এক ঘটি জল খাব।

কয়োর বুক আবার শুকিয়ে উঠেছে।

কেশবানন্দ শ্যামানন্দকে বললেন, খানিকটা হজমী দাও জলের সঙ্গে; আকণ্ঠ পুরে পেটুকটা হালুয়া আর মেওয়া ফল খেয়েছে।

হাল্লু আর ম্যাও যে হালুয়া আর মেওয়া, এ বুঝতে কেশবানন্দের কষ্ট হয় নি।

কয়ো বললে, করব কী বলেন? ফোজদার হীরেটা নিয়ে ভেতরে গিয়ে হুকুম করলে—নিয়ে আয় ব্যাটা বোরেগী ভিখেরীকে। ব্যাগম দেখবে তাকে, আর নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াবে। আর তারই কাছে বলতে হবে ঐ মোহিনীর কথা। মেয়েছেলের কথা যে! আর নবাবী ফোজদারী অন্দর যে। যা করবার ব্যাগম করবে। তা—

শ্যামানন্দ এক ঘটি জল আর একটি হজমী বটিকা নিয়ে এসে দাঁড়াল। কয়ো ব্যগ্রভাবে অঞ্জলি পাতলে: দাও।

—আগে এই বড়িটা গলায় ফেলে নে।

কয়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, পরানটা আইঢাই করছে আর তেষ্টা পাচ্ছে—

নইলে ঘি-গরমমশলার খুশবুইটা বড় ভাল উঠছে গোসাঁই। নাহলে তো এতক্ষণ কোন্‌কালে কয়ো গলায় আঙুল দিয়ে সব উগরে দিয়ে খালাস হত। হজম হলে তো খুশবুইটাও আর উঠবে না।

কয়োর দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠল। পরক্ষণেই বললে, না, দাও। এগুলো খেতে হবে তো। দাও।

বড়ি এবং জল খেয়ে গোটা দুই বড় ঢেকুর তুলে বললে, বুঝেছেন গোসাঁই, এ ফৌজদার আর সব আমীর কি খাশ জমিদারদের মত নয় গো। ওই এক ব্যাগম নিয়েই ঘর-সংসার। ব্যাগমের পেতাপ খুব। দুজনার মধ্যে খুব ভালবাসা। বললে—আমিনা পেয়ারী, এই এর কাছেই শোন সে মেয়ের কথা। শুনে যা করবার কর।

কেশবানন্দ চমকে উঠলেন। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল তাঁর। বললেন, কী? কী বলে ডাকলেন ফৌজদার? আমিনা?

—হ্যাঁ। আমিনা পেয়ারী।

আমিনা! আমিনা! মথুরার ঘাটে বাদশাহ-বংশের এক ব্যভিচারী সন্তানের কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কেশবানন্দের। আমিনা! সে হারানো মেয়ের নামও আমিনা। ওসমান নামক এক ওমরাহপুত্রের সঙ্গে পালিয়েছে।

কয়ো বললে, তা ব্যাগমও লোক ভাল। আমাকে হাল্লু-ম্যাও খেতে দিয়ে বললে—তু খা, হামলোক সমঝ করে দেখি। খুব খুবসুরত লেড়কী? আমি বললাম—ঝুট বলব না; খুবসুরত বটে ব্যাগম সাহেব, তবে সে কি আপনকাদের মতন? এমন রঙ কোথা পাবে? রূপের ত্যাজ কোথা পাবে? এই দ্যাশের লেড়কী তো সদ্য পাক-ধরা ধানের মতন, মানে গোরো রঙ হলেও সবুজ সবুজ আভা, এই আর কী! আর বড় ঠাণ্ডা! তেমনি নরম। কথা বলতে বলতে কয়ো পর পর গোটা চারেক বড় বড় উদ্‌গার তুললে—হেউ—হে—উ হে—উ—হেউ।

কেশবানন্দ বললেন, তারপর?

কয়ো হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আঃ, বাঁচালে বাবা গোসাঁই। আঃ! সব হেঁটিয়ে গেল চার ঢেকুরে। আঃ, আর দুটো ঢেকুর উঠলে তো পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে গোসাঁই।

—খাবার তো প্রস্তুত রয়েছে রে; ভোজনে বসে যা। খা আর বল্, তারপর কী হল? অক্রূরের হাত থেকে রক্ষা করবে কথা দিলে? অক্রূরের সঙ্গে তো হাতেম খাঁয়ের খুব দহরম-মহরম ছিল রে! না, ফৌজদারের অন্দরে ঢোকাবার ব্যবস্থা করে এলি?

—কথা শেষ হল না গোসাঁই। ফৌজদার চলে গিয়েছিল তো, আবার হন্তদন্ত হয়ে চলে এল। কী সব বললে ব্যাগমকে, ব্যাগমও খুব ত্রস্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন। লোকজনে বললে—খেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যা রে বোরেগী। জলদি ভাগ্, নগরী (রাজনগর) থেকে ঘোড়স'র এসেছে। ভাগ্—ভাগ্। এখন উৎসব শুনবার সময় নাই।

কেশবানন্দ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্যামানন্দের দিকে তাকালেন। শ্যামানন্দ সে দৃষ্টির অর্থ

অনুমান করলেন। নবাবী ফৌজ মুরশিদাবাদ থেকে রওনা হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার ঘোষণা দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল। শিবারা ধ্বনি তুলে বনময় ডেকে উঠল; বাদুড়েরা পাখা মেলে উড়ল; গাছের কোটরে—ডালে ডালে প্যাঁচারা ডাকতে শুরু করলে। এই ধ্বনির প্রতিক্রিয়ায় সচকিত হয়ে অহরহ জাগ্রত পতঙ্গেরা চঞ্চল হয়ে উঠল; তাদের ধ্বনি বারেকের জন্য উচ্চ হয়ে উঠল। কয়োও সচকিত হয়ে উঠল।—গোসাঁই!

—কী হল? চমকে উঠলি যে? প্রহর রাত হল, সেই জন্য শেয়াল ডাকছে।

—হ্যাঁ গোসাঁই, আমার যে বড্ড দেরি হয়ে গেল গো! মোহিনী যে একা আছে। মা-জী যে থেকেও না-থাকা। আমি যাই গোসাঁই—

—খেয়ে নে, কতক্ষণ লাগবে?

—আমি খেতে খেতে যাব। সে তার ময়লা গামছাখানা বিছিয়ে পাতাসুদ্ধ খাবার তার উপর চাপিয়ে বেঁধে নিয়ে ঢিপ করে একটি প্রণাম করে বললে, আমি চললাম গোসাঁই।

কেশবানন্দ বললেন, কাল একবার আসবি। প্রয়োজন আছে।

কয়ো চলে গেল। কেশবানন্দ খুশী মনেই এগিয়ে চললেন। যে সংবাদ চাচ্ছিলেন তা পেয়েছেন। আশ্চর্যভাবে কয়ো জেনেছে এবং দিয়ে গেল। কয়োকে একটু তালিম দিতে পারলে ওর দ্বারা অসাধ্যসাধন করা যাবে।

—কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

—আমি কেশবানন্দ।

—গুরু মহারাজ? এমন করে—? প্রশ্ন করতে গিয়েও করতে পারলেন না কেশবানন্দ।

মাধবানন্দ বললেন, ভাবছি কেশবানন্দ। কালের পদধ্বনি শোনবার সেই ধ্বনিতরঙ্গ অনুভব করবার শক্তি বোধ হয় জীব-জগতের জন্মগত। নইলে প্যাঁচা শেয়াল এরা ঠিক প্রহরে প্রহরে কী করে ডেকে ওঠে? আমরা মানুষ। ওদের থেকে অনেক জন্ম এগিয়ে আছি। আমাদের পক্ষে বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের কোন এক প্রহরের ক্রান্তি-মুহূর্ত অনুভব করা তো অসম্ভব নয় কেশবানন্দ। আমি যেন অনুভব করছি, চোখের উপর কতকগুলো ঘটনা যেন অকস্মাৎ ঘটে গেল আমার। ঠিক ধরতে পারছি না, কিন্তু—

কেশবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে মাধবানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আপনার শরীর বোধ করি সুস্থ নয় গুরু মহারাজ, চলুন, বিশ্রাম করবেন চলুন।

—বিশ্রাম! বিশ্রাম নিতে পারছি না কেশবানন্দ। একটা কী যেন আমাকে অস্থির করে রেখেছে অহরহ। নিদ্রাকে, বিশ্রামকে শাসন করে দূরে রেখেছে।

ধীর পদক্ষেপে তিনি ফিরলেন গোবিন্দের ঘরের দিকে।

দশম পরিচ্ছেদ

মাধবানন্দ ধ্যানে বসেছিলেন।

তাঁর ধ্যানের মধ্যে তিনি ভগবানের 'কংসারি'-রূপটি মনের মধ্যে রূপায়িত করে প্রার্থনা করেন—এই রূপে তুমি প্রকট হও সর্বলোকের অন্তরে। পাপকে তুমি নাশ কর। ব্রজলীলার ধূলার খেলা সাঙ্গ করে রথে আরোহণ কর; দেহধারী মানব-মানবীর স্নেহ-মমতা-রাগ-অনুরাগ-ময় পার্থিব চেতনাকে অতিক্রম করে পূর্ণ চৈতন্যে জাগ্রত হও। পাঞ্চজন্য শঙ্খে নির্ঘোষ তুলে সকল মানুষের জীবনরথের অশ্বরজ্জু ধরে মোহাভিভূত নর-চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করে বল—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও; কিন্তু অহরহ মানব-অন্তরে তুমি রয়েছ। জীবনপয়োধিতে চৈতন্যের শতদলকে সেই অনাদি কাল থেকে দলের পর দলে বিকশিত করছ। আজ এই এ-দেশের লৌকিক কালগণনার ১১৪৬ সাল—হিজরী ১১৫১—শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়ে পিছনের গণনায় অতীত—বহু সহস্র বহু লক্ষ বৎসর অতীতকালের দিকে তাকিয়ে তো দেখতে পাচ্ছি, প্রভু, সে চৈতন্যের শতদল ক্রমপ্রকাশে ক্রমবিকাশে দিনে দিনে ফুটেই চলেছে—ফুটেই চলেছে—ফুটেই চলেছে। এই আমার জীবনে—আমি সেই তো কৃমিকীট হতে চৌরাশী কোটি দেহান্তরের পর মানুষের দেহেমনে উপনীত হয়েছি; কত জন্মান্তরের পর এই জন্মে তোমাকে উপলব্ধি করছি—এ তো মিথ্যা নয়। চৈতন্যে তুমি পূর্ণ হয়ে জাগ্রত হও প্রভু।

নিত্যই তাঁর এই প্রার্থনা। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে একটি বেদনার সুর তাঁর এই প্রার্থনা-সঙ্গীতের সঙ্গে তানপুরার ধ্বনির মত বাজতে থাকে। আজ হঠাৎ তাঁর চোখের সম্মুখে তিনি এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন। দেখলেন, দলে দলে অশ্বারোহী আসছে। অশ্বক্ষুরে ধূলা উড়ে দিগন্ত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন এ-দেশের পটুয়ারা পটে ছবির পর ছবি দেখায় তেমনিভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য। দেশ জ্বলছে। গ্রাম লুট হচ্ছে। মহামারী, দুর্ভিক্ষ। আবার অশ্বারোহী। যুদ্ধ। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। এরই মধ্যে—ছি-ছি-ছি! মধ্যে মধ্যে একটি কিশোরীর মুখ! আশ্চর্য, সারি সারি সারি মুখ। ওই একখানি মুখ। নানান বিচিত্র বেশে, নানান রূপে—ওই এক মুখ সহস্র হয়ে ভেসে উঠছে। কখনও ঢলঢল বিহ্বল দৃষ্টি—মুখে সূর্যোদয়-মুহূর্তের আকাশের অরুণরাঙা পেলবতা, কখনও উদাস দৃষ্টি—মুখে আকাশের নীলের প্রসন্ন কোমলতা, কখনও সকরুণ সজল দৃষ্টি—মুখে সায়াহ্নের মলিনতা; কখনও বিলাসিনী বেশ, উদাসিনী বেশ, কখনও ভিখারিণী বেশ। কিন্তু সর্বরূপে সর্বভাবেই সে কিশোরী। জীবন-জগতের সর্বস্থান সর্বকাল ব্যাপ্ত করে রয়েছে যেন। সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর জীবনের প্রথম মাধুরী অনন্তমূল অনন্তকাণ্ড দূর্বাদলের মত এই কিশোরী রূপমাধুরী নিজেকে বিস্তার করে রেখেছে মানব-জীবনে। পাথর না হলে যেমন দূর্বাদলের আচ্ছন্নতা থেকে নিস্তার নাই, জীব-জীবনেরও মৃত্যু ভিন্ন যেন ওই রূপের প্রভাব-স্পর্শ থেকে নিষ্কৃতি নাই।

প্রার্থনা করেছিলেন—হে কেশব, হে কংসারি, হে গোবিন্দ! আমাকে তুমি ওই রূপ আর দেখিয়ো না। ওকে আবরিত করে তুমি প্রকট হও।

ধ্যানের আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন মাধবানন্দ। বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্ত বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুস্থ হয়ে ভেবেছিলেন—এটা কী হল? এসব কী দেখলেন তিনি? ১১৪৬ সালের এই আষাঢ় মাসের রাত্রের প্রথম প্রহরে ধ্যানাসনে বসে তিনি কি ভবিষ্যৎ দেখলেন? দেখা কি সম্ভব? আর ওই মুখ? ওরই বা অর্থ কী? হঠাৎ মনে হল, সবই অর্থহীন। তাঁর চিন্তা-উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ও অনুভূতির বিভ্রম। একান্তভাবে মিথ্যা কল্পনা। নিজেকেই নিজে ছলনা করেছেন তিনি। কিন্তু এই মুহূর্তটিতেই প্রহর ঘোষণা করে ডেকে উঠল শেয়াল-প্যাঁচা; কীটপতঙ্গধ্বনিতরঙ্গের মধ্যেও যেন একটি চকিত ছেদ পড়ল। যতক্ষণ এই ঘোষণা চলল, মাধবানন্দ একাগ্র এবং উন্মুখ হয়ে শুনলেন এই ঘোষণা। তিনি যেন, যেন নয়—নিশ্চিতভাবে, তাঁর মনের প্রশ্নের উত্তর শুনছিলেন।

এই শিবারা এই পেচকের এই কীটপতঙ্গেরা তো এই প্রহর শেষের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত মত্ত ছিল—আহারে বিহারে বিশ্রামে। হঠাৎ মুহূর্তটি আসবামাত্র ডেকে উঠল কী করে? এই কালগণনা কী ভাবে চলছিল তাদের মধ্যে? তারা তো মানুষের চেয়ে অনেক পশ্চাতে রয়েছে। তাদের চেতনা বুদ্ধি চৈতন্য—সবই তো মানুষের থেকে অনেক গুণে ক্ষীণ, অপরিপুষ্ট। তবু তাতেই তারা যদি বর্তমানে এই ভাবে প্রহর-ক্রান্তিকে বুঝতে পারে, তবে মানুষই বা ভবিষ্যতের ক্রান্তিকালকে অনুভব করতে পারবে না কেন? জন্তুরা অতীতকে ভুলে যায়। মানুষ অতীতকে মনে রাখে, বর্তমানে দাঁড়িয়ে তাকে স্মরণ করে—সময়ে সময়ে তো অতীত কালের ঘটনা প্রত্যক্ষের মত চোখের সামনে ঘটে যায়; তবে ভবিষ্যৎই বা দেখা অসম্ভব কিসে?

তিনি কি তবে ভবিষ্যৎকে দেখলেন?

কথাটা কেশবানন্দকে বলতে গিয়েও বললেন না। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কূটনীতির বিচারেও হিসাবে পারদর্শী এই পশ্চিমদেশীয় সুচতুর লালা-বংশের সন্তানটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর খানিকটা মিল রয়েছে। কেশবানন্দ এতেই উৎসাহিত হয়ে তার সর্বনাশা চাতুরীর খেলাকে অভ্রান্ত বিধি এবং বিধান বলে প্রয়োগ করতে উদ্যত হবে। দাবাখেলার খেলুড়ে সে, জীবনখেলার বিধাতা নয়—এটা যে ভুলে যাবে; নিজের কাছে নিজে প্রতারিত হয়েই এ খেলা শেষ করবে সে।

"যা দেবী ভ্রান্তিরূপেণ সর্বভূতেষু সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

মন্দিরে প্রবেশ করে আসনে বসে আবার যেন অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। এবং সে অস্থিরতা এমন যে আসন ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত বের হয়ে এলেন মন্দির থেকে। আশ্রম-প্রাঙ্গণ তখন জনশূন্য। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি আশ্রম থেকেও বেরিয়ে পড়লেন। দাঁড়ালেন বনের মধ্যে।

আপনার চিত্তের সে এক বেদনার্ত অসহায় উপলব্ধি বা অনুভূতি যাই হোক, তার আবেগেই

কই? কোথায় সে, যে এমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে? গাঢ় অন্ধকারে সব আচ্ছন্ন। আকাশে পাতলা মেঘের আস্তরণ পড়ে নক্ষত্রালোকের পথও রুদ্ধ করে রেখেছে, এই পাতলা মেঘে বারেকের জন্য ক্ষীণ বিদ্যুচ্চমকও চমকায় না যে, তার সাহায্যেও চকিত দেখার সাহায্য হয়! কিন্তু চোখেরও একটা অন্ধকারভেদী শক্তি আছে। কিছুক্ষণ অন্ধকারে চললেই কিছু-কিছুটা দেখা যায়। যত দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে থাকে মানুষ, ততই এই দৃষ্টিশক্তির পরিধি বাড়ে। কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছেন মাধবানন্দ। ওই তো কালো কালো চিতার দাগ। ওই তো পোড়া কাঠ এখানে একটা ওখানে একটা—ওই আর-একটা—ওই আর-একটা পড়ে আছে। কিন্তু যে কাঁদছে সে কই? তবে কি নিরালম্ব বায়ুভুক কোন অশরীরিণী শ্মশানের বায়ুস্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে আর কাঁদছে? বিগত জন্মের অপরিপূর্ণ বাসনার টানে মাটিকে আঁকড়ে ধরে ফিরে পেতে চাচ্ছে তার বাসনাময়ী দেহকে, কিন্তু পাচ্ছে না? আবার মুহূর্তে মাধবানন্দের মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই মোহময়ীর কল্পনা। বাসনাময়ী দেহের বস্তুভোগের বিধির স্তরের বেদী থাকে থাকে সাজানো—আহার-বাসনা, বসন-বাসনা, ভূষণ-বাসনা, স্বাদ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বাসনা-বেদী, তার উপর আসীনা ওই মোহময়ী; সে বলে—প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর, রূপ লাগি আঁখি ঝুরে—রূপ দেখে সে আকুল হয়ে কাঁদে।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। কে? কে? ও কে?

অন্ধকারের মধ্যে সহসা একটি ভূতলশায়িনী মূর্তি উঠে বসল। ভূতলশায়িনী—হ্যাঁ, তাই বটে, একটি নারীমূর্তি, মাথার আলুলায়িত চুলের রাশি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি, নারীমূর্তিই বটে! চিৎকার করে উঠল আর্তস্বরে: আঃ—হা-হা-হা রে! আঃ!

সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মাধবানন্দের। একটা ভয়ার্ত শিহরণে তাঁর সর্বশরীর শিউরে উঠল। মাধবানন্দ ভীরু নন। তিনি সারা উত্তরাপথ ঘুরেছেন তাঁর জীবনপ্রশ্নের উত্তরের জন্য। অরণ্যে, পাহাড়ে, শ্মশানে, বিপ্লবাক্রান্ত নগরীর হিংসাজর্জরতার মধ্যে দিনরাত্রি যাপন করে এসেছেন। তবু, এই অন্ধকার রাত্রে এই মহাশ্মশানের মধ্যে যখন এক মোহময়ীর কল্পনায় তাঁর মন বিভ্রান্ত, সেই মুহূর্তে ওই আলুলায়িতকুন্তলা এক নারীকে ঠিক যেন মাটির বুক ভেদ করে উঠতে দেখে তিনি শিউরে উঠলেন!—এই কি সেই?

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। উন্মাদিনী নিশ্চয়। অথবা এ মূর্তিমতী সেই। উঠে বসে সে বিলাপ করছে। বিলাপ, না, গান? এ তো গান! কী, কী গাইছে? শোনবার জন্য সমস্ত অন্তরকে তিনি একাগ্র করে তুললেন। এবার শুনতে পেলেন—

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।
হরি-বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা॥

পরক্ষণেই সে চিৎকার করে উঠল, আঃ আঃ আঃ!

চিৎকার করে সে এবার উঠে দাঁড়াল। সভয়ে শিউরে উঠলেন মাধবানন্দ। পূর্ণপরিণত-যৌবনা, গৌরাঙ্গী, রুক্ষ আলুলায়িতকেশা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গিনী এক নারী।

এ তবে—এ তবে—? পরক্ষণেই তিনি আবার চমকে উঠলেন। এ যে, এ যে—এ যে সেই পাপিনী বৈষ্ণবী! কয়ো আজই তাঁকে বলেছে, সে উন্মাদ হয়ে গেছে। তাঁরই অভিশাপে।

মাধবানন্দ পাথর হয়ে গেলেন।

উন্মাদিনী চিৎকার করে বললে, রাধা পাপ? হে কবিরাজ গোস্বামী, তোমার ভ্রম ভেঙে-ছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ। নিজের হাতে পাদপূরণ করে লিখেছিলেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্! আর আজ যে রাধাকে মোহময়ী ভেবে, পাপ ভেবে গোবিন্দর পাশ থেকে সরালে, নির্বাসন দিলে, তার ভ্রম কে ভাঙবে? আমার এ অপমানের শোধ কে নেবে? আমি অভিসম্পাত দিলাম—আমি অভিসম্পাত দিলাম—তৃষ্ণায় বুক-ফাটা যন্ত্রণার মধ্যে তুমি তৃষ্ণার জলকে চিনো! বুকের মধ্যে দেহের রোমকূপে-কূপে তোমার আগুন জ্বলবে, যেমন আমার জ্বলছে। সেই দিন তুমি বুক ফাটিয়ে চিৎকার করবে 'রাধা' 'রাধা' বলে; তোমার রোমকূপে-কূপে চিৎকার উঠবে 'রাধা' 'রাধা' বলে। উপর দিয়ে উঠতে গিয়ে পাতালমুখো মাথা ঠুকে পড়বে তুমি।

বলতে বলতে সে আবার হা-হা-হা শব্দে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই সে সেই নিশীথ রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন বালুচর ধরে চলতে শুরু করল। সুদীর্ঘ অজয় চলে গেছে পূর্বমুখে ইলামবাজার হয়ে গঙ্গাসঙ্গম অভিমুখে। ধূধূ-করা বালুচরের রেশ কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, তারপরই অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারই সঙ্গে উন্মাদিনী বৈষ্ণবীও মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে, শুধু তখনও শোনা যাচ্ছিল: অভিসম্পাত দিলাম—আমি অভিসম্পাত দিলাম। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে সে শব্দও ক্রমে মিলিয়ে গেল। মাধবানন্দ যেন পাথর হয়ে গেছেন। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। পিছনে অজয়ের জলস্রোতের মৃদু কুলকুল ছলছল শব্দ ধ্বনিত হয়ে চলছিল অবিরাম। মাধবানন্দের কানে যেন মনে হল মৃদু জলকলধ্বনির মধ্যেও বাজছে সেই গান—

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।
হরি-বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা॥

আশ্চর্য! তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে ওই সর্বনাশীর পিছনে ছুটে যান। একটি করুণ মমতায় তাঁর মন বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। ওই বেদনার আকর্ষণ তাঁকে টানছে। তিনি কঠিন হয়ে সেই-খানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

* * *

কতক্ষণ পর কে জানে! কার উৎকণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠের শব্দে তাঁর চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠল। কে কাকে ডাকছে। বোধ করি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—মা-জী! মা-জী! মা-জী!

মাধবানন্দের চোখে পলক পড়ল। তিনি চঞ্চল হয়ে সামনে পাশে পিছনে মুখ ফিরিয়ে আহ্বানের দিক্‌নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। কোন্ দিক থেকে কে কাকে ডাকছে?

—মা-জী গো!

এবার মা-জী শব্দটির অর্থ তাঁর মস্তিষ্কে বোধগম্য হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এ কণ্ঠস্বর তো তাঁর পরিচিত। কে? কয়ো? হ্যাঁ, কয়োই তো; মনে পড়ল যে উন্মাদিনীকে এই বালুচরের শ্মশানে বিলাপ করতে দেখেছেন, সে কৃষ্ণদাসী। কয়ো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাধবানন্দ।

মনে মনে কংসারিকে প্রণাম করলেন। হে কংসারি, তুমি দাসকে রক্ষা করেছ। বৃন্দাবনের সকল মোহকে পশ্চাতে রেখে মোহময়ী রাধাকে ফেলে তোমার যাত্রাপথে তুমি পিছনে ফিরে তাকাও নি। রাধার চোখের জলে ব্রজভূমি-মৃত্তিকা সিক্ত হয়েছিল, তোমার অনিবার্য নিয়মে সূর্য তাকে শোষণ করে নিশ্চিহ্ন করেছে, তার দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপকে বায়ু গ্রাস করেছে, তার বিরহতাপতপ্ত তনুদেহকে বহ্নি নিশ্চিহ্ন করেছে; ভস্মাবশেষকে গ্রাস করেছে ধরিত্রী। মানুষের স্মৃতিতে বেদনায় শুধু সে বেঁচে আছে। জড়-জগতের নিয়মে তাকেও তুমি নিশ্চিহ্ন করে দাও। মানব-চৈতন্যের মোহ-বন্ধন মোচন কর।

চারিদিকের অন্ধকার স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অকস্মাৎ পাখিরা কলরব করে উঠল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। মাধবানন্দ আবার অজয়ের জলে নামলেন। এপারে এসে পরিত্যক্ত খড়ম-জোড়াটা পায়ে দিয়ে পূর্বমুখে এগিয়ে চললেন নিজের আশ্রমের দিকে। ওই দেখা যাচ্ছে ইচ্ছাই ঘোষের দেউল।

আশ্রমে যখন এসে তিনি প্রবেশ করলেন, তখন মেঘাচ্ছন্ন পূর্বদিগন্ত মেঘান্তরালবর্তী সদ্যোদিত সূর্যের রক্তাভায় যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

সকালবেলা উদয়দিগন্তে এ রক্তাভা, বৃষ্টি নামবার পূর্বলক্ষণ। বৃষ্টি নামবে। বর্ষা আসন্ন। হ্যাঁ, এই সকালেই পাখিরা আহারসন্ধান ছেড়ে মুখে কুটো নিয়ে বাসার দিকে উড়ছে।

—গুরু মহারাজ!

কেশবানন্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন কংসারির গৃহের সামনে। বোধ করি ভোরবেলা উঠে দেবগৃহে বা তাঁর নিজের কুঠরিতে না পেয়ে তাঁরই জন্যে চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাধবানন্দ বললেন, কেশবানন্দ!

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে কেশবানন্দ বললেন, প্রশ্ন করা আমার উচিত নয়, অধিকারও নাই। কিন্তু আপনার মুখ দেখে—

—কাল রাত্রে কেন্দুবিল্বের দেবতার কাছে কিছু নিবেদনের জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু আকাশ দেখেছ? বর্ষা আসন্ন। চালের আচ্ছাদন মেরামত অবিলম্বে সম্পূর্ণ কর।

—সে ব্যবস্থা অনেক আগেই করেছি। গুরু মহারাজ, আমাকে একটু বেশী বৈষয়িক বলে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করেন। আজ গুরুর কাছ থেকে প্রশংসা প্রত্যাশা করি।

মাধবানন্দ এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখো সেগুলি ইতিমধ্যেই আবার জীর্ণ হয় নি তো। এসব অঞ্চলে উইপোকার উপদ্রব বেশী।

কেশবানন্দ বললেন, তার জন্যে বাখারি এবং কাঠে গুড়ের গাদের প্রলেপ মাখাবার ব্যবস্থা করেছি। মিষ্টলোভী পিঁপড়ের ঝাঁক উইপোকা প্রায় শেষ করে এনেছে। উপদ্রব হবে না। কিন্তু দুটো সংবাদ আছে। এই ভোরবেলা পেয়েছি। ওপার

করো এসেছিল। শুনলাম উন্মাদরোগগ্রস্তা কৃষ্ণদাসী কাল রাত্রে নিরুদ্দেশ হয়েছে। সে এখানে তাকে খুঁজতে এসেছিল। আর সংবাদ পেয়েছি, নবাব সুজা খাঁ মারা গিয়েছেন। শুনছি, শেষ মুহূর্ত নিকট বুঝে বীরভূম-অভিযানের হুকুম প্রত্যাহার করে রাজনগরের নবাবের আরজি মত মিটমাট করে নিতে বলে গিয়েছেন। এক লক্ষ টাকা দিতে রাজনগরের নবাব স্বীকৃত হয়েছেন। বর্ধমানের মহারাজ তাঁর জামিন দাঁড়িয়েছেন।

মাধবানন্দ বললেন, কৃষ্ণদাসীর সংবাদ নিয়ো একবার।

মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, না। পাপ নিশ্চিহ্ন হওয়াই ভাল। বলেই তিনি অগ্রসর হতে উদ্যত হলেন। কেশবানন্দ বললেন, বীরভূম-অভিযান আপাতত স্থগিত হয়েছে বটে, কিন্তু সারা বঙ্গদেশ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ আসন্ন এবং নিশ্চিত হয়ে উঠল গুরু মহারাজ। নবাব সুজাউদ্দিন মারা যাবার পর সরফরাজ খাঁ নবাব হবে। লোকটি বিচিত্রচরিত্র। শুনি ইতিমধ্যেই তার হারেমে উপপত্নীর সংখ্যা শত শত। কেউ কেউ বলে, এসব নাকি তার এক বিচিত্র ধর্মসাধনার অঙ্গ। উজীর হাজী মহম্মদ একদিকে গোঁড়া মুসলমান, অন্যদিকে রাজ্যলোভী কুচক্রী! তার সঙ্গে সরফরাজের বিবাদ লাগল বলে। আমাদের পক্ষে সুবর্ণ-সুযোগ গুরু মহারাজ। আমার প্রস্তাব আপনি বিবেচনা করে দেখুন।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ : কী প্রস্তাব?

—লোক সংগ্রহ করা, আমাদের দলকে পরিপুষ্ট করা। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা।

—সন্ন্যাসীর দলকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করতে চাও কেশবানন্দ?

—হ্যাঁ গুরু মহারাজ। হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার এ সুযোগ গেলে আর আসবে না।

মাধবানন্দ কেশবানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেশের দিকে তাকিয়ে ইষ্টদেবতার নাম নিয়ে, একটা সত্য উত্তর দেবে কেশবানন্দ?

—গুরুর সম্মুখে আমি মিথ্যা কথা বলি বলে কি গুরু মহারাজের মনে সন্দেহ হয়?

—মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা প্রকাশয়েৎ—সূত্রটি সত্য এবং মিথ্যার সীমারেখার উপর অতি সুকৌশলে স্থাপিত করে গেছেন মহাপণ্ডিত কৌটিল্য। তুমি একদা রাজ-কর্মচারী ছিলে, রাজনীতিতে তুমি অভিজ্ঞ। তোমার মনের অজ্ঞাতসারে অভ্যাস ক্রিয়া করে যায়, এটাও মানুষের একটা জীবন-সত্য। তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না।

একটু স্তব্ধ থেকে কেশবানন্দ হেসে বললেন, প্রশ্ন করুন। সত্য বলব। অত্যন্ত সতর্ক সচেতনতার সঙ্গে বিচার করেই উত্তর দেব।

—বল তো কেশবানন্দ, মুসলমান-রাজত্বের উচ্ছেদ করে হিন্দুরাজত্ব চাও, কেন? বিদ্বেষের বশে?

কেশবানন্দ স্থিরদৃষ্টিতে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তর বোধ করি সতর্ক বিচারের সঙ্গে স্থির করছিলেন।

মাধবানন্দ বললেন, রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কোন বিশেষ ধর্ম নয় কেশবানন্দ। সেটি হল ন্যায়ধর্ম। যা ন্যায়সঙ্গত তাই ধর্ম। যা অন্যায় তাই অধর্ম। এবং রাজা ন্যায়পরায়ণ হলেই রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য হয় না। রাজ্যের প্রজা যদি অন্যায় অধর্মে আসক্ত হয়, তবে সেখানেও

রাজার সঙ্গে প্রজার বিরোধ বাধে। যেখানে অন্যায়, সে এক পক্ষেই থাক্ আর দু পক্ষেই থাক্, সেখানে অশান্তি থাকবেই। এখন বল তো কেশবানন্দ. আজ দেশের এই অবস্থা, এই যে অন্যায়ের স্রোত বইছে, রাজ-অন্তঃপুর বিলাসভবন থেকে মানুষের পর্ণকুটির পর্যন্ত, এর জন্য দায়ী কি শুধু মুসলমান আধিপত্য, না হিন্দুর জীবনের বিকৃতি এবং অধঃপতনও সমানভাবে দায়ী ?

কেশবানন্দের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। একটা অবরুদ্ধ ক্রোধে তাঁর সর্ব দেহ মন যেন জ্বর-জর্জরতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

মাধবানন্দ বলেই গেলেন, কেশবানন্দের মানসিক অবস্থা তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন না তা নয়, কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি বললেন, শুধু মুসলমানকে দোষ দিয়ো না বিদ্বেষবশে, হিন্দুরও বিচার কর। বল তো, রাজা হিসাবে শুধু কি মুসলমানই অত্যাচারী ? যেখানে যেখানে হিন্দু রাজা রয়েছে সেদিকে তাকাও তো। মুসলমান যে যে অত্যাচার করে সেই সেই অত্যাচারের জন্য হিন্দু রাজারাও কি দায়ী নয় ?

এবার কেশবানন্দ অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলে উঠলেন। বললেন, আপনি গুরু, তাই কথার উত্তর দিতে কুণ্ঠা বোধ করছিলাম। এখনও কুণ্ঠা রয়েছে। তাই আপনাকে নাস্তিক, ধর্মবোধহীন বলতে বাধছে। এ কথার উত্তর মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষময় অস্ত্রাঘাতে খোদিত করে লিখে রেখেছে। তাকিয়ে দেখুন সোমনাথের দিকে, বৃন্দাবনে গোবিন্দ-মন্দিরের দিকে, কাশীধামে বেণীমাধবের ধ্বজার দিকে। এর পরও আর উত্তর চান ?

—চাই, একটা জবাব চাই।

—বলুন।

—মুসলমান মন্দির ভেঙেছে, তারা মূর্তিপূজাকে মিথ্যা মনে করে বলে। মূর্তি যদি সত্যই হয় কেশবানন্দ, তবে মূর্তি ভেদ করে দেবতা আবির্ভূত হয়ে সেই সত্য প্রকট হল না কেন ?

কেশবানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মাধবানন্দ বললেন, আমার ধারণা কী জান ? হিন্দুই তার অনাচারে আচারের নামে অধর্মকে আশ্রয় করে দেববিগ্রহ থেকে দেবত্বকে নির্বাসিত করেছে। মাটির প্রদীপে আগুন ধরালেই প্রদীপ জ্বলে, আবার নিবিয়ে দিলেই নিবে যায়। জ্বালেও মানুষ, নেবায়ও মানুষ। যতক্ষণ সে ন্যায়কর্ম করে ততক্ষণ তার আলো না হলে চলে না, যখন সে অন্যায় করে তখন প্রথমেই সেই আলোটা নিবিয়ে দেয়। অন্ধকার—চারিদিক অন্ধকার কেশবানন্দ ; কাল রাত্রে আকাশে একটি তারাও দেখতে পাই নি। তারই মধ্যে দেখেছি বোধ করি এ দেশের সত্য অবস্থা। অন্ধকারে অনেক হানাহানি, অনেক রক্তপাত, অনেক রাজা বদল হয়েছে কেশবানন্দ। আর অন্ধকারে নয়—আলো জ্বালো, জীবনে জীবনে আলো জ্বালো ; আলোয় আলো হয়ে উঠুক, তারপর দেখবে সমাজে শান্তি আসবে, মন্দিরে দেবতা আসবেন, অধর্ম দূরে যাবে ; রাজা ধার্মিক হবে।

কেশবানন্দ এতক্ষণে যেন স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে আত্মস্থ হলেন। তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে

উঠেছে, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল স্থির। মাধবানন্দ বললেন, শোন কেশবানন্দ, শেষ কথা বলি। অধার্মিক রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধার্মিক প্রজার অভ্যুত্থান-বিদ্রোহ সে শুধু অধর্মকেই প্রবল করে তোলে, জীবনের দুঃখকেই বাড়িয়ে তোলে। অধার্মিক রাজারও স্বেচ্ছাচারের অধিকার নাই, অধার্মিক প্রজারও অভ্যুত্থানের অধিকার নাই কেশবানন্দ। অধিকার আছে শুধু অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের অভ্যুত্থানের।

কেশবানন্দ এবার বললেন, নিশ্চয়, সে-কথা আমি অস্বীকার করি না। এ-কথা শুধু আপনি গুরু, আপনার বাক্য গুরুবাক্য বলেই মানি না, সর্বান্তঃকরণে মানি। আমাদের দেশের সব মানুষই মানে। ধর্ম যেখানে সত্য, সেখানে হিন্দু-মুসলমান বিচার কেউ করে না। সিদ্ধ সাধক যিনি, তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, তাঁর প্রতি মানুষের সমান ভক্তি। সেই কারণেই ধর্মদ্বেষী বিধর্মী রাজশক্তির পতনের সময় যখন আসন্ন তখন তার উচ্ছেদ করলে, আমি মহাধর্ম বলে মনে করি। প্রজার অধঃপতন, তাদের মধ্যে ধর্মের বিকৃতি সত্য; স্বীকার করি। কিন্তু সে অধর্মের পঙ্ক থেকে টেনে তোলার যে পন্থা আপনি নির্ধারণ করেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই। রাজশক্তি অনুকূল হলে, সে কাজ সহজে হবে। শক্তি যদি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের হাতে আসে, তবে সে কর্ম হবে অতি সহজে।

ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজ কত অংশ ছদ্মবেশী পাপী চোর ডাকাত খুনী ব্যভিচারী, আর কত অংশ সত্যকারের সাধু ঈশ্বরসন্ধানী তুমি বলতে পার কেশবানন্দ? এমন কি নানান মঠের দিকে তাকিয়ে কথা বল। যারা শুধু ডাল-রুটি খায়, যৌগিক পন্থায় দেহচর্চা করে ত্রিশূল হাতে মদমত্তের মত বেড়ায়, তারাও কি সত্যকারের সন্ন্যাসী? আজ সারা ভারতবর্ষে নিরীহ তীর্থযাত্রীদের ধন-প্রাণ সাধুর বেশধারী পাষণ্ডদলের অত্যাচারে বিপন্ন। এদের নিয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপনের কল্পনা, আকাশকুসুম কেশবানন্দ। কেশবানন্দ, সেদিন রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামীর কথা তো আলোচনা করেছি। আজ যদি হিন্দুস্থানের রাজশক্তি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের হাতে আসে, তবে ওই রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামীই তো প্রধান হবেন। অনুমান করতে পার, কেমন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে?

কেশবানন্দ আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে কথাগুলি শুনলেন, তারপর বললেন, শুনুন গুরু মহারাজ, আমি আপনাকে বলি। আপনি ধর্মনীতি জানেন, রাজনীতি জানেন না বা বোঝেন না। রাজেন্দ্র গিরি গোসাঁইরা শক্তিমান দুর্ধর্ষ; ওরা লড়াই করে লড়াই জিততে জানে, কিন্তু রাজনীতি জানে না। তাই ওরা সিংহাসনেও অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না! আজ দিল্লির দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাদশাহের আমল চলে গিয়েছে। উজিরের আমল এসেছে। মুরশিদাবাদের হাজী মহম্মদের দিকে তাকান। গুরু মহারাজ, শিষ্যকে গুরুর আদেশ মানতে হয়, গুরুকেও শিষ্যের পরামর্শ শুনতে হয়। আমার পরামর্শ শুনুন। অন্যথায়, গুরুর অভিশাপ যেমন শিষ্যকে লাগে শিষ্যের অভিশাপও ঠিক তেমনি ভাবেই ক্রিয়া করে গুরুর উপর। আজ আমরা প্রতিটি শিষ্য একমত। আমাদের অনুরোধ রাখুন, পরামর্শ শুনুন, না হলে—

তার চোখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হলেন মাধবানন্দ। প্রচ্ছন্ন আগুন যেন দৃষ্টির

উত্তাপে আভাস দিচ্ছে। কথা অসমাপ্ত রেখেই স্তব্ধ হয়েছিলেন কেশবানন্দ। মাধবানন্দ সেই কথাটি ধরেই প্রশ্ন করলেন, না হলে গুরুবধেও তোমরা নিরস্ত হবে না ?

—না, সে পাপ করব না। আপনাকে পঙ্গু করে খেলার পুতুলের মত সামনে ধরে রেখে আমরা কাজ করে যাব।

—আমাকে বন্দী করবে ?

—বন্দী নয়। অসুস্থ মতিভ্রান্ত গৃহকর্তাকে যে যত্ন এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে সর্বদাই চোখে চোখে রাখতে হয়, তাই রাখব। ভোরবেলা আপনি ফিরে এসে যখনই আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, তখন থেকেই সেই যত্নে সেই ভাবেই আপনি আছেন গুরু মহারাজ।

এবার মাধবানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লক্ষ্য করলেন, দুটি তরুণ শিষ্য দুই দিকে নিস্পৃহের মত সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা যে অতি সতর্ক তাতে সন্দেহ নেই।

কেশবানন্দ আবার বললেন, আপনি আগুন জেলেছেন। সে আগুন যখন জ্বলেছে তখন তার গতি নির্ধারিত হবে বায়ুর দ্বারা, তার সম্মুখে বিস্তৃত দাহ্যবস্তুর পরিমাণের দ্বারা। গুরু-মহারাজ, আজ এ উদ্যমকে ঠেকাবার শক্তি কারুর নাই। চারিদিকে আয়োজন শুরু হয়েছে। এ আয়োজন মহাকালের অভিপ্রায়। বর্ষায় যেমন সকল বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সবলে মাটি ঠেলে ওঠে, তেমনিভাবে এর অভ্যুদয় হচ্ছে। শুনুন, ওপারের সুপুরে আনন্দচাঁদ গোস্বামী—সামান্য একজন বৈষ্ণব গুরু, সেও গড় তৈরি করছে। আমাদের আজ আপনি নিবৃত্তি হতে বলছেন কিন্তু যেদিন রাধাকে নির্বাসিত করে শুধু কংসারিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, হাতের বাঁশি ফেলে দিয়ে চক্র এবং অসি হাতে দিয়ে তাঁকে ভজনা করতে বলেছিলেন, সেদিন এ-কথা ভাবেন নি কেন ?

—কংসারিকেও পরিশেষে প্রভাসে যদুবংশ-ধ্বংস স্বচক্ষে দেখতে হয়েছিল কেশবানন্দ।

—উপায় নাই গুরু মহারাজ, দেখতে হয় দেখব ; কিন্তু কংসারিকে যখন ভজনা করেছি তখন কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর আমাদের হতেই হবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কেশবানন্দ যে সংবাদ পেয়েছেন সুপুরের আনন্দচাঁদ গোস্বামীর গড় তৈয়ারি সম্পর্কে, সে সংবাদ মিথ্যা নয়! সংবাদটা এখনও সকল লোকে জানে না। যারা গড়ের গড়ন কাজ দেখেছে তাদের মধ্যেই সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়েছে, যেন 'গড় গড়' মনে হচ্ছে।

আনন্দচাঁদ নব-বৃন্দাবন তৈরি করাচ্ছিলেন। যমুনা-পুলিন, দ্বাদশ-বন, গিরিগোবর্ধন, রাস-মঞ্চ, দোল-মঞ্চ, ঝুলন-মঞ্চ ইত্যাদি বৃন্দাবনের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণ লীলাভবনগুলি প্রকট করবার আয়োজন করেছেন অনেক দিন থেকেই। রাস-মঞ্চ, ঝুলন-মঞ্চ, দোল-মঞ্চগুলি তৈরি হয়েছে প্রথমেই। এখন তৈরি হচ্ছে যমুনা-পুলিন এবং ঘাটগুলি ; লম্বা নদীর আকারের

ঝিল কাটা হচ্ছিল এবং চারিপাশে চারিটি সিংহদ্বার তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ লোকের একদিন চোখে পড়ল যে, ঝিল-কাটা মাটিগুলি থেকে যে পাড় তৈরি হয়েছে সে পাড় আর গড়বন্দীর পগার অর্থাৎ মাটির তৈরি সুদৃঢ় গড়বেষ্টনীতে কোন তফাত নেই। এবং সেই বেষ্টনীর উপর এমন ঘন করে গাছের ডাল কেটে লাগানো হয়েছে যে, আগামী দুটো বর্ষার জল পেয়ে ডালগুলি সজীব বৃক্ষে পরিণত হয়ে দুর্ভেদ্য বৃক্ষবেষ্টনীতে পরিণত হবে। মানুষ দূরের কথা, সে বেষ্টনী পার হয়ে শেয়াল-কুকুরও ঢুকতে পারবে না। তীর দূরের কথা, বন্দুকের গুলিও সে বেষ্টনী ভেদ করতে পারবে না। এবং চারপাশে যে চারটি ফটক তৈরি হচ্ছে তার চেহারাও ঠিক গড়ের ফটকের চেহারা নিচ্ছে। তবে এটা এখনও ঠিক, সর্বসাধারণের চোখে ঠেকবার মতন গড়ন নেয় নি। যারা হাতেমপুর রাজনগর প্রভৃতি গড়ের চেহারা দেখছে, তাদের মধ্যে যারা চতুর বুদ্ধিমান, তারাই এটা ধরতে পেরেছে।

দু-একজন এ নিয়ে একটু খোঁজখবরও করেছে। তাতে তারা যা শুনেছে, সে শুনে তারা বিস্মিত না হয়ে পারে নি। তারা শুনেছে যে, আপনা-আপনি অর্থাৎ যারা কাজকর্ম করছে হাতে-হাতিয়ারে, তাদের অজ্ঞাতসারেই এমনি চেহারা হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আঁকাবাঁকা ঝিল কেটে মাটি ফেলে পাড় তৈরী করতে গিয়ে দেখা গেল যে, ঠিক গড়বন্দীর পগার হয়ে গেছে। ফটক তৈরি করতে গিয়ে রাজমিস্ত্রীদের অজ্ঞাতসারেই গড়ের ফটক হয়ে যাচ্ছে।

আনন্দচাঁদ বলেছেন, শ্যামসুন্দরের অভিপ্রায়ে হচ্ছে। কী অভিপ্রায় এখনও বলেন নি।

আনন্দচাঁদের কথায় অবিশ্বাস করবে কে? গোস্বামী এ অঞ্চলে সিদ্ধপুরুষ বলে সুপরিচিত। গৃহস্থ বৈষ্ণবদের সর্বপ্রধান গুরু, মাথার মণি। বিচিত্র মানুষ। যুগলভাবের উপাসক, ভাবুকচূড়ামণি রসিকদের মহাজন অথচ নারী-সংস্পর্শহীন ব্রহ্মচারী, অকৃতদার। বিপুল বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী, অথচ নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। বিষয় তাঁকে অর্জন করতে হয় না, বিষয় তাঁর কাছে এসে প্রায় আত্মসমর্পণ করে। এ অঞ্চলের গৃহস্থ বৈষ্ণবদের যারা সন্তানহীন বা নিকট উত্তরাধিকারীহীন, তাদের অন্তে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন আনন্দচাঁদ। তাদের পারলৌকিক ক্রিয়ার দায় তাঁরই। তাঁর এ অধিকার বৈষ্ণব গৃহস্থ-সম্প্রদায়ই দিয়েছে। লোকের বিশ্বাস, আনন্দচাঁদ যাদের পারলৌকিক ক্রিয়া করেন, তাদের সংসার-জীবনের কর্ম যাই হোক না কেন, মোক্ষ তাদের অবধারিত। এমন অনেক ভক্ত আছে যারা নিঃসন্তান হয়েই মৃত্যু কামনা করে, যাতে তার পারলৌকিক ক্রিয়ার দায় আনন্দচাঁদের উপর গিয়ে পড়ে। এই ভাবেই আপনা থেকে বিপুল বিষয় আনন্দচাঁদের হাতে এসেছে। সে বিষয় আনন্দচাঁদ তাঁর উপাস্য দেবতা শ্যামসুন্দরকে সমর্পণ করেন, তাঁরই সেবক হিসাবে পরিচালনা করেন—নিজে নিরাসক্ত সন্ন্যাসী।

বাউল-বৈরাগীদের এই অধিকার ছিল ইলামবাজারের প্রেমদাস মহান্তের। এখন তার উত্তরাধিকারিণী কৃষ্ণদাসী মা-জীর।

এ নিয়ে প্রেমদাস মহান্তের সঙ্গে আনন্দচাঁদের একটা নাকি আপস-মীমাংসা হয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা, পঁচিশ বছর পূর্বের কথা। অবশ্য সবই লোকের কথা। লোক-প্রবাদ।

তখন বৈষ্ণবতন্ত্রে সাধনকামী বহু লোক সিদ্ধপুরুষ বাউল বৈরাগী প্রেমদাস বৈরাগীর কাছে যারা দীক্ষা নিত বা সাধন-ভজন শিক্ষা নিত, তাদের উপর এবং বাউলদের উপর ব্রাহ্মণ গুরু গোসাঁইরা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যারা দীক্ষা নিত তাদের পতিত করবার বিধানও তারা জারি করেছিল, কিন্তু জাতহীন কুলহীন বাউলদের কী করবে তারা? ওদিকে পরকীয়া-মতে বিশেষ তন্ত্রে সাধন-ভজনের স্রোত এমনি প্রবল যে, এ বিধান সত্ত্বেও গোপনে প্রেমদাসের গুরুগিরি প্রায় অবাধে চলত। ব্রাহ্মণেরা অনেক কিছু নূতন মতের প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা অর্থাৎ গুরু-পেশাধারী ব্রাহ্মণেরা বাড়িতে প্রায় হাট বসিয়ে দেবতার সেবা বসিয়ে দিয়েছিলেন। একটি খড়ো আটচালা নাটমন্দিরের চারিদিকে কালী দুর্গা শিব রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করে ফুল বেলপাতা তুলসীপাত্র আতপচাল এবং গুড় নিয়ে যথাসাধ্য পূজার ব্যবস্থা করতেন। নিজে শাক্ত শৈব বৈষ্ণব যে মন্ত্রের উপাসক হোক, যে-কোন মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা তাঁদের ছিলই, এবার সে ব্যবস্থাকে ফলাও করে প্রায় বীজমন্ত্রের ব্যবস্থা খুলে দিলেন।

প্রেমদাস হেসে বলত, বামুন মশায়রা খেয়া ঘাট ডাক নিয়েছেন গো। কড়ি দিয়ে মন্তর নিলেই নায়ের জায়গা কেনা হয়ে যাবে। বছরে বছরে পেনামী আর ছেরাদ্দের সময় গুরুবরণ সুখশয্যে দিয়ো, তা হলেই ওপারে নন্দনকাননে মৌরসী পাট্টা কেনা হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে শাক্ত ব্রাহ্মণেরা অট্টহাসি হাসতেন। বলতেন, পটোদের পট দেখেছিস? নরকের সাজা? ন্যাড়ানেড়ীদের গরম তেলে ফেলে ভাজবে। সশব্দে বলতেন, ছ্যাক—কলো কলো। ওপথে ওই গতি।

শুধু ব্যঙ্গ-রহস্যেই এমন বিষয়ের শেষ হয় না। মানুষের অন্তরের তৃষ্ণা অকৃত্রিম, সে সুরায় মেটে না, সে শরবতেও মেটে না। সে জলধারার উৎসের জন্য ব্যাকুল। সেই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ-গুরুরা শাস্ত্রের নজির দেখিয়ে শিষ্যের রাশিনক্ষত্র বিচার করে, চরিত্র এবং রুচি বিচার করে তদনুযায়ী বীজমন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছেন এবং ভরসা দিয়ে বিশ্বাস করতে বলেছেন, এই নির্মল জল। অধিকাংশ জলই অশ্বত্থামার পিটুলি-গোলা জল। পান করে দুগ্ধ-পানের স্বাদ পেয়েছে বলে বিশ্বাসও করেছে। সুপুরের ভট্টাচার্য-বংশ বিখ্যাত গুরুবংশ। এই বংশের ব্রজমোহন ভট্টাচার্য সিদ্ধ শক্তিসাধক। পাগল মানুষ। নিজে কাউকে দীক্ষা দেন না। কিন্তু কেউ তাঁদের পাটে মন্ত্রদীক্ষা নিতে এলে তিনি বীজ বিচার করে দেন অলৌকিক উপায়ে। তিনি বলেন, যা, ওই বাড়ির পিছনে পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখ্, জবার গাছ আছে। যা তুলে আন্। ঢেকে আনবি। যেন আলো না লাগে। বুঝলি?

সে ফুল তুলে নির্দেশমত ঢাকা দিয়েই নিয়ে আসে। ক্ষ্যাপা ভটচাজ বলেন, খোল্ ব্যাটা, ঢাকা খোল্, দেখি।

খুললে দেখা যায় কারুর জবাফুল জবাফুলই আছে। সে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা পায়। কিন্তু কারুর জবাফুল মালতীফুল হয়ে যায়। কারুর হয়ে যায় ধুতুরা। যার ফুল মালতী হয় তাকে নিতে হয় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা। যার হাতে জবা হয় ধুতুরা—তার ইষ্ট হল শিব।

এ ছাড়া আরও আছে—কোষ্ঠীবিচারে ত্রিপাপ প্রভৃতি দুঃসময়ে গ্রহশান্তিযোগের ব্যবস্থায় নবগ্রহের শক্তিদেবতা নবমহাবিদ্যার অর্চনা ছাড়া গ্রহযাগ হয় না। সেসব সময়ে তান্ত্রিক

ব্রাহ্মণ ছাড়া গতি থাকে না। এর ফলে বৈষ্ণব ধর্মের যতই প্রসার থাক্, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের প্রভাব ছিল অব্যাহত। কাজেই তান্ত্রিকদের কাছে বৈষ্ণবদের খাটো হয়ে থাকতে হত।

লোকে বলে, এই অঞ্চলে বৈরাগীদের ও বৈষ্ণব-গুরুদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-গুরুদের বিরোধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন আনন্দচাঁদ।

আনন্দচাঁদেরা পুরুষানুক্রমে সুপুরের ভটচাজ-বংশেরই শিষ্য এবং তাঁরা শক্তিমন্ত্রের উপাসক ব্রাহ্মণবংশ। এই বংশের সন্তান আনন্দচাঁদ জন্ম থেকেই অসাধারণ। রূপে অসাধারণ, অপরূপ রূপবান। তেমনি সুকণ্ঠ, তেমনি মেধা। প্রকৃতিতেও তেমনি অসাধারণ, এমন কি দেহ-প্রকৃতিতেও। মাছ-ভাতের দেশ বাংলা দেশের শাক্তবংশের ছেলে, সেই ছেলের জন্মাবধি অরুচি আমিষে, এমন কি মাছের সংস্পর্শদুষ্ট খাদ্য পেটে গেলে আনন্দচাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বাল্যকাল থেকেই ধর্মে আসক্তি আনন্দচাঁদের। ভালবাসতেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি।

উপনয়নের পর দীক্ষার জন্য গিয়েছিলেন খোদ ব্রজমোহন ভট্টাচার্যের কাছে।

খ্যাপা ভটচাজ আনন্দচাঁদকে দেখে খুব খুশী হয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ওরে—ওরে—ওরে, তোর গলায় পৈতে ক্যানে রে! অ্যাঁ? তুই তো দ্বাপরে ছিলি গোয়ালিনী, তুই তো রাধা রে! নূতন সাধন করতে এসেছিস এ জন্মে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আনন্দচাঁদ।

ভটচাজ বলেছিলেন, তোর মনে নাই। তুই কুঞ্জবনে কালার সঙ্গে পীরিত করেছিলি, কুটিলে তোকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে বলে আয়ানকে ডেকে নিয়ে এল। তুই বললি—কী হবে কালাচাঁদ? কালাচাঁদ বললে—ভয় কী? আমি কালী হচ্ছি, তুমি আমাকে পুজা কর। কালা হলেন কালী, মালতীমালা হল জবার মালা, শ্বেতচন্দন হল রক্তচন্দন। দেখে শুনে আয়ান খুশী হল। রাধার মান বাঁচল। কিন্তু তার মাশুল দিতে হবে তো! এ জন্মে তোকে কালীকে কালা করতে হবে রে। জবাফুলকে মালতীফুল করতে হবে। হ্যাঁ, দীক্ষা তোকে আমি নিজে দোব। এই কালীমন্ত্রে। সাধনা করতে করতে একদিন সামনে দেখবি কালী হলেন কালাচাঁদ; শক্তিবীজ হয়ে যাবে বৈষ্ণববীজ। ভয় নাই রে, ভয় নাই। পনের আনা হয়ে আছে, বাকী এক আনা—আপনি হবে রে, আপনি হবে। কালীর সামনে আসন করে বসলেই বুকের ভেতরটা থালুবালু করবে, টনটন করবে, চোখ থেকে জলের বান ডাকবে; সেই জলের অভিষেকে কালী হবে কালা। মুণ্ডমালা হবে বনমালা। জবার মালা হবে মালতীর মালা, অঙ্গের দাগ ধুয়ে যাবে। বোস্ রে বেটা, বোস্। দিয়ে দি কানে ফুঁ। জয় কালী—জয় কালী—জয় কালী!

আনন্দচাঁদকে তিনি শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। আনন্দচাঁদ বলতে পারেন নি, না না। আমাকে বৈষ্ণব যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দাও।

কঠিন মর্ম-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল আনন্দচাঁদকে। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে উঠতেন ঘুমের ঘোরে। সেই মর্ম-যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি গিয়েছিলেন বৈরাগী বাউল সাধক প্রেমদাস মহান্তের কাছে। গিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। প্রেমদাসের সিদ্ধি ছিল যোগিনী-বিদ্যার সিদ্ধি; শুদ্ধ ভগবৎসাধনার সিদ্ধি থেকে সেই সিদ্ধি নীচের স্তরের সিদ্ধি। অষ্টাদশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগ তখন, তখন ডাকিনী যোগিনী পিশাচ প্রভৃতি নানান ধরনের সাধনা ও সিদ্ধির বিশ্বাস এবং অস্তিত্ব বিপুল ও প্রবল। প্রেমদাস আনন্দচাঁদের মত এমন সর্বসুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে, বিশেষ করে তান্ত্রিক ভট্টাচার্যের শিষ্যকে, মন্ত্রভিক্ষার্থী হিসাবে পেয়ে আনন্দে উল্লাসে দু হাত তুলে নেচেছিল এবং আনন্দচাঁদকে যোগিনী-বিদ্যা দিয়ে এক রাত্রের সাধনায় সিদ্ধি পর্যন্ত পাইয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, জয় গুরু! জয় গুরু! তোমার জন্যেই তো বসে আছি গো—পরমধন নিয়ে। দোব—আজই দোব। এই রাত্রেই দোব। শ্যামা শ্যামা হবে চোখের পলকে—ভাবনা কিসের?

দিন দেখে নি, ক্ষণ দেখে নি, আনন্দচাঁদকে দীক্ষা দিতে বসে গিয়েছিল। শ্যামা-মূর্তি সত্য-সত্যই নটবর বংশীধারী শ্যামরূপে প্রকট হয়েছিলেন আনন্দচাঁদের চোখের সম্মুখে। কিন্তু শুধু শ্যাম, পাশে রাধার প্রকাশ হয় নি।

আনন্দচাঁদ বলেছিলেন, রাধা কই মহান্ত? রাধা?

মহান্ত বলেছিলেন, তাই তো ঠাকুর!

ভটচায বলতেন, প্রেমদাস ডাকিনী-সিদ্ধি প্রভাবে শ্যামামূর্তিকে শ্যাম-বিগ্রহে রূপান্তরিত করেছিল। ডাকিনী-সিদ্ধির প্রভাবে অলৌকিক অনেক কিছু ঘটানো যায়, কিন্তু আসলে তা 'মায়া'র খেলা মাত্র; সত্য নয়।

শেষ পর্যন্ত প্রেমদাস নিজেই এ সত্য স্বীকার করে বলেছিল, ঠাকুর, এর পর তোমাকে সাধনা করে আসল সিদ্ধি পেতে হবে। আমি তোমাকে ডাকিনী-সিদ্ধি দিয়েছি। আর এর সঙ্গে যদি বামুনের জাত পৈতে সব ফেলে দিয়ে আমার মত ছাড়া বৈরাগী বৈরাগিনী নিয়ে ভজন করতে পার—

আনন্দচাঁদ তা পারেন নি। মুহূর্তে শ্যাম আবার শ্যামা হয়ে উঠেছিল। তিনি সভয়ে আসন ছেড়ে উঠে বলেছিলেন, না। না। না।

প্রেমদাস বলেছিল, এঃ, ন্যাংটা মেয়ের ভূতো ছেলে ভটচায বামুন মুড়ো মেরে দিয়েছে। বামুনের সাধন মোক্ষম বাবা। এ একদিনের কাজ নয়। সময় লাগবে। তুমি ভেক নিয়ে বৈরাগী হয়ে এইখানে থাক—মন্তর-তন্তর দেব-দেবী বাদ দাও। মালা-চন্দন করে বৈরাগিনী নিয়ে শুরু কর—

আনন্দ বলেছিলেন, না। তখন তাঁর সম্বিৎ ফিরেছে।

প্রেমদাস তখন বলেছিল, তা হলে ঠাকুর আমার দোষ নাই। তোমার অদেষ্ট। কিন্তু আমার কাছে যা হোক কিছু পেলে তো, তা তার দক্ষিণে তো আমার পাওনা বটে।

আনন্দ বলেছিলেন, বল, কী চাও?

প্রেমদাস বলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি গো, তুমি এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় গুরু হবে বৈষ্ণব সমাজে। বল, আমাদের বাউলদের ওপর তুমি বিধেন দেবে না। বাক্যি দাও।

আনন্দ বলেছিলেন, দিলাম।

—বল গোসাঁই, আমাদের বৈরাগী-বৈরেগিনীরা যা করবে তা নিয়ে দেশের মাঝে দশে যে রটনাই করুক, তুমি কিছু বলবে না। ঠাকুর, মনসার কথার সেই কথা গো—যা গেল দেখবে

তা মুখে বলবে না কোন লোককে, স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে কোনখানে, কারুর কাছে। দেবতা পাপ বলুক, মানুষ পাপ বলুক, দৈত্যি পাপ বলুক, তুমি বলবে না।

—বলব না।

—আমাদের পাওনায় আমাদের পথে আমাদের ঘাটে আমাদের হাটে তুমি হাত বাড়াবে না।

—বাড়াব না।

—বাস্। তোমাকে যা দিয়েছি তা তোমার পায়ের কড়ি না হোক, ভবের হাটের মূলধন হবে বাবা।

সিদ্ধ তান্ত্রিক ব্রজ ভটচাযের কাছে এ সংবাদ অগোচর থাকে নি। সেই রাত্রেই তিনি ধ্যানযোগে জেনেছিলেন। পরের দিন প্রত্যূষে আনন্দচাঁদ ক্লান্ত দেহমন নিয়ে গ্রামে ফেরবার পথে ভটচায পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন, করলি কী? ওরে ব্যাটা, এ তুই কী করলি? যোগিনী-সিদ্ধি পেয়ে পূর্ণসিদ্ধির পথে কাঁটা দিলি? ছি ছি ছি! তুই পনের আনা নিয়ে জন্মেছিলি। আমি তোকে দীক্ষা দিয়ে পনের আনা তিন পয়সা করে দিয়েছিলাম রে ব্যাটা। শোন্ রে ব্যাটা। ওই বৈরেগী ব্যাটার যোগিনীমন্ত্র নিয়ে তুই জাদুবিদ্যা পেয়েছিস—যা কালীর কালা হওয়া দেখেছিস সে হল ভেল্কীবাজি। ওতে আমি যে তিন পয়সা তোকে দিয়েছি তার এক পয়সা তুই হারিয়েছিস। এই ঘাটতি দু পয়সার এক পয়সা যদি বা তুই সাধনভজনে পূরণ করতে পারিস, এক পয়সা ঘাটতি তোর থেকেই যাবে এ জন্মে। শোন্ তোর ষোল আনার পথে দুটো 'রা'য়ের কাঁটা ছিল। এক রাধা আর এক রাজ্য। মেয়ে আর মাটি। তা তোকেই 'রাধা' বলে মন্ত্র দেবার সময় মেয়ের বাধা আমি ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওদিকে তোর মন কিছুতেই যাবে না, ভুলবে না। কিন্তু 'মাটি', 'রাজ্য' তোর পথের এমন কাঁটা হয়ে রইল যে, কাঁটা এ জন্মে ঘুচবে না। কি জাদুমন্ত্র যেচে নিয়েছিস সেই মন্ত্রই মাটি এনে তোকে মালিক করে দেবে। শোন্, আরও বলি—

ভটচাযের কথা মিথ্যা হয় নি। আনন্দচাঁদের অলৌকিক শক্তির খ্যাতি কিছুদিনের মধ্যেই এমনভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, বৈষ্ণবমন্ত্র-অভিলাষী গৃহস্থ-সম্প্রদায় দলে দলে তাঁর পায়ে এসে গড়িয়ে পড়ল। অলৌকিক শক্তির প্রকাশ আনন্দচাঁদ ইচ্ছে করে দেখাতেন না, কার্যকলাপে ঘটনাসংস্থান এমনিই হয়ে উঠত যে প্রকাশে তিনি বাধ্য হতেন। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম, মন্ত্রসিদ্ধির যুগ; সে যুগে আনন্দচাঁদের সিদ্ধবিদ্যা নিষ্ক্রিয় সুপ্ত থাকবার নয়, থাকেও নি।

প্রথম খুসটিকুরির সিদ্ধ পীর সৈয়দ হোসেন সাহেব তাঁকে উপঢৌকন দিতে মাংস নিয়ে এলে আনন্দচাঁদ সেই রক্তসিক্ত মাংসকে রক্তরাঙা গোলাপফুলে পরিণত করে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রকাশ্যে বাধ্য হন। এ ছাড়া তাঁর উপায় কী ছিল?

ভটচায তখনও বেঁচে, তিনি হা-হা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ওরে, সাপ যতই লুকিয়ে রাখ্, ফোঁস সে করবেই। সাপের ওঝা সাপ না ধরেও থাকতে পারে না, কামড়ও খায়, মরেও ওতেই।

এর পরই ঘটে আর একটি ঘটনা। যে ঘটনায় আনন্দচাঁদের জীবনের পথ এবং গতি নির্দিষ্টরূপে নির্ধারিত হয়ে যায়। আনন্দচাঁদ গিয়েছিলেন মকর-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়ের প্রবাহের ধারে গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য। বহু জন-সমাগমের মধ্যে এসেছিলেন এক সন্তানহীনা তরুণী বিধবা ধনী-গৃহিণী। সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের সুন্দরী। এই গৃহিণীটির সমাজে খুব সুনাম ছিল না। না থাকারই কথা। বিবাহ হয়েছিল বৃদ্ধ ধনীর সঙ্গে, বৃদ্ধের চতুর্থ পক্ষে। বৃদ্ধের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি সন্তানের। সন্তান একটি হয়েছিল। তার পরই বৃদ্ধ গত হন। বিধবাই হন পুত্রের মাতা হিসাবে সম্পত্তির একচ্ছত্রাধিকারিণী। তার পরই এই তরুণ বয়সের প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং সম্পত্তির প্রভাবে শক্তির মত্ততায় প্রায় স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে ওঠেন। ফল পেতেও দেরি হয় নি, পাঁচ বৎসরের সুন্দর ছেলেটি মারা যায়। লোকে ভেবেছিল, এই আঘাতে তাঁর চৈতন্য হবে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা ফল হয়েছিল বিপরীত। বিধবাটি যেন বন্ধনহীন হয়ে স্বেচ্ছচারে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এই ধরনের মেলায় তীর্থে যেতেন বিপুল সমারোহ করে, উদ্দেশ্য পুণ্যসঞ্চয় নয়, প্রমত্ততার ঘূর্ণাবর্তে অবগাহন করা। জয়দেবের মেলায় আনন্দচাঁদকে দেখে তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। আনন্দচাঁদ একটু হেসে বলেছিলেন, আমি তো যেতে পারব না, তাঁকে আসতে বল এইখানে। প্রমত্তা বিধবা তাই এসেছিলেন, এবং এসেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, গোপাল—আমার গোপাল—ওরে গোপাল! দুই হাত বাড়িয়ে আনন্দচাঁদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কে? তুমি? আমার গোপাল কই? আমার গোপাল?

প্রবৃত্তি-প্রমত্তা বিধবা আনন্দচাঁদের কাছে এসে তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন তাঁর মৃত সন্তানকে। মনে হয়েছিল তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সেই সন্তানটি বসে আছে। দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে এসে দেখলেন, কোথায় গোপাল? গোপাল নয়, বসে আছেন আনন্দচাঁদ।

আনন্দচাঁদ হেসে বলেছিলেন, কেন মা, এই তো আমি তোমার গোপাল।

বিধবা আবার আনন্দচাঁদের মধ্যে তাঁর মৃত সন্তানকে দেখেছিলেন। এবং এর পর আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন আনন্দচাঁদের পায়ের উপর। চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল বিধবার প্রবৃত্তির তাড়না। দুটি পা ধরে স্বীকার করেছিলেন জীবনের সকল পাপ।

আনন্দচাঁদ বলেছিলেন, সব পাপ তো চোখের জলে ধুয়ে আমার পায়ে ঢেলে দিলে, আবার ভয় কী?

বিধবা বলেছিলেন, আবার যদি সেই মতি জাগে?

—জাগবে না। আমি তোমায় মন্ত্র দেব। সেই মন্ত্রজপে রক্ষা পাবে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বিধবা বলে উঠেছিলেন, না না না।

—কেন?

—আমার গোপালকে তো তা হলে দেখতে পাব না তোমার মধ্যে! তুমি যে আমার

গুরু হবে!

—তবুও পাবে। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

—তা হলে আর এক শর্ত করতে হবে। আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তি তোমাকে নিতে হবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে চোখ বুজব, জেনে যাব, আমার ধন আমার গোপাল পেলে।

—নেব। কিন্তু আমার দেবতার নামে নেব।

—সে তোমার যা খুশি।

বিধবাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে তাঁর পরলোকের ভার নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন আনন্দচাঁদ। সংবাদটা সেই দিনই সেই মেলার জনতার মারফতে দিকে দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

ব্রজমোহন ভটচায হা-হা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, আমি জানি, আমি জানি। মাটির চোরা বালিতে বেটার পা ডুববেই। ডুবল। শেষে পয়সা খামতি থেকে গেল, থেকে গেল, থেকে গেল—জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী!

এ কথা কানে পৌছলে আনন্দচাঁদ চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। যে কর্ম তিনি করেছেন তার ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সে ফল সারা জীবনই পেয়ে চলেছেন। আজ গৃহস্থ বৈষ্ণবদের গুরুর গুরু তিনি। উত্তরাধিকারীহীন গৃহস্থ বৈষ্ণবের সম্পত্তি আজ এসে তাঁকেই অর্সায়। ইষ্টদেবতা গোবিন্দের নামে তিনি গ্রহণ করেন। গোবিন্দের আজ বিপুল সম্পত্তি। ধর্মসাধনার সঙ্গে সে সম্পত্তিও তাঁকে পরিচালনা করতে হয়। বাউল বৈরাগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারপর আর তিনি সম্পর্ক রাখেন নি। তবে তাদের স্নেহ করেন। প্রেমদাস বাবাজীও তার সম্প্রদায়কে দূরে দূরে থাকতেই বলে গেছে।

—তেলে জলে মিশ খায় না। ভুল আমারও, গোসাঁইয়েরও। তোরা আর ভুল করিস না। যাস না ওর কাছে. ওরও সহ্য হবে না, আমাদেরও না। তবে বামুন বৈরাগীর মন্তরে সিদ্ধ হলে রাজা হয়, দেখ্ চোখের ওপর। রাজ-দরবার গেরস্তের জন্যে, সম্পত্তিবানের জন্যে। আমাদের মত ভিখারীর জন্যে নয়।

*   *   *

সেইদিনই কেশবানন্দ চলেছিলেন এই আনন্দচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। বাস্তববাদী বুদ্ধিমান সনাতনরটি আনন্দচাঁদ সিদ্ধপুরুষ কিনা বিচার করেন নি। বিচার করে বুঝেছিলেন আনন্দ শক্তিমান এবং বুদ্ধিমান। বিলম্ব তিনি করবেন না। হয়তো বিলম্ব ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু এর আগে কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। সমস্ত সংবাদ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। শুধু আনন্দচাঁদেরই নয়, এখানকার সকল বর্ধিষ্ণু লোকের নির্ভুল ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন এই চতুর রাজনীতিবিদ সন্ন্যাসী। এবং নারকেলের মত ছোবড়া ছাড়িয়ে খোলা ভেঙে তার শাঁস বের করার মত সমস্ত ইতিহাসের মর্ম উদ্ঘাটিত করে তার আসল সত্যটি আবিষ্কার করেছেন। এক কালের চতুর রাজকর্মচারীটি জানেন, লোকেরা লৌকিক জীবনে যত দুর্বল যত অসহায় হয় ততই তারা অলৌকিককে আঁকড়ে ধরতে চায়। না হলে তারা

বাঁচতে পারে না। অবশ্য ধর্মসাধনায়, দেবমহিমায় অবিশ্বাসী তিনি নন ; কিন্তু তিনি জানেন সে বস্তু সিন্ধুপ্রমাণ জলের মধ্যে বিন্দুপ্রমাণের মতই দুর্লভ। সেই বিন্দু যখন সিন্ধুকে ব্যাপ্ত করে তাকে ছাড়িয়ে ওঠে—তার লগ্ন আছে সময় আছে। ত্রেতায় রামের আবির্ভাব, দ্বাপরে কৃষ্ণ-ভগবানের আবির্ভাব ত্রেতা এবং দ্বাপরের এক খণ্ডাংশে। তার আগে চলে তাঁর আবির্ভাবের জন্য লোকের তপস্যা। কল্কীর আবির্ভাবের বিলম্ব আছে। তার পূর্বে সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য লৌকিক চেষ্টার প্রয়োজন আছে। সে চেষ্টা শুধু ভগবানের নামে আর ধর্মের বিচারের আয়োজনে সার্থক কখনও হয় না। সেখানে বিষয়বুদ্ধি, রাজনৈতিক চতুরতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আজ সময়ের গুণে রাজনৈতিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান শক্তি ভাঙছে। স্বাভাবিকভাবে মুঘল বাদশাহী শক্তির চাপে যে সব শক্তি চাপা ছিল তারা উঠছে। মঠ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবে শাসন-শৈথিল্যের সুযোগে মাথা তুলছে।

হাতেমপুরের হাতেম খাঁ ফৌজদারের বিষয়বুদ্ধি ছিল। এ অঞ্চলের বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ রাঘব রায়কে দমন করে হাতেমপুরে গড় তৈরি করবার সময় এই সত্যটা সে বুঝেছিল। এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র একটি ঘটনার মধ্যে ভাবীকালের সংঘটনের আভাস অনুভব করেছিল। সেই কারণেই, এ অঞ্চলের মঠ-মহান্ত, ব্রাহ্মণ, গুরুদের উপর—হিন্দু জমিদারদের অপেক্ষাও সতর্কতর কঠিন দৃষ্টি রেখেছিল। কোনও অজুহাতে সে কোনও মঠে বা মন্দিরে গড়বন্দী শক্ত পাঁচিল তৈরি করতে দিত না, নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী পাইক রাখতে দিত না। হাতেম খাঁর মৃত্যুর পরই আনন্দচাঁদ গোস্বামীর নববৃন্দাবনের গড়ন বিচিত্রভাবে আপনা-আপনি দ্বারকার যাদবপুরীর গড়ন নিচ্ছে। ঝিল হচ্ছে গড়খাই, পাড় হচ্ছে গড়বন্দীর বাঁধ। সিংহদ্বার তৈরি হচ্ছে চারটি। সিংহদ্বারে স্তম্ভগুলির নীচে থেকে উপর পর্যন্ত যে বন্দুকধারী সৈন্যসন্নিবেশের সুচতুর ব্যবস্থা থাকবে, সে সম্পর্কে কেশবানন্দ নিঃসন্দেহ।

আনন্দচাঁদ সামান্য গৃহস্থ-সন্তান। আর মাধবানন্দ তাঁর গুরু, জমিদার-সন্তান। আনন্দচাঁদ গৃহী সন্ন্যাসী হয়ে সম্পত্তি অর্জন করে যে সত্যটা বুঝেছেন, মাধবানন্দ সম্পত্তি বর্জন করার জন্যই সে সত্যটা বুঝতে পারছেন না।

কেশবানন্দ দাঁড়ালেন।

এখান থেকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন আনন্দচাঁদ গোস্বামীর নব বৃন্দাবনের সংগঠন। হ্যাঁ। গোস্বামীর দূরদৃষ্টি আছে! গড়টি দৃঢ় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কেশবানন্দের সঙ্গী বললে, ওই যে আনন্দচাঁদ গোস্বামী। ওই আসছেন। এই দিকে।

কেশবানন্দ আজ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এসেছেন। সঙ্গে দুজন আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী এবং গ্রামের চারজন পাইক সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছে তাদের ধ্বজা। পাইকদের একজন দেখিয়ে দিলে সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে। ব্রহ্মচারী কেশবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।—এই দিকে। ওই আসছেন।

কেশবানন্দ দেখছিলেন গড়বন্দীর বাঁধ। চমৎকার হয়েছে। সঙ্গীর কথায় দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালেন।

বাঃ, সুন্দর সুপুরুষ লোকটির মহিমা আছে।

আনন্দচাঁদ আসছিলেন, সঙ্গে একদল লোক—ভক্ত সম্প্রদায়।

কেশবানন্দ অগ্রসর হলেন। আনন্দচাঁদও তাঁদের ধ্বজা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দাঁড়ালেন। কিছু বললেন দলস্থ লোকদের। দল থেকে দুজন লোক তাঁদের দিকে এগিয়ে এল।

কেশবানন্দ হাত তুলে বললেন, জয়, কংসারি কানহাইয়ালালকি জয়!

আনন্দচাঁদের লোকেরা বললে, জয় শ্যামসুন্দর!

কেশবানন্দ বললেন, গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছি। ওপারের কংসারি মঠ থেকে আসছি আমরা।

—আসুন আসুন। শ্যামসুন্দর আজ ভক্তের আগমনে তৃপ্ত হয়েছেন।

এরই মধ্যে একজন দ্রুতপদে এগিয়ে চলে গেল। সংবাদ দিল আনন্দচাঁদকে।

আনন্দচাঁদও অগ্রসর হলেন। কাছাকাছি হতেই সম্ভাষণ জানালেন, নমো নারায়ণায়!

প্রত্যভিবাদনে নারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে কেশবানন্দ বললেন, ত্রুটি স্বীকার করছি, অনেক পূর্বেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমাদের কর্তব্য ছিল।

হেসে আনন্দচাঁদ বললেন, কর্তব্য আমারই ছিল আগে। যেহেতু না আপনারাই এখানে আগন্তুক। বিশেষ করে কেন্দুলীতে সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী বর্গীদের সঙ্গে আপনারা যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তাতে তার পরদিন থেকেই নিত্য ভাবি আপনাদের আশ্রম দর্শন করে আসব। কিন্তু—

'কিন্তু' বলে চুপ করলেন আনন্দচাঁদ।

কেশবানন্দ বললেন, অতিথিকে আতিথ্যে কার্পণ্য অবশ্যই অধর্ম। কিন্তু বিশ্বাস একটি কর্ম দেখেই করা যায় না। আপনার দোষ নেই গোস্বামী-গুরু।

—না। সেজন্য নয়। যেতে দ্বিধা হয়েছে এই হেতু মহারাজ যে, আপনারা শ্রীমতী রাধাকে নির্বাসিত করেছেন।

—ধনুর্যজ্ঞের কাল সমাগত হলে শ্রীমতীকে পশ্চাতে রেখে প্রভুকে যেতেই হয় গোস্বামী-গুরু। ধনুর্যজ্ঞ শেষ হলে কুরুক্ষেত্র এগিয়ে আসে। আপনার বৃন্দাবনে দেখছি যাদবপুর দ্বারকার আয়োজন। এ পুরীতে হাতের বাঁশি প্রভু বাজাবেন কখন? চক্রই বা ধরবেন কোন্ হাতে?

কেশবানন্দের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আনন্দচাঁদ। কেশবানন্দ বললেন, তত্ত্বের কথা কইতে আমি আসি নি গোস্বামী-প্রভু। তত্ত্বে আমি পারঙ্গমও নই। সে কথা বরং কোনদিন আমাদের গুরুর সঙ্গে হবে আপনার। আমি এসেছি এইটুকু বলতে যে, রাত্রি তৃতীয় প্রহর সমাগত। শিবাসংকেত শুনতে পাচ্ছি। আমরা, যারা তীর্থযাত্রী, যে যে মন্দিরে যাই না কেন, এ সময় আমাদের একসঙ্গে দল বেঁধে চলা উচিত নয় কি?

—আসুন, ভিতরে আসুন। এ আলোচনা তো পথে দাঁড়িয়ে হবে না।

—চলুন।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতে কাতর কণ্ঠে 'ঠাকুর!' 'ঠাকুর!' বলে ডাকতে ডাকতে কে এগিয়ে আসছিল। আনন্দচাঁদ ঘুরে দাঁড়ালেন। কে? কী চায়? ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর। এমনি একটি গুরুতর ভাবনায় মন যখন ব্যাপৃত এবং সেই গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্ত যে মুহূর্তে পা বাড়িয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তটিতে পিছু ডাকার মত এই ডাক তাঁর ভাল লাগল না। মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে গেল, কী বিপদ!

কেশবানন্দ বললেন, আপনার কোন শিষ্যকে বলুন ওর আবেদন শুনতে। আর আমাদের আলোচনা অনেক পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। ওর এ ডাকে তাতে বাধা হয় নি। চলুন।

আনন্দচাঁদ একজন শিষ্যকে ওই লোকটির আবেদন শুনতে আদেশ দিয়ে কেশবানন্দকে নিয়ে তাঁর পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন। কয়েকটি বাঁক ফিরে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

যে লোকটি চিৎকার করে ঠাকুরকে ডাকছিল, সে কয়ো। কয়োর মত হতশ্রী মানুষের চেহারাও এমন বিপর্যস্ত, কাদায় ধূলায় তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনই বিকৃত ও বিচিত্রিত যে, তাকে চেনবার উপায় ছিল না।

উপায়ান্তরহীন হয়ে সে এসেছে আনন্দচাঁদ গোস্বামীর কাছে। কাল রাত্রে মা-জী অর্থাৎ কৃষ্ণদাসী নিরুদ্দেশ। কয়ো তার পিছনে পিছনে জয়দেব-কেঁদুলীর শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিল, সে মাধবানন্দকেও দেখেছিল, মা-জীর সেই উন্মাদিনী উলঙ্গিনী রূপ, তার সেই অভিশাপ দেওয়া, তাও দেখেছিল। তারপর সে তারই অনুসরণ করে আসছিল। উলঙ্গিনী উন্মাদিনী আসছিল অজয়ের শীর্ণ জলধারার পাশে পাশে বালুচরের উপর দিয়ে। কয়ো সভয়ে দূরত্ব বজায় রেখে আসছিল তটের উপরের পথ ধরে। এরই মধ্যে অন্ধকারে হঠাৎ মাঝপথে কৃষ্ণদাসী কোথায় হারিয়ে গেছে। কয়ো অনেক খুঁজেও পায় নি। অবশেষে ভোরের সময় ক্লান্ত হয়ে ধুলোকাদা মেখে আখড়ায় ফিরে দেখেছে যে, আখড়াও শূন্য; মোহিনী নেই। আখড়ার দরজা খোলা, ঘরের দরজা খোলা, বিছানা জিনিসপত্র বিপর্যস্ত, মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। মোহিনীর হাতের চুড়ি-ভাঙার টুকরো সকালের আলোয় ঝিকমিক করছে। আশপাশের লোকের কাছে সন্ধান করেও সংবাদ পায় নি। কেউ দেয় নি। ওই সংবাদ না দেওয়াতেই সে মোহিনীর সঠিক সংবাদ পেয়েছে, তাকে বর্বর অক্রূরের চরেরা চুড়ি বা ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই কয়ো ছুটে এসেছে আনন্দচাঁদ ঠাকুরের কাছে। আনন্দচাঁদ এখানকার গৃহস্থ বৈষ্ণবদের গুরুর গুরু। অক্রূর, অক্রূরের বাপ যত পাষণ্ডই হোক, নিজেদের তো বৈষ্ণব বলে! তোমার কথা অবশ্যই শুনবে। গোস্বামী ঠাকুর, মোহিনীকে রক্ষা কর—এই আবেদন জানাতে ছুটে এসেছে।

সে এসে টলতে টলতে বসে পড়ল সামনের ফটকে। ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে ডাকলে, গোস্বামী ঠাকুর! ঠাকুর!

ঝড়ে-লাট-খাওয়া ভগ্নকণ্ঠ কাকের মতই তার সে কণ্ঠস্বর।

—ঠাকুর, তুমি রক্ষা কর অভাগিনীকে। ঠাকুর! ঠাকুর! ঠা-কু-র!

কেশবানন্দ এবং আনন্দচাঁদ তখন হিন্দুস্থানের রাজশক্তির প্রস্তর-কঠিন স্বরূপকে চোখের

সামনে ধরে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করছিলেন। চুলের মত অসংখ্য সরু দাগ দেখা দিয়েছে তার সর্বাঙ্গে। এই দাগগুলি ক্রমে ফাটলে পরিণত হবে। তারপর একদিন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

কালস্য কুটিলা গতি। যদুপতির মথুরাপুরী আছে কিন্তু সে যাদব-গৌরব নেই। রঘুপতির সূর্যবংশ-গৌরবও ভেঙে পড়ে। কালধর্ম।

—কিন্তু কালধর্ম পূর্ণ হয়, প্রকট হয় মানুষের চেষ্টায় উদ্যমে। রাজা গিয়ে রাজা হওয়া তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সিংহাসন খালি থাকে না, পূর্ণ হয়ই। ধর্মের অভ্যুত্থানের জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ পথ চাই গোস্বামী-গুরু। নদী অনেক নেমেছে পাহাড় থেকে। কিন্তু গঙ্গাজী যখন নামেন তখন স্বর্গ থেকে নামেন, তখন তাঁকে ধরবার জন্য রুদ্রের মাথা পাতার প্রয়োজন হয়। আজ সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। আমি আপনার অস্ত্র-সংগ্রহের ভার নিলাম। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

ঠিক এই সময়টিতে কয়োর শেষ উচ্চারিত সর্বোচ্চ কণ্ঠের দীর্ঘায়িত 'ঠা-কু-র' ডাকের শব্দ বদ্ধ দ্বার ভেদ করে ক্ষীণ হয়েই অবশ্য ভেসে এল, কিন্তু তার মধ্যেও কয়োর চেরা কর্কশ কণ্ঠস্বরের স্বরূপটি ঢাকা পড়ল না। তার সঙ্গে আরও ছিল মর্মান্তিক একটি আকুতি। তারই স্পর্শে চমকে উঠলেন আনন্দচাঁদ।—কে? এমন আকুতির সঙ্গে কে ডাকে? পরক্ষণেই একটু তিক্ত অথচ সকৌতুক ব্যঙ্গহাসি দেখা দিল তাঁর মুখে। বললেন, ও, ইলামবাজারের সেই ধর্মাধর্ম-জাতি-বিচারহীন উচ্ছিষ্টভোজী বৈরাগী পশুটা?

কেশবানন্দও কয়োর কণ্ঠস্বর চিনেছিলেন, তিনিও হাসলেন, বললেন, পশু নয়—পক্ষী। কউয়া।

আবার ডাক ভেসে এল, ঠাকুর গো!

আনন্দচাঁদ বদ্ধ দুয়ারের দিকেই মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, বাইরে কে রয়েছে?

বাইরে থেকে সাড়া এল, আমি প্রভু, দীনদাস।

আনন্দচাঁদ বললেন, ইলামবাজারের ওই লোভী বৈরাগীটাকে খাদ্য দিয়ে বিদায় কর। দেখ গত রাত্রের উদ্বৃত্ত খাদ্য কী আছে! চিৎকার করতে নিষেধ কর।

—করেছি প্রভু। কিন্তু ও সেজন্য চিৎকার করছে না! খেতেও চায় না।

—খেতে চায় না? কয়ো? তবে কী চায়?

—কাল রাতে উন্মাদিনী কৃষ্ণদাসী। প্রেমদাস মহান্তের বেটার বউ কোথায় চলে গিয়েছে। খুঁজে—

—কী বিপদ! উন্মাদধর্মে কোথায় কোন্‌দিকে গিয়েছে, আবার আসবে। অবশ্য অপঘাত ঘটলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তার আমি কি করব?

—আরও আছে প্রভু। কৃষ্ণদাসীর কন্যাটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাত্রে আখড়ায় কারা ডাকাতি করে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গিয়েছে। কয়ো বলছে, ইলামবাজারের দে-সরকারের ছেলে অক্রুর। তার উদ্ধারের জন্যই ও এসেছে, বুক চাপড়ে কাঁদছে।

আনন্দচাঁদ মুহূর্তে যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। কী করবেন তিনি? প্রেমদাসের

কাছে যে বাক্য দান করেছিলেন, সে বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কৃষ্ণদাসীর আচার-আচরণের কোন কথাই তিনি তো না-জানা নন। দে-সরকারের সঙ্গে সাধনভজনের নামে ব্যভিচারের কথা তিনি জানেন, দে-সরকারের ওই বর্বর পুত্রটার জন্য কন্যাকে বিক্রি করার কথাও তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোনদিন কোন শাসন করেন নি, কোন প্রশ্ন করেন নি, দু-চারজন বৈরাগী মহান্তও তাঁর কাছে এসে এর প্রতিবিধানের জন্য তাঁর সাহায্য চেয়েছে; কিন্তু তিনি নীরব থেকেছেন, সাহায্য করেন নি। এই পরিণাম কৃষ্ণদাসীদের অনিবার্য। তিনি কী করে নিবারণ করবেন ?

কেশবানন্দ বললেন, ইলামবাজারের শেঠ দে-সরকার কি গোস্বামীপাদের শিষ্য ?

—আমার ভক্তের শিষ্য। আমার নয়। পরক্ষণেই বিচিত্র হেসে বললেন, দে-সরকার বণিক। সে সর্বক্ষেত্রেই বণিক। গুরুর কাছে সে দীক্ষা নিয়েছে দক্ষিণা দিয়ে। দীক্ষা তার ধর্মের নামে ব্যভিচারের জন্য। পাপ করে সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবে দীক্ষাবলে—এই ছলনায় নিজেকে ছলবার জন্য মহারাজা। গুরুকে এরা অর্থ দেয়, তাদের সর্বকর্মে ধর্মে-অধর্মে গুরুর সমর্থন পাবার জন্য। এদের আপনি জানেন না।

হেসে কেশবানন্দ বললেন, খুব জানি গোস্বামীপাদ। আপনার থেকেও বোধ করি বেশী জানি। শুধু গুরু নয়, রাজা গুরু ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই ওদের এক সম্পর্ক। হাতেমপুরের হাতেম খাঁর সঙ্গে দে-সরকারের সম্পর্ক খুব নিবিড় ছিল। জয়দেবের মহান্ত মহারাজ আমাকে বলেছিলেন। যেদিন ওর ওই পাষণ্ড ছেলেটা ছদ্মবেশী বর্গী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কলহ করে আহত হয়, সেদিন আমাদের গুরু মহারাজের দিকে থুৎকার নিক্ষেপ করেছিল। আমি ভেবেছিলাম, ওকে শাস্তি দেব। জয়দেবের মহান্ত বলেছিলেন, ওকে ঘাটাবেন না, হাতেম খাঁকে আপনাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে। আমরা শক্ত হয়ে বসতে পারি নি বলে চুপ করে গিয়েছিলাম। শুনেছি ওর নিজের পাইক-লাঠিয়ালের দলটিও নেহাত উপেক্ষার নয়।

আনন্দচাঁদ বললেন, ওকে আমি কঠোর সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করব। আর ওকে দণ্ড না দিলে ধর্ম বিরূপ হবেন।

কণ্ঠস্বর তাঁর গভীর ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে তখন।

কেশবানন্দ বললেন, এ সময়ে যা করবেন, গভীরভাবে বিবেচনা করে করবেন গোস্বামীপাদ। আপনার বৃন্দাবন দ্বারকা হয়ে উঠেছে।

—মহারাজ, এ ঝিল এ গড় পুরনো কালের ভগ্নকীর্তি। আমি কিনে দেবতার নামে সংস্কার করাচ্ছি মাত্র।

—তবুও বিবেচনা করবেন। যে কোনদিন কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার দশা অথবা ব্রজের গোবিন্দ-মন্দিরের দশা হতে পারে আপনার মন্দিরের। বিশেষ করে হিন্দু যদি হিন্দুর বিপক্ষে গোপনে সংবাদ দেয়, তা হলে তার গুরুত্ব কত প্রচণ্ড হবে ভেবে দেখবেন।

আনন্দচাঁদ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কেশবানন্দের দিকে।

কেশবানন্দ বললেন, সুজা খাঁ মৃত্যুর পূর্বে বীরভূমের বাকী রাজস্বের জন্য বীরভূম-অভিযানের সংকল্প করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা জামিন হয়ে লক্ষ টাকা পেশকস্ দিয়ে

মিটমাট করে দিয়েছেন। বীরভূমের নবাবের এখন অর্থাভাব। এদিকে সুজা খাঁ গত হয়েছে, সরফরাজ খাঁ নবাব হবেন। এখন নজরানা ভেট পাঠাতেই হবে। এ সময় ফৌজদার নবাব শিকার খুঁজছে, অজুহাত খুঁজছে। এরপর বিবেচনা করে দেখবেন সাবধানতার প্রয়োজন আছে কিনা!

আনন্দচাঁদ ডাকিনী-বিদ্যা প্রভাবে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন, মানুষের ভবিষ্যৎও দেখতে পান; কিন্তু এইভাবে গোটা দেশের ভবিষ্যৎ কখনও দেখতে পান নি, অবশ্য দেখতেও চেষ্টা করেন নি।

কেশবানন্দ আবার বললেন, তা ছাড়া মহাযজ্ঞে বহু বলি বহু আহুতির প্রয়োজন গোস্বামীপাদ। শুধু দেবতাই বলি আহুতি পান না, ভূত প্রেত পিশাচ রক্ষ এদেরও দিতে হয়। সাধনভ্রষ্টা একটা স্বৈরিণীর কন্যা, তাও তো সে বিক্রীতা।

আনন্দচাঁদ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কঠিন সমস্যা তাঁর সম্মুখে।

ঠিক এই সময়ই বাইরে থেকে দীনদাস বললে, প্রভু!

উত্তর দিতে পারলেন না আনন্দচাঁদ। বোধ করি শুনতেই পেলেন না। দীনদাস আবার বললে, মুরশিদাবাদের মোক্তারের কাছ থেকে লোক এসেছে, চিঠি এনেছে। জরুরী চিঠি। আর বলছে, দিল্লিতে নাকি বড় গোলমাল।

কেশবানন্দের কপালে ভ্রূতে প্রশ্নের কুঞ্চনরেখা জেগে উঠল, কী হয়েছে? বাদশা মহম্মদ শা—

—না মহারাজ, বলছে ইরানের বাদশা নাদির শা আটক পার হয়ে পাঞ্জাবে ঢুকেছিল। পাঞ্জাব লুঠ করেই সে ফিরে যাবে ভেবেছিল লোকে। কিন্তু সে ফিরে যায় নি। সে দিল্লির দিকে আসছে। যে দিক দিয়ে আসছে সব শ্মশান করে দিয়ে আসছে। এতদিনে সে দিল্লি ঢুকেছে। দখল করে বসেছে। যে খবর নিয়ে এসেছে সে আসবার সময় পথে খবর পেয়েছে নাদির শা দিল্লি দখল করে ছারখার করে দিয়েছে।

চমকে উঠলেন আনন্দচাঁদ।

কেশবানন্দ মুহূর্তে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোখ দুটি তাঁর বিস্ফারিত, তারা দুটি যেন প্রদীপের মত জ্বলছে, ইরানের বাদশা নাদির শাহ! প্রথম জীবনে ভেড়াওয়ালা নাদির শা, সাক্ষাৎ শয়তান যাকে ভর করে বিশ্ববিজয়ী করে তুলেছে?

তাঁর উত্তেজিত মুখের রেখায় মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটতে লাগল, প্রদীপের মত জ্বলন্ত চোখের তারা দুটিও যেন নিবছে আর জ্বলছে, নিবছে আর জ্বলছে।

হঠাৎ তিনি চারিদিক চেয়ে দেখলেন, তারপর ঘরের মেঝেতে ফরাসের চৌকির নীচে রাখা বৃহৎ গুরুভার একখানা পাথর দু হাতে সবলে মাথার উপর পর্যন্ত তুলে সেখানাকে মেঝের উপর আছড়ে ফেলে দিলেন। খোয়া-বাঁধানো মেঝেটা ফেটে চৌচির শুধু হল না, গর্ত হয়ে গেল। পাথরখানাও ভেঙে গেল তিন টুকরো হয়ে।

কেশবানন্দ গর্তের কাছে এসে বললেন, হিন্দুস্থানের বাদশাহী—

পাথরখানার কাছে এসে বললেন, ইয়ে হ্যায় নাদিরশাহী—

তারপর বললেন, তুনো যায়েগা। নাদিরশাহীও থাকবে না। লগ্ন এসেছে। এখন খুব হুঁশিয়ার গোস্বামীপাদ। মহাযজ্ঞে আগুন জ্বলছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"অশেষ করুণা এবং মহিমার আধার, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, নিয়ম ও ন্যায়ের বিধানকর্তা, সৃষ্টি এবং ধ্বংস-শক্তির উৎস, মহামহিমময় ঈশ্বর, যাঁহার বদান্যতা ও অনুগ্রহের মূল হইতে আলোকদাতা সূর্যের প্রকাশ, তাঁহার যিনি ছায়া, সেই সম্রাট, সৌভাগ্যবান অভিজাতদিগের মধ্য হইতে বিশেষ সম্মানিত, জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন, ন্যায়নীতি ও মহত্ত্বের আদর্শে একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রদেশের সুবাদার সেনানায়ক নবাব ফৌজদার বহাল করেন এই হেতু যে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত ন্যায়নীতি নিয়ম শৃঙ্খলা দেশে সমাজে যেন সূর্যকিরণ, বায়ু ও বর্ষণের মতই পক্ষপাতশূন্য এবং সুষম হয়। কিরণ ও উত্তাপ বর্ষণের ভার যেমন তিনি সূর্য এবং বরুণ বা মেঘের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি মানুষের সমাজে ন্যায়বিচারের ভার তিনি অর্পণ করিয়াছেন সম্রাটের উপর। সম্রাটের যাঁহারা প্রতিভূ তাঁহারা সেই নিয়মে নিরপেক্ষ এবং সূক্ষ্ম বিচারক। এই অমোঘ নিয়মে, যে বৃক্ষ সদম্ভে মস্তকোত্তোলন করিয়া বহু বৃক্ষের উপর অত্যাচার করে, তাহার মস্তকে ঈশ্বর বজ্র-নিক্ষেপে তাহা নাশ করিয়া বহু অসহায় বৃক্ষকে রক্ষা করেন এবং প্রাপ্য আলোক ও জল দ্বারা তাহাদের পালন করেন। সম্রাটের নির্দেশ ও নিয়মে, সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ শাসকগণও অত্যাচারী মদমত্তকে ধ্বংস করিয়া নিঃশঙ্কতা ও সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ঈশ্বরের রাজ্যে, একজন রাজা ও একজন সামান্য ভিক্ষুকের ভাগ্যফলে পার্থক্য পূর্বজন্মের কর্মফলে নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত—সেই অনুসারে ভোগসুখের তারতম্য সত্ত্বেও কিন্তু তাহাদের প্রাণের মূল্য এক। সেই নিয়মেই সম্রাটের বিচারালয়ে একদা এক বিধবার পুত্রকে দৈবক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরের আঘাতে বধ করার জন্য ন্যায়পরায়ণ কাজী সাহেব স্বয়ং সম্রাট নাসিরুদ্দিনের বিচার করিয়াছিলেন এবং সম্রাট অবনত মস্তকে সে বিচার শিরোধার্য করিয়াছিলেন; ইসলামের মহামান্য পয়গম্বর সামান্যতম মানুষকেও সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। অশেষ করুণার আধার ঈশ্বর, অন্যায় অত্যাচারে অত্যাচারিত সামান্য প্রাণীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। সামান্যতম ব্যক্তি অন্যায়ভাবে পীড়িত হইলে, তাহা জ্ঞাত হইবামাত্র ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ সম্রাটের বক্ষ হইতেও তেমনি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সম্রাটের রাজ্যে শাসকবৃন্দ সেই সব গুণের শরিক, তাঁহারাও বিচলিত হন।

"মহামান্য ফৌজদার অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহম্মদ হাফেজ খাঁ জানাব আলি বাহাদুর—আপনি অভিজাত, আপনি ধার্মিক, আপনি নির্ভীক, আপনি দয়ার্দ্র হৃদয় অথচ ন্যায়পরায়ণ। আপনার শাসনাধীনে প্রজাবর্গ ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে সুখেই কালাতিপাত করিতেছে। তবুও মৃত্তিকার গহ্বরে দিবসকালেও অন্ধকারের মত সেই অন্ধকারগহ্বরবাসী হিংস্রক অজগরের মত লুক্কায়িতভাবে অন্যায়কারী অত্যাচারী যে রহিয়াছে ইহা সত্য এবং সে সত্য সূক্ষ্মদূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহামান্য ফৌজদার সাহেবও অস্বীকার করিবেন না।

বহু ক্ষেত্রে ইমারতের মধ্যেও এমন অজগর বাস করে। আপনার এলাকাধীনে গঞ্জ ইলামবাজারের এমনি এক অজগর-চরিত্রের ব্যক্তি অর্থসম্পদের ইমারতের গহ্বরে আত্মগোপন করিয়া বিষনিশ্বাসে বায়ু বিষাক্ত করিতেছে, বহু অসহায় জীবকে কবলগত করিয়া নাশ করিতেছে, গ্রাস করিতেছে। আমি ইলামবাজারের ধনী ব্যবসায়ী রাধারমণ দে-সরকার এবং তাহার পুত্র অক্রুর দে-সরকারের কথা বলিতেছি।"

মাধবানন্দ হাতেমপুরের ফৌজদার হাফেজ খাঁয়ের উদ্দেশে পত্র রচনা করছিলেন। ধুলো-কাদা মেখে কয়ো সামনে একটা গাছতলায় শুয়ে কাঁদছিল। কয়ো দুপুরে গোসাঁই ঠাকুরের ওখান থেকে হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে এখানে এসেছে।—নবীন গোসাঁই, তুমি বাঁচাও। তোমার জন্তেই গোসাঁই, তোমার জন্তেই এ সর্বনাশ, তুমি বাঁচাও।

প্রথম সে মাধবানন্দের কাছে আসে নি, আসতে ভরসাও হয় নি, মনও চায় নি। সে তো রথযাত্রার দিন এসে গোসাঁইয়ের কাছে কৃষ্ণদাসীর দুর্দশার কথা জোড়হাত করে নিবেদন করে বলেছিল, সিদ্ধিপুরুষ, দয়া কর। কিন্তু দয়া হয় নি। গোসাঁই দেখিয়ে দিয়েছিল হাতেমপুরের ফৌজদারের দরবার। ফৌজদার লোক ভাল, তার বেগম আরও লোক ভাল, কিন্তু রাজা বাদশা ফৌজদারের মন গরীবের দুঃখে কাঁদতে চাইলেও কাঁদবার তাদের অবকাশ কোথায়? ভগবান যে ভগবান, তারই সময় হয় না। শুধু সময়? এর বিচার করাও তো সোজা নয়। ভাবতে গেলে কয়োর চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হিজিবিজি হয়ে যায়। কয়ো এই গড়জঙ্গলের দিকে তাকায় আর ভাবে, বনে বাঘ আছে, হরিণ আছে। বাঘ বলে—ভগবান, খেতে দাও, হরিণ দাও মেরে খাই। হে ভগবান, হে ভগবান! হরিণ বলে—ভগবান, বাঘের হাত থেকে বাঁচাও, কচি ঘাস দাও; ভগবান, হে ভগবান!

ভগবান কী করে? ওদিকে তখন দ্রৌপদীকে হয়তো চুলে ধরে দুঃশাসন রাজসভায় এনে তার কাপড় ধরে টানছে। দ্রৌপদী ডাকছে—গোবিন্দ, রক্ষা কর! ঠাকুর তখন বাঘ-হরিণের কথা কানে তোলেন, না দ্রৌপদীকে কাপড় যোগান? কিংবা কুরুক্ষেত্রে রথের ঘোড়া চালান? তা ছাড়া 'অক্কুরুর' যদি ফৌজদারকে বলে—জনাব, আমি বড়লোকের ছেলে, আমার অনেক টাকা, তোমাকে দফায় দফায় খেলাত দি, পেশকস্ দি; আমার দরবারও তো তোমাকে শুনতে হবে। আমার যদি লোকলস্কর না থাকে তো আমি কিসের বড়লোক? আমার বড় বাড়ি ঘোড়া পালকি না থাকলে যেমন চলে না, তেমনি মোহিনীর মতন দু-চারটে সেবাদাসী না থাকলে চলবে ক্যানে? বাদশার ঘরে দশ হাজার বিশ হাজার বাঁদী, নবাবের ঘরে হাজার দু হাজার, ফৌজদার কাজী জমিদার এদের ঘরে গণ্ডায় গণ্ডায়; কুলীন বামুনদের শ-দরুনে পরিবার; অক্কুরুরের দোষই বা তা হলে কোথায়? ওই তো সেদিন সেই নীল মানিকটা পেয়ে খুশী হয়ে তাকে খাইয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলছিল, বলতে বলতে কী খবর এল কোথা থেকে, বাস্, ফৌজদার হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল; হয়ে গেল খতম। কোথায় মোহিনী, কে মোহিনী, কেই বা কয়ো—কে তার খোঁজ রাখে, খবর রাখে!

তাই সে মাধবানন্দ বা ফৌজদার এদের কাছে না গিয়ে, উপায়ান্তরহীন হয়ে শেষে ছুটে গিয়েছিল আনন্দচাঁদ ঠাকুরের কাছে। কিন্তু সেখানেও ঠাকুর যখন দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে

আর দরজাই খুললেন না, তখন হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ইলামবাজারে ফিরেই আসছিল। হঠাৎ পথে কয়ো ওপারের বনের দিকে তাকিয়ে রাগে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল : ওই নবীন গোসাঁই সব সর্বনাশের মূল। ওরই অভিশাপে মা-জী পাগল হয়ে গেল। মাজী—কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী যখন কেশবিন্যাস করে, কপালে তিলক নাকে রসকলি কেটে, পান-দোক্তায় ঠোঁট রাঙা করে পথ দিয়ে চলে যেত তখন পথের লোক দাঁড়িয়ে দেখত তার রূপ। সে যখন কথা বলত, তখন লোকে অবাক হয়ে শুনত, ভাবত, কথা তো সবাই বলে কিন্তু এমন কথা এ মেয়ে কেমন করে বলে—এ কথা, কোন্ কথা, যার ধার ক্ষুরের মত, যার ছটা বেলোয়ারি চুড়ির ঝিকিমিকির মত, কণ্ঠস্বরে বাঁশির সুর, কথার সঙ্গে হাসিতে মধুর আমেজ। কয়ো মাজীকে ভয় করত, তার আচার-আচরণ ভাল লাগত না তার, তবু ভালবাসত ; মন্দ কথা মন্দ মানে করতে ভাল লাগে নি, ভরসা হয় নি। একদিন সে বুড়ো বাউলদের দু-চারজনের কথা শুনেছিল—তারা বলাবলি করছিল, "মা-জী সাক্ষাৎ রাধা-রসের দূতী গো। ওই রসে ডগমগ। চলনে, হাসি, বলনে হাসি, রঙ্গে হাসি, ব্যঙ্গে হাসি। রসের পিঠে, রসে রসে এলিয়ে আছে, তুলে ধরতে গলে পড়ে। সাক্ষাৎ রসময়ের কৃপা না হলে কি জীবনে এত রস ঢোকে? জয় রাধে—জয় রাধে! রসেই আশ, রসেই বাস, রসেই ভোজন, রসেই শয়ন, রসেই স্বপন, রসেই জাগরণ। চামড়ার চোখে চেয়ে দেখে মা-জীকে বিচার কোর না, ঠকবে।" বুড়ো বাউল বলাইদাস গান গেয়ে উঠেছিল—সেই গান যা তাদের একান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া কারুর কাছে গাইতে নাই, গাইতে মানা—সেই গান একে অপরের কানের কাছে মুখ এনে রসের ঘোরে মুচকি মুচকি হেসে গুন গুন করে গেয়েছিল—

"রসের ভজন রসের পূজন রসের ভোজন কর।
রসেতে মজিবি রসিকে পূজিবি রসেতে বাঁধিবি ঘর॥
রসেতে শয়ন রসেতে স্বপন রসে হাসা রসে কাঁদা।
রসের সাগরে ডুব দিলে পরে রসময় পড়ে বাঁধা।"

অন্ধকারে গাছতলায় শুয়ে ছিল কয়ো। তার ধাঁধা জটিল হয়ে উঠছিল ; কৃষ্ণদাসী আরও রহস্যময়ী হয়ে উঠছিল তার কাছে।

সেই মা-জী উন্মাদ পাগল হয়ে গেল ওই নবীন গোসাঁইয়ের রোষে, তার শাপে।

—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোসাঁই, দায়ী তুমি।

রাগে ক্ষোভে ক্ষ্যাপার মত এই বলে চিৎকার করতে করতে সে ইলামবাজারের রাস্তা থেকে সরে কখন যে অজয়ের কূলে এসে হাজির হয়েছিল, কখন যে নদী পার হয়ে এপারে এসে বনের মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রমের ফটকে এসে উঠেছিল, সে সম্পর্কে কোন সচেতনতাবোধও তার ছিল না। প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রুদ্ধ কয়ো আশ্রমের দুয়ারে চিৎকার করছিল—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোসাঁই, দায়ী তুমি।

মাধবানন্দ অশ্রান্ত পদক্ষেপে মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে ফিরছিলেন।

কেশবানন্দ তাঁকে বন্দী করে চলে গেছেন; শ্যামানন্দ এবং আরও কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসী নতদৃষ্টিতে বা উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্কোচ বা লজ্জা এড়িয়ে তাঁর উপর বোধ করি প্রহরা দিয়েই বসে ছিল। মাধবানন্দ তাদের সঙ্গে একবার মাত্র কথা বলেছিলেন—একটি প্রশ্ন করেছিলেন, কেশবানন্দের উপলব্ধিকেই কি তোমরা সত্য বলে মনে কর? আমি ভ্রান্ত বলে তোমাদের বিশ্বাস?

উত্তর তারা দিতে পারে নি। নীরবে যে যেভাবে বসে ছিল সেই ভাবেই বসে থেকেছিল।

মাধবানন্দ আর প্রশ্ন করেন নি। তাদের মৌনতার মধ্যেই তাদের উত্তর তিনি পেয়েছিলেন। দোষ দেন নি। এরা নিতান্ত তরুণ। প্রত্যেকেই তাঁর থেকেও বয়সে নবীন। এবং এদের দু-তিনজনকে বাদ দিয়ে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন আঘাতে আহত হয়ে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। কারও ঘর ভেঙেচে সমাজের আঘাতে, কারও ঘর ভেঙেছে রাজা বা নবাব জায়গীরদার কি ফৌজদারের আঘাতে, কারও সংসার ছারখার হয়েছে রাজায় রাজায় সংঘর্ষের মধ্যে, কারও ঘর লুটে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ডাকাত-লুটেরার দল। ঘর এরা ত্যাগের প্রেরণায় ছাড়ে নি, ঘর হারিয়ে গেছে বলে উপায়ান্তরহীন হয়ে সন্ন্যাসী। প্রতিষ্ঠা হারিয়ে গৈরিক নিয়ে ভিক্ষুকের প্রতিষ্ঠাহীনতার লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করেছে। বুকের মধ্যে এদের ক্ষোভ হিংসা চাপা আছে, মেবে নি। সকলেই দিল্লি থেকে কাশী পর্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী। কয়েকজন সমৃদ্ধ সম্পন্ন ঘরের ছেলে, ঘর ভেঙেছে কোন লড়াইয়ে বা সুবাদার-জমিদারের অত্যাচারে। পথে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার জন্য ভিক্ষুকের চীরবস্ত্র গায়ে না জড়িয়ে গেরুয়া কাপড় গায়ে দিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নেওয়ার লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি খুঁজেছে। বাকী কয়েকজন নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—ঘর-পালানো ছেলে সব; কারও মধ্যে একটা হা-ঘরে প্রকৃতি আছে, কেউ ঘরে দুষ্কৃতি করে, কেউ বাইরে দুষ্কৃতি করে ঘর ছেড়েছিল। সকল লজ্জা সকল অপরাধ থেকেই আত্মরক্ষার পক্ষে এ দেশে গেরুয়া আবরণের মত আর কিছু নাই। এদেরও বুকে আগুন রয়েছে, ওই এক আগুন। সেই আগুনের উত্তাপে ওদের বুক শুকিয়ে তৃষ্ণার্ত, কিন্তু সে তৃষ্ণা অমৃতের নয়—সে তৃষ্ণা মদিরার। শক্তির মদিরা।

ঠিক এই সময়টিতেই কয়োর চিৎকার এসে তাঁর কানে ঢুকল।—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোসাঁই, দায়ী তুমি।

এতক্ষণে মাধবানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ওই চিৎকার, তাঁর চিন্তা এবং পদচারণার গতিতে একটি ছেদ টেনে দিল চকিতে।

কয়োর কণ্ঠস্বর চিনতে দেরি হল না তাঁর। কয়োকে মনে হতেই, কয়োর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণদাসীকে মনে পড়ে গেল। গতকাল রাত্রির ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠল। উঃ, হতভাগিনীর কর্মফলের সে কী নিদারুণ পরিণাম! সে কী মর্মযাতনা তার! সে কি তা হলে আরও কোন নিষ্ঠুরতর পরিণামে—? শিউরে উঠলেন মাধবানন্দ। নইলে নির্বোধ জড়বুদ্ধি কয়ো এমন কাতর আবেগে তাঁকে দায়ী করে চিৎকার করে কেন? কয়োর ধারণার

কথা তো জানেন। সে নিজের মুখে বলে গেছে—নবীন গোসাঁই, তুমি সিদ্ধপুরুষ, তোমার রোষে পড়েই কৃষ্ণদাসীর এই অবস্থা। প্রশ্ন করেছিল, হতভাগী বষ্টমীর কি অপরাধটা খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল গোসাঁই ?

মাধবানন্দ শ্যামানন্দের দিকে মুখ ফেরালেন, ডাকলেন, শ্যামানন্দ! মাধবানন্দের এ কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। এ কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর এবং নেতৃত্বের গাম্ভীর্যের গুরুত্ব অলঙ্ঘনীয়। কেশবানন্দ হয়তো একে লঙ্ঘন করতে পারে, কিন্তু শ্যামানন্দ পারে না।

শ্যামানন্দ চকিত হয়ে সামনের গাছটির উপর ইচ্ছাকৃত প্রসারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে চাইলে; কিন্তু মাধবানন্দ বললেন, শোন। ওই বৈরাগী ভিক্ষুকটিকে ডাক। নিয়ে এস এখানে। যাও।

শ্যামানন্দ অবনত মস্তকে বেরিয়ে গেল, কয়োকে ডাকবার জন্য ইতস্তত করতেও সাহস করলে না।

* * *

কয়োর কাছে সকল কথা শুনে মাধবানন্দ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কৃষ্ণদাসী গতরাত্রির অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে। উন্মাদিনী মরেছে। অজয়ের জলস্রোত এখন অগভীর, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দহ আছে। দহে কুমীর আছে।

কৃষ্ণদাসীর মর্মযাতনার অবসান যদি এভাবেও হয়ে থাকে তবে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এক মুহূর্ত পরে অকস্মাৎ শিউরে উঠলেন তিনি। কৃষ্ণদাসীর নিষ্ঠুরতম পরিণতির জন্য নয়, মুহূর্তে তাঁর চিন্তা কৃষ্ণদাসীর দিক থেকে চলে গেছে গোটা সমাজের বিকৃত অবস্থার দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে তিনি যেন দেখলেন, গোটা সমাজটাই আজ কৃষ্ণদাসীর মত প্রেমসাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ব্যভিচারমগ্নতার নেশায় বিকৃত মানুষের মত বিহ্বলচিত্ত হয়ে উঠেছে। তিনি শিউরে উঠলেন। তারাও কি ঠিক ওই ভাবে জীবননদীর দহে পড়ে অপঘাতে শেষ হয়ে যাবে ?

তাঁকে স্তব্ধ দেখে কয়ো আবার চিৎকার করে উঠল, তোমাকেও সে শাপান্ত করে গিয়েছে। ডাকিনীসিদ্ধ মা-জীর শাপ তোমাকেও লাগবে।

শ্যামানন্দ তাকে ধমক দিয়ে উঠল, এ-ই! কাকে কী বলছিস রে বৈরেগী ?

—ঠিক বলছি। আরও বলছি, মোহিনীর এ দশা হল কোন্ অপরাধে—বল, বল তুমি গোসাঁই ? তাকে তুমি একদিন নাগা গোসাঁইদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, তোমাকে সে সাক্ষাৎ ঠাকুরের মত ভক্তি করে। তার এই দশা তুমি করলে! বল, কেনে করলে, কোন্ পাপ তার ? তার উদ্ধার যদি না হয় তবে তার দায় তোমার, সেই দায়ে তোমাকে আমি শাপান্ত করব।

এবার মাধবানন্দের মোহিনীকে মনে পড়ল। সরলা কিশোরী মেয়েটি বড় অসহায় বড় ভীরু, মায়ের মুখের ছাপ মেয়েটির মুখে পড়ে নি। এ মেয়ে যেন ওই জাতের নয়। অক্রূরকে মনে পড়ল। কুৎসিত বীভৎসদর্শন বর্বরটার আহত অবস্থাতেও সেই থু-থু করে থুৎকার নিক্ষেপের ছবি ভেসে উঠল চোখের উপর; সেই কুৎসিত অশ্লীল গালিগালাজ মনে পড়ে গেল। অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন মাধবানন্দ। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,

বোস্ তুই।

—কী করব বসে? কী হবে?

—বোস্, উপায় আমি করছি। তুই কিছু খা। শ্যামানন্দ, ওকে কিছু খেতে দাও।

—আগে বল কী উপায় করবে?

—ফৌজদারকে আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, সেই পত্র নিয়ে তুই যা! ফৌজদার অবশ্যই বিধান করবে।

—ছাই করবে। করবে না, করবে না।

—করবে। আমি বলছি!

—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ, আমি বলছি।

—তার চেয়ে গোসাঁই, তুমি তাকে শাপ দাও, তার পক্ষাঘাত হোক, সে বোবা হোক, মোহিনী তার চোখের সামনে কালীর মত ভয়ঙ্করী হয়ে উঠুক।

—চিৎকার করিস নে কয়ো। তোকে খেতে বলছি, তুই খা। আমি পত্র লিখে দি, তুই ফৌজদারের কাছে নিয়ে যা। যদি ফৌজদার প্রতিবিধান না করে, আমি বিধান করব। যা তুই শ্যামানন্দের সঙ্গে।

তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কাগজ এবং দোয়াতকলম নিয়ে বসলেন। ফৌজদার হাফেজ খাঁকে পত্র লিখলেন।

মনের উত্তাপ এবং আবেগের বশে পত্র রচনা করলেন। দীর্ঘ পত্র। ঈশ্বরের অভিপ্রেত ন্যায়ের ভিত্তির উপর রাজধর্মকে স্থাপিত করে সেই ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে অক্রুরের শাস্তি ও মোহিনীকে উদ্ধার করবার প্রার্থনা জানালেন। পরিশেষে লিখলেন—"ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণার উপর একটি পিপীলিকার যে অধিকার আছে, আপনার দরবারে—বাদশাহের রাজ্যে এই হতভাগিনী অসহায়া বালিকাটিরও অবশ্যই ততটুকু অধিকারে আছে। একটি পিপীলিকাকে অকারণে বধ করিলে মানুষকেও সর্বশক্তিমানের দরবারে শাস্তি পাইতে হয়। শুধু তাই নয়, এই সংসারে ওই পিপীলিকাবধের পাপ জমা হইয়া বিশ্বসংসারের পাপের ভার বৃদ্ধি করে। এবং একদা পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহামারী, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। মানুষের রাজ্যে এমনই ভাবে পাপ জমা হইলে আমাদের শাস্ত্রে বলে—ভগবান আবির্ভূত হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া তাহার অবসান ঘটাইয়া থাকেন। জনাব আলি, একটি সামান্য অসহায়া বৈষ্ণবকন্যার দীর্ঘনিশ্বাসও উপেক্ষার নয়। নিরপরাধের দীর্ঘনিশ্বাস অগ্নির তুল্য; সে বহ্নি কণা-পরিমাণ হইলেও সময়বিশেষে বিগলিতপত্র অরণ্যভূমে যুক্ত হইয়া সর্বনাশের বহ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়া দেয়। সুতরাং ইহার প্রতিবিধানে উপেক্ষা করিলে রাজ্যের অকল্যাণ ঘটিবে। অতএব আপনি ইহার প্রতিকার করুন।"

পত্র শেষ করে মাধবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কয়োর হাতে দিয়ে বললেন, ফৌজদারের হাতে দিবি। ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুতালোকে সমস্ত বনভূমি চকিতে দীপ্ত হয়ে উঠল, পর-মুহূর্তেই বজ্রগর্জনে থর থর করে কেঁপে উঠল সব। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত আকাশ মেঘে

ছেয়ে গেছে; উতলা বাতাস উঠেছে; অনেক দূরে বোধ করি বনভূমির অপর প্রান্ত থেকে একটা অবিশ্রান্ত ঝর ঝর শব্দ উঠছে; শব্দটা যেন চলমান—দূর থেকে নিকটে আসছে এগিয়ে। একটানা ঝর-ঝর-ঝর-ঝর শব্দ। বর্ষণ নেমেছে, এগিয়ে আসছে নৈর্ঋত কোণ থেকে। আরও কিসের শব্দ। ক্যাও—ক্যাও—ক্যাও! বনের শাখায় বসে ময়ূরেরা ডাকছে।

মাধবানন্দ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের কী একটা বিষণ্ণ মায়া আছে। সেই মায়া মনকে বিষণ্ণ করে তোলে, উদাস করে দেয়। তেমনি বিষণ্ণ উদাসীনতার মধ্যেই মাধবানন্দের এই মুহূর্তে অকস্মাৎ মনে হল, হতভাগিনী মোহিনীর ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি আকাশে বাতাসে ফুটে উঠেছে। নিজের করুণার কাছে তাঁর নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। বিচিত্রভাবে নিজের অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছায় কৃষ্ণদাসীর শোচনীয় পরিণতি, তার সঙ্গে মোহিনীর এই দুর্দশার সকল কারণের মূলের সঙ্গে তিনি যেন জড়িয়ে গেছেন।

* * *

ঝর ঝর শব্দে বর্ষণ নেমে এসেছিল কখন।

চিন্তামগ্ন মাধবানন্দের খেয়াল ছিল না। ধারাবর্ষণের মধ্যে সব লুপ্ত হয়ে গেছে। বন ঢেকে গেছে, আকাশ ঢেকেছে, অজয়ের তটভূমি, অজয়, অজয়ের পরপার—সব ঢেকে গেছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনার দিক্‌দিগন্ত সব যেন এমনি একটা কিছুর মধ্যে হারিয়ে গেছে, ঢেকে গেছে। তিনি ভাবছিলেন, যদি ফৌজদার কোন প্রতিবিধান না করে? তারপর? কী করবেন তিনি? অসহায় কোটি কোটি জীব এই সৃষ্টির ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্যে বলি হচ্ছে; ভাল মরছে, মন্দ মরছে, তারই মধ্যে সৃষ্টি চলেছে আপন পথে। মহাকুরুক্ষেত্রের শেষ আজও হয় নি, কতকালে হবে কে জানে! সেই যজ্ঞে নিজেকে বলি দিয়েছে কৃষ্ণদাসী। তিনি মন্ত্র পড়েছেন। আবার মোহিনীও বলি হবে? তিনি পুরোহিতের মত মন্ত্র পড়েই চলবেন? কয়ো বলে গেছে, ঝুলন-পূর্ণিমার দিন মোহিনী বলি হবে। রমণ দে-সরকার অনুষ্ঠান করে ব্যভিচারী পুত্রের হাতে মোহিনীকে তুলে দেবে। বলির পশুর মতই মোহিনীর সকল আর্তনাদ ব্যর্থ হবে। পরশু পূর্ণিমা—একদিন পর।

—গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দ মুখ তুলে তাকালেন। কেশবানন্দ ঘরে প্রবেশ করেছেন। মাধবানন্দ উত্তর দিলেন না। শুধু তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন। কেশবানন্দের সর্বাঙ্গ সিক্ত; মাথার চুল থেকে জল ঝরছে। চোখ দুটি রাঙা, বোধ হয় ভেজার জন্যই এমন রাঙা হয়েছে?

—ফৌজদার যদি আপনার পত্র উপেক্ষা করেন?

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ।

—কয়োর হাতে আপনি যে পত্র দিয়েছেন, সে পত্র আমি পড়েছি। পত্র আপনারই উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু জয়দেবের মহান্ত মহারাজ বলেন—গঙ্গাজী যখন অলকাপুরী থেকে মর্ত্যধামে নেমেছিলেন তখন শিব তাঁকে মাথা পেতে ধরেছিলেন; সে মাহাত্ম্য সাক্ষাৎ শিবরুদ্রের যেমন তেমনি অলকাবাহিনী গঙ্গারও বটে। মাটির এই পাপপুণ্যময় ধরিত্রীতে গঙ্গা অবতরণ

করার পর কিন্তু তাঁর জলে মাটি মিশেছে। শিবের জটা বেয়ে জল তাঁর যত বাড়ে, ধরতির মাটি তাতে তত বেশী মেশে। তাই বন্যার কালে গঙ্গার মধ্যে যত জল, তত মাটি। তখন বন্যার প্রবাহে সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের শক্তি বেশী। তাই গঙ্গায় বান ডাকলে, শত শিবলিঙ্গ সাজিয়ে বাঁধ দিলেও বানের গতি রোধ হয় না; বানে যা ভাঙবার তা ভাঙে। তোমার গুরুকে বলবে—ঈশ্বরের নিয়ম সূর্য মানে, চন্দ্র মানে, বাতাস মানে, বর্ষা মানে; কিন্তু মানুষের মধ্যে তার দশা হয়—কাচস্বচ্ছ অলকানন্দার অমৃতবারির ধরতির বুকে বহতা গঙ্গার ঘোলা জলের মত। রাজবিধান গঙ্গার ঘোলা জল, আর রাজা হল ওই পথলের শিবলিঙ্গ। সুবাদার ফৌজদার কাজী—এ তো নুড়ি ভাই। গায়ে একটা সাদা দাগের বেড় থাকে সেটা দাগই ভাই, উপবীত নয়। গঙ্গাজলের মহিমা গেয়েছে তোমার গুরু, এক নুড়ির কাছে! হা রে গঙ্গাজল, যার আধা হল মাটি আর কাদা!

—তুমি বলছ, ফৌজদার হাফেজ খাঁ আমার পত্র অনুধাবন করবে না? পরক্ষণেই বললেন, তুমি কি কেন্দুলীর মহান্তের কাছে গিয়েছিলে? তুমি তো সুপুরে গোস্বামী-পাদের কাছে গিয়েছিলে!

—সেখান থেকে আমি মহান্ত মহারাজের কাছেও গিয়েছিলাম। সুপুরে সংবাদ পেলাম আগুন জ্বলেছে। দিল্লিতে নাদির শাহ এসে চেপে বসেছে। এ খবর দু মাসের পুরনো। এতদিনে কী হয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু দিল্লির বাদশাহী তক্ত যে পাথরের উপর বসানো, সে পাথরখানায় বাদশাজাদারা হাতুড়ি মেরে মেরে ফাটিয়েছিল, নাদির শাহের ইরানী হাতুড়ির ঘায়ে সেটা ভেঙেছে। আর তো বসে থাকবার সময় নেই। তাই মহান্ত মহারাজের কাছে না গিয়ে পারি নি। এ খবর হাতেমপুরেও এসেছে গুরু মহারাজ। এখন আপনার পত্র পড়ে অনুধাবন করবার মত তার সময় নাই বলেই আমার ধারণা।

মাধবানন্দ হাত তুলে উপরের দিকে নির্দেশ করে বলতে গেলেন—ফৌজদার না শুনলে তাঁর হাত। আমি কী করব কেশবানন্দ? কিছু বলতে গিয়েও পারলেন না বলতে। চুপ করে আকাশের দিকে নয়, মাটির দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি কি কয়াকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ফৌজদার প্রতিকার না করলে—। কথাটা শেষ করলেন না তিনি, অসমাপ্তির মধ্যে ইঙ্গিতে প্রশ্নটিকে সামনে ধরে দিলেন।

মাধবানন্দ মুখ তুললেন। বললেন, ধর্মসাধনার পথে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম। তুমি তাকে এই কালের সুযোগে বিধর্মীশাসন-উচ্ছেদের কাজে প্রয়োগ করতে চাও। বিধর্মী উচ্ছেদের সঙ্গে অধর্মের উচ্ছেদ করবে কেশবানন্দ? বল তা হলে—

মাধবানন্দ আসন ছেড়ে উঠলেন। কংসারি-বিগ্রহের বেদীর এক পাশে থাকত একখানি তরবারি, অপর পাশে একখানি ঢাল। তরবারিখানি হাতে তুলে নিয়ে মাধবানন্দ বললেন, তা হলে আমি তোমাদের সকলের ইচ্ছা এবং চেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিচ্ছি। বল।

কেশবানন্দ নতজানু হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, জয় কংসারি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঝুলন-পূর্ণিমার পূর্বেই অসহায়া মেয়েটিকে আমরা উদ্ধার করব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কী করবেন মাধবানন্দ ?

বাকী সারাটা দিন এবং রাত্রি ও পরের দিন তিনি ওই চিন্তা করে দেখলেন। কয়ো ফিরে এখনও আসে নি। সংবাদ পেয়েছেন, ফৌজদারের লোক এসে রমণ দে-সরকার এবং তার বর্বর ছেলেটাকে আজ সকালে প্রায় গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

কেশবানন্দই তাঁকে খবর দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ আশা তিনি প্রকাশ করেন নি। বরং ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেছেন, ফৌজদার অথর্ব অজগরের মত পড়ে ছিল, তার মুখের সামনে সে শিকার পেয়েছে। দিল্লির অবস্থার কথা শুনে অর্থ সংগ্রহের জন্য সকলেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অর্থ ভিন্ন সামর্থ্য শক্তি সব কিছুই আকাশকুসুম। এদিকে সরফরাজ খাঁ মুরশিদাবাদের তক্তে বসেছে, তার নজরানা চাই। রমণ সরকারের অর্থদণ্ড হবে। ফৌজদারের কিছু সুবিধা হল।

পর মুহূর্তেই বলেছেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সে বৈষ্ণব-কন্যাকে নিশ্চয় উদ্ধার করব। আমার উপর ভার দিয়েছেন। আমি নিয়েছি ভার, সে ভার উদ্ধার না করতে পারলে আমার নরক হবে। শুধু চঞ্চল হয়ে আমার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।

—না, করব না। যা হয় তুমি কর। শুধু আমার বাক্য যেন নিষ্ফল না হয়। ওই সরল অসহায়া মেয়েটি উদ্ধার হোক। তা হলেই আর অনুশোচনা থাকবে না। কৃষ্ণদাসার জন্য তাঁর অনুশোচনা নেই। না, নেই। এই পরিণতিই তার অনিবার্য।

কৃষ্ণদাসা রাত্রির অন্ধকারে ফসলকীট শ্যামাপোকার মত জন্মেছিল। তিনি অন্ধকারের মধ্যে সূর্যোদয়ের তপস্যায় হোমকুণ্ড জ্বেলে বসে আছেন, তাতে শ্যামাপোকা-কৃষ্ণদাসী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরল ; তিনি কী করবেন তাতে ? তর্পণের সময় 'আব্রহ্মস্তম্ব' পর্যন্ত জগৎকে জলগণ্ডূষ যখন তিনি দেবেন, তখন তার মধ্য থেকে একটি জলকণা সে পাবে, দেবেন তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে আত্মসম্বরণ করলেন মাধবানন্দ।

এই সরলা অসহায়া মেয়েটি রক্ষা পেলে তাঁর আর কোনও গ্লানি থাকবে না। মেয়েটির কিশোর-চিত্তটি তাঁর সম্মুখে সূর্যের সম্মুখে ফুলের মত মেলে ধরেছিল, তিনিও ঠিক তেমনি ভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন—সেখানে বিমুগ্ধতা আছে, ভক্তি আছে, আর কিছু নাই ; সে নিষ্পাপ। পাপ দণ্ডিত হয়েছে অমোঘ নিয়মে, কিন্তু তিনি হয়েছেন তার হেতু। সেই কারণেই ওই নিষ্পাপ মেয়েটিকে রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। তাঁর অন্তর বলছে। হায়, যদি তাঁর পুণ্যময় ইচ্ছামাত্রেই মেয়েটি রক্ষা পেত ! কিন্তু সে পুণ্য এখনও তাঁর সঞ্চিত হয় নি। সকল সময়ে ইচ্ছাশক্তিতেও কাজ হয় না। ভগবানের অবতারেরও হয় না। তাঁকেও সেতুবন্ধন করে সমুদ্র পার হয়ে যুদ্ধ করে রাবণকে ধ্বংস করতে হয় ; তাঁকেও কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করে অশ্বরজ্জু ধরতে হয়—তাতেই শেষ নয়, অশ্বরজ্জু ছেড়ে চক্রও ধারণ করতে হয়। হোক, তাই হোক। কুরুক্ষেত্রই হোক। সমগ্র ভারতভূমে দিকে দিকে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন কার্যকারণে গড়ে উঠেছে ; প্রখরতম গ্রীষ্মে একদিকে বায়ুস্তর শুষ্ক হয়ে উঠছে, অন্য দিকে বৃক্ষশাখা শুকিয়ে ভিতরের অগ্নিকে উন্মুখ করে তুলছে ; শাখায় শাখায় সংঘর্ষে উন্মুখ অগ্নি জ্বললে সমস্ত অরণ্য জুড়ে আগুন জ্বলবে। এ সময়ে শান্তিজল সিঞ্চন, শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের সময়

নয়। এখন আহুতি-মন্ত্র উচ্চারণের সময়, আহুতি দেবার সময়। তাই করবেন, তাই-ই দেবেন তিনি। এই মহাকালের মহাযজ্ঞে তিনি প্রথম আহুতি দিয়েছেন তাঁর সংসার, জীবন, ইহলোক তাঁরা ধ্যান-ধারণা ; দ্বিতীয় আহুতি দেবেন জীবনমুক্তি পরলোক। প্রথম বলি হয়েছে পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসী, দ্বিতীয় বলি হোক বর্বর পশুতুল্য ওই ধনীপুত্রটা। ভগবানের যদি অন্য অভিপ্রায় হয় তবে ফৌজদার অবশ্যই প্রতিবিধান করবে। না করলে কেশবানন্দ বলির ভার নিয়েছেন। কেশবানন্দ নির্ভীক ছেত্তা।

অকস্মাৎ একসময় মাধবানন্দ অনুভব করলেন যেন দিন শেষ হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরটার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের কোণে কোণে ঝিঁঝিপোকাগুলি প্রখরভাবে মুখর হয়ে ডাকছে। দিন শেষ হয়ে গেল। এত শীঘ্র! পরক্ষণেই হাসলেন। কাল যেমন নিজের গতিতে চলে, মানুষের মনও তেমনি নিজের গতিতে চলে। সে যখন আনন্দে আপনার মধ্যে সমাহিত তখন কাল চলে এগিয়ে, মনের এক দিন শেষ হতে হতে হয়তো কালের তিন দিন পার হয়ে যায় ; তপস্বীদের একটি সমাধিতে একবার চোখ বন্ধ করে চোখ খুলতে খুলতে একটা কাল কেটে যাওয়ার কথা মিথ্যা নয়। আবার মন যখন চঞ্চল অধীর, বাইরে ছোটে, সে তখন কালের চেয়েও দ্রুততর গতিতে চলে—তখন কাল পড়ে পিছিয়ে ; একটি উদ্বেগের রাত্রে মানুষের কালো চুল সাদা হয়ে যায়, একরাত্রে গোটা যৌবন অতিক্রম করে মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হয়। কিন্তু আলো জ্বালতে হবে। কই, আশ্রমের সেবকেরা কোথায়? তিনি আসন ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন, শ্যামানন্দ!

বাইরে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন না, দিন শেষ হয় নি, আকাশে আবার মেঘ উঠেছে। পশ্চিম দিগন্ত থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নিঃশব্দসঞ্চারে বনভূমির মাথা পার হয়ে চলেছে পূর্ব দিগন্তের পানে। মৃদুমন্দ বাতাসও বইতে শুরু করেছে। বেলা অবশ্য অপরাহ্ণ পার হয়েছে, পশ্চিম দিকে বনের প্রান্ত শেষের দিকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের আভাস বোঝা যাচ্ছে। প্রবল বর্ষণ নামবে আবার। আকস্মিকভাবে মেঘ উঠে আসার জন্যই সন্ধ্যা নেমেছে বলে ভ্রম হয়েছে তাঁর। কিন্তু আশ্রমটি অত স্তব্ধ বলে মনে হচ্ছে। মানুষ থাকলে তার অস্তিত্বের একটা আভাস অনুভব করা যায়, তাও অনুভব করা যাচ্ছে না। কোথায় গেল সব?

—কেশবানন্দ!

—শ্যামানন্দ!

—যাদবানন্দ।

—গোপালানন্দ!

এবার সাড়া এল : গুরু মহারাজ!

বিশালদেহ সরল সহজ গোপালানন্দ। সে এসে দাঁড়াল।

—এরা সকলে কোথায় গোপালানন্দ?

গোপালানন্দ জোড়হাত করে বলল, ওহি কউয়াঠো আইলো গুরু মহারাজ, কেশব মহারাজজীকে সাথ কী বাতচিজ হইলো, কেশব মহারাজজীকে সবকইকে লিয়ে বাহার হোই গেলেন। হামাকে বোল দিলন কি—গুরু মহারাজকে বাতানা কি হামলোক যাচ্ছে, গুরু

মহারাজকে হুকুম তামিল করকে ঘুমেঙ্গে।

মাধবানন্দ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শুধু। দাঁড়িয়েই রইলেন আকাশের দিকে চেয়ে। ফৌজদার প্রতিকার করে নি। কেন্দুলীর মহান্ত ভরতদাস মহারাজের কথাই সত্য; ঈশ্বরের ন্যায়নীতির অনুসরণে রাজ্যের নীতি, স্বর্গের গঙ্গার ভূমিতলবাহিনী অবস্থার মতই মহিমা সত্ত্বেও মৃত্তিকামলিন। শাসকরাজা ফৌজদার-সুবাদারে আর শিবত্বরহিত নুড়িতে কোন প্রভেদ নেই। জীবনের গ্লানি থেকে পরিত্রাণ আজ শাসননীতি এবং শাসক হতে অসম্ভব। আজ মুক্তির জন্য যজ্ঞের প্রয়োজন।

আকাশের মেঘ দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেল প্রায়। ঘন কালো রঙ ফিকে হয়ে আসছে, সীসার রঙের মত রঙ ধরছে। স্বল্পদীপ্তির সূক্ষ্ম বিদ্যুৎরেখা খেলে গেল—তামসীর মুখের স্মিত হাস্যের মত। মৃদু পক্ষীর গর্জনধ্বনি বেজে গেল গড়-জঙ্গলের মাথায় মাথায়। দীর্ঘায়িত মৃদু গুরু-গুরুধ্বনি। মেঘমল্লারের আসর পড়েছে, মহামৃদঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার ঘা পড়ছে।

—গুরু মহারাজ!

—কিছু বলছ, গোপালানন্দ?

—না, গুরু মহারাজ, আপ কুছ আদেশ করে—?

—না। যাও তুমি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম—এরা গেল কোথায়?

গোপালানন্দ চলে গেল।

মাধবানন্দ পদচারণা শুরু করলেন।

বাতাস প্রবল হয়ে উঠল। দূর থেকে ঝর ঝর শব্দ ক্রমশ নিকট হয়ে আসছে। বনভূমির পাতায় পাতায় পল্লবে পল্লবে সঙ্গীতধ্বনির মত সুর উঠছে। অজয়ে বন্যা আসবে।

কী ভাবে কেশবানন্দ এ কাজ উদ্ধার করবে? শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে বিফল হবে না তো? কেশবানন্দ থাকতে তা হবে না। এরা কি বন্দুক নিয়ে গেছে? হতাহতের সংখ্যা বেশী হবে? হোক। পাপ যেখানে শক্তিকে আশ্রয় করে অসুর সেখানে। এ ছাড়া পথ নেই।

আকাশের দিকে আবার চাইলেন। এখনও সূর্যাস্ত হয় নি? না, এখনও হয় নি। এখনও পাখিরা ডাকে নি। শৃগালেরা সন্ধ্যা ঘোষণা করে নি।

ওঃ, মন বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ছুটে চলেছে, মনের গতির সঙ্গে কাল চলছে না। জীবনের উদ্বেগের সঙ্গে নিরুদ্বেগকালের সম্পর্ক নেই।

মাধবানন্দ আবার মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করে গীতা খুলে বসলেন। ওদিকে আবার বর্ষণ নামল বাইরে।

হঠাৎ একসময় গোপালানন্দ ঘণ্টাধ্বনি করলে, শিঙায় ফুৎকার দিলে। সন্ধ্যা হয়েছে তা হলে। গোপালানন্দ আরতির প্রদীপ নিয়ে আসছে। আরতির জন্য উঠলেন মাধবানন্দ।

এক পশলা প্রবল বর্ষণের পর বর্ষণ ক্ষান্ত হয়ে এসেছে। দুরন্ত বাতাসে মেঘ দ্রুতগতিতে চলে গেছে, তারই মধ্যে যতটা সম্ভব প্রবল বর্ষণ হয়েছে। শীতল হয়েছে পৃথিবী। পূর্বদিগন্তে মেঘান্তরালে শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদ উদিত হয়েই আছে। মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যেও তার আভাস ফুটে

উঠেছে। আলো এবং অন্ধকারের সংমিশ্রণে এ প্রকাশ হয়েছে অপরূপ—দুই রঙের মিশ্রণে এ যেন তৃতীয় রঙের সৃষ্টি! কলরোল তুলে জলস্রোত নামছে সেনপাহাড়ীর মাথা থেকে অজয়ের দিকে, আশ্রমের আশপাশের শালবনের গাছের পাতা থেকে পাতায় জলবিন্দু ঝরছে; এর শব্দ বিচিত্র; সব নিয়ে এ এক সঙ্গীত। মেঘমল্লারের সমাপ্তিপর্ব। মধ্যে মধ্যে এখনও মেঘ ডেকে উঠছে। দূর পূর্বদিগন্তে বিদ্যুৎরেখা ঝলসে উঠছে। বর্ষণ চলছে, এগিয়ে চলছে।

গোপালানন্দ আরতির আয়োজন করে দিয়ে ঘণ্টায় ঘা দিয়ে, শিঙাধ্বনি তুললে। মাধবানন্দ আরতির পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরলেন।

পঞ্চশিখার ছটায় কংসারির হাতের তরবারি ঝকমক করছে, ঝলসে ঝলসে উঠছে। অন্যদিন তো ওঠে না! না, এ তাঁর মনের বিভ্রান্তি? না, এ সত্য। এ-ই সত্য। বিগ্রহ সত্য হলে এ-ও সত্য। সংশয় কেন? মস্তিষ্ক থেকে পা পর্যন্ত রক্তধারা চঞ্চল বেগেই প্রবাহিত হচ্ছিল, সে বেগ দ্রুততর হল।

* * *

আরতি শেষ করে আবার তিনি বসলেন গীতা নিয়ে। কংসারির তরবারিতে আজ বহ্নিচ্ছটার মধ্যে তিনি ইঙ্গিত পেয়েছেন; কেশবানন্দ এতক্ষণ দলবল সমবেত করেছে নিশ্চয়; কেশবানন্দ পাষণ্ডদলন করে অনাথা নিরপরাধ সরলা মেয়েটিকে উদ্ধার না করে ফিরবে না। বিচক্ষণ কেশবানন্দ, এককালে রাজকর্মচারীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেশবানন্দ, পুণ্য-কর্ম-উদ্যত কেশবানন্দ—তার সম্মুখে বর্বর পাপী ও ধনী পিতা-পুত্র ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে। উদরান্নের জন্য অর্থ নিয়ে যারা তাদের দাসত্ব করে, তারা কেশবানন্দের উদ্দেশ্যের কথা শুনে সভয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াবে। কেশবানন্দ নিশ্চয় বলবে—বাধা দিলে শুধু প্রাণই হারাবে না, ইহকালই শুধু যাবে না তোমাদের, ওই নিরপরাধ বালিকার ধর্মনাশে সমুদ্যত পাপীর সহায়তা করার পাপে পরকালও হারাবে, অনন্ত নরকে নরকস্থ হবে। সরে দাঁড়াও। কংসারির সেবক আমরা, পাপীকে ধ্বংস করে পুণ্যাত্মার প্রতিষ্ঠা আমাদের ধর্ম। আমাদের বিপক্ষে যে দাঁড়াবে, সে অধর্মপক্ষ সমর্থনের পাপে ভগবানের বিধানে ধ্বংস হবে। এই পাপে ভীষ্ম হত হয়েছেন, দ্রোণ ধ্বংস হয়েছেন। সাবধান! এখনও পাপপক্ষ থেকে সরে দাঁড়াও, অনুতাপ কর, ভগবানের চরণে শরণ নাও, ধর্মকে আশ্রয় কর। অসহায়া কিশোরী কুমারীকে রক্ষা কর।

উদ্যত হাতিয়ার সম্বরণ করে তারা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হরিধ্বনি দিয়ে অস্ত্র রেখে বলবে, আমার ধর্মের পক্ষকে বরণ করছি। উদ্ধার করুন, আপনারা মোহিনীকে উদ্ধার করুন।

প্রৌঢ় রমণ দে-সরকার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। মার্জনা করুন। এখনি মুক্ত করে দিচ্ছি আমি তাকে।

হয়তো বর্বর পশু অক্রুর মানবে না। চিৎকার করবে; অস্ত্র হাতে নিয়ে উন্মত্তের মত বাধা দিতে আসবে।

মাধবানন্দ বিগ্রহের দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন—মনে মনে কামনা করলেন, তোমার প্রভাবে যেন কেশবানন্দের মধ্যে দৈবশক্তির সঞ্চার হয়, কেশবানন্দ সেই শক্তিতে

বলীয়ান হয়ে শুধু বলবে—ওইখানে, ওইখানেই পঙ্গু হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্ পাষণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অক্রুর পঙ্গু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। নির্বাক। শক্তিহীন পঙ্গু চোখে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি।

উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠে পড়লেন মাধবানন্দ। মন তাঁর আর ধ্যানে মগ্ন নয়, বাইরের জগতে ছুটে চলেছে, ইলামবাজারের দিকে। ওপারের ঘটনা তাঁর মনের কল্পনায় ঘটে চলেছে। পা দুখানিও আপন অজ্ঞাতে চলতে শুরু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে স্থির হয়ে কান পেতে দাঁড়ালেন। দলবদ্ধ মানুষের পায়ের শব্দ, মৃদুস্বরে কথা বলার শব্দ তো শোনা যায় না! ওপার থেকে কেশবানন্দের গম্ভীর কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে না। সমবেত কণ্ঠের হরিধ্বনিও না। শোনা যাচ্ছে জল-কলরোল, জলস্রোত নামছে; তার সঙ্গে হাজার হাজার ব্যাঙের আনন্দ-চিৎকার; মধ্যে মধ্যে এক-একটা প্রমত্ত ময়ূরের কেকাধ্বনি। আকাশের দিকে তাকালেন, কত রাত্রি হল?

এতক্ষণে তাঁর মন স্থানকালে বাঁধা পড়ল। অপরূপ। অপরূপ বাঁধা পড়েছে—স্থান ও কালের বেষ্টনীর মধ্যে হয়তো আকস্মিকভাবে, হয়তো বা কার্যকারণের অনিবার্য বন্ধনে। অপরূপ! এ কী রূপ! অবিশ্রান্ত বর্ষণে ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ গলিত হয়ে ক্ষয়িত হয়ে ক্ষীণস্তর একখানি স্ফটিক আস্তরণের মত পাতা রয়েছে। না, অতি ক্ষীণ এক স্তর মেঘ মন্থরগতিতে ভেসে চলেছে তার উপর। যেন মসলিনের সূক্ষ্ম একখানি আস্তরণ মৃদু বাতাসে দুলছে। তারই অন্তরালে চতুর্দশীর চাঁদ অবগুণ্ঠনবতী স্মিতহাস্যমুখী কোন স্বর্গকন্যার মত আকাশ-অঙ্গনে চলন্ত একখানি আসন পেতে বসে আছে।

মনে পড়ে গেল, বাদশাহ আলমগীর, মসলিনের-তৈরি-পোশাক-পরা কন্যা জেবউন্নিসাকে দেখে বলেছিলেন—লজ্জাহীনা। চাঁদেরও রূপ তেমনি হয়েছে, কিন্তু চাঁদ লজ্জাহীনা বলে তিরস্কারের অতীত। মানবীর অঙ্গে রূপের মাধুরীর সঙ্গে মোহ আছে, তাই তার লজ্জাও আছে, তার দিকে তাকাতেও লজ্জা আছে। চাঁদের শুধু রূপের মাধুরীই আছে, মোহ নেই।

মাধবানন্দ একেবারে মুক্ত অঙ্গনতলে নেমে এসে দাঁড়ালেন। নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে দিলেন বনভূমির মাথার উপর। মেঘের অবগুণ্ঠনে ঢাকা চাঁদের ওই অপরূপ মাধুরী বনভূমির মাথায় মাথায় রূপালী রেখার একখানা মায়াজালের মত বিছিয়ে রয়েছে। সদ্য-বর্ষণস্নাত শালের ঘন-শ্যাম পাতাগুলির উপর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত আলোর ঝিকিমিকি ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে বাতাসের আন্দোলনে পাতার দোলায় দোলায় যেন এই নিবছে এই জ্বলছে, আলো যেন পাতার মাঝে ডুব দিচ্ছে আবার ভেসে উঠছে।

মাধবানন্দ ধীরে ধীরে এসে নিমগাছের তলায় পাথরখানির উপর বসলেন। পাথরখানা এখনও ভিজে রয়েছে, গাছের পল্লব থেকে টোপায় টোপায় জল ঝরছে মধ্যে মধ্যে। থাক্ ভিজে, পড়ুক জল, তিনি পাথরখানার উপর বসলেন। মন বাঁধা পড়েছে এবার প্রকৃতির রূপের খেলায়। সম্মুখে অজয়, ওপরে কেন্দুবিল্ব; মনে পড়ল গীতগোবিন্দ।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার সঙ্গে আজ ঠিক মিলছে না। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ।" অম্বর আজ মেঘমেদুর নয়; বনভূমি সুশ্যাম, তমাল না হোক—শালতরুর

শ্যামলতা গাঢ়ই বটে। জ্যোৎস্নার আলোয় শ্যাম আভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মেঘাড়ম্বর বিষণ্ণ নয়—প্রসন্ন। দীপ্তিমতী হয়ে এমন হলে বালক কৃষ্ণকে রাধার হাতে দিয়ে নন্দ তাকে গৃহে পৌঁছে দেবার কথা হয়তো বলতেন না।

আবার মন ফিরে এল বাস্তব বর্তমানে, আজকের দিনে ঘটনাবর্তে, উদ্বিগ্ন চিন্তায়। মানুষের সাড়া উঠছে নিকটেই কোথাও। একদল লোক যেন কলকল করতে করতে আসছে।

ফিরল? তা হলে কেশবানন্দরা ফিরল পাষণ্ডদলন করে, অসহায়াকে উদ্ধার করে? আসন থেকে উঠে পড়লেন। এসে দাঁড়ালেন আশ্রমের ফটকে। কথা এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

—তিন পোর চেঁয়ে বেশী হবেক আমি বলে দেলম। এর স্যার করাকার।

—হুঁ। এক স্যার লয়, এক মণ। মাগুর লয়, কুমীর বটে উটা তোর। হুঁ।

—উরি মা রে! উরি মা রে! উ! উ! উ! আর্ত নারীকণ্ঠ।

—সাপ! সাপ! সাপ!

কলরব উঠল। পর মুহূর্তেই আর্ত কলরব হাসিতে ভেঙে পড়ল।

—মরণ দশা, ল্যা-লীর দড়িতে পা দিয়ে (খড়ের দড়িতে) ঢঙ দেখ ছুঁড়ীর!

—হি-হি-হি! মাইরি বলছি, তুর কিরে (দিব্যি) আমি বলি গেলম, লিলেক আমাকে যমে, খেলেক কালে। অমন মাগুর মাছটো আর খ' হল নাই আমার। হি-হি-হি!

নারীকণ্ঠের কৌতুকহাস্যে বনের পল্লবদল যেন চকিত হয়ে উঠছে। পল্লীবাসী দরিদ্রের দল, আজ এই বর্ষণের পর নালায় খালে জলের ঢল নামার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল মাছের সন্ধানে। মাছ ধরে ফিরছে! কেশবানন্দেরা নয়। কিন্তু ওরা কি ওপারের কোনও কোলাহল শোনে নি? নিস্তব্ধ রাত্রি, অজয়ের ওপারের কোলাহল এপারে আসবে না? এত বড় কোলাহল। এ কোলাহল তো ক্ষুদ্র হবে না!

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাকলেন, কারা যায়! কারা তোমরা?

—আমরা গ। গাঁয়ের লোক। মাছ-ধরনে যেয়েছিলাম গ।

—অজয়ের ধার থেকে আসছ তোমরা?

শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন মাধবানন্দ এবং কথা শেষ হতে হতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে চিনতে তাদের দেরি হল না। তখন মেঘ কেটে খানিকটা নীল আকাশের প্রকাশ হয়েছে প্রায় মাথায় উপর, আধখানা চাঁদ তার মধ্যে পূর্ণ জ্যোতিতে দীপ্যমান। তাঁকে চেনবামাত্র তারা সসম্ভ্রমে বললে, গোসাঁইবাবা মহারাজ!

—হ্যাঁ, অজয়ের ওপার থেকে কোনও গোলমাল শোন নি তোমরা?

—গোলমাল? আজ্ঞা, বই না তো! বরং চুপচাপ গ সব। বাদলের ঠাণ্ডিতে সব ঘুম দিছে লাগছেক।

—হুঁ। আচ্ছা, তোমরা যাও।

চিন্তিত মনে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। গ্রাম্য লোক কটি তাঁর স্তব্ধতার গাম্ভীর্যে শঙ্কিত হয়ে আর দাঁড়াতে সাহস করলে না, নীরব হয়েই স্থানত্যাগ করল।

মাধবানন্দ কণ্ঠস্বর উচ্চ করে ডাকলেন, গোপালানন্দ।

আশ্রমের ফটক থেকেই সাড়া দিল গোপালানন্দ : গুরু মহারাজ ! গুরু মহারাজ আশ্রম ছেড়ে বাইরে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। মাধবানন্দ লোক কয়টির সামনে দাঁড়ালেন যখন, তখন সে ফটকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মাধবানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সেও আছে।

সাড়া দিয়ে সে এসে কাছে দাঁড়াল। বলিষ্ঠদেহ স্থূলবুদ্ধি গোপালানন্দ, গুরু মহারাজের আশেপাশে ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধ পোষা বাঘের মত। গুরু বসে থাকেন, সে তাঁর দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গুরু মহারাজ স্তোত্রপাঠ করেন, সে দূর থেকে উৎকর্ণ হয়ে শোনে। পোষা পাখির মত শুনে যতটা আয়ত্ত হয়, সেইটুকুই ঠিক তেমনিভাবে, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত নকল করে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করে। ভালবাসে হৃষ্টপুষ্ট গাভী কটিকে। মধ্যে মধ্যে অকারণে কাঁদে। প্রশ্ন করলে স্থূলদৃষ্টি মেলে উত্তর দেয় : ভর দুনিয়া দুখ, দুখ আওর দুখ মালুম হোতা হ্যায়—ওহি দুখসে রোতা হ্যায় মহারাজ।

কতদিন মাধবানন্দ নিজে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছেন, আনন্দ হ্যায় ভগবানমে। উনকো দর্শন তুমারা মিলেগা বেটা।

মধ্যে মধ্যে সামান্য কারণে রাগে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। তখন সামনে এসে দাঁড়ান কেশবানন্দ। কেশবানন্দকে তার প্রচণ্ড ভয় ; মাধবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের সময় কেশবানন্দই তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

হাতজোড় করে গোপালানন্দ বললে, গুরু মহারাজ !

মাধবানন্দ বললেন, তুমি গিয়ে অজয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাক। ওপারে কোন গোলমাল শুনলেই ওখান থেকে শিঙা বাজিয়ে আমাকে জানাবে। ওপার থেকে কেশবানন্দরা ফিরছে দেখলেই বা বুঝলেই আমাকে এসে খবর দেবে।

গোপালানন্দ বললে, হাঁ গুরু মহারাজ।

—শিঙা নিয়ে যাও গোপালানন্দ।

যেতে যেতে ফিরে গোপালানন্দ সবিনয়ে হেসে বললে, হাঁ হাঁ বাবা গুরু মহারাজ।

শিঙা নিয়ে সে চলে গেল ; তার মোটা গলার গান ক্রমশ দূরে চলে গেল।

"তুনি সুখ মিলে ভিখ্‌দাতা
সুখদাতা।"

*　　*　　*

মুহূর্ত দীর্ঘ হয়ে যেন প্রহর মনে হচ্ছে। সময় চলছে না। এরই মধ্যে দ্বিপ্রহর ঘোষণা করে শিবারব ধ্বনিত হল ; প্যাঁচারা ডাকল, বাদুড়েরা উড়ল। আর থাকতে পারলেন না মাধবানন্দ, নিজেও বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে পড়বার সময় তরবারিখানি টেনে নিলেন কংসারির বেদী থেকে।

কী হল ? কেশবানন্দেরা ভয়ে পারলেন না অগ্রসর হতে ? প্রথম উদ্যমেই ব্যর্থতা ? দু পাশের ঘন শালবনের মধ্যে এখনও জলস্রোত নামছে ; পায়ের তলায় রাঙা মাটি নরম হয়ে খানিকটা পিছল হয়েছে। সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে। পথও ভাল দেখা যাচ্ছে না। সেই

ছায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্নার দীপ্তিময় শ্যামবর্ণাভা যেন ম্লান হয়ে গেছে। ও! আকাশে মেঘ আবার গাঢ় হয়ে উঠছে; পশ্চিম দিগন্তে আবার একখানা নিকষ-কালো মেঘ মুখ বাড়িয়ে বুক পর্যন্ত যেন এগিয়ে আসছে। তারই প্রথম অংশটা চাঁদকে ঢাকছে। অন্ধকার মুহূর্তে-মুহূর্তে ঘন হচ্ছে যেন মহাকাল-প্রেয়সী সতী দক্ষযজ্ঞের সূচনায় শ্যামা থেকে কৃষ্ণা কালী হয়ে উঠছেন।

অকস্মাৎ নিশীথ-রাত্রির এই কৃষ্ণরূপান্তর চকিত হয়ে উঠল বিদ্যুৎ-চমকের দীপ্তিতে, তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শিঙা বেজে উঠল। মাধবানন্দ উল্লসিত হয়ে প্রাণ খুলে ডাক দিয়ে উঠলেন, জয় কংসারি!

তাঁর ডাক শেষ হতে হতে মেঘ ডেকে উঠল গুরু গুরু গুরু গর্জনে। কিন্তু সে গর্জন মাধবানন্দের মনে যেন ধরাই পড়ল না। মনে হল, গোপালানন্দের শিঙাধ্বনিই দিগ্‌দিগন্তে বিপুল হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে।

—জয় কংসারি! তোমার নির্দেশ, তোমার ভক্তদের মধ্যে সার্থক কর। পাপীর ক্ষয় হোক; সাধু পুণ্যাত্মার জয় হোক, নিরীহ, অসহায়, পরিত্রাণ লাভ করুক।

দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন তিনি। হ্যাঁ, তিনিও কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন। ওপারে আ-আ-আ ধ্বনি উঠছে। প্রচণ্ড কিছুর আঘাতশব্দ উঠছে যেন—দুম্-দুম্-দুম্। বোধ করি দে-সরকারের বড় দরজায় ঢেঁকির ঘা পড়ছে। ঢেঁকি দিয়ে ঘা মারলে গড়ের দরজাও ভেঙে পড়ে। বড় বড় জমিদারের ঘরে ডাকাতেরা এইভাবেই দরজা ভাঙে।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ডাকাতি! এ কি ডাকাতি নয়? স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন মাধবানন্দ। কতক্ষণ তার স্থিরতা নেই। তিনি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিলেন। উপায় নেই। আর মুক্তি নেই। ওপারের কোলাহল বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকছে। কোথায় যেন বাজ পড়ল, প্রচণ্ড, বিদ্যুৎ-দীপ্তি, পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর মেঘগর্জনে সব কেঁপে উঠল। সেই মুহূর্তেই নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল কোথাও। কাছেই কোথাও। যেন ওই নদীর ধারে!—আ—

মাধবানন্দের সর্বশরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। তিনি ছুটলেন।

—আ—। ছেড়ে দাও। বাঁচাও। আ—

মাধবানন্দ দিক লক্ষ্য করে ছুটে এসে উঠলেন অজয়ের বাঁধের উপর। চিৎকার করে ডাকলেন, গোপালানন্দ!

একটা ক্রুদ্ধ জান্তব গর্জনে উত্তর এল: আঃ—

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে মাধবানন্দ দেখলেন, এই দিকেই ছুটে আসছে একটি বালিকা—কিশোরী। চকিতে দেখাতেই মনে হল অপরূপা মেয়ে। তার পিছনে দুই বাহু বিস্তার করে ছুটে আসছে লালসায় উন্মত্ত দানবের মত গোপালানন্দ।

মাধবানন্দ কঠোর চিৎকারে শাসন করে হাঁক দিলেন, গো-পা-লা-নন্দ! মেয়েটি সেই মুহূর্তেই তাঁর পায়ে এসে চিৎকার করে আছাড় খেয়ে পড়ল: ওগো গো-সাঁ-ই! কে? মোহিনী? কিন্তু সে দেখবার তখন সময় ছিল না। তার পিছনে কামার্ত গোপালানন্দ সেই ক্রুদ্ধ জান্তব চিৎকারে উত্তর দিল: আঃ! চোখ দুটি তার জ্বলছে। উন্মত্ত দৃষ্টি, পাশব

কামার্তভায় সে ভ্রূক্ষেপহীন, তার জ্ঞান বুদ্ধি ভয় সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে গুরু মহারাজকে চিনতে পারছে না। দাঁতে দাঁত টিপে, কঠিন আক্রোশে সে তাঁর উপর আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে।

মাধবানন্দ মুহূর্তে তাঁর হাতের তরবারিখানার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিদ্ধ করে দিলেন গোপালানন্দের বুকে। উষ্ণ তরল একটা ধারা পিচকারির মুখের ধারার মত তাঁর দেহে এসে লাগল। বারেকের জন্য চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। চোখে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, রঙ কালো, মনে হচ্ছে আলোর অভাবে; কিন্তু উষ্ণ স্পর্শে, গাঢ়তায়, গন্ধে বলে দিচ্ছে—রক্ত।

মাথার মধ্যে যেন বজ্রপাতের বিদ্যুৎ-দীপ্তি খেলে গেল। তীব্রতম উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলেন মাধবানন্দ। জীবনে তাঁর এই প্রথম স্বহস্তে অস্ত্রাঘাতে আততায়ীকে হত্যা। অসহায়া ভীতার্তা একটি কুমারীকে রক্ষা করতে, কামোন্মত্ততায় হিংস্র পশুতে পরিণত গোপালানন্দের দানবের মত শক্তিকে প্রতিহত করে তাকে হত্যা করেছেন। গোপালানন্দ তাঁর শিষ্য। সে তাঁর সন্তান হলেও এমনি দৃঢ়হস্তে তরবারি ধরতেন তিনি। দুই কানের পাশ দিয়ে যেন আগুনের উত্তাপ অনুভব করছেন। চোখ যেন জ্বলছে। প্রবল বর্ষণসিক্ত দিনটির বাতাসের শৈত্য স্নিগ্ধ বলে মনে হচ্ছে।

পরক্ষণেই হতচেতন মেয়েটিকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন এবং দৃঢ় মুষ্টিতে রক্তাক্ত তরবারিখানা ধরে অকারণে উদ্যত করে ফিরলেন। আশ্রমে ফিরে মন্দিরের দাওয়ার উপর নামাতে গিয়ে নামালেন না। এদিকের সেবকদের ঘরের দাওয়ায় ধুনি অর্থাৎ অহরহ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডটার পাশে মেয়েটাকে নামিয়ে দিলেন। মেয়েটার বেশবাস সর্বাঙ্গ জলে ভিজেছে, হাত দুটোর স্পর্শ যেন হিমের স্পর্শ। ধুনির কাঠগুলি একটু ঠেলেও দিলেন।

তারপর নিজে ঊর্ধ্বলোকে মুখ তুলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রবল একটা গতিবেগে তিনি যেন ভেসে চলেছেন। নিয়তি? বুঝতে পারছেন না, তাঁর মন এবং মস্তিষ্ক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি যেন নিজে চলছেন না। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—আঃ, তারপর কী? স্মৃতিও যেন বিস্মৃতির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। হারিয়ে যাচ্ছেন নিজে।

একসময় করুণ আবেগভরা নারীকণ্ঠের মৃদুস্বরে এবং পায়ের উপর কোমল কিছুর স্পর্শে চমকে উঠলেন মাধবানন্দ।—কে?—ওঃ, সেই মেয়েটি! সচেতন হয়ে উঠলেন এতক্ষণে। দৃষ্টি নামালেন।

কখন চেতনা পেয়ে মেয়েটি উঠে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে বলছে, দয়াময় নবীন গোসাঁই! ঠাকুর! ওগো দেবতা!

এ কী, এ যে মোহিনী! হ্যাঁ, এ তো মোহিনী! সেই ভাষা।

—ওঠ। ওঠ, তুমি ওঠ। পা ছাড়। ওঠ।

তাঁর বাক্য অবহেলা করবার মত শক্তি মোহিনীর নেই, সে পা ছেড়ে উঠে হাত জোড় করে নতজানু হয়ে দেবতার সম্মুখে পূজার্থিনীর মত বসল।—তোমার দয়া ছাড়া আমি বাঁচতাম না গোসাঁই। ঠাকুর, তুমি আমার সাক্ষাৎ ভগবান।

এর উত্তর দিতে পারলেন না মাধবানন্দ। ওদিকে ধুনির আগুন চমকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেই আগুনের আভা পড়েছে মোহিনীর সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য মনে হচ্ছে। এ তো ভিখারিণী অসহায়া মেয়ে নয়, এ যে কোন অপরূপা রাজনন্দিনী, মহার্ঘ বেশবাস, কপালে চন্দনের ছাপ, চোখে কাজল। কেমন করে হল ? তবে কি—

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ওই কটি কথা বলেই যেন সকল আবেগ শেষ করে নিঃশেষ হয়ে গেছে মোহিনী। ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ছে ছিন্নমূল লতার মত। চোখ দুটি আপনা থেকে বুজে আসছে, মধ্যে মধ্যে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। উপবাসক্লিষ্ট বিশীর্ণ মুখ। তার সে মুখ দেখে করুণা না হয়ে পারে না। চোখ থেকে জলের ধারা নেমে আসছে।

মাধবানন্দ অধীর হয়ে উঠলেন। অন্তরে মমতা বিগলিত তুষারের মত স্রোতবতী হয়ে উঠছে, অন্য দিকে প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্বেগে উত্তেজনায় তিনি আগ্নেয়গিরির মত উত্তাপে বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছেন। ওই কলুষিত দেহটাকে বাঁচাতে নরহত্যা করলেন তিনি ? আত্মা মরেছে অক্রুরের হাতে ? তার কী হল ? তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। আবার প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে বল ? তুমি একা কেন ? একলা তুমি কেমন করে এলে ?

—গঙ্গা পার হয়ে বনে বনে অজয়ের ধারে ধারে পালিয়ে এসেছি গোসাঁই। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমাকে বাঁচাও।

—তুমি বেঁচেছ ?

এ প্রশ্নে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সরলা গ্রাম্য কিশোরীটি।

—যদি বেঁচছ তো এই প্রেমোন্মাদ সাজ কেন তোমার ? অক্রুর তোমাকে—

এবার বুঝল মোহিনী। ঘাড় নেড়ে স্মিত হেসে বললে, না, সে আমাকে ছুঁতে পারে নি, সেও তো তোমার দয়া ঠাকুর। ওদের বাপ-বেটাকে যে ফৌজদার ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেও তো তুমি চিঠি লিখে দিয়েছিলে গোসাঁই ! বিকেলে ফিরে এসে বড় সরকার আমাকে বললে—তোর নবীন গোসাঁই তোকে ছাড়িয়ে নিতে ফৌজদারকে চিঠি লিখেছিল, এবার কী করে ছাড়ায় দেখি ! কায়স্থ বৈষ্ণবের ছেলের সেবাদাসী হতিস, এবার যা নবাবী হারেমে বাঁদী হয়ে থাকবি, যা। আমাকে সাজিয়ে-টাজিয়ে নৌকোয় তুলে দিয়েছিল সন্ধ্যের সময়। ভোর ভোর আমাকে শহরে নবাবের কাছে নিয়ে যেত।

সঠিক বুঝতে পারলেন না মাধবানন্দ—কী বলছে মোহিনী। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, নবাবের কাছে পাঠাচ্ছিল তোমাকে ?

—রাজনগরে রাজার কাছে ঘোরস'র (সওয়ার) পাঠিয়েছিল বড় সরকার। বুদ্ধি খাটিয়ে চিঠি লিখেছিল—

বড় সরকার—রাধারমণ দে শুধু কৃতী ব্যবসায়ীই নয়, তার সঙ্গে সে কূটবিষয়বুদ্ধিতে চতুর

তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। ফৌজদার হাফেজ খাঁ উদার মুসলমান, ন্যায়বান শাসন। তিনি পত্র পড়ে অভিভূত হয়ে, ভোররাত্রে সওয়ার পাঠিয়ে, সরকারদের পিতাপুত্রকে নিজের কাছারিতে হাজির করেছিলেন। কিন্তু রমণ সরকার হাতেমপুর রওনা হবার পূর্বেই ফৌজদারের লোকদের কাছে সকল বিবরণ জেনে নিতে কিছু অর্থব্যয় করতে কার্পণ্যও করে নি, ভুলও করে নি। এবং রাজনগর দরবারে একখানি পত্র লিখে দ্রুতগামী সওয়ারের হাতে দিয়ে দুটি মূল্যবান পারস্যসাগরের মুক্তা ও স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে, গোবিন্দ স্মরণ করে, নির্ভয়ে রওনা হয়েছিল। তাতে সে লিখেছিল—মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপ ন্যায়বিচারী বীরভূমাধিপ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজনগর-রাজ জনাব আলি বাহাদুরের সমীপে ইলামবাজার-অধিবাসী পুরুষানুক্রমে রাজানুগত তুলা ও গালা-ব্যবসায়ী রাধারমণ দে-সরকারের একান্ত বিনীত আরজি এই যে—। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দে-সরকার মুহূর্তের চিন্তায় আশ্চর্য কার্যকরী প্রতিরোধ-পন্থা আবিষ্কার করেছিল।

নবাব সুজাউদ্দিন গত। নবাবজাদা সরফরাজ খাঁ মসনদে বসেছেন। সরফরাজ খাঁর চরিত্র অতি বিচিত্র। তাঁর হারেমে প্রায় হাজারখানেক উপপত্নী। কেউ বলে—নারী-বিলাসী কামুক, কেউ বলে—নবাবজাদার বিচিত্র ধর্মসাধন-পন্থায় ওরা তাঁর সহচরী। উপপত্নীর অসুখ হলে নবাবজাদা কোরাণ মাথায় সারাদিন প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকেন। দে-সরকার নিজেও নারী নিয়ে ধর্মসাধনা করেছে। চতুর ব্যবসায়ী, টাকা-আনা পাই নিয়ে সারাদিন অঙ্ক কষে; গুদামে মাল বোঝাই করে ধরে রেখেছে মাস পরের বাজার-দর বাঁধে। সে হিসেব করেই রাজনগরের রাজাকে জানাল যে, ভাবী নবাব সাহেবের ধর্মসাধনার পথে সহায় হইবার যোগ্যতা আছে এবং সেবায় তাঁহাকে তুষ্ট করিবার নিষ্ঠা আছে দেখিয়া একটি বৈষ্ণব-বালিকাকে তাহার মায়ের কাছ হইতে উচিত মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া অন্যান্য উপঢৌকনসহ তাহাকে রাজধানী মুরশিদাবাদে ভেট পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছি। এবং নিজের জন্য রায় খেতাব প্রার্থনা করিয়াছি। কিন্তু অজয়ের ওপারে গড়জঙ্গলে আগন্তুক এক ধর্মান্ধ সন্ন্যাসী ইহাতে হিন্দু-কন্যা মুসলমানের হাতে সমর্পণ করা হয়—এই অজুহাত তুলিয়া হাতেম-পুরের নূতন ফৌজদার সাহেবের বরাবর এক পত্র পেশ করিয়াছে। সন্দেহ হয়, এই বৈষ্ণব সাধু নিজেই নবাবের নামে ক্রয়-করা এই অপরূপ গুণ ও রূপবতী কুমারীটিকে মনে মনে কামনাও করে। হাতেমপুরের ফৌজদার বয়সে নবীন—ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাই-বার জন্য অধীনকে এবং তদীয় পুত্রকে একরূপ গ্রেপ্তারই করিতেছেন।

এর ফলে বেলা দুপ্রহর নাগাদ রাজনগর থেকে সওয়ার এসে হাতেমপুরের ফৌজদারী কাছারিতে নবাবী হুকুমত জারি করে দে-সরকারদের পিতাপুত্রকে মুক্তি দেয়। সেই দেখেই কয়ো ছুটে এসেছিল আশ্রমে। কয়োর সংবাদ নিয়েই কেশবানন্দরা বের হয়ে গিয়েছে। কয়ো একটা সংবাদ পায় নি। সে সংবাদ হল এই যে, রাজনগরের রাজার আরও একটি হুকুম ছিল। সে হুকুম দে-সরকারের উপর। হুকুম ছিল, ওই বাঁদীকে ভেট সহ অবিলম্বে আগামী প্রত্যুষের মধ্যে যেন মুরশিদাবাদ রওনা করানো হয়। এই হুকুম খেলাপে দে-সরকারকে মন্দ অভিপ্রায়ের জন্য দায়ী করা হইবে।

রাজনগরের ঘোড়সওয়ার নিজে দাঁড়িয়ে, মোহিনীকে নৌকোয় চাপানো দেখে তবে রাজনগর ফিরে গেছে। দে-সরকার আপসোস করে বলেছিল, রাজকুল চিরকালই বুনো তেঁতুলের মত জোঁদা টকই থাকল রে বাবা, যত গুড় দিয়েই রাঁধ না কেন, খেলে শুধু অম্বল নয়—অম্বলশূল হবে।

সাজিয়ে-গুজিয়ে মোহিনীকে নৌকোয় তুলে দিয়ে, তার সঙ্গে গালার খেলনা, মসলিন, বিষ্ণুপুরের রেশমী কাপড় এবং আরও নানান জিনিসে নৌকো সাজিয়ে, মাল্লা-মাঝি এবং পাহারাদার জিম্বা করে নেমে যাবার সময় দে-সরকার মুখভঙ্গি করে মোহিনীকে বলেছিল, যাও, নবাবী হারেমে গিয়ে বাঁদীগিরি কর, গরম গোস্ত আর প্যাজ-রসুনের কালিয়া পোলাও খেয়ে বষ্টুমী-জন্ম সার্থক কর। তোমার নবীন গোসাঁইয়ের বাবার বাবা এলেও এ থেকে রক্ষে নাই।

জিম্মায় রেখে গিয়েছিল জন-দুই পাইক আর মাঝি-মাল্লাদের। কিছুক্ষণ পর এসেছিল ফুলজান বিবি, সে তার সঙ্গে যাবে।

অতি সরল, ভীরুপ্রকৃতির মেয়েটি প্রথমটায় দে-সরকারের এত কথা শুনেও বুঝতে খুব কমই পেরেছিল। যেটুকু বোধশক্তি, তাও ভয়ে বিহ্বলতায় দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। এমন মনোহর সাজে সেজে নৌকোয় চড়ে এইটুকু শুধু বুঝেছিল যে, তাকে নবাবী হারেম নামক কোন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। নৌকোর ছইয়ের মধ্যে খাঁচায় বন্দিনী হরিণীর মত দু'পাশের দুটি চোখ ঘুলঘুলির কাছে এসে বাইরের দিকে চেয়ে ভয়ার্ত এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রবল বর্ষণ নামল, দুই পাশের সমস্ত কিছু বর্ষণধারার মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর সন্ধ্যা হল, রাত্রি নামল, সে একসময় ক্লান্ত হয়ে পাটাতনের উপর বিছানো একখানা শতরঞ্চির উপর বসে পড়ল। অন্ধকার হয়ে গেছে ছইয়ের ভিতর, সেই অন্ধকারই যেন পৃথিবীজোড়া অন্ধকার, তারই মধ্যে সে ডুবে গেছে। মাঝি-মাল্লারা বাইরে খানিকটা ঢাকা অংশের মধ্যে তামাক খেতে খেতে গল্প করছিল ফুলজান বিবির সঙ্গে। ফুলজান বিবি ইলামবাজারের গালার চুড়ির বিখ্যাত চুড়িওয়ালী। সে বরাত দিয়ে চুড়ি তৈরি করিয়ে হিজড়ে বাঁকাওলীর মাথায় চাপিয়ে বড় বড় জমিদার মহাজন থেকে কাজী ফৌজদার মনসবদার সাহেবদের অন্দরে গিয়ে বহু-বেটী-বিবিদের চুড়ি পরিয়ে আসে। বছরে দু-তিনবার মুরশিদাবাদ যায়, তখন সুবা বাংলার সুবাদার নবাব বাহাদুরের হারেমে গিয়ে চুড়ি পরিয়ে আসে। হারেমের খোজা বাঁদী বেগম, এমন কি নবাবও তাকে চেনেন। নবাব সুজার ফররা-বাগেও সে অনেকবার গিয়েছে। চেহেল-সেতুনের সব সে চেনে। বিশেষ করে নূতন নবাব সরফরাজ খাঁ তাকে ভাল করে চেনেন। হাজারখানেক বেগম। নবাবের খেয়ালে সব বেগমকে কখনও একরকম চুড়ি পরিয়েছে, কখনও রকম রকম পরিয়েছে। ফুলজান প্রৌঢ়া কিন্তু সাজ-সজ্জা করে তরুণীর মত। পান এবং দোক্তার সঙ্গে তার ফুরসি নিয়ে সে মাঝি-মাল্লাদের গাল দিচ্ছিল আর গল্প করছিল : উল্লু—বুরবক—ছোট জাত—ছোট আদমী, জাহান্নমে যা। এই তোরা ছিলম বানিয়েছিস! তোবা—তোবা—তোবা! আমার খুসবইদার তমকুল এমন করে বানালি যে সব বরবাদ হয়ে গেল! নবাব সুবাদার হলে কী

করত জানিস রে বেয়াকুফ। ফুরসির নল সটাকসনি আছড়ে ফেলে হাঁকত—আবে কৈ হ্যায় রে? কোতল করনা ছিলমদারকো। হঁ! দে রে বুরবক, উল্লু, বন্দর, একটা কাঠি-উঠি দে; খুঁচে-খেঁচে দেখি কী হয়! আরে, বোলাও না, ওহি লেড়কীকে বোলাও; তমকুল পিলাতে তালিম দেই দি। নবাবী হারেমে যাবে, আর ওর যা সুরত, আর নতুন নবাবের যা নজর, তাতে তুরন্ত ওর নসীব খুলবে। সঙ্গে সঙ্গে হারেমে কি ফররা-বাগে ভেজবে। একদিনমে বেগম বনেগী। পেশোয়াজ ওড়না পরিয়ে কিংখাবের বিছানায় বসিয়ে বাঁদীরা শরবৎ আনবে, তারপর পান, তারপর হাতে তুলে দেবে ফুরসিল নল। বেয়াকুফের মত টেনে কেশে মরবে। বমি করবে।—তার চেয়ে আন ওকে, তালিম দেই দি। নসীবওয়ালী গরিবের বেটী হত—ভুঁড়িওলা তুলাবেচা সরকারের ওই ভাল্লুর মত বেটাটার বাঁদী, নয় তো ওই ওপারের ওই যে নতুন হিন্দু ফকির—ওরও পোষা কুত্তি। তা না, একদিনে নসীব খুলল, চলল শহর মুরশিদাবাদ, সুবা বাংলার সুবাদার জঙ্গ বাহাদুর নবাব-উল-মুলুক সরফরাজ খাঁ বাহাদুরের চেহেলসেতুন না হয় ফররা-বাগ! হা-রে-হা! হা-রে-হা! নে, কই হয়েছে, দে দেখি টেনে। তুই বেটা টেনে টেনে এতনা ধুঁয়া নিকাললি রে কি কইইটাকে ভাঁটা মে আগ লাগা মালুম হোতা। ছোটা আদমী, ছোটা জাত, উল্লু বান্দর কাঁহাকা! আমার যদি একতিয়ার থাকত তো তোদের চাবুক লাগাতাম। আর ওই হিন্দু ফকিরকে ধরে এনে কলমা পড়িয়ে এক বুঢ়টীর সঙ্গে নিকা দেওয়াতাম। হাঁ। এই এমন ছোকরি তার উপর তার নজর!

মাঝি-মাল্লা একজন বলেছিল, আমাদের পান দিচ্ছ দাও, নবীন গোসাঁইকে নিয়ে পড়লে কেনে? সে কী করলে?

—আঁ? কী করেছে? কেয়া কিয়া হ্যায়? ওহি ওহি ফকির তো সব করলে রে বুরবক! ওর নজর ছোকরির উপর ছিল কিনা—তাই কউশার পাশ যব শুনলো কি, অক্‌কুরুর ছোকরিকে ঘর মে লে গিয়া, কাল পুর্ণমাসি রোজ, উসকী সেবাদাসী বানা লেগা, ব্যস—এক চিঠঠি লিখা ফৌজদার হাফেজ খাঁ বরাব্বর। হঠ হঠ, পানের পিচ ফেলে নিই আগে!

পানের পিচ ফেলে নূতন পান-জর্দা খেয়ে খুসবইওয়ালা তমকুলের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ফুলজান বক বক করে বকে একলাই নদীর বুকে নৌকোর মজলিসটি জমিয়ে রেখেছে।

মোহিনী উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেই চলেছে। যতই শুনেছে, ততই বেদনা, নৌকোর তলায় অজয়ের জলের মতই বেড়ে চলেছিল। নৌকোখানার দোলা বাড়ছিল, ছল-ছল শব্দ ক্রমশ যেন কলকল ধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, সেই শব্দের অন্তরাল দিয়ে মোহিনী কাঁদতে কাঁদতে একটি কথাই বলে চলেছিল—ওগো গোসাঁই, ওগো দেবতা, যদি ওই অক্‌কুরের মত কুমীরের হাত থেকে বাঁচালে, এতই দয়া যদি করলে, যদি দাসী হিসেবেই আমাকে চেয়েছ, তবে মাঝনদীতে ছেড়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিলে কেনে? আমি যে সাঁতার জানি না দয়াল। কুমীর ছেড়েছে, এখন ভেসে চলেছি হাঙরের দহে। দেবতা, নবাবের হাত থেকে বাঁচাতে তুমি ভগবানকে খত নিকলে না ক্যানে? তোমার খত তো তাঁর দরবারে পৌঁছয়! ঠাকুর! দয়াল! ওগো নবীন গোসাঁই।

এরই মধ্যে শেয়াল ডাকল, রাত্রি এক প্রহর হল। ফুলজান ছইয়ের মধ্যে এসে খানা নিয়ে বললে, খা ছোকরি, খেয়ে নে। বাইগুনের কাবাব আছে, রোটী আছে, ঠাণ্ডি ভাত আছে, পিঁয়েজ দিয়ে বহুত তরিবত করে কুরতি কলাইবাটা আছে, পুঁটিমাছের কালিয়াভি আছে। খা। পোলাওয়ের থারি, মুরগ মসল্লম খাবি দুদিন পর, তখন দেখিস ফুলজানের হাতের পাকানো খানা ভাল, না নবাবের বাবুর্চিখানার খানা পাকানো ভালো!

মোহিনী শুধু ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, সে খাবে না।

ফুলজান আরও বারদুয়েক খেতে বলে আর বলে নি, নিজেই খেতে বসে গিয়েছিল। বক্ বক্ করা ফুলজানের স্বভাব, খাবার সময়েও বকেই চলেছিল। মোহিনীকেই বকছিল ফুলজান। ছোট জাত, ছোটলোকের বেটীর মন কি ফুলজান জানে না? জানে। তা না খেয়ে কদিন থাকবি থাক্। কদিন ওই হিন্দু ফকিরের খুবসুরত মুখখানা ভেবে না খেয়ে থাকা যায় দেখবে সে। আর ওই হিন্দু ফকিরকেও দেখবে সে। নবাবকে বলবে, ওকে কলমা পড়িয়ে ফুলজানের হাতে দাও, সে ওকে শায়েস্তা করে দেবে।

খাওয়া শেষ করে পান-তামাক খেয়ে শুয়েই সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করেছিল সে। মাঝি-মাল্লারাও ঘুমিয়েছিল, ইলামবাজারের বাজার ঘুমিয়েছিল, ঘুমোয় নি বাতাস, ঘুমোয় নি অজয়ের ধারের শালবনের পত্রপল্লব, ঘুমোয় নি অজয়ের জল। বাতাসে শালবনের শাখাপল্লবের সন-সন সোঁ-সোঁ শব্দ কখনও কম হচ্ছিল, কখনও বাড়ছিল—অজয়ের কল-কল শব্দ বেড়েই চলেছিল। জেগে ছিল শুধু ছইয়ের দরজায় দে-সরকারের পাইকটা, সে মধ্যে মধ্যে গাঁজা খাচ্ছিল এবং অশ্লীল গান গেয়ে চলেছিল। আর জেগে ছিল মোহিনী। শুদ্ধ হয়েই পড়ে মনে মনে ভাবছিল, হায় গোসাঁই! গোবিন্দের দরবারে কেনে তুমি জানালে না নবীন গোসাঁই?

হঠাৎ একটা বিপুল কোলাহল উঠেছিল কোথায়। আতঙ্ক-করা কোলাহল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গোটা নৌকোটা দুলে টলে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কে চিৎকার করে ডেকেছিল, ওরে—ওরে শম্ভা রে! জগা রে!

—কী? কে?

—সর্বনাশ হয়েছে। সরকার-বাড়ির গদিতে ডাকাত পড়েছে। ওরে, আমি ফড়কে বেরিয়েছি। তোদের খবর দিতে এসেছি। আয়, জলদি আয়। ডাকাত।

—বেরত ডাকাতের দল। পঞ্চাশ-ষাট জনা লোক। ঢাল তরোয়াল শড়কি! পগগর বেঁধে চলে এসেছে। ঢেঁকি দিয়ে দুয়োর ভাঙছে। চারিদিকে ঠিক ঠিক জায়গায় ঘাঁটি পেতেছে। শিগগির আয়।

—নৌকো?

—থাকুক পড়ে।

তারা চলে গেল। মাঝি-মাল্লারা এবং ফুলজান উঠে বসল। ফুলজান গাল দিতে বসল, নায়েব-নাজিম জঙ্গবাহাদুর মালিক-উল-মুল্ক্ নবাব বাহাদুরকে বলে, এই ডাকাতের দলকে সে এমন সাজা দেওয়াবে যে, লোকের ডরকে মারে রাত্রে ঘুম হবে না। দু পা ধরে কুড়াল

দিয়ে দুদিকে ফেড়ে গাছে টাঙিয়ে দেবে। হাত-পা টুকরো টুকরো করে কেটে জানোয়ারকে খাওয়াবে, কোমর পর্যন্ত পুঁতে ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবে।

আরও গালাগাল দিত, কিন্তু বাধা পড়ল। আবার একজন ছুটে এল—ওই পাইকদেরই একজন। লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে মোহর জহরতের সেই হাতীর দাঁতের বাক্সটা নিয়ে ঝপ করে অজয়ের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বললে, পালা, পালা সব। ডাকাতেরা মোহিনীকে লুটে নিয়ে যেতে এসেছে। বড় সরকারকে খুঁটিতে বেঁধে মশালের ছেঁকা দিয়ে শুধুচ্ছে—মোহিনী কাঁহা বাতাও? কয়ো বোষ্টমী মোহিনী মোহিনী বলে চেল্লাচ্ছে—সাড়া দে মোহিনী, তোকে নিতে এসেছি। মোহিনী! পালা। এখুনি কে বলে ফেলাবে মোহিনী নায়ের ভেতর আছে আর তারা ছুটে আসবে হে-রে-রে-রে করে। পালা। পাঁচ-সাতজনাকে দু ফাঁক করে দিয়েছে। এরা সেই ওপারের সন্নেসীর দল; বর্গীদিকে তাড়িয়েছে; এদের হাতে রক্ষে নাই—

বলতে বলতে সে সাঁতরে ওপারে উঠে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তারপর শব্দ উঠেছিল কয়েকটা। ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। ফুলজান বু-বু করে কেঁদে উঠেছিল। এবং কয়েকটা বু-বু শব্দের পর অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে নৌকোর উপরেই আছড়ে পড়ে গিয়েছিল।

ওগো গোসাঁই! ওগো দেবতা!—ওগো দয়াল! বলে এবার ছই থেকে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে মোহিনী বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন অজয়ের জল গর্ভের সমস্ত বালি ঢেকে কূলে কূলে ভরে উঠেছে। কলকল শব্দ উতরোল উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মোহিনী অজয়ের কূলের মেয়ে, সাঁতার তার না-জানা নয়, তার বুকও উল্লাস উচ্ছ্বাসে কানায় কানায় ভরা এই মুহূর্তে। অজয় ছুটেছে গঙ্গার দিকে, তার মন ছুটেছে নবীন গোসাঁইয়ের চরণতলের দিকে, গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। তবুও সে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। পর মুহূর্তেই মনে পড়েছিল, মাঝি-মাল্লাদের রান্নাবান্নার জন্য সঙ্গে নেওয়া হাঁড়ি-কলসীর কথা। খুঁজতে বেশী হয় নি, অল্পেই পেয়েছিল; একটা বড় কলসী নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নৌকো থেকে। খানিকটা স্রোতে টানলেও সাঁতার কেটে কূলে উঠে অজয়ের বন্যারোধী বাঁধ ধরে সে ছুটে আসছিল।—গোসাঁই! দেবতা! দয়াল! চরণে আশ্রয় দাও। বাঁচাও। ঠাকুর!

হঠাৎ পথের উপর সামনে দাঁড়াল গোপালানন্দ।

—কৌন? কেয়া হুয়া? কী হইয়েসে?

একটা আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল মোহিনী। গোপালানন্দ বলেছিল, ডর নেহি—ডর নেহি।

মোহিনী ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গোপালানন্দও তার দিকে তাকিয়েছিল। অকস্মাৎ একসময় তার দৃষ্টি হয়েছিল নিষ্পলক। তারপর সে দৃষ্টির রূপান্তর ঘটতে লাগল। চকমকি-থেকে-ঝরে-পড়া একবিন্দু আগুন যেমন শোলার মধ্যে পড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ঝকমক করে বাড়ে—মুহূর্তে মুহূর্তে দীপ্ত হয় আবার ম্লান হয়,

ঠিক তেমনি ভাবে গোপালানন্দের দৃষ্টির মধ্যে আগুনের মত একটা কিছু দুটি চোখকে জলন্ত অঙ্গারখণ্ডে পরিণত করে তুলেছিল। মোহিনী কেন ভয় পাচ্ছিল তার হেতু স্পষ্ট সে জানে না, কিন্তু ভয়ে সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এমন সময় দুই সবল বাহু প্রসারিত করে গোপালানন্দ তাকে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হয়ে বলেছিল, পিয়ারী! আ মেয়ে পিয়ারী!

চিৎকার করে উঠে মোহিনী পড়ে গিয়ে বাঁধের ঢালু গায়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছিল, তাকে পাবার জন্ম উন্মত্ত অধীর পদক্ষেপে ছুটে নামতে গিয়ে গোপালানন্দও পা পিছলে পড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল আরও অনেকটা এবং একটা কাঁটার ঝোপে জড়িয়েও গিয়েছিল, কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সবলে টেনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেকে মুক্ত করে উপরে উঠতে গিয়ে আরও দুবার পা পিছলে পড়েছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে মোহিনী উঠে আর্তস্বরে চিৎকার করে ছুটেছিল বাঁধের উপরের প্রশস্ত পথ ধরে। পিছনে গোপালানন্দ, দুই বাহু তার প্রসারিত, চোখ প্রদীপ্ত, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র।

অকস্মাৎ দেবতার আবির্ভাবের মত সামনে দাঁড়ালেন মাধবানন্দ।

মোহিনী বললে, ঠাকুর, দয়াল, ছামনে দেখলাম তুমি। আঃ ঠাকুর, আমার সব ভয় সব ভাবনা সব দুঃখু চলে গেল, আমি তোমার পা দুটির ওপর গড়িয়ে পড়তে গেলাম, কিন্তু কী হল মনে নাই। সব যেন আঁধার হয়ে গেল। অথৈ অন্ধকার হয়ে গেল স-ব।

* * *

মাধবানন্দ স্থির হয়ে সব শুনলেন। শুনেও স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই একই ভাবে। ভাবছিলেন ঘটনা একটা ঘটলে তারপর সে চলে আপনার নিজের গতিতে আপন পথে, তখন আর তাকে বল্গাবদ্ধ রথাশ্বের মত চালানো যায় না। সে চলে অজয়ের জল-স্রোতের মত। তাঁর ইচ্ছামত ঘটনাস্রোত চলে নি। গোপালানন্দ মরল। তাঁকেই মারতে হল; আশ্রমের সেবকেরা দস্যুর মত আচরণ করলে; মুখে কালি মেখে, ফেটা বেঁধে, পাগড়ী বেঁধে, ছদ্মবেশে অক্রমণ ডাকাতি ছাড়া কী? প্রকাশ্য পরিচয় দিয়ে আক্রমণ করলে না কেন কেশবানন্দ? অবশ্য বুদ্ধির দিক দিয়ে ঠিকই করেছে সে, কিন্তু এ আক্রমণ যে তাঁর নির্দেশে সে কথা তো গোপন নেই। ভবিষ্যৎ ভাবনাও বর্ষার মেঘের বিদ্যুৎরেখার মত মুহূর্তে মুহূর্তে চকিতদীপ্তিতে উঁকি মারছিল। কাল—কাল কেন, আজ রাত্রেই এই কথা ছড়িয়ে যাবে চারিদিকে—গ্রামে গ্রামে। গ্রামের জন্য তিনি চিন্তিত নন। মানুষ দু ভাগ হয়ে যাবে। এক দল মানুষকে তিনি অবশ্যই পাবেন। দে-সরকার এবং তার ওই ছেলেটার প্রতি কেউ সন্তুষ্ট নয়; প্রায় নিত্য-অত্যাচারে পীড়িত তারা; রাজদরবারে অভিযোগ করে ফল পায় না, নীরবে ঈশ্বরকে ডাকে। তিনি ঈশ্বরের সেবকের কর্ম করেছেন। সামান্য কিছু লোক, ওই দে-সরকারের সমধর্মী, তারা বিরুদ্ধে যাবে। রাজ-সরকারে অভিযোগ যাবে। তাঁকে দাঁড়াতে হবে দৃঢ় হয়ে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চকিতে মনে হল, আর একদল মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। এ অঞ্চলের দৈহিকশক্তিশালী দুর্দান্ত লোকেরা, ডাকাতেরা, লাঠিয়ালেরা। চমকে উঠলেন তিনি।

সেই মুহূর্তটিতেই তাঁর পায়ের উপর অতি কোমল উত্তাপমধুর একটি স্পর্শ অনুভব করলেন;

স্নায়ুশিরায় একটা কিসের তরঙ্গ ছুটে গেল। হৃৎপিণ্ড ধক করে উঠল; মন শিউরে উঠল। কে? কী? এ কী? কেন? বুঝেছেন তিনি কী হয়েছে, তবু প্রশ্ন করলেন। মোহিনী তাঁর পা দুটির উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ নির্জন নিশীথ আকাশে বাতাসে বর্ষা-প্রকৃতির আকুলতা, আকাশে মেঘ ডাকছে—গুরু গুরু গুরু, চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, বনের পল্লবে পত্রে মাতামাতি, মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নেই, সব আড়াল পড়েছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সরলা কিশোরীটি বিগলিত হয়ে উদ্ধারকর্তার পায়ের উপর নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। কৃষ্ণদাসী বষ্টুমীর মেয়ে, সে তার ভাষায় তার ভাবনার কথা অকপটে নিবেদন করে চলেছে: ওগো গোসাঁই, তুমি আমার শ্যাম, তুমিই আমার ঠাকুর, আমি তোমার দাসী। ওগো, এত দয়া তোমার দাসীর ওপর! আঃ! আমার এত ভাগ্যি!

সর্পস্পৃষ্টের মত পা দুটি টেনে নিলেন মাধবানন্দ। কংসারি! কেশব! গোবিন্দ! গোবিন্দ! ওঠ। তুমি ওঠ। উঠে বস। বস।

উঠে বসল মোহিনী। মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন, দয়া ভগবানের, মানুষের নয়। এখন আমার কথার জবাব দাও। কে আছে তোমার আপনার জন?

—আপনার জন? কেউ নাই ঠাকুর তুমি ছাড়া। তুমিই তো বাঁচালে।

—আমি বাঁচিয়েছি তুমি অসহায় বলে। অধর্মের অত্যাচারকে রোধ করবার জন্যে বাঁচিয়েছি। এখন বল, কোথায় যাবে তুমি?

—কোথায় যাব? আমি এখানেই থাকব ঠাকুর।

—না। রূঢ়ভাবে মাধবানন্দ বললেন, না।

—তবে তুমি বলে দাও, আমি কোথায় যাব! সকরুণ মিনতি-ভরা কণ্ঠের স্বর, সজল বাতাসের সঙ্গে বিগলিত হয়ে শুধু মিশেই গেল না, দুটি চোখের কোণ থেকে ধারা বেয়ে মাটির উপরেও ঝড়ে পড়ল।

মাধবানন্দ এবার কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, ভাল, আশ্রমের কাছেই কোন গ্রামে তুমি থাকবে। কয়ো তোমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসে। তোমাকে পাপস্পর্শ করতে সে দেবে না। কয়োর সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।

আর্তস্বরে মোহিনী চিৎকার করে উঠল, না, না, না। তোমার চরণ ছাড়া আমি কিছু ভজতে পারব না। ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

আবার চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। সংঘটিত কর্মের স্রোত এসে তাঁকে প্রবল আক্রমণে ভাসিয়ে নিতে চাচ্ছে। সরলা অসহায়া বলে যাকে উদ্ধার করেছেন, তার উদ্ভব যে পাপ থেকে; তার রক্তে পাপ, তার মর্মে পাপ, তার রূপে মোহ, তার ধ্যান ধারণা ভাবনা কামনা —সব পাপ—সব পাপ। প্রেম বড় সহজে বিকৃত হয়, কাম পঙ্কে পরিণত হয়, সারা বৈষ্ণব-ধর্মের বিকৃত পঙ্কের বিষ আকণ্ঠ পান করে ও বিষাক্ত। আজ সেই বিষপুষ্ট জীবনকামনা যেন জলসিক্ত লক্ষ লক্ষ বীজের মত একসঙ্গে ফেটে অঙ্কুর মেলে জেগে উঠেছে। ওর ওই জলসিক্ত দেহের রোমকূপে-কূপে যেন সর্বনাশের বীজোদ্গম হচ্ছে। তবু শেষ চেষ্টা করবেন তিনি।

—তুমি বৈষ্ণবী। গোবিন্দের চরণ ছাড়া তোমার ভজনা নেই। তিনি ছাড়া তোমার ধ্যান নেই। শ্যাম ছাড়া স্বামী নেই। মানুষ তোমার কেউ নয়। তোমার মায়ের পরিণাম তুমি দেখেছ। কয়ো তোমার স্বামী হিসেবে উপলক্ষ্য। ভজনা তোমার গোবিন্দের—শুধু গোবিন্দের। অন্য যাকে ভজতে যাবে মহাপাপ হবে।

—মহাপাপ হবে? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে মোহিনী। মুহূর্ত পরেই কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, না, না। তুমি ছাড়া কাউকে আমি ভজতে পারব না। ওগো গোসাঁই, তুমি—তুমি আমার শ্যাম, তুমি আমার গৌর, তুমি আমার ঠাকুর, তুমি আমার গোসাঁই। এবার তার কণ্ঠস্বরের আবেগ গাঢ়তর হয়ে উঠল, সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, সে আবেগে বললে, ওগো গোসাঁই, তোমার তো অজানা থাকার কথা নয়, প্রথম দিনের দেখার কথা। তুমি প্রথম এলে নৌকায় উপর ধ্বজা-পতাকা উড়িয়ে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে. আমি অজয়ে চান করে আঁচল ভরে পলাশফুল কুড়িয়েছিলাম, তোমাকে দেখেই যে তোমার চরণে বিকিয়ে গেলাম। আমার অঙ্গ অবশ হয়ে গেল, দিনের আকাশে চাঁদ উঠল, আমার আঁচলের হাত এলিয়ে পলাশফুলের রাশ ঝর-ঝর করে মাটিতে পড়ে গেল; সে তোমারই চরণের উদ্দেশে, গোসাঁই, সেই পলাশের সঙ্গে মন হারালাম, পরান বললে—তুমি আমার সব পরানের পরান; সেই দিন থেকে যে আমার সাধ—আমি তোমার সেবা করব, তোমার সেবাদাসী হব।

মেয়েটি যেন ভেঙে পড়ে গেল আবেগে, সে নতজানু হয়ে বসে হাতজোড় করে হাঁপাতে লাগল: দয়া কর। পায়ে রাখ। ওগো গো-সাঁ-ই।

—না। মাধবানন্দও কঠোর সংযমে বাঁধছিলেন নিজেকে; মোহিনীর আবেগ গাঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সে বন্ধনকে দৃঢ়তর করছিলেন। এবার নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন তিনি, রূঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন না। সে 'না' এক গর্জনের মত।

মোহিনী কিন্তু তবু থামল না। সে যেন আজ আর এক মোহিনী। পাথরের বাঁধ ভেঙে প্রথম-ঝরা ঝরনার মত। ঝরঝর কলকল শব্দে মুখর। সদ্য-যৌবনা বৈষ্ণবের মেয়ে, কৃষ্ণদাসীর মেয়ে মোহিনী। পরকীয়া-সাধনার ব্যগ্র কামনা তার রক্তে, তার সাধনের তন্ত্রে, তার আশৈশব-শেখা ও নিত্য-আবৃত্তি-করা মন্ত্রে; তার বাহির-মনে, তার ভিতর-মনে, তার স্বপ্নে, তার শোনায়, তার জানায়, তার দেহমনের একাগ্র কামনায়। তার উপর এই নিদারুণ বিপদ এবং আতঙ্ককর অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে তার ভয় ভেঙেছে; আজ অপরাহ্ণ থেকে রাত্রির দুপ্রহর পর্যন্ত সে শুধু শুনেছে তার এই দেহখানা নিয়ে নানান জনের নানান কুৎসিত কথা। তারই মধ্যে শুনেছে নবীন গোসাঁইয়ের তার প্রতি করুণার কথা। রাত্রি দ্বিপ্রহরে, নবীন গোসাঁইয়ের স্নেহে মুক্তি পেয়ে আবেগে তার জীবনের ফুল ফুটেছে, সে অজয়ে ঝাঁপ খেয়েছে, সে অন্ধকার বনপথে ছুটে এসে এই নবীন গোসাঁইকে ডেকেছে; গোপালানন্দ মাঝখানে পথ আগলেছে দৈত্যের মত; দেবতার মত গোসাঁই তাকে বাঁচিয়ে তাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে এসেছেন; চৈতন্যহারা অবস্থার মধ্যেও সে তাঁর দেহস্পর্শ অনুভব করেছে। আজ তার রক্তের কণায় কণায় নারীজীবনের পরম উত্তেজনা ফেটে পড়ছে, আজ তার লজ্জা

নাই, বাধাবন্ধ নাই, দেহমনের একাগ্র কামনা মুক্ত কণ্ঠে বেরিয়ে এসেছে, এবার সে মুক্ত কণ্ঠ উচ্চ হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে উঠল, তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না, ওগো গোসাঁই, আমি বাঁচব না।

সে-চিৎকার প্রাণ-কাটানো চিৎকার। মাধবানন্দ চমকে উঠলেন, দৃঢ়তা সত্ত্বেও তিনি এমনটির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বনভূমির পল্লবান্দোলন -শব্দমুখরতাকে ছাপিয়ে সে চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। সামনের গাছটার কোটরে বসে অকস্মাৎ চকিত হয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল; একটা বাদুড় গাছ থেকে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী আবার পায়ের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

সর্পস্পৃষ্টের মতই চকিত আকর্ষণে পা টেনে নিলেন ও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত তাকে ঠেলে দিলেন মাধবানন্দ এবং নিষ্ঠুরতম ক্রোধে বললেন, পাপিষ্ঠা!

একটি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মোহিনী।

নিষ্পলক স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে মাধবানন্দ যেন নিজের কথা সংশোধন করে বললেন, না, সাক্ষাৎ পাপ।

মোহিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠে বসল; সামনের অগ্নিকুণ্ডটার শিখা তখনও জ্বলছিল, সেই শিখার আভা তার মুখের উপর পড়ল, তার উপরের ঠোঁটখানা কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাধবানন্দের পদাঙ্গুষ্ঠের নখের তীক্ষ্ণ রূঢ় আঘাতে কেটে গেছে। হাত বুলিয়ে মুছে নিয়ে মোহিনী আগুনের শিখার সামনে ধরে রক্ত দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। নবীন গোসাঁই, তার শ্যাম, তার গৌর, তাকে—

মাধবানন্দ দীর্ঘ পদক্ষেপে এ দাওয়া থেকে নেমে অঙ্গন অতিক্রম করে বিগ্রহের ঘরের দিকে চলে গেলেন। দাওয়ার উপর উঠে বললেন, কাল ভোরে তুমি চলে যেয়ো। আর যেন তোমার মুখ আমাকে দেখতে না হয়।

বিগ্রহ-গৃহের দুয়ারে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

দেহটা যেন অশুচি হয়ে গেছে। নিজের কাছে অস্বীকার করতে তো পারছেন তিনি, তাঁর দেহকোষে-কোষে যেন লোভী শিশুর ক্রন্দনের মত ক্রন্দন উঠেছে। তারস্বরে চিৎকার করছে ওই কিশোরী কুমারীর সুকোমল উষ্ণ স্পর্শ। হয়তো বা মনের মধ্যে ওই মেয়েটিকে অসহায়া অভাগিনী বলে করুণা অনুভব করছেন; তার মধ্যেও কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কামনার বীজ। অশুচি হয়ে গেলেন তিনি। স্নান প্রয়োজন, শুদ্ধি প্রয়োজন। অঙ্গনে নেমে তিনি দক্ষিণ দিকে গিয়ে নামলেন আশ্রম-সংলগ্ন প্রাচীন কালের পুষ্করিণীটিতে। ইছাই ঘোষের খনিত সরোবর। স্নান করে শীতল হল দেহ-মস্তিষ্ক। ফিরে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করে মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের সম্মুখে বসলেন। না, কংসারির শ্রীমুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না। দীপশিখা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাই আসে। শিখা মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল করে দিতে হয়। দিলেন তাই। হ্যাঁ, এবার দেখতে পাচ্ছেন। কংসারির মুখমণ্ডলে নিরাসক্ত অথচ আনন্দময় দৃঢ়তা; চোখে প্রখর প্রসন্ন দীপ্তি। উদ্যত ডান হাতের মুষ্টিতে ধরা চক্র, বাঁ হাতে শঙ্খ। যেন বলছেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কামনার রাত্রির অন্ধকার দূর হোক শ্রীমুখের দীপ্তিতে। হে কংসারি, তুমি বল, তুমি বল, জন্ম থেকে শৈশব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তুমি যোগী। চৈতন্যময় প্রতিক্ষণের ভগ্নাংশেও জাগ্রত। তোমার জীবনে রাধা ছিল না, রাধা নাই, বাধা নাই। রাধা তোমাকে মোহগ্রস্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে চিরকাল কেঁদেছে—কেঁদেছে।

শ্রীমুখের মহিমার গুহাভ্যন্তর সত্যিই বুঝি দিবালোকের চেয়ে প্রদীপ্ত ছটায় ভরে উঠল। জয় কংসারি। জয় কংসারি!

আঃ, কিসের এমন বিকট গর্জন? ও, মেঘ ডাকছে।

বাইরে বজ্রপাতের মত বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জন। তার সঙ্গে বাতাস। দূরান্তর থেকে বনের মাথায় মাথায় ধারাবর্ষণের শব্দ সঙ্গীত তুলে বর্ষণ এগিয়ে আসছে। সন-সন ঝর-ঝর। ঝর-ঝর, ঝর-ঝর, ঝর-ঝর-ঝর-ঝর। অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বসংসার। যাক। মাধবানন্দও ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন।

আঃ! কে? কে ডাকে? ও, কেশবানন্দের কণ্ঠস্বর! গভীর ধ্যানের মধ্যেও পৃথিবীর সঙ্গে যোগের একটা রন্ধ্র যেন মুক্ত ছিল; কেশবানন্দের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা। সেই রন্ধ্র-পথে ধ্বনি এসে পৌঁছেছে। কেশবানন্দ ডাকছে। কেশবানন্দ! উঠে পড়লেন তিনি। দেবতাকে প্রণাম করতে ভুলে গেলেন। আসন ছেড়ে এসে দুয়ার খুলে বাইরে এলেন।

—কেশবানন্দ!

হ্যাঁ, কেশবানন্দই বটে। সঙ্গে শ্যামানন্দ, যাদবানন্দ এবং অপর সকলে! আর ওটা কী? দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পশুর মত? ও! বর্বর অক্রুরটা। পাপ! ওরই পাপের জন্ম তাঁর আজ—

—ওরে শালা, বদমাশ, নচ্ছার, ভণ্ড, লম্পট—

বর্বর অক্রুর তাঁকে দেখে এই অবস্থাতেও গাল দিয়ে উঠল।

শ্যামানন্দ তাকে মুখে আঘাত করে বললে, চুপ রহো।

কেশবানন্দ বললেন, সেই মেয়েটিকে কোথায় লুকিয়েছে। আমরা পাই নি। তাই ওকে গুরু মহারাজের কাছে বেঁধে এনেছি।

আহত হয়ে অক্রুর চিৎকার করে উঠল পশুর মত, তারপরই অভ্যাসমত থু-থু করে থুতু ছুঁড়তে আরম্ভ করলে: তোদের মুখে আমি থুতু দিই—থুতু দিই। ওরে চোর ডাকাত লম্পট বদমাশের দল, তোদের আমি ছাড়ব না—শূলে দোব, ফাঁসি দোব। জালিয়ে দোব আশ্রম। তুই—তুই—তুই শালাকে কেটে কেটে নুন লঙ্কা দিয়ে দিয়ে মারব। মাধবানন্দের দিকে উন্মত্ত আক্রোশে থুতু ছুঁড়তে লাগল—থু-থু-থু-থু-থু—

মাধবানন্দের রক্তের আগুন তখন নেবে নি। সে আগুন খোঁচা খেয়ে আবার জ্বলল

—দাউ দাউ করে জ্বলল। মুহূর্তে তিনি টেনে নিলেন কেশবানন্দের তরবারিখানা। তারপর বিদ্যুতালোক ঝলসে উঠে নিবে যাওয়ার মত চকিতে ঘটে গেল একটা বজ্রাঘাতের সংঘটন।

বিদ্যুৎবেগেই তরোয়ালখানা উপরে উঠে অগ্নিকুণ্ডের ছটায় ঝলসে উঠে নেমে এল বজ্রের বেগে, পরমুহূর্তে বৃত্রাসুরের ন্যায় কৃষ্ণকায় দুর্দান্ত অক্রুরের মুণ্ডটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে গড়িয়ে পড়ল; কবন্ধ দেহখানা একটা নিদারুণ মূক আক্ষেপে সারাদিনের বর্ষণসিক্ত মাটির বুকটুকুকে কর্দমাক্ত করে তুলল। তাতে মিশছিল তারই গাঢ় লাল রক্ত। রাত্রির নিষ্প্রভতায় মনে হচ্ছিল গাঢ় কালো সে রক্ত।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। কেশবানন্দ পর্যন্ত। মাধবানন্দ এমন পারেন, এ ধারণা যে তাদের স্বপ্নাতীত।

মাধবানন্দ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন বর্বরটার মৃত্যু-আক্ষেপের দিকে। আক্ষেপ স্থির হয়ে গেল, তিনি হাতের রক্তাক্ত তরবারিখানা ফেলে দিলেন। বললেন, কামার্ত পশুর রক্তের জন্য পৃথিবী আজ তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন। বাক্যশেষে এদিক-ওদিক চাইলেন। উষ্ণ গাঢ় রক্ত হাতে লেগেছে, অশুচি মনে হচ্ছে। জল! ওঃ, এই যে দাওয়ার উপর কয়েকটাই ঘড়া নামানো। একটা ঘড়ার কানা ধরে তিনি কাত করলেন। এ কী? এত ভারী! কী? জল তো নয়, কঠিন বস্তু কী, এ প্রশ্নের উত্তর এসে পড়ল তাঁর হাতে। অন্ধকারের মধ্যেও স্বর্ণবর্ণের স্বরূপ ঢাকা পড়ল না, আকার অগোচর রইল না। হাতে এসে পড়েছে একমুঠো মোহর। চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। ঘড়াটা ছেড়ে দিলেন, হাতের মোহরগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তিনি কেশবানন্দের দিকে তাকালেন।

কেশবানন্দ সে সবিস্ময় নীরব প্রশ্নের উত্তর দিলেন তৎক্ষণাৎ।

—পাষণ্ড পরস্বাপহারী দে-সরকারের গুপ্ত সঞ্চয়। কংসারির সেবায় লাগবে। অধর্মের ধন ধর্ম-সংস্থাপনে ব্যয়িত হবে।

মাধবানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। একটা বিপুল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে তাঁর চিন্তা-শক্তিও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট প্রশ্ন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উত্তর দূরের কথা।

এরই মধ্যে কেশবানন্দের কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি।

—শ্যামানন্দ, তৃতীয় প্রহরের শিবাধ্বনি শুনেছ?

—কই, না তো!

—কেউ শুনেছ?

মৃদু সম্মিলিত কণ্ঠের উত্তর হল, না।

কেশবানন্দ বললেন, তা হলে এক প্রহরেরও অধিক রাত্রি আছে এখনও। শোন শ্যামানন্দ, এখনই আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। মুহূর্ত বিলম্বের অবসর নাই। গুরু মহারাজ!

—কেশবানন্দ!

—অক্রুরকে বেঁধে এনেছিলাম মোহিনীর সন্ধানের জন্যও বটে এবং দে-সরকারের প্রতিহিংসা-শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যও বটে। বলে এসেছিলাম, ফৌজদার কি নবাবের

দরবারে অভিযোগ করলে অক্রূরকে আমরা হত্যা করব। কিন্তু সে আর হবে না। এখন এ স্থান ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নাই। আমাদের আশ্রম সুরক্ষিত নয়, শক্তি সঞ্চয় করি নি। সকাল হতে হতে আমাদের চলে যেতে হবে।

—চলে যেতে হবে? উপায় নাই?

আকাশের দিকে তাকালেন মাধবানন্দ। ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ অন্ধকার; বনের মাথার সঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। চারিপাশ অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই চলতে হবে, উপায় নাই।—তাই হোক। চল।

কেশবানন্দ সক্রিয় হয়ে উঠলেন, অস্ত্র সংরক্ষণের গুপ্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হলেন, ডাকলেন, শ্যামানন্দ, যাদবানন্দ, অস্ত্রগুলি বের করে শবের মত করে বাঁশে বাঁধ, তার পাশে বিছিয়ে দাও মোহর এবং শিরস্ত্রাণগুলি। এক-একটি শববাহকের দলে ভাগ হয়ে যাত্রা করব। এক-এক দলে আটজন। কিছু যাবে গরুর গাড়ির সঙ্গে। গাড়িতে যাবে অস্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বাকী সব পড়ে থাক্। গাই-বাছুর, তৈজসপত্র, খাদ্যভাণ্ডার সব পড়ে থাক্। গোপালানন্দ, গোকুলানন্দকে ডাক। গোপালানন্দ! গোপালানন্দ।

এতক্ষণে সচেতন হলেন মাধবানন্দ, ওই গোপালানন্দের নামই তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলে। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি যেন বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধবানন্দ গম্ভীর স্বরে বললেন, সে নাই কেশবানন্দ, আমি তাকে হত্যা করেছি।

—হত্যা করেছেন? আপনি?

—হ্যাঁ, ওই অক্রূরের মত। এমনি কামার্ত এবং বীভৎস হয়ে আক্রমণ করেছিল মোহিনীকে। আমার উপস্থিতি আমার নিষেধও তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারে নি। আমাকেও আক্রমণ করতে এসেছিল, আমি তাকে হত্যা করেছি।

—গুরু মহারাজ!

—রথ চলতে শুরু করেছে কেশবানন্দ, কংসারির রথ। কী করব? তিনি করিয়েছেন, আমি করেছি। আজ আমি তাঁর মুখকমলে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি।

তাঁর সে কণ্ঠস্বর আশ্চর্য। অলঙ্ঘনীয়। বর্ষার মেঘগর্জনের মত গাঢ় গম্ভীর।

সমস্ত সেবক-মণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কংসারির মুখকমলে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে, গুরু মহারাজ দেখেছেন! শুধু চিৎকারে বিদীর্ণ হয়ে গেল একটি কর্কশ কণ্ঠ। কয়োর কর্কশ কাতর কণ্ঠস্বর। কয়ো সকলের পিছনে অন্ধকারে হতাশায় নির্বাক হয়ে বসেছিল এতক্ষণ। মোহিনীর নাম শুনে সে চীৎকার করে উঠেছে।

—গোসাঁই! মোহিনী কোথা? মোহিনী?

—কয়ো?

—তাকেও কেটেছ?

—কাটাই উচিত ছিল, কিন্তু নারী-হত্যা করি নি। দেখ ওই অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুয়েছিল। মূর্তিমতী পাপ।

—কই? কোথায়? গোসাঁই, কেউ নাই তো!

—তা হলে জানি না। খুঁজে দেখ।

—মোহিনী! মোহিনী! মোহিনী! কয়োর কর্কশ কাতর কণ্ঠস্বরে রাত্রির শেষপ্রহর ক্ষণে ক্ষণে যেন চমকিত হয়ে উঠল। ওদিকে যাত্রা শুরু হয়ে গেল সন্ন্যাসীদলের।

মাধবানন্দ নিঃশব্দে চলেছেন বয়েল গাড়ির উপর। মনে পড়ছে এবং মনে মনে অনুভব করছেন, মহাভারতের কথা। জতুগৃহে গভীর রাত্রে অগ্নিসংযোগ করে পাণ্ডবেরা যেমন নিঃশব্দে বারণাবত ত্যাগ করেছিলেন, এ যাত্রাও তেমনি। নিরাপত্তার জন্য নয়, কুরুক্ষেত্রের জন্য। আশ্চর্যভাবে এই নিঃশব্দ গোপন যাত্রা চলেছে কুরুক্ষেত্রের দিকে। নূতন কুরুক্ষেত্র। আশ্চর্য অনিবার্য গতি। ওঃ! জীবনে সিদ্ধির প্রসাদকে মাধবানন্দ যেন অনুভব করছেন। হোক এটা ঘোর কলি, এগারো শো সাল ; সিদ্ধি এখনও আছে, হ্যাঁ, আছে।

পিছনে এখনও কয়োর ডাক শোনা যাচ্ছে, মো-হি-নী!

আঃ! মেয়েটার নাম শুনেও তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠছে।

তিনি গরুর গাড়ির উপর বসেই ধ্যানস্থ হতে চেষ্টা করলেন।

হে চৈতন্যময় সত্তার চিন্ময় আত্মাপুরুষ, তুমি জ্যোতিষ্মান হয়ে অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকট হও। মাধবানন্দের বস্তুজগৎময় দেহসত্তার সকল স্পন্দন বস্তুজগতের সকল আকর্ষণের স্পর্শকাতরতা শুদ্ধ করে দাও, চৈতন্যমহিমাকে জাগ্রত কর।

বনপথে গাড়ি চলেছে, চাকার শব্দ উঠছে।

অজয়ের ঘাটের নৌকোগুলির দড়ি কেটে দেওয়া হয়েছে। যাক ভেসে। লোকে সর্বপ্রথম নৌকোর সন্ধানই করবে। তখনও বর্ষণ চলছে। ঝর-ঝর—ঝর-ঝর—ঝর-ঝর।

মাধবানন্দ তারই মধ্যে সিদ্ধির আসনে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারছেন রথ চলেছে কুরুক্ষেত্রের দিকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তামাম হিন্দুস্থান ছারখার হয়ে গেল। দিল্লীর বাদশাহী খতম বললেই হয়। সারা ভারত জুড়ে অধর্মের তাণ্ডব চলছে। দুর্যোধন দুঃশাসনের জনম এবার এক নয়, দুই নয়, হাজার, দু হাজার। কুরুক্ষেত্রের ইশারা ঝলসাচ্ছে। উদ্যোগপর্ব শেষ। এ সময়ে আপনি—

গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কেশবানন্দ কথাটা শেষ করলেন না, কিন্তু অনুযোগ প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

ষোল বৎসর পর গুরুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শ্যামরূপার গড় পরিত্যাগের পর ষোল বৎসর চলে গেছে।

মাধবানন্দ অসুস্থের মত নিরতিশয় ক্লান্তিতে আধশোওয়া অবস্থায় আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। বিষণ্ণ হেসে মাধবানন্দ বললেন, কী করব কেশবানন্দ, এর উপর তো আমার হাত নাই। আমি কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতে পারি না ; আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিচার সব আচ্ছন্ন হয়ে যায় ; মনে হয় দুঃখের আমার আর পারাপার নাই। মনে হয় সব আঁধিয়ার, সব

আঁধিয়ার। দুনিয়াতে দুঃখ ছাড়া কিছু নাই। বিলকুল ঝুট। সব মিথ্যে। ভগবান কংসারির মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় প্রভুর মুখমণ্ডলও ম্লান। তাঁর চোখও যেন ছলছল করে। কান্না আপনি আসে কেশবানন্দ, বুক ফেটে বেরিয়ে আসে। কাঁদি, তাই যেন দম ফেলতে পারি, নয়তো দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন মাধবানন্দ, বোধ করি আবেগে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন; বললেন, কেশবানন্দ, গীতা আওড়াই, মনে করি প্রভুর বাণী—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

তাতেও মন নাড়া খায় না, সাড়া দেয় না। কী করব আমি, কী করব? এ যার না হয়েছে সে বুঝতে পারবে না।

বলতে বলতেই দুটি বিশীর্ণ জলধারা চোখের কোণ থেকে নেমে এল। আবার তিনি হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেশবানন্দ বললেন, তা হলে কি কুম্ভস্নানে যাত্রার দিন স্থগিত রাখব?

এবার চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। কুম্ভস্নানে যাত্রার দিন স্থগিত? ওঃ, কথাটা তাঁর মনে ছিল না। এবার প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ স্নান। অবশ্য বিলম্ব আছে, এখন সবে কার্তিক মাস। কিন্তু সংকল্প ছিল কার্তিক মাসে বের হয়ে ব্রজমণ্ডল থেকে দিল্লী পর্যন্ত মুলুকের অবস্থাটা দেখে আসবেন। সম্ভবপর হলে জ্বালামুখী পর্যন্ত, মুলুক পাঞ্জাবও স্বচক্ষে দেখা হয়ে যাবে। যাত্রার দিন কার্তিকী শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে। আজ বোধ হয় অষ্টমী; কিন্তু আজ তিন দিন তাঁর বিচিত্র পুরাতন ব্যাধি উঠেছে। তিন দিন এই ভাবে স্তব্ধ হয়ে আছেন। অনাহার চলেছে, জল এবং সামান্য দুধ ছাড়া কিছু খাচ্ছেন না। রিক্ত সর্বস্বহারার মত শোকার্ত দৃষ্টিতে আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছেন; কখনও মন্দিরের মধ্যে গিয়ে বিগ্রহের সম্মুখে আসনে বসে অনর্গল কাঁদছেন। ধারা বেয়ে চোখের জল নামছে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র যেন নিঃশেষে কেটে গেছে, সুতো-কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছেন। কারুর কোন কথা কোনও জিজ্ঞাসাই যেন কানে যায় না; গেলেও অর্থবোধ হয় না। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ঘাড় নাড়েন, যার অর্থ 'না'। হয়তো তার অর্থ 'কী বলছ বুঝতে পারছি না' অথবা 'জানি না'।

এ অবশ্য তাঁর নূতন নয়। মধ্যে মধ্যে এমন তাঁর হয়। ষোল বৎসর পূর্বে শ্যামরূপার গড় ইছাই ঘোষের দেউল ত্যাগ করেছেন, তার মধ্যে বারো বৎসর ধরে মধ্যে মধ্যে এই অবস্থায় ব্যাধিগ্রস্তের মত আক্রান্ত হয়ে আসছেন। ব্যাধির মত লক্ষণও কিছু কিছু আছে। কখনও দেহের উত্তাপ বাড়ে; কখনও কমে যায়। পায়ের আঙুলগুলি ঠাণ্ডা হয়। প্রথম, ব্যাধি আশঙ্কা করে কেশবানন্দ কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিরাজকে ডেকেছিলেন। তাঁরা কেউই কিন্তু তাঁর দেহে কোন ব্যাধির সন্ধান পান নি, শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন, আধ্যাত্মিক সাধনার এ কোন বিচিত্র আক্ষেপ।

এক অবধূত সন্ন্যাসী অবধৌতিক মতে চিকিৎসা করেন, তিনি বলেছেন, কোন একটা নূতন সিদ্ধি আসতে আসতে আসছে না। এ বিচিত্র অবস্থা কখনও এক পক্ষ, কখনও এক মাস, কখনও দু মাস পর্যন্ত চলে। শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে যান, ঝড়ে ভগ্নশীর্ষ বনস্পতির মতই মনে হয় তাঁকে দেখে।

এবার মাত্র তিন দিন আক্রমণ হয়েছে, সুতরাং কেশবানন্দ যাত্রা স্থগিতের কথা না বলে পারলেন না। এই অবস্থায় সুদূর পথে যাত্রা তো উচিত হবে না।

মাধবানন্দ চমকে উঠলেন।

তামাম হিন্দুস্থান ছারখার হয়ে গেল। পাপের তাণ্ডবে পৃথিবীর কেঁপে ওঠার শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এত অনাচারেও ভূমিকম্প হয় না। "ধরতি পথল হো গয়ি"—কেশবানন্দ বলেন ; মা ধরিত্রী পাষাণ হয়ে গেছেন।

* * *

বাংলা দেশের একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজমহলের কাছাকাছি ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে পাহাড়ঘেরা একটি নিভৃত অঞ্চলে নূতন আশ্রমের মন্দিরচত্বরে শুয়ে ছিলেন মাধবানন্দ। সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কেশবানন্দ।

ষোল বৎসর পূর্বে সেই রাত্রে গড়জঙ্গল ত্যাগ করে এখানে এসে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। ষোল বৎসরে আশ্রম এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বহুবিস্তৃত, সংঘশক্তিও বিপুল এবং সুদৃঢ়। গঙ্গার পরপারে মালদহ গৌড় এবং আরও উত্তরে বনবহুল অঞ্চলে একদিকে পূর্ণিয়া, অন্যদিকে কুচবিহার পর্যন্ত নানাস্থানে আশ্রমের ছোট বড় মাঝারি শাখা, মঠ ও মন্দির গড়ে উঠেছে। এ সব মঠের মন্দিরের দেবতা একক কংসারি নন, তাঁর সঙ্গে রুদ্র-ভৈরব-শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আদিষ্ট হয়েই করেছেন মাধবানন্দ। সেদিন রাত্রে সেই দুর্যোগের মধ্যে বনের ভিতর দিয়ে চলবার সময় মাধবানন্দ বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। গোপালানন্দ এবং অক্রূরকে হত্যা করে গাড়ির উপর স্তব্ধ হয়েই বসেছিলেন। বড় বড় বয়েল দুটো বিপুল শক্তিতে বর্ষণসিক্ত লালমাটির উঁচুনিচু পথ ভেঙে চলেছিল বাদশাহী সড়কের দিকে। গন্তব্যস্থল বর্ধমান। তারপর স্থির করবার কথা ছিল কোথায় হবে গন্তব্যস্থল। দামোদর পার হয়ে গড় মান্দার হয়ে যে পথ পুরী গিয়েছে সে পথ ধরবেন, অথবা কাটোয়া গিয়ে ভাগীরথীর ধারা ধরে উত্তর ভারতের দিকে চলবেন—তা স্থির করবার সময় ছিল না। তাঁর তো ছিলই না। তিনি তখন ভয়-ভাবনার সীমারেখা পার হয়ে অন্য এক রাজ্যে যেন বিচরণ করছেন। মানসলোকে এক সিংহদ্বার খুলে গেছে যেন।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

গীতার একাদশ অধ্যায় তাঁর অন্তরলোকে গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি আপনাআপনি ধ্বনিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে আজকের রাত্রের এই অন্ধকারের ঠিক ওপারেই কংসারি বিশ্বরূপে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই জন্য। "দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি, দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি"—সে প্রলয়ঙ্কর ভয়ঙ্করতম রূপের আভাস মাধবানন্দ আজ মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করেছেন, বোধ করি

তাঁর বাণীও শুনেছেন—'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।" গোপালানন্দ এবং অক্রূরকে তিনিই হত করে রেখেছিলেন, নইলে তিনি হত্যা করতে পারতেন না। তিনি তো ওদের থেকে দৈহিক শক্তিতে সবল ছিলেন না, পাশবিক উগ্রতায় প্রচণ্ড ছিলেন না। তাঁর ভয় হত, দুর্বলতায় হাত কাঁপত, নরহত্যার পাপ পুণ্যের বিচারের জন্যে তিনি ইতস্তত করতেন। তিনি নিশ্চয়ই তখন অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর বাণী শুনেছেন। এই তো বেশ অনুভব করছেন যে তাঁর রথকে তিনি চালিয়ে নিয়ে চলেছেন কুরুক্ষেত্রের পথে। এরই মধ্যে রাত্রি অবসান হল একসময়, কলরব করে পাখি ডেকে উঠল। আকাশে তখনও মেঘ, তারই মধ্যে আলো ফুটল। কেশবানন্দ গাড়ি থামালেন। এতক্ষণে মাধবানন্দের সম্বিৎ ফিরল—গাড়ি থামালে কেশবানন্দ?

—একবেলা বিশ্রাম করব। অপেক্ষারও প্রয়োজন আছে। যদি তারা অনুসরণ করে থাকে, সেটা বুঝতে পারব।

পথ ছেড়ে বনের গভীর অভ্যন্তরে গিয়ে ঢুকেছিলেন তাঁরা। ভাগ্যক্রমে পেয়েও ছিলেন একটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন স্থান, বড় বড় পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কিছু কিছু মাটির ভিতর থেকে যেন উঁকি মারছিল। বোধ করি বহু প্রাচীন কোন কিছুর ভগ্নাবশেষ; অদূরবর্তী রাঢ়েশ্বর-শিবের মন্দিরের পাথরের মতই এ পাথরগুলি। গতদিনের প্রবল বর্ষণে মাটি ধুয়ে গিয়ে নীচের পাথরগুলি বিশ্রামের জন্য যেন পরিচ্ছন্ন হয়েই প্রতীক্ষা করছিল। কাছেই একটি প্রাচীনকালের মজা পুকুর। একটি পাথরের উপর আসন করে তিনি বসেছিলেন। শিষ্য-সেবকরা প্রাতঃকৃত্য সেরে ইষ্টস্মরণ করে চিড়া ভিজিয়ে আহারের উদ্যোগ করছিল। নীরবে কাজ করে চলেছিল কেশবানন্দের নির্দেশে।

সেইখানে তাঁর আসনের ঠিক পাশেই একটি কষ্টিপাথরের খানিকটা অংশ হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ পাথরগুলি বেলেপাথরের, এটি কষ্টিপাথর। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে যেন টেনেছিল। তিনি থাকতে পারেন নি, খুঁড়ে বের করেছিলেন পাথরটিকে। পাথর নয়, শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গটিকে সামনে রেখে তিনি সবিস্ময়ে ভাবছিলেন, মাটির তলা থেকে দেবতা উঠবার জন্যেই তাঁকে যেন এখানে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন। কতকাল মাটির অভ্যন্তরে প্রসুপ্ত ছিলেন, কত লোক গিয়েছে এসেছে এই অদূরের পথ দিয়ে, কতজন হয়তো এসে এখানে এমনি করেই বসেছে। কিন্তু দেবতা দেখা দেন নি, তারা দেখেও দেখে নি। তাঁর জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারই মধ্যে তিনি স্পষ্ট শুনেছিলেন দৈব কণ্ঠস্বর: আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমি যে রুদ্র, আমি ভিন্ন কুরুক্ষেত্র হবে কেন? চমকে জেগে উঠেছিলেন। কেশবানন্দ সমস্ত শুনে নিজেই নিজের নির্দেশ ভুলে গিয়ে ধ্বনি দিয়ে উঠেছিলেন, জয় শঙ্কর!

মঠে মঠে কংসারির সেবার সঙ্গে রুদ্রের আরাধনাও প্রচলন করেছেন তখন থেকে। তার ফলে সেবকদের মধ্যে শৈবনাগা-সম্প্রদায়ের জীবনসাধন-পদ্ধতির কিছুটা আচার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে যারা শ্যামানন্দ-গোকুলানন্দদের মত, তারা জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। নাগাদের মতই তারা যোগচর্চার সঙ্গে ডনবৈঠক দেয়, কুস্তি করে, গায়ে ভস্ম

মাথে, ব্রহ্মচর্য পালন করে আর প্রাণভরে হরি-হরকে ডাকে। হরি-হর একসঙ্গে কংসারি এবং রুদ্রের উপাসনা। কল্পনাটা কেশবানন্দের। তিনিই বলেছিলেন, ভগবান পথ দেখালেন গুরু মহারাজ; এ পথে স্বকীয়া-পরকীয়ার জটিলতা নাই। তার উপর স্বয়ং রুদ্র আদেশ করে আবির্ভূত হয়েছেন। এ পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না।

কেশবানন্দই এই স্থানে বাংলার ও বিহারের সীমান্ত প্রদেশে চারিদিকে পাহাড়ঘেরা এই স্থানটির কথা মনে করে এইখানে এসে আশ্রম স্থাপন করেছেন। মাধবানন্দের তখনও আচ্ছন্ন ভাব। বর্ধমানে এসে কেশবানন্দ বলেছিলেন, পুরীর পথ যে অঞ্চল দিয়ে গিয়েছে সে অঞ্চল দুর্গম বটে, কিন্তু এ অঞ্চল মুরশিদাবাদ এবং দিল্লী থেকে অনেক দূর। তা ছাড়া এই পথ মহাপ্রভুর পায়ের ধুলোমাখা পথ। এ দিকে 'রাধা'-নির্বাসন তত্ত্ব নেবে তো না-ই, উপরন্তু কঠিন শত্রুতা করবে। এখানকার মানুষেরা বড় উগ্র, এরা জঙ্গল-মহলের দেহাতি।

ওদিকে তখন দামোদরের প্রবল বন্যা। সংবাদ পেয়েছেন অজয়ও ভেসেছে। এই বন্যার জন্যই বোধ হয় ইলামবাজারের দে-সরকারের ক্ষোভ, হাতেমপুরের ফৌজদার কি রাজনগরের রাজার কোতোয়ালী পেয়াদা তাদের অনুসরণ করতে পারে নি। জয় দামোদর, জয় অজয়! কিন্তু দামোদর-অজয়ের প্রকৃতি মহাদেবের মত; রোষে যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন প্রলয়ঙ্কর; কিন্তু সে রোষ থাকে না; অল্পেই প্রসন্ন হয়ে শান্ত হয়ে যান। বন্যা তিন-চার দিন, বড় জোর পাঁচ-ছ দিনের বেশী থাকে না। বন্যা থাকতে থাকতে বেরিয়ে যেতে হবে। দামোদর পার হয়ে পুরীর পথ। দামোদর বন্যার সংকেতে নিষেধ করেছেন। বলছেন, এ পথে নয়। দক্ষিণে নয়, উত্তরে চল, উত্তরে চল। বর্ধমান থেকে কাটোয়া পর্যন্ত সড়ক ধরে যাত্রা শুরু হয়েছিল। কাটোয়ার পথেই এই স্থানে আশ্রম স্থাপনের কল্পনার জন্ম। মাধবানন্দের পিতৃবংশের কয়েকখানি তালুক আছে এখানে। এবং কংসারির সেবার জন্য নানান স্থানে যে নিষ্কর জমি আছে তার একটা অংশ এই তালুকের মধ্যে। ভাগীরথী ধরে নৌকোযোগে গড়-জঙ্গল আসবার সময় তাঁরা এখানে নৌকো বেঁধে একদিন বিশ্রাম করেছিলেন, এবং সেই অবসরে এখানকার প্রজাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাদের আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। স্থানটি বড় সুন্দর। গঙ্গার ধারা এখানে প্রায় পাহাড় কেটে গতিপথ করে নিয়েছে। উত্তরে রাজমহল, দক্ষিণে গঙ্গার ওপারে মুরশিদাবাদ, অবারিত পূর্বে ক্রোশখানেক দূরেই গঙ্গা, পশ্চিমে ক্রমশ উত্তর দিকে বিস্তৃত পাহাড়ের পর পাহাড়। এরই মধ্যে দিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাংলা দেশের এক সুপ্রাচীন সংযোগ-পথ। উত্তরে এই পথের উপরেই গিরিসংকটের মধ্যে উধুয়ানালায় দুর্গ। গঙ্গার ওপারে জিলা মালদহ এবং রাজশাহী। কয়েক ক্রোশ দক্ষিণেই ঘিরিয়া প্রান্তর। এই পথে অনেক অভিযান এসেছে, গিয়েছে; এ পথে অনেক তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীর দল যায় আসে। এখানে আসবার এক বৎসরের মধ্যে বাংলার মসনদের অধিকারী বদল হয়ে গেল এই ঘিরিয়ার প্রান্তরে। আলিবর্দী খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে, মুরশিদাবাদে নবাব হয়ে বসল। আলিবর্দী খাঁ তার পল্টন নিয়ে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে গিয়েছে। তিনি ওই পাহাড়ের মাথার উপর দাঁড়িয়ে দেখেছেন। কেশবানন্দকে বলেছেন, এক পক্ষ হারবেই কেশবানন্দ, এবং হারবে সরফরাজ। যার হারেমে হাজারের উপর উপপত্নী,

সে কখনও জিতবে না। সে মরেই আছে। তুমি সেবকদের প্রস্তুত রাখ, যে পক্ষ হারবে তাদের অস্ত্র আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

লোক বলে, আলিবর্দী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে ইটের উপর রুমাল জড়িয়ে কোরান বলে পাঠিয়ে, আনুগত্যের শপথ জানিয়ে সময় সংগ্রহ করে সরফরাজকে পরাজিত করেছে। সরফরাজ খাঁ বীরের মত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছে। বলুক। সরফরাজের পরাজয় এবং মৃত্যু অবধারিতই ছিল। তিনি যুদ্ধের বিবরণ শুনে এতটুকু বিচলিত হন নি। পরাজিত নবাবপক্ষের সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে-আনা, মৃত সৈনিকদের পড়ে-থাকা অস্ত্র সংগ্রহের জন্যই উৎসুক হয়েছিলেন। শ্যামরূপা গড়ের ওই শেষ রাত্রি থেকে তখন তিনি অন্য মানুষ। যেন জলন্ত জীবন। কুরুক্ষেত্রের লগ্নের জন্য অধীর, কুরুক্ষেত্রের পথের যাত্রী। এ আশ্রয় কুরুক্ষেত্রের পথের ধারে শিবিরে।

এই শিবিরে বসে দিল্লীতে নাদিরশাহের নাদিরশাহীর বিবরণ শুনেছে। এখানে এসেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্য তিনি কেশবানন্দকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। সে বিবরণ শুনতে শুনতে তিনি চিৎকার করে উঠেছেন, হে কংসারি, হে রুদ্র, পাথর কাটিয়ে জাগো। জাগো আমাকে বল দাও।

সূর্যোদয়ের পর বেলা ছ দণ্ড থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত সে এক অবাধ হত্যাকাণ্ড! চাঁদনীচক, দরিয়াবাজার, পাহাড়গঞ্জ রক্তে ভেসে গিয়েছে। মানুষ দুপ্রহরে একটা বন ঘিরে এত জানোয়ার মারতে পারে না। মারাঠারা বলে তিন-চার লক্ষ মানুষ, কেউ বলে এক লক্ষ। মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে জাল-পেতে-ধরা মাঠ চড়ুইয়ের ঝাঁকের মত। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মর্যাদাবানেরা বাড়ির শিশু নারীদের নিজের হাতে কেটে আত্মহত্যা করেছে অথবা লড়াই করে মরেছে। নির্বীর্য কাপুরুষদের মেয়েদের মধ্যে তেজস্বিনীরা কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁচেছে, হতভাগিনীরা করুণ আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করে নরকের অন্ধকারে ডুবেছে; তাতেও অব্যাহতি পা. নি, ক্রীতদাসী হয়ে পারসীক সৈন্যাবাসে বন্দিনী হয়েছে। বহুজন আতঙ্কে, অনেকজন অপমানে বিষ খেয়েছে, নিজের হাতে গলা কেটেছে, দড়ি গলায় দিয়ে মরে পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রকাশ্য দরবারে অর্থের জন্য আমীরদের কান কেটে দিয়েছে, চৈত্রের রৌদ্রে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। আশী-নব্বই ক্রোর টাকা মূল্যের ধন-সম্পদ লুঠ করে নিয়ে গেছে। কোহিনুর গেছে, ময়ুরতক্ত গেছে; হিন্দুস্থানের রাজকোষ শূন্য করে, রাজলক্ষ্মীকে ভিখারিণীর বেশে নামিয়ে দিয়ে গেছে পথে। হায় রে হায়, আর কসবী-নাচনেওয়ালী নূরবাঈকে চা. জার রূপেয়া দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শাহের অনুরোধে ছেড়ে দিয়ে গেছে। হা রে বাদশা, হা! মুণ্ডুটা হেঁট করে সেলাম বাজিয়ে রাখলি হিন্দুস্থানের তক্ত, আর ওই কসবী নূরবাঈ! তক্ত নয় তক্তা, কাঠের চৌকি; আর লক্ষ্মীকে পথে ভিক্ষের জন্য নামিয়ে দিয়ে বাঁচালি নূরবাঈকে? পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর সেলামী দিয়েছে নাদিরশাহকে। হা রে হা!

তিন দিন ধরে এমনি করে হা-রে-হা, হা-রে-হা বলে মধ্যে মধ্যে চিৎকার করেছিলেন তিনি। তৃতীয় দিনে এক অত্যাচারীর মাথা কেটে তবে শান্ত হয়েছিলেন। রাজশাহীর

জায়গীরদারের পাইক-সর্দার, একদল পাইক নিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল এ অঞ্চলের কয়েকজন প্রজা এবং তাদের যথাসর্বস্ব। এই সামনের পথ দিয়েই যাচ্ছিল। মাধবানন্দ পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, কৌন হ্যায় তু? নাদের শা? বাঁধকে লে যাতা? আর ওই প্রজাদের বলেছিলেন, তু লোক ক্যা হ্যায়, ভেড়ি হ্যায়?

পাইক-সর্দার রহিম উদ্ধত হয়ে তাঁকে মারতে এসেছিল, আরে কাফের, ফকির—

মাধবানন্দ চিৎকার করেছিলেন, জাগো কংসারি, শঙ্কর! হরি-হর! হরি-হর!

তারপর হয়েছিল একটি খণ্ডযুদ্ধ। পাইকদের একজনও অব্যাহতি পায় নি, আহত রহিম সর্দারের মাথা কেটে নিয়েছিলেন মাধবানন্দ। রাজশাহী ফিরে গিয়ে সংবাদ দেবার লোকও অবশিষ্ট ছিল না।

প্রজারা প্রণাম করে জয়ধ্বনি দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

মাধবানন্দ শান্ত হয়েছিলেন।

*　　　*　　　*

তখন সরফরাজ খাঁর নবাবী আমল। প্রথম দিন থেকেই উজীর হাজি আহম্মদের সঙ্গে বিবাদে পঙ্গু শাসনের আমল। কিন্তু শাসনের ভয় তখন মাধবানন্দের ছিল না। তিনি তখন তিন দৈবী শক্তিতে বলীয়ান। তাঁর চোখের সম্মুখে ভবিষ্যৎ ভাসে—তিনি দেখতে পান রক্তাক্ত পৃথিবী। যে দৃশ্য তিনি এক গভীর নিশীথে গড়জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন —সেই দৃশ্য ব্যাপক এবং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। দিবারাত্রি অহরহই প্রায় গীতার শেষ শ্লোকটি আবৃত্তি করতেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

কখনও কখনও আবৃত্তি করতেন—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

পরের দিন থেকেই আশ্রম গঠনের কাজ স্থগিত রেখে নূতন কল্পনা করে গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। সম্মুখের মন্দির এবং ঘরদুয়ারগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে পিছনে পাহাড়ের আড়ালে গোপন দেবস্থল, আশ্রমস্থল, ভাণ্ডার, অস্ত্রাগারগুলিকে বড় করে তোলা হয়েছিল। অর্থের অভাব হয় নি। যে অর্থ সঙ্গে এনেছিলেন সে অর্থ কম ছিল না, তাঁর নিজের অর্থ এবং দে-সরকারের বাড়ির অর্থ যোগ করে পরিমাণে হয়েছিল অনেক। তারপরও অর্থ সংগ্রহ করেছেন কেশবানন্দ। জায়গীরদার, জমিদার এবং বড় বড় বণিকদের অনেক নৌকো রাজমহলের ওপার থেকে এপারে কয়েক ক্রোশব্যাপী গঙ্গার মধ্যে লুণ্ঠিত হয়েছে। কেশবানন্দকে বাধা দেন নি। কী পাপে যে এই অর্থ সংগ্রহ করে এরা, তা তিনি কেশবানন্দের মতই ভাল করে জানেন। মুরশিদাবাদের বৈকুণ্ঠে জমিদার জায়গীরদাররা পচে, জায়গীদার জমিদারদের বাড়িতে বৈকুণ্ঠের বদলে যা আছে তাকে অবশ্যই কৈলাস বলা যায়। বড় বড় বণিকেরা বড় বড় দে-সরকার। অনেক কৃষ্ণদাসীর আশ্রয়দাতা। হাজার হাজার টাকা দিয়ে

দিল্লি, লক্ষ্নৌ, কাশী থেকে কসবীর মেয়ে কিনে এনে পোষে। কাশী যায় বিশ্বনাথ দর্শন করতে নয়, বাঈজীর গান শুনতে। ডোবার ছোট মাছের সায়রে এসে সারা অঙ্গে লাল রঙ ধরিয়ে, উল্লাসে-জল-তোলপাড়-করে-বেড়ানোর সরলা মোহিনীরা, পল্লীগ্রাম থেকে কাঁদতে কাঁদতে এই সব বণিকদের বাগান-বাড়িতে এসে অল্পদিনের মধ্যেই নাচের আসর মাতিয়ে তোলে। এদের সকলকে ধ্বংস করতে হবে—কেশবানন্দ ঠিক করেছেন। কুরুক্ষেত্রের বিরাট আয়োজন সম্মুখে। মহাযজ্ঞের জন্য বিপুল সমিধের প্রয়োজন। যে বিশাল বনস্পতির কোটরে কোটরে সরীসৃপের বাস, যার অন্ধকার তলদেশ পাপানুষ্ঠানের লীলাভূমি, তার পল্লবশোভা দেখে ভুলো না, তার ছায়া দেখে মোহগ্রস্ত হয়ো না, তাকেই কেটে আন, মূলোচ্ছেদ করে কেটে আন।

এক বৎসর পর যেদিন আলিবর্দী খাঁ পল্টন নিয়ে বাজনা বাজিয়ে এই পথ ধরে ঘিরিয়া প্রান্তরের দিকে গেল, সেদিন আশ্রমের গোপন সংগঠন প্রায় সম্পূর্ণ। বাইরের প্রকাশ্য মঠ-মন্দির নিতান্তই সাধারণ, তা দেখে কারও সন্দেহ হয় না। আশ্রমের সেবকসংখ্যা এক শোর উপর। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মাধবানন্দ আলিবর্দী খাঁর পল্টন এবং অস্ত্রসম্ভার দেখে বলেছিলেন—এমনই আয়োজন চাই কেশবানন্দ, প্রস্তুত হও। এক পক্ষ হারবেই। হারবে সরফরাজ। কামুক, সে মৃত। আলিবর্দী খাঁ উপলক্ষ। সরফরাজের ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের অস্ত্র আমার চাই।

অনেক অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল।

অস্ত্রগুলি এনে এক জায়গায় জমা করা হলে, সেগুলি দেখে খুশী হয়ে বলেছিলেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় অস্ত্রগুলি বৃদ্ধা মায়ের শব বলে শ্মশানে শিমুলগাছের ডালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। এগুলি সযত্নে কাফনবন্দী করে কবর দাও।

গুহাগহ্বরে রেখে দেবার নির্দেশ।

তারপর এল বর্গীর প্লাবন।

বার বার—পাঁচবার। আলিবর্দী খাঁ মসনদে বসবার পর-বৎসরেই প্রথম বর্গী এল। ভাস্কর পণ্ডিত আর উড়িষ্যাফেরত আলিবর্দী খাঁ বর্ধমান থেকে লড়াই করতে করতে এল কাটোয়া পর্যন্ত। আলিবর্দী খাঁ বাঁচল এবং শেষ পর্যন্ত জিতল, দুর্গা-নবমীর দিন, দুর্গাপূজা-নিযুক্ত ভাস্করকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হারিয়ে দিলে। ভাস্কর ফিরে গেল। পর-বছরই একদিক থেকে এল রঘুজী ভোঁসলে, অন্য দিক থেকে এল পেশোয়া বালাজী রাও। পর-বছর আবার। আবার এল ভাস্কর পণ্ডিত। ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা দেশে ঢুকেই হুকুম দিলে—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, নারী—কোন বিচার নাই। কাটো।

দেশ শ্মশান করে দিলে। সেই চিরাচরিত বর্গীর অত্যাচার। নবাব এবার কৌশলে কার্যোদ্ধার করলে! সন্ধি করবার ছলে ভাস্কর পণ্ডিতকে শিবিরে নিমন্ত্রণ করে এনে অতর্কিতে তাকে হত্যা করলে। বর্গীরা পালাল।

আবার এল বর্গী। শোধ নিতে এল রঘুজী ভোঁসলে।

মাধবানন্দ স্থির হয়ে বসে দেখেছিলেন। লগ্ন গণনা করছিলেন। ওদিকে দিল্লীতে বাদশাহী পোকায়-শিকড়-কাটা প্রাচীন অশ্বত্থের মত শুকিয়ে আসছে। বড় বড় শাখাগুলির প্রশাখা শুকিয়েছে। হরিদ্বার গোকুল প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের মঠে মঠে তিনি কয়েকবার ঘুরে এলেন। সন্ন্যাসীরাও সর্বত্র শক্তি সঞ্চয় করছে। রাজেন্দর গিরি গোসাঁই অযোধ্যার নবাবকে আশ্রয় করে সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে একজন শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ভাগীরথীর ওপারে মালদহ থেকে রংপুর কোচবিহার পর্যন্ত কয়েকটি মঠের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তিনি চোখে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। আসছে, শেষ লগ্ন আসছে। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন। ঠিক এই সময়ে এল, এক নূতন অবস্থা। অবধূত সন্ন্যাসী বলেছেন, কোন নূতন সিদ্ধি আসতে আসতে আসছে না।

কেশবানন্দ শ্যামানন্দ জানে, এ অভ্রান্ত সত্য। তারা চোখে দেখেছে যে!

ঘটনাটা ঘটে যেবার রঘুজী ভোঁসলে এল ভাস্করের হত্যার শোধ নিতে। সেইবার বর্গীদের সুযোগ করে দিয়েছিল মুস্তাফা খাঁ। আলিবর্দী খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই সামনের পথ ধরেই মুরশিদাবাদ থেকে পাটনার দিকে ছুটল। পাটনা আক্রমণ করে দখল করবে। পথে রাজমহল লুঠ করলে। আলিবর্দী খাঁ অনুসরণ করলেন তাকে। ওদিকে মুস্তাফার নিমন্ত্রণে রঘুজী ভোঁসলে ঢুকে বসল বাংলায়। মেদিনীপুরের পথে বর্ধমান। মাধবানন্দ স্থির হয়ে বসে সংবাদ শুনতেন; কেশবানন্দ সংবাদ সংগ্রহের সুনিপুণ ব্যবস্থা করেছিলেন। নিত্য সংবাদ আসত। ঠিক দু দিন তিন দিনে নির্ভুল সংবাদ এসে পৌঁছত। বর্ষার মেঘের মত থমথমে হয়ে থাকতেন মাধবানন্দ। বিগ্রহের সম্মুখে বসে গভীর কণ্ঠে গীতার চতুর্থাধ্যায় পাঠ করতেন—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

কখনও মনে মনে কখনও উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করতেন, কবে? কবে? কবে? হিন্দু হয়ে মহারাজ শিবাজীর পতাকা—সাক্ষাৎ শিবতুল্য রামদাস স্বামীর উত্তরীয়-পতাকা বহন করে শুধু অর্থলালসায় গ্রাম নগর অত্যাচারে অত্যাচারে উৎসন্ন করে দিলে, পাপের উপর পাপ জমা হয়ে আকাশ স্পর্শ করলে, বায়ু দূষিত হল, জল কলুষিত হল, তবু সময় হল না? তিনি মনশ্চক্ষে দেখতেন, গ্রাম জ্বলছে, বর্গীদের চিৎকারে অট্টহাস্যে আকাশ বাতাস চমকে উঠেছে। মানুষের ঘরের মেঝে স্তূপাকার মাটির ঢিপিতে পরিণত হয়েছে, হাত-পা-কাটা মানুষ অন্তিম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; কান-নাক-কাটা মেয়েরা এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুকের রক্তাক্ত কাপড়খানা সরিয়ে দিচ্ছে। হে ভগবান! স্তন নাই, পাশবিক অত্যাচারের পর স্তন কেটে ছেড়ে দিয়েছে তাদের। এক-একদিন অধীর হয়ে বিভ্রান্তের মত সারা দিনরাত্রি পায়চারি করতেন। ইচ্ছাও মধ্যে মধ্যে হয়েছে, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। নিবৃত্ত করেছেন কেশবানন্দ। প্রশ্ন করেছেন, কাকে বাঁচাবেন? মানুষকে, না নবাবকে? তাতেই কি অধর্মের উচ্ছেদ হবে? আলিবর্দী খাঁ অবশ্য সরফরাজের মত

ব্যভিচারী নয়, সে শক্তিমান, কৌশলী আর বিচক্ষণও বটে। কিন্তু তারপর? নবাবের দৌহিত্র ভাবী নবাবের চরিত্রের কথা তো জানেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন মাধবানন্দ, যার মধ্যে অকস্মাৎ মনে পড়ে যাওয়ার অর্থ সুস্পষ্ট।

হ্যাঁ। মনে করিয়ে দিয়েছে কেশবানন্দ। তিনি জানেন, শুনেছেন, সিরাজউদ্দৌল্লার কথা। অন্যের কাছে শুনেছেন এবং নবাবদৌহিত্রের দ্বারা অত্যাচারিতের অবস্থা চোখে দেখেছেন। নিতান্তই বালক—এখনও ষোল বছর বয়সও পূর্ণ হয় নি। এখন থেকেই তার ভবিষ্যৎ স্বরূপ সুস্পষ্ট। মুরশিদাবাদ চৌকবাজার তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। উদ্ধত দাম্ভিক নিষ্ঠুরই শুধু নয়, এরই মধ্যে অনাচার, দেহলালসার কথাও শোনা যায়। নবাব আলিবর্দী খাঁ পর্যন্ত তার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সংসারে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণদান করে যাঁরা গাজী হন, তাঁরা জানেন না সংসার-সংগ্রামে স্নেহের অত্যাচারের সঙ্গে যাঁরা যুদ্ধ করে জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বীর। একজন শত্রুর হাতে মরে, অন্যজন অসহায়-ভাবে মরে স্নেহাস্পদের হাতে। নবাব আলিবর্দী খাঁ শুধু বর্তমানের কথাই লেখেন নি, ভবিষ্যৎ নবাব-গৌরবের কথাও বলেছেন।

ঠিক বলেছেন কেশবানন্দ। পাপ নিজের ঘাতে সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ুক। তখন তাঁর শক্তিতে যতটুকু সম্ভব আঘাত হানবেন। আসুক, আগে ভগবানের আমোঘ নিয়মে পরিণাম আসুক।

রঘুজী ভোঁসলে বর্ধমানে ঢুকে ন লক্ষ টাকা আদায় করলে এক মাসে।

হঠাৎ একদিন সংবাদ এল, বর্গী ছাউনি তুলে কাটোয়ার পথে না হেঁটে বীরভূমে ঢুকেছে। ছাউনি গেড়েছে উত্তর বীরভূমে কেন্দুয়ার ডাঙায়। পথে গ্রামে গ্রামে আগুন জেলে দিয়ে গেছে। কেন্দুয়ার আশপাশের কয়েকখানা গ্রাম তিন দিনে মুছে দিয়েছে। সম্ভবত এই পথ ধরে বিহারে গিয়ে ঢুকবে। নবাবের সঙ্গে মুখোমুখি হবে না।

কদিন পর সংবাদ এল, বর্গীরা হাতেমপুর আক্রমণ করে লুঠতরাজ করেছে। ফৌজদার হাফেজ খাঁ মারা গেছে।

হাফেজ খাঁ মারা গেছে? বর্গী হাতেমপুর লুঠ করেছে? মাধবানন্দের মনে পড়ে গিয়েছিল, গড়জঙ্গলে কয়ো একটি নীলা কুড়িয়ে পেয়েছিল। কয়ো বলেছিল হাফেজ খাঁর বেগমের কথা। বড় ভাল। তার কী হয়েছে?

শুধু হাতেমপুর নয়, হাতেমপুর থেকে ইলামবাজার, সেখান থেকে সুপুর পর্যন্ত বর্গীরা আক্রমণ করেছে। ইলামবাজারে দে-সরকারের বাড়ি শেষ। ঠেকেছে শুধু সুপুরে। আর অজয় পার হয়ে ইছাই ঘোষের দেউলের চারিপাশের গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। নিষ্ঠুরতম অত্যাচার করেছে ইলামবাজারে বৈরাগীপাড়ায়।

মাধবানন্দ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কেশবানন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেশবানন্দ!

কেশবানন্দ তার অর্থ বুঝেছিলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব অবশ্যই নয়। এ সেই সন্ন্যাসী-ছদ্মবেশী বর্গী সেনাপতি, প্রতিশোধ নিয়েছে, এমন নিশ্চয়ই হতে পারে। আবার তাই যে নিশ্চিত সত্য এমন মনে করারও কোন কারণ নেই।

বৈরাগীপাড়ার অত্যাচারের কথা, দে-সরকার বাড়ি ধ্বংস করার কথা, এপারে আমাদের আশ্রমের চারিপাশের গ্রামের উপর অত্যাচারের কথার পরেও কারণ নেই?

কেশবানন্দ বললেন, আমি বিস্তারিত খবরের জন্য লোক পাঠাচ্ছি।

মাধবানন্দ আর কথা বললেন না, উঠে গিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। ইলামবাজার হাতেমপুর অঞ্চলের ঘটনা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করতে আসনে বসলেন। প্রথমেই দেখলেন, আগুন জ্বলছে, বৈরাগীদের কুটির জ্বলছে। আর্ত চিৎকার উঠেছে নারীকণ্ঠে। চেনা কণ্ঠস্বর, কিন্তু বর্গী সিপাহীর অট্টহাসির রোলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কার কর্কশ কণ্ঠের আর্তনাদ! এ তো সেই উচ্ছিষ্টভোজী বৈরাগী কয়ো। হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে, হাত-পা-কাটা কয়ো পথের পাশে পড়ে চেঁচাচ্ছে। কী বলে চেঁচাচ্ছে? মোহিনী! মোহিনী! ওঃ, ওই যে চেনা নারীকণ্ঠ, ও-কণ্ঠ মোহিনীর!

—নবীন গোসাঁই! বাঁচাও। বাঁচাও। বলতে বলতে মোহিনী ছুটে আসছে। মোহিনীর বক্ষবাস রক্তে ভেসে গেছে।

ছি—ছি—ছি! চোখ খুললেন মাধবানন্দ। ছি—ছি—ছি! পরক্ষণেই দৃঢ় হলেন।

এপারের অসহায় গ্রামগুলির লোকের কী হল? ওঃ, একান্ত অনুগত সেই বীর বাগদী, ওই যে তার বুকে একখানা বর্শা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে! ওঃ—

বিস্তারিত সংবাদ এল পনের দিন পর। জয়দেব কেন্দুলীর মহান্ত মহারাজের কাছ থেকে চিঠি এল। তখন রঘুজী ভোঁসলে বীরভূম পিছনে রেখে দক্ষিণ বিহারে গিয়ে ঢুকেছে।

বিস্ময়কর বিবরণ। মাধবানন্দকেই মহান্ত লিখেছেন—"কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব প্রভুর আরাধ্য দেবতার আশীর্বাদে এবং তদীয় তপস্যার পুণ্যে অত্র কেন্দুলী রক্ষা পাইয়াছে। আমরা বিগ্রহ লইয়া নিরাপদে অন্যত্র সরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু এতদঞ্চলে যে হামলা ও অত্যাচার হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। এ অত্যাচার, ইলামবাজার প্রভৃতি স্থানে যাহা হইয়াছে তাহা করিয়াছে সেই ছদ্মবেশী বর্গী সন্ন্যাসী, যাহাকে আপনি খেদাইয়া দিয়াছিলেন। এতদিন পর শোধ লইল। আপনার পড়ো আশ্রমটি ক্রমশ পড়িয়াই যাইতেছিল, যতটুকু খাড়া ছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে। পাশের গ্রামগুলিকে ছাই করিয়া ছাড়িয়াছে। ইলামবাজারের বৈরাগীপাড়াও ধ্বংস। দে-সরকারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নুন জামির দিয়া বধিয়াছে। সরকার-বাটির কাহাকেও বাতি দিতে রাখে নাই। পাষণ্ড উচিতমত শাস্তি পাইয়াছে। এই পাষণ্ডই একরূপ হাতেমপুরের বর্গীদের ডাকিয়া আনিয়াছে। ফৌজদার ন্যায়পরায়ণ হাফেজ খাঁর সর্বনাশ করিয়াছে। তাঁহার পত্নী সাধ্বী শেরিনা বেগম আত্মহত্যা করিয়া জুড়াইয়াছেন। সে এক অপরূপ উপাখ্যান। অমাবস্যার রাত্রের পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের মতই অপরূপ। বেগম শেরিনা খোদ পাতশাহের ভাইঝি। পাতশাহের এক ভাইপো শাহ হুসেনের সহিত সাদীর কথা হইয়াছিল।"

সে-কথা মাধবানন্দ জানেন। মনে পড়ে গেল হুসেনকে। মত্তপ উচ্ছৃঙ্খল যুবক নেশায় আরক্তমুখ স্খলিতপদক্ষেপে তাঁর নৌকোয় উঠে জড়িত কণ্ঠে উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল, হিন্দু

ফকিরের কি এলেম আছে? এক বেশরমী আওরত ফেরার হয়েছে, তার নাম আমিনা, বহুত সুরত তার, রঙ গুলাবের মত; চোখ হরিণের মত।

সে এক কাব্যের রূপ বর্ণনা করে বলেছিল, সে এক এক বেইমান ছোট ঘরের বাচ্চা, উসমান তার নাম, তার সঙ্গে ফেরার হয়েছে। খড়ি পেতে সে কোন্ দিকে, কোন্ মুলুকে গিয়েছে বলতে পারলে বকশিশ দেবে। কেশবানন্দ অপূর্ব চাতুর্যে তার নিজের অনুমানের কথাগুলি জেনে নিয়ে তাই বলে খুশী করে ফিরিয়েছিলেন। মাধবানন্দ মনে মনে সেই আমিনার রুচির প্রশংসা করেছিলেন; এই লোকটির পদমর্যাদা, দেহের বাদশাহী রক্তগৌরব সমস্ত সত্ত্বেও তার কুৎসিত প্রকৃতিকে ঘৃণা করে উপেক্ষা করেছে।

আমিনা এবং উসমান পরস্পরকে ভালবেসে গোপনে বিবাহ করে সমস্ত বিপদ মাথা পেতে নিয়ে মুক্ত পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে পড়েছিল। যা হবার হবে। দশ দিকে শত শত পথ, সহস্র সহস্র হয়ে কোথায় চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত শেরসাহী সড়ক ধরে শ্যামরূপার গড়জঙ্গলে উপস্থিত হয়ে ওপারে হাতমপুরে হাতেম খাঁয়ের নূতন গড়ের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে চাকরি নিয়েছিল। আমিনা এবং উসমান হয়েছিল শেরিনা ও হাফেজ। পুত্রহীন হাতেম খাঁ তার অন্তিমে হাফেজকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করে, দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সর্বস্ব এবং রাজনগরের নবাবকে অনুরোধ করেছিলেন ফৌজদারি দেবার জন্য।

উদার ন্যায়পরায়ণ হাফেজ খাঁ। কয়ের হাতে মাধবানন্দের পত্রে অসহায়া মোহিনীর বিবরণ শুনে দে-সরকারের মত শেঠকে এবং তার বর্বর পুত্রটাকে গ্রেপ্তার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি

দে-সরকার চাতুরী খেলে ফৌজদারের হাত থেকে মুক্তি পেলে। কিন্তু অক্রুরের পাপের ভার তখন পূর্ণ হয়েছে, ভগবানের রোষ নেমে এল, তাঁর সেবক মাধবানন্দের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে। কংসারির সেবকেরা তার দীর্ঘদিনের পাপপথে সঞ্চিত ধন কেড়ে নিলে। অক্রূর বলির পশুর মত নিহত হল।

দে-সরকার কিন্তু পাথরে-গড়া মানুষের মত সব সহ্য করলে। আবার বিবাহ করলে, আবার ধীরে ধীরে ব্যবসায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে। গড়জঙ্গলের আশ্রমের সন্ন্যাসীরা চলে গেছে, তাদের সন্ধান সে পায় নি। তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল হাফেজ খাঁর উপর। তার সন্দেহ ছিল আশ্রমের সন্ন্যাসীদের এই ডাকাতির পিছনে হাফেজ খাঁর গোপন প্রশ্রয় আছে। সাপের আক্রোশের মত সে এই আক্রোশকে প্রতিটি দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে পোষণ করত।

সুযোগ এল।

একদিন ইলামবাজারের ঘাটে এল এক নৌকো। নামল হুসেন।

পরিচয় হতে দেরি হল না। সব চেয়ে বড় ব্যবসায়ী দে-সরকার, তার গদিতে এল হুসেন: এক মোকাম চাই আচ্ছা মোকাম। সে শুনেছে বড় শেঠের বেটার এক বাগিচা-ওয়ালা কোঠি আছে। আর শুনেছে, এখানে খুব ভাল বষ্টুমী আছে, শেঠ ইচ্ছে করলে দিতে পারে। সব তার একতিয়ারের অন্দর। আর চাই টাকা। তার কাছে আছে জহরত।

কিছু সন্দেহের কারণ নাই। তার কাছে বাদশাহী ফরমান আছে। বলেই সে কয়েকটা মুক্তো এবং একটা হীরে বের করে দিয়েছিল। তার পর হুসেনের সমাদর হতে দেরি হয় নি। এবং প্রথম দিন রাত্রেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমিনা আর কুত্তার' বাচ্চা উসমানকে সে জানে কিনা! নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল সে আমিনা-উসমানের।

দে-সরকার সুচতুর। চেহারার বর্ণনা এবং তাদের নিরুদ্দেশ হওয়ার সন তারিখ শুনে মনে মনে হিসেব করে মিলিয়ে সন্দেহ হতে তার দেরি হয় নি। কিন্তু সেদিন কিছু বলে নি। পরের দিন ভাল করে জেনেশুনে হুসেনকে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ফৌজদারকে দেখিয়েছিল: দেখিয়ে শাহজাদা, উয়ো আদমী আপকা উসমান হ্যায় কি নহি!

—ওহি। ওহি। ওহি। নিকমহারাম কুত্তা—

—চুপ কর শাহজাদা। এ তোমার দিল্লি নয়। দিল্লির তোমার সে দিন নাই। তোমাকে চিনতে পারলে তোমাকে কোতল করে নিশ্চিন্তি হয়ে যাবে। আমারও এবার জান নিয়ে ছাড়বে। সবুর কর। ফিরে চল এখন। হুঁশিয়ার, কারুর কাছে এ কথা বলো না। বলবে না তোমার নাম হুসেন। বলবে, তুমি সওদাগর। গালার খেলনা সওদা করতে এসেছ।

হুসেন বলেছিল, ঠিক বলেছ। বহুত এলেম তোমার। কালই আমি লোক পাঠাব মুরশিদাবাদ নবাবের কাছে।

—নবাব এখন একদিকে মুস্তাফা খাঁর কামড়ে, অন্যদিকে বর্গীর থাবার খোঁচায় ছটফট করছে। তোমার আমিনাকে উদ্ধার করবার এখন ফুরসত কোথায়?

—তব্? বহুত আচ্ছা, ওর সঙ্গে আমি লড়াই করব। ও আর আমি।

—না। এক কাজ কর। বর্গীরা ছাউনি করেছে কেন্দুয়ার ডাঙায়। তুমি তাদের কাছে যাও। তোমার কাছে জহরত রয়েছে, ঘুষ দাও, বল, হাতেমপুরে চড়াও হোক। সোনা-রূপা জহরত তাদের, আমিনা তোমার। হাতেমপুরের পথঘাট, হালহদিস আমি সব জানি। আয়নার মত সাফা করে আমি সব বাতলে দেব। আমার আক্রোশ মিটবে।

রঘুজীর সঙ্গে ছিল মীর হাবিব। নিমকের গুণ, নিজের জাত, ধর্মের দাম তার কাছে কিছুই নাই। একছড়া মুক্তোর হার নিয়ে সে যোগাযোগ করে দিলে। কেন্দুয়ার ডাঙা থেকে বিহারের পথে যাওয়া স্থগিত রেখে ঘুরল বর্গীরা। রাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতেমপুরের গড়ের উপর। হাফেজ খাঁ অপ্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু রঘুজীর বর্গীর দলে চোদ্দ হাজার সওয়ার আর হাতেমপুরের গড়ের সবে হাজার তিনেক পয়দল আর সওয়ার। তার উপর বিশ্বাসঘাতক দে-সরকারের গোপন পথ-দেখানো। কেন্দুয়া থেকে আসবার সড়ক-পথের উপর লক্ষ্য রেখে হাফেজ খাঁ পল্টন সাজিয়েছিলেন। দে-সরকার অন্য পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথে এসে তারা গড় ঘিরে মশাল জ্বেলে আত্মপ্রকাশ করলে। আশ্চর্য ভাগ্যের খেলা! নিয়তি! ওদিকে তখন শেরিনা বেগম প্রথম সন্তান প্রসব করে সূতিকাগারে। হাফেজ খাঁ অকস্মাৎ এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্র হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শেরিনা বসে আল্লাকে ডাকছেন।

—বিদায় নিতে এসেছি।

—বিদায় ?

—হ্যাঁ, বিদায়। অসংখ্য বর্গী পল্টন। তার উপর—

—কী তার উপর ?

—হুসেন। মশালের আলোয় হুসেনকে দেখলাম।

—হুসেন ! চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চমকে উঠে দাঁড়াল শেরিনা বেগম।

—সে এখান পর্যন্ত এসেছে। আমার ভাবনা শেরিনা।

—সব ভাবনা আমাকে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। লড়াই কর। বিশ্বাস রাখ আমার উপর। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ। দাও, আমাকে শেষ চুম্বন দাও।

শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে হাফেজ খাঁ চলে গেলেন। শেরিনা বেগম বসে রইলেন। আকাশস্পর্শী কোলাহল। রক্তাক্ততার মত অন্ধকারের বুকে মশালের আলোর ছটা নাচছে। মুহুর্মুহু বন্দুক এবং বারুদ-ফাটার শব্দ। ওদিকে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ উঠল। ভাঙল ফটক ; শেরিনা বিবি স্থির থাকতে পারলেন না। বাঁদীর কোলে শিশুসন্তানকে দিয়ে একখানা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে।

একটা সমবেত ভয়ার্ত ধ্বনি উঠল, ফৌজদার—

হাফেজ খাঁ গুলির আঘাতে আহত হয়ে পড়েছেন ঘোড়া থেকে। গড়ের পল্টনেরা পালাচ্ছে। হুসেন এসে তার তরোয়ালখানা হাফেজের বুকে বিঁধে দিলে। চিৎকার করে বারেকের জন্য নিজের তরোয়ালখানা উদ্যত করে হাঁকলেন শেরিনা বিবি, পালিও না। রোখো। ওই দোজখের কুত্তাকে রোখো। কিন্তু পরমুহূর্তে তরোয়ালখানা নামিয়ে ঘুরলেন। কী হবে ? হাফেজ, তার প্রিয়তম নাই, তিনি বেঁচে কী করবেন ? তিনিও মরবেন। হঠাৎ বাঁদীটা সামনে এসে কোলের শিশুকে তাঁর হাতে দিয়ে বললে, নাও বেগম সাহেবা। তোমার ছেলে নাও। তাঁর কোলে ছেলেটিকে দিয়ে পালাল ছুটে। শিশুর স্পর্শে চমকে উঠলেন শেরিনা বেগম। তাই তো ! এর উপায় কী হবে ! একে হত্যা করে তার পর মরবেন ? না, তা পারবেন না। নিজের সন্তানের বুকে—। না. না। তার চেয়ে—। গাঢ় স্নেহে বুকে চেপে ধরলেন তাকে।

—আমিনা। এইবার ? বিপুল উল্লাসে 'আ মেরি পিয়ারি' বলে কে হি-হি করে হেসে উঠল ! কে আবার ? হুসেন।—কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে দিল্লি নিয়ে যাব। বাদশা হব। শের আফগানকে মেরে জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে নূরজাহা করেছিলেন। আমি হব দুসরা জাহাঙ্গীর, তুমি হবে দুসরি নূরজাহা। পিয়ারী ! শেরিনা !

বেগম হাসলেন বিচিত্র হাসি। উঠতে লাগলেন উপরে।

—আমিনা !—হুসেনও উঠতে লাগল।

—এস।

—আমিনা !

—এস।

—কোথায় ?

—এস। ভয় কেন? উঠতে লাগলেন শেরিনা। উঠলেন ছাদে।

এবার হুসেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। যাবে কোথায় আর?

শেরিনা বেগম আলসের উপর উঠলেন—বুকে তাঁর শিশু। 'দেখ, কোথায় যাব। আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওখানে। যেখানে হাফেজ গিয়েছে। সেখানে তোমার মত পাপী কোন কালে যেতে পারবে না। পার তো এস। এস।

—আমিনা! আমিনা!

উত্তরে জলতরঙ্গের মত সঙ্গীতময় হাসি সেই বীভৎসতার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল। তারপরই আর শেরিনা বেগমকে দেখা গেল না। মুহূর্ত পরে নীচের প্রাসাদ-সরোবরের বুকের জলে সশব্দ আলোড়ন উঠল। সন্তানকে বুকে নিয়ে মাতাপুত্রে ঝাঁপ খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

"এ উপাখ্যান লইয়া এদেশে ইহার মধ্যে লোকে গীত রচিয়া গান করিতেছে মাধবানন্দজী। শেরিনা বিবির কবরে নিত্য সন্ধ্যায় চেরাগের সারি জ্বালায়। গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করে। হিন্দু মুসলমান নাই। হিন্দু মেয়েরা সিন্দুর দেয়, বলে, তোমার মত যেন সতী হয়ে যেতে পারি। এখন ইলামবাজারের কথা জানাই। এই বর্গীর দলে ছিল সেই সাধু-ছদ্মবেশী বর্গী মনসবদার।"

সে হাতেমপুর আক্রমণের সময় একদল বর্গী নিয়ে আসে ইলামবাজার। গতবার সে যখন লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যায়, তখন অক্রূরের পরিচয় জেনে গিয়েছিল। কৃষ্ণদাসীর পরিচয়, ওপারে সন্ন্যাসীদের পরিচয়—সবই সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল। অক্রূরের বাপের ধনসম্পত্তির কথাও জেনেছিল। সুতরাং সর্বাগ্রে আক্রমণ করেছিল দে-সরকারের বাড়ি। খুঁজেছিল অক্রূরকে। অক্রূর মরেছে শুনে বলেছিল, তবে আন্ ওর বাপকে, আর আন্ যে যেখানে আছে তাদের। কেটে ফেল্। ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেল্। তারপর জ্বালিয়ে দে ঘর।

দে-সরকার নিশ্চিন্ত ছিল। তার বাড়ি যেন কোন মারাঠা আক্রমণ না করে—এই মর্মে এক আদেশপত্র সে সংগ্রহ করে রেখেছিল মীর হাবিবের কাছ থেকে। কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণ বর্গী সেনাপতি সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর থুতু ফেলে টুকরোগুলোর উপর নিজের ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিয়ে বলেছিল, কুত্তা, সে কুত্তাই। সে কারও পোষাই হোক আর রাস্তারই হোক। ওরে কুত্তা, তোর বেটা কুত্তা আমাকে কামড়াতে এসেছিল, তার শোধে তোদের সব কুত্তাকে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব। এমনি করে, এমনি করে, এমনি করে। নিয়ে আয় রে সুন জামির, দে ওর কাটায় কাটায় ছিটিয়ে।

সেখান থেকে গিয়েছিল বৈরাগীপাড়া। কাঁহা হ্যায় উ ডুনো লৌণ্ডি? কাঁহা হ্যায়? জ্বালিয়ে দে, গোটা বস্তি জ্বালিয়ে দে। বের করে আন্। নাক কান হাত পা কেটে দে।

বৈরাগীপাড়া জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোনও বৈরাগীকে পায়নি। তারা তার আগেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সুপুরে—ডাকিনীসিদ্ধ আনন্দসুন্দর ঠাকুরের গড়ের মধ্যে প্রেমদাস বৈরাগীর ঋণ ঠাকুর ভোলেন নি।

বর্গীরা ছুটে গিয়েছিল সুপুরের দিকে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে।

কেন্দুলির মহান্ত মহারাজ লিখেছেন, গোস্বামীজী, লোকে বলছে চার ফটকে একসঙ্গে বর্গীরা আক্রমণ আরম্ভ করলে, আনন্দসুন্দর তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন, একই সময়ে বর্গীরা এক আনন্দসুন্দরকে সাদা ঘোড়ার উপর আরূঢ় হয়ে চার ফটকেই উপস্থিত দেখে ভীত হয়ে ফিরে গিয়েছে।

কেউ কেউ বলছে, বর্গীরা সংখ্যায় কম ছিল—একশো-দেড়শো ; আনন্দসুন্দর তাঁর গড়ের মধ্যে হাজার দুহাজার জোয়ান জমায়েত করে দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে বাধা দিয়েছিলেন। বন্দুক-পিস্তলও তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই কারণেই বর্গীরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এবং তাদের সময়ও ছিল না। যাই হোক, মাধবানন্দজী, বৈরাগীপাড়া পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে ; কিন্তু আনন্দসুন্দর ঠাকুর বীরও বটে, সাধকও বটে তাঁর জন্য নিরীহ বৈরাগীরা রক্ষা পেয়েছে। তার পরই তারা ওপারে গিয়ে আপনার পরিত্যক্ত আশ্রম জ্বালিয়ে ধ্বংস করে পার্শ্ববর্তী গৌরাঙ্গপুর, লোহাগড়ি, গড় গোয়ালপাড়া, কোটালপুকুরে আগুন দেয়, কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা তার আগেই গভীর বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কারও কোনও অনিষ্ট হয় নাই। শেষ লিখেছেন, "বর্গীরা এই ঘটনার পরদিনই বিহার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দেশ শ্মশান হইয়াছে। স্বয়ং নবাব আলিবর্দী খাঁ বর্গীর সঙ্গে লড়াই দিতে বাহির হইয়া ভুজা চানা চাউল আটা দুই টাকা সের কিনিয়া জান বাঁচাইয়াছে। আর কেন্দুলী বাঁচিয়াছে কবিরাজ গোস্বামীর দৈবানুগ্রহে। দক্ষিণ অঞ্চলে কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দ শ্রীমদ্ভাগবত তুল্য পবিত্র এবং প্রিয়। বর্গীরা যাওয়া-আসার পথে নাকি বার বার প্রণাম করিয়া গিয়াছে। স্থানান্তরে নিরাপদে থাকিয়া পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, সমস্তই অটুট আছে, একটি ইটও খসে নাই। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটি লোক ছাড়া লোক ছিল না। সে আপনার সেই কউয়া বৈরাগী। সে বহুকাল হইতেই কদমখণ্ডীর বটগাছে ডালের উপর বাসা বাঁধিয়াছে। গাছের শীর্ষদেশে বসিয়া মোহিনী' 'মোহিনী' বলিয়া চিৎকার করে। সে কিন্তু বর্গীর ভয়েও স্থানত্যাগ করে নাই। সে বলে জয়দেব ঠাকুর নাকি নিজে কেন্দুলীকে রক্ষা করিয়াছেন। গাছের মাথা হইতে সিদ্ধাসনে সে তাঁহার দিব্যমূর্তি দেখিয়াছে।"

*   *   *

পত্র শেষ হলে মাধবানন্দ দীর্ঘক্ষণ—পূর্ণ অষ্টপ্রহর স্তব্ধ হয়ে সেই একই স্থানে বসে ছিলেন। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, বৈরাগীপাড়া পুড়েছে, কিন্তু বৈরাগীরা বেঁচেছে ? কারুর কিছু হয় নি ?

কেশবানন্দ সারা পত্রখানির উপর আবার একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বলেছিলেন, হাঁ, তাই লিখেছেন মহান্ত মহারাজ। সুপুরের আনন্দসুন্দর গোস্বামী তাদের আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছেন।

আবার কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করেছিলেন, কয়ো বৈরাগী কেন্দুলীর কদমখণ্ডীর ঘাটের বট-গাছের ডালে—

—হ্যাঁ, সারা কেন্দুলীর মধ্যে একা কয়োই তার বটগাছের ডালের বাসা ত্যাগ করে নি।

সে সিদ্ধাসনের উপর কবিরাজ গোস্বামীর দিব্যমূর্তি দেখেছে।

—তার কোনও অনিষ্ট হয় নি? অক্ষত দেহেই আছে?

—মনে তো তাই হয়। অবশ্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু লেখেন নি তিনি।

—কয়ো গাছের মাথার উপর বসে চিৎকার করে, লিখেছেন না?

—হ্যাঁ। 'মোহিনী' 'মোহিনী' বলে চিৎকার করে। মোহিনী সেই মেয়েটি, যাকে উদ্ধারের জন্য—

হাত তুলে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলেছিলেন মাধবানন্দ। কেশবানন্দ নীরব হয়ে কিছুক্ষণ নূতন প্রশ্ন বা কথার প্রতীক্ষা করে অবশেষে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। মাধবানন্দ সেই হাত তুলে শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন মাটির মূর্তির মত। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোধ করি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলেন, তবে?

কিছুক্ষণ পর আবার বলেছিলেন, আমি যে স্পষ্ট দেখলাম। আরও অনেকক্ষণ পর আবার বলেছিলেন, সব ভ্রান্তি?

মনে পড়ে গেল অথবা আবার তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন, হাত-পা-কাটা কয়ো চিৎকার করছে—মোহিনী! মোহিনী!

নাক-কান-কাটা মোহিনী ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ভয়ে যন্ত্রণায় উন্মাদিনীর মত ছুটে চলে আসছে, তার বক্ষাঞ্চল রক্তসিক্ত, সে ডাকছে—বাঁচাও। ওগো নবীন গোসাঁই! ও—গো—

এ দর্শন তা হলে ভ্রান্তি?

সন্ধ্যা তখনও আসন্ন। মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছে। কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি উঠছে, দামামায় ঘা পড়ছে, আরতি হবে; মাধবানন্দ উঠে হাতমুখ ধুতে ধুতেই ডেকেছিলেন, কেশবানন্দ!

কেশবানন্দ কাছেই ছিলেন। গুরুর মানসিক অবস্থান্তরে শঙ্কিত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, গুরুজী!

—আমি একবার কেন্দুলী যাব। কাল বা পরশুর মধ্যে। তুমি আয়োজন কর। সঙ্গে অর্থ নাও। গৌরাঙ্গপুর লোহাগড়ি গ্রামগুলির লোকেদের যা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ না করলে ধর্মে পতিত হতে হবে।

কেন্দুলী গিয়েছিলেন মাধবানন্দ। মহান্তের অতিথি হয়েছিলেন। কাটোয়া হয়ে অজয়ে ঢুকে যেভাবে প্রথমবার শ্যামরূপার গড়ে গিয়েছিলেন সেই ভাবেই। সেই ভাবেই তিনি নৌকোর ছইয়ের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বর্গীদের অত্যাচারের পৈশাচিক দৃশ্য দেখতে দেখতে গিয়েছিলেন। পোড়া গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম; পড়ো প্রান্তরের মত তৃণশূন্য কঠিন শস্যক্ষেত্র, হাত-পা-কাটা মানুষ, নাক-কান-কাটা কর্তিত-স্তন নারী—বীভৎস দৃশ্য। একদিন রাত্রে একটি ঘাটে নৌকো বেঁধেছিলেন, সেখানে গান শুনেছিলেন, দল বেঁধে পালাবন্দী গান—

উপায় কি করি বল, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান—

কিমতে কও বাঁচে জান মান?

বরগীরা আইল দ্যাশে, হাজারে হাজারে যমদূতের সমান—

কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

মানুষ হইলে যম, সাক্ষাৎ যমের বাড়া

দেবতারে মানে যম, মানুষ-যমে ডরে দেবতারা—

মানুষে ঘর ছাড়তে নারে, দেবতারা আগেভাগে পালান—

কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

কবি গঙ্গারামে বলে, দেবতায় কেনে দুষ?

অন্তর খুঁজিয়া দেখ, কত পাপ পুষ।

ওরে মানুষে থেকা পাপ বেশী জড়ো কৈলে বিন্ধ্যপর্বত সমান—

কি করিবে, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

ওরে তবে শুন বিবরণ—

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা

রাত্রদিন ক্রীড়া কর পরস্ত্রী লইঞা।

শৃঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্বক্ষণ

হেন নাহি জানে সেই কি হবে কক্ষণ!

পরহিংসা পরনিন্দা রাত্রি দিনমান—

জর্জর পৃথিবী, পাপ বিন্ধ্যপর্বত সমান—

কলির ঠ্যাঙায় ধর্ম বুঝে যায় যায় শেষ পদখান—

রুষ্ট হইল কিষ্টো কালী শিব ভগবান।

শুন শুন বিবরণ—

এত যদি পাপ হইল পৃথিবীর উপরে—

পাপের কারণে পৃথিবী ভার সহিতে নারে—

তবে পৃথিবী চলি গেলা ব্রহ্মার গোচরে—

কান্দিতে লাগিলা পৃথী ব্রহ্মা বরাবর।

পাপের ভারায় ভেঙে বুঝি যায় বা বক্ষখান—

কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

দীর্ঘ গান। মূর্খ গঙ্গারাম কল্পনা করেছে, এই পাপের প্রতিবিধানের জন্য শিব নন্দীকে পাঠালেন শাহরাজার মধ্যে অধিষ্ঠান হতে।

এতেক শুনিয়া নন্দী গেল শীঘ্রগতি

উপনীত হইলা গিয়া শাহরাজা প্রতি।

শাহরাজা বাহু মেলি তোলে তলোয়ার খান

জয় কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

তবে হ্যাঁ, এ তাণ্ডব প্রেততাণ্ডব বটে। সেখানে গঙ্গারাম ভুল করে নি। ওঃ, অসহ্য! মাধবানন্দ অধীর হয়ে বলেছিলেন, কেশবানন্দ, নৌকো খোল, এগিয়ে চল, এ শুনতে আমি আর পারছি না।

ওরা তখন গাইছিল, বামুন পালাচ্ছে, স্বর্ণবণিক পালাচ্ছে, গন্ধবণিক কামার কুমার বৈশ্য কায়স্থ, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী পালাচ্ছে। বর্গী আসছে—

ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলোয়ারের ধ্বনি—
তলোয়ার ফেলাইঞা তারা পলায় এমনি।
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল—
বরগির নাম শুইনা সব পালাইল।
গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে।
গাছতলাতে কান্দে নারী কোলেতে সন্তান—
রাখো কিষ্টো কালী শিবো ভগবান।
এই মতে সব লোকে পলাইয়া যাইতে—
আচম্বিতে বরগী ঘেরিল আইসা সাথে—
কারু হাত কাটে কারু কাটে নাক কান—
একই চোটে কারু বা বধএ পরাণ।
মোহিনী রমণী বাছি ধইরা লইয়া যাএ—
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।
একজনে ছাড়ে আর অন্যজনা ধরে।
রমণের ভয়ে তারা ত্রাহি শব্দ ছাড়ে।
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দিছে পাষাণ—
রাখো কিষ্টো কালী শিবো ভগবান॥

নৌকো খোলো—নৌকো খোলো—এই মুহূর্তে। উন্মত্তের মত চিৎকার করে উঠেছিলেন মাধবানন্দ।

কেন্দুলীতে এসে করোকে দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। করোর হাত-পা কাটা যায় নি বটে, কিন্তু তার হাত-পা ভেঙে সে পঙ্গু হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ঘোর উন্মাদ। শুধু চিৎকার করে, মোহিনী, মোহিনী, মোহিনী! মো—হি—নী!

মোহিনী হারিয়ে গেছে। সেই রাত্রে। সেই ভয়ঙ্কর বর্ষণমুখর রাত্রে মাধবানন্দ যে তাকে বলেছিলেন, সাক্ষাৎ পাপ। তোমার মুখদর্শনও পাপ। কাল ভোর হতে হতে তুমি চলে যাবে, আর যেন তোমার মুখদর্শন করতে আমাকে না হয়!

সেই কথা শুনে, সেই রাত্রেই সে সেই দুর্যোগের রাত্রে বর্ষণোল্লসিত শাল-অরণ্যের মধ্যে কোথায় সন্ধানহারা হয়ে হারিয়ে গেছে।

করো সেই দিন থেকেই ডেকে ডেকে ফিরেছে। অবশেষে গাছে বাসা বেঁধে গাছের মাথায় বসে দিগ্‌ দিগন্তের দিকে চেয়ে তার সন্ধান করেছে আর ডেকেছে—মোহিনী!

এর পর গিয়েছিলেন শেরিনা বিবির কবর দেখতে। হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে কবরে প্রণাম করে সন্ধ্যার প্রদীপ সাজিয়ে দেয়; হিন্দুরা সিঁদুর দেয়—তাদেরও প্রেম যেন এমনি গভীর হয়। এমনিভাবে যেন তারাও মরতে পারে।

মাধবানন্দের চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা নেমে এলেছিল সেদিন সন্ধ্যায়। কেঁদেছিলেন সারা রাত্রি সারা দিন।

সেই দিন সেই মুহূর্ত থেকে এই বিচিত্র ব্যাধির সূত্রপাত। স্তব্ধ হয়ে ছিলেন ক্রমান্বয়ে সাত দিন। বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন অভিভূতের মত বসেছিলেন। চৈতন্য যেন কোন্ দূরলোকে আকাশের গায়ে সুতোকাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে···হারিয়ে যাচ্ছে। অসীম অনন্তের মধ্যে নিরালম্ব নিরাশ্রয়, দিক নাই, দিগন্ত নাই; মাটির বুকে নামার উপায় নাই; বন্ধন নাই; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের স্নেহ থেকেও যেন বঞ্চিত হয়েছেন তিনি।

*　　*　　*

সাত দিনের পর সেবার সুস্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীর বুকে নেমেছিলেন বজ্রের বেগে! কাটা ঘুড়ি অকস্মাৎ ইন্দ্রদেবতার বজ্র হয়ে নেমেছিল মাটির বুকের এক উদ্ধত পাপ-পরায়ণের উপর—ধর্মের বিচারে অভিশপ্ত জনের মাথায়।

ফেরার পথে মুরশিদাবাদের পরেই বালুচরের সামনে গঙ্গার ঘাটে একখানা ছোট প্রমোদ-তরুণী বাঁধা ছিল, তরঙ্গদোলায় অলসবিলাসে যেন দুলছিল। ছাদের উপর বসেছিল এক বিলাসী শেঠের ছেলে; সন্ধ্যা তখনও হয় নি, দিনের আলো ম্লান হলেও সমস্ত স্পষ্ট দেখা যায়। সেই স্পষ্ট আলোকে পবিত্র গঙ্গার বুকে সে এক নটীকে কোলে নিয়ে তার মুখচুম্বন করছিল। বার বার। মিথুনলীলায় মগ্ন পশু এবং পশু নারীর মতই লজ্জা সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন।

বিষণ্ণ বিমর্ষ মাধবানন্দ মুহূর্তে বজ্রের মত জ্বলে উঠেছিলেন। পরমুহূর্তেই আকস্মিক বিপদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা ফিরিঙ্গীদের তৈরী বন্দুক একটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলেছিলেন—খাড়া কর নৌকো। অলঙ্ঘনীয় সে কণ্ঠস্বর এবং আদেশ। নৌকোর গতি স্থির হতেই বন্দুক গর্জে উঠেছিল বজ্রের মত। হতভাগ্য শেঠ যুবক পড়ে গিয়েছিল, নটীটার কী হয়েছিল কে জানে! নৌকো' সমস্ত দাঁড়গুলি তখন একসঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছে।

আরও বারো বৎসর এই ধারায় চলছে। ক্রমশ বাড়ছে। সাত দিন থেকে দশ দিন, পনের দিন, ক্রমে এখন তিন মাস পর্যন্ত ওই অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে থাকেন মাধবানন্দ। প্রয়াগে এবার পূর্ণকুম্ভ। পূর্ণকুম্ভস্নানের জন্য যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেবীপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি, বুধবার দিনটি চিরকালই প্রশস্ত, শুভ। এবার আরও কয়েকটি বিশেষ যোগাযোগে পুণ্য এবং কল্যাণকর হয়ে উঠেছে; ওই তারিখেই যাত্রার কথা, কিন্তু অকস্মাৎ আজ তিন দিন মাধবানন্দ এই বিচিত্র বিষণ্ণতায় স্তিমিত স্তব্ধ হয়ে গেছেন। প্রথম দু দিন কেশবানন্দ কিছু বলেন নি। আজ কথাটা নিবেদন না করে পারলেন না।

—তা হলে যাত্রার আয়োজন এখন স্থগিত থাক্।

যাত্রার আয়োজন স্থগিত থাকবে? প্রয়াগযাত্রার আয়োজন? চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। গভীর মগ্নতার মধ্যে ডুবে যাওয়া মনও সকল শক্তি এক করে সজাগ হয়ে উঠল। যাত্রা স্থগিত

থাকবে ?

পূর্ণকুম্ভ বারো বৎসর পর আবার আসবে। নবগ্রহ, দ্বাদশ রাশি, তিথি বার সৃষ্টিচক্রের অপরিবর্তিত নিয়মে বারো বৎসর পর পর এই সমাবেশে আসবে ; রবিবারে পূর্ণিমাতিথিতে সূর্য বৃহস্পতি মকররাশিস্থ হবে। গঙ্গা-পুষ্করযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এবার মহাযোগ। স্নানযোগের সঙ্গে মহাদর্শনযোগ যুক্ত হয়েছে।

যে যে গ্রহ রাশি নক্ষত্র তিথি বার সমাবেশে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ হয়েছিল, সে সমাবেশ তারপর আবারও এসেছে, এর পর আবারও আসবে, সেই যোগে কুরুক্ষেত্র-তীর্থ দর্শনে স্নানে স্নায়ীর কোটিজন্মের পাপমোক্ষণও হবে ; কিন্তু যে বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, সে বৎসর সেই যোগে সমস্ত পৃথিবীর পাপ মোক্ষণ হয়েছিল। সে যোগ মহাযোগ, একসঙ্গে স্নানযোগ ও দর্শনযোগ। রক্তাক্ত কুরুক্ষেত্র, রথ রথী গজ অশ্বের শবসমাকীর্ণ কুরুক্ষেত্র, বিগতশক্তি নিঃশেষিততেজ সিদ্ধ মহাস্ত্র-আকীর্ণ কুরুক্ষেত্র ; কুরুকুল এবং পাণ্ডবকুলের পুরনারীদের অশ্রু-অভিষিক্ত কুরুক্ষেত্র ; পাঞ্চজন্য-মহাশঙ্খধ্বনি এবং গীতার মহাসঙ্গীতের রেশঝঙ্কৃত কুরুক্ষেত্র সেই বৎসরই কালের সঙ্গে চলে গেছে, আর আসে নি। এ বৎসর যে সেই মহাযোগ। সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে মহাধ্বংসলীলার শেষ পর্ব এখনও আসে নি, কিন্তু অর্ধেক শেষ। সম্মুখে আসছে অপরার্ধ। শেষ পর্বে তাঁরা উঠবেন ; তার আগে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মহাকালের রুদ্ররূপ দর্শন না করলে দিব্যজ্ঞান মহাশক্তি আসবে কী করে ? রক্তস্রোতে তুফান উঠুক, অন্তরাত্মা হুঙ্কার দিয়ে উঠুক। বিষণ্ণ সন্ন্যাসীর চিত্রলোকে মহাভারতের শঙ্খ বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল হিন্দুস্থানের বর্তমান চিত্র।

বাংলা দেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই বিরাট ক্ষেত্রে ষোল বছরে যে যুদ্ধ চলেছে, তার কথা কুরুক্ষেত্র থেকে কম কি বেশী তিনি বুঝতে পারছেন না। মনে হচ্ছে যেন বেশী। কলির কুরুক্ষেত্র। বাংলা দেশে সরফরাজের ধ্বংস হল ঘিরিয়ার প্রান্তরে। এই তো কয়েক ক্রোশ দূরে। সুতির নালা থেকে চড়কা বালিঘাটা পর্যন্ত দু পক্ষের কামান বসাবার জায়গাগুলো পর্যন্ত চিহ্নিত করা রয়েছে। আলিবর্দী ওগুলো পাকা করে কায়েমী করতে চেয়েছিল। ভবিষ্যতে যুদ্ধ হবে এ কথা সে জানত। কিন্তু জানত না যে, ঘিরিয়ায় হবে না, হবে মারাঠাদের সঙ্গে বাংলা-বিহার জুড়ে নানান স্থানে। মারাঠারা বাংলা দেশকে বার বার চারবার জালিয়ে লুঠে মেরে কেটে নারী-ধর্ষণ করে ছারখার করে দিয়ে উত্তর-ভারতের দিকে মুখ ফেরাল। আলিবর্দী খাঁ ভেবেছিল—বাস্, নিশ্চিন্ত, এইবার আর একটা যুদ্ধ হলেই শেষ। দ্বৈপায়ন হ্রদের দুর্যোধনের মত হৃতসর্বস্ব দিল্লির বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে, অথবা ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের শেষ সেনাপতি অশ্বত্থামার মত অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে একটা লড়াই হলেই শেষ। তারই জন্য সে ঘিরিয়া এবং আরও উত্তরে রাজমহলের ওপারে উধুয়ানালায় ঘাঁটি তৈরি করেছিল। ভাবে নি তার বংশ ধ্বংস হবে মুরশিদাবাদের উত্তরে নয়—দক্ষিণে, পলাশীর আমবাগানে। তিন মাসও পূর্ণ হয় নি এখনও, পলাশীতে উচ্ছৃঙ্খল অস্থিরচিত্ত নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা শেষ হয়েছে। আলিবর্দী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে সরফরাজকে ধ্বংস করে নবাব হয়েছিল। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে ফিরিঙ্গী ইংরেজের মুঠোখানেক পল্টনের হাতে

সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটিয়ে ফিরিঙ্গীকে ঘুষ দিয়ে নবাব হয়েছে। এই তো বর্ষার সময় শ্রাবণ মাসে হতভাগ্য মীরজাফরও যাবে। ওদিকে সারা উত্তর-হিন্দুস্থান শ্মশান, দিল্লীর অবস্থা দ্বৈপায়ন হ্রদের দুর্যোধনের মত।

নাদিরশাহী মহা দুর্যোগের পর আবদালশাহী দুর্যোগ। নাদির শা মরেছে—মরেছে তার তুর্কী-মনসবদারের হাতে। গভীর রাত্রে তুর্কীরা তার তাঁবুতে ঢুকে, একসঙ্গে তেরোজন মনসবদার তেরোটা তলোয়ার দিয়ে কোপ মেরেছিল। নাদিরের আফগান মুল্লুকে শাহ হয়ে বসেছে আহম্মদ-শাহ আবদালী। দুটো কান কাটা, নাকে কুষ্ঠরোগের বিকৃতি, তেমনি নিষ্ঠুর কুটিল প্রকৃতি আহম্মদ শাহ আবদালী। এর মধ্যে চার-চারবার সে হিন্দুস্থান ঢুকেছে মহামারীর মত, আশ্বিনী ঝড়ের মত, বৈশাখী অগ্নিদাহের মত সমস্ত দেশকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। গতবার সে এসেছিল মথুরা বৃন্দাবন গোকুল পর্যন্ত। গোটা হিন্দুস্থান শ্মশান। সাত দিন ধরে মথুরা তাদের দেওয়া আগুনে পুড়েছে। মথুরার রাজপথ গলিপথ কাটা মুণ্ডু আর লাসে ছয়লাপ। মাটি কাদা হয়েছে রক্তে। যমুনার জলে শুধু মড়া—মড়া আর মড়া। কুয়োগুলো জেনানার লাসে ভর্তি। দেবমূর্তি ভেঙে রাস্তায় তারা গেণ্ডুয়া খেলেছে। হাজারে হাজারে—দশ বিশ ত্রিশ হাজার যুবতী মেয়ে আর জোয়ান ধরে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। কাবুল কান্দাহারে পথে হাটে হাটে গুরু-বকরি-ভেড়ীর মত এক এক মুঠো দামড়ির দামে বেচে গিয়েছে। পথের দুধারে থালা কাঁসা তামার ভাঙা বাসন ছড়িয়ে পড়ে আছে—কুড়িয়ে নেবার লোক নেই। আবদালী নিজে নিয়ে গেছে বাদশাহ ঘরের শাহজাদী। মহম্মদ শাহের বেটী—বাদশাহী রঙমহলের ফুটন্ত গোলাপ—তার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত নাকে দিয়ে ভোগ করবার জন্য টেনে নিয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। আরও নিয়ে গেছে আরফতউন্নিসকে। হায় রে নসীবের খেল, আরফতউন্নিসা—ঔরংজীব বাদশার সাক্ষাৎ প্রপৌত্রী, দেওয়ার বক্সের বেটি। তার বেটা তাইমুর নিয়ে গেছে দুসরা আলমগীর বাদশার বেটা গৌহরউন্নিসাকে। দিল্লি-হারামের আরও ষোল-ষোলটি বহু বা বেটী লুঠে নিয়ে গেছে। দিল্লির আমীরদের বাড়ির সুন্দরী বহু বেটী লুঠে নিয়ে গেছে আবদালীর পাঠান মনসবদারেরা। দিল্লি থেকে কাবুল পর্যন্ত পথের ধারে পড়ে আছে কঙ্কাল, আর আছে ভাঙা বাসন-কোসন। আরও আছে, তা খুঁজতে হয়—মাটির সঙ্গে মিশে আছে লবণাক্তস্বাদ চোখের পানি, আর স্বাদ আছে রক্তের।

গোটা হিন্দুস্থানের মধ্যে দু জায়গা ছাড়া কোথাও তলোয়ার ওঠে নি। ব্রজমণ্ডলে চৌমুহায় জাঠেরা লড়েছে ব্রজনাথের জন্য। হিন্দুপাদ-পাদশাহীর নামে মিথ্যে গৈরিক ধ্বজা বয়ে বেড়ায় আর লুঠতরাজ অত্যাচার করে বেড়ায় যে মারাঠা সে মারাঠা হঠে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, আর আট হাজার জাঠ চাষী এসে রুখল আফগানের পথ। জাঠদের দেহ মাড়িয়ে তবে ঢুকতে হবে ব্রজমণ্ডলের রাজধানী। ওদিক থেকে এল বিশ হাজার আফগান আর রোহিলা সিপাহী। সঙ্গে কামান শিভল-বন্দুক—বন্দুক। সকালবেলা থেকে পুরা নও ঘড়ি বিশ্রামহীন লড়াই। বন্দুক-কামানের শব্দ, তার সঙ্গে চিৎকার, বারুদের ধোঁয়ার সঙ্গে রক্তের গন্ধ। ন' ঘড়ির পর শবাকীর্ণ চৌমুহার প্রান্তর থেকে হাজার কয়েক জাঠ ফিরল মাথা হেঁট করে। আফগান ঢুকল ক্ষিপ্ত নেকড়ের মত। বারো হাজার মুর্দায় আচ্ছন্ন তখন চৌমুহার

প্রান্তর, আঠ পাঁচ হাজার, আফগান সাত হাজার। আফগানী সওয়ারের ঘোড়া হুঁচোট খেলে মুর্দার উপর।

ওই চৌমুহার প্রান্তরের মাটিতে প্রণাম করতে হবে, রক্তের গন্ধ স্বাদ থাকতে ওই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে।

আর মহাপুণ্যতীরথ—গোকুল।

গোকুলে আবদালী পল্টন হঠেছে—হেরেছে। হঠেছে, হেরেছে সন্ন্যাসীর কাছে। রাজা নয়, সেনাপতি নয়, পল্টন নয়, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। দেহে বর্ম নাই, চড়বার জন্য ঘোড়া নাই, আফগান আসছে শুনে ভস্মমাখা কৌপীনসার পাঁচ হাজার বীর সন্ন্যাসী তলোয়ার তীর ধনুক—কিছু বন্দুক আর চিমটা ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়াল। নাকাড়া বাজল, শিঙা বাজল, ধ্বনি উঠল: গোকুলনাথকি—! পাঁচ হাজার গলায় আওয়াজ উঠল—জয়!

তারপর এক ভীষণ সংঘাত। দুটো পাহাড় যেন জীবন্ত হয়ে উঠে মহা আক্রোশে পরস্পরের দিকে ছুটে গিয়ে পরস্পরকে আঘাত করল।

পড়ল আড়াই হাজার গোস্বামী, ওদিকে আড়াই হাজারের বেশী আফগান। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেল আফগান; মরণোল্লাসের এমন হুঙ্কার তারা শোনে নি; সমুদ্রের ঢেউয়ের পাহাড়ের উপর আছড়ে-পড়ার মত এমন আছড়ে পড়ে লড়াই দেওয়া কাজাকস্তান, খোরাসান, আফগানেস্থান—বহু স্থানে তারা লড়েছে, কিন্তু কোথাও দেখে নি।

আবদালী নিজে ফিরিয়ে নিয়েছে ফৌজ, ছোড় দো। চালায় থাকে, পরনে কৌপীন, গায়ে ছাই, ওদের কাছে কী থাকবে, ওরা বাউরার দল, ওদের ছেড়ে দিয়ে ঘোরো, সব ঘোরো। পল্টনে মহামারী লেগেছে তখন। কৃতকর্মের ফল, যমুনার জলে হাজার হাজার লাস তখন পচে উঠে জল বিষাক্ত করে তুলেছে। তার পশ্চাতে আছে দেবরোষ। হার স্বীকার করেই আফগান গোকুল থেকে ফিরে গেছে। জয় গোকুলনাথ কি—! বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মরেছে, কিন্তু গোকুলনাথ সেই আত্মোৎসর্গে হাসছেন। তিনি জেগেছেন। তিনি জেগেছেন। অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তির প্রসাদ পেতে হবে। গোকুলনাথকে প্রণাম করে ওই হাসি দেখে আসতে হবে। ওই গোস্বামীদের যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছে জেনে আসতে হবে, শেষ লগনের দেরি কত? তার আগে কী নির্দেশ? অজ্ঞাতবাসের মত আত্মগোপনের কালের আর কত বাকি! 'তামাম হিন্দুস্থানের সন্ন্যাসী এক হো যাও'—এ ফতোয়া জারি হবে কবে?

লগন আ গয়া—লগন আ গয়া—নিদ মগন রহনা নহি হ্যায়। তিনি নিজেই রচনা করে দিয়েছেন আশ্রমের সেবকদের জন্য। যাত্রা স্থগিত রাখলে তো চলবে না।

—জয় কংসারি! জয় গোকুলনাথ! না কেশবানন্দ, যাত্রা স্থগিত থাকবে না। এই অবস্থাতেই আমাকে নিয়ে চল। দেহান্তই যদি ঘটে, তবে গোকুলে সৎকার করো আমায়। ওই দেবীপক্ষের ত্রয়োদশীর দিনই যাত্রা স্থির। ওর আর অস্থির হবে না।

দূরে গ্রামে-গ্রামান্তরে বোধনের ঢাক বাজছে। অকালে মহাশক্তির আবাহন। দশভুজার পূজা। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। বাঁকা এক ফালি চাঁদ গাঢ় নীল আকাশের পশ্চিম দিগন্তে

ঘেঁষে গলা রূপার দীপ্তিতে দীপ্যমান, তার অনতিদূরেই শুক্রাচার্য মণিখণ্ডের মত ঝলমল যেন মহাকালের ললাটপট্ট দেখলেন মাধবানন্দ।

অবসাদ কেটে যাবে। চল। চল।

* * *

হরি-হর! হরি-হর! হরি-হর! কংসারি আর রুদ্র।

আবেগময় গম্ভীর কণ্ঠস্বরের ডাক গঙ্গার দুই তীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছিল। হরি-হর! হরি-হর! ক্লান্তি হোক অবসাদ হোক, যা হোক—দূরে যাক। নূতন সিদ্ধি চাই না, যদি তা না আসে

সম্মুখে যেন মনোলোকের পথের মধ্যখানে একটা রুদ্ধ সিংহদ্বার গতিরোধ করে দাঁড়ায় মাধবানন্দের। তখন আশপাশ চারিদিকে তাকিয়ে অনুভব করেন, এক পাও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হন নি। একটা দিক্‌ভ্রান্তির মধ্যে ওই রুদ্ধ সিংহদ্বারের এক পাশেই একটা চক্রাকার পথে পাক খেয়েছেন এতদিন। দুয়ার খোলে না। আঘাত করতে গেলে ওই দ্বারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না; মনে হয় শুধু গাঢ়তর অন্ধকার দিয়ে গড়া, কোন বস্তুময় লজ্জাই নেই; আঘাত করতে গেলে আঘাত কিছুকে স্পর্শ করে না, অন্ধকারের ভয় উপেক্ষা করে পা বাড়াতে গেলে তাও যায় না, যেখানে কোন-কিছুই নাই সেখানে পদস্থাপন করবেন কোথায়? শূন্যে পা বাড়ালে মানুষ পড়ে; পড়বার জন্যও স্থানের প্রয়োজন, এ যে স্থানই নাই। আলোহীন বায়ুহীন এমন কি ব্যোমসত্তাহীন নাস্তিত্ব শুধু। ভয়ে? না, এ তো ভয় নয়। আর কিছু। শূন্যতার মত একটা কিছু তাঁকে মুহূর্তে গ্রাস করে নেয়। কিছু নাই; কেউ নাই; নিজেও হারিয়ে যাচ্ছেন, ধরতে কিছু নাই, ধরবার কেউ নাই।

সব হারাচ্ছে, নিজে হারাচ্ছেন, শুধু বেদনা হারাচ্ছে না। নিজেকে মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করবার একমাত্র উপায় নিজের বুকটা চাপড়ানো। আলো তো নাই যে নিজের ছায়া দেখেও নিজের অস্তিত্ব অনুভব করবেন। পিছনের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে যান, দেখতে পান, পিছনটা তৃণহীন পুষ্পহীন প্রান্তরের মত খাঁ-খাঁ করছে। সেখানেও কেউ নাই। তাঁর এই চলে-আসা পথের দিকে কোন দুটি চোখ তাকিয়ে নাই। ফেলে-আসা কোন ঘরের চিহ্ন নাই, নিজের হাতে পোঁতা গাছ নাই, কোন নিশানা নাই কোথাও। নিজের ঝুলি খোঁজেন, সেখানে শুধু মুঠো মুঠো ছাই; যে যা জীবনে তাঁকে দিয়েছে তিনি যে তার সবই পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছেন—সেই ছাই। সব মিথ্যা সব মিথ্যা হয়ে গেছে। কিছুই পান নি তিনি। মনে শান্তি নাই, সান্ত্বনা নাই, সারা দেহে ক্লান্তি, উদরে ক্ষুধা, কণ্ঠে তৃষ্ণা, জীবনে এক বিচিত্র অস্বস্তি—যেন জ্বালা। সব মিথ্যা। কোথায় সে চৈতন্যময়? তার বস্তুময় দেহকে নিংড়ে তার সকল হবিকে নিঃশেষিত করে চৈতন্যের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, সে প্রদীপ-শিখা নাস্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। কোথায় জ্যোতির্লোক? কোথায় প্রাণময় উষ্ণমণ্ডল? তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন পিছনে ফেরবার জন্য। কিন্তু তা তো পারেন না। পঙ্গুর মত অসাড় হয়ে পড়ে থাকেন। সে অনুভূতি-অনুভবও নাস্তিত্বের মত ব্যক্ত করতে যেন পারা যায় না। বার বার তাই পুনরাবৃত্তি করে নিজেই যেন বুঝতে চেষ্টা করেন।

তারপর একদিন বাস্তবে ফেরেন। কখনও দুরন্ত ক্রোধে ফেরেন, কখনও দৈহিক আঘাত পেয়ে ফেরেন; কখনও গান শুনে ফেরেন। কখনও কখনও ফেরবার জন্য নিজের দেহে নিজে অস্ত্র দিয়ে ক্ষতসৃষ্টি করেন, কিন্তু তাতে ফল হয় না। আবার আকস্মিকভাবে কোন পাথরে হোঁচট খেয়ে অল্প আঘাতেই সচেতনায় ফিরে আসেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মোহ কাটিয়ে প্রবলতর উদ্যমে কর্মে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। উৎসব জুড়ে দেন।

অহরহই বলেন, আনন্দ্ রহো। আনন্দ্ রহো।

বন্দুক নিয়ে চাঁদমারি করেন। সমস্ত অস্ত্র বের করিয়ে নিজের সামনে সাফ করান। শিষ্যদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন। কুস্তির আখড়ায় মাটি মাখেন। তারপর গঙ্গার জলে স্নান করতে নেমে সাঁতার কেটে চলে যান গঙ্গার মাঝখানে। তারপর একদিন কেশবানন্দকে ডেকে বলেন, তলব এসেছে কেশবানন্দ। এর অর্থ কেশবানন্দ জানেন। কংসারির খাজনাখানায় খাজনা বাকি পড়েছে।

স্বপ্নাদেশে মাধবানন্দ কংসারির ভাণ্ডারে এক খাস তহবিল খুলেছেন। বৎসরে সেখানে সোনায় রূপায় নগদে বিশ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। সেই টাকা জমেই আসছে। কুরুক্ষেত্রের আয়োজন ছাড়া এ তহবিল থেকে খরচ হয় না। ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ কুঠির যে সব কর্মচারী নিজেরা গোপন ব্যবসা করে, তাদের মারফত বন্দুক বারুদ কেনা হয়। দালালি করে আরমানী বানিয়ারা। ওদিকে পাটনায়, এদিকে চন্দননগর হুগলীতে মাধবানন্দের গৃহী শিষ্যেরা কিনে পাঠায়। হুগলী কলকাতা অঞ্চলের বৈষ্ণব বণিকদের, বাংলার রুকুনপুর মালদহ রঙপুর জেমো বাঘডাঙার জমিদার থেকে বিহারের পালোয়ান সিং, স্বেতাব রায়, এমন কি রাজা রামনারায়ণ রায় প্রভৃতি বিশিষ্টদের ঘরেও মাধবানন্দের পরিচয় এবং প্রভাব পৌঁছেছে। তারা ভক্তি করে। সাহায্য করে। বিশেষ করে পূর্ণিয়ার শক্তিশালী রাজকর্মচারী অচল সিং। শুধু ধর্মজীবনেই নয়, কর্মজীবনেও সম্পর্ক আছে পরস্পরের মধ্যে। উত্তর-ভারতে অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে রাজেন্দর গিরি মহারাজ যেমন নবাব সাহেবের সকল অভিযানে ডান হাত, পাশে থেকে যেমন যুদ্ধ করেন, ততখানি ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও অনেকটা সেই ভাবেই মাধবানন্দজী এঁদের দু-তিনজনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী জায়গীরদার এবং জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে মাধবানন্দ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অস্ত্রধারণও করে থাকেন। এর জন্য যে টাকা প্রণামী পান, তাই জমা হয় কংসারির খাজাঞ্চিখানায়। বৎসরান্তে হিসাবে এই জমার পরিমাণ বিশ হাজারের কম হলে সে টাকা পূরণ করতে হয় এবং পূরণ হয় ব্যবসায়ী বা জমিদার বা জোতদারের কাছ থেকে। এর জন্য এক পৃথক সেরেস্তা আছে কংসারির কাছারিতে। এই এলাকার জমিদার জোতদার এবং বানিয়াদের অন্যায় জবরদস্তির খতিয়ান থাকে। সেই খতিয়ান দেখে তাদের উপর জরিমানা হয়। এবং একদিন সশিষ্য বেরিয়ে পড়েন এই জরিমানা আদায়ের জন্য।

'হরি-হর' 'হরি-হর' ধ্বনি ওঠে। ধ্বজা ওড়ে, পতাকা ওড়ে, ঘোড়া বয়েল গাড়ি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বের হন। দণ্ডিত জমিদার জায়গীরদারের এলাকায় গিয়ে বসেন। সাধারণ প্রজা গৃহস্থদের বাদ দিয়ে তহশীল কাছারি অধিকার করে তহবিল বাজেয়াপ্ত করেন। সাধারণ

লোককে দিতে হয় সিধা—চাল-আটা-ঘি-সবজী-দুধ। যেখানে যে কদিন তাঁবু পড়ে সে কদিন গ্রামের সমস্ত ঘরে অরন্ধন; ভাণ্ডারা খুলে দেন মাধবানন্দজী। মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ হলে জরিমানার পরিমাণ বাড়ে। মাধবানন্দ আজও কোন ঠাঁই থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরেন নি। ফিরে এসে মাধবানন্দ লুটিয়ে পড়েন কংসারি এবং রুদ্রের সম্মুখে।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

জয় কংসারি! আনন্দ রাখো। আনন্দ রাখো।

কেশবানন্দকে ডেকে বলেন, খুলে দাও ভাণ্ডারা। ভাণ্ডারা খোলা হয়। ঢেঁড়া পড়ে—ভাণ্ডারা! কংসারির প্রসাদ নেবে এস। অবারিত দ্বার। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। পরিতৃপ্তি করে খেয়ে তারা ধ্বনি দেয়, জয় হরি-হর! জয় কংসারি! জয় গুরু মহারাজ!

—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! বলে হাত তুলে মাধবানন্দ গ্রহণমুক্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন। এই বারো বছর এমনি ভাবে জীবনে চলেছে গ্রহণ এবং গ্রহণমুক্তি। আবার লাগে গ্রহণ।

* * *

নৌকোয় ছইয়ের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন মাধবানন্দ। হাতে একখানা ছুরি। বুকে একটা সদ্য ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেদনার যন্ত্রণায় অনেক সময় এই অবস্থার কাটে, তাই নিজের হাতেই ক্ষতটার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও জাগ্রত চৈতন্য ফিরছে না। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, তপস্যা মিথ্যা, সিদ্ধি মিথ্যা—সব মিথ্যা। নাস্তিত্বের মধ্যে সব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই আঘাতের যন্ত্রণাতেও মন জাগ্রত হচ্ছে না। অতি কষ্টে চোখ ফেলছেন, সে চোখ আবার বন্ধ হয়ে আসছে। ছেলেবেলায় এক সাপের ওঝার কাছে এই পদ্ধতি শিখেছিলেন। তাকে গোখুরায় কামড়েছিল; সে নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছিল। দেখেছিলেন সামনে একটা জলন্ত অঙ্গারের কড়াই রেখে কতকগুলো আধখানা-করা কেলেকোঁড়া ফল শিকে বিঁধিয়ে তেল মাখিয়ে ওই আগুনে গরম করে তাই দিয়ে বুকে ছ্যাঁকা নিচ্ছিল। বিষের আচ্ছন্নতায় চেতনা নিবে-আসা প্রদীপের মত স্তিমিত হয়ে আসতে আসতে আবার যেন জলে উঠছে। ওই ছ্যাঁকার যন্ত্রণায় চমকে উঠে আবার কিছুক্ষণের জন্য বিষের প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করছে। সে বেঁচেছিল এতে। মাধবানন্দও তা করেন। ফলও পান কিছু। কিন্তু এবার যেন এ বিষের প্রভাবে মৃত্যুর গাঢ়তা। যন্ত্রণাও তার মনকে চেতনাকে চকিত করতে পারছে না। অন্তর চিৎকার করছে, এ গ্রহণ থেকে মুক্তি দাও। নয়, মৃত্যু দাও।

নৌকো চলেছে, আশ্বিনশেষের ভরা গঙ্গা। দু পাশের তীরভূমি বর্ষান্তে মহালক্ষ্মীর সস্নেহ অঞ্চলের মত পুষ্পে ফলে পল্লবে পত্রে সমৃদ্ধ; বর্ণ তার কিছু স্বর্ণবর্ণ, বাকিটা ঘন সবুজ। আশু ধানের ক্ষেতগুলি সোনার বরণ পাকা ফসলে ভরা; হৈমন্তী ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দিগন্ত পর্যন্ত গাঢ় সবুজ ধানের শীষগুলি সদ্য সদ্য বের হচ্ছে; ওরই ওপর দিয়ে বয়ে আসছে বাতাস,

ধানগুলি তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত দোলা খাচ্ছে ; বাতাসের সর্বাঙ্গে ধানের শীষে শীষে যে শ্বেতকণিকার মত ধান্যপুষ্প তারই গন্ধ ; বাসমতী, গোবিন্দভোগ, কনকচূর, খুদিখাসা প্রভৃতি সুগন্ধি ধানের চাষ যেখানে, সেখানে বাতাস যেন নারায়ণ-মন্দিরে অর্ঘ্যবাহিনী লক্ষ্মীর অর্ঘ্যথালিকা-বাহিকা সংচরীর মত মধুর পবিত্র। তটে তটে দিয়ার ভূমি জাগতে শুরু করেছে। গঙ্গার জল শুভ্র, এখনও স্বচ্ছ হয় নি। বহর চলেছে কখনও পাল তুলে, কখনও গুণ টেনে। উজানে যাত্রা। কোন নৌকোয় সেবকেরা ভজন গাইছে। কোন নৌকোয় শাস্ত্রপাঠ হচ্ছে। কোন নৌকোয় দেবতার পূজা-ভোগের আয়োজন চলছে। একটি নৌকোয় কেশবানন্দ শ্যামানন্দ প্রভৃতি প্রধানেরা আলোচনা করছেন। মাধবানন্দের নৌকোয় মাধবানন্দ বসে আছেন স্তব্ধ হয়ে ; তাঁর সেবার জন্য দুজন সেবক বাইরে বসে আছে। দীর্ঘ ধ্বজদণ্ডে ধ্বজা উড়ছে ; ধ্বজদণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পর্যবেক্ষক।

গঙ্গায় এই সময় থেকেই নৌকোর ভিড় বেশী। বর্ষার প্রবল স্রোত বন্যা ঝড় প্রভৃতির কাল চলে গেল। এইবার ভীমাভয়ঙ্করী হবেন বরদা প্রসন্নময়ী। প্রাচীনযুগে এই সময়েই নদীপথে রাজারা বের হতেন দিগ্বিজয়ে। আজ দিগ্বিজয়ের দিন নাই কিন্তু বণিকেরা আজ বের হয় বাণিজ্যে ; পুণ্যকামীরা বের হয় তীর্থদর্শনে। এই সময় থেকেই শুরু হয় মেলার। এই তো শোনপুর হরিহরছত্রে রাস-পূর্ণিমায় মেলার আরম্ভ, মেলা শেষ আষাঢ়ে রথযাত্রায় নীলাচলে। কিন্তু এবার গঙ্গার বুকে নৌকোর ভিড় নাই। ঘাটগুলি ফাঁকা। স্থানীয় এ-ঘাট ও-ঘাট, এপার ও-পার যাওয়ার নৌকো ছাড়া লম্বা-পাড়ির নৌকো বড় দেখা যায় না। লম্বা পাড়ির নৌকোর একটা আলাদা গড়ন আছে, যাওয়ার ভঙ্গির মধ্যেও বিশেষ ঢঙ আছে। লম্বাপাড়ির নৌকোর মধ্যে দু তিন দফায় ইংরেজ কিরিঙ্গীদের নৌকো এবং দফা নবাবী নৌকোর ছোট বহর ছাড়া আর কোনও বহর দেখা যায় নি।

পলাশীর যুদ্ধের পর এখনও চার মাস পুরো হয় নি। পলাশীর পাপের জেরই এখনও মেটে নি। মীরন এখনও অবাধে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নানান স্থানে নানান আয়োজনের গুজব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। উৎকণ্ঠায় মীরজাফর আফিংয়ের মাত্রা চড়িয়েছে। খাস মুর্শিদাবাদ শহরে রাজা দুর্লভরাম নাকি হিন্দু আমীরদের নিয়ে জোট পাকাচ্ছে। আলিবর্দী বেগম সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র বালক মির্জা মেহেদীকে খাড়া করে মসনদ দখলের চেষ্টায় আছেন। ঢাকার এক দল নবাব সরফরাজের দ্বিতীয় পুত্র আমানী খাঁকে নবাব করবার জল্পনা-কল্পনা করছে। পাটনায় রাজা রামনারায়ণ রায় আজও মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করেননি। ফরাসী জাঁদরেল মসিয়ে ল' বাংলায় আসতে আসতে পলাশীর খবর পেয়ে পথ থেকে ফিরে গিয়ে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ক্লাইভের হুকুমে গোরা সিপাই আর তেলেঙ্গী পল্টন আজ এখানে কাল ওখানে ছুটোছুটি করছে। পূর্ণিয়ার অচল সিং নবাবী প্রভুত্ব অস্বীকার করে মাথা চাড়া দেবার আয়োজন করছে। গোটা দেশটায় যেন থমথমে ভাব। কেউ ঘর থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। গঙ্গাই শুধু তার আপন গতিতে চিরকালের ধারায় যেমন চলেন তেমনি চলেছেন। কিন্তু কলকল্লোলে কি সেই একই কথা ? না অন্যকথা বলছেন ? মাধবানন্দের মনে হচ্ছে, সেই একই কথা বলছেন। কথাই নয়, অর্থহীন ধ্বনি,

শুধু গতিশীল জলস্রোতের শব্দ। ভাবতে ভাবতে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি। ধ্বনিময়ী গতিময়ী গঙ্গাও যেন ওই অন্ধকার নাস্তিত্বের মধ্যে মিশে যাচ্ছেন। অর্থহীন—সব অর্থহীন।

অকস্মাৎ নৌকোর গতি মন্থর হল। বাইরে কেশবানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত বিশ্রামের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট কোন ঘাট এসেছে—কোন গঞ্জ। এখানে একদিন বিশ্রাম করে আবার যাত্রা শুরু হবে। এখানে মঠের শিষ্য সেবক ভক্ত আছে। তারা আসবে, প্রণামী দেবে। প্রণাম করবে। কিন্তু কোন্ ঘাট? রাজমহল, শকরিগলিঘাট পার হয়ে এসেছে নৌকো। তারপর বিশ্রামের কথা সুলতানগঞ্জে। গৈবীনাথ দর্শন করে মুঙ্গেরে গিয়ে বিশ্রাম। তা হলে সুলতানগঞ্জ এল?

ঠিক এই মুহূর্তেই শিঙা বেজে উঠল।

শিঙাধ্বনিতে সংকেত জানানো হচ্ছে, নৌকোর গতি সংযত কর। হুঁশিয়ার, রোখ্ না হ্যায়। রোখ্ না হ্যায়! না, তা হলে রাজমহল নয়। কোন নৌকোতে কোন একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ সংকেত তীরে ভিড়াবার নয়; এ সংকেত দুর্ঘটনার জন্য নৌকোগুলিকে হুঁশিয়ারের সঙ্গে গতিরোধ করবার সংকেত। দুর্ঘটনা! কী দুর্ঘটনা? হয়তো কেউ জলে পড়েছে। হয়তো কোন নৌকো বিপন্ন হয়েছে। হলেই হল। অর্থহীন ধ্বংস সৃষ্টির নিয়ম। একটু বিষণ্ণ হাসি তাঁর মুখে দেখা দিল। কিন্তু সে হাসি পরমুহূর্তেই বিলুপ্ত হয়ে গেল, নৌকোখানা অকস্মাৎ দুলে উঠল—কেউ বা কিছু লাফ দিয়ে যেন পড়ল নৌকোর উপর। অসতর্ক মাধবানন্দ নৌকোর ছইয়ের গায়ে আছাড়ে পড়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আকস্মিক আঘাতে তিনি বিরক্তি এবং ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন, আঃ!

—কে মূর্খ? কৌন্ মুরখ? বলে উদ্যত ক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন।

সেই মুহূর্তেই বাইরে উদ্ধত ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কে বলে উঠল, রোখো নায়। কাঁহা হ্যায় উ বেইমান কাফের ফকির?

মুহূর্তে মাধবানন্দের ক্রুদ্ধ অন্তরাত্মা ঊর্ধ্ব আকাশে উদাস পরিক্রমায় সঞ্চরমাণ চিলের পাখা গুটিয়ে পৃথিবীর বুকে এক মুহূর্তে নেমে পড়ার মত ছোঁ দিয়ে নেমে এল। তিনি তুলে নিলেন পাশে-রাখা তরোয়ালখানা। দরজার মুখে সেই ক্ষণটিতেই দেখা দিল এক দীর্ঘকায় পাঠান। সেই মুহূর্তেই আবার নৌকোখানা দুলে উঠল, আবার কেউ লাফিয়ে পড়েছে নৌকোর উপর। সেই দোলায় দরজার মুখে পা হড়কে পাঠান পড়ে গেল। মাধবানন্দ ফিরেছেন, দুরন্ত ক্রোধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সুযোগ উপেক্ষা করলেন না। লাফ দিয়ে তার বুকের উপর পড়ে তরোয়ালের অগ্রভাগ সজোরে বিদ্ধ করে দিলেন। বাইরে বন্দুক গর্জে উঠল। কেউ একজন পড়ল নৌকোর পাটাতনের উপর। মাধবানন্দ বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, পাশেই একখানা ছিপ। ছিপ থেকে নবাবী কোতোয়ালী জমাদার চৌকিদার নৌকোয় উঠবার চেষ্টা করছে। কিছু দূরে আরও দুখানা ছিপ। এপাশে তাঁর নৌকোর বহরের দুখানার উপর সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ন্যাসীর দল, হাতে বন্দুক তীর ধনুক সড়কি। নেতৃত্ব করেছেন কেশবানন্দ। পাটাতনের উপর গুলি খেয়ে পড়েছে তাঁরই একজন সেবক। মাধবানন্দ জ্বলে উঠলেন বৈশাখের আগুনের মত।

ছিপে নবাবী সিপাহীদের একজন বন্দুক গাদছে, একজন তুলছে ; মুহূর্তে তিনি চিৎকার করে তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাশের ছিপটায়। হরি-হর! হরি-হর! লগন আ গয়া।

হ্যাঁ, লগ্ন এবার সত্যই এসেছে। নবাবী শক্তির সঙ্গে এই প্রথম সংঘর্ষ। সামনের জমাদারটার মাথার উপর পড়ল তাঁর উদ্যত তরবারি। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা নিষ্ঠুর আঘাত অনুভব করলেন। বন্দুকের গুলি! আঃ! সেই নাস্তিত্ব, মানসলোক-দর্শন-করা সেই বিচিত্র সত্তা আজ বাস্তবে দিবালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে আসছে। এক কৃষ্ণ-অবগুণ্ঠনাবৃতা রহস্যময়ী—তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু নিদারুণ হতাশার আতঙ্কের মত ঝাপসা—তার আঁচল দিয়ে সব কিছু মুছে দিচ্ছে। দ্যুলোক ভূলোক দুলছে, উল্টে যাচ্ছে।

টলে তিনি জলে পড়ে গেলেন। বন্দুকের শব্দ উঠল, বহুদূরে যুদ্ধক্ষেত্রের শব্দের মত।

গঙ্গার জলস্রোতের মধ্যে রহস্যময়ী যেন কায়া গ্রহণ করছে—বর্ণহীন গন্ধহীন শব্দহীন গতিহীন নাস্তিত্ব। স্পর্শও নেই। গঙ্গার জলের শীতলতাও নেই ; স্পর্শাতীত হয়ে বিলুপ্তিতে মিশিয়ে যাচ্ছে।

* * *

না, তারপরও তো রয়েছে। অমৃতলোক।

কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ উঠছে। তাঁকে ঘিরে মৃদু প্রসন্ন প্রদীপের আলো এবং মধুর ধূপগন্ধ। তারই সঙ্গে ললাটে একটি স্নিগ্ধ কোমল শীতল স্পর্শও অনুভব করলেন। মাথার শিয়রের দিকে চেয়ে তিনি শিউরে উঠলেন, ঠিক তাঁর কল্পনার মত একটি মূর্তি। কালো কাপড় পরা একটি মূর্তি তাঁর মুখের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু সে মুখ ঘন এলোচুলের রাশিতে ঢাকা। কালো চুলের ডগাগুলি তাঁর কপালের উপর ঝুলছে, যেন স্পর্শও করছে। এ কি সেই ?

এ সবই যেন স্বল্প কয়টি মুহূর্তের জন্য। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার সেই নাস্তিত্ব তাঁকে চারিদিক থেকে বৃত্তাকারে ঘিরে চৈতন্যমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে নিরন্ধ্র হয়ে মিলিত হল।

নীলাম্বরী-পরা রূপসী একটি মাধবানন্দের শিয়রে বসেছিল। সে-ই ঝুঁকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল একাগ্র দৃষ্টিতে। বারেকের জন্য মাধবানন্দের চোখ-মেলে-চাওয়া তার একাগ্র দৃষ্টি এড়ায় নি। মাধবানন্দ আবার চোখ বুজতেই সে ধীরে ধীরে মাধবানন্দের হাতখানি টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে। তারপর হাতখানি সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে পাশের ত্রিপদী থেকে খল নুড়ি ওষুধ নিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে আঙুল দিয়ে জিভে লাগিয়ে দিলে। তারপর কয়েক ঝিনুক দুধ ফোঁটা ফোঁটা করে খাইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে যেন মেয়েটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হল। বসে ছিল, মুখের উপর চুলের ছায়া পড়েছিল, তাই আকারে অবয়বে অনবগুণ্ঠিত মুখের মাধুর্য ও ব্যঞ্জনা যেন অর্ধ-অপ্রকাশিত ছিল।

মেয়েটি অপরূপা। কিশোরী অথবা যুবতী বুঝা যায় না। কৈশোর-যৌবনের সঙ্গমে স্নান করে উঠেছে যেন ; এ মেয়ে সেই মেয়ে, যারা চির-কিশোরী চিরযুবতী, একাধারে দুই। মুখে আশ্চর্য একটি দ্যুতি! সুকোমল সারল্যের মাধুর্য, বর্ষাসন্ধ্যায় অর্ধবিকশিত জুঁইফুলে-

ভরা জুঁইলতার মত শুভ্র নিষ্কলুষতায় প্রসন্ন এবং পবিত্র।

মেয়েটি উঠে লঘুপদক্ষেপে ঘরের বাইরে এল। বাইরে বসেছিল মাধবানন্দেরই সেবক প্রৌঢ় গোকুলানন্দ। তাকে বললে, এখন তুমি গিয়ে বোস। ভাল আছেন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। অঘোরে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবেন। সে চলে গেল। গোকুলানন্দ শিয়রে গিয়ে বসল।

মাধবানন্দ আহত হয়ে জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। উত্তর-ভারতে যমুনার তটভূমির এক গ্রামে তার জন্ম; তাদের বংশগত পেশা নৌকো চালনা। আগ্রার উত্তরে গাঁওঘাটে খেয়া নৌকো চালাত। গাঁওঘাট বিখ্যাত খেয়াঘাট।

বাদশা মহম্মদ শার সিপাহীরা তার বাপকে খুড়োকে কেটেছিল। মহম্মদ শা তখন বাদশা নয়, তখন ছিল শাজাদা রৌশন আখতার, আসছিল বাদশা হতে। দিল্লি থেকে বজরা নিয়ে আসছিল ফতেপুরসিক্রী। পুরনো বাদশাকে সৈয়দ উজীর আর তার ভাই খুন করে তার লাশ গায়েব করে রেখেছে। নূতন বাদশা তক্তে বসিয়ে তবে ঢেঁঢ়া দেবে, পুরনো বাদশার ইন্তেকাল হয়েছে। তবে সইছে না। বাদশাহী বজরার সামনে পড়েছিল তার বাপের নৌকো। পথ ছাড়তে দেরি হয়েছিল। বাদশাহী কালাপোশ সিপাহী গুলি চালিয়ে নৌকো ডুবিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, তার বাপ এবং খুড়ো ভেসে উঠে সাঁতার দিতে শুরু করলে তাদেরও গুলি করে মেরেছিল। সে নৌকোতে গোকুলানন্দও ছিল; সে তখন বিশ বছরের নওজোয়ান। তার দম ছিল বহুত। ছেলেবেলা থেকে যমুনায় গাঁওঘাট থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত যেখানে কেউ একটা দামড়ি ফেলেছে জলে, সেইখানে ডুব মেরে সে দামড়ি তুলে এনেছে। সে ডুব-সাঁতার কেটে অনেক দূর গিয়ে উঠেছিল এক গাঁয়ে। সেখান থেকে কয়েক দিন পর ঘরে ফিরে আর ঘর পায় নি। শুধু ঘর নয়, মা বহিন তার সত্ত-সাদী-করা বহু কাউকে পায় নি। সেই থেকে সে বেরিয়েছে পথে। খুঁজতে বেরিয়েছিল সকল খেয়ামাঝির সেরা সর্দার মাঝিকে, যে সারা দুনিয়ার বাদশা থেকে ফকির—তামাম লোককে এপার থেকে ওপারে পার করে।

কতজনকে গুরু ধরে কত মঠ ঘুরে শেষে এসেছিল মাধবানন্দের আশ্রমে। মাধবানন্দের সাধনা, তাঁর সিদ্ধি, তাঁর শক্তি দেখে সে নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছে—সে পাবে, যাকে খুঁজছে তাকে সে পাবে। শুধু তাই নয়, গরীবের উপর অত্যাচার, আমীর-ওমরাওদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে মাধবানন্দের লড়াই দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল, একদিন-না-একদিন যে কালাপোশ দুজন গুলি ছুঁড়ে তার বাপ-খুড়োকে মেরেছে তাদের এবং যে বাদশার জন্য তার বাপ খুড়ো নৌকো ঘরবাড়ি মা বহিন বহু সব গিয়েছে, তারও সঙ্গে একদিন মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে। সেই দিন-দুনিয়ার খেয়ামাঝির বাদশাহের দরবারে সেদিন সে ফরিয়াদ করবে। গুরু তার উকিল। সে সেই গুরুকে পড়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর অচেতন দেহখানা নিয়ে জলের তলেই উজানের বদলে ভাটির টানের সঙ্গে সাঁতারের টান মিলিয়ে বন্দুকের এলাকার বাইরে গিয়ে ভেসে উঠে কিনারায় পৌঁছেছে। তারপর কংসারির দয়া, গুরু মহারাজের সসীম পুণ্যবল, সেই ঘাটেই সন্ধ্যায় স্নান করতে এসেছিলে এই ভক্তিমতী বাঁশরীওয়ালী

প্যারেবাঈ। লোকে বলে, বাঁশরীওয়ালী প্যারেবাঈ বাঁশরী বাজায় আর বৈকুণ্ঠধামে নন্দলালা আকুল হয়ে ওঠেন। নেমে আসতে হয় তাঁকে।

আরও খবর মিলেছে। প্যারেবাঈ সব খবর যোগাড় করেছে। মঠের নৌকোগুলোর তিন-চারখানা ডুবেছে। বাকী সব ভেসে চলে গেছে ভাটিতে। নবাবী ছিপ একখানা ফিরেছে, বাকী কখানা খতম। সন্ন্যাসীরা নবাবী ছিপ হটিয়ে কিনারায় উঠে নৌকো ছেড়ে দিয়ে পয়দলে পাহাড়-জঙ্গলের পথে লুকিয়ে পড়েছে। তারা কোন্ মুখে কোন্ পথে চলেছে তার খবর ঠিক মেলে নি, কিন্তু তারা গঙ্গায় কিনারা ধরে হাঁটছে না এটা বিলকুল ঠিক। কেশবানন্দজী বেওকুফ নন। সামনে মুঙ্গের পর্যন্ত এবং পিছনে রাজমহল পর্যন্ত প্রত্যেক নবাবী থানা-ঘাঁটি হুঁশিয়ারী নজর রেখেছে গঙ্গার বুকের উপর এবং গঙ্গার দুই পারের পথঘাটের উপর। কংসারির সেবকদের পাকড়াও করবার হুকুম জারি হয়েছে। আশ্রম ছেড়ে যাত্রা করে উজান ঠেলে এই পর্যন্ত আসতে যে সময় লেগেছে তারই মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। খবর তাঁরা পান নি। পূর্ণিয়ায় অচল সিং গুরু মহারাজের ভক্ত শিষ্য। তিন-চার দফায় অচল সিংয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে গুরু মহারাজ পূর্ণিয়ার আশেপাশের জায়গীরদার জমিদারের 'পাপ করমে'র জন্য জরিমানা আদায় করে ভগবানের খাজাঞ্চীখানায় খাজনা দাখিল করেছেন। এই খবর ছাপি নেই। কিন্তু তখন নবাবী দরবারের খাজনা দাখিল করলেই সব মিটে গেছে। এবার অচল সিং গুরুর হুকুম অমান্য করে 'হঠকরী'র কাজ করে নিজে ডুবেছে, গুরুকে গুজবে ডুবিয়েছে। মীরজাফরের বিরুদ্ধে চারিদিকে নানান্ গুজব। অসন্তোষ সারা বাংলা জুড়ে। সব থেকে অসহ্য হয়েছে নূতন নবাবজাদা মীরনের অত্যাচার। অচল সিং গুরুর আদেশ অমান্য করে হাজির আলি মনসবদারকে নিয়ে পূর্ণিয়ার নূতন ফৌজদার মীরজাফরের দলের লোক মোহন সিংয়ের বেটা সোহন সিংকে হটিয়ে ফৌজদার হয়ে বসে ফতোয়া জারি করেছে—খাজনা দেবে সে তাকেই, যে বাদশালের কাছে সুবেদারী ফরমান পাবে। আলিবর্দী-বেগম বালক মির্জা মেহেদীর জন্য ফরমানের চেষ্টা করছেন—এ গুজব চারিদিকে ছড়িয়েছে। ওদিকে পাটনায় রাজা রামনারায়ণের হাবভাব ভাল নয়। অযোধ্যার নবাব নাকি আসছে মঁসিয়ে ল'কে নিয়ে বিহার দখল করতে। মীরজাফর আর থাকতে পারেন নি। এসে হাজির হয়েছেন রাজমহলে। ওদিকে মীরন বাচ্চা ছেলে মীর্জা মেহেদীকে খুন করেছে। কেউ বলছে, সিরাজ নবাবের মা আমেনা বেগমকে নৌকো সমেত জলে ডুবিয়েছে। ক্লাইভ আসছে কলকাতা থেকে। মীরজাফরের সঙ্গে যাবে বেহার। রাজমহলে নবাব মীরজাফর তার পেয়ারের লোক খাদেম হোসেনকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার দিয়ে অচল সিংয়ের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছে। রাজমহল থেকে শকরিগলিঘাটে পৌছে খাদেম হোসেন পাকড়াও করে অচল সিংয়ের এক লোককে। এই লোককে অচল সিং পাঠিয়েছিল গুরু মহারাজের কাছে। সে অনুনয় করেছিল গুরুকে। এ সময় কুম্ভে না গিয়ে তার এই লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্য আরজি করেছিল। দুর্ভাগ্য অচল সিংয়ের, এবং শিষ্যের দুর্ভাগ্য গুরুর দুর্ভাগ্য। লোক পথে অসুস্থ হয়ে দেরি করেছে, মাধবানন্দ শকরিগলি আসবার সময় বরাবর পৌছতে পারে নি।

মঠের নৌকো শকরিগলি ছাড়বার চার দিন পর এসে পৌছেছে। চিঠি পড়েছে খাদেম হোসেনের হাতে। খাদেম হোসেন সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছিল ছিপ। খাদেম হোসেনের হুকুম ছিল বরাবর মুঙ্গের যাবার। সেখানে কেল্লা থেকে লোক লস্কর পল্টন নিয়ে চারিপাশে ঘিরে নবাবজাদা এই হিন্দু ফকিরদের গ্রেপ্তার করে নবাবজাদা মীরনের কাছে পাঠাবে। না পার, তামাম ফকিরকে গুলি করে মেরে রাস্তার গাছে লটকে রাখবে। কিন্তু দারোগা বাহাদুরি আর ইনাম পাবার লোভে পথের মধ্যে নিরস্ত্র সন্ন্যাসী দেখে আক্রমণ করবার লোভ সামলাতে পারে নি।

রক্ষা করেছেন দিনদুনিয়ার মালিক, সকল রাজার রাজা, সব বাদশাহের বাদশাহ ভগবান কংসারি আর গুরু মহারাজের তপস্যা। ব্রজনাথ, নন্দলাল, কিষণলালার সাক্ষাৎ সেবিকার মত এই বাঁশরীওয়ালী প্যারে গোসাঁইন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির ছিল গুরু গোসাঁইয়ের জন্য। গোকুলানন্দ জানে, বাঁশরীওয়ালী মুখে স্বীকার করুক আর নাই করুক, এর জন্য ইশারা সে পেয়েছিল, সে সাক্ষাতেই হোক আর স্বপ্নেই হোক।

মান্দারে মধুসূদন। সেই মান্দার পাহাড়ে বাঁশরীওয়ালী প্যারের রাধাগোবিন্দজীর মঠ।

পৌষ-সংক্রান্তিতে মান্দারে মধুসূদনজীর বাৎসরিক পর্ব। সামনে রাসপূর্ণিমায় রাধাগোবিন্দজীর রাসযাত্রা। সে সব রেখে সে বের হয়েছিল তীর্থ-পরিক্রমায়; রাসপূর্ণিমায় শোনপুর গণ্ডক গঙ্গা আর শোনসঙ্গমে স্নান করে হরিহরনাথের উপর জল চড়াবে, ভজন শোনাবে, তারপর যাবে পূর্ণকুম্ভে প্রয়াগধামে। সেখানে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে স্নান করে সেই জল নিয়ে যাবে বৃন্দাবন গোকুলে। তার তপস্যার ষোল বছর পূর্ণ হয়েছে এবার। সেই জন্য চলেছিল সে ভাগলপুর হয়ে সড়ক ধরে সুলতানগঞ্জ। সেখানে স্নান সেরে মুঙ্গেরে গিয়ে নৌকা নেবার কথা। পথে সন্ধ্যার মুখে রাত্রের জন্য ডেরা ফেলে বাঁশরীওয়ালী এসেছিল গঙ্গার ঘাটে সাঁঝের স্নান করতে। গোকুলানন্দ গুরুর অচেতন দেহ নিয়ে ঘাটের কাছেই একটা গাছের বেরিয়ে পড়া শিকড় ধরে হাঁপাচ্ছিল। দাঁড়াবার ক্ষমতাও ছিল না। বাঁশরীওয়ালী সেই ক্ষণটিতে ডুব দিয়ে উঠেছিল ঠিক গঙ্গা থেকে ওঠা কোন দেবীর মত। গোকুলানন্দ চিৎকার করে উঠেছিল, বাঁচাও, মাতাজী, বাঁচাও।

বাঁশরীওয়ালীর লোকজন ছিল ঘাটের উপরেই। বাঁশরীওয়ালীর ডাকে তারা ছুটে এসে তুলেছিল তাদের দুজনকে। আঃ, বাঁশরীওয়ালী সাক্ষাৎ দেবী। ঘাটের উপর গুরু মহারাজের অচেতন দেহ দেখে সে কী করুণা! ধীরে ধীরে দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে তার সে কী নিঃশব্দ রোদন!

* * * •

"জয় রাধারাণী! জয় রাধারাণী! শ্যামপিয়ারী, তোমার হুকুম আর বাঁশরীওয়ালীর নসীব!"

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গুরু মহারাজের অবস্থা নিজে পরখ করে দেখেছিল বাঁশরীওয়ালী, অনেক ওষুধ জানে, নাড়ী দেখতে জানে। নিজে দেখে ওই গাঁয়ের কাছের একজন কবিরাজকে ডেকে দেখিয়ে বলেছিল, ফেরো, মুঙ্গের না, চল মান্দার।

সঙ্গের লোকজন বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ বাঁশরীওয়ালীর ছিল না। হুকুম রাধারাণীর আর নসীব বাঁশরীওয়ালীর আর গুরু মহারাজের প্রাক্তন—গোকুলানন্দ ভেবে দেখেছে, এ যেন 'ত্রিবেণী'র টান। লোকের বুঝবার ক্ষমতা নেই ; আর না বুঝে তাদের বিস্ময় হলেই বা কার কী যায়-আসে, দুনিয়ারও আসে-যায় না, বাঁশরীওয়ালীর তো নয়ই। এবং বাঁশরীওয়ালীর যা ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কেন, কী জন্য—এ নিয়ে তকরার বাঁশরীওয়ালীর লোকজনের মধ্যে নাই।

বাঁশরীওয়ালী কাঁদে, বাঁশরীওয়ালী বংশী বাজায় রাধা-গোবিন্দজীর সামনে, বাঁশরীওয়ালী ভজন গায়, বাঁশরীওয়ালী নাচে ; বাঁশরীওয়ালী ধুলোয় গড়াগড়ি দেয় ; বাঁশরীওয়ালী এক-একদিন ভিখ মাগতে বের হয়, কোনদিন বাঁশরীওয়ালী মনোহর সজ্জায় সাজে, সে সজ্জা খুলে বিলকুল বিলিয়ে দেয় ; কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। জিজ্ঞাসা করলে ছোট্ট এতটুকু একটু হাসি, জোনাকির আলোর মতই জ্বলে উঠে নিবে যায়। ওতেই জবাব হয়ে যায়। জবাব মানে তো মনের অস্বস্তি অখুশী ভাব, তা ওতেই মন খুশী হয়ে যায়, সব খুঁতখুঁতি মিটে যায়। বাঁশরীওয়ালীর সব হয় রাধাগোবিনজীর ইশারায়। ও জিজ্ঞাসা করতে নেই ; ও বলতে নেই, শুনতে নেই।

সেই রাত্রেই বাঁশরীওয়ালীর কথামত গুরুকে ডুলিতে চাপিয়ে পনের কোশ পথ এসে এই মঠে এসেছে। আজ আট দিন। আট দিন গুরু মহারাজ বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। পুজার সময় ছাড়া সব সময় মাথার শিয়রে বসে আছে বাঁশরীওয়ালী। শহর থেকে বড় কবিরাজ এসেছিল। তার কাছ থেকে সব বুঝে নিয়েছে বাঁশরীওয়ালী নিজে।

আজ বাঁশরীওয়ালী বলে গেল, চোখ মেলে চেয়েছেন, শোর হয়েছিল গুরু মহারাজের। বাঁশরীওয়ালী আরতির জন্য গেল। আরতির পর বাঁশরীওয়ালীর ভজন। সারা গাঁয়ের লোক বসবে। বাঁশরীওয়ালী বংশী বাজাবে, ভজন গাইবে, নাচবে রাধারাণী-কিষণলাল মহারাজের সামনে।

ওই তো বংশী বাজছে। কাঁদছে, মুরলী কাঁদছে। চোখের জল আসছে গোকুলানন্দের। বাংলা দেশে সে এ সুর অনেক শুনেছে। কীর্তন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মাধবানন্দ।

গোকুলানন্দ সন্তর্পণে একটু ঝুঁকে তাঁর মুখের দিকে তাকালে। না, জাগেন নি। ঘুমের ঘোরেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন! বেহুঁশের মধ্যেও একটা হুঁশ থাকে, সেই হুঁশের কুঠরির ভিতর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে এই বংশীর সুর।

শেষ-কার্তিকের হিমের রাত্রি, ঠাণ্ডা আসছে জানলা দিয়ে। সুরও আসছে ওই পথে। গোকুলানন্দ উঠে গেল জানলাটা বন্ধ করবার জন্য। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বলে দিয়েছে বাঁশরীওয়ালী, কবিরাজও বলে গেছে—এই অবস্থায় ঠাণ্ডাকে সাবধান। সর্দি হলে বহুত মুশকিল হবে ; বুকে সর্দি বসলে কাশি হবে, জ্বর আসবে। হুঁশিয়ার!

জানলা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বাঁশরী বন্ধ হয়ে সারেঙ্গী বাজছে মন্দিরা বাজছে, ঠিনি-ঠিনি ; এইবার গাইবে বাঁশরী-

ওয়ালী প্যারে। বাইরে চাঁদনী ঝলমল করছে। সামনে কদিন পরে রাধারাণী আর ব্রজবালাদের নিয়ে কানাহিয়ালালের রাস-দরবার বসবে; মলমলের ফরাস বিছানো হচ্ছে, মসলিনের ঝালর ঝুলাচ্ছে, নীলমণি দিয়ে মোড়া দরবারের ছাদটাকে দুধ দিয়ে মাজাঘষা হচ্ছে, চন্দ্রকান্তমণির বাতির ডোমটাকে মুছে সাফা করছে, আর একদিকের আঙুল-দুই জায়গায় কালি পড়ে আছে, ওইটুকু মোছা হলেই—বাস, সুগোল হয়ে একটা জলন্ত নিটোল মুক্তার মত টলমলে হয়ে উঠবে। শীত আসছে; কোকিল-পাপিয়াগুলোর গলায় সর্দি জমবে; এই রাস-দরবারে তারা গীত গেয়ে গোটা শীতের মত গান বন্ধ করবে; সেই রাস-দরবারে গানের মহড়া দিচ্ছে। একটা কোকিল হঠাৎ কু-কু-কু করে ডেকে উঠল।

নাচত নাগররাজ
ঝমর ঝমর ঝম; ঝমর ঝমর ঝম;
রাসরস-রাজিয়া, পীতপট সাজ।
সুন্দর শ্যাম, সখীগণ মাঝ।

আ! হায়! হায়! ভজন শুরু করে দিয়েছে বাঁশরীওয়ালী। এইবার কিছুক্ষণ পরে ঘুঙুর বাজবে, ঝুম-ঝুম-ঝুম। ঝুম ঝুম ঝুম! ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্; ঝুম্ ঝুম্।

জানলাটি বন্ধ করতে গিয়েও বন্ধ করা হল না গোকুলানন্দের; আবেশ লাগছে তার; দাঁড়িয়ে সে শুনতেই লাগল—

ঝুমুর ঝুমুর ঝুম নাচত নাগরী—
মুচকি মুচকি মধু হাস—
কিঙ্কিণী কঙ্কণ কিনি-কিনি কন-কন
গাওত সঙ্গীত আধ আধ ভাষ।

'ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, ঝুমুঃ ঝুমুর ঝুমু, ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু, ঝুম। ঝুমু ঝুমু ঝুমু, ঝমু, ঝুম। ঝুমু ঝুমু ঝুমু।' বেজেই চলেছে ঘুঙুর। বেজেই চলেছে।

একটা আবেশে যেন জ্যোৎস্নালোক নিথর স্পন্দনহীন। আনন্দে পৃথিবী যেন হারিয়ে যাচ্ছে। গোকুলানন্দও আবিষ্ট হয়ে গেছে। সে ভুলে গেল জানলা বন্ধ করতে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, চলল ওই শব্দ লক্ষ্য করে।

গান থেমে গেল, ঘুঙুর নীরব হল, তবু তার মোহ ভাঙল না। এসে দাঁড়াল রাধা-গোবিন্দজীর মন্দিরের আঙিনায়। লোকেরা চলে যাচ্ছে। বাঁশরীওয়ালী আহিরিণী পোশাকে সেজে নাচছিল, সে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে বিগ্রহের সামনে, দুটি হাত তার বিগ্রহের দিকে প্রসারিত। কিন্তু মূর্ছিত তো নয়। সে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

অকস্মাৎ মাধবানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কেশবানন্দ!

চমক ভাঙল গোকুলানন্দের। সে ছুটল: গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দ জেগেছেন। চেতনা ফিরেছে। বাঁশরীওয়ালী প্যারে যে ঘুমের ওষুধ দিয়ে

বলেছিল—অঘোরে ঘুমোবেন, সে ওষুধ তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে নি। হয়তো তার ভুল হয়েছিল। কঠোর ব্রহ্মচর্য এবং গভীর চিন্তা ও যোগের পথে সাধক মাধবানন্দের যে চৈতন্য আঘাতের প্রচণ্ডতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, আঘাতের প্রচণ্ডতার প্রতিক্রিয়ার কাল পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জাগতে শুরু করেছে যখন, তখন সাধারণ মানুষকে যে ওষুধ যতখানি এবং যতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে বা রাখতে পারে, তাঁকে তা পারে নি। অন্তরের মধ্যে সেই আঘাতের ক্ষণের উৎকণ্ঠাও চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে। এবং তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেই জাগিয়ে তুলেছে। তিনি ডেকে উঠলেন, কেশবানন্দ! শ্যামানন্দ!

তারপর তাকিয়ে দেখছেন চারিদিকের পারিপার্শ্বিক। বাস্তব জগতে ফেরবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। অপরিচিত পারিপার্শ্বিক। এ তিনি কোথায়? জাগ্রতোন্মুখ চৈতন্যলোকে ঝঙ্কৃত অপরূপ সঙ্গীতধ্বনির রেশ যেন মনের মধ্যে বেজে চলেছে। ক্ষীণ অস্পষ্ট হলেও মনে পড়ছে, শিয়রে সেই এক রহস্যময়ীর মুখ। জীবনের সেই প্রশ্ন যা চিত্তলোকে অনুভব করছেন, তারই যেন সে প্রত্যক্ষ শরীরী রূপ। তার সঙ্গে এই স্বল্পদীপালোকিত, জনহীন, পরিচ্ছন্ন, অনুপূর্ব ঘরখানির সম্পর্ক ঠিক আবিষ্কার করতে পারছেন না। খাপরার চাল। মাটিতে নিকানো দেওয়াল, বোধ হয় কাঁচা ইটের। তিনি হয়তো মৃত্যুর ওপারের রহস্যপুর থেকেই বিচিত্র ভাবে ফিরেছেন; এ গল্প তো অনেক শুনেছেন; এবং এখন তিনি মরজগতে ফিরেছেন এটা নিশ্চিত। কিন্তু এ তিনি কোথায়?

—গুরু মহারাজ!

হাত জোড় করে গোকুলানন্দ দাঁড়াল।

—গোকুলানন্দ?

—হাঁ পরুভু, আপনা দাস সেবক।

—এ আমি কোথায় গোকুলানন্দ? কেশবানন্দেরাই বা কোথায়? আমি তো গুলি খেয়ে জলে পড়েছিলাম! লড়াইয়ের কী হল? নবাবী কালাপোশেরা এমন করে হামলাই বা করল কেন? আর—

চারিদিক আবার একবার তাকিয়ে দেখে মাধবানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, আমি কোথায়?

—বাঁচাইলেন বাঁশরীওয়ালী প্যারেবাঈ। ই আশ্রম উনকি। রাধাগোবিনজীর মন্দিল। আশ্রম। ভগবানকে সাথ উনকি বাতচিত হয়। বাঁশরীওয়ালী প্যারে সাক্ষাৎ দেবী।

—বাঁশরীওয়ালী প্যারেবাঈ?

—হাঁ, মহারাজ, বাঁশরীওয়ালী প্যারে। গোসাঁইন। বড়া ভারি মাতাজী।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন মাধবানন্দ। গোকুলানন্দ সব বিবরণ বলে গেল। তিনি শুনলেন। মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন, নানান সিদ্ধান্ত, নানান বিশ্লেষণ এলোমেলো ভাবে আসছে যাচ্ছে। অচল সিং তাঁর উপদেশ অমান্য করে বিদ্রোহ করলে। কেন? বার বার তিনি বলেছেন, এখন নয়, লগ্ন আসুক। সে লগ্ন রাজনৈতিক সুযোগ-সন্ধান নয়, সে লগ্ন দেবতার নির্দেশ। সমস্ত কিছুর উপর মধ্যে মধ্যে ওই নাস্তিত্বের ছায়া পড়ে মিথ্যা মনে হয়, তবুও তো সবার

একসঙ্গে সময় নির্ণয় ক'রে একযোগে অভ্যুত্থানের একটা মূল্য আছে। তবে? সন্দেহ তাঁর বরাবরই ছিল, আজ বোধ হয় নিঃসন্দেহ হলেন যে, এই জায়গীরদার জমিদার ফৌজদার—এরা ধর্মরাজ্য-হিন্দুধরমশাহী মুখেই চায়, আসলে চায় না। সব চায় নিজের নিজের সুযোগ। কেশবানন্দেরা কোথায় গেল? কী করলে? এরাও কি—? হাঁ, তিনি জানেন, তাঁর সে-জানা সন্দেহাতীত সত্য যে, তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব থেকে মুক্তি পেলে ওদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে শুধু আক্রোশ, শুধু হিংসা; তার সঙ্গে লোভ, তার সঙ্গে কাম। ওঃ, গোপালানন্দের সে মূর্তি তাঁর মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দুনিয়ার জীবনের সমুদ্রে যেন একটা তুফান জেগেছে; কালে কালে জাগে; দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, ভালবাসা-হিংসা—কিছু হারায় না, একতিলও না; সব জমা হয়, তারপর একদিন তুফান ওঠে। দিল্লির তক্ততাউস নিয়ে হানাহানির মধ্যে পাঠান আলাউদ্দিন বাদশার খুড়োকে খুন করার পাপ থেকে ঔরংজীব বাদশার সব ভাইকে খুন করার পাপ আছে। নাদিরশাহী, আবদালশাহী, বর্গী হাঙ্গামা সব এক তুফানের পরের পরের ঢেউ। গোকুলানন্দ, গোপালানন্দ, কেশবানন্দের কারও জীবনের আগুন নেবে নি। সব আজ বাতাসে ছাই উড়িয়ে জেগেছে। পাপ-পুণ্য ধরম-অধরম সব একাকার হয়ে গেছে। আজ কিছুর মানে নেই। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য? কী ধর্ম, কী অধর্ম? তাঁর সামনে সেই নাস্তিত্ব, সেই কিছুই-না যখন এসে দাঁড়ায়, তিনি যখন নিজেই হারিয়ে যান, তখনকার কথা সামনে এসে দাঁড়াল।

জ্ঞাতুম্—ইচ্ছাই প্রশ্ন, সেই অদম্য ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে গেল, উত্তর তো মিলল না!

উত্তর নাই? প্রশ্ন জাগলে উত্তর খুঁজে বের করতে হয়, প্রশ্নের পথেই এগিয়ে চলতে হয়; কিন্তু পথ কোথায়? নাস্তিত্বের মধ্যে? বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন, স্থানহীন, কালহীন নিরর্থকতা নাস্তিত্ব।

না। না। তিনি যেন তার আকার দেখেছেন। হাঁ, দেখেছেন। কালো আবরণে ঢাকা অবয়ব, কালো কিছুতে ঢাকা মুখ তাঁরই মুখের উপর ভাসছিল। হাঁ। তারপর যেন সঙ্গীত-ঝঙ্কার শুনেছেন। তা হলে কি তাঁর উত্তর দেবার জন্য এসে সে দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে মূক দেখে হেসে ফিরে গেছে?

একটা কাতর আক্ষেপ সশব্দে তাঁর বুক যেন ফাটিয়ে বের হয়ে এল: আঃ!

গোকুলানন্দ সভয়ে দু পা পিছিয়ে এসে ডাকলে, গুরু মহারাজ!

বাইরে থেকে এসে ঢুকল আশ্রমে একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব। মাথার শিয়রে এসে ত্রিপদ থেকে ওষুধ নিয়ে খলে মেড়ে সামনে ধরে দেহাতী হিন্দীতে বললে, খেয়ে নিতে মহারাজের ইচ্ছা হোক। মহারাজের শরীর তো এখন বহুত দুর্বল। এখন ঘুম দরকার। খুদ্ বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী বলে দিলেন।

—বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী?

—হাঁ মহারাজ।

—কোথায় তিনি?

—তিনি মন্দিল মে।

—তাঁকে বল আমি তাঁকে নমো-নারায়ণ জানিয়েছি। দর্শন চাই। এখনি একবার যদি—

—তিনি এখন দেবতাকে শয়ন দিচ্ছেন। রাধারাণী-গোবিন্দজীকে শয়ন দিয়ে চরণসেবা করবেন। এখন তো আসতে পারবেন না।

—শয়ন দিচ্ছেন? চরণসেবা করছেন?

একটু হাসি দেখা দিল তাঁর মুখে। বিগ্রহের শয়ন, চরণসেবা? কংসারির মুখের দিকে চোখের দিকে চেয়ে কত বিনিদ্র রাত্রি তাঁর কেটে গেছে।

—ওষুধ পিয়েন গোসাঁইজী। খলটি সে এগিয়ে ধরলে।

খলটি হাতে নিয়ে মাধবানন্দ বললেন, অবসরমত একবার মেহেরবানি করে আসতে বলো গোসাঁইনকে। আমার কথা আছে।

—হাঁ। ই বাত আপনি বলবেন, ই তাঁর মালুম ছিল। বলিয়েছেন কী, কহনা—উনকে সামনা যানে কি প্যারেজী কি মানা হ্যায়।

—মানা হ্যায়? কার মানা?

—উ তো হামি জানি না! আপ শো যাইয়ে। নিদ যাইয়ে।

* * *

—কিসকে মানা?

হাঁ, কার মানা? বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী তো সকলের সামনেই মুখ খুলে বের হন, কথা বলেন, বিগ্রহের দরবারে হাজার হাজার লোকের সামনে ভজন গান করেন, নাচেন, তবে আমার সামনে মানা কেন? আপনার ঠাকুরের? রাধাগোবিন্দজীর?

বাঁশরীওয়ালী প্যারেকেই মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন; অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে বাঁশরীওয়ালী তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। পরনে ঘাগরা। কাঁচুলির উপর ঘন নীল রঙের ওড়নার দীর্ঘ অবগুণ্ঠন। বেশভূষার কাপড় মূল্যবান নয়, সাধারণ দেহাতী তাঁতের। কিন্তু রঙের প্রাচুর্যে ঝলমল করছে। যার মধ্যে দেহাতের রুচি সুস্পষ্ট।

এ ঘটনা আরও দশ দিন পরের। এই দশ দিনের মধ্যে মাধবানন্দ অনেকটা সেরে উঠেছেন। শরীরে বল পেয়েছেন—চলে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু সংবাদ পেয়েছেন নবাবী ফৌজ চারিদিকে কংসারি মঠের সন্ন্যাসীদের খোঁজ করছে। কারণ কংসারি মঠের সন্ন্যাসীরা নৌকো ছেড়ে দিয়ে পাহাড় জঙ্গল ভেঙে আজ এখান কাল সেখান করে ফিরছে, তাদের চেষ্টা তারা গঙ্গাজী পার হয়ে ওপারে পূর্ণিয়া-কিষণগঞ্জের দিকে গিয়ে অচল সিংয়ের ভাঙা দলের সঙ্গে মিলিত হবে। পথে ছোটখাটো লুঠতরাজ নিত্যই ঘটছে। বিশেষ করে কয়েকটা সরকারী থানা লুঠ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, নবাবের অনুগত কয়েকজন ছোট জমিদার বড় জোতদারের কাছারীবাড়ি লুঠ করেছে। গিধৌড় থেকে ত্রিকূট পর্যন্ত অঞ্চলে লুঠতরাজ করে সম্প্রতি তারা উত্তরমুখে ঘুরে বনের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। কয়েকটা মুসলমান-গ্রাম হাতী দিয়ে সমভূমি করে দিয়েছে। গিধৌড়ের রাজা এবং একজন

মুসলমান জমিদারের তিনটে হাতী তারা লুঠ করে নিয়েছে। এদিকে মুঙ্গের ওদিকে রাজমহল থেকে নবাবী ফৌজ তাদের পেছন নিয়ে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। তারাও পথেঘাটে সন্ন্যাসীদের অকারণ গ্রেপ্তার করে জুলুমবাজি চালাচ্ছে। মঠগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি পড়েছে। ওদিকে ঘিরিয়ার কাছে তাঁদের মূল মঠ তল্লাশি করে নবাবী ফৌজ প্রায় দখল করে রেখেছে। এ সময়ে পথে বের হওয়ার বিপদ আছে। এবং বাঁশরীওয়ালীও বের হতে দেয় নি। কিন্তু এখানে ধরা পড়লে বাঁশরীওয়ালীর বিপদ আছে। সেই সূত্রেই আজ বাঁশরীওয়ালী দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে মাধবানন্দের সঙ্গে কথা বলতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দশ দিন ধরে বাঁশরীওয়ালীর অস্তিত্ব তার ব্যক্তিসত্তার আস্বাদ প্রতিমুহূর্তেই গ্রহণ করেছেন —তারই চিকিৎসা, তারই শুশ্রূষা, তারই সেবা, তারই হাতের পথ্য পেয়েছেন; তার কণ্ঠস্বর শুনেছেন, হাসি শুনেছেন, গান শুনেছেন, তার নাচের নূপুরধ্বনি শুনে গভীর রাত্রে হেসেছেন, সাধনার কত বিচিত্র ধারাই মানুষ বের করেছে! জীবনের অপব্যয়কে দানখাতে খরচ লিখলেই আত্মগ্লানি থেকে অব্যাহতি। কিন্তু না। তা ভেবেও নিজে গ্লানিবোধ করেছেন। ওই গানের মধ্যে নাচের মধ্যে একটা কিছু আছে। সঙ্গীতের মাধুর্য ছাড়াও আরও কিছু।. নইলে গান শুনে কখন একসময় অনুভব করেছেন যে, তাঁর চোখে জল এসেছে—এমন হবে কেন? কিছু আছে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সামনে পেয়েও করেন নি। নিত্যই দিনে রাত্রে দুবার এমনই নীলাম্বরী অবগুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে বাঁশরীওয়ালী প্যারে এসে তাঁকে দেখে নীরবে চলে গেছেন। কপালে কোমল হাতের তালুর স্পর্শ এবং মণিবন্ধে তার চাঁপার কলির মত আঙুলগুলির স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাকিয়েও দেখেছেন তার গঠন ও সৌন্দর্য। অনাবৃত দুটি হাতের সুষমাও দেখেছেন। বিস্ময় বোধ করেছেন এই ভেবে যে, এই সুকুমার তরুণ বয়সের এ সাধনা সম্ভব হল কী করে? এ তো যেন কিশোরী কুমারী! অবশ্য প্রতিবারই দেখেছেন কুহেলির মত আলোর মধ্যে। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে একটি কোমল শীতল স্পর্শে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রতিদিনই তিনি চমকে উঠেছেন। মনে হয়েছে, তাঁর জীবনের সেই নাস্তিত্বের এ যেন অস্তিত্ব। নীলাম্বরীর দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃতা সুকুমার নারীমূর্তিটি মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রেখে উত্তাপ অনুভব করেছে। সেই অল্প আলোকে নীলাম্বরী ঘনকৃষ্ণাম্বরী বলে ভ্রম হয়েছে।

প্রথম দু-তিন দিন সচকিতভাবে প্রশ্ন করেছেন, কে? তুমি কে?

অবগুণ্ঠনাবৃতা নীরব থেকেছে, অচঞ্চল থেকেছে। পাশ থেকে উত্তর দিয়েছে গোকুলানন্দ: বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী প্রভু।

হ্যাঁ। তিনি সদ্য-স্নাতার কেশগন্ধ পেয়েছেন তখন। স্পর্শের শীতলতার মাধুর্যের অর্থ অনুভব করেছেন।

শেষ দিন হাত চেপে ধরে দুবার প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কে? গোকুলানন্দের উত্তর শোনার পর আবারও প্রশ্ন করেছিলেন, বল তুমি কে?

মূর্তি তেমনি স্থির অচঞ্চল ছিল।

গোকুলানন্দ তাঁকে নাড়া দিয়ে বলেছিল, গুরুজী! বোধ করি সে তাঁকে নিদ্রাঘোর-

বিভ্রান্ত ভেবেছিল। তিনি গোকুলানন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই সে মনে করিয়ে দিয়েছিল, প্যারেজী—বাঁশরীওয়ালী প্যারে আপনার নাড়ী দেখবেন।

তিনি আবার একবার ওই কৃষ্ণাবগুণ্ঠনাবৃতা মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখে হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর পর আর কোনদিন কোনও প্রশ্ন করেন নি। মনের প্রশ্নের নিবৃত্তি হয় নি, কিন্তু নিজেকে সংযত করেছেন। এক-একদিন ক্রোধ হয়েছে, অবগুণ্ঠনপ্রান্ত চেপে ধরে এক মুহূর্তে টেনে খুলে দিতে ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছেন। সন্ধ্যায় দেবকর্মে যাবার আগে আবার এসে দেখে যায় বাঁশরীওয়ালীজী। তখন আসে ভজনের আসরের সজ্জায় সেজে। সযত্ন কেশ-প্রসাধনে আমলকি ও মশলার গন্ধ পেয়েছেন। হাতের স্পর্শে উষ্ণতা অনুভব করেছেন।

তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়েছে—কী পেয়েছ? কিন্তু তাও করেন নি। সন্ধ্যায় তিনিও থাকেন নীরব স্থির। বোধ করি ওই সঙ্গে একটি দুটি কুঞ্চনরেখা ফুটে ওঠে ললাটে, কখনও বা একটু ক্ষীণ হাসির রেখা।

আজ বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী নিজেই কথা বলবেন অভিপ্রায় জানিয়েছেন। আজ সকালেই গোকুলানন্দ সংবাদ এনেছিল নবাবী ফৌজ ত্রিকূট পাহাড় থেকে মান্দারের পথে রওনা হয়েছে। সন্ন্যাসীর দল নাকি বনে বনে এইদিকে এসেছে। দুখানা গ্রামে তারা জুলুমবাজি করে সিধা আদায় করেছে—এ খবরের সুতার নাগাল পেয়েছে নবাবী ফৌজ। মাধবানন্দ গোকুলানন্দকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন, খবর করো গোকুলানন্দ, দলের খবর করো। আমি আজই রাত্রে এ আশ্রম ত্যাগ করব। দলের খবর মেলে ভাল, না মেলে আমি পথে বের হয়ে পড়ব। প্যারেজীর আশ্রমে নবাবী ফৌজের হাতে ধরা পড়ে তাকে বিপন্ন করতে পারব না। গোকুলানন্দ চলে গেছে। সন্ধ্যায় প্যারেজীর লোক এসে বললে, প্যারেজী আপনার সঙ্গে বাত বলতে চান।

—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। আপনার অনুমতি চাইছেন তিনি।

—কিন্তু কার যে মানা আছে শুনেছি। পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর, জিজ্ঞাসা করলেন, কার মানা? এ প্রশ্নটা আজ হঠাৎ যেন জেগে উঠল তাঁর মনে। দরজার মুখেই তখন কৃষ্ণ-অবগুণ্ঠনাবৃতা মেয়েটি ঢুকছিল; মাধবানন্দের কথা শেষ হতেই সে ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলে, কার মানা?

কথা হচ্ছিল দেহাতি হিন্দীতে।

মাধবানন্দ বললেন, হ্যাঁ। কার মানা? বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী তো সকলের সামনেই মুখ তুলে বের হন, কথা বলেন। বিগ্রহের দরবারে হাজার লোকের সামনে ভজন গান করেন, নাচেন, তবে আমার সামনে মানা কেন? কার মানা? রাধাগোবিন্দজীর? স্বপ্ন?

অবগুণ্ঠনবতীর মাথাটি 'না'র ভঙ্গিতে দুলে উঠল। 'না' অর্থাৎ তাঁদের মানা নয়।

—তবে?

—আমার শ্যামের।

—শ্যাম? গোবিন্দজী?

—না। গোবিন্দজী ভগবান। শ্যাম আমার শ্যাম। আমার গোসাঁই। আমার গুরু।

—কিন্তু কেন?

—আমার মুখ দেখলে আপনার পাপ হবে।

—তোমার মুখ দেখলে আমার পাপ হবে? বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী, তোমার সেবায় চিকিৎসায় আশ্রয়ে আমি বেঁচেছি। তুমি না থাকলে আমাকে নিশ্চিত মরতে হত। তোমার ভক্তি-গদগদ কণ্ঠের গান শুনেছি, শুনে কেঁদেছি। তোমার পায়ের নূপুরের শব্দে আবেশ এসেছে। চোখে দেখি নি, কিন্তু মনে মনে কল্পনা করতে পারি, তার মধ্যে তোমার সে আত্মনিবেদন। আমি শুনেছি এখানকার লোকে তোমাকে দেবী মনে করে। তবে তোমার মুখ দেখলে আমার পাপ হবে কেন?

—সে কথা থাক্ গোসাঁইজী, শ্যামের দেখা পেলে আমি শুধাব। তবে আমার ডর লাগে গোসাঁইজী কেন জান? কারণ লোকে আমাকে বলে প্যারে, আমার মধ্যে তারা নাকি দেখে রাধাভাবের ছায়া; আমার সাধনও সেই রাধাভাবের। তুমি গোসাঁইজী, মস্ত বড় যোগী, ভারী সাধনা তোমার। তোমার রাগ হলে আগুন জলে যায়; তোমার দিকে কেউ অবুঝ যদি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায় তো আপন কলুষে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরে। তুমি জ্ঞানী পণ্ডিত, তোমার হুকুমে রাধারাণীজীকে বনবাসে পাঠিয়েছ; গোসাঁই, আমাকে দেখে যদি তোমার রাগ হয়! আমি যে ভস্ম হয়ে যাব মহারাজ!

স্তব্ধ হয়ে রইলেন মাধবানন্দজী।

বাঁশরীওয়ালী বললে, ও কথা যাক গোসাঁইজী, যে কথা বলতে আমার শ্যামের হুকুম আমি আধা লঙ্ঘন করেছি, তাই বলি—

বাধা দিয়ে মাধবানন্দ বললেন, না। তার আগে আর কয়টা প্রশ্ন করব। লোকে বলে, আমারও বিশ্বাস, তুমি সিদ্ধি পেয়েছ।

—সিদ্ধি কাকে বলে জানি না গোসাঁই, তবে আনন্দ পেয়েছি। দুঃখে যখন কাঁদি তখনও সুখ পাই। সেও সুখ হয়ে ওঠে। সে যদি সিদ্ধি হয় তো পেয়েছি।

—তুমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও?

—তাও জানি না গোসাঁই। আমি তো কখনও দেখতে চাই নি।

—ভগবানের দর্শন?

—না গোসাঁই। ভগবানের দর্শন তো আমি মাঙি নাই, আমি চিরদিন চেয়েছি আমার শ্যাম—আমার গুরুর দর্শন। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে গোসাঁই—ষোল বছর। তখন আমার বয়স ষোল। আজ আমার বয়স বত্রিশ। ষোল বরিষ আজ আমার যৌবন-রূপের পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে ফিরছি।

—দেহকামনা নিয়ে তোমার সাধনা প্যারেজী? বিস্মিত হলেন মাধবানন্দ। এ হতভাগিনী বলে কী? এই নিষ্ঠা যার, তাকে দীক্ষা দিলে কে?

বাঁশরীওয়ালী হাতজোড় করে বললে, দেহের মধ্যেই যে বেঁচে থাকা গোসাঁই। দেহ আমার মূল, পরমাত্মা আমার ফুল। মূলের তিয়াস না মিটলে ফুল ফুটবে কেন মহারাজ? ফুল ফুটলে ভ্রমর আসে গুরু। ভ্রমর ভগবান। তখন ফল হয়। তুমি জ্ঞানী। আমি মুরখ্ দেহাতি ছোকরী। অপরাধ হলে নিও না। সংসারে যে ভাল কথা বলে সেই আমার আপনজন, যাকে বুকে ধরে বুক জুড়ায় সেই আমার পরমধন। ধরম কী তা জানি না গোসাঁই, যে করমে মনে আহ্লাদ, দেহে আহ্লাদ, তুমি খুশী, তারা খুশী, তাই আমার ধরম।

অভিভূত হয়ে শুনছিলেন মাধবানন্দ। কথাগুলি নূতন নয়, এ কথা অনেকবার অনেক-জনের কাছে শুনেছেন, ভণ্ড পণ্ডিতের মুখে মুখস্থ বুলির মত শুনেছেন, কূট নাস্তিকের মুখে তর্কের বক্র ছন্দে শুনেছেন, কিন্তু এমন বিশ্বাসের সঙ্গে পবিত্র জীবন-নিষ্ঠার কষ্টিপাথরে-যাচাই-করা সোনার মত পরিচয় নিয়ে কখনও কথাগুলি তাঁর সামনে ফুটে ওঠে নি। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর মুখ—মুখের ছবি।

বাঁশরীওয়ালী একটু থেমেছিল, আবার বললে, আপনি পণ্ডিত, আপনার ধরম আলাদা; কিন্তু গোসাঁইজী, ধরম আপনার যাই হোক, আপনি ওই সুন্দর দেহখানি ধরেছেন বলেই তো সে ধরমকে আপনি ধরতে পেরেছেন, আর ধরমও আপনাকে ধরে ধ্বজা তুলেছে। দেহের উপর রাগ কেন গোসাঁই? সে তো নিজের উপরেই রাগ করা গো! দেহের উপর রাগ করে মরা তো সোজা, কিন্তু তখন দাঁড়াই কোথা? কোথায় মাটি? তিয়াস মেটে কিসে? কোথায় জল? মাটি নাই, জল নাই, চাঁদস্থরয নাই—

চিৎকার করে উঠলেন মাধবানন্দ। যেন চোখের সম্মুখে সেই নাস্তিত্বের রূপ। চিৎকার করে উঠলেন, কে তুমি? কে? কে?

দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়ালেন তিনি। ওই অবগুণ্ঠন খুলে দেবেন।

হাতজোড় করে পিছিয়ে গেল বাঁশরীওয়ালী: না মহারাজ। তারপরই বললে, আমি কসুর করেছি গোসাঁইজী। আপনার সঙ্গে ধরমের তকরার করেছি। আপনি সিদ্ধপুরুষ, কংসারির সঙ্গে কথা হয় আপনার। আমার মুখ দেখবেন না। এ মুখ দেখে যদি আপনার মুখ অপ্রসন্ন হয়, তবে লজ্জায় যে মরে যাব আমি।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। আরতির সময় হয়েছে। বাঁশরীওয়ালী একটু চঞ্চল হয়ে উঠল; বললে, এসব কথা থাক্ মহারাজ; আমি দেহাতি মেয়ে, কিছুই জানি না। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, অহঙ্কার হল আমার, আবোল-তাবোল বকেই যাচ্ছি। প্রাণের আকুলি-বিকুলিতে আদেশ আধা লঙ্ঘন করে যে কথা বলতে এসেছি, তাই বলা হয় নি। আজ যে আমার ডর লাগছে গোসাঁই। নবাবী ফৌজ শুনছি—

মাধবানন্দ চঞ্চল হলেন না, অচঞ্চলভাবেই বললেন, সে খবর আমি পেয়েছি প্যারেজী।

—আপনি গোকুলানন্দকে পাঠিয়েছিলেন আপনার শিষ্যদের সন্ধানে। একজন ভিন্ গাঁয়ের লোক তাকে ধরিয়ে দিয়েছে নবাবী ফৌজের হাতে। খবর এসেছে।

—গোকুলানন্দ ধরা পড়েছে? চিন্তাকুল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবার মাধবানন্দ।

—আমাকে না বলে কেন পাঠালেন মহারাজ? আপনার শিষ্যরা ওদিকে গাঁয়ে জুলুমবাজি করছে। পরশু এক গাঁও হাতী দিয়ে ভাঙিয়ে দিয়েছে। এ লোক সেই গাঁওয়ের। এখন আপনাকে আমি বাঁচাই কী করে, সেই ভাবনায় আমি ছুটে এসেছি।

—ভাবনা তুমি করো না প্যারেজী। ভয় নাই। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। তোমার সেবা, তোমার স্নেহ, তোমার দেওয়া আনন্দের মত আনন্দ আমার জীবনে কখনও পাই নি। অনেক তপস্যা করেছি প্যারেজী, সিদ্ধি আমি পাই নি—শুধু কেঁদেছি, দুঃখ ভোগ করেছি, অনেক ভেবেছি, কিন্তু এ স্বাদ মেলে নি। আমার জন্যে তোমার বিপদ ঘটতে দেব না, আমি চলে যাব।

—রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী! কাতর স্বরে যেন কেঁদে উঠল বাঁশরীওয়ালী: না, না, না গোসাঁই, না। আমার বিপদের কথা আমি ভাবি নি গোসাঁই। আপনার জন্যে আমার বিপদ ঘটলে সেই বিপদেই ভগবান আসবেন, আমার সিদ্ধি হবে। আমার বিপদের জন্যে নয় গোসাঁই; কথাটা আপনাকে জানাতে এসেছি। আমি মনে মনে জেনেছি, আপনি চলে যাবার মতলব করেছেন। তাই হাতজোড় করে আপনার চরণ ধরে—

বাঁশরীওয়ালী যেন ভেঙে পড়ে গেল, নতজানু হয়ে বসে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, এমন কাজ আপনি করবেন না। আপনি বেরোবেন না। আপনি আমার পরম ধন।

বিষণ্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে উপরের দিকে চেয়ে মাধবানন্দ বললেন, বাঁশরীওয়ালী, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি যাব না। বলেই তিনি বুঝলেন, বলেই বিষণ্ণতায় আবার যেন ডুবে যাচ্ছেন।

কিন্তু সে কথা তাঁর সম্পূর্ণ হল না, মেঘের ডাকের মতই আকস্মিকভাবে একটা প্রচণ্ড গর্জনধ্বনি যেন ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার লোকের চিৎকার একসঙ্গে।

মুহূর্তে জলের স্রোতের টানে পড়ে বেঁকে যাওয়া বেতের লতা যেন স্রোতের টান থেকে মুক্ত হয়ে ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল; দীর্ঘ নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠনখানা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে বাঁশরীওয়ালী ছুটে বেরিয়ে গেল, পিঠের বেণীটা দুলে উঠল। অপরূপ কোমল লাবণ্যের চকিত একটা ঝলক খেলে গেল; দরজার মুখে বারেকের জন্য মুখ ফিরিয়ে সে বললে, আমি আসছি।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। বাইরে চিৎকার উঠেছে; হয়তো নবাবী ফৌজের কিংবা সন্ন্যাসী দলের। কিন্তু সে প্রশ্ন তাঁর মনে ছিল না। ছিল একটি প্রশ্ন—

—কে? ও কে? আকাশপাতালের অসীম শূন্যতায় হারানো একটি তারা আজ অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছে।

—বন্ধ করো, ফটক সব বন্ধ করো। নাকাড়ায় ঘা মারো।—নীচে কেউ আদেশ দিচ্ছে।

*   *

মাধবানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন: কে?

কতক্ষণ কে জানে? মাধবানন্দ ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনের অন্ধকার বিষণ্ণতার যবনিকায় যেন আগুন লেগেছে। ধোঁয়াচ্ছে। জ্বলে উঠবে। বাইরের কোলাহল কানে গিয়েও যাচ্ছে না। দরজার ওপারে অন্ধকার পার হয়ে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল বাঁশরীওয়ালী প্যারে। অবগুণ্ঠনহীন মুখ, ওড়নাখানা মেঝের উপর পড়ে আছে। হাঁপাচ্ছে সে। সন্ধ্যার আরতির সাজসজ্জা এই অল্পকালের মধ্যে বিস্রস্ত হয়ে গেছে। ভারী ভারী ফটক দুটো বন্ধ করিয়ে উঠোনের চারিপাশের ঘন আমবাগানের তল দিয়ে ছুটোছুটি করবার সময় বাধার জ্ঞান ছিল না। মাথার চুল উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে, সিঁথির ধুকধুকিটা একপাশে এসে পড়েছে। কাঁচুলির কাঁধটা ছিঁড়ে গেছে। মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

মাধবানন্দের চোখ দুটিও বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে: কে?

—আমি মোহিনী! ওগো গোসাঁই, আমি মোহিনী। তুমি তোমার চরণ ছাড়িয়ে নিয়েছিলে, তোমার চরণের ঘায়ে আমার ঠোঁট কেটে গিয়েছিল; এই দেখ সেই দাগ। তুমি মুখ দেখাতে বারণ করেছিলে। কী করব গোসাঁই—আমার শ্যাম—আমি সাধ করে দেখাই নি। পাশের গাঁয়ে নবাবী ফৌজ এসেছে, গাঁয়ের ওপাশে তোমার সন্ন্যাসীর দল। আমার হুঁশ ছিল না। আমার অপরাধ নিয়ো না গোসাঁই। তোমার সেবা করেছি; আমার সাধন সফল হয়েছে। আমার সাধনের শিক্ষাগুরু বলেছিলেন, তোর রূপ-যৌবনের পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে রাধাশ্যামের ভজন গেয়ে পথ চল্—তাকে পাবি, ওই কুম্ভের জলে তার অভিষেক হবে, আমার আশীর্বাদ রইল। গোসাঁই, আমি আমার কুম্ভের জল তোমার পায়ে ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়েছি। তুমি রেগো না গোসাঁই।

হেমন্তের রাস-পূর্ণিমার আগের রাত্রি আর শ্রাবণের ঝুলন-পূর্ণিমার আগের রাত্রি যেন এক হয়ে গেছে। ষোল বছর আগের সেই গড়-জঙ্গলের রাত্রি যেন ফিরে এসেছে। মেঘ আকাশে নেই; কিন্তু মাধবানন্দের দেহেমনে ষোল বছর ধরে যে গুমটের মত আচ্ছন্নতা নিরন্তর ঘনিয়ে ঘনিয়ে ওঠে, সেই আচ্ছন্নতাকে আজ বিদীর্ণ করে যেন বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হয়ে বর্ষণ নেমেছে, ঝড় উঠেছে; ঝড়-ঝাপটায়-বর্ষণে-বিদ্যুতে মাতামাতি লেগেছে জীবনে।

আজ জীবন এই বর্ষণে ধুয়ে ধুয়ে অমলিন অবারিত সত্যে প্রকাশিত হচ্ছে। আজীবন নিবারিত জীবনসত্যের এ কী মহাপ্রকাশ! আঃ! জীবনের সেই মর্মান্তিক নাস্তিত্ব আনন্দে আশায় সুখে দুঃখে সাধনায় কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাবগুণ্ঠনখসা মোহিনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার ষোল বছর ধরে কাঁখে-বওয়া রূপযৌবনের পূর্ণকুম্ভ থেকে অমৃত উথলে উঠছে। সেবার অমৃত, স্নেহের অমৃত, সান্ত্বনার অমৃত, শুশ্রূষার অমৃত অঞ্জলি অঞ্জলি পান করেছেন তিনি। আজ মৃত্যু-কোলাহলের সম্মুখে এই প্রাণ দিয়ে ঘিরে রাখার আকুতির মধ্যে সে অমৃত উথলে পড়ে বুকে প্লাবন তুলেছে। আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মৃত্যুর মধ্যেও তিনি একা নন। এ কী আনন্দ!

মাধবানন্দের চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল। বলতে চাইলেন—তুমি রাধা, তুমি রাধা, তুমি রাধা। কিন্তু পারলেন না।

কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড মহানাচনে নাচছে। দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি কোষ-মুখ থেকে উল্লাসের কল্লোল প্রস্রবণের ধারার মত বেরিয়ে আসছে। সৃষ্টির আদিপ্রান্তের অনাবিষ্কৃত কন্দর-মুখ থেকে জীবন-স্রোতের নির্গমন-কলরোল। তার ফেনিল আবর্তে আনন্দের জ্যোতির ছটার প্রতিফলনে হাজার ইন্দ্রধনু ফুটে উঠেছে! তাঁকে যে সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে কামনা করেছে, সে তার সম্মুখে; তিনি যাকে অবচেতনে মনের কোণে কোণে খুঁজেছেন—পান নি, সে আজ বাইরে এসে বিচিত্র ভাবে দাঁড়িয়েছে।

মোহিনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে, পথের শেষপ্রান্তে এসে সে আর পারছে না। তার চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। মুখে শোনিতোচ্ছ্বাসের প্রতিচ্ছটা। সে আত্মবিহ্বলা। বিস্রস্ত-বেশবাস। তার বক্ষাবরণ কাঁধের কাছটায় ছিঁড়ে গিয়ে সে অর্ধ-অনাবৃত। অতিশুভ্র-নবনীত তনু-লাবণ্য প্রদীপের আলোয় গলে গলে তাঁর জীবন হোমের শিখার সম্মুখে ঘৃত-ধারার আহুতির মত উদ্যত হয়ে রয়েছে।

অকলুষ আনন্দে অসঙ্কোচ বাহু বিস্তার করে প্রার্থীর মত নতজানু হয়ে বসলেন, এতক্ষণে কথা বের হল, তুমি রাধা—আমার রাধা!

মুহূর্তে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহিনী।

পূর্ণকুম্ভ আছাড় খেয়ে পড়ল বিগ্রহের মাথায়। এক মুহূর্তে প্লাবনে সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে ছড়িয়ে পড়ল।

* * *

মোহিনী বললে, গোসাঁই, বড় দুঃখ না হলে সাধনে মন বসে না। দুঃখের আসনে না বসলে রাধারাণীর দয়া হয় না। ঠোঁটটা কেটে গেল, তুমি বললে—ভোর হলেই চলে যেয়ো, তোমার মুখ যেন না দেখতে হয়।

—মোহিনী!

না, মোহিনীর মুখ তো এ নয়। এ মুখ রাধারাণীর স্নানজলে ধুয়ে ধুয়ে অন্য মুখ—শ্যাম।

—দুঃখে অভিমানে সেই তখনই বেরিয়ে গেলাম। বনের পথ যেদিকে যায় সেই দিকেই চলেছিলাম। কেমন করে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এসেছিলাম জানি না। তারপর পড়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে। জ্ঞান যখন হল তখন মাথার কাছে দেখলাম, বড় সুন্দর এক বুড়ী মাকে। আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে শুধু বললে, বেটী! আমার মনে হল, গোসাঁই, আমার সব হারিয়েছিল, আমি সব পেলাম। সেই বুড়ী মায়ের এই আশ্রম। সে ছিল কাশীর মস্ত বড় বাঈজী। সন্তান হল একটি, তাকে হারিয়ে মান্দারে গোপালের সাধনায় সন্ন্যাসিনী হয়ে ভজন করত। বাদশাহী সড়ক ধরে যাচ্ছিল বিষ্ণুপুরে হরিনামের বেগার-জেলেওয়ালা রাজা দুর্জন সিংহের বাড়ি মদনমোহনের আঙিনায় ঝুলনে ভজন গাইতে। আমার ভাগ্য গোসাঁই, উটের গাড়ির উপর থেকে ভজনওয়ালী নন্দরাণী মা আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়েছিল যশোদার মত। সে আমাকে গান শিখিয়ে নাচ শিখিয়ে বলেছিল—এই তোর সাধন। বাঁশের বাঁশী বাজাতে শিখেছিলাম, তাই বাঁশী হাতে দিয়ে বলেছিল—তুই বাঁশরী-ওয়ালী প্যারে, মন্তর না, তন্তর না, ধরম না—এই মন্তর, এই ধরম। ভগবান চাস না, মিলবে

না। মানুষ যাকে চায় তাকে চাইবি। পাস না-পাস তার জন্য প্রাণপাত করবি, মরবি, তখন আপনি আসবে ভগবান। আমি পেয়েছি গোসাঁই।

মাধবানন্দ বাক্যহারা। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

বাইরে কোলাহল বাড়ছে।

হেমন্ত-শুক্লা-চতুর্দশীর জ্যোৎস্নাকে নিষ্প্রভ করে দিগন্ত-আকাশে আগুনের ছটা ফুটেছে। আগুন লেগেছে। গ্রাম পুড়ছে।

* * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা।

আকাশে রাস-পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

কোলাহল উঠছে বাঁশরীওয়ালী প্যারের আশ্রমে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসছে লোক। বাঁশরীওয়ালী বৃন্দাবন যাচ্ছে। সাধন পূর্ণ হয়েছে। সাধুর বেশে স্বয়ং শ্যাম এসেছিলেন নিতে। মন্দিরের সামনে রাশি রাশি ফুলে ঢাক দুটি শব।

বাঁশরীওয়ালী প্যারে আর মাধবানন্দ।

উদয়-মুহূর্তে মারা গেছেন মাধবানন্দ; তাঁর দেহের উপর পড়ে দেহত্যাগ করেছে বাঁশরী-ওয়ালী। মাধবানন্দের দেহখানা দলিত পিষ্ট মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। তাঁর নিজের দলের হাতী তাঁকে পায়ে দলে দিয়ে গিয়েছে।

যুদ্ধোন্মত্ত হাতীর সামনে গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন মাধবানন্দ।

সারারাত্রি এই গ্রামের ও-প্রান্তে নবাবী ফৌজ আর সন্ন্যাসীর দলে লড়াই হয়েছে। গোকুলানন্দকে গ্রেপ্তারের সংবাদ সন্ন্যাসীদের কাছে পৌঁছেছিল, গ্রামের লোক তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তারা কঠিন আক্রোশে ফিরেছিল, গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ওদিকে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল নবাবী ফৌজ। দু দলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলেছে শেষরাত্রি পর্যন্ত। শেষরাত্রে নবাবী ফৌজের কাছে হটে গিয়ে সন্ন্যাসীরা মান্দার পাহাড়ের কোলে বনের দিকে পালাবার পথে সম্মুখের গ্রাম লুঠে জ্বালিয়ে হাতী দিয়ে ভূমিসাৎ করে চলে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীর আর্তনাদে আর থাকতে পারেন নি মাধবানন্দ। তিনি বেরিয়ে এসে পথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন তলোয়ার হাতে। যুদ্ধোন্মত্ত হাতী ছিল সর্বাগ্রে। সে শুঁড় দিয়ে ঘরের চাল টেনে নামাচ্ছিল; মাথা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল দেওয়াল। আবার ছুটছিল সম্মুখে। সে রূপ ভীষণ রূপ! হাতীর উপরে বসে চিৎকার করছিল কেশবানন্দ: হরি-হর! হরি-হর! হরি-হর!

পথের উপর লাফ দিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন মাধবানন্দ: না। না। রোখো। কেশবানন্দ!

সে ডাক বোধ হয় শুনতে পায় নি কেশবানন্দ। পাগলা হাতী শুঁড় দুলিয়ে ভয়ানক চিৎকার করে ছুটে এসেছিল। সে মানবে কেন? মাধবানন্দ একপাশে সরে গিয়ে সবলে তলোয়ারের আঘাত করেছিলেন তার শুঁড়ে। প্রচণ্ড চিৎকার করে হাতী দুর্বার বেগে দলের গুরুকে পায়ে দলে সম্মুখপথে ছুটে চলে গেছে। সন্ন্যাসীর দল শেষ মুহূর্তে তাঁকে চিনেছিল,

কিন্তু দাঁড়াবার তাদের উপায় ছিল না। পিছনে ছুটে আসছে হয়তো নবাবী ফৌজ।

আশ্রমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল বাঁশরীওয়ালী, স্থিরদৃষ্টিতে দেখছিল। হাতীটা ছুটে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে এসে মাধবানন্দের দলিত দেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছিল। তারপর আর ওঠে নি।

পিছনে আসছিল উন্মত্ত গ্রামের লোক। নবাবী ফৌজ ক্লান্ত। তারা বিশ্রাম নিচ্ছে। গ্রামের লোক পিছু নিয়েছিল সন্ন্যাসীদের। কিন্তু বাঁশরীওয়ালীর বিচিত্র মৃত্যু দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়েছিল।

বাঁশরীওয়ালী প্যারের সাধন পূর্ণ হয়েছে রাস-পূর্ণিমার প্রভাতে। শ্যাম তাকে নিতে এসেছিল সন্ন্যাসীর বেশে। শ্যাম হাতীকে বধ করে বৃন্দাবন ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশরীওয়ালী প্যারে।

হাতীটা গ্রামপ্রান্তে গিয়ে পড়েছে। সন্ন্যাসীরা পায়দল পালিয়েছে উত্তরমুখে।

পালাক। পালাতে দাও তাদের। গাঁয়ের লোকেরা, এস। ফুল আন, ধূপ আন, চন্দন আন, সোনা আন, রূপা আন, বেনারসী শাড়ি আন, ভারে ভারে আন গঙ্গাজল। প্রণাম কর।

শ্যামের সঙ্গে বাঁশরীওয়ালী প্যারে যাচ্ছেন বৃন্দাবন।

ও সে গোপন মনের গুপ্ত বৃন্দাবন।
হোক না লক্ষ কুরুক্ষেত্র
বৃন্দাবনে অহরহ যুগল-মিলন।

লোকে আজও গান গায়। গায় ওই বাউলেরা

গ্রন্থপরিচয়

কীর্তিহাটের কড়চা

'কীর্তিহাটের কড়চা'র তৃতীয় খণ্ড 'তারাশঙ্কর-রচনাবলী'র পঞ্চদশ খণ্ডে সংযুক্ত হয়েছে। পূর্বতন দুটি খণ্ডে—অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে 'কীর্তিহাটের কড়চা'র যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সংযুক্ত হয়েছে। 'কীর্তিহাটের কড়চা'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড স্বতন্ত্র পুস্তক-আকারেও পাওয়া যায়। এই কালজয়ী বিপুলায়ন উপন্যাসটি দীর্ঘ আড়াই বৎসর কাল ধরে 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিক রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারাশঙ্করের মৃত্যুর পূর্বে আর বই হয়ে বের হওয়া সম্ভব হয় নি।

বর্তমান খণ্ডে 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় সবচেয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের আমল ও প্রধানত তাঁর কীর্তিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রত্নেশ্বর রায়ের আমল উনবিংশ শতাব্দীর জমিদারী প্রথার স্বর্ণ যুগ। সেই স্বর্ণ যুগের নানা প্রাচুর্য ও বিলাস-বৈভবের এবং বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করবার বিচিত্র কাহিনী 'কীর্তিহাটের কড়চা'র মধ্যে পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের বাংলাদেশের জীবনযাত্রা ও জমিদারী পরিচালনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন প্রাচীন জমিদার-বংশ-সম্ভূত। তাই জমিদার বংশের পতন ও উত্থানের নানা কাহিনী তাঁর জানা ছিল। যে প্রজাস্বত্ব আইন ও মামলা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা ও উল্লেখ করেছেন—সেগুলির মধ্যে অনেক আইন আজ ইতিহাসের 'মহাফেজ-খানা'য় কালের গর্ভে নিহিত। পূর্বতন জমিদার ও তাঁদের আমলারা—আজও যাঁরা জীবিত—তাঁরা ছাড়া এখন আর এগুলির অর্থ কেউ বুঝবেন না। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া অনেক মধুর ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কাহিনী অতীত থেকে উদ্ধার করেছেন প্রবীন ও যশস্বী কথাকার।

রত্নেশ্বর রায়ের পুত্রদের বিলাসবহুল ইংরেজি শিক্ষায় দীক্ষিত জীবন-যাপনের কাহিনী পড়তে পড়তে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের বছরগুলির বিলীয়মান স্মৃতি এবং বিংশশতাব্দীর সূচনা ও উষাকালের কথা 'কড়চা' পাঠকদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখনকার ধনী বাঙালীদের জীবনযাত্রার প্রণালী—তাঁদের ধ্যান ধারণা ও কয়লাখনির ব্যবসা, ইংরেজী সংবাদপত্র পরিচালনা ও বিলেত যাওয়া ও বিলিতি সভ্যতার অনুসরণের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় 'কীর্তিহাটের কড়চা'য়।

অন্যান্য খণ্ডের মতই এই খণ্ডেও এই মহা উপন্যাসের চমৎকারিত্ব, নাটকীয়তা এবং চলচ্চিত্রের প্রবহমান দৃশ্যের মত ঘটনার স্রোতও বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রবীন কথাশিল্পী দৃঢ় প্রতীতি নিয়ে গত দেড় শত বছরের বিরাট ভাঙাগড়ার কাহিনী বিরাট

ক্যানভাসে এঁকেছেন। মহাকালের মন্দিরা-ধ্বনি তিনি যেন শুনতে পেয়েছিলেন। তাই এত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিগত যুগের দলিলের খসড়ায় আঁকি-বুকির আঁচড় কেটেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁর 'কড়চা'র রঙ বিন্দুমাত্র ফিকে হয়নি॥

রাধা

সাম্প্রতিক কালে যে কয়েকটি বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে তারাশঙ্করের 'রাধা' তার মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান পাবার দাবী রাখে। সাহিত্য-স্রষ্টা তারাশঙ্করের পরিণত বয়সের রচনার উৎকর্ষ ও সাফল্যের নিদর্শন তাঁর 'রাধা' উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। 'রাধা' উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজির মধ্যেও একটি মহামূল্যবান সম্পদ বলে চিহ্নিত করা যায়। 'রাধা' সম্পর্কে আলোচনার আগে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পশ্চাৎপট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাঁচ দশকের প্রারম্ভ থেকে দীর্ঘ কাল, প্রায় কুড়ি বছর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ঢেউ বাংলা সাহিত্যে এসেছিল। অগণিত লেখকের—কাছের ও দূরের ইতিহাসকে আশ্রয় করে—অসংখ্য ঐতিহাসিক কিম্বা ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রচিত হয়েছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় লেখকের রচনাই কালজয়ী রচনা হিসেবে কালের পটে স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। সেই বিরলতম প্রতিভার সৃষ্টি হচ্ছে তারাশঙ্করের 'রাধা' উপন্যাস। এই সঙ্গে বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ও 'লালকেল্লা', গজেন্দ্র-কুমার মিত্রের 'সোহাগপুরা' ও 'বহ্নিবন্যা' এবং বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর নাম করতে হয়। রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ-এর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। 'রাধা' উপন্যাসটি বঙ্কিম-রমেশ-হরপ্রসাদ ও রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহ্যের ধারা বহন করছে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাস থেকে কিছু অগ্রবর্তী কালের ইতিহাসকে আশ্রয় করে 'রাধা' রচিত হয়েছে।

'রাধা' উপন্যাসটি পুস্তক আকারে প্রকাশের পূর্বে 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'রাধা' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ: দোলপূর্ণিমা ১৩৬৬ পৃ. ২+৩২৪ ষোল পেজী ডবল ডিমাই। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রচ্ছদপট। প্রকাশক: ত্রিবেণী প্রকাশন: ১৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

'রাধা'র প্রথম 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭৪। ষোল পেজী ডবল ডিমাই সাইজ পৃ. ৮+২৭১। আশু বন্দোপাধ্যায় অঙ্কিত ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট। প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দ্বিতীয় 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৭৭)। 'তারাশঙ্কর—রচনাবলী'র পঞ্চদশ খণ্ডে ২য় মিত্রঘোষ সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

'রাধা'র উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ :

"শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরম মিত্রবরেষু

দোল পূর্ণিমা ১৩৬৪"

রাঢ়ের প্রান্তসীমায় অবস্থিত বীরভূম জেলা—কয়েক শতাব্দী ধরেই বৈষ্ণব ও শক্তি সাধকদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। জয়দেব-কেঁদুলী প্রায় হাজার বছর ধরে বৈষ্ণব তীর্থ ও পুণ্যভূমি। রাঢ়ের তাল তমাল ছাতিম ও শালবনের ছায়ায় গড়ে উঠেছে বাউল ও বৈষ্ণবদের সাধন ও ভজন ক্ষেত্র—শ্রীপাট ও আখড়া। বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় যুগ যুগান্ত ধরে কত বৈষ্ণব পদকর্তা ও বৈষ্ণব সাধক এবং সহজিয়া ও বৈষ্ণব সাধনার তত্ত্বজ্ঞ ও মর্মজ্ঞের ঘটেছে আবির্ভাব। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর থেকেই রাঢ়ে—বিশেষ করে বীরভূম ও অজয়ের তীরে বৈষ্ণব সাধনা প্রবল। সেই সঙ্গে এসে মিশেছে শক্তি সাধনা। শক্তি ও তন্ত্র সাধনার এত পীঠস্থান—একত্র এত সমাবেশ অন্যত্র আর দেখা যায় না।

তারাশঙ্কর সাহিত্য সৃষ্টির আদিতেই-বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের নিয়ে লিখেছেন 'রাইকমল'। তাঁর প্রথম দিকের গ্রন্থগুলির নামকরণের মধ্যেও বৈষ্ণব চেতনা ও বৈষ্ণব ভাবনার চিহ্ন পরিস্ফুট। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের বৃত্ত যতই পরিবর্ধিত হয়েছে—ততই বৈষ্ণব ভাবনা ও শক্তি সাধনার কথা এসেছে। বীরভূম ও রাঢ়ের দুটি ধর্ম-সাধনার ধারাই তারাশঙ্করের রচনায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

* * *

'রাধা' তারাশঙ্করের পরিণত বয়সের একটি বিশিষ্ট রচনা। বিষয় নির্বাচন, পাত্র ও পাত্রী এবং স্থান ও কালের যথার্থ বর্ণনায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রাঢ় ও বঙ্গের ইতিহাসের সজীবও উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্করের সাফল্য ইতিহাস-আশ্রয়ী সার্থক উপন্যাস হিসেবে 'রাধা'র মুখ্য স্থান পাবে। তারাশঙ্করের ইতিহাস-মনস্কতার এক আশ্চর্য দলিল হোলো এই কালজয়ী উপন্যাস। সেই সঙ্গে নবাবী আমলের ইসলামী সমাজের এবং নিম্নবর্ণের মুসলমান সমাজেরও কিছু কিছু খণ্ডিত কিন্তু নিখুঁত চিত্র নিপুন হাতে এঁকেছেন তারাশঙ্কর।

বৈষ্ণব ও তন্ত্র সাধনারও কিছু কিছু বিকৃত ও ব্যভিচারী ভাবের নিখুঁত আলেখ্য পাওয়া যায় বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসী ও ইলামবাজারের ধনী ব্যবসায়ী রমণ দাস-সরকারের পরকীয়া রসের সাধনা ও ভজনার মধ্য দিয়ে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব প্রেম-ধর্মের ব্যপ্তি ও উদারতা সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নিতান্ত ব্যভিচার ও বিকৃত ধর্ম সাধনায় পর্যবসিত হয়েছে। তারই নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন তারাশঙ্কর। কৃষ্ণদাসীর 'সাধন রাত্রি'র বেশ বাসের বর্ণনা এরকম : "সেদিন সন্ধ্যার মুখ। কৃষ্ণদাসী তখন ব্যস্ত। ঘরের সকল কাজ সেরে নিয়েছে। প্রভুর আরতি হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুত হচ্ছে সে 'সাধন রাত্রি'র

জন্য। দেহ-মার্জনা আছে, প্রসাধন আছে। দুধের সর এবং ময়দা মুখে মেখে ধুয়ে-মুছে হলুদের-সূক্ষ্ম চূর্ণ-বাঁধা মিহি কাপড়ের থুপনিটি মুখের উপর হালকাভাবে বুলিয়ে নিয়ে রসকলি তিলক আঁকতে হবে। চুল বাঁধা আছে। রাধারমণ দাস-সরকার প্রৌঢ় বৈষ্ণব মানুষ, নটীর প্রসাধন বা সজ্জা তাঁর কাছে পলাণ্ডুর মতই অস্পৃশ্য, অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবী-বেশ না-হলে তিনি দোর-গোড়া থেকেই ফিরিয়ে দেবেন। বৈষ্ণবীর বেশই তাকে এমন করে করতে হবে, যাতে সুর্মা-টিপ-ওড়না-চুড়ি-সমৃদ্ধ নটী বা তওয়াইফী বেশকে হার মানাতে পারে। ব্যস্ততা সেই জন্য।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী', পঞ্চদশ খণ্ড।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মহিলাদের প্রসাধন রীতির একটি নিখুঁত চিত্র এবং সেই সঙ্গে রূপ-চর্চার প্রকরণের ফিরিস্তিও পাই কৃষ্ণদাসীর বেশ-রচনার মধ্যে।

রাধারমণ দাস-সরকার মশাইয়ের কুঞ্জে কৃষ্ণদাসীর অভিসারের বর্ণনাটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনী গৃহের বিলাস বৈভবের একটি মূল্যবান আলেখ্য। তারাশঙ্করের পরিবেশ রচনার দক্ষতা এসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে :

"সুন্দর সাজানো ঘরে বসে দাস-সরকার তামাক খাচ্ছিলেন। সুগন্ধি কাষ্ঠ গড়ার তামাক। ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ ভুর-ভুর করছিল। রাঢ় অঞ্চলের মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল ঘর খড়ি মাটি দিয়ে নিকোনো; লম্বায় চওড়ায় বেশ বড় ঘর। দরজার পাশে মাথায় পটুয়ার তুলিতে আঁকা সুন্দর পদ্ম; কুলুঙ্গির মাথায় মাথায় ছোট ছোট আল্পনা। এ ছাড়াও দেওয়ালগুলির ঠিক মাঝখানে ব্রজলীলার এক-একটি অধ্যায় বেশ বড় বড় করে আঁকা—মানভঞ্জন রাসলীলা বস্ত্রহরণ দোললীলা। এসবের মাঝখানে ঢুকেছে মুসলমানী আমলের লতাপাতা ফুল পাখি। মেঝেটি জমানো খোয়ার—উপরে পঙ্কচূনের পালিশ। মেঝের উপর পুরু গালিচার ফরাস। গালিচার উপর কয়েকটি মখমলের তাকিয়া। দেওয়ালে শৌখিন দেওয়াল-গিরিতে সামাদানের মধ্যে বাতি জ্বলছে। চার দেওয়ালে আটটি দেওয়াল-গিরিতে জোড়া সামাদানে ষোল বাতির আলোয় ঘরখানি উজ্জ্বল। তার উপর খড়ি-মাটীর কোমল শুভ্র লেপনের প্রতিফলন সে উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বড় একখানি গালিচার আসন। তার সামনে জ্বলছে বড় পিলসুজের উপর বড় একটি প্রদীপ। গন্ধে বোঝা যায় প্রদীপ তেলের নয়, ঘিয়ের। আর নামানো হয়েছে রূপোর রেকাবিতে নানান উপকরণ। ফুলের মালা, ফুল, চন্দন, চুয়া, পান, একটি আতরদানও নামানো রয়েছে। দাস-সরকারের কাছে নামানো একখানি চমৎকার খোল। দাস-সরকার কৃষ্ণদাসীর কথায় মুখ তুলে চোখ মেলে তাকালেন। বেশ জোর করেই তাকাতে হল যেন। চোখ দুটি রাঙা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। ওঠারই কথা। সন্ধ্যার মুখেই দুগ্ধ এবং সর-সহযোগে অহিফেন সেবন হয়েছে, তার উপর এই তামাক-ছিলিমটির অব্যবহিত পূর্বেই সেবন করেছেন সকাল থেকে গোলাপ জলে-ভিজানো ত্বরিতানন্দ একদফা। ত্বরিতানন্দ অর্থাৎ গাঁজা। কেউ কেউ তুরীয়ানন্দও বলে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যের যবনিকা যেন ফাঁক হয়ে গেছে সরকারের চোখের সামনে। মৃদঙ্গ বাজিয়ে বিশ্বজগৎ নৃত্য করতে করতে চলেছে—অপ্সরীর মত

রাসমঞ্চের চারিপাশের অষ্টসখীর মত, আর রাধারমণ সরকার যেন কেন্দ্রস্থ গোবিন্দের চরণ-পদ্মে স্থির ভ্রমরটির মত বসে আছেন।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী,' পঞ্চদশখণ্ড,)।

আবার কৃষ্ণদাসীর রাধারমণ দাস-সরকার সঙ্গে কুঞ্জে অভিসারের বিশদ বর্ণনা যেমন আছে—তেমনি পাশাপাশি তারাশঙ্কর কৃষ্ণদাসী ও মোহিনীর জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটি বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণদাসীর আখড়ার জীবন—তার দাস-সরকারের কুঞ্জে অভিসার গমনের চিত্র এবং সেই সঙ্গে আবার নিশীথ রাত্রিতে ডাকিনী-মন্ত্রে দীক্ষিতা কৃষ্ণদাসীর জীবনের ভয়ঙ্কর অভিশাপের চিত্র মনকে অভিভূত করে—এক অজানা জগতের দ্বারদেশে নিয়ে যায়।

আবার খুসটি কুরির পীর সিদ্ধপুরুষ হজরৎ হোসেন সাহেবের সঙ্গে আনন্দচাঁদ ঠাকুরের সিদ্ধাই-পাওয়া শক্তির লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

"খুসটি কুরির পীরতুল্য সিদ্ধপুরুষ হজরৎ হোসেন সাহেব একবার আনন্দ ঠাকুরের শক্তি পরীক্ষার জন্য বাঘের পিঠে চড়ে দেখা করতে এসেছিলেন। সঙ্গে উপঢৌকন এনেছিলেন সোনার থালায় সুন্দর খাঞ্চিপোশে ঢেকে হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস। আনন্দ ঠাকুর তখন একটা ভাঙা পাঁচিলের উপর বসে কাজকর্ম দেখছিলেন। হজরৎ বাঘের পিঠে সুরপুরের প্রান্তে উপস্থিত হতেই ঠাকুর পাঁচিলকে বললেন, চল। পাঁচিল চলতে লাগল, এসে হাজির হল গ্রামে ঢোকবার প্রবেশপথে। হজরৎ অবাক হলেন। তাঁর আর সাহস হচ্ছিল না হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস উপঢৌকন দিতে। কিন্তু ঠাকুর বললেন, ও কী হজরৎ, আমার জন্যে এমন সমাদর করে উপঢৌকন এনে আমাকে না দিয়ে আপনি লুকোচ্ছেন কেন? না না না, দিন দিন। বলে থালাখানি প্রায় কেড়ে নিয়ে খাঞ্চি-পোশ খুলে ফেললেন। সে অবাক কথা, সাধারণ মানুষ ছার, হজরৎ সাহেবই অবাক হয়ে দেখলেন—থালায় মাংস কোথায়! মাংস নেই; তার পরিবর্তে রয়েছে সদ্য-ফোটা একরাশি লাল পদ্ম-পুষ্প; তার গন্ধে চারিপাশে মৌমাছি এসে জমতে লাগল।" ('তারাশঙ্কর-রচনাবলী,' পঞ্চদশখণ্ড)।

আবার তার মধ্যেই নবজাগরণের—ব্যভিচার ও বিকার-মোচন করবার জন্যে শ্যামরূপার গড়ে আবির্ভাব ঘটেছে নবীন সন্ন্যাসী মাধবানন্দের। মাধবানন্দের উপাস্য দেবতা বাংলার ননীচোরা নৌকা-বিলাসের নায়ক কানাই নন—তিনি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব। ইলামবাজার ও জয়দেব-কেঁদুলীর বিলাস বহুল জীবনযাত্রার পাশাপাশি শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে 'রাধা' উপন্যাসে দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ও নিছক ধর্ম-উপাসক নন—তাঁদের অন্তরেও ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে একটা গূঢ় এষণা বর্তমান। তাঁরা অত্যাচারী-সন্ন্যাসীর ভেকধারী মারাঠি দস্যুদের দমন করেন। দমন করেন নারীর সতীত্ব নাশকারী রাধারমণ দাস-সরকারের ক্রূর ও বন্যবরাহ তুল্য হিংস্র ও কামুক ও লম্পট পুত্রের অত্যাচার। অক্রূর দাস-সরকারের আস্ফালন খর্বিত করেন। সেজন্যে তাঁরা যুদ্ধ করতেও পিছিয়ে যান নি।

আবারও কৃষ্ণদাসীর অভিশপ্ত জীবনের কথা এসে পড়ে। তার 'বাট-বওয়া'র নির্মম ও ভয়ঙ্কর বর্ণনার কথা মনে আসে। ঘটনার বৈচিত্র্যে অভিনবত্বে ও চমৎকারিত্বে পাঠকের মনকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় কৃষ্ণদাসীর বিকৃত বৈষ্ণব-সাধনা ও নিম্নতন্ত্র ও ডাকিনী মন্ত্রের সাধিকা-জীবনের বিবরণ তারাশঙ্কর বোধহয় 'রাধা'র আলো-আঁধারে পরিবেশ ভিন্ন অন্যত্র দিতে পারতেন না। স্বর্ণ ডাইনীর গল্প বলতে গিয়ে একবার শুধু বলেছিলেন 'বাট-বওয়া'র কথা। এমন বিশদ বর্ণনা সেখানে করেন নি।

আবার 'গোবিন্দ মোহিনী' বা 'মোহিনী'র কথা যখন লিখেছেন—তখন মনে হয় লিখেছেন এক অনাঘ্রাতা যুথিকা ফুলের কথা। এমন অভিজ্ঞতা মিষ্ট ও মধুর কিশোরী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। হোসেন ও আমিনার প্রেম কাহিনীও বড় মধুর।

'রাধা' উপন্যাসের 'কয়ো' চরিত্রটিও লেখকের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এই অন্ত্যজ নিঃসঙ্গ কদাকার চেহারার মানুষটির মধ্যে একটি দয়াশীল ও স্নেহ পরায়ণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ মানবের ছবি পাই। মানব জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধ এই চরিত্রটির মধ্যে বিধৃত—লেখক অত্যন্ত মমতা দিয়ে সযত্নে রচিত করেছেন এই 'কয়ো' চরিত্রটি।

এইসব ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে 'সুবে বাংলা'র নবাবী দরবারের বিলাস ও শাসনের চিত্রও পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের বিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি 'কীর্তিহাটের কড়চা'র বীজরূপ যেন দেখতে পাই 'রাধা'র মধ্যে। 'রাধা' না লিখলে তারাশঙ্কর তাঁর মহত্তম সৃষ্টি 'কীর্তিহাটের কড়চা' রচনা করতে পারতেন না। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি তারাশঙ্করের 'রাধা'। চিরায়ত বা 'ক্ল্যাসিক' সাহিত্যরসে সংপৃক্ত এই উপন্যাসটি পাঠ করে তৃপ্ত হবেন পাঠকবৃন্দ একথা বলাই বাহুল্য।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত